বোখারী শরীফ

(বাংলা তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা)

পঞ্চম খণ্ড

সীরাতুন-নবী সঙ্কলন

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ)
প্রাক্তন প্রিন্সিপাল জামেয়া কোরআনিয়ার

ফয়েজ ও বরকতে

মাওলানা আজিজুল হক সাহেব
মোহাদ্দেছ জামেয়া কোরআনিয়

কর্তৃক অনুদিত।

হামিদিয়া লাইব্রেরী

প্রকাশনায় :
আল্‌হাজ্জ মোহাম্মদ গোলাম আযম
হামিদিয়া লাইব্রেরী
৬৫, চক সারকুলার রোড ১১
ফোন : ২৪৪৪০৮

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত
দ্বিতীয় সংস্করণ :
মোহার্‌রম
১৩৯৭ হিজরী, ১৩৮৩ বাংলা।

হাদিয়া :
৪০.০০ চল্লিশ টাকা মাত্র।

মুদ্রনে :
এম, আজিজুর রহমান চৌধুরী
হামিদিয়া প্রেস
৫০, হরনাথ ঘোষ রোড
( )

প্রথম পৃষ্ঠাগুলির সূচী

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসুলের দরবারে মানপত্র ও সৌভাগ্য লাভের অছিলা

বাংলা বোখারী শরীফ তৃতীয় খণ্ড অনুবাদকালে ১৯৬০ ইং সনে
পবিত্র মদীনায় বিশেষভাবে নবীজীর রওজা পাকে পঠিত

التوسل بمدح خير الرسل

قِفَا نَحْظَ مِنْ ذِكْرَى حَبِيْبٍ وَّمَنْزِلِ * سَقَتْهُ السَّوَارِىْ وَالْغَوَادِىْ بِسَلْسَلِ

বন্ধুগণ! অপেক্ষা করুন, আমরা প্রিয়পাত্র ও তাঁহার দেশের আলোচনার আস্বাদ উপভোগ করি। সকাল বিকালের মেঘমালাগুলি ঐ দেশকে ঠাণ্ডা রাখুক!

وَسَهْلًا عَلَى تَذْكَارِ آثَارِ طَيْبَةٍ * مَدِيْنَةِ مَحْبُوْبٍ كَرِيْمٍ مُّفَضَّلِ

থামুন! "তায়বা" শহরের নিদর্শনগুলির স্মরণে, উহাই সর্ব্বাধিক মর্যাদাবান বন্ধুর শহর "মদিনা"।

بِهَا قُبَّةٌ خَضْرَاءُ فِىْ رَوْنَقِ الضُّحَى * تَلَأْلَأُ نُوْرًا فَوْقَ بَدْرٍ مُّكَمَّلِ

ঐ শহরে সবুজ গুম্বুজ উজ্জ্বলরূপ নিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে যাহা পূর্ণিমার চন্দ্র হইতে অধিক দিপ্ত।

بِهَا مَرْقَدُ الْمَوْلَى الْكَرِيْمِ مُحَمَّدٍ * يَفُوْقُ عَلَى الْعَرْشِ الْمُعَلَّى وَيَعْتَلِىْ

সেই গুম্বুজের ভিতরই রহিয়াছে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শয্যাস্থান—তাঁহার শয্যার ভূখণ্ডের মর্য্যাদা আরশ অপেক্ষা অধিক।

يُذَكِّرُنَا آثَارُهَا وَدِيَارُهَا * وَتُبْدِىْ لَنَا مَا لَا نَرَاهُ وَنَجْتَلِىْ

ঐ শহরের ঘর বাড়ী ও নিদর্শনসমূহ এমন বস্তু স্মরণ করায় যাহা আমরা বর্ত্তমান দেখিতেছি না।

نَشُمُّ بِهَا رَيَّا الْحَبِيْبِ كَأَنَّهُ * عَلَى ظَهْرِهَا ثَاوٍ وَلَمْ يَتَرَحَّلِ

ঐ শহরে এখনও প্রিয়পাত্রের সুবাস এইরূপে ছড়ান রহিয়াছে যে, মনে হয় তিনি এখনও উহার ভূপৃষ্ঠে অবস্থানরত—কোথাও যান নাই।

حَبِيْبُ إِلٰهِ الْعٰلَمِيْنَ مُحَمَّدٌ * رَفِيْعُ الْعُلَى خَيْرُ الْبَرَايَا وَأَفْضَلُ

তিনি বিশ্ব জগৎ প্রভুর প্রিয়পাত্র, সর্ব্বোচ্চ মর্ত্তবার অধিকারী, সৃষ্টির সেরা ও সর্ব্বাধিক মর্য্যাদাবান

إِمَامُ النَّبِيِّيْنَ رَسُوْلٌ مُّعَظَّمٌ * وَسَيِّدُ كَوْنَيْنِ عَدِيْمُ الْمُمَثَّلِ

তিনি সমস্ত নবীগণের ইমাম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসুল, দোন জাহানের সর্দ্দার, তাঁহার কোন তুলনা নাই।

شَفَاعَتُهُ تُرْجَى لَدَى كُلِّ غُمَّةٍ * وَكَرْبٍ وَّهَوْلٍ وَّاقْتِحَامِ الْغَوَائِلِ

বিপদ-আপদ, বালা-মছিবৎ ইত্যাদির সময় সুপারিশের আশারস্থল তিনি।

تَرَى بِاسْمِهِ يُشْفَى السَّقَامُ وَإِنَّهُ * لَحِرْزٌ عَظِيْمٌ مِّنْ جَمِيْعِ النَّوَازِلِ

তাঁহার নামের বরকতে অনেক অনেক রোগের উপশম দেখিতে পাইবা এবং তাঁহার নাম সব রকম বিপদ হইতে অতি বড় রক্ষা-কবচ।

وَلَوْ كَانَتِ الْاٰيَاتُ تَعْدِلُ قَدْرَهٗ * لَكَانَ اسْمُهٗ يُحْيِىْ رَمِيْمَ الْمَفَاصِلِ

তাঁহার মর্য্যাদানুপাতিক মোজেযা যদি তাঁহাকে প্রদত্ত হইত তবে তাঁহার নামের বরকতে মরা মানুষের ছিন্নভিন্ন অঙ্গ সমূহ জীবিত হইয়া উঠিত।

هُوَ النُّوْرُ الْبُرْهَانُ طٰهٰ وَشَاهِدٌ * وَصَاحِبُ اِسْرَاءٍ عَظِيْمُ الشَّمَائِلِ

পবিত্র কোরআনে নূর (আলো), বোরহান (উজ্জ্বল প্রমাণ), শাহেদ (সাক্ষী) এবং ত্বা-হা বলিয়া তাঁহাকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। তিনিই সপ্ত আকাশ ভ্রমণকারী এবং সর্ব্বোচ্চ গুণাবলীর আকর।

دَعَاهُ الْاِلٰهُ بِالْبُرَاقِ وَمِعْرَجٍ * اِلَى الْمَلَاءِ الْاَعْلٰى وَاَعْلَى الْمَنَازِلِ

স্বয়ং আল্লাহ বোরাক্ পাঠাইয়া এবং উরস্ত সিংহাসন পাঠাইয়া উর্দ্ধস্থানীয় জগতের এবং সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদা লাভের প্রতি তাঁহাকে দাওয়াত করিয়াছিলেন।

فَسَارَ اِلَى الْعَرْشِ وَمَا شَاءَ رَبُّهٗ * لِرُؤْيَةِ اٰيَاتٍ عِظَامِ الدَّلَائِلِ

সে মতে তিনি পরিভ্রমণ করিলেন মহান আরশ পর্য্যন্ত এবং যে পর্য্যন্ত পরওয়ারদেগারের ইচ্ছা হইয়াছিল, আল্লার কুদরতের নিদর্শন এবং তাঁহার প্রভুত্বের বড় বড় প্রমাণ পরিদর্শন করিবার জন্য।

وَزَارَ مِنَ الْاٰيَاتِ مَا لَمْ يُفَسَّرْ * وَحَازَ الْكَرَامَاتِ وَمَا لَمْ يُفَصَّلِ

এবং তিনি পরিদর্শন করিলেন এমন এমন মহান নিদর্শন সমূহ যাহা ব্যাখ্যা অসম্ভব এবং তিনি এমন এমন সম্মান লাভ করিলেন যাহা বর্ণনাতীত।

وَنَالَ الْعُلٰى فَوْقَ الْخَيَالِ وَخَاطِرٍ * وَعِزًّا وَاِجْلَالًا وَكُلَّ الْفَضَائِلِ

এবং উচ্চ মর্ত্তবা, সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব ও ফজিলত এই পর্য্যায়ের লাভ করিলেন যাহা ভাবনা বা ধারণায়ও আসিতে পারে না।

دَنَا فَتَدَلّٰى قَابَ قَوْسَيْنِ رَبُّهٗ * فَاَوْحٰى اِلَيْهِ مِنْ عِظَامِ الْمَسَائِلِ

তিনি প্রভুর নৈকট্য লাভ করিলেন যতদুর সৃষ্ট ও স্রষ্টার মধ্যে সম্ভব, সঙ্গে সঙ্গে প্রভুও তাঁহাব প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, অতঃপর বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ বহু সার্কুলেশন তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

وَصَارَ نَجِيًّا لِلْحَبِيْبِ حَبِيْبُهٗ * وَجِبْرِيْلُ نَاءٍ فِى الْوَرَاءِ بِمَعْزِلِ

এবং বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর আলাপ হইল, তখন জিব্রাইল পর্য্যন্ত তথা হইতে বহু পেছনে ছিলেন।

هَدَانَا اِلَى الْخَيْرِ وَجَنَّةِ رَبِّنَا * اَتَانَا مِنَ اللّٰهِ بِدِيْنٍ مُعَدَّلِ

তিনি আমাদিগকে উন্নতি ও বেহেশতের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে পারিপাট্য-বিশিষ্ট দ্বীন বহন করিয়া আনিয়াছেন।

لَقَدْ جَاءَ وَالنَّاسُ فِىْ قَعْرِ ظُلْمَةٍ * ضَلَالٍ وَّاِشْرَاكٍ وَفِىْ كُلِّ بَاطِلِ

তাঁহার আবির্ভাব হইল যখন মানুষ ভ্রষ্টতা শেরেক ও সব রকম কুসংস্কারে নিমজ্জমান ছিল।

بشيرا نذيرا للأنام ورحمة * رؤوفا رحيما مثل عذب المناهل

তিনি সুসংবাদবাহক ও সতর্কবাণীবাহক হইয়া আসিলেন বিশ্বমানবের জন্য এবং রহমত হইয়া, মেহেরবান, দয়ালু ও পিপাসা নিবারক সুমিষ্ট ঝরণারূপী হইয়া আসিলেন।

سراجا منيرا مثل شمس ظهيرة * كريما جوادا مثل غيث مهطل

দ্বিপ্রহরের সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তপ্রদীপ হইয়া আসিলেন এবং মুষলধার বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘমালার ন্যায় দাতা হইয়া আসিলেন।

عزيز عليه ما عنتم مصيبة * حريص عليكم لن ترو من مماثل

বিশ্বমানবের প্রতি তাঁহার এত স্নেহ যে, তাহাদের জন্য কষ্টদায়ক বস্তু তিনি একেবারেই বরদাশত করেন নাই এবং তাহাদের জন্য এমন মঙ্গলাকাঙ্খী যাঁহার কোন তুলনা নাই।

وداع الى الخير بوعظ وحكمة * وهاد الى الله بقول مدلل

নছিহত ও হেকমতের দ্বারা তিনি বিশ্ববাসীকে মঙ্গলের প্রতি আকুল আহ্বান জানাইয়া ছিলেন এবং দলিল প্রমাণ মারফৎ আল্লার প্রতি পথ প্রদর্শনকারী ছিলেন।

وبالبينات من دلائل ربه * وبالمعجزات الباهرات الجلائل

এবং স্বীয় প্রভুর পক্ষ হইতে প্রদত্ত উজ্জ্বল প্রমাণ; প্রকাশ্য বড় বড় অলৌকিক ঘটনা মারফৎ—

تشقق بدر من اشارة اصبع * تكسر صخر من اشارة معول

তাঁহার আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছিল এবং গেতীর ইশারায় বিরাট পাথর চুর্ণবিচুর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

وسلم احجار عليه تحية * عليك سلام الله دوما تقبل

পাথর সমূহ তাঁহাকে সালাম করিয়া ছিল যে, আপনার প্রতি সর্ব্বদা আল্লার তরফ হইতে শান্তি বর্ষিত হউক—এই সালাম কবুল করুন!

وجاء عدو بالحجارة قبضة * فنادت نداء في شهادة مرسل

শত্রুদল কাঁকর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া উপস্থিত হইল, ঐ কাঁকর উচ্চৈস্বরে তাঁহার রেছালতের সাক্ষ্য দিল।

تقلعت اشجار اليه مطيعة * وقامت لديه مثل عبد مذلل

তাঁহার আদেশ পালনে কতিপয় বৃক্ষ ছুটিয়া আসিয়া সম্মুখে অনুগত দাসের ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল।

تجمع اغصان اليه مظلة * وسار الغمام مثل سقف مظلل

গাছের ডাল তাঁহাকে ছায়া দানের জন্য একত্রিত হইয়া ঝুকিয়া পড়িয়াছিল এবং মেঘমালা ছায়া প্রদানকারী ছাদের ন্যায় হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া ছিল।

وحنت اليه نخلة من محبة * فانت ورنت كاليتيم وارمل

এবং তাঁহার বিচ্ছেদে কাষ্ঠ বিচ্ছেদ-যাতনা প্রকাশ করিয়া এতিম ও বিধবার ন্যায় কাঁদিয়াছিল।

فلما أتاها هاديا متعطفا * لغاض بكاها كالوليد المعلل

অতঃপর যখন তিনি উহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আসিলেন এবং স্নেহ দেখাইলেন তখনই সে সান্ত্বনা প্রদত্ত শিশুর ন্যায় ক্ষান্ত হইয়া গেল।

تشكت إليه بالمظالم ناقة * وكلم ظبي مثل ثكلى بحامل

উষ্ট্রী আসিয়া তাহার অত্যাচারের অভিযোগ জানাইয়া ছিল এবং হরিণ তাঁহার নিকট সন্তানহারা মায়ের ন্যায় স্বীয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছিল।

أتت عنكبوت بالبيوت وقاية * عليه من الأعداء تحمى بمقتل

মাকড়সা ঘর বানাইয়া তাঁহাকে শত্রু হইতে হেফাজত করিয়াছিল যখন তাঁহার প্রাণের ভয় ছিল।

وجاءت تقيه من عدو حمامة * يقول لثان لا تخف وتوكل

এবং শত্রু হইতে রক্ষা করার জন্য কবুতরও আসিয়াছিল—তিনি নিজ সঙ্গীকে বলিতে ছিলেন, ভয় পাইও না আল্লার উপর ভরসা কর।

وقد قال يا أرض خذيه لفارس * فلم يتخلص قبل أمر مبدل

একবার এক অশ্বারোহী শত্রুর প্রতি ইশারা করিয়া বলিয়াছিলেন, হে মাটি! এই ব্যক্তিকে পাকড়াও কর, অতঃপর সে আর ছুটিয়া যাইতে পারিল না, যাবৎ না তিনি ছাড়িবার নির্দ্দেশ দিলেন।

طيور ووحش والخلائق كلها * لتدرى رسول الله دون التأمل

পশু-পক্ষী এবং সমস্ত সৃষ্ট জগৎ আল্লার রসুলকে বিনা দ্বিধায় চিনিয়া থাকিত।

دعا قومه يوما إلى الله دعوة * وأنذرهم هول العذاب المعجل

একদা তিনি স্বীয় জাতীকে আল্লার প্রতি আহ্বান জানাইলেন এবং তাহাদিগকে নিকটবর্ত্তী আজাবের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করিলেন।

فنادى نداء يا معاشر مكة * هلموا إلى قول النذير المهول

সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, হে মক্কার বিভিন্ন গোত্রগণ! তোমরা ভয়ঙ্কর সংবাদদাতা সতর্ককারীর কথার প্রতি ধাবিত হও।

فعم قريشا والعشيرة كلها * وخص من القربى بقول مفصل

তিনি কোরায়েশ তথা স্বীয় বংশধরের সকলকে এবং বিশেষ ভাবে স্বীয় আত্মীয়বর্গকে পরিষ্কার ভাষায় এই বলিয়া সম্বোধন করিলেন—

ألا تعلموني صادقا إن أخفتكم * بجيش أتاكم من قريب معجل

আমি যদি এইরূপে সতর্ক করি যে; অতি সত্বর নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে এক দল শত্রু সেনা তোমাদের উপর আক্রমণ করিতে আসিতেছে—তবে কি আমাকে সত্যবাদী গণ্য করিবে?

فقالوا بلى لم تأت زورا ولم نر * بك الكذب يا خير الأمين المعول

তাহারা সকলে একবাক্যে বলিল, নিশ্চয় -কারণ আপনি কখনও মিথ্যা অবলম্বন করেন নাই এবং হে নির্ভরযোগ্য সত্যবাদী আপনার মধ্যে কখনও আমরা মিথ্যা পাই নাই।

فقال اسمعوا ثم اسمعوني فإنني * نذير لكم قبل العذاب المعجل

তখন তিনি বলিলেন, তোমরা শুন, পুন: বলিতেছি—তোমরা আমার কথা শুন, অপদস্থকারী আজাব আসিবার পূর্ব্বেই আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছি।

ألا فاعبدوا ربا ولا تشركوا به * ولا تعبدن من إله مسول

তোমরা সতর্ক হও—সৃষ্টিকর্ত্তার এবাদৎ কর এবং তাঁহার সঙ্গে শরীক করিও না এবং গর্হিত মাবুদের এবাদৎ তোমরা করিও না।

ألا فاهجروا رجزا وأوثان قومكم * وما يعبد الآباء أجل المجاهل

তোমরা মূর্ত্তি ও দেবদেবী পূজা পরিত্যাগ কর এবং তোমাদের বাপ-দাদা অজ্ঞতার দরুণ যাহাদের পূজা করিত ঐ সবও পরিত্যাগ কর।

فراغوا إليه بالعداوة كلهم * وهموا به شرا بكل الوسائل

তখন তাহারা সকলে তাঁহার প্রতি শত্রুতার ব্যবহার আরম্ভ করিল এবং সব রকমের ব্যবস্থাবলম্বন করিয়া তাঁহার ক্ষতি সাধনে উদ্যত হইল।

سعى كل سعى في هداية قومه * ولكن تلقوه بشر مسلسل

তিনি স্বীয় জাতীকে হেদায়েত করার জন্য সব রকমের চেষ্টাই করিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার প্রতি অসদ্ব্যবহারই করিতে লাগিল।

فصار يجول في المجامع تارة * وطورا يدور في بطون القبائل

তখন তিনি বিভিন্ন লোক-সমাগমের স্থানে, বিভিন্ন গোত্রের শাখা সমূহের নিকট সত্যের ডাক নিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

ويعرض دين الله في كل محضر * ويدعوا عباد الله في كل محفل

এবং তিনি প্রত্যেক সুযোগেই আল্লার দীনকে লোক সমক্ষে তুলিয়া ধরিতে লাগিলেন এবং প্রত্যেক সভা-সমিতিতে তিনি আল্লার বন্দাগণকে আহ্বান জানাইতে লাগিলেন।

أتى طائفا يدعوا إلى دين ربه * ويرجو بأهليها لعون مؤمل

এই পরিস্থিতিতে তিনি তায়েফ নগরে স্বীয় পরওয়ারদেগারের দীনের আহ্বান নিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি তায়েফবাসীদের হইতে আশানুরূপ সাড়া পাইবার ভরসা করিতে ছিলেন।

ولكن أتوه بالجفاء وغدره * وجور وإيلام وجرح مقتل

কিন্তু তাহারা তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, অসদ্ব্যবহার, অত্যাচার, দুঃখ-যাতনা প্রদান এবং প্রাণনাশক আঘাত লইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল।

وأدموه ضربا بالحجارة صبغة * وآذوه إيذاء بما لم يمثل

এবং তাহারা পাথর মারিয়া তাঁহাকে রক্তে রঞ্জিত করিয়া দিল এবং দৃষ্টান্তহীন কষ্ট-যাতনা দিল।

فسالت دماء من جبين مبارك * وصارت على الرجل كخف منعل

তাঁহার মোবারক মুখ-মণ্ডলের রক্ত বহিয়া পায়ের উপর মোজা ও জুতার ন্যায় হইয়া গেল।

ليمسح وجها من دماء ومدمع * ويمشي غشيا في هجوم البلابل

তিনি মুখমণ্ডলের রক্ত ও অশ্রু মুছিতে লাগিলেন এবং দিশাহারা হইয়া বিপদের তুফানের মধ্যে তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

فجاء إليه من ملائك ربه * لإهلاك قوم بالعذاب المنكل

এমতাবস্থায় তাঁহার প্রভুর তরফ হইতে ফেরেশতা আসিল ঐ দেশবাসীকে আজাবদানে ধ্বংস করার জন্য

لإهلاكهم بين الجبال بطائف * بسحق ورض بينها مثل فلفل

তায়েফ নগরীর পাহাড় সমূহের মধ্যে মরিচের ন্যায় পিশিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করার জন্য।

ولكن دعا ربي اهد قومي فإنهم * إذا يعرفوني لن يصيبوا بخردل

কিন্তু তিনি তাহাদের ধ্বংস চাহিলেন না বরং দোয়া করিলেন, হে প্রভু! এই জাতীকে হেদায়েত দান করুন তাহারা আমাকে চিনিতে পারিলে আমাকে সরিষার দানার আঘাতও করিবে না।

وإن كان أولى كذبوني فنسلهم * عسى أن يكونوا مؤمنين فأجمل

তিনি আরও বলিলেন—তাহারা যদিও আমাকে অমান্য করিতেছে, কিন্তু আশা করি তাহাদের নছলের মধ্যে ঈমানদার সৃষ্টি হইবে, তাই তাহাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করুন।

فهذا رسول الله يأتي بشفقة * على من يجور من عدو وقاتل

এই ছিলেন আল্লার রসুল—প্রাণঘাতি শত্রু অত্যাচারীর প্রতিও তিনি দয়া প্রদর্শন করিতেন।

ويدعو لهم بالخير حبا ورحمة * يسكن غضب الله حين التنزل

এবং তাহাদের প্রতি প্রীতি ও দয়াপরবশ হইয়া মঙ্গল কামনা করিয়া দোয়া করিতেন—আল্লার গজব নাজেল হওয়ার সময় উহাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিতেন।

معين لخلق الله في كل غمة * شفيع العصاة في شديد المنازل

প্রত্যেক কষ্ট-যাতনার স্থানেই তিনি আল্লার বন্দাদিগকে সাহায্যকারী এবং ভীষণ কঠিন স্থানে গোনাহগারদের জন্য সুপারিশকারী।

وساقي عطاش الناس في يوم محشر * من الحوض أحلى من حليب معسل

হাশরের দিনে তিনি তৃষ্ণাতুর মানুষগণকে এমন হাওজ হইতে পান করাইবেন যাহার পানীয় দুগ্ধ ও মধু হইতে অধিক সুস্বাদ।

شَرَابًا طَهُورًا مَنْ يُصِبْ مِنْهُ جُرْعَةً * يَجِدْ رِيَّةً تَبْقَى وَلَمْ تَتَزَيَّلِ

এমন পবিত্র শরবৎ যে, যে ব্যক্তি এক ঢোক লাভ করিবে সে চিরজীবনের জন্য তৃপ্তি লাভ করিবে।

يَجِيءُ إِلَى الْعَرْشِ وَيَسْجُدُ رَبَّهُ * إِذَا النَّاسُ سَكْرَى فِي شَدِيدِ التَّمَلْمُلِ

যখন (কেয়ামতের মাঠে) মানুষ ভীষণ চিন্তা-ভাবনার মধ্যে হইবে তখন তিনি আরশের নীচে আসিয়া স্বীয় পরওয়ারদেগারের সন্নিধানে সেজদা করিতে থাকিবেন।

إِذَا النَّاسُ سَكْرَى مِنْ شَدَائِدِ مَحْشَرٍ * حَيَارَى كَغَوْغَاءِ الْجَرَادِ بِمَوْجَلِ

যখন মানুষ হাশরের মাঠের বিপদের ভয়ে পতঙ্গ দলের ন্যায় বিক্ষিপ্ত ছুটাছুটি করিতে থাকিবে।

يَفِرُّ قَرِيبٌ مِنْ قَرِيبٍ وَأَقْرَبٍ * بِيَوْمِ حِسَابٍ لَمْ تَجِدْ مَنْ يَعُولِ

হিসাবের দিন সর্ব্বাধিক নিকটস্থ আত্মীয় পরস্পর একে অন্য হইতে পালাইয়া যাইবে, কাহাকেও ভরসাস্থলরূপে পাওয়া যাইবে না।

وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ يَبْكِي لِأُمَّةٍ * وَيَدْعُو الْإِلٰهَ بِابْتِهَالِ التَّذَلُّلِ

কিন্তু রসুল (দঃ) উম্মতের জন্য কাঁদিবেন এবং কাকতি-মিনতির সহিত আল্লার দরবারে দোয়া করিবেন।

إِلٰهِي تَرَحَّمْ وَاغْفِرَنْ كُلَّ أُمَّتِي * وَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّاتِ فِي خَيْرِ مَنْزِلِ

হে আল্লাহ! আমার প্রত্যেক উম্মতকে ক্ষমা কর, রহমত কর, তাহাদিগকে বেহেশতে দাখিল কর।

ثِمَالٌ مَلَاذٌ فِي ثَلَاثِ مَوَاطِنٍ * صِرَاطٍ وَمِيزَانٍ وَنَشْرِ الرَّسَائِلِ

তিনি বিশেষরূপে তিনটি জায়গায় আশ্রয়স্থল—পোলছেরাতে, নেকী-বদী ওজনের পাল্লার স্থানে এবং আমলনামা বণ্টনের স্থানে।

عَلَيْكَ سَلَامٌ يَا حَبِيبُ الْمُكَرَّمُ * تَحِيَّةُ مُشْتَاقٍ إِلَيْكَ وَآمِلِ

আপনার প্রতি সালাম হে (আল্লার) সম্মানী হাবীব! ইহা আপনার দ্বারে বহু আশা-আকাঙ্খাধারীর সম্ভাষণ।

أَتَيْتُ بِآمَالٍ وَشَوْقٍ وَرَغْبَةٍ * رَجَاءَ إِلَيْكُمْ وَابْتِغَاءَ التَّوَسُّلِ

আশা ও আগ্রহ নিয়া আমি আপনার দ্বারে হাজির হইয়াছি—আপনার অছিলা লাভের উদ্দেশ্যে।

فَرَبُّكَ سَاعٍ فِي رِضَاكَ وَمُسْرِعٌ * وَيُعْطِيكَ مَا تَرْضَى بِدُونِ التَّمَهُّلِ

আপনার পরওয়ারদেগার আপনার সন্তুষ্টি সাধনে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং যথাসত্বর আপনার মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া থাকেন।

وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ جِئْتُكَ تَائِبًا * وَمُسْتَغْفِرًا رَبِّي لِذَنْبِي الْمُذَلِّلِ

আপনি আল্লার রসুল, আমি স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট তওবা করতঃ এবং আমার অপদস্তকারী গোনাহ হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ আপনার দ্বারে হাজির হইয়াছি।

فلو انك استغفرته لي وجدته * رحيما وتوابا فهل انت مجملي

আপনি যদি আমার মাগফেরাতের দোয়া করেন তবে নিশ্চয় আমি পরওয়ারদেগারকে তওবা গ্রহণকারী মেহেরবানরূপে পাইব, আপনি কি আমার প্রতি সহানুভূতি করিবেন?

وهذا لوعد يا رسول محقق * يوحى اليك مثله لم يبدل

হে আল্লার রসুল! উক্ত বিষয়টি আল্লাহ তায়ালার অকাট্য ওয়াদা যাহা আপনার প্রতি অহী দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে উহার বরখেলাফ হইবে না।

عليك سلام يا شفيع المشفع * شفاعتك العظمى نجاة لنائل

আপনার প্রতি সালাম হে গ্রহণীয় সুপারিশকারী! আপনার মহান শাফায়াৎ যে লাভ করিবে তাহার পরিত্রাণ সুনিশ্চিত।

عليك سلام يا رءوف ومشفق * ثمال ملاذ للحيارى وموئل

আপনার প্রতি সালাম হে মেহেরবান স্নেহশীল! আপনি বিপদগ্রস্ত আতঙ্কগ্রস্তের আশ্রয়স্থল।

سلام عليكم يا رسول المعظم * جزاك الاله بالمزيد واكمل

আপনার প্রতি সালাম হে শ্রেষ্ঠ রসুল! আল্লাহ আপনাকে অধিক অধিক প্রতিদান দান করুন।

شهادتنا ان قد هديت جميعنا * وبلغت ما اوتيت من كل منزل

আমরা এক বাক্যে সাক্ষ্য দিতেছি—আপনি আমাদের সকলকে সৎপথ দেখা এবং যাহা কিছু আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে অবতারিতরূপে লাভ করিয়াছেন সবই আপনি আমাদের নিকট পৌছাইয়া দিয়াছেন।

واديت والله امانة ربنا * نصرنا على دين متين مسهل

খোদার কসম—আপনি পরওয়ারদেগারের সমস্ত আমানত পূর্ণরূপে আল্লার বান্দাদের নিকট পৌছাইয়া দিয়াছেন, তাই আমরা একটি সহজ ও মজবুত দ্বীনের সন্ধান পাইয়াছি।

اتيتك يا خير الملاذ زيارة * ومستشفعا كالعائذ المتوسل

হে সর্বোৎকৃষ্ট আশ্রয়ের স্থান! অছিলা ও আশ্রয়ের আশা নিয়া সুপারিশ প্রার্থী হইয়া আপনার দ্বারে হাজির হইয়াছি।

ترحم عزيز الحق يا بحر رحمة * ويا مرجع العاصي ويا خير موئل

হে দয়ার দরিয়া—হে গোনাহগারের উপস্থিতির স্থল, হে সর্ব্বোত্তম আশ্রয়স্থল! আপনি আমি "আজিজুল হকের" প্রতি দয়া করুন।

عليك الوف من صلوة ورحمة * والاف تسليم من العبد فاقبل

আপনার প্রতি লক্ষ লক্ষ দরুদ ও আল্লার রহমত এবং লক্ষ লক্ষ সালাম এই গোলামের পক্ষ হইতে কবুল করুন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উপক্রমণিকা

আল্লাহ তায়ালা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে মানবরূপেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আল্লার রসুল ছিলেন ; এমন রসুল যে, বিশ্ব-বুকে আল্লাহ প্রেরিত এক লক্ষ বা দুই লক্ষের অধিক সংখ্যক রসুলের সেরা ও সর্দ্দার বা সর্ব্বউর্দ্ধের রসুল ছিলেন তিনি।

নবী-রসুলগণ মানব জাতির মধ্যে সর্ব্বউর্দ্ধের এবং তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বউর্দ্ধের হইলেন নবীজী মোস্তফা (দঃ)। এই উর্দ্ধের সীমা কি তাহা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন।

তবে হিন্দুদের ন্যায় দেবত্ববাদ তথা গায়রুল্লাকে উপাস্য ও পূজনীয় গণ্য করা ইসলামে ইহার স্থান নাই। উপাসনা এক আল্লাহ তায়ালার জন্যই সীমাবদ্ধ—এই অতিউর্দ্ধের মর্য্যাদা অন্য কাহারও নাই। তাই হযরত মোহাম্মদ (দঃ) সম্পর্কে ইসলাম সর্ব্বক্ষেত্রে এই পরিচয় উল্লেখ করে, عبده و رسوله—আবদুহু ওয়া রসুলুহু "আল্লার বন্দা—উপাসক দাস এবং আল্লার রসুল।"

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) উপাস্য ও পূজনীয় হওয়া অর্থে অতি-মানুষ বা অলৌকিক ব্যক্তি নিশ্চয় ছিলেন না। কিন্তু সকল সৃষ্টির সর্ব্বউর্দ্ধের অলৌকিক ব্যক্তিত্ব তাঁহার নিশ্চয় ছিল এবং তাঁহার এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের নিদর্শন ও প্রকাশরূপে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার দ্বারা বা তাঁহার জন্য অসংখ্য অলৌকিক ঘটনাবলীর বিকাশ সাধন করিয়াছেন। এই সূত্রে তাঁহাকে মহা মানুষ এবং এই অর্থেই তাঁহাকে অতি মানুষ বলিলে তাহা শুধু ভাষার প্রয়োগ হইবে। ভাষা হিসাবে মহা মানুষ ও অতি-মানুষ—এই দুই-এর মধ্যে এত বড় বিরাট ব্যবধান আছে কি না যে, অতি-মানুষ শব্দ দেবত্বের মতবাদ বুঝায়—তাহা পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিতে পারেন। জন সাধারণের আকিদা ও মৌলিক বিশ্বাসকে বিশুদ্ধ করা চাই যে, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মর্য্যাদা উর্দ্ধের উর্দ্ধে ছিল, কিন্তু উপাস্য ও পূজনীয় হওয়ার মর্য্যাদা তাঁহার ছিল না মোটেই। সেইরূপ ধারণা থাকিলে তাহা অবশ্যই শেরক ও অংশীবাদী গণ্য হইবে। ইহাই মর্ম্ম এই আয়াতের—انما انا بشر مثلكم "আমি তোমাদেরই ন্যায় মানুষ বৈ নহি।" অর্থাৎ আমি আল্লার বন্দা তথা উপাসক দাস। উপাস্য, পূজনীয় মোটেই নহি।

এই আয়াতের সূত্র ধরিয়া নবীজী মোস্তফা (দঃ) অতি-মানুষ হওয়াকে অস্বীকার করার আড়ালে একটি ইসলাম বিরোধী ভাবধারার ফাঁক বাহির করা হইয়া থাকে। এক শ্রেণীর লোক নবী-রসুলগণের মোজেযা যাহা অলৌকিক ঘটনাবলী হইয়া থাকে উহার প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন। ঐ শ্রেণীর লোকেরাই এই জিগির তোলায় খুব উৎসাহী যে, নবীজী মোস্তফা (দঃ) অতি-মানুষ বা অলৌকিক মানুষ ছিলেন না। এই জিগিরের সঙ্গে এই সুর মিশাইয়া দেওয়া তাহাদের জন্য সহজ হয় যে, তিনি যেহেতু অলৌকিক মানুষ ছিলেন না, তাই তাঁহার কোন ঘটনা বা কার্য্যও অলৌকিক হইবে না। এই ভাব-প্রবণতায় তাহারা নবীজীর মোজেযার অস্বাভাবিক ঘটনাবলীকে স্বাভাবিকের গণ্ডিভুক্ত করার জন্য অস্বাভাবিক হেরফের ও গোজামিল দেওয়ার পেছনে ছুটাছুটি করে। শুধু নবীজী মোস্তফার মোজেযা সম্পর্কেই নহে সকল নবীগণের মোজেযার ব্যাপারেই তাহাদের এই হাল। যেমন ছিলেন, স্বভাব-মাওলানা আকরম খাঁ

মরহুম। নবীগণের মোজেযা সম্পর্কে উল্লেখিত প্রবণতাটা খাঁ মরহুমের বাতিক ব্যাধিরূপ ছিল। পবিত্র-কোরআনে পূর্ব্ববর্ত্তী বিভিন্ন নবীগণের মোজেযা শ্রেণীর যে সব ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে তাঁহার তফছীর নামীয় কোরআনের অপব্যাখ্যায় তিনি ঐসবের বিকৃতি সাধনে যে সব অস্বাভাবিক হেরফের ও গোজামিলের আশ্রয় লইয়াছেন তাহা নিতান্ত দুঃখজনক। তাঁহার জীবদ্দশায়ই আমরা ঐসবের কঠোর সমলাচোনায় বিশেষ পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলাম। যাহার কোন কোন অংশ বাংলা বোখারী শরীফ ৪র্থ খণ্ডের বিভিন্ন পাদটিকায় বিদ্যমান আছে।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মোজেযাসমূহ সম্পর্কেও তিনি ঐ একই পথ অবলম্বন করিয়াছেন। এমনকি নবীজীর বিখ্যাত বিখ্যাত মোজেযা, যেমন—মে'রাজ, বক্ষবিদারণ, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করা এবং নবীজীর হিজরত ছফরের বিভিন্ন মোজেযার ঘটনা ইত্যাদিকে হয় অস্বীকার করিয়াছেন, না হয় আজগবীরূপে বিকৃত করিয়াছেন। বিশেষতঃ নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্বে নবীজীর সম্মান প্রদর্শনে এবং নবুয়তের আভাস প্রদানে যেসব অস্বাভাবিক ঘটনাবলী ঘটিয়া ছিল ঐ সবের সহিতও তিনি একই ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার এই শ্রেণীর অপচেষ্টার কোন কোনটার সমালোচনা বিভিন্ন স্থানের পাদটিকায় আমরা প্রদান করিব।

খাঁ মরহুম তাঁহার এই অপচেষ্টার পথ পরিষ্কারের স্থায়ী ব্যবস্থারূপে তাঁহার মোস্তফা চরিত গ্রন্থের সুদীর্ঘ উপক্রমণিকার কয়েকটি পরিচ্ছেদ ব্যায় করিয়াছেন। উহাতে তিনি দুইটি জঘন্য বিষ সৃষ্ঠির চেষ্টা করিয়াছেন। একটি হইল—মোসলেম জাতির গৌরব ইসলামের শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুরক্ষক ও অতন্দ্রপ্রহরী পূর্ব্ববর্ত্তী কোরআন-হাদীছ বিশেষজ্ঞ মহান ইমামগণকে শুধু উপেক্ষা ও কটাক্ষ করাই নয়, বরং তাঁহাদিকে সমাজের নিকট পরিত্যাজ্য সাব্যস্ত করার জন্য অশালীন ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। আর একটি হইল ঐ মনিষীবৃন্দ ইমামগণের জীবন-সাধনালব্ধ মূল্যবান জ্ঞান-গবেষনার প্রতিও সমাজের আস্থা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন।

এই অপকর্ম্ম ও অপচেষ্টায় খাঁ মরহুমের মত্‌লব-সিদ্ধি লাভ হইবে বটে, কারণ মোজেযার অনেক ঘটনা অস্বীকার করিতে বা বিকৃত করিতে বিরাট বাধা ও প্রতিবন্ধক এই সম্মুখে আসে যে, নবীজীর জীবনী সঙ্কলনে পূর্ব্বাপর সাধক ও গবেষকগণ সকলে এক বাক্যে ঐসব ঘটনাবলীর স্বীকৃতি দিয়াছেন এবং বিশেষ আকারে লিখিয়াছেন। অতঃপর শত শত বৎসর হইতে তাঁহাদের সঙ্কলন মোসলেম সমাজে গৃহিত হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং ঐ সঙ্কলকগণের সঙ্কলনের প্রতি আস্থা বিনষ্ট করিতে পারিলে সহজেই ঐ বাধা ও প্রতিবন্ধক অপসারিত হইল। কিন্তু ইহার পরিণাম অতি মারাত্মক। জাতীয় সাধক ও গবেষকগণ এবং তাঁহাদের সঙ্কলন জ্ঞানভাণ্ডার জাতির অমূল্য ধন; ইহা হইতে বঞ্চিত হইলে জাতি রিক্তহস্ত এবং এতীম হইয়া পড়িবে।

সভ্য ও প্রগতীশীত জগতের অবস্থা লক্ষ্য করুন! হাইকোট ও সুপ্রিমকোটের বিচার-পতিগণের রায়সমূহ সরকারীভাবে গেজেটরূপে প্রকাশিত এবং বিশেষ যত্নের সহিত সুরক্ষিত হয়। পরবর্ত্তীকালে বিচারপতিগণ ঐসব রায়ের পূর্ণ মর্য্যাদা দিয়া থাকেন। উকীল মোক্তারগণ ঐসব রায়ের বরাত বা রেফারেন্স দানেই অগ্রসর হইয়া থাকেন। কেহই উহাকে উপেক্ষা করে না।

খাঁ মরহুম ঐ বিষাক্ত বস্তুদ্বয়কে তাঁহার পাণ্ডিত্বের রং-পলিশ এবং ভাষার লালিত্যের সাজ-সজ্জায় এত সুন্দররূপ দিয়াছেন যে, বুঝমান মানুষও উহাকে বরণ করিতে দ্বিধা করিবে না। পাণ্ডিত্বে তাঁহার ন্যায় দক্ষ ও প্রতিভাবান এবং প্রকাশভঙ্গির ছল-চাতুরীতে তাঁহার ন্যায় পটু

কোন মানুষ তাঁহার মোকাবিলায় আসিলে—তিনি যেভাবে অসত্যকে সুন্দর সাজে সত্যবেশী বানাইয়াছেন, তদ্রূপ তাঁহার বিপক্ষ অন্ততঃ সত্যকে সুন্দররূপে প্রকাশ করিতে পারিতেন। আমরা শুধু সংক্ষেপে খাঁ মরহুমের মাকালরূপী বক্তব্য সমূহের সামান্য ইঙ্গিত প্রদানের চেষ্টা করিব।

খাঁ মরহুম প্রথম পরিচ্ছেদে পূর্ব্ববর্ত্তী সীরত সকলন সমূহের প্রতি অভিযোগ করিয়াছেন—"মহাপুরুষগণের জীবনী অলোচনায় প্রায়ই দেখা যায় যে, কিংবদন্তি-সঙ্কলক ঐতিহাসিক ও অন্ধভক্তগণের দ্বারা তাঁহাদের প্রকৃত জীবনী পর্ব্বত পরিমাণ কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের আবর্জ্জনা-রাশির তলে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। উদাহরণে হিন্দুদের শ্রীকৃষ্ণ ও খৃষ্টানদের যীশুখৃষ্টের নাম উল্লেখ করা যায়। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সম্বন্ধেও অবস্থা কতেকটা ঐরূপই। (নাউজুবিল্লাহ্)

কী যঘন্য দৃষ্টান্ত ও মহাপাপের উক্তি! হিন্দুদের এবং শ্রীকৃষ্ণের তুলনার ন্যায় ঈমান-হীনতার বেয়াদবী ত দূরের কথা হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের উম্মত হওয়ার দাবীদার খৃষ্টানদের উল্লেখও এই ক্ষেত্রে রাত্র ও দিনের ন্যায় অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, মোস্তফা (দঃ) নবীজীর খাতিরে আল্লাহ তায়ালা গ্যারান্টি ও নিশ্চয়তা দিয়া দিয়াছেন—নবী (দঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মত সত্যের বিপরীতের উপর একমত হইবে না। খাঁ মরহুম তাঁহার ঐ জঘণ্য ভাবধারাকে উক্ত পরিচ্ছেদের শেষ লাইনগুলিতে আরও উলঙ্গ ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন—"যিনি হযরতের জীবনী আলোচনায় সত্য-মিথ্যাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে ও দেখাইতে চান তাঁহার পক্ষে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা বেশী আয়াস সাধ্য নহে। তবে·········বাপ দাদার কথা, পূর্ব্বতন আলেমগণের নজির ইত্যাদি মক্কার মোশরেকগণের অবলম্বিত যুক্তিধারার চোখরাঙ্গানীকে যিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, তাঁহার পক্ষে ইহা একেবারে অসম্ভব।"

আল্লাহ তাঁহাকে ক্ষমা করুন! তের শত বৎসর পরে মোসলমান তাহাদের নবীজীর জীবনী আলোচনায় পূর্ব্বতন আলেমগণের নজির লক্ষ্য করিলে তাহা মক্কার মোশরেকগণের অবলম্বিত যুক্তি তুল্য হইবে—এইরূপ উক্তি করা খাঁ মরহুমেরই দুঃসাহস। শুধু ঐ উক্তিই নহে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী ইমামগণকে যেভাবে গালিগালাজ করিয়াছেন তাহা নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক।

তিনি তাঁহার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মাকালরূপী কতকগুলি যুক্তি সত্যের অবরণীতে ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই যুক্তিগুলির ভিতরেও বিষ ঢুকাইয়াছেন অনেক; যদ্দারা তিনি সীমাহীন ধৃষ্টতায় পৌঁছিয়াছেন যে, তৃতীয় পরিচ্ছেদে পরিষ্কার ভাষায় ইসলাম ও মোসলেম জাতির গৌরব পূর্বতন আলেম ও ইমামগণ সম্পর্কে বলিয়াছেন—"'বোজর্গানে দীন' ও 'ছলফে-ছালেহীন' বলিয়া মোসলমান সমাজে যে সকল 'তাগূতের' সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহাই হইতেছে সর্বনাশের মূল।"

পাঠক! মোসলেম সমাজের 'বোজর্গানে দীন' কোন কোন শ্রেণী—খাঁ মরহুম পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় উহারও ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহারই উক্তি—"অমুক ইমাম বলিয়াছেন, অমুক পীর করিয়াছেন, অমুক আলেম লিখিয়াছেন—ইহারা হইতেছেন বোজর্গানে দিন।" এই উক্তিতে স্পষ্টই বুঝা গেল ইমাম, আলেম, পীর—ইহারাই বোজর্গানে দীন।

ছল্‌ফে-ছালেহীন অর্থও বুঝুন! 'ছল্‌ফ' অর্থ পূর্বতন, আর 'ছালেহীন' অর্থ নেক্‌কার ব্যক্তিবর্গ; ছল্‌ফে-ছালেহীন অর্থ পূর্বতন নেক্‌কার ব্যক্তিবর্গ।

এই সুধী শ্রেণীসমূহ সম্পর্কে খাঁ মরহুম একটি আরবী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন 'তাগূত'। এই শব্দটির অর্থে বাংলা শব্দ এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করিলে মোসলেম সমাজ খাঁ মরহুমের মুখে কি

দিত তাহা বলা যায় না, তবে তিনি ক্ষমা পাইতেন না নিশ্চয়। 'তাগূত' শব্দটি পবিত্র কোরআন আয়াতুল-কুরসিতে উল্লেখিতর হিয়াছে—কাফের-মোশরেক পৌত্তলিকগণের পূজণীয়দের উদ্দেশ্যে 'শয়তান' ও 'দেবদেবী' অর্থে উহা ব্যবহৃত হইয়াছে।

সেমতে খাঁ মরহুমের উক্তির অর্থ দাঁড়ায়—ইমাম, আলেম, পীর ও নেক্‌কার ব্যক্তিবর্গ বলিয়া মোসলমান সমাজে যে সকল শয়তান বা দেবদেবীর সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহাই হইতেছে সমস্ত সর্বনাশের মূল। এই জঘণ্য উক্তির প্রতিবাদের ভাষা জগতে আছে কি?

পাঠক! আপনারা ভাবিতে পারেন এবং খাঁ মরহুম এই ধারণা সৃষ্টির অপচেষ্টা করিয়াছেনও বটে যে—তাঁহার কঠাক্ষ ও আক্রোশ শুধু কল্পিত ও ভুয়া বোজর্গদের সম্পর্কে এবং নবীজীর চরিত সংক্রান্ত অপ্রামাণিক উর্দ্দু-ফার্সি ইত্যাদি চটি বই-পুস্তক সম্পর্কে সীমাবদ্ধ।

খাঁ মরহুমের পাণ্ডিত্ব ও বাক-পটুতার আবরণে অসংখ্য ধোকা-ফাকির ইহাও একটি। তাঁহার অসার পেঁচালো মন্তব্যসমূহে তিনি ঐরূপ হাবভাব দেখাইয়া এবং ঐ শ্রেণীর শব্দ ব্যবহার করিয়া সমাজের ধিক্‌কার ও ক্ষোভ হইতে গা-ঢাকা দেওয়ার মতলব করিয়াছেন মাত্র।

প্রথমতঃ—পূর্ব যুগে 'ইমাম' আখ্যার ভুয়া ও কল্পিত পাত্র ছিল বলিয়া কোন ইতিহাস আমাদের জানা নাই। তবে আলেম ও পীর নামে ভুয়া ও কল্পিত পাত্র থাকা স্বাভাবিক। জগতের অন্যান্য সম্প্রদায় এবং শ্রেণীতেও তাহা আছে; যেমন, ডাক্তার, আইনজ্ঞ, বিভিন্ন প্রশাসক ইত্যাদিতেও ভুয়া ব্যক্তির অস্তিত্ব আছে; সেই জন্য তাঁহাদিগকে শ্রেণীগতভাবে গালি দিয়া তাঁহাদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির উক্তি কি ক্ষমার যোগ্য হইবে?

অধিকন্তু পূর্ব যুগে, মোসলমানদের সোনালী আমলে—যখন ইসলামী শাসন প্রচিলত ছিল তখন আলেম ও পীর ইত্যাদি ইসলামী পরিভাষার উর্দ্ধতন আখ্যাসমূহ ভুয়ারূপে নিতান্ত কমই অবলম্বিত হইতে পারিত। যেমন বর্ত্তমান যুগে ভুয়া সামরিক অফিসার ও উচ্চস্তরের ভুয়া প্রশাসক ইত্যাদি হওয়া কি সহজ ব্যাপার? ইসলামের গৌরব ও শাসনের আমলে সামরিক অফিসার বা প্রশাসকদের আখ্যা সমূহ অপেক্ষা 'আলেম' 'পীর' ইত্যাদি আখ্যা বহু পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইত। বিশেষতঃ ইমাম, আলেম ও পীর শ্রেণীর যে সব বিশিষ্ট মনীষীবৃন্দের জ্ঞানভাণ্ডার রচনা ও সঙ্কলন আকারে জাতীয় রত্নরূপে সুরক্ষিত রহিয়াছে তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব ত ইসলাম ও মোসলেম জাতির গৌরব এবং অমূল্য সম্পদ।

দ্বিতীয়তঃ—খাঁ মরহুম প্রকৃত প্রস্তাবে ভুয়া ও কল্পিত বোজর্গ নামীয় চুনোপুটি আটকাইবার জন্য সুবৃহৎ উপক্রমণিকার জাল ফেলেন নাই; তিনি ইমাম বোখারী, ইমাম মোসলেমের ন্যায় বড় বড় মোহাদ্দেছ ইসলাম ও মোসলেম জাতির গৌরব—রুই-কাতল আটকাইবার উদ্দেশ্যে জাল ফেলিয়াছেন! তিনি উর্দ্দু-ফার্সি চটি বই মুছিবার জন্য এত পাণ্ডিত্ব ব্যয় করেন নাই; তিনি ৬০০—৭০০ বৎসর হইতে প্রচলিত ৪০০০—৬০০০ পৃষ্ঠায় রচিত সুপ্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ ও মোফাছ্‌ছেরগণের জ্ঞান-গর্বময় জাতীয় সম্পদ ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীকে উপেক্ষনীয় ও প্রক্ষিপ্ত সাব্যস্ত করার মতলব আঁটিয়াছেন। কতিপয় নমুনা ও দৃষ্টান্ত মাত্র লক্ষ্য করুন—

(১) কাফেরদের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় রসুলুল্লাহ (দঃ) আল্লাহ তায়ালার কুদরতে আঙ্গুলের ইশারায় আকাশের চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দেখাইয়াছিলেন—আমরা যথাস্থানে এই মোজেযার প্রামাণিক সুদীর্ঘ আলোচনা পেশ করিব।

খাঁ মরহুম মোস্তফা-চরিত রচনা করিয়াছেন; নবীজীর মোজেযা বয়ান করার কোন আলোচনা উহাতে নাই। এমনকি এই বিখ্যাত মোজেযাটিরও উল্লেখ করেন নাই। ইহাতেও আমাদের কোন আপত্তি ছিল না; এত বড় মোজেযাকেও বর্ণনা না করা তাঁহার অভিরুচি মনে করিতাম। কিন্তু মোজেযা অস্বীকার করার বাতিক খাঁ মরহুমকে এই ক্ষেত্রেও রেহায়ী দেয় নাই। তিনি তাঁহার উপক্রমণিকায় কৌশলের সহিত উহাকে অস্বীকার করিতে বলিয়াছেন—

"আমাদের অধিকাংশ লেখকের যুক্তিধারা এই যে, "আল্লাহ তায়ালার সর্বশক্তিমানত্বের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া আজগৈবী ঘটনার সম্ভবপরতা প্রতিপন্ন করেন। যথা—যে আল্লাহ এত বড় চাঁদ-সুর্য্যকে সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন তিনি কি চাঁদকে দু'টুকরা করিতে পারেন না?"

আমরা এই শ্রেণীর বন্ধুদের যুক্তি স্বীকার করিয়া নিবেদন করিব, আল্লাহ করিতে পারেন সব—তোমাকে বা আমাকে পাগল করিতে পারেন। তাই বলিয়া কি তুমি আমাকে বা আমি তোমাকে পাগল গণ্য করিব?......ইহা যে ঘটিয়াছে—ঐতিহাসিক ভাবে তাহার প্রমাণ দাও।"

ধৃষ্টতার সীমা আছে কি? বোখারী শরীফ, মোসলেম শরীফ, তিরমিজি শরীফ, মেশকাত শরীফ সহ অসংখ্য কেতাবের হাদীছসমূহে প্রমাণিত এবং হাজার বৎসর হইতে প্রচলিত সীরত শাস্ত্রের বড় বড় প্রামাণিক কেতাবসমূহে বর্ণিত সুপ্রসিদ্ধ মোজেযাটিকে খাঁ মরহুম আজগৈবী ঘটনা বলিতে সাহস করিয়াছেন। আরও আশ্চার্য্যজনক এই যে, বোখারী, মোসলেম, তিরমিজী শরীফ কেতাবসমূহে এই মোজেযার প্রমাণে সুস্পষ্ট হাদীছ এবং অসংখ্য সীরত গ্রন্থের বর্ণনাসমূহ বিদ্যমান থাকা সত্বেও তিনি ঐতিহাসিক প্রমাণ দাবী করিয়াছেন। মাতৃগর্ভে জন্ম নিয়া পিতার পরিচয়ের জন্য আত্মীয়-কুটুম্ব সকলের সাক্ষ্য, এমনকি মাতার রেজেষ্ট্রী কৃত বিবাহের কাবীন-নামাকেও উপেক্ষা করিয়া ঐতিহাসিক প্রমাণের দাবী উত্থাপন অপেক্ষা অধিক অজগৈবী ও আশ্চর্য্যজনক দাবী উহা নয় কি? বাকপটু চতুর খাঁ মরহুম সরল প্রাণ পাঠদেরকে ধোকা দেওয়ার কী অপচেষ্টা করিয়াছেন! তাঁহার বর্ণনার হাবভাবে মনে হয়—আল্লার কুদরতে চাঁদ দু'টুকরা হওয়ার শুধু সম্ভাব্যতার উপর নির্ভর করিয়াই পূর্বাপর মোসলেম সমাজ উক্ত মোজেযায় বিশ্বাস করিয়া নিয়াছে। অথচ বহু সংখ্যক হাদীছ গ্রন্থ ও সীরত গ্রন্থে উহার সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে, এমনকি বোখারী শরীফের দুই স্থানে এই মোজেযাটির আলোচনা রহিয়াছে এবং একাধিক [সুস্পষ্ট ছহীহ্ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে—যথা স্থানে আমরা উহা পেশ করিব। এতদসত্ত্বেও খাঁ মরহুম ঐঅপচেষ্টায় দ্বিধা বোধ করেন নাই; এতদপেক্ষা ধৃষ্টতা কি হইতে পারে?

পাঠক! আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিলেন কি? খাঁ মরহুম তাঁহার বক্তব্যে এই ধূম্রজাল সৃষ্টি করার চেষ্টা করিয়াছেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও যিশু-খৃষ্টের জীবনী গ্রন্থের ন্যায় আজগৈবী গল্পগুজবের পুস্তকাবলী এবং বীর হনুমানের পুথি ও মোহাম্মদী পঞ্জিকা শ্রেণীর সীরত-সঙ্কলন সমুহের খণ্ডন করিতে চাহেন না। আর—ভণ্ড, ভুয়া, কল্পিত আলেম ও পীরদিগকে নাজেহাল করিতে চাহেন না। খাঁ মরহুমের এই হাবভাব ও এই শ্রেণীর বাক্যাবলী ধোকা ও ফাঁকি মাত্র। বস্তুতঃ তিনি এই সব বলিয়াছেন মানুষকে ধোকায় ফেলিয়া পানি ঘোলাটে করার জন্য এবং সেই ঘোলা পানিতে বড় বড় রুই-কাতল শিকার করার উদ্দেশ্যে।

দেখুন! বোখারী শরীফ, মোসলেম শরীফ, তিরমিজী শরীফ, মেশকাত শরীফ ইত্যাদি পাক-পবিত্র গ্রন্থাবলী কি শ্রীকৃষ্ণ ও যীশু-খৃষ্টের জীবনী-গ্রন্থের নায় আজগৈবী গল্পগুজবের বৈ?

ইমাম বোখারী (রঃ), ইমাম মোসলেম (রঃ) ইমাম তিরমিজী (রঃ) সহ অসংখ্য সীরত সঙ্কলক ইমামগণ কি ভুয়া ও কল্পিত শ্রেণীর ইমাম ও আলেম ?

হাজার বৎসরের অধিক কাল হইতে বরণীয় ঐসব পাক-পবিত্র মহাগ্রন্থাবলীতে বর্ণিত এবং উল্লেখিত পবিত্রাত্মা ইমামগণের প্রামাণিক বর্ণনায় প্রাপ্ত চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মোজেযাকে অস্বীকার কেন করা হইল ? ঐতিহাসিক প্রমাণের দাবীর ধূয়া ত এই ক্ষেত্রে নিতান্তই অবান্তর ; হাদীছ গ্রন্থাবলীর মর্য্যাদা ও প্রামাণিকতা ইতিহাস অপেক্ষা লক্ষ-কোটি গুণ উর্দ্ধে নয় কি ?

খাঁ মরহুমের ধৃষ্টতা শুধু এই একটি মোজেযা সম্পর্কেই নয় ; শক্কে-ছদর বা বক্ষ-বিদারণ মোজেযা সম্পর্কেও তিনি সেই অপকর্ম্মই করিয়াছেন। বোখারী, মোসলেম ও মেশকাত সহ বহু হাদীছ গ্রন্থে এবং সীরত শাস্ত্রের সমস্ত প্রামাণিক কেতাব সমূহেই উক্ত মোজেযাটি বর্ণিত। রহিয়াছে। কিন্তু খাঁ মরহুম হাদীছ শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনবিজ্ঞ পাঠকদের সম্মুখে যুক্তি ও পরীক্ষার ভাওতা ধরিয়া মিথ্যা সমাবেশ করতঃ ঐ মোজেযাকে অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মিথ্যাকে সমাজের নজরে ধরাইয়া দেওয়া দুরূহ ব্যাপার নহে, কিন্তু খাঁ মরহুমের এই শ্রেণীর কুকর্ম্ম এতই অধিক যে ঐসবের শুধু ফিরিস্তি লিখিতে গেলেও সীরত সঙ্কলনের কাজ বাদ দিয়া বসিতে হইবে।

ছোর-পর্বত গুহার মোজেযা এবং হিজরত ছফরের অন্যান্য মোজেযা সমূহকেও তিনি একই অপকৌশলে অস্বীকার করিয়াছেন। আর মে'রাজ শরীফের ন্যায় নবীজী মোস্তফার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রখ্যাত মোজেযাকে খাঁ মরহুম স্বপ্নের ঘটনা বলিয়া স্বাভাবিকতার গণ্ডিভুক্ত করিয়াছেন, অন্যান্য নবীগণের মোজেযাও তিনি অস্বীকার করিয়াছেন—যাহার নমুনা চতুর্থ খণ্ডের ফুট নোটে আছে।

খাঁ মরহুম মোজেযা অস্বীকার করেন—সরাসরি এই মতবাদ তিনি কোথাও প্রকাশ করেন নাই, বরং ইহার বিপরীতই হয় ত লিখিয়া থাকিবেন। নতুবা ধোকার ধূম্রজাল ত পূর্ণ হইবে না এবং সমাজও ক্ষমা করিবে না। কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি কি করিয়াছেন তাহা দেখা প্রয়োজন। তাঁহার তফছীর নামীয় পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যায় পূর্ববর্ত্তী নবীগণের মোজেযা বর্ণিত আয়াত সমূহের বিকৃতি সাধনে সেই মোজেয়া সমূহের যেভাবে খণ্ডন করিয়াছেন তাহা অতীব দুঃখজনক। আর নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কি কি মোজেযা তিনি স্বীকার করিয়াছেন তাহা খুঁজিয়া দেখিলেই প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পাইয়া যাইবে।

খাঁ মরহুমের দৌরাত্ম আরও সম্প্রসারিত হইয়াছে ; এই সম্প্রসারিত দৌরাত্মে তিনি মোসলমানদের এত বড় ক্ষতি করিয়াছেন যাহা কোন অমোসলেমও করিতে সাহস পায় নাই।

মোসলমান জাতি নবীজীর এবং ছাহাবীগণের পরে হাজার হাজার বৎসর পর্য্যন্ত ইসলাম লাভ করিবে দুইটি মহামবস্তর মাধ্যমে—একটি পবিত্র কোরআন, আর একটি সুন্নাহ বা হাদীছ। মোসলেম সমাজ কোরআনও লিপিবদ্ধাকারে লাভ করিয়াছে। হাদীছও বিভিন্ন গ্রন্থরূপে লিপিবদ্ধাকারে লাভ করিয়াছে। প্রচলিত বিশিষ্ট হাদীছ গ্রন্থসমূহ নবীজীর মাত্র দুই-আড়াই বা আড়াই-তিনশত বৎসর পরেই সঙ্কলিত হইয়াছে। তখন ইসলামের সোনালী যুগ ছিল যাহা দীর্ঘ দিন চলিয়াছে। তখন হইতে হাজার হাজার হাদীছ বিশারদ ও হাদীছ বিশেষজ্ঞগণ চুলচেরা অনুসন্ধানে দুই খানা হাদীছ গ্রন্থকে ছহীহ্—বিশুদ্ধতা ও নির্ভরশীলতার সর্বোচ্চ স্থান দান করিয়াছেন। (১) ছহীহ বোখারী শঃ (২) ছহীহ্ মোসলেম শঃ ; ছহীহ্ বা 'শুদ্ধ'—গুণবাচক শব্দ উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের নামের অংশরূপে হাজার বৎসরের অধিক কাল হইতে বিশ্ব-মোছলেম কর্ত্তৃক

প্রচলিত। মোসলেম সমাজ নির্দ্বিধায় এই গ্রন্থদ্বয় হইতে দ্বীন-ইসলামের শিক্ষা লাভ করিতেছে।

দীর্ঘ হাজার বৎসরের অধিক কাল পর খাঁ মরহুম সবুজ-শ্যামল ঘাসে আচ্ছাদিত গোবরস্তূপ তুল্য তাঁহার উপক্রমিনিকায় বুঝাইতে চাইয়াছেন যে উক্ত মহান গ্রন্থদ্বয়ও সংশয় মুক্ত নহে। উক্ত গ্রন্থদ্বয়েও অশুদ্ধ, অপ্রকৃত ও ভুল হাদীছ রহিয়াছে।

পাঠক! খাঁ মরহুমের লেখা পড়িলে ভাবিতে পারেন—তিনি ত দলীল-প্রমাণ দিয়াই দেখাইয়াছেন, বোখারী শরীফে ভুল হাদীছ আছে। তাঁহার প্রদত্ত দলীল প্রমাণের স্বরূপ এখনই দেখিতে পাইবেন তবে প্রথমে একটি সরল কথা অনুধাবন করুন। হাফেজে-হাদীছ ইবনে-হজর (রঃ) লক্ষ লক্ষ হাদীছ যাহার কণ্ঠস্থ ছিল ৬০০ বৎসর পূর্বে তাঁহার জন্ম। তিনি তাঁহার সাধনাময় জীবনের বিরাট অংশ বোখারী শরীফের উপর (research ও) গবেষণায় ব্যয় করিয়া প্রায় ৭,০০০ পৃষ্ঠায় উহার ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন। তদ্রূপই হাফেজে-হাদীছ আঈনী (রঃ) প্রায় ২০,০০০ পৃষ্ঠা লিখিয়া গিয়াছেন, আল্লামা কাস্তালানী (রঃ) ৫,০০০ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন, আল্লামা কেরমানী (রঃ)ও ঐরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। হাদীছ শাস্ত্রের (research ও) গবেষণায় জীবন ক্ষয়কারী এই সব মহামনীষীগণ বোখারী শরীফের উপর সুদীর্ঘ গবেষণা চালাইয়া উহার এত বড় বড় ব্যাখ্যা-গ্রন্থ রচনা করিয়া গেলেন, অথচ তাঁহারা এই সব ভুল হাদীছগুলি দেখিলেন না যেগুলি পণ্ডিত খাঁ মরহুম দেখিতে সক্ষম হইলেন! প্রকারান্তরে খাঁ মরহুমের এই সমালোচনা শুধু ইমাম বোখারী (রঃ)কেই ঘায়েল করে নাই; ৬০০ বৎসর হইতে প্রচলিত উক্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহের রচনাকারী মহামনীষীগণকেও বোকা বানাইয়াছে।

ক্ষোভ ও দুঃখের সীমা থাকিতে পারে কি?—খাঁ মরহুম মাকড়সার জালের আশ্রয় লইয়া পাহাড়ের সহিত টক্কর দেওয়ার ন্যায় যে সব ছুতা-নাতার আঁচল ধরিয়া বোখারী শরীফের হাদীছকে ভুল সাব্যস্ত করিয়াছেন ঐ সব কোনটাই তাঁহার আবিষ্কার নহে। মোসলেম জাতির ঈমানী বিশ্বাসকে শিথিল করিয়া তাহাদেরে দুর্বল করার সম্ভাব্য চেষ্টা রূপে যে সব ছল-ছুতার জন্ম দেওয়া যাইতে পারে উম্মতের হিতৈষীগণ পূর্ব আমলেই সেই সবের উদ্ঘাটন করিয়াছেন এবং বোখারী শরীফের গবেষণাকারীগণ নিজ নিজ রচনায় ঐসবের ধুম্রজালকে ছিন্ন করিয়া গিয়াছেন।

পণ্ডিত খাঁ মরহুম কোথাও বিষজনিত ঐ সব ছল-ছুতার খোঁজ পাইয়াছেন; কিন্তু হাদীছ শাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান-গবেষণার দৌড় তাঁহাকে বোখারী শরীফের উল্লেখিত ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ পর্য্যন্ত পোঁছাইতে পারে নাই। ফলে তিনি ঐ বিষের প্রতিষেধক হইতে বঞ্চিত থাকিয়া গিয়াছেন এবং বাংলাভাষী ভাইদের জন্য ঐ বিষ আমদানী করিয়াছেন। কতইনা পরিতাপের বিষয়! বাংলাভাষী পাঠক ভাইগণ হাদীছ শাস্ত্রের কী জ্ঞান রাখেন যে, তাঁহারা এই বিষের প্রতিষেধক খোঁজ করিয়া বাহির করিবেন! আরও পরিতাপের বিষয়—ভাষার সম্রাট বাকপটু পণ্ডিত খাঁ মরহুম নিজ প্রতিভা দ্বারা উক্ত বিষকে এমন সুন্দর সাজে সাজাইয়াছেন যে,হাদীছ শাস্ত্রে অনবিজ্ঞ বাংলাভাষী পাঠক উহা গলধঃ না করিয়া পারিবেনই না। তাই এই সত্য সুস্পষ্ট যে, খাঁ মরহুম তাঁহার এই দুঃসাহসিকতা দ্বারা বাংলাভাষী মোসলেম সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি করিয়াছেন।

নবীগণের মোজেযা অস্বীকারের ন্যায় খাঁ মরহুম আরও অনেক সত্যকে অস্বীকার করিতেন। যথা—জিন জাতির অস্তিত্ব, ইয়াজুজ মাজুজ সম্পর্কীয় অনেক তথ্য; ঈসা আলাইহেচ্ছালামের কোন কোন বৈশিষ্ট ইত্যাদি। বোখারী শরীফ, মোসলেম শরীফ এবং হাদীছ ভাণ্ডারের অনেক

হাদীছ ঐ সব সত্যকে অস্বীকার করায় অন্তরায় হয় ; সেই বাধা অপসারণে খাঁ মরহুম এই কর্ম্ম করিয়াছেন। এতভিন্ন খাঁ মরহুমের তফছীর নামে পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা এবং "মোস্তফা-চরিত" পাঠ করিলে মনে হয় যেন বোখারী শরীফ মোসলেম শরীফের ন্যায় মহাগ্রন্থসমূহের হাদীছ অস্বীকার ও ভুল সাব্যস্ত করিয়া তিনি বাহাদুরী দেখাইবার স্বাদ অনুভব করিতেন। যেমন, কেহ পিতাকে খুন করিয়া বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করার আনন্দ উপভোগের প্রয়াস পায়।

বাংলা বোখারী শরীফ তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে ঐরূপ কোন কোন হাদীছ অস্বীকার করা এবং তাহা খণ্ডনের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এস্থলে সংক্ষেপে শুধু ঐ হাদীছ সম্পর্কে আলোচনা হইবে যাহা তিনি মোস্তফা-চরিতের উপক্রমণিকায় তাঁহার কথিত—হাদীছ "পরীক্ষার নূতন ধারা" পরিচ্ছেদে ভুল হাদীছের নমুনারূপে পেশ করিয়া বলিয়াছেন—"ছনদ-ছহীহ হওয়া সত্ত্বেও ঐ হাদীছগুলি নির্দ্দোষ প্রকৃত এবং সত্য হাদীছ বলিয়া কোন মতেই গৃহীত হইতে পারে না"। বোখারী ও মোসলেম শরীফের হাদীছ সম্পর্কে এই দাবী যে, সত্য হাদীছ বলিয়া কোন মতেই গৃহীত হইতে পারেনা ; তাহাও নেহাত তুচ্ছ হেতুর অজুহাতে—ইহা জঘন্য ধৃষ্টতা বই নহে।

খাঁ মরহুমের ভাষায় "প্রথম প্রমাণ" অর্থাৎ বোখারী শরীফ ও মোসলেম শরীফে যে ভুল হাদীছ রহিয়াছে তাহার প্রথম প্রমাণ বা নমুনা। "আনাছ বলিতেছেন, يا يها الذين اصفوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى হে মোমেনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর আপনাদের স্বর উর্দ্ধে চড়াইও না। এই আয়াতটি নাযেল হইলে ছাবেত-বেন কায়েছ ছাহাবীর খুব ভয় হইল ; তাঁহার কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃ খুব উচ্চ ছিল। এই জন্য তিনি আর হযরতের খেদমতে উপস্থিত না হইয়া বাটিতে বসিয়া থাকেন। কয়েক দিন এইভাবে অতীত হইলে হযরত (দঃ) ছাআদ-বেন-মাআজ নামক ছাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ছাবেৎকে দেখিনা কেন, তাহার কি অসুখ হইয়াছে? ছাআদ-বেন-মাআজ ছাবেতের বাটিতে গমন করিলেন ও ছাবেতকে হযরতের প্রশ্নের কথা জানাইলেন। ছাবেৎ নিজের কণ্ঠস্বর ও সদ্য-অবতীর্ণ উক্ত আয়াতের কথা উল্লেখ করিয়া নিজের নরকী হওয়ার আশঙ্কা জানাইলেন। ছাআদ-বেন-মাআজ ছাবেতের আশঙ্কা-প্রকাশ নবীজীকে জ্ঞাত করিলে তিনি বলিলেন, বরং সে বেহেশ্‌তী।

খাঁ মরহুমের বক্তব্য হইল, এই হাদীছটি সত্য হইতে পারে না—কারণ, ঘটনায় উল্লেখিত আয়াতটি নবম হিজরী সনে নাজেল হয়, আর ছাআদ-বেন-মাআজের মৃত্যু হিজরী পঞ্চম সনে।

পাঠক! হাদীছ খানাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার একটি ভিত্তী হইল, হাদীছটির আলোচ্য আয়াত নবম হিজরী সনে নাজেল হইয়াছে—এই বিষয়টি বিতর্কমূলক। প্রসিদ্ধ হাফেজে-হাদীছ ইবনে হজর (রঃ) ভিন্ন মতের অবকাশ দেখাইয়াছেন।

খাঁ মরহুম বোখারী শরীফ তফছীর অধ্যায়ের যে হাদীছের বরাত দিয়াছেন বোখারী শরীফের উক্ত পৃষ্ঠায়ই হাফেজ ইবনে-হজরের অবকাশ প্রকাশের সমর্থন বিদ্যমান রহিয়াছে। বিতর্কমূলক একটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া হাদীছকে অবাস্তব অসত্য বলা ক্ষমাহীন অপরাধ নয় কি? আরও একটি বিষয় সুস্পষ্ট হইল যে, ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বেই বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবনে হজর (রঃ) যে প্রশ্নের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন সেই প্রশ্নের মৃত লাশকে বাহির করিয়া হাদীছ শাস্ত্রের অভিজ্ঞতাহীন বাংলাভাষী পাঠকদিগকে বিভ্রান্ত করা হইয়াছে।

হাফেজ ইবনে-হজর (রঃ) যে ধারায় প্রশ্নের খণ্ডন করিয়াছেন উহা হাদীছ ও তফছীরের শাস্ত্রীয় অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। আমরা অন্য একটি সরল ও সহজ পয়েণ্ট পেশ করিতেছি।

আলোচ্য হাদীছখানা বোখারী শরীফের দুই স্থানে ৫১০ ও ৭১৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে একই ছনদ তথা সাক্ষীসূত্রে। মোসলেম শরীফে হাদীছখানা একই জায়গায় পর পর চারটি ছনদ তথা সাক্ষীসূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। অতএব হাদীছখানার মোট সাক্ষীসূত্র হইল পাঁচটি।

পাঠক! ইহা একটি মহা সত্য যে, হাদীছকে উহার মূল ও আসল (Orijnal) জায়গায় সরাসরিভাবে গবেষণা (Study) না করিয়া শুধু ধার করা জ্ঞানে তথা উদ্ধৃতি বা অনুবাদ দেখিয়া কোন হাদীছ সম্পর্কে মুখ খোলা মহাপাপ। এই মহাপাপের পরিণাম এখানে লক্ষ্য করুণ। মরহুম খাঁ সাহেব একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও স্বভাব-জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু তিনি বোখারী শরীফ মূল গ্রন্থ হইতে বহু দূরে থাকিয়া শুধু উদ্ধৃতি দেখার ধার করা জ্ঞানে দূর হইতেই ঢিল ছুড়িয়াছেন। নতুবা তিনি উল্লেখিত হাদীছের সমালোচনা করিতে বোখারী শরীফের নাম মুখে বা লিখনীতে কখনও আনিতেন না। কারণ, তাঁহার সমালোচনার দ্বিতীয় ভিত্তি হইল হাদীছটির বর্ণনায় ছাআদ-বে -মাআজের উল্লেখ—যেহেতু তাঁহার মৃত্যু হিঃ পঞ্চম সনে। পাঠক! শুনিয়া আশ্চার্যান্বিত হইবেন যে, বোখারী শরীফের দুই স্থানে হাদীছখানা বর্ণিত, কিন্তু উহার কোন স্থানেই ঘটনার বর্ণনায় ছাআদ-বেন-মাআজের নাম নাই। বরং আছে—فقال رجل انا اعلم لك علمه অর্থাৎ নবীজী ছাবেত বেন-কায়ছের আলোচনা করিলে এক ব্যক্তি বলিল, "ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি আপনার জন্য তাঁহার সংবাদ জানিয়া আসিব।"

পাঠক! লক্ষ্য করুন—সমালোচনার ভিত্তিটাই যখন বোখারী শরীফের হাদীছে বিদ্যমান নাই তখন সমালোচনার ক্ষেত্রে এরূপ বলা যে, "বোখারী ও মোসলেমে একটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে"। ইহা কতটুকু ঈমানদারী তাহা ভাবিয়া দেখিবেন।

তারপর আসুন! মোসলেম শরীফে হাদীছখানার অবস্থাও দেখুন! পূর্বেই বলা হইয়াছে—শুধু উদ্ধৃতি দেখার ন্যায় ধার করা জ্ঞানে হাদীছ সম্পর্কে কিছু বলা নিতান্তই অবান্তর। খাঁ মরহুমের সমালোচিত হাদীছখানা মোসলেম শরীফে চারটি ছনদ তথা সাক্ষীসূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে উল্লেখ হইয়াছে ঐ সাক্ষীর বর্ণনা যাঁহার বর্ণনায় খাঁ মরহুমের সমালোচনার ভিত্তি বস্তুটি তথা"ছাআদ-বেন-মাআজ"নাম বিদ্যমান রহিয়াছে। পাঠক আশ্চার্য্যান্বিত হইবেন, মোসলেম (রঃ) বিভ্রান্তি হইতে সতর্ক ও হুশিয়ার করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যবস্থা রাখিয়াছেন উহা হইতে খাঁ মরহুম নিজে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া এবং পাঠককে অজ্ঞ রাখিয়া সেই বিভ্রান্তিতেই নিজেও পতিত হইয়াছেন এবং অপরকেও পতিত করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই কেলেঙ্কারীর একমাত্র কারণ হইল মোসলেম শরীফ মূল গ্রন্থকে দেখার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত থাকা।

দেখুন! মোসলেম শরীফে বিভ্রান্তি অবসানের কী সুন্দর ব্যবস্থা রহিয়াছে! একটি সাক্ষীসূত্রে ঐসমালোচনার বস্তু সম্বলিত বিবরণ উল্লেখিত সঙ্গে সঙ্গে ঐহাদীছটির আরও তিনটি সাক্ষীসূত্র ইমাম মোসলেম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। এই সাক্ষীগণের বর্ণনায় স্পষ্ট বলিয়াছেন, ليس فى حديثه ذكر سعد بن معاذ — এই সাক্ষীর বর্ণনায় ছাআদ-বেন মাআজের উল্লেখ নাই। لم يذكر سعد بن معاذ — এই সাক্ষী ছাআদ-বেন মাআজের নাম উল্লেখ করেন নাই।

ইমাম মোসলেমের বর্ণনায় সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইয়া গেল যে, মূল হাদীছটি তথা উহার তথ্যকে অসত্য বা অপ্রকৃত বলা যাইতে পারে না। কারণ শুধু একজন সাক্ষীর বর্ণনায় একটি নাম উল্লেখের বিভ্রাট থাকিলেও অপর তিন জন সাক্ষীর বর্ণনা ঐ বিভ্রাটমুক্ত বিদ্যমান রহিয়াছে।

পাঠক! একটি ঘটনা সাব্যস্ত করিতে বাদী যদি পাঁচটি সাক্ষী পেশ করে—সে ক্ষেত্রে বিবাদী একটি সাক্ষীর বর্ণনায় দোষ দেখাইতে পারিলেই ঘটনাটি মিথ্যা হইয়া যাইবে? ইমাম মোসলেম বিভ্রাট খণ্ডনের জন্য বিভ্রাটযুক্ত হাদীছটি উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা কি তাঁহার দোষ হইল?

মোসলেম শরীফের চার সাক্ষীসূত্রে এবং বোখারী শরীফের এক সাক্ষীসূত্রে—এই পাঁচটি সাক্ষীসূত্রের মধ্যে শুধু একটি সাক্ষীসূত্র বিতর্কমূলক; চারটি সাক্ষীসূত্রই সম্পূর্ণ নির্মল নির্দোশ; এমতাবস্থায় কোন আইনে বা বিচারে কি উক্ত ঘটনাকে মিথ্যা বলার অবকাশ আছে?

অতঃপর সুধী বিচারকের সম্মুখে আরও একটি তথ্য বিতর্কের জন্য নয় বিচারের জন্য পেশ করিতেছি। একটি সাক্ষীর বর্ণনায় যে, ছাআদ-বেন মাআজের নাম উল্লেখের বিভ্রাট রহিয়াছে তাহাও অতি নগণ্য। ছাহাবীগণের নাম পর্য্যালোচনায় দেখিতে পাওয়া যায়, ছাহাবীগণের মধ্যে একজন ছিলেন ছাআদ-বেন মাআজ, আর একজন ছিলেন ছাআদ-বেন ওবাদাহ।

আলোচ্য হাদীছের ঘটনার ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে ছিলেন ছাআদ-বেন ওবাদাহ, যাঁহার মৃত্যু নবীজীরও অনেক পরে, সুতরাং তাঁহার নামের বেলায় কোন প্রশ্নেরই অবকাশ নাই। এখন ভাবিয়া দেখুন—ছাহাবীদের যুগে নয়, তাবেয়ীদের যুগে নয়; ইহারও পরে তথা ঘটনার অনেক বৎসর পরে একজন বিশিষ্ট জ্ঞানীবান অতিশয় শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি ছাআদ নামও ঠিকই বলিয়াছেন শুধু কেবল বেন-ওবাদাহ স্থলে বেন-মাআজ বলিয়া পিতার নাম ব্যতিক্রমে বলিয়াছেন। ইমাম মোসলেম উক্ত সাক্ষীর বর্ণনা উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনজন সাক্ষীর বর্ণনা উল্লেখ করিয়া ঐ ব্যতিক্রমটা ধরাইয়া দিয়াছেন। শুধু ঐ ব্যতিক্রমকে পুঁজি করিয়া সুদীর্ঘ বিবরণকে অপ্রকৃত ও অসত্য বলা এবং ইমাম মোসলেম কর্ত্তৃক ব্যতিক্রমটা ধরাইয়া দেওয়ার কথা গোপন করিয়া বোখারী-মোসলেমে অসত্য হাদীছ আছে বলা কতদূর ঈমানদারী তাহা সুধীগণ বিচার করেন।

খাঁ মরহুম তাঁহার বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদের জন্য পথ পরিষ্কারের উদ্দেশ্যে তাঁহার খেয়াল-খুশি মতে হাদীছ এন্‌কার ও অস্বীকার করার জন্য "পরীক্ষার নূতন ধারা" নামে একটি ফাঁদ তৈরী করিয়াছেন। মাকড়শার জালে তৈরী সেই ফাঁদে তিনি বোখারী শরীফ মোসলেম শরীফের ন্যায় শক্তিশালী গ্রন্থাবলীর হাদীছ আটকাইতে যাইয়া দশটি নমুনা প্রমাণরূপে পেশ করিয়াছেন।

তাঁহার সবগুলি প্রলাপের উত্তর দিতে গেলে অহেতুক অপচয়ের যাতনা পোহাইতে হয়। এতদ্ভিন্ন হাদীছ শাস্ত্র এবং বোখারী ও মোসলেম গ্রন্থদ্বয় সম্পর্কে অনভিজ্ঞ বাংলাভাষী পাঠকদের চোখে তাঁহার প্রলাপগুলি পাণ্ডিত্য ও বাকপটুতার প্রলেপে সুন্দর দেখাইবে বটে, কিন্তু যে কোন খাঁটী আলেমের নিকট হইতে ঐ সব প্রলাপের সুষ্ঠু সুরাহা প্রত্যেকেই লাভ করিতে পারেন। যেমন—নবীজীর বয়সের সংখ্যার তিনটি হাদীছের কোন দুইটি অসত্যই মনে হইবে। কিন্তু উহার খণ্ডন অতি সহজ। নবীজীর বয়স আলোচনায় আমরা তাহা দেখাইয়াছি।

হাদীছকে মোটেই না বুঝিয়া এমনকি প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা-গ্রন্থাবলীতে সুস্পষ্টরূপে হাদীছের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও উহার মূলগ্রন্থ তলাইয়া দেখার যোগ্যতা-অভাবে উহা হইতে অজ্ঞ থাকায় যে সব প্রলাপের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দেখিলে ত বিরক্তির সহিত ক্ষোভ ও ঘৃণা জন্মে। যথা—

বোখারী শরীফের একটি হাদীছ প্রথম খণ্ডে ৪নম্বরে অনুদিত—উহাতে ছুরা কেয়ামতের একটি আয়াতের শানে-নুজুল বর্ণিত আছে। ওহী নাজেল হওয়ার প্রথম যুগে নবীজীর অভ্যাস ছিল, জিব্রিল ফেরেশ্‌তা ওহী পঠনকালে নবীজী উহা শ্রবণ ও হৃদয়ঙ্গম করার সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট নাড়িয়া পড়িতে থাকিতেন। নবীজীকে এই ক্লেশ হইতে মুক্ত করিতে এই আয়াত নাজেল হইল—
لا تحرك به لسانك لتعجل به "তাড়াতাড়ি কণ্ঠস্থ করার উদ্দেশ্যে মুখ নাড়িয়া এই ওহী (সদ্য অবতারিত কোরআনের আয়াত) সমূহকে আপনার পড়িতে হইবে না; আমার দায়িত্বে থাকিল আপনাকে উহা কণ্ঠস্থ করাইয়া দেওয়া এবং উহা পঠনের শক্তি দেওয়া।"

হাদীছে আছে যে, উক্ত বিবরণীটি বর্ণনা করিতে ইবনে আব্বাস(রাঃ) শাগের্দকে বলিয়াছেন, আমি নবীজীকে যেভাবে ঠোঁট নাড়িতে দেখিয়াছি সেইভাবে আমিও ঠোঁট নাড়িয়া দেখাইব।

খাঁ মরহুম বুঝিয়াছেন—এই আয়াত নাজেল হওয়ার পূর্ব্বে যে, নবীজী ওহী সংরক্ষণে ঠোঁট নাড়িতেন অর্থাৎ যেই ঠোঁট নারা উপলক্ষ করিয়া উহাকে বন্ধ করার জন্য উক্ত আয়াত নাজেল হইয়াছে ইবনে আব্বাস (রাঃ) সেই ঠোঁট নাড়াই দেখিয়াছিলেন বলিয়াছেন। এই বুঝের বশেই খাঁ মরহুম লাফাইয়া পড়িয়াছেন উক্ত হাদীছকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিতে এবং বলিয়াছেন যে, "ছুরা কেয়ামত (তথা উক্ত ছুরার উল্লেখিত আয়াত) যখন নাজেল হইয়াছিল তখন ইবনে আব্বাসের জন্মই হয় নাই। অতএব কোরআন নাজেল হওয়ার সময় হযরতের 'ঠোঁট নাড়া' দর্শন করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, ছনদের হিসাবে হাদীছ ছহীহ হওয়া সত্ত্বেও যুক্তির হিসাবে তাহা অগ্রাহ্য হইতে পারে।"

নিজের আন্দাজ না করিয়া বড় কথা বলার পরিণামে এইভাবেই মানুষ বিড়ালের মুত্রে আছাড় খায়। খাঁ মরহুম এস্থলে নিজেই ভুল বুঝিয়াছেন এবং সেই ভুল বুঝের পরিণামে বোখারী শরীফের হাদীছকে অসত্য বলার অভিশাপে পতিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ হাদীছের সঠিক তাৎপর্য্য দৃষ্টে কোন সংশয়ের অবকাশই থাকে না। হাদীছটির মূল তাৎপর্য্য লক্ষ্য করুন—

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বাল্যকাল হইতেই পবিত্র কোরআনের জ্ঞান লাভে অতিশয় তৎপর ছিলেন। নবীজীর ইহধাম ত্যাগের প্রাক্কালে ইবনে আব্বাস (রাঃ) পরিণত বয়সের নিকটবর্ত্তী ছিলেন মাত্র; তবুও পবিত্র কোরআনের জ্ঞানে তিনি এতই পারদর্শী ও দক্ষ ছিলেন যে, খলীফা ওমর (রাঃ) পর্য্যন্ত কোরআনের জ্ঞান সম্পর্কে তাঁহার বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি দিয়া থাকিতেন (১৭১৯ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)। ইবনে আব্বাসের এই বৈশিষ্ট্যের অন্যতম সূত্র ছিল এই যে, তিনি নবীজী (দঃ) হইতে কোরআনের আয়াত সমূহের জ্ঞান আহরণে সর্ব্বাধিক তৎপর ছিলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁহার সেই তাৎপরতার ধারায়ই কোন এক দিন ছুরা কেয়ামতের আলোচ্য আয়াতটি নবীজীর নিকট বুঝিতে চাহিলেন। নবীজী (দঃ) তাঁহাকে উক্ত আয়াতের আদ্যপ্রান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত বুঝাইলেন। তখন আয়াতটির শানে-নুজুল বা মূল উদ্দেশ্য—জিব্রায়ীলের সঙ্গে সঙ্গে নবীজীর মুখ নাড়িয়া পঠনের বিষয়টিও উল্লেখ করিলেন। এমনকি নবীজী এই আয়াত নাজেল হওয়ার পূর্ব্বে যে, মুখ নাড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে পড়িতেন উহার দৃশ্যও তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে দেখাইয়াছিলেন। সেই দেখানো প্রসঙ্গে নবীজীকে ঠোঁট নাড়িতে দেখিয়া ছিলেন ইবনে আব্বাস (রাঃ)। পরবর্ত্তীকালে ইবনে আব্বাস স্বীয় শাগের্দকে বলিয়াছেন, নবীজী আমাকে তাহার ঠোঁট নাড়ার দৃশ্য দেখাইবার সময় আমি তাঁহাকে যেরূপে

ঠোঁট নাড়িতে দেখিয়াছি তোমাকেও আমি ঐরূপে ঠোঁট নাড়িয়া দেখাইব। এই বলিয়া ইবনে আব্বাস (রাঃ) নিজ শাগের্দকে ঠোঁট নাড়িয়া দেখাইলেন। এমনকি পরম্পরা প্রত্যেক ওস্তাদ নিজ নিজ সাগের্দকে এই হাদীছ পড়াইতে ঐরূপে ঠোঁট নাড়িয়া দেখাইয়াছেন। সুদীর্ঘ প্রায় চৌদ্দ শত বৎসর কাল এই হাদীছ শিক্ষা দানে ঐ ঠোঁট নাড়িবার নীতি বজায় রহিয়াছে। আমাদের ওস্তাদও আমাদিগকে উহা দেখাইয়াছেন; আমরা আমাদের শাগের্দগণকে উহা দেখাইয়া থাকি। এইভাবে এই হাদীছটির মধ্যে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি মোবারক স্মৃতি চৌদ্দ শত বৎসর হইতে চলমান রহিয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই এই হাদীছখানাকে "মোছাল্‌ছাল-বে-তাহ্‌রীকিশ্‌-শ্ফাতাইন" অর্থাৎ ধারাবাহিক রূপে ঠোঁট নাড়িবার স্মৃতি বহনকারী হাদীছ নামে আখ্যায়িত করা হয়।

হাদীছটির এই প্রকৃত ব্যাখ্যা কোন নূতন আবিষ্কার নহে বা খাঁ মরহুমের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত নহে। ছয় শত বৎসর পূর্বে সঙ্কলিত বোখারী শরীফের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফতহুল-বারীতে স্বয়ং ইবনে আব্বাসের উক্তির প্রমাণ দ্বারা এই ব্যাখ্যা বর্ণিত রহিয়াছে।

অপবাদের আশ্রয়ঃ খাঁ মরহুমের রচনাবলীতে বহু সত্যের অস্বীকৃতি রহিয়াছে। সত্যের শক্তি এত প্রবল যে, একটি সত্যকে অস্বীকার করিতে অনেক রকমের মিথ্যা জোটাইতে হয়। খাঁ মরহুমের দশা তাহাই হইয়াছে। সত্য শুদ্ধ ছহীহ হাদীছ অস্বীকার করার অভিনব ফাঁদ—তিনি নাম রাখিয়াছেন "পরীক্ষার নূতন ধারা"। সত্য অস্বীকারের এই ফাঁদের ভিত্তিরূপে একটি মহামিথ্যা জোটাইয়া আনিতে হইয়াছে তাঁহাকে। তিনি পূর্বতন মোহাদ্দেছবৃন্দের প্রতি ভিত্তিহীন অপবাদ ও মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছেন যে, তাঁহারা হাদীছকে ছহীহ শুদ্ধ সাব্যস্ত করিতে শুধু ছনদের যাচাই করিতেন; হাদীছের আভ্যন্তরীন দার্শনিক দিক যাচাই করিতেন না।

খাঁ মরহুম নিজেই এক পরিচ্ছেদে "দেরায়েত"-এর আলোচনা করিয়া উহার অর্থ করিয়াছেন—আভ্যন্তরীন সূক্ষ্ম সমালোচনা। এবং পূর্বতন বহু মোহাদ্দেছগণের এই পন্থার যাচাই এর উদ্ধৃতি দিয়াছেন। দেখুন! তিনি নিজেই স্বীকার করিলেন, মোহাদ্দেছগণ হাদীছের আভ্যন্তরীন যাচাইও করিতেন। এই স্বীকৃতির সম্মুখে পূর্বোল্লেখিত মিথ্যা অপবাদকে টিকাইয়া রাখিতে চতুর খাঁ মরহুম স্বীকৃতির মধ্যে ফাঁক রাখিয়াছেন যে—হাদীছের আভ্যন্তরীন যাচাই না করার দোষটা ছাহাবীদের পরে জমাটবাঁধা অন্ধকারময় মধ্য যুগীয় মোহাদ্দেছগণের মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছে।

খাঁ মরহুমের কথাই শিরোধার্য্য করিয়া প্রশ্ন করিব, ইমাম বোখারী, ইমাম মোসলেম তাঁহারাত প্রায় ১২০০ বৎসর পূর্বের—ছাহাবীদের যুগের মাত্র দেড়শত বৎসর ব্যবধানের মোহাদ্দেছ। তাঁহাদের যাচাই বাছাই করা হাদীছ নিয়া আপনি বাড়াবাড়ী কেন করিলেন?

খাঁ মরহুম একটি যুক্তি ইহাও দেখাইয়াছেন যে, পূর্বতন মোহাদ্দেছগণ হাদীছের আভ্যন্তরীন যাচাই করিয়াছেন—তাহা দেখিয়া আমিও করিলাম। এই সম্পর্কে অনেক কিছুই বলার ছিল, কিন্তু সীমাহীন ধৃষ্টতা খণ্ডনেও অনিহা সৃষ্টি হয়। সংক্ষেপে এই বলা যায়, পাঁচ-দশ লাখ হাদীছ কণ্ঠস্তকারী, হাদীছ গবেষণায় আজীবন সাধনাকারী মনিষীগণের ভূমিকায় আপনার অবতীর্ণ হওয়ার পরিণাম তাহাই হইয়াছে যেই পরিণাম বাঁদরের হইয়াছিল অভিজ্ঞ সুতার—মিস্ত্রীর অনুকরণে অবতীর্ণ হইয়া। আল্লাহ তায়ালা উহা হইতে সকলকে রক্ষা করুন—আমীন!!

আজিজুল হক

সূচী-পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রাইভেট ভাবে নবীজীকে প্রলুব্ধ করা	১৫৪
ইহুদীদের সহিত কোরেশদের যোগাযোগ	১৪৭
আপোষের প্রচেষ্টা	১৫৯
সায়্যেদুনা বেলাল (রাঃ)	১৬০
খাব্বাব (রাঃ)	১৬১
আম্মার পরিবার	১৬৩
পরিক্ষার ফল	১৬৫
সম্ভ্রান্তগণের উপরও অত্যাচার	১৬৫
আবু তালেব কর্ত্তৃক হযরতকে রক্ষা করার ভার গ্রহণ	১৬৯
নবুয়তের পঞ্চম বৎসর	
আবিসিনিয়ায় হিজরত	১৭০
মক্কাবাসীদের মোসলমান হইয়া যাওয়ার গুজব	১৭১
নবুয়তের ষষ্ঠ বৎসর	
মোসলমানদের পক্ষে কতিপয় শুভ লক্ষণ	১৭১
আবুবকরের আবিসিনিয়া হিজরতের প্রস্তুতি	১৭৯
আবিসিনিয়ায় ইসলামের প্রভাব	১৮১
আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীগণের ফজিলত	১৮৩
হামযা (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ	১৮৫
ওমর (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ	১৮৬
নবুয়তের সপ্তম বৎসর	
হযরতের বিরুদ্ধে মোশরেকদের অসহযোগ আন্দোলন	১৯১
নবুয়তের দশম বৎসর	
অসহযোগিতা ও বয়কট ভঙ্গের এবং হযরতের শোকের বৎসর	১৯৫
রোকানা পালোয়ানের ইসলাম গ্রহণ	১৯৮
সত্যের গতি অপ্রতিহত	১৯৮
তোফায়েল দৌসির ইসলাম গ্রহণ	১৯৯
গুনীন জেমাদের ইসলাম গ্রহণ	২০১
আবু তালেবের মৃত্যু	২০৬
আবু তালেবের শেষ অবস্থা	২০৬
তায়েফের ছফর	২১৮
সাধনার ফলে ধারণা বহির্ভুত আল্লার রহমত আসে	২২৬
তায়েফ হইতে মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন	২২৮
বিভিন্ন গোত্র ও এলাকায় ইসলাম প্রচারে নবীজীর তৎপরতা	২৩০

জ্ঞাতব্য ও সতর্কবাণী

মহাগ্রন্থ বোখারী শরীফ অনুবাদের তথা বাংলা বোখারী শরীফের পঞ্চম খণ্ড সীরতুন-নবী সঙ্কলনরূপে প্রকাশ করা হইল। মূল বোখারী শরীফে এই শিরোনামার কোন অধ্যায় নাই, এমনকি "নবী কাহিনী" যে অধ্যায় আছে উহার অংশরূপেও নহে। তবে এই সঙ্কলনের অনেক মৌলিক পরিচ্ছেদ মূল বোখারী শরীফে রহিয়াছে। যথা— ৫০০ হইতে ৫১৩, ৫৪৩ হইতে ৫৬১ এবং ৬২৬ হইতে ৬৪১ পর্য্যন্ত পৃষ্ঠাসমূহে উহার বিভিন্ন পরিচ্ছেদ বিক্ষিপ্ত আকারে রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন উক্ত বিষয়ে বোখারী শরীফের বিভিন্ন স্থানে আরও অনেক হাদীছ রহিয়াছে।

নবী-কাহিনী অধ্যায়ের অনুবাদে চতুর্থ খণ্ড লেখার পর নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আলোচনার প্রতি মন অতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। মূল গ্রন্থের উল্লেখিত পৃষ্ঠাসমূহ উহাতে অধিক উৎসাহ যোগাইল। কারণ, ঐ পৃষ্ঠাগুলির বিক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদ সমূহকে অনুবাদ করিলে উল্লেখিত প্রিয় আলোচনার বিরাট অংশ উহাতে আসে। তাই অন্তরে আবেগ জন্মিল ক্রমিকবিহীন পৃষ্ঠাগুলি হইতে প্রিয় আলোচনার পরিচ্ছেদসমূহ ভিন্ন করিয়া একত্রে বিন্যস্তরূপে অনুবাদ করার।

এরই সঙ্গে আর একটি দুঃসাহসের প্রতিও মন আকৃষ্ট হইল যে, নবীজীর ধারাবাহিক সুবিন্যস্ত আলোচনা যাহা পূর্ব্বাপর সীরত-সঙ্কলকগণ করিয়াছেন উহার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা। ইহা করিতে যাইয়া বহু পরিচ্ছেদ ও বিষয় এমনও আলোচিত হইয়াছে যাহার উল্লেখ মূল বোখারী শরীফে নাই, এমনকি সে সম্পর্কে কোন হাদীছও বোখারী শরীফে নাই; অন্যান্য কেতাবে উহার আলোচনা রহিয়াছে। নবীজীর মোবারক আলোচনাকে যথাসাধ্য পূর্ণাঙ্গ রূপ দানের মানসে আমি তাহা করিয়াছি। তাই একটি বিভ্রাট সৃষ্টির অভিযোগে আমি অপরাধী।

পবিত্র কোরআনের পরে বোখারী শরীফ সর্ব্বোচ্চে; সাধারণ গ্রন্থাবলী বা উহাতে বর্ণিত সব হাদীছ বোখারীর মর্য্যাদার নহে। সুতরাং আমি সতর্ক করিয়া দিতেছি—

এই সঙ্কলনে মূল বোখারী শরীফের অতিরিক্ত যে সব বিষয়াবলী বা হাদীছ রহিয়াছে, যাচাই ছাড়া উহার প্রামাণিকতা বোখারী শরীফের তুল্য নহে। অবশ্য প্রত্যেকটির প্রমাণ উহার সঙ্গে উল্লেখ রহিয়াছে।

যথাসাধ্য পার্থক্যের জন্য আমি একটি নিয়মের অনুসরণ করিয়াছি। যে সমস্ত পরিচ্ছেদ মূল বোখারী শরীফে আছে উহা পৃষ্ঠা নম্বর সহ বড় অক্ষরে রহিয়াছে। তদ্রূপ যে সব হাদীছ মূল বোখারী শরীফ হইতে অনুদিত উহার উপর ক্রমিক নম্বর রহিয়াছে। **ক্রমিক নম্বর বিহীন যে সব হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে উহা বোখারী শরীফের নহে।**

আজিজুল হক

আরম্ভ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بَعَثَ الْاَنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلِيْنَ - لِهِدَايَةِ
النَّاسِ وَتَعْلِيْمِهِمْ اَحْكَامَ الدِّيْنِ

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লার যিনি নবী এবং রসুলগণকে পাঠাইয়াছেন—
মানুষকে সৎপথ প্রদর্শনের এবং তাহাদিগকে দ্বীনের বিধান শিক্ষা দানের জন্য

وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مُحَمَّدِنِ الَّذِىْ جَعَلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى
رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

দরুদ এবং সালাম নবজী মোহাম্মদের প্রতি যাঁহাকে আল্লাহ তায়ালা সারা
জাহানের জন্য রহমতরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।

وَجَعَلَهٗ سَيِّدَ الرُّسُلِ وَاَفْضَلَ النَّبِيِّيْنَ

এবং তাঁহাকে সমস্ত রসুলগণের সর্দ্দার, সমস্ত নবীগণের শ্রেষ্ঠ বানাইয়াছেন।

وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - صَلٰوةً وَّسَلَامًا دَائِمَيْنِ
مُتَلَازِمَيْنِ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ

দোয়া ও সালাম নবীজীর পরিজনের প্রতি এবং সমস্ত ছাহাবীগণের প্রতি।
এই দরুদ ও সালাম সর্ব্বদা জারি থাকিবে কেয়ামত পর্য্যন্ত।

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা
আহমদ মোজতবা

ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম

بَلَغَ الْعُلٰى بِكَمَالِهِ - كَشَفَ الدُّجٰى بِجَمَالِهِ

বালাগাল ওলা বেকামালিহী — কাশাফাদ্দোজা বেজামালিহী

حَسُنَتْ جَمِيْعُ خِصَالِهِ - صَلُّوْا عَلَيْهِ وَاٰلِهِ

হাসুনাৎ জমীউ খেছালিহী — ছাল্লু আলাইহে ওয়া আলিহী

★ ★ ★ ★ ★

مُحَمَّدٌ بَشَرٌ لَا كَالْبَشَرِ
بَلْ هُوَ يَاقُوْتَةٌ وَالنَّاسُ كَالْحَجَرِ

মোহাম্মাদোন বাশারোন লা-কাল্-বাশার
বাল্ হুআ য়্যাকুতাতোন ওন্নাছু কাল্-হজর

لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ

بعد از خدا بزرگ توئی قصّہ مختصر

লা-য়্যুম্‌কেনুছ্‌ ছানাউ কামা কানা হাক্কুহূ
বা'দায খোদা বুযুর্গ তুয়ী কিচ্ছা মোখ্‌তছর

সর্ব্বোচ্চ শিখরে তিনি নিজ মহিমায়
কাটিল তিমির রাশি তাঁর রূপের আভায়

চরিত্র মাধুরী তাঁহার অতি মনোরম
তাঁহার পরে ও বংশ পরে দরূদ ও সালাম

* * * *

মোহাম্মদ মানুষ তবে যেমন মানুষ নন
পাথর মাঝে পরশমণি গণ্য তিনি হন

গরিমা তাঁহার বর্ণিবে কেউ এমন সাধ্য নাই
খোদার পরেই শ্রেষ্ঠ তিনি তুলনা তাঁহার নাই

সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টি হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ঃ

অনাদিরূপে এক আল্লাহ তায়ালাই ছিলেন—অন্য কিছু বলিতে আর কিছুই ছিল না। আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই নাই—এই শূন্যতার সমাপ্তি ঘটাইবেন তিনি ; এই শুভলগ্নেই আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করিলেন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নূর মোব.রককে। এই নূরকেই পরিভাষায় বলা হইয়া থাকে "হাকীকতে-মোহাম্মদিয়্যাহ"। (যোরকানী, ১—২৭)

এই নূর বা হাকীকতে-মোহাম্মদিয়্যাহ বলিতে কাহারও মতে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পবিত্র রুহ বা আত্মা উদ্দেশ্য ; আর কাহারও মতে অন্য কোন বাস্তব বস্তুবিশেষ উদ্দেশ্য (যোরকানী ১—৩৭) ; যথা—ঐ পবিত্র রুহ বা আত্মারই বাহন, কিন্তু পদার্থীয় দেহ নহে, বরং হয়ত এক বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব—যাহার প্রতিবিম্বের বিকাশ ছিল জাগতিক নশ্বর দেহ।*

এই হাকিকতে-মোহাম্মদিয়্যাই হইল নিখিল সৃষ্টিজগতের সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টি। লৌহ-কলম, বেহেশত-দোযখ, আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য্য, ফেরেশ্‌তা এবং মানব-দানব সব কিছুই ঐ হাকীকতে-মোহাম্মদিয়্যাহ বা নূরে-মোহাম্মদীর পরে সৃষ্টি হইয়াছে। এই তথ্য সুস্পষ্টরূপে বিশিষ্ট ছাহাবী জাবের (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে—

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَخْبِرْنِىْ عَنْ اَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَبْلَ الْاَشْيَاءِ قَالَ يَا جَابِرُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهٖ فَجَعَلَ ذٰلِكَ النُّوْرُ يَدُوْرُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ وَلَمْ يَكُنْ فِىْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَّلَا قَلَمٌ وَّلَا جَنَّةٌ وَّلَا نَارٌ وَّلَا مَلَكٌ وَّلَا سَمَاءٌ وَّلَا اَرْضٌ وَّلَا شَمْسٌ وَّلَا قَمَرٌ وَّلَا جِنِّىٌّ

وَلَا اِنْسِىٌّ ... (رواه عبد الرزاق)

---

* প্রথম খণ্ডে "কবরের আজাব" পরিচ্ছেদে জেছমে-মেছালী বা জ্যোতির্দেহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। প্রত্যেক মানুষেরই ঐ দেহ আছে ; ঐ শ্রেণীর কোন বাহন হওয়া বিচিত্র নহে।

"জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি একদা আরজ করিলাম—ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার চরনে উৎসর্গ হউক; সকল বস্তুর পূর্বে সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালা কোন জিনিষটি সৃষ্টি করিয়াছেন? রসুল (দঃ) বলিলেন, হে জাবের! আল্লাহ তায়ালা সকল বস্তুর পূর্বে সর্বপ্রথম তোমাদের নবীর নূরকে সৃষ্টি করিয়াছেন (যাহা) আল্লার (বিশেষ কুদরতে সৃষ্ট) নূর হইতে। অতঃপর সেই নূর আল্লার কুদরতে আল্লাহ তায়ালার নিয়ন্ত্রণাধীনে চলমান ছিল। ঐ সময় লৌহ-কলম, বেহেশত-দোযখ, আসমান জমিন, চন্দ্র-সূর্য্য, মানব-দানব এবং ফেরেশতা কিছুই ছিল না। (যোরকানী, ১—৪৬)

নিখিল সৃষ্টি হযরতের খাতিরে ঃ

কোন শিল্পী নিজ দক্ষতায় সুন্দর একটি জিনিষ তৈরী করে; উহা এতই সুন্দর হয় যে, স্বয়ং গঠনকারী শিল্পী তাহারই হাতে গঠিত জিনিষটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, সে উহাকে আদর করে, উহাকে ভালবাসে। এমনকি শিল্পী তাহার গড়ানো জিনিষটির প্রদর্শনী করিয়া তাহা অন্যকে দেখাইবার প্রবল আকাঙ্খা পোষন করে এবং দেখাইয়াও থাকে।

তদ্রূপ মহান আল্লাহ হাকীকতে-মোহাম্মদীয়্যাহকে সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং উহার প্রতি আকৃষ্ট হন, উহাকে ভালবাসেন।

হাদীছ—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—

إِنِّيْ قَائِلٌ قَوْلًا غَيْرَ فَخْرٍ إِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ اللّٰهِ وَمُوْسٰى صَفِيُّ اللّٰهِ

وَأَنَا حَبِيْبُ اللّٰهِ

"আমি একটি কথা বলিতেছি; ফখর ও গর্ব করা উদ্দেশ্য নয়। ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (অর্থাৎ তিনি আল্লাহকে দোস্ত বানাইয়াছিলেন), মূছা ছফিউল্লাহ (অর্থাৎ তিনি আল্লাহ কর্তৃক বৈশিষ্ট্য প্রদত্ত), আর আমি হাবীবুল্লাহ (অর্থাৎ আমাকে স্বয়ং আল্লাহ তাঁহার দোস্ত বানাইছেন—তিনি আমাকে ভালবাসিয়াছেন।)

(মেশকাত শরীফ)

আল্লাহ তায়ালারই সৃষ্ট হাকীকতে-মোহাম্মদীয়্যার প্রতি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার এমনই আকর্ষণ ও ভালবাসা হয় যে, আল্লাহ ইচ্ছা করেন ঐ হাকীকতে-মোহাম্মদীয়্যার প্রদর্শনী করিবেন এবং অন্যকে দেখাইবেন তাঁহার ভালবাসার প্রিয় মোহাম্মদকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)। সেই প্রদর্শনী করিতে যাইয়াই আল্লাহ তায়ালা এই বিশ্বভূবন সহ কুল্ মখ্‌লুকাত তথা অসংখ্য অগণিত বস্তু সৃষ্টি করেন।

হাদীছ—ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে—

أَوْحَى اللّٰهُ إِلَى عِيْسَى آمِنْ بِمُحَمَّدٍ وَمُرْ أُمَّتَكَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهٖ فَلَوْلَا

مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَ وَلَا الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ (رواه الحاكم)

"আল্লাহ তায়ালা ঈসা আলাইহেচ্ছালামের নিকট ওহী মারফত আদেশ পাঠাইয়া ছিলেন, মোহাম্মাদের প্রতি আপনি ঈমান গ্রহণ করিবেন এবং স্বীয় উম্মৎকে আদেশ করিবেন—তাহারা যেন তাঁহার প্রতি ঈমান আনে। মোহাম্মদ (-এর বিকাশ সাধন ইচ্ছা) না হইলে আদমকেই সৃষ্টি করিতাম না এবং বেহেশতও সৃষ্টি করিতাম না, দোযখও সৃষ্টি করিতাম না। (যোরকানী, ১—৪৪)

হাদীছ—সালমান ফারেসী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—

هَبَطَ جِبْرَئِيْلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ إِنْ

كُنْتُ اتَّخَذْتُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا فَقَدِ اتَّخَذْتُكَ حَبِيْبًا وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا

أَكْرَمَ عَلَيَّ مِنْكَ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ

عِنْدِيْ وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا (رواه ابن عساكر)

"একদা জিব্রায়ীল (আঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনার প্রতিপালক সংবাদ পাঠাইয়াছেন—ইহা সত্য যে, ইব্রাহীম আমাকে দোস্ত বানাইয়া ছিলেন আমি তাহা গ্রহণ করিয়া ছিলাম, কিন্তু আপনাকে স্বয়ং আমি দোস্ত বানাইয়াছি। আমার নিকট আপনার চেয়ে সম্মানী কোন কিছু আমি সৃষ্টি করি নাই। আর আমি শপথ করিয়া বলিতেছি—নিখিল বিশ্ব এবং উহার সব কিছু আমি সৃষ্টি করিয়াছি এই উদ্দেশ্যে যে, তাহাদের নিকট প্রকাশ করিব আপনার গৌরব এবং আমার নিকট আপনার যে কত মর্য্যাদা। আপনি না হইলে আমি নিখিল বিশ্বকে সৃষ্টি করিতাম না। (যোরকানী, ১—৬৩)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—পবিত্র কোরআনের আয়াত ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون "একমাত্র আমার গোলামী করার উদ্দেশ্যেই মানব-দানবকে আমি সৃষ্টি করিয়াছি"। আলোচ্য হাদীছের মর্ম্ম উক্ত আয়াতের পরিপন্থী নহে ; কারণ, আল্লাহর গোলামী করার মাধ্যমেও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গৌরব ও মর্যাদার বিকাশ হইবে। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই পবিত্র কোরআনে

ঘোষণা দিয়াছেন—قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ "আপনি বলিয়া দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাও তবে তোমাদেরকে আমার অনুসরণ করিতে হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে (শুধু ইহাই প্রতিপন্ন হইবে না যে, তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, বরং) আল্লাহ স্বয়ং তোমাদেরকে ভাল বাসিবেন"। (৩ পাঃ ১২ রুঃ)

মোহাম্মদ (দঃ) হাবীবুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ তাঁহাকে দোস্ত বানাইয়াছেন ; আল্লাহ তাঁহাকে ভালবাসেন—তাঁহার প্রতি আল্লাহ তায়ালার ভালবাসা এতই প্রগাঢ় যে, তাঁহার অনুসারীকেও আল্লাহ তায়ালা ভাল বাসিয়া থাকেন, স্বীয় হাবীব গণ্য করেন।

এক আয়াত আছে—مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ "যে ব্যক্তি আমার রসুলের তাবেদারী করিবে সে আল্লার তাবেদার সাব্যস্ত হইবে"। (৫ পাঃ ৮ রুঃ)

বিশ্ব সৃষ্টির পূবের্বই উর্দ্ধ জগতে হযরতের নবুয়ত প্রাপ্তি ঃ

কাহাকেও কোন পদে নিযুক্তির তিনটি পর্য্যায় আছে—যেমন, চাকুরির জন্য (১) বাছাই করা (Selection) (২) চাকুরি প্রদান করা (Appointment) (৩) কর্ম্মক্ষেত্রে নিয়োগ করা (Posting)। কোন সময় দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়দ্বয় এক সঙ্গেই প্রযোজ্য হয়, আর কোন সময় এই উভয়ের মধ্যে ব্যবধান হইয়া থাকে।

সকল নবীরই নবুওতের জন্য নির্ব্বাচন ও বাছাই করা (Selection) আদিকালে আল্লাহ তায়ালার নিকট সম্পন্ন হইয়া রহিয়াছিল, কিন্তু উহা শুধু প্রথম পর্যায়ের অনুষ্ঠান ছিল। অতঃপর হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ছাড়া অন্য সকল নবীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়দ্বয় একই সঙ্গে তাঁহাদের আবির্ভাবকালে সম্পন্ন হইয়াছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া ছিলেন এবং উহা তাঁহার জন্য এক অসাধারণ গৌরব ও বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার বেলায় তৃতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান ত তাঁহার আবির্ভাবকালে হইয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান বহু বহু পূর্বে, এমনকি সারা বিশ্ব ও বিশ্বের আদি পিতা আদম আলাইহেচ্ছালামেরও সৃষ্টির পূর্বেই সম্পন্ন হইয়াছিল।* হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এই বিশ্ব ভূবন এবং হযরত আদমেরও সৃষ্টির পূর্বেই উর্দ্ধ জগতে নবীরূপে বিঘোষিত ছিলেন। মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই একক বৈশিষ্ট্য নিম্ন হাদীছে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত রহিয়াছে।

---

* এই তথ্য "যোরকানী" ১—৩৮ এবং "নশরুত্তীব" ৬ পৃষ্ঠার টীকা হইতে গৃহীত। উক্ত টীকায় এই তথ্যটি দৃষ্টান্তের দ্বারা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং উক্ত টীকাটি মূল কেতাবের সংকলক মাওলানা আশ্রফ আলী থানভী রহমতুল্লাহে আলাইহের নিজস্ব হওয়ার চিহ্ন রহিয়াছে।

হাদীছ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—

قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة قال وآدم بين الروح
والجسد (رواه الترمذي فى سننه)

"ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! কোন্ সময়ে আপনার নবুওত লাভ হইয়াছিল? রসুল (দঃ) বলিলেন, যে সময়ে আদম তাঁহার আত্মা ও দেহের সম্মেলনে পয়দাও হইয়াছিলেন না।" অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির পূর্বে। এই তথ্যটি আরও কতিপয় হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে, যথা—এরবাজ ইবনে ছারিয়াহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এবং মাইছারাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে।
(যোরকানী, ১—৩১, ৩২)

আরশ-কুরছিতে "মোহাম্মদ" (দঃ) নাম এবং তাঁহার নবুয়তের প্রচার ঃ

আদম সৃষ্টিরও পূর্বে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) নবুওত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এমনকি তাঁহার নাম এবং তিনি যে, আল্লাহ তায়ালার রসুল তাহা ঊর্দ্ধ জগতের সর্বত্র বিঘোষিত হইতে ছিল এবং মহান আরশের গায়ে তাঁহার পরিচয় (এবং Designation) "রসুলুল্লাহ" লিখিত ছিল। এই তথ্য একাধিক হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে।

হাদীছ—ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال
يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي فقال الله تعالى يا آدم
وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه قال يا رب لأنك لما خلقتني بيدك
ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش
مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى
اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله تعالى صدقت يا آدم إنه
لأحب الخلق إلي وإذا سألتني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد
ما خلقتك (رواه البيهقي)

"রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আদম (আঃ) আল্লার আদেশ বিরোধী কার্য করার পর একদা তিনি আল্লাহ তায়ালার দরবারে এইরূপে দোয়া করিলেন—হে পরওয়ারদেগার, মোহাম্মদের অছিলা ধরিয়া আপনার নিকট প্রার্থনা করি, আপনি অবশ্যই আমাকে ক্ষমা করিবেন। তখন আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আদম। তুমি মোহাম্মদকে কিরূপে চিনিতে পারিয়াছ, অথচ এখনও আমি তাঁহার (প্রকাশ্য) দেহ তৈয়ার করি নাই ? আদম (আঃ) বলিলেন, হে পরওয়ারদেগার। যখন আপনি আমাকে আপনার বিশেষ কুদরতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আপনার সৃষ্ট আত্মা আমার ভিতরে প্রবেশ করাইয়াছেন তখন আমি আমার মাথা উঠাইবা মাত্র আরশের পায়াসমূহে লেখা দেখিয়াছি—"লাইলাহা-ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ"। আমি তখনই ভাবিয়াছি, আপনার সর্ব্বাধিক ভালবাসার সৃষ্টি না হইলে আপনার নামের সহিত (এই নাম) জড়িত করিতেন না। আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, হে আদম। তুমি সত্য বিষয়ই ভাবিয়াছ। নিশ্চয় মোহাম্মদ আমার সর্ব্বাধিক প্রিয় সৃষ্টি। তুমি তাঁহার অছিলা ধরিয়াছ, অতএব আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। মোহাম্মদ না হইলে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করিতাম না।

(যোরকানী, ১—৬২)

পূর্ববর্ত্তী প্রত্যেক নবীর প্রতি মোহাম্মদ (দঃ) সম্পর্কে নির্দ্দেশ ঃ

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) নিখিলবিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বেই আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে নবুওত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তায়ালা এই বিশ্বভুবনকে সৃষ্টি করিলেন। সেমতে এই বসুন্ধরাকে হযরতের (দঃ) আবির্ভাব-ক্ষেত্ররূপে উপযোগী করার উদ্দেশ্যে ধাপে ধাপে উহাকে মার্জিত করার জন্য এক লক্ষ বা দুই লক্ষ চবিবশ হাজার নবী এই বিশ্বে আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে কেন্দ্র করিয়াই সকল নবীগণের আগমন।

জাগতিক কার্য ব্যবস্থায়ও দেখা যায়—একটি দেশকে কেন্দ্র করিয়াই উহার প্রেসিডেন্ট, গভর্ণর, মন্ত্রীপরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় ; সুতরাং তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে ঐ দেশ ও উহার শাসন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে শপথ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। তদ্রূপ হযরত মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (দঃ)কে কেন্দ্র করিয়াই সমস্ত নবী এই ধরায় আসিয়া ছিলেন ; সুতরাং তাঁহাদের নিয়োগ তথা আবির্ভাব লগ্নে তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) সম্পর্কে অঙ্গীকার ও শপথ গ্রহণ করা হইয়াছে। আলী (রাঃ) এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে এই তথ্যটি সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

لَمْ يَبْعَثِ اللّٰهُ نَبِيًّا مِّنْ اٰدَمَ فَمَنْ بَعْدَهٗ اِلَّا اَخَذَ عَلَيْهِ الْعَهْدَ فِىْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ بُعِثَ وَهُوَ حَىٌّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ وَلَيَنْصُرَنَّهٗ وَيَاْخُذُ الْعَهْدَ بِذَالِكَ عَلٰى قَوْمِهٖ (رواه ابن كثير فى تفسيره وابن عساكر)

"আদম (আঃ) এবং তাঁহার পরবর্ত্তী প্রত্যেক নবীকে ধরাপৃষ্টে প্রেরণকালে আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সম্পর্কে অঙ্গীকার ও শপথ গ্রহণ করিতেন যে, তাঁহার জীবদ্দশায় যদি ধরাপৃষ্ঠে মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাব হয় তবে তিনি স্বয়ং অবশ্যই তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়ন করিবেন এবং তাঁহার সমর্থন ও সহায়তা করিয়া চলিবেন। আর প্রত্যেক নবীও স্বীয় উম্মত হইতে মোহাম্মদ (দঃ) সম্পর্কে ঐরূপ অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়া যাইতেন। (যোরকানী ১—৪০)

এই জন্যইত রসুলুল্লাহ (দঃ) বিশেষ জোরের সহিত বলিয়াছেন—

لَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا لَمَا وَسِعَهٗ اِلَّا اِتِّبَاعِىْ

এই যুগে মূছা পয়গাম্বর জীবিত থাকিলে তাঁহার জন্য আমার আনুগত্য ও অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর থাকিত না (মেশকাত শরীফ)। "মওয়াহেবে-লহ্নিয়্যাহ" কেতাবে উক্ত তথ্যটি বর্ণার পর উল্লেখ আছে যে, এই তথ্যের অনিবার্য অর্থ ইহাই যে, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) শুধু তাঁহার উম্মতের নবীই ছিলেন না, তিনি সমস্ত নবীগণেরও নবী ছিলেন। ইহারই প্রতিফলন এবং বিকাশ সাধন হইবে কেয়ামতের দিন ; যে—আদম (আঃ) এবং তৎপরবর্ত্তী সকল নবীগণই ঐ দিন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পতাকাতলে সমবেত হইবেন। তিরমিজী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীছে ইহার সুস্পষ্ট বিবরণ রহিয়াছে—

مَا مِنْ نَبِىٍّ يَّوْمَئِذٍ اٰدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ اِلَّا تَحْتَ لِوَائِىْ

"কেয়ামতের দিন আদম এবং তিনি ছাড়া আরও যত নবী আছেন সকলেই আমার পতাকাতলে থাকিবেন।"

পূর্বাপর সকল মানুষ, জ্বীন ও ফেরেশতাগণের নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ঃ

আলী (রাঃ) এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত উল্লেখিত তথ্য অনুযায়ী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) বিশ্বভূবন সৃষ্টির প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত মানুষেরই নবী।

কারণ, উক্ত তথ্য অনুযায়ী আদম (আঃ) এবং তাঁহার পরবর্ত্তী প্রত্যেক নবীই নিজ নিজ উম্মত হইতে অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, তাহারা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগ পাইলে তাঁহার প্রতি অবশ্যই ঈমান আনিবে এবং তাঁহার সমর্থন করিবে। আমরা হযরতের (দঃ) যুগ প্রাপ্তিতে তাঁহার প্রতি যে আনুগত্য প্রকাশের ঈমান গ্রহণ করিয়া আমরা তাঁহার উম্মত হইয়াছি আর তিনি আমাদের নবী হইয়াছেন তদ্রূপ পূর্ব্ববর্ত্তী লোকগণও সেই প্রকার ঈমানের অঙ্গীকার গ্রহণ করায় তিনি তাহাদেরও নবী হইয়াছেন যেরূপ তাহাদের নবীগণেরও তিনি নবী ছিলেন। এই সূত্রে হযরতের বাক্য— بُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً "আমি সমগ্র মানব জাতির প্রতি প্রেরিত তথা— আমি সমগ্র মানব জাতির নবী।" এই বাক্যে সমগ্র মানব জাতি বলিতে শুধু হযরতের যুগের মানুষ উদ্দেশ্য করার কোনই প্রয়োজন নাই ; বস্তুতঃ এই সীমাবদ্ধতা উল্লেখিত বাক্যের শব্দাবলীর অর্থের ব্যাপকতারও বিপরীত। পূর্বালোচিত তথ্য অনুযায়ী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) প্রকৃতই পূর্বাপর সমগ্র মানব জাতির নবী।

শুধু তাহাই নহে, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) সমগ্র জ্বীন জাতিরও নবী; পবিত্র কোরআনে ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ রহিয়াছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতেও এই বিষয়টি বর্ণিত রহিয়াছে (মেশকাত শরীফ ৫১৫ পৃঃ)।

হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ফেরেশতাদেরও নবী।

এই তথ্য অনুসারে মোসলেম শরীফে বর্ণিত হাদীছের বাক্য—وَاُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً "আমি সমগ্র সৃষ্টির নবী" এই ব্যাপকতাও সম্পূর্ণ যথার্থই বটে।

নবীগণের সর্দার হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ঃ

এই পর্যন্ত যে সকল তথ্য বর্ণিত হইয়াছে উহার প্রত্যেকটি দ্বারা ইহাই প্রমাণিত যে, সমস্ত সৃষ্টির সেরা ছিলেন হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ; এমনকি সকল নবীগণেরও সেরা ও প্রধান ছিলেন তিনি। হযরত (দঃ) নিজ উম্মতকে তাহাদের নবীর মর্ত্তবা ও মর্যাদা উপলব্ধি করাইবার উদ্দেশ্যে স্বীয় পরিচয় দানে এই শ্রেণীর অনেক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

হাদীছ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ اَوَّلُ مَنْ يَّنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَاَوَّلُ شَافِعٍ وَّاَوَّلُ مُشَفَّعٍ

"রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি সকল আদম সন্তানের সর্দার ও প্রধান ; ইহার সুস্পষ্ট বিকাশ হইবে কেয়ামতের দিন। আমি

সর্ব্বপ্রথম কবর হইতে পুনরুজ্জীবিত হইব, আমি আল্লার দরবারে সর্ব্বপ্রথম সুপারিশ-কারী হইব এবং আমার সুপারিশই সর্ব্বপ্রথম গৃহীত হইবে। (মোসলেম শরীফ)

হাদীছ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰتِىْ بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

فَاَسْتَفْتِحُ فَيَقُوْلُ الْخَازِنُ مَنْ اَنْتَ فَاَقُوْلُ مُحَمَّدٌ فَيَقُوْلُ بِكَ اُمِرْتُ اَنْ

لَّا اَفْتَحَ لِاَحَدٍ قَبْلَكَ

"রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আমি বেহেশতের দ্বারে আসিয়া উহা খুলিতে বলিব। তখন উহার প্রহরী ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিবে, আপনি কে? আমি বলিব, মোহাম্মদ। প্রহরী বলিবে, আপনার সম্পর্কেই আমি আদিষ্ট যে, আপনার পূর্ব্বে কাহারও জন্য আমি যেন বেহেশতের দরজা না খুলি। (মোসলেম শরীফ)

হাদীছ—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِيْنَ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا

خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَلَا فَخْرَ وَاَنَا اَوَّلُ شَافِعٍ وَّمُشَفَّعٍ وَّلَا فَخْرَ

"নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি সমস্ত রসুলগণের নেতা ও সর্দার; আমি গর্ব করি না। আমি সমস্ত নবীগণের সর্ব্বশেষ নবী; আমি গর্ব করি না। আমি আল্লার দরবারে সর্বপ্রথম সুপারিশকারী; আমারই সুপারিশ সর্বপ্রথম গৃহীত হইবে; আমি গর্ব করি না। (মেশকাত শরীফ ৬১৩)

হাদীছ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اَوَّلُ النَّاسِ خُرُوْجًا اِذَا بُعِثُوْا

وَاَنَا قَائِدُهُمْ اِذَا وَفَدُوْا وَاَنَا خَطِيْبُهُمْ اِذَا اَنْصَتُوْا وَاَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ اِذَا

حُبِسُوْا وَاَنَا مُبَشِّرُهُمْ اِذَا اَيِسُوْا اَلْكَرَامَةُ وَالْمَفَاتِيْحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِىْ

وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِىْ وَاَنَا اَكْرَمُ وُلْدِ اٰدَمَ عَلٰى رَبِّىْ

"রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সকল মানুষের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিব, আমিই সকল মানুষের নেতা ও পরিচালক হইব—যখন সকলে আল্লাহ তায়ালার দরবারে উপস্থিত হইবে। আল্লার মহান দরবারে যখন সকলেই নির্বাক থাকিবে তখনও আমি সকলের পক্ষ হইতে কথা বলিব। সকলে যখন হাশর ময়দানে অসস্তিকর অবস্থায় আবদ্ধ থাকিবে তখন তাহাদের পক্ষে আমারই সুপারিশ গৃহীত হইবে। সকলে যখন নিরাশ অবস্থায় থাকিবে আমিই সকলকে আশার বাণী শুনাইব। ঐ দিন সকল সম্মান আমারই হইবে এবং সব কিছুর চাবি আমারই হাতে হইবে। আমার প্রভু-পরওয়ারদেগারের নিকট সকল আদম সন্তানের মধ্যে আমিই সর্বাধিক সম্মানিত হইব। (মেশকাত শরীফ ৫১৪)

হাদীছ—উবাই ইবনে কায়াব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ كُنْتُ اِمَامَ

النَّبِيِّيْنَ وَخَطِيْبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ

"নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন এই সত্যের পূর্ণ বিকাশ হইবে যে, আমি সকল নবীগণের ইমাম ও প্রধান এবং তাঁহাদের মুখপাত্র বা নেতা এবং তাঁহাদের সুপারিশকারী ; ইহাতে আমার কোন গর্ব নাই। (তিরমিজী)

মে'রাজ শরীফের রাত্রে বায়তুল-মোকাদ্দাস মসজিদে যখন বিশিষ্ট বিশিষ্ট নবীগণের সমাবেশ হইয়া ছিল এবং নামাযের জমাত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তখন আল্লাহ তায়ালার আদেশে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) ঐ বিশিষ্ট নবীগণের নামাযের ইমাম হইয়া ছিলেন। ঐ ঘটনায় এই সত্যেরই বিকাশ ছিল এবং কেয়ামতের দিন অসংখ্য ঘটনায় এই সত্যেরই বিকাশ ঘটিবে।

হাদীছ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَلُوا اللّٰهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ قَالُوْا

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْوَسِيْلَةُ قَالَ اَعْلٰى دَرَجَةِ الْجَنَّةِ لَا يَنَالُهَا اِلَّا رَجُلٌ

وَارْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ

"নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লার নিকট আমার জন্য "অছিলা" লাভের দোয়া করিও। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন "অছিলা" কি জিনিষ ? রসুলুল্লাহ(দঃ) বলিলেন, বেহেশতের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত মহল যাহা শুধু এক ব্যক্তির জন্যই তৈরী হইয়াছে ; আশা করি একমাত্র আমিই সেই ব্যক্তি। (তিরমিজী শরীফ)

পূর্ববর্ত্তী আসমানী কেতাবসমূহে হযরতের বয়ান ঃ

আমাদের আসমানী কেতাব কোরআন শরীফেও পূর্ববর্ত্তী অনেক নবীগণের উল্লেখ এবং বয়ান রহিয়াছে। কিন্তু সেই বয়ান হইল সাধারণ ও স্বাভাবিকরূপে ; অর্থাৎ অতীতকালের ইতিহাস স্বরূপ দৃষ্টান্ত মূলকভাবে বিভিন্ন নবীগণের উম্মতের ঘটনাবলী বর্ণনায় নবীগণের উল্লেখ হইয়াছে বা বিশ্বভূবনে যে নবীগণের আগমন হইয়াছে তাহার প্রমাণে ও সংবাদ দানে বিশিষ্ট বিশিষ্ট নবীগণের আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সম্পর্কে পূর্ববর্ত্তী আসমানী কেতাবসমূহে যে আলোচনা হইয়াছে তাহা ভিন্নরূপ।

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ধরাধামে আবির্ভাবের হাজার হাজার বৎসর পূর্ব হইতেই তাঁহার আবির্ভাব ও আগমণের ভবিষ্যৎ সংবাদ সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে সমগ্র সৃষ্টিকে প্রদান করা হইতেছিল। নিখিল বিশ্বকে বিশ্বপতির তরফ হইতে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি তখন হইতেই আকৃষ্ট করা হইতেছিল। বিশ্ব প্রকৃতির অন্তর জুড়িয়া যেন কৌতুহল, অপেক্ষা ও আবেগ জাগিয়া থাকে মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি ; নিখিলের যেন ধ্যানের ছবি হইয়া থাকেন তিনি, তাই তৌরাত, যবুর, ইঞ্জিল কিতাবে তাঁহার গুণগান ও তাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বিঘোষিত হইতে ছিল। এই সব কিতাবে তাঁহার বর্ণনা এতই বিস্তারিত ও সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান ছিল যে, এই সব কিতাবধারীরা তাহাদের ধ্যানের ছবিকে ঠাহর করিতে মোটেই কোন বেগ পায় নাই। পবিত্র কোরআন দুই জায়গায় এই বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছে—

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ

لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

"যাহাদিগকে আমি আসমানী কিতাব দিয়াছি তাহারা মোহাম্মদ (দঃ)কে স্পষ্টরূপেই চিনিয়া থাকে যেমন পিতা তাহার সন্তানকে চিনিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের আলেম শ্রেণী সত্যকে গোপন করিয়া রাখে—জানিয়া বুঝিয়া।" (২পাঃ ১রুঃ)

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ - اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْا

اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

"যাহাদিগকে আসমানী কিতাব দিয়াছি তাহারা মোহাম্মদ (দঃ)কে ঐরূপেই সুস্পষ্ট -ভাবে চিনে যেরূপে নিজ সন্তানকে চিনিয়া থাকে। যাহারা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে তাহারাই তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়ন করে না।" (৭ পাঃ ৮ রুঃ)

ইহুদীদের বিশিষ্ট আলেম আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) এবং নাছারাদের বিশিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তি সালমান ফারেসী (রাঃ)—এই শ্রেণীর কতিপয় কিতাবধারী লোক হযরত (দঃ) সম্পর্কে তাঁহাদের কিতাবে বর্ণিত নিদর্শন সমূহ পরীক্ষা করিয়াই হযরতের হাতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া হাদীছে স্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে। তদ্রূপ ইহুদী মতের বিশিষ্ট অভিজ্ঞ আলেম কা'বুল-আহ্বার—তিনি ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আমলে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে তৌরাত কিতাবের অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছিলেন না বিধায় হযরতের সময়ে ইসলাম হইতে দূরে ছিলেন; পরে তৌরাতের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সেমতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—

قَالَ مَكْتُوْبٌ فِى التَّوْرَاةِ صِفَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"তিনি বলিয়াছেন, তৌরাত কিতাবে মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গুণাগুণ এবং বিবরণ লিখিত ছিল।" (মেশকাত শরীফ ৫১৫)

কা'বুল আহবার (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে—

يَحْكِى عَنِ التَّوْرَاةِ قَالَ نَجِدُ مَكْتُوْبًا مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ عَبْدِى الْمُخْتَارُ

لاَ فَظٌّ وَلاَ غَلِيْظٌ.........مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ هِجْرَتُهُ بِطَيْبَةَ

"কা'বুল-আহবার (রঃ) তৌরাত কিতাব হইতে বর্ণনা দান পূর্বক বলিয়াছেন, আমরা সেই কিতাবে লিখিত পাইয়াছি—মোহাম্মদ যিনি আল্লার বিশিষ্ট বন্দা, (তিনি কোমল স্বভাবের হইবেন)—পাষাণ হইবেন না, কঠোর হইবেন না; (অতিশয় শালীন ও ভদ্র হইবেন—) হাটে-বাজারেও চীৎকার করিয়া কথা বলিবেন না। তিনি মন্দের প্রতিশোধে মন্দ করিবেন না, মাফ করা ও ক্ষমা করায় অভ্যস্ত হইবেন। তাঁহার জন্ম হইবে মক্কায়, দেশ ত্যাগ করতঃ "তায়বা" তথা মদিনায় বসবাসকারী হইবেন। (মেশকাত, ৫১৪)

পরবর্ত্তীকালে ইহুদী-নাছারাগণ তৌরাত ও ইঞ্জিল কিতাবের বহু সত্যকে গোপন করিয়া ফেলিয়াছে এবং নানাভাবে বিকৃত করিয়া উহার মৌলিকত্ব বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। এমন কি প্রকৃত তৌরাত-ইঞ্জিল কিতাব বিশ্বে কোথাও নাই; আসল

কিতাবকে এইরূপে উধাও করিয়া উহার বিকৃতরূপের নাম মাত্র অনুবাদকে খৃষ্টানেরা "বাইবেল" নামে খাড়া করিয়াছে। প্রথমতঃ উহা যে, তৌরাত ইঞ্জিলের অনুবাদ তাহার কোন প্রমাণ নাই এবং যাচাই-এরও কোন উপায় নাই। আসল কিতাবকে একেবারেই বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই বাইবেলেরও পুরাতন প্রকাশ ও নূতন প্রকাশের মধ্যে গড়মিলের ইয়ত্তা নাই।

প্রতীক্ষিত রসুল হযরত মোহাম্মদ (দঃ)ঃ

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রদর্শনীর জন্যই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি। তাই মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁহার আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতেই বিশ্ব প্রকৃতিকে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় উন্মুখ করিয়া রাখার জন্য নানা রকমের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার শুভাগমন অবিদিত না থাকে বিশ্ব ভুবনের এবং সারা বিশ্ব যেন তাকাইয়া থাকে তাঁহার আবির্ভাব পানে; ফলে পুলুকিত হইয়া উঠিবে সারা বিশ্ব তাঁহাকে পাইয়া আপন বুকে, প্রাণ ভরিয়া উঠিবে মহাতৃপ্তিতে নিখিল সৃষ্টির এবং আনন্দ ধ্বনিতে খোশ্-আমদেদ জানাইবে কুল্ মখলুকাত তাঁহার শুভাগমনকে।

হাদীছ—রসুলুল্লাহ (দঃ) এক হাদীছে বলিয়াছেন—

أَنَا دَعْوَةُ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ وَبِشَارَةُ عِيْسٰى

"আমি আমার বংশ-পিতা ইব্রাহীম (আলাইহেচ্ছালাম)-এর দোয়ার উদ্দেশ্য এবং ঈসা (আলাইহেচ্ছালাম)-এর ভবিষ্যৎ সু-সংবাদের বিকাশ।"

উল্লেখিত উভয় বিষয়ই পবিত্র কোরআনে বর্ণিত রহিয়াছে। যথা—

(১) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ

وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ *

আল্লাহ্ তায়ালার নির্দ্দেশে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ) উভয়েই পবিত্র কা'বা শরীফ পুনঃ নির্মাণ সমাপ্ত করার শুভ লগ্নে সুদীর্ঘ দোয়া করিয়াছিলেন। উক্ত দোয়ায় উল্লেখ ছিল—"হে প্রভু-পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে তোমার ফরমাবরদার অনুগত দাস বানাইয়া রাখিও এবং আমাদের বংশধর হইতে তোমার অনুগত দাসের অন্ততঃ একটি দল ও শ্রেণী সর্বদা কায়েম রাখিও। প্রভু হে! আর ঐ সম্প্রদায়ের মধ্য হইতেই তাহাদের হেদায়েত-উদ্দেশ্যে একজন রসুল পাঠাইও

যিনি তাহাদেরকে তোমার কিতাব পড়িয়া শুনাইবেন, তাহাদেরে কিতাবের শিক্ষাদান ও পরিপক্ক জ্ঞান তথা শরীয়ত শিক্ষা দান করিবেন এবং তাহাদিগকে সর্ববিষয়ে পবিত্র ও পরিমার্জ্জিত করিবেন।"

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাইল (আঃ) উভয়ে সম্মিলিতভাবে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাবের তিন হাযার বৎসরের অধিক কাল পূর্বে এই দোয়া করিয়াছিলেন। উল্লেখিত হাদীছে রসুলুল্লাহ (দঃ) এই দোয়ার শেষ আংটিই উদ্দেশ্য করিয়াছেন যে, উক্ত দোয়ায় যে রসুল আগমনের জন্য আল্লার দরবারে আবেদন করা হইয়াছিল সেই রসুলই আমি। অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাবের বহু পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা তাঁহার অনুসন্ধিৎসা বিশ্ব মুরুব্বি শ্রেণীর লোকদের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া দেন; যেন তাঁহার প্রতি নিখিলের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

এস্থলে একটি প্রশ্নের অবকাশ থাকে যে, উক্ত দোয়ার মূল হযরত ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের পর হইতে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) পর্যন্ত মধ্যবর্ত্তী সময়ে বহু নবীর আগমন হইয়াছে, এমতাবস্থায় অন্য কোন নবী উক্ত দোয়ার উদ্দেশ্য সাব্যস্ত হইলেন না; অথচ তিন হাজার বৎসরেরও অধিককাল পরে আবির্ভূত একমাত্র মোহাম্মদ (দঃ) ঐ দোয়ার উদ্দেশ্যবস্তু সাব্যস্ত হইলেন—ইহার সূত্র কি? উত্তর এই যে, হযরত ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের দুই পুত্র (১) ইসহাক (আঃ) ও (২) ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর হইতে তাঁহার পরবর্ত্তী নবীগণের আগমন হইয়াছে। ইসহাক (আঃ) হইতে বংশ পরম্পরায় বহু সংখ্যক নবীর আগমন হইয়াছিল—তাঁহারা সকলই বনী ইস্রায়ীলের নবী ছিলেন। ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশ হইতে দীর্ঘ তিন সহস্রাধিক বৎসর পরে শুধুমাত্র হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর আগমন হইয়াছিল। উল্লেখিত দোয়ার মধ্যে আমাদের বংশধর হইতে বলা হইয়াছে। ইহাতে আমাদের বলিতে উদ্দেশ্য হইয়াছে ইব্রাহীম (আঃ) এবং ইসমাঈল (আঃ); কেননা তাঁহারা উভয়েই কা'বা শরীফ পুনঃনির্মাণে শরীক ছিলেন। পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে—

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ......

পবিত্র কা'বা গৃহ পুনঃনির্মাণ করিয়াছিলেন ইব্রাহীম এবং ইসমাঈল এবং তাঁহারা উভয়েই সমবেতভাবে ঐ দোয়া করিয়া ছিলেন; সুতরাং ঐ দোয়ায় উল্লেখিত রসুলের উদ্দেশ্য একমাত্র সেই রসুলই হইতে পারেন যিনি হযরত ইব্রাহীমের বংশ হইতে হযরত ইসমাঈলের সূত্রে। এইরূপ রসুল একমাত্র হযরত মোহাম্মদ (দঃ)। পক্ষান্তরে হযরত ইব্রাহীমের বংশের অন্য সব নবী ছিলেন হযরত ইসহাকের সূত্রে।

আলোচ্য হাদীছের দ্বিতীয় বিষয়টি যে, আমি ঈসা (আলাইহেচ্ছালাম)-এর ভবিষৎ সুসংবাদের বিকাশ—এই সম্পর্কেও পবিত্র কোরআনে উলেখ রহিয়াছে—

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

"একটি স্মরণীয় কথা—মরিয়ম পুত্র ঈসা বলিয়াছিলেন, হে বনী-ইস্রায়ীল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লার রসুলরূপে আসিয়াছি—আমার পূর্ব্ববর্ত্তী কিতাব তৌরাতের সমর্থনকারী হইয়া এবং এই সুসংবাদ লইয়া যে, আমার পরে এক মহান রসুল আসিবেন যাহার নাম হইবে "আহমদ"। (২৮ পাঃ ৯ রুঃ)

হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাবের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে হযরত ঈসা (আঃ) কর্তৃক এই সুসংবাদপূর্ণ ভবিষ্যদ্বানী প্রচারিত হইয়াছিল।

নিখিল সৃষ্টির সেরা হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ঃ

পূর্ব্বালোচিত যাবতীয় তথ্য সমূহ এই সত্যকে সুস্পষ্টরূপে উদ্ভাসিত করে যে, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) কুল-মখলুকাত তথা সমগ্র সৃষ্টির সেরা ছিলেন। সৃষ্টিজগতের সেরা সৃষ্টি হইল মানবজাতি; তাহাদের মধ্যে সেরা মানুষ হইলেন নবী রসুলগণ। সমস্ত নবী-রসুলগণের সেরা ও প্রধান হইলেন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)। এই বিষয়ে অনেক হাদীছও বর্ণিত রহিয়াছে—

হাদীছ—আবত্নল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে একটি সুদীর্ঘ হাদীছে ইহাও বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—

أَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرَ

"আল্লাহ তায়ালার নিকট পূর্ব্বাপর সকল সৃষ্টির সেরা ও সর্ব্বাধিক শ্রেষ্ঠ আমি; ইহা বাস্তব সত্য—গর্ব্ব নহে।" (তিরমিজী শরীফ)

হাদীছ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তায়ালা মূছা আলাইহেচ্ছালামকে বলিলেন, বনী ইস্রায়ীলকে জানাইয়া দিবেন, যে কোন ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত হইবে এই অবস্থায় যে, সে আহমদকে স্বীকার করিয়া ছিল না, তাহাকে আমি দোযখে নিক্ষেপ করিব—সে যে-ই হউক না কেন। মূছা (আঃ) আরজ করিলেন, আহমদ কে? আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, হে মূছা! আমার মহত্বের

ও বড়ত্বের কসম করিয়া বলিতেছি—আমার এমন কোন সৃষ্টি নাই যে আমার নিকট তাঁহার অপেক্ষা মহান ও সম্মানিত হইতে পারে। আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টিরও (বহু পূর্ব্বে—যাহার পরিমাণ বর্ত্তমান হিসাব অনুসারে) বিশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে আমার নামের সহিত মিশ্রিত রূপে তাঁহার নাম আরশের গায়ে লিখিয়া রাখিয়াছি। আবার আমার মহত্বের ও বড়ত্বের কসম করিয়া বলিতেছি, মোহাম্মদ (দঃ) এবং তাঁহার উম্মত বেহেশতে প্রবেশ না করা পর্য্যন্ত অন্য সকলের জন্য বেহেশতে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকিবে। (নশ্রুত-তীব—১৯২)

পূর্ব্বে এক হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, পূর্ব্বকালের প্রত্যেক নবী এবং তাঁহার উম্মত হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছে যে, হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাবকাল পাইলে অবশ্যই তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়ন করিবে এবং তাঁহার অনুগত ও অনুসারী হইবে। হযরত মুছা আলাইহেচ্ছালামের বেলায় সেই অঙ্গীকার গ্রহণের পূর্ব্বে উল্লেখিত সতর্কবাণীর আলোচনা হইয়াছে।

মাহবুবে-খোদা হযরত মোহাম্মদ (দঃ)ঃ

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি ছিলেন, কিন্তু সাধারণ সৃষ্টি নন; মহান সৃষ্টি—অতি মহান। স্রষ্টার ছিলেন তিনি মাহবুব—প্রিয়পাত্র একান্ত ভালবাসার বস্তু। পূর্ব্বালোচিত তথ্যাবলীতে এবং অনেক হাদীছে এই বিষয়টি ব্যক্ত হইয়াছে। পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতও এই বিষয়ের সর্ব্বোচ্চস্তরকে প্রমাণ করে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

"আপনি বলিয়া দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে তোমরা আমার অনুগত হও ও আমার অনুসরণ কর; ফলে আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন" (৩পাঃ ১২রুঃ)। কত বড় মর্যাদার স্বীকৃতি ইহা! যে, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অনুসারী মানুষ আল্লাহ তায়ালার মাহবুব ও একান্ত প্রিয়রূপে পরিগণিত হইবে; অতএব স্বয়ং হযরত মোহাম্মদ (দঃ) যে কোন্ স্তরের মাহবুব ও প্রিয় তাহা কি ধারণা করা যায়?

আমরা এই ক্ষেত্রে আর একটি বিষয়ের আলোচনা করিব; সেইটি হইল আল্লাহ তায়ালার নিকট হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠের ফজিলত ও মর্তবা। ইহাতে প্রতীয়মান হইবে, তিনি আল্লাহ তায়ালার কিরূপ ভালবাসার পাত্র যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার প্রতি দরূদের এত অধিক মূল্য দিয়া থাকেন!

হযরতের প্রতি দরুদের ফজিলত ঃ

পবিত্র কোরআনের আয়াত—

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا

عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁহার ফেরেশতা সম্প্রদায় প্রিয় নবীকে দরুদের সওগাত প্রদান করিয়া থাকেন ; হে মোমেনগণ ! তোমরাও তাঁহার প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ কর।" (২২ পাঃ ৪ রুঃ)

হাদীছ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি দশটি রহমত নাযেল করিবেন, তাহার দশটি গোনাহ মাফ করিবেন এবং তাহার দশটি মর্তবা বাড়াইবেন। (নাছীয় শরীফ)

হাদীছ—আবু তাল্‌হা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, জিব্রিল (আঃ) বিশেষভাবে এই কথাটি বলিবার জন্য আসিয়াছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপনার প্রতি একবার দরুদ পাঠ করিবে আমি তাহার প্রতি দশবার রহমত নাযেল করিব। যে ব্যক্তি একবার আপনার প্রতি সালাম পাঠ করিবে আমি তাহার প্রতি দশবার সালাম পাঠাইব। (নাছায়ী শরীফ)

একবার দরুদ পাঠে দশটি রহমত লাভ হওয়া—ইহা ন্যূনতম প্রতিদান ; ইহা অপেক্ষা বেশী রহমত লাভের সুসংবাদও রহিয়াছে—

হাদীছ—ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি একবার দরুদ পাঠ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সত্তরটি রহমত দান করিবেন এবং ফেরেশতাগণ তাহার জন্য সত্তর বার মাগফেরাতের দোয়া করিবেন। (মেশকাত শরীফ ৮৭ পৃঃ)

হাদীছ—উবাই ইবনে কা'য়াব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি আরজ করিলাম, আমার দোয়া-কালাম পড়ার নির্দ্ধারিত সময়ের কি পরিমাণ অংশে আপনার প্রতি দরুদ পাঠ করিব ? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমিই নিজ ইচ্ছায় নির্দ্ধারিত কর। আমি আরজ করিলাম, চতুর্থাংশ ? হযরত (দঃ) বলিলেন, আরও বেশী করিলে তোমারই অধিক মঙ্গল হইবে। আমি বলিলাম, অর্দ্ধেক ? হযরত (দঃ) বলিলেন, আরও বেশী করিলে তোমার অধিক মঙ্গল হইবে। আমি বলিলাম, দুই তৃতীয়াংশ ? হযরত (দঃ) বলিলেন, আরও বেশী করিলে তোমার অধিক মঙ্গল হইবে। আমি বলিলাম, দোয়া-কালামের সম্পূর্ণ সময় আপনার প্রতি দরুদ পাঠেই

কাটাইব? হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহা করিলে (আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে) তোমার সকল রকম চিন্তা-ভাবনা দূর করার ব্যবস্থা করা হইবে এবং তোমার গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। (তিরমিজি শরীফ)

হাদীছ—আবদুল্লাহ ইবনে মসঊদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন বিশেষ এক শ্রেণীর ফেরেশতা আল্লাহ তায়ালা এই কাজে নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছেন যাঁহারা সর্বদা বিশ্বব্যাপী ঘোরাফেরা করিতে থাকেন। আমার কোন উম্মত আমার প্রতি সালাম পাঠ করিলে তাঁহারা ঐ সালাম আমার নিকট তৎক্ষণাৎ পৌঁছাইয়া থাকেন। (নাছায়ী শরীফ)

হাদীছ—ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, দোয়া আল্লার দরবারে কবুল ও গৃহীত হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে না যাবৎ দোয়ার সহিত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি দরুদ পড়া না হয়। (তিরমিজী শরীফ)

এতদ্ভিন্ন হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার এরূপ আরও অসংখ্য ব্যবহার প্রমাণিত আছে যাহা তাঁহার মাহবুবে-খোদা হওয়ার সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে।

হাদীছ—মালাকুল-মওত—জান কবজের ফেরেশতা যখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলেন তখন প্রথমে তিনি হযরত (দঃ)কে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন; আপনি যদি অনুমতি দেন আপনার জান কবজ করিতে পারি; নতুবা কবজ করিব না। আল্লাহ তায়ালা আমাকে আপনার হুকুমের তাবেদারী করিতে আদেশ করিয়াছেন। ঐ সময় তথায় জিব্রিল (আঃ)ও উপস্থিত ছিলেন; হযরত (দঃ) তাঁহার প্রতি তাকাইলেন। জিব্রিল (আঃ) বলিলেন, হে মোহাম্মদ (দঃ)! আল্লাহ তায়ালা আপনার সাক্ষাতের আগ্রহী। (জড়দেহের বেষ্টনী মুক্ত হইয়া পবিত্র আত্মা বরযখী জগতে চলিয়া গেলে আল্লার সহিত উহার সম্পর্ক অধিক নিবিড়, নিরবিচ্ছিন্ন এবং সুদৃঢ় হয়—উহাকেই আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাৎ বলা হইয়াছে।) জিব্রিলের কথা শুনিয়া হযরত (দঃ) মালাকুল-মওতকে রুহ কবজের অনুমতি দিলেন। (নশরুত-তীব ১৭৪)

হাদীছ—আদম (আঃ)-এর বেহেশতে অবস্থানকালে বিবি হাওয়া (আঃ) যখন তাঁহার পরিণীতা সাব্যস্ত হইলেন এবং উভয়ের শুভ মিলন লগ্ন উপস্থিত হইল তখন বিবি হাওয়া মহর তলব করিলেন। আদম (আঃ) আল্লাহ তায়ালার দরবারে নিবেদন করিলেন, কিসের দ্বারা আমি মহর আদায় করিব? হুকুম আসিল, আমার ভালবাসার পাত্র—হাবীব মোহাম্মদের (দঃ) প্রতি কুড়িবার দরুদ পাঠ করুন। (নশরুত তীব ১০)

ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ও আলা আলিহী
ও আছহাবিহী ও বারাকা ও সাল্লাম।

আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক হযরত (দঃ)কে রাজকীয় সম্মান ও মর্যাদা দান ঃ

নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁহার পরমপ্রিয় সৃষ্টি হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে যে মান-মর্যাদা ও রাজকীয় সম্মান দান করিয়া ছিলেন বস্তুতঃ তাহা ছিল অপরিসীম, ভাষায় প্রকাশের সাধ্যের উর্দ্ধে। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার পাক কালামে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) সম্পর্কে যেসব ফরমান জারি করিয়াছেন উহা দ্বারা সেই অপরিসীম মান-মর্যাদার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

(১) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ

"হে মোমেনগণ! নবীজীর সম্মুখে তাঁহার আওয়াজ অপেক্ষা উচ্চ আওয়াজে কথা বলিও না এবং তোমরা পরস্পর যেরূপ উচ্চ কণ্ঠে কথা বল নবীজীর সহিত ঐরূপে কথা বলিও না; নতুবা আশঙ্কা আছে—সারা জীবনের কৃত নেক আমল সমুহ বেমালুম নষ্ট ও বরবাদ হইয়া যাইবে।" (২৬ পাঃ ১৩ রুঃ)

উক্ত আয়াতের শানে-নুজুল দৃষ্টে বিষয়টির আরও গুরুত্ব প্রকাশ পায়। একদা হযরতের (দঃ) মজলিসে আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) উভয়ের কোন বিতর্কে তাঁহাদের কণ্ঠধ্বনি উচ্চ হইয়া গিয়াছিল। উহাকে কেন্দ্র করিয়াই এই মহাসতর্ক বাণীর আয়াত নাযেল হইয়াছিল। ছাহাবীগণ বলিতেন, ১৪ الْخَيِّرَانِ اَنْ يَّهْلِكَا "আমাদের দুই প্রধান ধ্বংসের মুখ হইতে অল্পে সারিয়া গিয়াছেন।"

(২) لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

"নবীজীকে কোন প্রয়োজনে ডাকিতে হইলে তাঁহাকে ঐরূপে ডাকিবে না যেরূপে তোমরা পরস্পর একে অন্যকে ডাকিয়া থাক।" (১৮ পাঃ ১৫ রুঃ)

অর্থাৎ নবীজীকে ডাকিতে হইলে তাঁহার মান-মর্যাদা ও যথাযোগ্য সম্মানের উপযোগী সম্বোধনে তাঁহাকে ডাকিবে।

(৩) اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ * وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

"যাহারা আপনাকে আপনার কক্ষের বাহির হইতে ডাকে নিঃসন্দেহে ঐ শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই নির্বোধ আহমক। তাহারা যদি (আপনাকে না ডাকিয়া) কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া আপনার বহিরাগমনের প্রতীক্ষায় থাকিত তবে তাহাদের মঙ্গল হইত।" (ঐ)

(৪) إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ

امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى * لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ عَظِيْمٌ *

"নিশ্চয় যাহারা রসূলুল্লার সম্মুখে স্বীয় কণ্ঠস্বর অনুচ্চ রাখে তাহাদের অন্তরকেই আল্লাহ তায়ালা খোদা-ভীতির যোগ্য পাত্র সাব্যস্ত করিয়াছেন ; তাহাদের জন্য নির্দ্ধারিত রহিয়াছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।" (ঐ)

হযরতের আবির্ভাব ঃ

নিখিল সৃষ্টির সর্বাগ্রে যে, আল্লাহ তায়ালা "হাকীকতে-মোহাম্মদীয়্যাহ"কে সৃষ্টি করিয়া ছিলেন—যাহার আলোচনা পূর্বে করা হইয়াছে সেই পবিত্র আত্মা বা উহার জ্যোতির্বাহন সহ আলমে-আরওয়াহ বা আল্লার কুদরতী উর্দ্ধজগত হইতে এই জড়জগৎ ও বস্তুজগতে অবতীর্ণ হইবেন, সেই "হাকীকতে-মোহাম্মদীয়্যাহ" জড়দেহের পোশাকে লৌকিকজগতে বিকশিত হইবেন—ইহাই হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাবের অর্থ।

হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে দেখাইবার জন্য এই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি ; সেই মহানেরই প্রদর্শনী EXHIBITION রূপে এই বিশ্বজগতের ওজুদ বা অস্তিত্ব। অতএব সেই মহানের মর্যাদানুপাতিক যোগ্য প্রদর্শনীরূপে এই বসুন্ধরার সুগঠনের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সমাপ্ত ও সম্পন্ন হইবে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে। আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান, কিন্তু তাঁহারই নীতি রহিয়াছে প্রত্যেক জিনিষকে ধাপে ধাপে উন্নতমানে উন্নীত করা ; এই ক্ষেত্রেও সেই নীতিই চলিয়াছে। বিশ্বভূবনকে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য যোগ্য প্রদর্শনী-ক্ষেত্র (Exhibition ground) রূপে গড়িয়া তুলিয়াছেন বিধাতা ধীরে ধীরে ও ধাপে ধাপে। সেই গঠন কার্য সম্পাদনের জন্যই ছিল বিশ্ববুকে এক লক্ষ বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বরের আগমন। বিশ্বভূবনে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সর্বশেষে আগমনের ইহাই ছিল রহস্য। কোন মহামূল্যবান ও মর্যাদাবান বস্তুর প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে এইরূপই হইয়া থাকে ; প্রথমে উক্ত প্রদর্শনী-ক্ষেত্রকে সেই মহানের যোগ্য করার প্রচেষ্টায় শত শত শিল্পীর আগমন হয় ; বিভিন্ন শিল্পী প্রদর্শনী-ক্ষেত্রকে গড়াইয়া তোলেন মূল প্রদর্শনীয় বস্তুর মর্যাদা অনুপাতে। সেই গড়ানো কার্য সমাপ্ত হইলে উক্ত

প্রদর্শনীতে উপস্থিত হয় সেই প্রদর্শনীয় মহানের এবং সেই মহানের প্রদর্শন শেষ হইয়া গেলে উক্ত প্রদর্শনীর বিলুপ্তির পালা আসে। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন—

بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ

"বিশ্বভূবনে আমার আগমন-পর্ব শেষ হওয়ার পর কেয়ামত তথা এই বসুন্ধরার প্রলয় এতই নিকটবর্তী যেরূপ নিকটবর্তী মধ্যাঙ্গুলি এবং উহার সংলগ্ন আঙ্গুল।" অবশ্য এই বিশাল বসুন্ধরাকে গড়ান হইয়াছিল দীর্ঘাতিদীর্ঘ সময়ে ধাপে ধাপে; তদ্রূপ ইহার ভাঙ্গন পর্ব্বও ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া মহাপ্রলয়ে সমাপ্ত হইবে।

হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাব তথা বিশ্ববুকে তাঁহার পদার্পণের জন্য মহান বিধাতা নির্ব্বাচন করিয়াছেন সর্ব্বোত্তম কাল বা যুগের; বাছনী করিয়াছেন সর্ব্বোত্তম স্থান বা দেশের; বাছনী করিয়াছেন সর্ব্বোত্তম শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের; বাছনী করিয়াছেন, সর্বোত্তম বংশ ও ঘরের।

সর্ব্বোত্তম যুগে হযরতের আবির্ভাব ঃ

যে কোন মহামানুষের মহত্বের বিকাশ এবং তাঁহার মান-মর্যাদার স্বীকৃতি লাভ সাধিত হয় তাঁহার উচ্চ আদর্শ এবং মহৎ গুণাবলীর প্রসার, প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দ্বারা এবং তাঁহার মিশনের কৃতিত্বের দ্বারা, তাঁহার সংস্কারের সাফল্যের দ্বারা। আর যে যত বড় মহান ও উত্তম সংস্কারকই হউক না কেন তাঁহার কৃতকার্যতা নির্ভর করে তাঁহার সহকারী ও সহচর উত্তম হওয়ার উপর। সহকারী ও সহচর উত্তম ও সুযোগ্য না হইলে কোন মহানের মহত্বের বিকাশ এবং কোন সংস্কারকের মিশনের সাফল্য লাভ সম্ভব নহে। অতএব আল্লাহ তায়ালা বিশ্বভূবনে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মহত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং তাঁহার মিশনের সাফল্য ও সংস্কারের কৃতকার্যতার দ্বারা তাঁহার পূর্ণ মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁহার জন্য যোগ্যতম সহকারী ও সহচরের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মানব জাতি মানবীয় গুণাবলীতে বিশেষতঃ উত্তম সহচর এবং যোগ্য সহকর্মী হওয়ার উপাদানে পুর্ণতা লাভ করিয়াছে যেই যুগে—ঠিক সেই যুগেই আল্লাহ তায়ালা স্বীয় হাবীবকে পাঠাইয়াছেন তাঁহার বিকাশ-ক্ষেত্র মানব সমাজে। সহজ সুলভ হইয়াছিল তাঁহার জন্য সুযোগ্য সহকারী ও সহচরবৃন্দ; শুধু কেবল তাঁহার সহকারী ও সহচরীগণই সুযোগ্য ছিলেন না, বরং পরম্পরা দীর্ঘ যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চলিয়াছে তাঁহার মিশনের সুযোগ্য কর্মীদের বহর। তাঁহার সঙ্গে থাকাকালে তাঁহার ভক্ত-অনুরক্ত সহকারী সহচরগণ তাঁহার জন্য এবং তাঁহার মিশনের জন্য যেভাবে নিজেদের ঘর-বাড়ী আত্মীয়-স্বজন ও জান-মাল কোরবান ও উৎসর্গ করিয়াছেন পূর্ববর্ত্তী কোন

যুগের কোন নবীর সহকারী ও সহচরগণের ইতিহাসে উহার কোনও নমুনা-নজীর মোটেও দেখা যায় না। এই সত্যের দৃষ্টান্ত বদর-জেহাদের ইতিহাসে দেখা যায় এবং "হোদায়বিয়ার ঘটনা" বিবরণে শত্রু পক্ষের সাক্ষেও পাওয়া যায় (তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য)। আর বদর, ওহোদ, খন্দক ইত্যাদি রণাঙ্গনে তাঁহারা কার্যতঃ যে চরম উৎসর্গতা ব্যাপক আকারে দেখাইয়াছিলেন উহার নমুনাও ইতিহাসে নাই।

তাঁহার পরে তাঁহার সহচর খলীফাগণ তাঁহার মিশনকে জীবন্তই নয় শুধু, বরং যেভাবে উন্নতির পথে আগাইয়া নিয়াছেন উহার নমুনায়ও পূর্ব যুগের কোন নবীর খলীফাদের ইতিহাস দৃষ্টিগোচর হয় না।

রাজনীতির পথে ইসলামের শাসন বিস্তারের দ্বারাই নয় শুধু, বরং নবীজীর মিশন তথা দ্বীন-ইসলামের জন্য নবীজীর সহচর ছাহাবীগণ যেসব গঠনমূলক কার্যাবলী সাধন করিয়া গিয়াছেন এবং উহার ভিত্তি স্থাপন পূর্বক সম্মুখের জন্য ছেলছেলাহ জারী রাখিয়া গিয়াছেন তাহাও এক অতুলনীয় সোনালী ইতিহাস। যেমন—

(১) নবীর প্রধান অবলম্বন ধর্ম্মের মূলভিত্তি আল্লাহ প্রদত্ত আসমানী কেতাবের সংরক্ষণ। পূর্ববর্ত্তী নবীগণের যুগের লোকদের মধ্যে এইরূপ সংরক্ষণের গুণ ছিল না যে, তাহারা নিজেদের আসমানী কেতাবকে সংরক্ষণ করিতে সক্ষম হয়। তাহাদের ধীশক্তি ও স্মৃতিশক্তি এই মানের ছিল না যে তাহারা তাহাদের আসমানী কেতাবকে কণ্ঠস্তকারে অক্ষরে অক্ষরে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে পারে। তাহাদের কেতাব শুধু কেবল পত্রপৃষ্ঠে ছিল; ফলে উহা শত্রু, স্বার্থান্বেষী ও ধর্মীয় মোনাফেকদের দ্বারা বৎসরে বৎসরে সংস্করণে সংস্করণে অতি সহজেই পরিবর্ত্তিত ও বিকৃত হইয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে তাহাদের মূল কেতাব মূল ভাষায় বিশ্ববুকে কোথাও বিদ্যমান নাই; আছে শুধু বিভিন্ন ভাষায় উহার মনগড়া অনুবাদ। মূল কেতাব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হওয়ার পর অনুবাদের নির্ভরতা কি থাকিতে পারে তাহা সহযেই অনুমেয়। আর কোন ধর্ম্মের মূলভিত্তি আসমানী কেতাব বিলুপ্ত হইয়া গেলে সেই ধর্ম্মের টিকিয়া থাকার আকার কি হইবে তাহাও অতি সহজেই অনুমেয়।

পক্ষান্তরে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগ তথা তাঁহার আবির্ভাবকাল হইতে (কেয়ামত পর্য্যন্ত) লোকগণ স্মৃতিশক্তি প্রখর হওয়ার গুণে উচ্চ স্তরে পৌঁছিয়াছিল। তার ফলে পবিত্র কোরআনের ন্যায় সর্ব্বাধিক দীর্ঘ আসমানী কেতাবকে এই উম্মত অক্ষরে অক্ষরে হৃদয়পটে অঙ্কিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের কেতাবের ঐরূপ সংরক্ষণকারী হাফেজ কোনকালে ছিল বলিয়া ইতিহাসে সন্ধান মিলে না। পক্ষান্তরে পবিত্র কোরআনের ঐরূপ সংরক্ষণকারী হাফেজ লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী সংখ্যায় পরম্পরা প্রত্যেক যুগে বিদ্যমান রহিয়াছে

বলিয়া ইতিহাসে সন্ধান মিলে না। পক্ষান্তরে পবিত্র কোরআনের ঐরূপ সংরক্ষণকারী হাফেজ লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী সংখ্যায় পরম্পরা প্রত্যেক যুগে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত থাকিবে; যার ফলে পবিত্র কোরআনের একটি অক্ষরও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে নাই এবং পারিবেও না। বিশ্ববুক হইতে কোরআন শরীফের সমুদয় ছাপা কপি বিলুপ্ত করিয়া দিলেও পবিত্র কোরআন বরং উহার একটি অক্ষরও বিলুপ্ত বা বিকৃত হইতে পারিবে না; কোটী কোটী হৃদয়পট হইতে পবিত্র কোরআন মূল আকারে ধ্বনিত হইতে থাকিবে।

মানুষের স্মৃতিশক্তি ধাপে ধাপে উন্নীত হইয়া হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগে এত উচ্চ মানে পৌঁছিয়াছিল যে, তাঁহার যুগের মানুষের জন্য এত বড় সংরক্ষণ কার্য্য সম্ভব হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী কোন যুগের নবীর উম্মতদের পক্ষে ইহা সম্ভব হয় নাই; নতুবা উহার খোঁজ ইতিহাসে থাকিত। বরং যুগ পরম্পরা এখনও তৌরাত-ইঞ্জিল কেতাবের হাফেজ পাওয়া সম্ভব হইত; কারণ এই যুগেও উক্ত কেতাবদ্বয়ের লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী অনুসারী দাবীদার ভক্ত বিদ্যমান আছে এবং কোটী কোটি টাকা তাহাদের ধর্ম্ম প্রচারে তাহারা ব্যয় করিতেছে। অথচ তাহাদের কেতাবের কোন একজন হাফেজ কোথাও দেখা যায় না; ইহার কারণ ইহাই যে, পূর্ববর্ত্তী নবীগণের যুগের লোকদের স্মৃতিশক্তি ও সংরক্ষণশক্তি এই মানের ছিলই না যে, তাহারা এই কার্য্য সমাধা করিতে পারে। অতএব প্রথম হইতে যাহা হয় নাই পরেও উহার ছেলছেলাহ রহে নাই। আর পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার যুগেই উহা ঐরূপে সংরক্ষিত হইয়াছিল; পরম্পরা যুগে যুগেও উহার ছেলছেলাহ চলিয়াছে এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে।

(২) তদ্রূপ পবিত্র কোরআনের অগণিত আয়াতসমূহের স্বয়ং নবীজী কর্ত্তৃক প্রদত্ত প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসমূহ তফছীর আকারে ছাহাবীগণ পূর্ণ রূপে সুরক্ষিত করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা অতি বড় একটি গঠনমূলক কাজ ছিল; কারণ দ্বীন-ইসলামের মূল বস্তু হইল কোরআন শরীফ যাহা মহান আল্লার কালাম। আল্লার কালামের প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যাখ্যা আল্লার প্রতিনিধি রসূলের দ্বারা হইলেই পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হইতে পারে এবং আল্লাহ প্রদত্ত কোরআন কার্য ক্ষেত্রে প্রয়োগের মূল ভিত্তি হইবে ঐ ব্যাখ্যা; সুতরাং ঐ ব্যাখ্যাবলীর সংরক্ষণ দ্বীন-ইসলামের জন্য এক অপরিহার্য্য বস্তু ছিল। ছাহাবীগণ নিজেদের প্রয়োজনে ঐ ব্যাখ্যা সংরক্ষণের প্রতি তেমন মুখাপেক্ষী ছিলেন না; কারণ, স্বয়ং ব্যাখ্যাকার রসূল তাঁহাদের সম্মুখে বিদ্যমান ছিলেন। পরবর্ত্তী যুগের পর যুগ তথা কেয়ামত পর্যন্ত লোকদের সম্মুখে রসূল (দঃ) থাকিবেন না, কিন্তু ইসলাম এবং কোরআন থাকিবে;

কাজেই লোকদের জন্য উক্ত ব্যাখ্যা ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না। সেই যুগ যুগান্তের জন্য ছাহাবীগণ পবিত্র কোরআনের উক্ত ব্যাখ্যা সমূহের সুসংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন—যাহা একমাত্র তাঁহাদের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব ছিল। ছাহাবীগণ ঐ ব্যাখ্যা সমূহ সযত্নে সুরক্ষিত করিয়া না গেলে চিরতরে ইসলাম-জগৎ ঐ ব্যাখ্যার ন্যায় অপরিহার্য বস্তু হইতে চির বঞ্চিত হইয়া যাইত। যেমন, যবুর, তৌরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদি আসমানী কেতাব সমূহের কোনই ব্যাখ্যা উক্ত কেতাব সমূহের বাহক নবী হইতে আজ ভূপৃষ্ঠে বিদ্যমান নাই। অথচ তৌরাতের অনুসারী হওয়ার দাবীদার ইহুদী জাতি এবং ইঞ্জিলের অনুসারী হইবার দাবীদার খৃষ্টানজাতি দুনিয়াতে কত জাঁকজমকের সহিত বিরাজমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ উক্ত নবীগণের সহকারী ও সহচরদের মধ্যে গঠনমূলক কাজ করার দূরদর্শিতা ছিল না, তাঁহাদের মধ্যে সেই গুণের অভাব ছিল। ফলে তাহাদের দ্বারা উক্ত সংরক্ষণ কাজ হয় নাই; পরিণামে সেই নবীগণের পরবর্ত্তী উম্মৎগণ উহা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে এবং বিশ্ববুক হইতে উহার চিহ্ন চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছ।

পক্ষান্তরে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সহকারী ও সহচরগণের মধ্যে ঐরূপ গঠনমুলক কার্যের এবং সংরক্ষণ কার্যের বিশেষ গুণ বিদ্যমান ছিল। তাঁহারা নবীজী হইতে প্রাপ্ত আল্লার কেতাবের ব্যাখ্যা সমূহ অক্ষরে অক্ষরে সংরক্ষিত করিয়া গিয়াছেন; ফলে আজ সেই সব ব্যাখ্যা চিরবিদ্যমানরূপে বিরাজমান। হাদীছ ভাণ্ডারের অধিকাংশ কেতাবে "তফছীর-অধ্যায়" নামে ঐ তফছীর সমুহ বর্ণিত আছে। এতদ্ভিন্ন ঐ শ্রেণীর তফছীর ভিত্তিতে রচিত বিশেষ বিশেষ বড় বড় বহু তফছীরগ্রন্থও বিদ্যমান আছে। যথা—তফছীর ইবনে আব্বাস, তফছীর ইবনে জরীর, তফছীর ইবনে কাছীর, তফছীর দোররে-মনছুর ইত্যাদি।

(৩) পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের যুগের লোকদের তুলনায় হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগের লোকদের গঠনমূলক কাজের গুণ ও যোগ্যতার আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, স্বীয় নবীর আদর্শ, নীতি, কার্যধারা, বক্তব্য ইত্যাদি সমুদয় বিষয়াবলী সংরক্ষণ করা। এই জিনিষটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ; কারণ নবীর তিরোধানের পর তাঁহার দ্বীনের উপর চলিতে হইলে সেই পথের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় দিশারী হইবে ঐ সব জিনিষ। উহা ব্যতিরেকে নবীর দ্বীন তাঁহার পরে সুষ্ঠুরূপে টিকিয়া থাকিতে পারে না। পূর্ববর্ত্তী নবীগণের যুগের লোকদের মধ্যে উক্ত গঠনমূলক অপরিহার্য্য কার্যের গুণ ও যোগ্যতা ছিল না বিধায় পূর্ববর্ত্তী কোন নবীর হাদীছ-ভাণ্ডার কোথাও বিদ্যমান নাই। "হাদীছ" বলা হয়—নবীর আদর্শ, নীতি, কার্যধারা, বক্তব্য ও তাঁহার সমর্থন ইত্যাদিকে। পূর্ববর্ত্তী কোন নবীরই এই সমস্ত জিনিষ সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হয় নাই। যদি থাকিত তবে

যে সমস্ত নবীর অনুসারী হওয়ার দাবীদার আজও লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি রহিয়াছে অন্ততঃ তাহারা তাহাদের নবীর হাদীছকে প্রমাণরূপে পেশ করিতে সক্ষম হইত—যেরূপ দেড় হাজার বৎসর পরেও সক্ষম আছে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মতগণ এবং ইন্‌শা আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত পর্যন্ত সক্ষম থাকিবে।

এই গুণ ও যোগ্যতা হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগের লোকদের এতই অধিক ছিল যে, তাঁহারা নিজ নবীর আদর্শ, নীতি, কাজ, কথা, সমর্থন এবং প্রতিটি গুণাবলীকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সুসংরক্ষিত করিতে সক্ষম হইয়াছে। যাহা আজ দেড় হাজার বৎসর পরেও হাজার হাজার হাদীছরূপে সাক্ষীর সূত্রধারা তথা সনদের সহিত শত শত কেতাব আকারে সারা বিশ্বে বিদ্যমান রহিয়াছে; যাহাকে হাদীছ শাস্ত্র বা হাদীছ ভাণ্ডার বলা হয়। এই সুসংরক্ষিত হাদীছ ভাণ্ডার যাহা হজরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মতগণ আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছে পূর্ববর্ত্তী কোন নবীর উম্মত তাহা আবিষ্কার করিতে পারে ন্যাই; তৎকালীন মানুষের মধ্যে এই প্রতিভা ছিলই না; মানবীয় গুণাবলীর উন্নতির ধাপে ধাপে মানুষ এই শ্রেণীর প্রতিভা লাভ করিয়াছে।

(৪) দুনিয়া পরিবর্ত্তনশীল—নিত্যনূতন ইহার ঘটনাবলী ও প্রয়োজনাদি। ইসলামের নিয়ন্ত্রণ মানুষের জীবনের প্রতি পদক্ষেপ ও প্রতি কার্য্যের উপর। পবিত্র কোরআন শাসনতান্ত্রিক পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত আকারের বস্তু; হাদীছ তদপেক্ষা বিস্তারিত বটে, কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল জগতের ঘটনা প্রবাহের খুঁটিনাটি সব বিষয়ের ফয়ছালা হাদীছে পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনাও অস্বাভাবিক। হাঁ—উক্ত প্রয়োজন মিটাইবার এবং উহার সমাধানের একটি পথ আছে যে, নিত্যনৈমিত্তের খুচরা বিষয়াবলী সম্পর্কে আদেশ-নিষেধ কোরআন ও হাদীছের আলোতে সাব্যস্ত করা; ইহাকেই "ইজ্‌তেহাদ" বলা হয়। এই ইজ্‌তেহাদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মতেই দেখা গিয়াছে, পূর্ববর্ত্তী নবীগণের উম্মতে ঐরূপ প্রতিভা ছিল বলিয়া কোন নিদর্শন দেখা যায় না।

হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মতে এমন এমন দূরদর্শী প্রতিভাধারী ইমাম—অসাধারণ জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের আবির্ভাব হইয়াছে যাঁহারা শুধু নিজ সম্মুখস্থই নয়, বরং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য যত রকম ঘটনার জন্ম হইতে পারে এইরূপ লক্ষ লক্ষ সম্ভাব্য খুচরা ঘটনাবলী গবেষণার মাধ্যমে অগ্রিম আবিষ্কার করিয়া ঐ সব সম্পর্কীয় আদেশ-নিষেধ কোরআন ও হাদীছের আলোতে স্থির ও সাব্যস্ত করতঃ বিরাট বিরাট গ্রন্থমালা রচনা করিয়া গিয়াছেন যাহার সংখ্যা হাযার হাযারের অধিক হইবে; ইহাকেই ফেকাহশাস্ত্র বলা হয়। এইরূপ অগ্রিম আবিষ্কারের বিশেষ প্রয়োজনও ছিল; কারণ, হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের

যুগ সর্বোত্তম যুগ—বিভিন্ন গুণাবলীর যুগ বটে, কিন্তু ইহজগত লয়শীল; মহাপ্রলয়ের দ্বারা উহার সমাপ্তি ঘটিবে। মহাপ্রলয় নিকটবর্ত্তী হওয়ার সাথে সাথে ধাপে ধাপে সৎ গুণাবলী ক্ষীণ হইয়া আসিবে; সেমতে ইজ্‌তেহাদের ক্ষমতাও লোপ পাইবে। ইজতেহাদের ক্ষমতা লোপ পাওয়াকালে দ্বীনের প্রয়োজন মিটিতে পারে সেই ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালা পূর্বাহ্নেই করিয়া রাখিয়াছেন। পূর্ববর্ত্তী ইমামগণকে আল্লাহ তায়ালা অসাধারণ ইজতেহাদশক্তি দান করিয়াছিলেন। তাঁহারা অগ্রিম আবিষ্কাররূপে ইজতেহাদের দ্বারা লক্ষ লক্ষ মছআলাহ রচনা করিয়া গিয়াছেন এই পর্যন্ত এমন কোন ঘটনা দেখা যায় নাই যাহার ফৎওয়া তাঁহাদের কেতাবে পাওয়া যায় নাই; আশা করা যায় ভবিষ্যতেও সেইরূপ হইবে না।

(৫) নবী না হইয়া নবীর দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়ার প্রতিভা মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগের লোকের মধ্যে ছিল। হযরতের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের গৌরবময় ভূমিকা উহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, শান্তি ও শৃঙ্খলার শাসন প্রতিষ্ঠা ক্ষেত্রে এবং ইসলামের উন্নতির বিদ্যুতগতি দ্রুততর করার ক্ষেত্রে খোলাফা-রাশেদীন বরং তাঁহাদের পরেও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত খলিফাগণ কৃতিত্বের যে ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহা মোসলমানদের সোনালী ইতিহাসরূপে চিরবিদ্যমান থাকিবে।

খোলাফা-রাশেদীনগণ হযরতের দায়িত্ব পালনে এবং তাঁহার আদর্শ বহনে যে, সাফল্য অর্জন করিবেন উহার স্বীকৃতি স্বয়ং নবী (দঃ) দিয়া গিয়াছিলেন। হযরত (দঃ) বলিয়া গিয়াছিলেন, عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين

"হে আমার উম্মত! তোমরা সুদৃঢ় থাকিবে আমার আদর্শের উপর এবং খোলাফা-রাশেদগণের আদর্শের উপর যাঁহারা সত্যের প্রতীক হইবেন।"

পূর্বকালের নবীগণের উম্মতের মধ্যে এই প্রতিভা ছিল না, এমনকি স্বয়ং তাঁহাদের সহকারী আছহাবগণের মধ্যেও ছিল না; তাই সেই যুগে এক নবীর তিরোধানের পর তাঁহার দ্বীনকে বাকি রাখার জন্য প্রয়োজন হইয়াছে অনতিবিলম্বে অপর নবী প্রেরণের। পক্ষান্তরে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরে খলীফাগণ ইসলামের সর্বাত্মক উন্নতির বিদ্যুতগতি শুধু অব্যাহতই নয়, বরং অধিক দ্রুত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এক হাদীছে এই তথ্যটির বর্ণনা রহিয়াছে। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—

كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه

لا نبي بعدي وسيكون خلفاء

"বনীইস্রায়ীলকে পরিচালনা করিতেন নবীগণ—যখনই এক নবীর তিরোধান হইত তাঁহার স্থলে অপর নবী আসিতেন। আমার পরে আর কোন নবীর আগমন হইবে না; আমার পরে খলীফাগণ হইবেন।" (মেশকাত শরীফ ৩২০)

এতদ্ভিন্ন মানবীয় সাধারণ গুণাবলী—যেমন, সত্যবাদিতা, ভ্রাতৃত্ব, পরোপকার, দানশীলতা, দয়া, সাহসীকতা, একতা, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্ত্তিতা; এমনকি প্রভু-ভক্ততা ইত্যাদি অসংখ্য গুণাবলী যদ্দারা মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজগত উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে—সেই সব গুণাবলীর অধিকারীরূপে হযরতের যুগটি ছিল শীর্ষস্থানীয় যুগ। তাহাদের উপর কুফর বা অন্ধকারের আবরণ পড়িয়া থাকায় কোন কোন গুণের সুষ্ঠু বিকাশ হইতেছিল না বা গুণগুলি অপাত্রে অক্ষেত্রে ব্যয়িত হইতেছিল; হযরতের অছিলায় যাঁহাদের হইতে সেই আবরণ ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল তাঁহারা এমন বিশ্বসেরা রূপে বিকশিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের তুলনা পূর্ব্ব ইতিহাসেও নাই পরবর্ত্তী ইতিহাসেও নাই এবং দুনিয়ার শেষ যুগ পর্য্যন্ত পাওয়াও যাইবে না। হযরতের ছাহাবীগণের ইতিহাস যাহা অমোসলেমদের নিকটও স্বীকৃত সেই ইতিহাসই উল্লেখিত দাবীর উজ্জ্বল প্রমাণ।

তাঁহাদের এইরূপ অতুলনীয় উচ্চাসনের আসীন হওয়ার পক্ষে হযরতের সাহচর্য্যের প্রভাব অনেক বেশী ছিল বটে, কিন্তু তাঁহাদের নিজস্ব গুণাবলীর প্রভাবও কম ছিল না। বীজ এবং বীজ বপনকারী যতই উত্তম হউক না কেন জমি যদি উত্তম না হয় তবে ফল ভাল হইতে পারে না। ছাহাবীদের ন্যায় সুপাত্র ও সুক্ষেত্রদের দ্বারা হযরত (দঃ) এমন একটি সোনালী যুগ ও সোনালী জামাত ও পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন যাহা বিশ্ব-জীবনের সর্ব্বোত্তম যুগ এবং সর্ব্বোত্তম জামাত ও পরিবেশ ছিল এবং সারা বিশ্বের জন্য আদর্শ হওয়ার উপযুক্ত ছিল। তাহাই স্বয়ং হযরত (দঃ) ছাহাবীদের যুগের প্রসংশায় বলিয়াছেন— خير القرون قرنى আমার সাহচর্য্যে গঠিত যুগটি হইল বিশ্ব-জীবনের সর্ব্বোত্তম যুগ।

সুতরাং পরবর্ত্তীকালে ইসলামের আদর্শ ও জীবনধারা খুঁজিতে হযরতের যুগ তথা ছাহাবীগণের ইতিহাসকে উপেক্ষা করা নিতান্তই বোকামী হইবে। হযরতের আদর্শের সঠিক খোঁজ পাইতে হইলে ছাহাবীগণের আদর্শকে সম্মুখে রাখিতেই হইবে। কারণ ছাহাবীগণ হযরতের শিক্ষা ও আদর্শকে যতটুকু গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন উহার নমুনা কোথাও পাওয়া সম্ভব নহে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগ সর্বোত্তম যুগ। অর্থাৎ এই যুগের মানুষ বিভিন্ন প্রতিভা ও গুণাবলীতে পূর্বেকার যুগসমূহের মানুষ অপেক্ষা উন্নত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপরে কতিপয় গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে; এই শ্রেণীর প্রতিভা ও গুণাবলী হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মতের মধ্যে

ছিল। কারণ, ইসলামের দীর্ঘায়ু এবং উন্নতির পথে উক্ত গুণাবলীর বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তাই মোসলমানগণ ঐসব গুণাবলীতে অধিক যত্নবান ও অধিক তৎপর ছিলেন*।

বলা বাহুল্য—হযরতের যুগ সর্বোত্তম হওয়ার অর্থ ও তাৎপর্য মোসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, বরং যুগের সর্বময় মানব গোষ্ঠির প্রতিভা ও গুণাবলী পুর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হওয়া উদ্দেশ্য। যাহাদের ভাগ্যে ইসলাম জুটে নাই তাহারা তাহাদের প্রতিভা ও গুণের বৈশিষ্ট্যকে জাগতিক উন্নতির পথে ব্যয় করায় নিয়োজিত হইয়াছে, ফলে ধাপে ধাপে তাহারা জাগতিক বিজ্ঞান ও আবিষ্কারে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, পুর্ব যুগে ঐসবের কল্পনারও অস্তিত্ব ছিল না। উক্ত বিজ্ঞান ও আবিষ্কার ঐ প্রতিভা ও গুণাবলীরই অবদান যাহার বদৌলতে হযরতের যুগ তথা তাঁহার যুগের মানুষকে উত্তম তথা উন্নতমানের বলা হইয়াছে। এই বিভাগীয় বৈশিষ্ট্য সকলেরই বিদিত সকলেই ইহার উপর গর্ব করে।

সার কথা—সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে ধাপে ধাপে উন্নত করিয়াছেন। মানব জাতি যখন উপরোল্লেখিত শ্রেণীর প্রতিভা ও গুণের পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে—যাহা মানব জাতির জন্য সৃষ্টিকর্ত্তার সাব্যস্তকৃত চরম উন্নতির পর্যায় ছিল তখন বিধাতা তাঁহার হাবিব মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বিশ্বভুবনে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবের জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা যুগের পর যুগ অপেক্ষা করিতে ছিলেন এই যুগটির জন্যই—যাহা মানব জাতির প্রতিভা ও গুণাবলীর শ্রেষ্ঠ যুগ ; এই যুগটি আসিলে পরই আল্লাহ তায়ালা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাবের ব্যবস্থা করিলেন। এই তথ্যটিই নিম্নের হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে—

১৬৫৮। হাদীছ ঃ—(৫০৩ পৃঃ) عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُوْنِ بَنِىْ

اٰدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتّٰى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِىْ كُنْتُ مِنْهُ -

---

* ইহজগত ধাপে ধাপে প্রলয়ের দিকে আগাইয়া যাইতে থাকিবে ; উহার জন্য ধাপে ধাপে মোসলমানদের ইসলামী গুণাবলীর শিথিলতা অবধারিত। কারণ, ইসলাম বিলুপ্ত হইলেই জগতের বিলুপ্তি আসিতে পারিবে। তাই উল্লেখিত গুণাবলী যাহা ইসলামী গুণাবলী বিভাগ উহা উচ্চমান হইতে ধাপে ধাপে নিম্নমানের দিকে আসিয়াছে, শিথিল হইয়া আসিয়াছে। পক্ষান্তরে মানব-জাতির বিশেষ প্রতিভা ও গুণাবলীর জাগতিক বিজ্ঞান ও আবিষ্কার বিভাগ যাহার আলোচনা সম্মুখে আসিতেছে—উহার মধ্যে শিথিলতা আসে নাই, বরং দিন দিন উহার উন্নতি বাড়িয়াই চলিয়াছে। কারণ, মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে জগত তাহার উন্নতির চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়া তারপর লয়ের পালায় আসিবে।

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মানব সমাজ যে, যুগে যুগে ক্রমান্বয়ে ও ধাপে ধাপে (মানবীয় প্রতিভা ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে) উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে সেই উন্নতির সর্ব্বাধিক উত্তম যুগে আমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে। যুগের পর যুগ অতিবাহিত হইয়াছে ; অতঃপর যখন আমার আবির্ভাবের (উপযুক্ত) যুগ আসিয়াছে তখনই আমার আবির্ভাব হইয়াছে।

হযরতের জন্মের জন্য দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান নির্ব্বাচন ঃ

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) ইহজগতে আবির্ভুত হইবেন ; সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার জন্মের জন্য বিশ্ববুকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান মক্কা নগরীকে নির্ব্বাচিত করিলেন।

সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা তাঁহার পবিত্র কালামে মক্কা নগরীকে যেসব নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন উহাই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে যথেষ্ট।

(১) আল্লাহ তায়ালা উহাকে "اُمُّ الْقُرٰى—উম্মুল-কোরা" আখ্যা দিয়াছেন। "উম্মুল-কোরা" অর্থ সমস্ত নগর-নগরীর জননী। বিশ্ববুকে যত নগর-নগরী আছে সবের মধ্যে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই ইহাকে এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন এই নগরী তথা ইহার কা'বা শরীফকে যেরূপ আল্লাহ তায়ালা সারা বিশ্বমানবের জন্য কেন্দ্ররূপে সৃষ্টি করিয়াছেন তদ্রূপ সৃষ্টির বেলায়ও মক্কা নগরী সারা ভূমণ্ডলের কেন্দ্র ছিল। সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা ভূমণ্ডল সৃষ্টিকালে সর্বপ্রথম মক্কা নগরীর খণ্ডকেই সৃষ্টি করেন এবং পরে উহাকে কেন্দ্র করিয়াই ভূমণ্ডলকে সম্প্রসারিত করা হয়। এই সূত্রেও উহাকে "উম্মুল-কোরা" বলা হইয়াছে ; অর্থাৎ সকল নগর-নগরীর কেন্দ্রস্থল।

(২) আল্লাহ তায়ালা উহাকে "البلد الامين" আল-বালাদুল আমীন"ও বলিয়াছেন, যাহার অর্থ শান্তির নগরী, নিরাপত্তার নগরী। মক্কা নগরীর এই বৈশিষ্ট্য সর্বকালে সর্ব যুগেই উল্লেখযোগ্য ছিল। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ত এই বৈশিষ্ট্যকে এত দূর সম্প্রসারিত করিয়াছেন যে, বন্য পশু-পক্ষী এবং গাছপালার জন্যও উহাকে শান্তি ও নিরাপত্তার স্থানরূপে ঘোষণা দিয়াছেন। ঐ এলাকার কোন উদ্ভিদ বা তৃণ-লতার পাতাও ছিন্ন করা নিষিদ্ধ, ঐ এলাকায় কোন বন্য পশু-পক্ষীকে তাড়া করাও নিষিদ্ধ।

মক্কা এলাকার এই শান্তি ও নিরাপত্তাকে অন্ধকার যুগের বর্ব্বররাও শ্রদ্ধা করিত, এমনকি তাহাদের কেহ নিজ পিতার হত্যাকারীকেও এই সীমার ভিতর কোন প্রকারে ক্ষতি সাধন করিত না।

শান্তির অগ্রদূত—হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য এই শান্তির নগরী যথোপযুক্তই ছিল।

এই মক্কা নগরী আল্লাহ তায়ালার নিকটও এত অধিক সম্মানী ও মর্য্যাদাশীল যে, ইহার হরম শরীফের মসজিদে এক রাকাত নামাযে সাধারণ মসজিদের তুলনায় এক লক্ষ রাকাতের ছওয়াব হইয়া থাকে। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার প্রিয় নবীর জন্য এই প্রিয় নগরীকেই নির্বাচন করিয়াছেন।

ভৌগলিক দিক দিয়াও মক্কা নগরীর বৈশিষ্ট্য এক বিচিত্রময়; মক্কা নগরী ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থিত। মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখা যায়, মক্কা নগরী যে ভূখণ্ডের বক্ষ অর্থাৎ আরব দেশ তথা হইতে যত সহজে ও অল্প সময়ে জল ও স্থল উভয় পথে পৃথিবীর সকল প্রান্তে গমনাগমন করা যায় অন্য কোন দেশ হইতে তাহা আদৌ সম্ভবপর নহে। অতএব জগতের মুক্তিদাতার আবির্ভাবের জন্য ভূমণ্ডলের এই এলাকাই সর্বাধিক সমিচীন ছিল।

হযরতের জন্য সর্বোত্তম বংশের নির্বাচন ঃ

এই সম্পর্কে স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বর্ণনা দান করিয়াছেন—

হাদীছ—রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত ইব্রাহীমের বংশধরে ইসলাঈল (আঃ)কে শ্রেষ্ঠত্বদান করিয়াছেন; হযরত ইসমাঈলের বংশধরে "কেনানা" গোত্রকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন; কেনানা গোত্রে কোরায়েশ শাখাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন; কোরায়েশ-শাখার মধ্যে হাসেমের বংশকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে আমাকে সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্বদান করিয়াছেন। (মেশকাত শরীফ)

হাদীছ—রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা নিখিল সৃষ্টির মধ্যে আদমজাতকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন; আদমজাতের মধ্যে আরবীদিগকে শ্রেষ্ঠত্বদান করিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে হাসেম বংশকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং আমাকে সেই বংশভুক্ত করিয়াছেন। (যোরকানী, ১—৬৯)

হযরতের সময়কাল ঃ

হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের পর একমাত্র নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম, তাঁহাদের মধ্যে কোন নবীর আবির্ভাব হয় নাই। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সময়কালের পরিমাণ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কাহারও মতে ৫৬০ বৎসর, কাহারও মতে ৫৪০ বৎসর। (ফতহুলবারী ৭—২২২)

ইমাম বোখারী (রঃ) এই সম্পর্কে (৫৪০ পৃষ্ঠায়) উল্লেখ করিয়াছেন—

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ فَتْرَةٌ بَيْنَ عِيْسٰى وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتُّمِائَةِ سَنَةٍ

"ছাহাবী সালমান ফারেসী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত ঈসা (আঃ) ও মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মধ্যবর্ত্তী সময়কাল—যে সময়ে কোন নবীর আবির্ভাব হইয়াছিল না, ছয় শত বৎসর ছিল।"

ব্যাখ্যা ঃ—সালমান ফারেসী (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন। তিনি ইসলাম পূর্ব্বে হযরত ঈসার ধর্ম্মাবলম্বী—নাছরানী হইয়াছিলেন, তিনি সেই ধর্ম্মের একজন বিশেষ সাধক ছিলেন এবং সেই ধর্ম্মের অনেক বিশেষজ্ঞের শিষ্যত্ব ও সাহচর্য্য তাঁহার লাভ ছিল। তাঁহার বয়স-মাত্রা ছিল অসাধারণ। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মদিনায় আসার পর ঈমান আনিয়াছিলেন এবং ৩৬ হিজরী সনে ওফাত পাইয়াছিলেন, অথচ মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল ২৫০ বা ৩৫০ বৎসর। কাহারও মতে তিনি হযরত ঈসার এক শিষ্যের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। (হাশিয়া বোখারী ৫৬২)

হযরতের পবিত্র নছব বা বংশ পরিচয় (৫৪৩ পৃঃ)

মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) (১) পিতা আবদুল্লাহ্, (২) পিতা আবদুল-মোত্তালেব, (৩) পিতা হাশেম, (৪) পিতা আব্‌দে-মনাফ, (৫) পিতা কুছাই, (৬) পিতা কেলাব, (৭) পিতা মোর্‌রাহ, (৮) পিতা কায়া'ব, (৯) পিতা লুআই, (১০) পিতা গালেব, (১১) পিতা ফেহ্‌র, (১২) পিতা মালেক, (১৩) পিতা নজর, (১৪) পিতা কেনানাহ্, (১৫) পিতা খোযায়মাহ্, (১৬) পিতা মোদ্‌রেকাহ্, (১৭) পিতা ইল্‌য়াছ, (১৮) পিতা মোজার, (১৯) পিতা নেযার, (২০) পিতা মায়া'দ্দ, (২১) পিতা আ'দ্‌নান।

বোখারী (রঃ) এই ২১ পোশ্‌তই উল্লেখ করিয়াছেন। এই ২১টি পোশ্‌ত এবং ইহাদের নামগুলি সম্পর্কে মতভেদ নাই। ইবনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) স্বীয় বংশ বর্ণনায় উক্ত ২১ পোশ্‌তই উল্লেখ করিতেন। (ফতহুলবারী ৭ × ১৩০)

উল্লেখিত "ফেহ্‌র" নামীয় ব্যক্তির উপনাম ছিল "কোরায়েশ" এবং তিনি কোরায়েশ নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার হইতেই তাঁহার বংশধরগণ কোরায়েশ আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। অভিধান মতে "কোরায়েশ" এক প্রকার সামুদ্রিক প্রাণীর নাম; সেই প্রাণীটি অতিশয় শক্তিশালী, সমস্ত সামুদ্রিক প্রাণীর রাজা। ঐ শ্রেণীর প্রশংসনীয় গুণ সূত্রেই ফেহ্‌রের এই উপনাম অবলম্বিত হইয়াছিল।

হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বংশ-তালিকার তিনটি অংশ—(১) আগার অংশ; মোহাম্মদ (দঃ) হইতে "আদনান" পর্য্যন্ত (২) গোড়ার অংশ; ইসমাঈল (আঃ) হইতে আদম (আঃ) পর্য্যন্ত (৩) মধ্যভাগের অংশ; "আদনান" হইতে ইসমাঈল (আঃ) পর্য্যন্ত। প্রথম অংশটি একুশ পোশ্‌তের—সর্ব্বসম্মত ও অকাট্যরূপে কোন প্রকার বিভিন্নতা ব্যতিরেকে প্রমাণিত রহিয়াছে যাহা ইমাম বোখারীর বর্ণনায়

উপরে উল্লেখ হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশটিও একুশ পোশ্‌তের ; উহাও প্রায় সর্ব্ব সম্মত, অবশ্য আদিমকালের নামগুলি ভাষান্তরে স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন আকার আকৃতি ধারণ করিয়াছে। হিব্রুভাষা হইতে যখন আরবীতে আসিয়াছে তখন নিশ্চয় কিছু বিকৃতি ঘটিয়াছে—যেমন, বাংলার "দ" অক্ষর সম্বলিত নাম ইংরাজীতে লেখা হইলে উহা "ড" হইয়া যাইবে। আরবী হইতে বাংলায় আসিলেও নিশ্চয় বিভিন্নতা সৃষ্টি হইবে ; কারণ, আরবী ভাষায় জের, জবর, পেশ দ্বারা শব্দের আকৃতি গঠিত হয়, বাংলা ভাষায় তাহা া, ি, ু দ্বারা হইয়া থাকে ; কিন্তু আরবী জের, জবর, পেশ ছাড়াই সাধারণতঃ লেখা হইয়া থাকে ; পাঠকের নিজ অভিজ্ঞতার দ্বারা উহা ব্যবহার করিতে হয়। পক্ষান্তরে বাংলা শব্দ া, ি, ু ছাড়া লেখা যায় না, এতদ্ভিন্ন আরবীতে "জবর" স্থান বিশেষে "অ" এবং স্থান বিশেষে "আ" এবং "জের" "ি" ও "ে" লেখা হয়—ইত্যাদি। এই সব কারণে ঐ আদিমকালের নামগুলির আবৃত্তি এবং ভাষান্তরে নানা আকারে বিভিন্নতা আসিয়াছে। নিম্নে উহার বর্ণনা দেওয়া হইল—

(১) ইসমাঈল (আঃ) (২) ইব্রাহীম (আঃ) (৩) তারেখ—অনেকে "তারেহ" লিখিয়াছেন এবং অনেকের মতে তাহারই আর এক নাম "আযর" (৪) নাহূর (৫) সরুগ—এই নামের উচ্চারণে বিভিন্ন মত রহিয়াছে ; সারূ, শারুগ, আশরাগ, শারুখ, সরূহ। (৬) রাউ (৭) ফালখ—কাহারও মতে ফালজ বা ফালগ। (৮) আইবার—কাহারও মতে আবর বা গাবর। (৯) শালাখ—কাহারও মতে শালাহ। (১০) আরফাখশাজ—কাহারও মতে আরফাখশাদ। (১১) সাম—পুত্র-নূহ (আঃ)। (১২) নূহ (আঃ) (১৩) লমক—কাহারও মতে লামক। (১৪) মাত্তুশালাখ (১৫) আখ্‌নুখ—তিনিই নবী ইদ্রিস (আঃ)। (১৬) ইয়ার্দ (১৭) মাহলায়েল (১৮) ক্বাইনাল—কাহারও মতে ক্বায়েন। (১৯) ইয়ানেশ—কাহারও মতে আনূশ। (২০) শীছ (আঃ) (২১) আদম (আঃ)।

মধ্য অংশ তথা ইসমাঈল (আঃ) ও "আদনান"-এর মধ্যবর্ত্তী অংশে বিরাট মতভেদ এবং ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় অসাঞ্জস্য বিভিন্নতা রহিয়াছে। নামের বিভিন্নতা ত আছেই সংখ্যার মতভেদও আশ্চার্য্যজনক। অনেকের মতে এই অংশের সংখ্যা মাত্র ৭ বা ৮ জনের ; আর কাহারও মতে সংখ্যা আরও অনেক বেশী। সীরত রচনায় ইতিহাস মন্থনকারী বিশিষ্ট লিখক মরহুম শিবলী-নোমানী তাঁহার "সীরতুন-নবী" গ্রন্থে সর্ব্বোচ্চ ৪০ সংখ্যার খোঁজ দিয়াছেন। আমরাও বিশেষ ইতিহাস গ্রন্থ "তারীখে-তবরী" এর মধ্যে ৪০ সংখ্যার মতের উদ্ধৃতি দেখিয়াছি। ৪০ সংখ্যার অধিক সম্পর্কেও কোন মতামত আছে বলিয়া আমরা খোঁজ পাই নাই। বাংলা ভাষায় বিশ্বনবীর জীবনী রচকগণের একজন সুপ্রসিদ্ধ লিখক এই অংশে চল্লিশের সংখ্যাও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন ; তিনি ৪৭ সংখ্যক নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

তিনি যেই বরাত দিয়াছেন তাহা যাচাই করা সম্ভব হয় নাই, তবে এই উদ্ধৃতির কোন স্থানে নিশ্চয় গরমিল হইয়াছে বলিয়া ধারণা।

এত দীর্ঘ মতবিরোধ লক্ষ্য করিয়াই অধিকাংশ সীরত লিখকগণ হযরতের বংশ তালিকা বর্ণনায় "আদনান" পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইয়াছেন ; সতর্কতায় ইহাই উত্তম।

নবীজীর জীবনী রচনায় বিশেষ গ্রন্থ "সীরতে-ইবনে হেশাম"—ইহার মূল গ্রন্থ আমাদের নিকট রহিয়াছে। এই গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়ে ৮ সংখ্যক নামই উল্লেখ হইয়াছে। "সীরতুন-নবী" লিখক ইহার বিরোধিতা করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদের নিকট এই সংখ্যাই বিশেষ যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কারণ, বিভিন্ন ইতিহাসবিদগণের সিদ্ধান্তে ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, হযরত আদম আলাইহেচ্ছালামের দুনিয়ায় আগমন হইতে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) পর্য্যন্ত সর্ব্বমোট সময়কাল ছয় হাজার বৎসরের ঊর্দ্ধে এবং ইসমাঈল আলাইহেচ্ছালামের পিতা ইব্রাহীম (আঃ) উক্ত সময়ের মাঝামাঝিকালে অবস্থিত। কারণ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হইতে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) পর্য্যন্ত তিন হাজার বৎসরের সামান্য উপরে, আর আদম আলাইহেচ্ছালামের দুনিয়ায় অবতরণ হইতে ইব্রাহীম (আঃ) পর্য্যন্তও তিন হাজার বৎসরের উপরে।

দ্বিতীয় তিন হাজার বৎসরে তথা আদম (আঃ) হইতে ইব্রাহীম (আঃ) পর্য্যন্ত মাধ্যম হইলেন ২০ জন।

প্রথম তিন হাজারে "আদনান" পর্য্যন্ত ত মাধ্যমের সংখ্যা ২১ জন আছেনই। তদুপরি আদনান হইতে ইসমাইল (আঃ) পর্য্যন্ত ৪০ বা ৪৭ জন হইলে এই তিন হাজার বৎসরে মাধ্যমের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬১ বা ৬৮ ; এই সংখ্যার অসামঞ্জস্যতা ২০ সংখ্যার সহিত অনেক বেশী। পক্ষান্তরে "আদনান" হইতে ইসমাঈল (আঃ) পর্য্যন্ত মাধ্যম সংখ্যা ৮ হইলে প্রথম তিন হাজার বৎসরে সর্ব্বমোট মাধ্যম সংখ্যা ২৯ হয় যাহা ২০ সংখ্যার নিকটবর্ত্তী। দুনিয়ার প্রথম দিকে এবং শেষ দিকে মানুষের বয়সের যে বেশকম আছে সে অনুপাতে এইরূপ নিকবর্ত্তীর ব্যবধানই যথেষ্ট মনে হয় ; ৬১ × ৬৮-এর সংখ্যার সহিত ২০ সংখ্যার যে অধিক ব্যবধান তাহা অসঙ্গত মনে হয়।

হযরতের রক্ত ধারায় আব্‌দিয়ত ঃ

মানুষ আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি ; সৃষ্টির সর্বোপরি মহত্ব হইল সৃষ্টিকর্ত্তার দাসত্বে আত্ম-নিবেদন—নিজকে উৎসর্গকরণ। মানুষ জ্ঞান-বিবেকসম্পন্ন সৃষ্টি ; তাহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা পরীক্ষার পাত্র বানাইয়াছেন, তাই তাহাকে সায়ত্বশাসিত ক্ষমতার অংশও দিয়াছেন ; দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ বা স্বেচ্ছাচারী—উভয় শ্রেণীর পথই তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত। মানুষ জ্ঞান-বিবেক খাটাইয়া স্বেচ্ছাচারিতা পরিহার পূর্ব্বক সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার দাসত্বে আবদ্ধ জীবন-যাপন করুক ; মানুষের প্রতি আল্লাহ তায়ালার আদেশ ও দাবী (Demand) ইহাই। পবিত্র কোরআনে আছে—

مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْن

"মানুষকে আমি সৃষ্টিই করিয়াছি আমার দাসত্বের জন্য—তাহাদের হইতে আমার একমাত্র দাবী (Demand) ইহাই।" এই দাসত্বের চরম পর্য্যায়কে "আব্‌দিয়ত" বলা হয়। অতএব, আব্‌দিয়তের অর্থ হইল সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার দাসত্বে আত্মনিবেদন ও নিজকে উৎসর্গ করণের চরমোৎকর্ষ। সুতরাং এই আব্‌দিয়তই হইল মানুষের মূল উন্নতির সোপান, আব্‌দিয়তহীন মানুষের জীবন ব্যর্থ; সে সৃষ্টিকর্ত্তার দাবী (Demand) আদায়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। পক্ষান্তরে এই আব্‌দিয়তের পরিমাণেই আল্লার নিকট মানুষের মর্ত্তবা ও নৈকট্য লাভ হইয়া থাকে।

হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মধ্যে এই আব্‌দিয়তের চরম পর্য্যায় বিদ্যমান ছিল। হযরতের সর্ব্বাধিক বৈশিষ্ট্য ছিল এই আব্‌দিয়ত; হযরত (দঃ) তাঁহার জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আব্‌দিয়তকে আঁকড়িয়া থাকিতেন, হযরত (দঃ) তাঁহার প্রতিটি কার্য্যে আব্‌দিয়তের বিকাশ ভালবাসিতেন।

হাদীছ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, হে আয়েশা। আমি ইচ্ছা করিলে পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আমার জন্য লাভ করিতে পারিতাম। আমার নিকট এক (বিরাটকায়) ফেরেশতা আসিয়াছিলেন যাঁহার কোমর কা'বা গৃহের ছাদ সমান। তিনি আসিয়া বলিলেন, আপনার প্রভু-পরওয়ারদেগার আপনার নিকট সালাম পাঠাইয়াছেন এবং আপনাকে এই বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়াছেন যে, আপনি ইচ্ছা করিলে পূর্ণ আব্‌দিয়ত সম্বলিত নবী থাকিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে রাজ্যাধিপতি নবী হইতে পারেন। ঐ সময় জিব্রাঈল (আঃ) তথায় উপস্থিত ছিলেন; রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (সৃষ্টিগতভাবেই এই পরিমাণ আব্‌দিয়তধারী ছিলেন যে, উক্ত বিষয়ের নির্বাচনও নিজ ইচ্ছায় করিলেন না—উহার জন্যও তিনি প্রভুর দূত) জিব্রাঈলের প্রতি পরামর্শ চাওয়ার দৃষ্টিতে তাকাইলেন। জিব্রাঈল (আঃ) ইশারায় পরামর্শ দিলেন যে, আপনি বিনয়, আত্মবিলীনতা অবলম্বন করুন। সে মতে হযরত নবীজী (দঃ) ঐ ফেরেশতার কথার উত্তরে বলিলেন, আব্‌দিয়ত সম্বলিত নবী থাকিব।

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এই ঘটনার পর হইতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হেলান দেওয়া বা নিতম্বে ভর করা অবস্থায় বসিয়া খানা খাইতেন না। (নিতম্ব ভূমি হইতে উচ্চ—শুধু পদদ্বয়ের ভরে বসিয়া খানা খাইতেন; এবং) বলিতেন, আমি ঐরূপেই খাইতে বসিব যেরূপে গোলাম—দাস খাইতে বসে। সাধারণ বসায়ও ঐরূপ (বিনয়ী আকারে) বসিব যেরূপ গোলাম বা দাস বসিয়া থাকে। (মেশকাত শরীফ, ৫২১)

আব্‌দিয়তের এই চরম উৎকর্ষ হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে ত ছিলই ; উহার আরও অধিক উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে হযরতের পুর্বপুরুষের বিশেষ রক্তধারা। আব্‌দিয়ত তথা আল্লার জন্য উৎসর্গীত হওয়ার যে চরম ও পরমতর পর্য্যায় আছে—আল্লার জন্য নিজকে বলিদান বা কোরবাণী করা—উহা বিশ্ব ইতিহাসে দুইজন লোকের জীবনীতেই দেখা যায়। সেই উভয়জন হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উর্দ্ধতন পুরুষ। হযরত (দঃ) নিজেই বয়ান করিয়াছেন, انا ابن الذبيحين "আল্লার জন্য নিজকে বলিদান বা কোরবাণকারী ব্যক্তিদ্বয়ের পুত্র আমি"।

উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের একজন ছিলেন হযরতের উর্দ্ধতন পিতা ইসমাইল (আঃ)।* তাঁহার ইতিহাস সুপ্রসিদ্ধ ; পবিত্র কোরআনেও বর্ণিত রহিয়াছে (চতুর্থ খণ্ড হযরত ইব্রাহীমের বয়ান দ্রষ্টব্য)। অপরজন হইলেন হযরতের জন্মদাতা পিতা আবদুল্লাহ।

হযরতের পিতা আবদুল্লার কোরবাণী হওয়া ঃ

হযরতের দাদা—আবদুল্লার পিতা আবদুল মোত্তালেব একটি সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইসমাঈল আলাইহেচ্ছালামের বিশেষ স্মৃতি বরকত ও মঙ্গল ভাণ্ডার যমযম-কূপ বহু দিন হইতে মাটির নীচে লুপ্ত হইয়া রহিয়া ছিল ; আবদুল মোত্তালেবের হাতে উহার বিকাশ হইয়া ছিল।

---

* হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ তায়ালার আদেশ মতে যেই পুত্রকে কোরবাণী করিতে গিয়াছিলেন সেই পুত্র ইসমাঈল (আঃ)ই বটে ; ইস্‌হাক (আঃ) নহে। এই বিষয়ের একটি সহজ প্রমাণ এই যে, ইস্‌হাক আলাইহেচ্ছালামের জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী যখন ফেরেশতা মারফত আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহীম (আঃ)কে পৌছাইয়াছিলেন তখন ইহাও বলা হইয়াছিল যে, "ইস্‌হাক হইতে সুদীর্ঘ বংশ চলিবে। তৌরাতেও আছে—"খোদা ইব্রাহীমকে বলিলেন, তোমার বিবি ছারা একটি ছেলে জন্ম দিবে ; তুমি তাহার নাম ইস্‌হাক রাখিবে ; আমি তাহার হইতে সুদীর্ঘ বংশ চালাইব" (সীরতুন-নবী ১,১০২)। পবিত্র কোরআনেও এই শ্রেণীর বর্ণনা রহিয়াছে। যথা—"ফেরেশতাগণ ইব্রাহীম (আঃ)কে সুসংবাদ দিলেন ইস্‌হাক (আঃ)এর জন্ম লাভ করার এবং ইস্‌হাকের উত্তরাধিকারী হইবেন ইয়া'কুব (আঃ) সেই সংবাদও ফেরেশতাগণ দিলেন।" সুতরাং যখন ইস্‌হাকের জন্মের পূর্ব্ব হইতে আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা ছিল যে, ইস্‌হাকের বংশ ও উত্তরাধিকারী চলিবে—যাহার অর্থ ছিল যে, ইস্‌হাক জীবিত থাকিবেন তখন সেই আল্লার তরফ হইতেই ইস্‌হাককে কোরবাণী করার আদেশ হইতে পারে না।

তৌরাত-ইঞ্জিল কেতাব ত ইহাদের বাহক নবীগণের পরে বিকৃত হইয়া গিয়াছে ; ইহুদ-নাছারাগণ ঐ কেতাবদ্বয়কে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহুদীরা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বংশকে আল্লার নামে কোরবাণ হওয়ার বৈশিষ্ট্য হইতে বঞ্চিত করার জন্য তৌরাত কেতাবে এই প্রসঙ্গটি বিকৃত করিয়া লিখিয়াছে যে, ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার যেই পুত্রকে কোরবাণী করিতে গিয়াছিলেন তিনি ইস্‌হাক (আঃ)। ইহা তাহাদের জঘন্য মিথ্যা অপবাদ সমূহের একটি অন্যতম মিথ্যা।

যমযম কূপ বিলুপ্ত ও নিখোঁজ হওয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই যে—মক্কা নগরীর আদি অধিবাসী ছিল "জুরহুম গোত্র"—যাহারা হযরত ইসমাঈল (আঃ) ও তাঁহার মাতা বিবি হাজেরার সময়েই মক্কা এলাকায় বসবাস অবলম্বন করিয়া ছিল; তাহাদের মধ্যেই ইসমাঈল (আঃ) বিবাহ করিয়াছিলেন। মক্কা নগীর কর্তৃত্ব এই গোত্রের হাতেই ন্যাস্ত ছিল; তাহাদের আমল-আখলাক বিনষ্ট হইলে পর আল্লাহ তায়ালার শাস্তি স্বরূপ তাহাদিগকে তথা হইতে বিতারণকারী এক পরাক্রমশালী শত্রুর আক্রমণ তাহাদের উপর আসিল। তখন তাহাদের মধ্যে "আম্‌র-ইবনুল-হার্‌ছ-ইবনুল-মেজমাম" নামক ব্যক্তি তাহাদের সর্দার ছিল। শত্রুর আক্রমণে তাহারা পলায়নে বাধ্য হইলে তাহাদের সর্দার আমর-ইবনুল-হার্‌ছ তাহার বিশেষ বিশেষ ধন-রত্ন এবং অস্ত্রশস্ত্র যমযম কূপের মধ্যে ফেলিয়া কূপকে ভরাট করতঃ এমনভাবে বন্ধ করিয়া দিল যেন উহার কোন নিদর্শনও দেখা না যায়—এইভাবে ঐ কূপ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। (যোরকানী, ১—৯২)

পুরাতন ইতিহাসরূপে হয়ত উহার চর্চ্চা ছিল, কিন্তু উহার কোন নিদর্শন ছিল না। খাজা আবদুল মোত্তালেব স্বপ্নে যমযম-কূপকে আবিষ্কার করার জন্য আদিষ্ট হইলেন; কিন্তু সঠিক কোন নিদর্শন তাঁহার জানা ছিল না, তাই আদেশ কার্য্যকরি করিতে পারিতে ছিলেন না। স্বপ্ন পুনঃ পুনঃ দেখিতে ছিলেন; শেষবার স্বপ্নে নিদর্শনও পাইলেন যে, প্রভাতে এক স্থানে পীপিলিকার বাসা দেখিতে পাইবে এবং দেখিবে, কাক ঠোঁট দ্বারা মাটি খুঁড়িতেছে। আবদুল মোত্তালেবের তখন একটি মাত্র পুত্র ছিল—হারেস। ভোর বেলা আবদুল মোত্তালেব হারেসকে সঙ্গে লইয়া কা'বা ঘর এলাকায় আসিয়া ঐ নিদর্শন—পীপিলিকার বাসা এবং কাকের মাটি খোঁড়া দেখিতে পাইলেন; ঐ জায়গাটিতে মক্কাবাসীরা সেই আমলে তাহাদের দেব-দেবীর নামে জীব বলিদান করিত। আবদুল মোত্তালেব হারেসকে লইয়া ঐ স্থান খনন আরম্ভ করিলেন। কোরায়েশের লোকেরা তাঁহাকে বাধা দিল; শেষ পর্য্যন্ত হারেসকে বাধার মোকাবিলায় দাঁড় করিয়া মাটি খনন আরম্ভ করিলেন। অল্প কিছু খননের পরই কূপের বেড় বাহির হইল; আবদুল মোত্তালেব আনন্দে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়া উঠিলেন। পূর্ণরূপে কূপ আবিষ্কারের পরে উহাতে তৈরী দুইটি স্বর্ণ-হরিণ এবং কতিপয় তরবারি ও লৌহবর্ম্ম পাওয়া গেল, উক্ত এলাকার আদি নিবাসী জুরহুম গোত্র ঐসব জিনিস তথায় রাখিয়া ছিল। এই সব মালামালের ব্যাপারেও কোরেশের লোকজনের সহিত আবদুল মোত্তালেবের কলহ বাঁধিল। তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী আবদুল মোত্তালেব ঐ সব মালামাল সম্পর্কে তাঁহার নিজের ও কোরেশ লোকজনের এবং কাবা গৃহের নামের ভিন্ন ভিন্ন লটারি করার প্রস্তাব দিলেন। সকলে তাহাতে সম্মত হইয়া লটারি করিল; তখন আবদুল

মোত্তালেব আল্লাহ তায়ালার নিকট আরাধনা করিতে ছিলেন। লটারিতে স্বর্ণ-হরিণদ্বয় কা'বা গৃহের নামে উঠিল এবং অস্ত্রসমূহ আবদুল মোত্তালেবের নামে আসিল; কোরেশগণ ফাঁকা গেল। দ্বিতীয় খণ্ড ৮৩০ নং হাদীছে যে কা'বা শরীফের পোতায় প্রোথিত স্বর্ণ-রৌপ্যের উল্লেখ আছে সেই ধন-রত্নের মধ্যে উক্ত স্বর্ণ-হরিণদ্বয়ও রহিয়াছে। তারপর যমযম কূপের স্বত্বাধিকার নিয়াও আবদুল মোত্তালেবের সহিত কোরেশদের বিরোধ দেখা দিল; উহার মীমাংসার জন্য উভয় পক্ষ এক গণকঠাকুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। পথিমধ্যে পানির অভাবে পিপাসায় তাহাদের সকলের মৃত্যু আসন্ন হইয়া পড়িল। তাহারা মৃত্যু-প্রহরের অপেক্ষায় এক স্থানে জড় হইয়া পতিত ছিল; আবদুল মোত্তালেব সকলকে বলিলেন, হাতপা গুটাইয়া মৃত্যু বরণ করা কাপুরুষের লক্ষণ; শক্তিবিন্দু থাকা পর্য্যন্ত পানির তালাশে বাহির হওয়া কর্ত্তব্য; আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে কোথাও পানির খোঁজ দিতে পারেন। সেমতে সকলেই তথা হইতে পানির তালাশে যাত্রা করায় তৎপর হইল। আবদুল মোত্তালেবও স্বীয় বাহনের উপর আরোহণ করিলেন; তাঁহার উটটি তাঁহাকে লইয়া দাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে উহার পায়ের নীচ হইতে পানি উথলিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। আবদুল মোত্তালেব আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়া উঠিলেন; সকলে ছুটাছুটি করিয়া আসিয়া পানি পান করিল এবং সকলে অনিবার্য্য মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইল। এই ঘটনায় কোরেশের লোকজন আবদুল মোত্তালেবের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হইয়া পড়িল এবং সকলে এক বাক্যে বলিল, হে আবদুল মোত্তালেব আপনার সহিত আমাদের আর কোন বিরোধ নাই, যেই মহান আপনাকে এই মরুভূমিতে পানি দান করিয়াছেন তিনিই আপনাকে যমযম কূপও দান করিয়াছেন; উহার উপর একমাত্র আপনারই অধিকার থাকিবে। সেমতে হাজিদিগকে যমযম কূপের পানি পান করাইবার সেবা আবদুল মোত্তালেবের ভাগ্যেই থাকিল এবং এই সৌভাগ্য পরম্পরা তাঁহার বংশেই নির্দ্ধারিত থাকিল (দ্বিতীয় খণ্ড ৮৫৩ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)। এই সব ঘটনা ঘটিবার সময় আবদুল মোত্তালেব একটি মাত্র পুত্রের পিতা ছিলেন; তিনি কোরেশদের বিগত বিরোধে যে ব্যথা পাইয়াছিলেন তাহা তিনি ভুলিতে পারিলেন না; তাঁহার আকাঙ্খা জন্মিল অধিক পুত্র লাভের; যাহাতে তিনি কোরেশদের বিরোধ ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হইতে পারেন। সেমতে তিনি আল্লার দরবারে প্রার্থনা ও প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমার দশটি পুত্র লাভ হইলে এবং তাহারা সকলে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তন্মধ্যে একটি পুত্র আমি আল্লার নামে কোরবাণী করিব।

আল্লাহ তায়ালার কুদরত—আবদুল মোত্তালেব একে একে দশটি পুত্র লাভ করিলেন; সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র হইলেন আবদুল্লাহ—যিনি মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আল.ইহে অসাল্লামের ভাবী পিতা। আবদুল মোত্তালেবের পুত্রদের মধ্যে সর্ব্বাধিক

আদরের ও সোহাগের পুত্র ছিলেন আবদুল্লাহ; তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তির উপরই আবদুল মোত্তালেবের মান্নত বা প্রতিজ্ঞা পূরণ করা জরুরী হইয়া পড়িল। সেমতে এক দিন আবদুল মোত্তালেব সকল পুত্রদেরকে ডাকিয়া তাহাদিগকে স্বীয় মান্নতের মর্ম্ম জ্ঞাত করিলেন এবং কোরবাণীর জন্য একজনকে নির্দ্ধারিত করা উদ্দেশ্যে লটারি করিলেন। অদৃষ্টের পরিহাস—লটারিতে কোরবাণীর জন্য আবদুল্লার নাম উঠিল। পিতা-পুত্র উভয়ে মান্নত পূরণে প্রস্তুত হইলেন, এবং আবদুল মোত্তালেব এক হাতে ছুরি, অপর হাতে আবদুল্লাহকে লইয়া কোরবাণীর স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কোরেশের লোকজন বিশেষতঃ আবদুল্লার মাতুল আবদুল মোত্তালেবকে বাধা দিয়া বলিলেন, এই ব্যাপারে সর্ব্বশেষ প্রচেষ্টায় বাধ্য না হইয়া এই কার্য্য আমরা সম্পন্ন করিতে দিব না।

সেই কালে মদিনায় একজন বিশিষ্ট ঠাকুরণী ছিল; সাব্যস্ত করা হইল সেই ঠাকুরণীর নিকট হইতে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে। আবদুল মোত্তালেব কতিপয় লোক সহ সেই ঠাকুরণীর নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদয় ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। ঠাকুরণী ঘটনা শ্রবনান্তে বলিয়া দিল, অদ্য তোমরা চলিয়া যাও; পরে পুনরায় সাক্ষাৎ করিও। আবদুল মোত্তালেব ঠাকুরণীর নিকট হইতে আসিয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন এবং পরদিন পুনরায় ঠাকুরণীর নিকট উপস্থিত হইলেন। অদ্য ঠাকুরণী তাহাদিগকে এই বিষয়ের ফয়ছালাহ এই শুনাইল যে, তৎকালের প্রথমানুযায়ী একজন মানুষের জীবন-বিনিময় দশটি উট ছিল; অতএব দশটি উট এবং আবদুল্লাহ উভয়ের মধ্যে লটারি করিবে; যদি উট দলের দিকে কোরবাণী করা সাব্যস্ত হইয়া যায় তবে আবদুল্লার বদলে উট দশটি কোরবাণী করিবে, আর যদি এই লটারিতেও কোরবাণীর জন্য আবদুল্লার নাম উঠে তবে ঐ উটের সহিত আরও দশটি উট যোগ করিয়া—বিশটি উট ও আবদুল্লার মধ্যে পুনঃ লটারি করিবে। এইরূপে যাবৎ কোরবাণীর জন্য লটারিতে উটের নাম না আসিবে প্রতিবার দশটি করিয়া উট যোগ করতঃ লটারি করিতে থাকিবে—যত সংখ্যার উপর যাইয়া লটারিতে উট কোরবাণীর নাম আসিবে সেই সংখ্যক উট কোরবাণী করিয়া দিলে আবদুল্লাহ কোরবাণী হইতে রেহায়ী পাইয়া যাইবে।

আবদুল মোত্তালেব এই ফয়ছালাহ লইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং ঐরূপে লটারির ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। নয় বার পর্য্যন্ত লটারিতে আবদুল্লার নামই আসিতে লাগিল; পুনরায় দশ উট বর্দ্ধিত করিলে উটের সংখ্যা একশত পূর্ণ হইল এবং দশম বার লটারি দেওয়া হইল; এইবার উটের নামে লটারি আসিল। কোরেশের লোকজন সকলেই আনন্দিত হইল এবং বলিল, হে আবদুল মোত্তালেব ধন্য হও; পরওয়ারদেগারকে সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টা তোমার পক্ষে সফল হইয়াছে।

আবদুল মোত্তালেব বলিলেন, আমি আশ্বস্ত হইব না যাবৎ একশত উট ও আবদুল্লার মধ্যে তিনবার লটারি না দেখি। এই বলিয়া আবদুল মোত্তালেব আল্লার দরবারে আরাধনা করিতে লাগিলেন এবং লোকেরা দ্বিতীয়বার লটারি করিল; এইবারও কোরবাণীর জন্য লটারিতে উটের নামই আসিল। তৃতীয়বার আবার ঐরূপে আবদুল মোত্তালেব আরাধনায় লিপ্ত হইলেন এবং এইবারও লটারি উটের নামেই আসিল। আবদুল মোত্তালেব সন্তুষ্টচিত্তে একশত উট কোরবাণী করিয়া উহার সম্পূর্ণই লোকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন।* (সীরতে ইবনে হেশাম ১৪৩—১৫৫)

এইভাবে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভাবী পিতা খাজা আবদুল্লাহ কোরবাণী হওয়ার হাত হইতে রক্ষা পাইলেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)—পিতা-পুত্র উভয়ে আল্লাহ তায়ালার নামে কোরবাণী হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া যাওয়ায় আল্লার বিশেষ কুদরতে কোরবাণী হওয়া হইতে রেহায়ী পাইয়াও আব্‌দিয়ত তথা আল্লার জন্য উৎসর্গ হওয়ার পূর্ণ মর্যাদার ভাগী হইয়াছিলেন যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে। তদ্রূপ আবদুল মোত্তালেব ও আবদুল্লাহ উভয় পিতা-পুত্র আল্লার নামে কোরবাণীর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া যাওয়ায় কোরবাণী হইতে রেহায়ী পাইয়াও আব্‌দিয়াত তথা আল্লার জন্য উৎসর্গের বিকাশ সাধনে পূর্ণ সফলকাম হইয়াছিলেন। সেই আব্‌দিয়াতের রক্তধারাই হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মধ্যে আসিয়াছিল যাহার ইঙ্গিত দানে হযরত (দঃ) বলিয়াছেন—

انا ابن الذبيحين অর্থাৎ আমার পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে দুইজন এরূপ ছিলেন যাঁহারা আল্লার জন্য কোরবাণী বা উৎসর্গকৃত হইয়াছিলেন; তাঁহাদের রক্তধারা আমার মধ্যে প্রবাহমান।

হযরতের বংশের সম্পর্ক মদিনার সহিত ঃ

আল্লাহ তায়ালার শান—হযরত মোহাম্মদ (দঃ) মক্কায় জন্ম গ্রহণ করিবেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের উল্লেখযোগ্য কাল কাটিবে মদিনায়, এমনকি শেষ শয়নও মদিনায়ই হইবে; সুতরাং পূর্ব হইতেই মদিনার সহিত তাঁহার সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন অতি বাঞ্ছনীয়। সেমতে কুদরতে-এলাহী উহার ব্যবস্থা করিয়াছিল।

* উক্ত ঘটনার পর হইতে মানুষের জীবন বিনিময়ে একশত উট প্রদানের প্রচলন হইয়া পড়ে। এমনকি ইসলামী শরীয়তের বিধানেও যে ক্ষেত্রে "কেছাছ" তথা খুনের বদলা খুন হয়না—যেমন, অনিচ্ছাকৃত খুন কিম্বা খুনের বিনিময়ে খুনের পরিবর্ত্তে বাদী পক্ষ যদি জীবন বিনিময় গ্রহণে সম্মত হয় তবে সেক্ষেত্রে একশত উট দেওয়ার বিধান রহিয়াছে। ফেকাহ শাস্ত্রে ইহাকেই "দিয়্যাত" বলা হয়।

হযরতের পিতামহ তথা দাদা আবদুল মোত্তালেবের পিতা হাশেম—যিনি হযরতের গোত্রশাখা বনুহাশেমের মূল, তিনি মদিনার এক সম্ভ্রান্ত গোত্র বনুনাজ্জার বংশের "সালমা" নাম্নী এক মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। হযরতের পিতামহ হাশেম কোন প্রয়োজনে মদিনায় আসিয়াছিলেন এবং এই বিবাহ করিয়া অনেক দিন তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। হযরতে দাদা আবদুল মোত্তালেব এই সালমার গর্ভেই জন্ম লাভ করেন। তাঁহার জন্মের পর হাশেম মক্কায় চলিয়া আসেন, কিন্তু শিশু আবদুল মোত্তালেব মদিনায়ই মাতার নিকট থাকিয়া যান। আবদুল মোত্তালেব মদিনায় বয়োঃপ্রাপ্ত হইলেন, ইতিমধ্যে হাশেম মারা গেলেন। তাঁহার ভ্রাতা মোত্তালেব ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিবার জন্য মদিনায় আসিলেন; সালমা পুত্রকে দিতে রাজি হইতেছিল না, পুত্রও মাতার অনুমতি ছাড়া যাইতে রাজি নয়। মোত্তালেব প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্রকে না লইয়া বাড়ী ফিরিব না। অবশেষে মোত্তালেব তাঁহার চেষ্টায় সফল হইলেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে লইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মক্কার লোকেরা হাশেমের এই পুত্রকে কেহ কোন সময় দেখে নাই, তাই প্রথমে তাহারা ছেলেটিকে মোত্তালেবের সহিত দেখিয়া ভাবিল, ছেলেটি মোত্তালেবের দাস—সেই মর্ম্মে ছেলেটিকে "আবদুল মোত্তালেব—মোত্তালেবের দাস" আখ্যায়িত করিল। মোত্তালেব লোকদিগকে প্রকৃত খবর জানাইয়া বলিলেন, ছেলেটি আমার ভ্রাতা হাশেমের পুত্র—তাহার নাম "শায়বাহ" কিন্তু "আবদুল মোত্তালেব" আখ্যা আর মুছিল না।

হাশেমের এই সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই মদিনাবাসীগণ মক্কায় কোরেশ বংশীয় বনু-হাশেমকে ভাগিনার গোষ্ঠি গণ্য করিয়া থাকিত তৃতীয় খণ্ড ১৪৩১নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।

হযরতের শাখাগোত্র বনুহাশেমের বৈশিষ্ট :

কোরায়েশ বংশ সমগ্র আরবের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোত্র পরিগণিত ছিল। কা'বা শরীফের উপর তাঁহাদেরই কর্ত্তৃত্ব ছিল, হাজীদের সর্ব্বপ্রকার সেবা বিশেষতঃ তাঁহাদের পানির যোগার তাঁহারাই করিতেন। আবদে-মনাফের পরে এই সব বৈশিষ্ট্য হাশেমের উপর ন্যস্ত হয়। হাশেম দানশীল ছিলেন; তিনি হাজীদিগকে রুটিও খাওয়াইয়া থাকিতেন। এমনকি এক বৎসর কোরেশদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল; কাহারও সাহায্য পাওয়ার আশা ছিল না; হাশেম তাঁহার সমূদয় সম্পত্তি ব্যয় করিয়া হাজীদের সেবার ব্যবস্থা একাই করিলেন। হাশেমের মৃত্যুর পর হাজীদের সেবার কাজ মোত্তালেব গ্রহণ করেন; তাঁহার মৃত্যুর পর হযরতের দাদা আবদুল মোত্তালেব হাজীদের পানির এবং সমুদয় সেবার ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেন, কোরেশদের উপর সর্ব্বপ্রকারের কর্ত্তৃত্ব এবং নেতৃত্বও তিনি লাভ করেন।

তাঁহার জাতির ভালবাসা ও শ্রদ্ধা লাভে তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে সক্ষম হন। এই জন্যই রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় আত্মমর্য্যাদা প্রকাশ ক্ষেত্রে আবদুল মোত্তালেবের সম্পর্ক উল্লেখ করিয়াছেন—তৃতীয় খণ্ড ১৩৭৫ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।

হযরতের মাতুল ঃ

হযরতের পিতা আবদুল্লার কোরবাণী হওয়ার ব্যাপার সম্পর্কীয় ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। খাজা আবদুল্লাহ কোরবাণী হইতে রেহায়ী পাইলে পর তাঁহার বিবাহের জন্য আবদুল মোত্তালেব প্রস্তুত হইলেন। আবদুল মোত্তালেব কোরেশদের প্রধান, সুখ্যাতির আধার; খাজা আবদুল্লাহও কোরবাণীর ঘটনায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন; তাঁহাকে কন্যা দেওয়ার জন্য কোরেশদের বিশিষ্ট বিশিষ্ট সকলেই প্রতিযোগী হইলেন।

কোরেশদের শাখাগোত্র বনু-যোহরা—ঐ সময় উহার সর্দার ছিলেন ওয়াহ্‌ব; তাঁহার এক কন্যা ছিল সৌভাগ্যশালীনী আমেনা। আবদুল মোত্তালেব স্বয়ং ওয়াহ্‌বের নিকট যাইয়া আবদুল্লার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। আমেনার সৌভাগ্যের চন্দ্রোদয় হইল; খাজা আবদুল্লার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। বিবি আমেনার পিতা ওয়াহ্‌বের বংশতালিকা এইঃ—ওয়াহ্‌ব, পিতা আবদে-মনাফ, পিতা যোহরা, পিতা—কেলাব। (সীরতে ইবনে হেশাম—১৫৬)

হযরতের বংশতালিকায় তাঁহার ষষ্ঠ উর্দ্ধতন পিতা ছিলেন "কেলাব"। অতএব হযরতের পিতা ও মাতা উভয়ের বংশধারাই কোরেশ বংশীয় "কেলাব" নামীয় পিতায় মিলিত ছিল।

ওয়াহ্‌বের পিতা আব্‌দে-মনাফ এবং হযরতের চতুর্থ উর্দ্ধতন পিতা আব্‌দে-মনাফ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। মাতার বংশের আব্‌দে-মনাফ হইলেন যোহরাপুত্র আব্‌দে-মনাফ, আর পিতার বংশের আব্‌দে-মনাফ ছিলেন উক্ত আব্‌দে-মনাফের পিতা যোহরার ভ্রাতা "কুছাই"-এর পুত্র। অর্থাৎ হযরতের ষষ্ঠ উর্দ্ধতন পিতা "কেলাব"—তাঁহার দুই পুত্র ছিল (১) কুছাই (২) যোহরা। "কুছাই"-এর এক পুত্রের নাম ছিল আব্‌দে-মনাফ; তাঁহার বংশধরই হযরতের পিতা আবদুল্লাহ। তদ্রূপ যোহরার এক পুত্রের নামও আব্‌দে-মনাফ ছিল তাঁহার বংশধরই হযরতের নানা ওয়াহ্‌ব। (সীরতে ইবনে হেশাম—১০৪)

হযরতের পিতৃবিয়োগ ঃ

মতভেদ থাকিলেও সাধারণতঃ ঐতিহাসিকগণের সাবাস্ত ইহাই যে, নবীজী (দঃ) মাতৃগর্ভে থাকাবস্থায় তাঁহার পিতা খাজা আবদুল্লার মৃত্যু হইয়াছিল। এই সম্পর্কে দুই রকম বর্ণনা পাওয়া যায়—(১) আবদুল্লাহ সিরিয়ার বাণিজ্য হইতে

প্রত্যাবর্ত্তনকালে মধ্যপথে অসুস্থ হইয়া তিনি স্বীয় পিতার মাতুলদেশ মদিনায় গিয়াছিলেন। সেই রোগেই তথায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল এবং তথায়ই তিনি সমাহিত হইয়াছিলেন। (২) মক্কায় খাদ্যের অভাব দেখা দেওয়ায় আবদুল মোত্তালেব স্বীয় মাতুলদেশ খেজুরের এলাকা মদিনায় খেজুরের জন্য খাজা আবদুল্লাহকে পাঠাইয়াছিলেন। তথায় তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সেই রোগশয্যায়ই তথায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। (তারীখে তবরী, ২—৮)

খাজা আবদুল্লার মৃত্যু তাঁহার ২৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়সের মধ্যে হইয়াছিল এবং নবী (দঃ) দুই মাস কালের মাতৃগর্ভে ছিলেন ; কাহারও মতে পিতার মৃত্যুকালে নবীজীর ভূমিষ্ঠ হওয়ার দুই মাস বাকী ছিল (যোরকানী, ১—১০৯)।

সত্যের প্রাধান্য দ্বারা হযরতের আবির্ভাবকে অভ্যর্থনা ঃ

ধরাপৃষ্ঠে হযরতের আগমন উপলক্ষে বহু ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়া ছিল, যাহা দৃষ্টে মনে হয় যেন খোদায়ী কুদরতের পক্ষ হইতে হক্ ও সত্যের বিকাশ এবং উহার প্রাধান্য হযরতের শুভাগমনকে অভ্যর্থনা করিতেছিল এবং সম্বর্দ্ধনা জানাইতে ছিল।

তন্মধ্যে আছ্হাবে-ফীল বা হাতীওয়ালা রাজা—আব্রাহার ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঘটনার উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে। ছুরা "ফীল" বা আলাম-তারার মধ্যে এই ঘটনার দিকেই বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

ইয়ামনের শাসনকর্ত্তা খৃষ্ঠান ধর্ম্মীয় আব্রাহা কা'বা শরীফের দিক হইতে লোকদের আকর্ষণ ফিরাইবার জন্য ইয়ামানের রাজধানী "সানা" শহরে অতি জাকজমকপূর্ণ একটি গির্জ্জা তৈরী করিয়াছিল। আরববাসী একজন লোকের দ্বারা উহা কদর্য্য বা ভস্মীভূত হইলে আব্রাহা আরবীয় কা'বা শরীফের উপর ক্ষেপিয়া উঠে এবং উহাকে ধ্বংস করার জন্য হস্তী সম্বলিত বাহিনী লইয়া মক্কার দিকে যাত্রা করে। পথিমধ্যে দুই স্থানে কা'বা শরীফের ভক্তগণ তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, কিন্তু তাহার বিরাট শক্তির মোকাবিলায় সকলেই পরাজিত হয়। আবরাহা তায়েফের পথে মক্কার অনতি দূরে "মোগাম্মেস" নামক স্থানে পৌঁছিয়া তথায় অবস্থান করিল। আবরাহা তথা হইতে তাহার একজন জেনারেলকে কিছু সংখ্যক সৈন্যসহ মক্কায় পাঠাইল; সেই জেনারেল মক্কায় আসিয়া ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া নিয়া গেল। মক্কার সর্দ্দার হযরতের পিতামহ আবদুল মোত্তালেবের দুই শত বা ততধিক উটও লুণ্ঠিত হইল। মক্কার লোকেরা বাধা দেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সেই পরিমাণ শক্তি মোটেই ছিল না।

অতঃপর আবরাহা দ্বিতীয় একজন লোক পাঠাইল এই কথা বলিয়া যে, তুমি মক্কায় যাইয়া উহার সর্দ্দারকে খোঁজ করিয়া বাহির করিবে এবং তাহাকে আমার

এই পয়গাম পৌঁছাইবে যে, আমি তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসি নাই ; আমি আসিয়াছি শুধু কা'বা গৃহকে ভাঙ্গিবার জন্য। তাহারা যদি আমাকে আমার এই কাজে বাধা না দেয় তবে তাহাদের মধ্যে রক্তারক্তির প্রয়োজন নাই এবং তাহারা যদি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না চায় তবে সেই সর্দ্দার যেন আমার সঙ্গে সাক্ষাত করিতে আসে।

আবরাহার দূত মক্কায় আসিয়া তৎকালীন তথাকার সর্দ্দার হযরতের পিতামহ আবদুল মোত্তালেবকে খুঁজিয়া বাহির করিল এবং তাঁহাকে আবরাহার পয়গাম পৌঁছাইল। আবদুল মোত্তালেব বলিলেন, আমরা আবরাহার সঙ্গে যুদ্ধ চাই না। আর কা'বা গৃহ আল্লার ঘর ; আল্লাহ যদি তাঁহার ঘর রক্ষা করেন করিবেন ; আর যদি তিনি আবরাহাকে সুযোগ দেন তবে তাহাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নাই। আবরাহার দূত বলিল, তবে আপনি আমার সঙ্গে চলুন ; তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাতের জন্য আমাকে বলিয়াছেন।

আবরাহার সহিত আবদুল মোত্তালেবের সাক্ষাত ঘটিল। দোভাষীর মাধ্যমে আবরাহা আবদুল মোত্তালেবকে তাঁহার কোন আব্দার থাকিলে তাহা প্রকাশ করিতে বলিল। আবদুল মোত্তালেব বলিলেন, আপনার লোক আমার পশুপাল নিয়া আসিয়াছে তাহা প্রত্যার্পণ করা হউক। আবরাহা বলিল, প্রথম সাক্ষাতে আমি আপনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া ছিলাম, কিন্তু আপনার কথা শুনিয়া আমার মন আপনার প্রতি বিতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল। আপনি সামান্য মালের জন্য আমার নিকট আব্দার করিলেন, আর আপনার এবং আপনার পুর্ব্বপুরুষদের ধর্ম্মীয় কা'বা ঘরটির জন্য কোন আব্দার করিলেন না। আবদুল মোত্তালেব বলিলেন, দেখুন। আমি পশুপালের মালিক, তাই আমি পশুপালের কথা বলিলাম। কা'বা গৃহের মালিক (আমি নহি, অন্য) একজন আছেন; তিনি হয়ত উহাকে ভাঙ্গায় বাধা দিবেন। আবরাহা দর্পের সহিত বলিয়া উঠিল, আমি কাহারও বাধা মানিব না। আবদুল মোত্তালেব বলিলেন, তাহা আপনি জানেন, আর তিনি জানেন। অতঃপর আবরাহা আবদুল মোত্তালেবের পশুপাল ফিরাইয়া দিল।

আবদুল মোত্তালেব মক্কায় আসিয়া লোকদিগকে একত্রিত করিল এবং সমবেত ভাবে কা'বা দ্বারে যাইয়া পরওয়াদেগারের নিকট আরাধনা করিল ; আবরাহা বাহিনীর মোকাবিলায় সাহায্য প্রার্থনা করিল। আবদুল মোত্তালেব কা'বা দ্বারের কড়া ধরিয়া আবেগপূর্ণভাবে বলিলেন, "হে আল্লাহ! একজন মানুষ সে তাহার মাল-ছামান রক্ষা করিয়া থাকে ; আপনি আপনার ঘর ও উহার ছামান রক্ষা করুন। আগামীকল্য শত্রু এবং উহার শক্তি যেন আপনার শক্তির উপর জয়ী হইতে না পারে। অতঃপর আবদুল মোত্তালেব লোকদেরকে লইয়া পাহাড়ের উপর আশ্রয় নিল এবং কা'বার সহিত আবরাহা কি করে তাহা দেখিবার অপেক্ষায় থাকিল।

পরদিন প্রভাতে আবরাহা দম্ভের সহিত সৈন্যবাহিনী লইয়া মক্কায় প্রবেশের জন্য অগ্রসর হওয়ার ব্যবস্থা করিল। তাহার প্রধান হাতীটির নাম ছিল—"মাহমুদ" সেই হাতীটি সর্ব্বাগ্রে চলিবে, কিন্তু সেই হাতী মক্কার দিক পথে কিছুতেই অগ্রসর হয় না, বসিয়া পড়ে। অন্য যে কোন দিকে চালাইলে সে চলে, কিন্তু মক্কার দিকে চলে না। এই বিভ্রাটের মধ্যেই হঠাৎ সমুদ্র দিক হইতে ঝাকে ঝাকে এক শ্রেণীর পাখী উড়িয়া আসিতে লাগিল; প্রতিটি পাখীরই মুখে ও দুই পায়ে—মোট তিনটি কাঁকর। পাখীগুলি আবরাহা বাহিনীর উপর সেই কাঁকরসমূহ ফেলিতে লাগিল; আল্লাহ তায়ালার কুদরত—যে কোন সৈন্য বা হাতীর উপর একটি কাঁকর পতিত হইলেই সে ধ্বংস হইয়া যাইত। এই ভাবে সেই বাহিনীর বিরাট অংশ ধ্বংস হইল এবং ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তাহাদের অবস্থা পবিত্র কোরআন ছুরা আলাম তারায় নিম্নরূপ ব্যক্ত হইয়াছে—

"হে প্রিয় নবী। আপনী কি খবর রাখেন না—কি অবস্থা করিয়াছিলেন আপনার পরওয়ারদেগার হাতীওয়ালা বাহিনীর? তাহাদের সমুদয় চেষ্টা কি ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন না? তাহাদের উপর তিনি পাঠাইয়া দিয়া ছিলেন, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী; সেই পাখী তাহাদের উপর ফেলিতেছিল শক্ত কাঁকর। ফলে তিনি তাহাদিগকে ভক্ষিত তৃণের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়া ছিলেন।"

ঘটনার সত্যতা প্রমানে একটি বিষয়ই যথেষ্ট যে, উল্লেখিত ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিবার মাত্র ৪০ হইতে ৫২ বৎসরের মধ্যে পবিত্র কোরআনের ছুরা "আলামতারা" নাযেল হইয়া ছিল; তখন উক্ত ঘটনার সময়কালের অনেক লোকই আবরাহার দেশ ইয়ামান এবং ঘটনার শহর মক্কায় ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিদ্যমান ছিল। তাহাদের বর্ত্তমানে ও সম্মুখে পবিত্র কোরআনের উক্ত ছুরা প্রচারিত হইয়াছে; তাহারা সকলেই কোরআনের বিরোধী দলভুক্ত ছিল। যদি কোরআনের বর্ণনায় বিন্দু মাত্রও অবাস্তবতা থাকিত তবে নিশ্চয় তাহারা উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিত এবং সেইরূপ কোন প্রতিবাদ হইয়া থাকিলে তাহা মুছিয়া যাওয়ার মত ছিল না। কারণ, প্রতি যুগেই কোরআনের শত্রুর আধিক্য ছিল।

আবরাহা বাহিনীর বহুসংখ্যক ধ্বংস এবং অবশিষ্টরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। স্বয়ং আবরাহার গায়েও কাঁকর পড়িয়া ছিল, কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গে হালাক হয় নাই; তাহার* শরীরে পঁচা লাগিয়া গিয়াছিল। আঙ্গুল হইতে আরম্ভ করিয়া শরীরের অংশ টুকরা টুকরা হইয়া খসিয়া পড়িতেছিল এবং সেই ঘা হইতে সর্ব্বদা পুঁজ

* কাঁকরের ক্রিয়ায় মূল রোগ তাহার হইয়াছিল "বসন্ত" এবং বিশ্বে বসন্ত রোগের আরম্ভ ঐ সময় হইতেই হইয়াছিল; বসন্তের দানা হইয়া তাহার শরীরে পচন লাগিয়া ছিল। (যোরকানী ৮৮)

প্রবাহিত হইত ; এইরূপ ঘৃণিত ও কদর্য্য অবস্থায় দীর্ঘ দিন ভোগার পর অবশেষে বক্ষ ফাটিয়া দিল-কলিজা বাহির হইয়া পড়িলে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

এই ঘটনায় সমগ্র আরবে কোরেশ বংশের প্রভাব অনেক বেশী বাড়িয়া ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে এই ঘটনা হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামেরই বরকত ছিল; হযরত(দঃ) তখন দুনিয়াতে পদার্পণের প্রথম ধাপে তথা মাতৃগর্ভে ছিলেন।

এই ঐতিহাসিক ঘটনার বৎসরই—ঘটনার ৫০ বা ৫৫ দিন পর হযরত (দঃ) ভূমিষ্ঠ হন। ঐ বৎসর রবিউল আউয়াল মাসে হযরতের জন্ম।

বেলাদৎ বা শুভ জন্ম ঃ

এই সুসজ্জিত বিশ্ববসুন্ধরা যেই মহানের প্রদর্শনী (Excibition), নিখিল সৃষ্টি যেই মহান স্রষ্টের বিকাশ উদ্দেশ্যে, ছয় হাজার বৎরের অধিককাল হইতে এই ধরণী যেই মহামানবের প্রতীক্ষায়, ভুবন-কাননে যেই ফুলের আশায় তাকাইয়া ছিল সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি ; আজ সেই মহানের শুভ পদার্পণ হইবে এই ধরণীতে, সেই মহাফুলের কুঁড়ি জন্ম নিবে এই উদ্যানে।

হযরত নূহ, হযরত ইব্রাহীম, হযরত মূছা, হযরত ঈসা আলাইহিমুস-সালাম শুভ সংবাদ দান ও শোহরত করিয়াছিলেন যে মহানবীর, অগণিত নবীগণের পরিক্রম শেষ করিয়া শোভা যাত্রার শেষে বিশ্ব-সভার মহাসমাবেশকে অলঙ্কৃত করিবেন যে মহামান্বিত মহাপুরুষ—আজ সেই মহামহিমের শুভাগমন হইবে বিশ্বভুবনে।

চন্দ্র মাস রবিউল-আউয়াল ১২, ১০, ৯, ৮ বা ২ তারিখ সোমবার—দিনও নয় ; রাত্রও নয়—আলো-আঁধারে ছোবেহ-ছাদেকের শান্ত-শুভ্র আলোক-রেখা গগণ-প্রান্তকে মনোরম করিয়াছে, স্নিগ্ধ বায়ুর শীতল প্রবাহ ধরাপৃষ্ঠকে প্রফুল্ল আমোদিত ও পুলকিত করিয়াছে। এই অপরূপ মূহূর্ত্তে বিবি আমেনা প্রসব-অবস্থা অনুভব করিলেন ; অভিনন্দন ও অভ্যর্থনার আয়োজন চলিল গগণে-ভূবনে। আল্লাহ তায়ালা আদেশ করিলেন, ফেরেশতাগণকে খুলিয়া দাও আসমানসমূহের সকল দরওয়াজা ; খুলিয়া দাও সমস্ত বেহেশতের সকল দরওয়াজা (যোরকানী, ১—১১১)। বিবি আমেনা দেখিলেন, তাঁহার কুটির অপূর্ব্ব নূরে উজালা হইয়া গিয়াছে। তিনি আরও দেখিলেন, এক অপরূপ দৃশ্য—নিজ গোত্রীয় আব্‌দে-মনাফ বংশের নারী আকৃতির দীর্ঘ কায়া বিশিষ্ঠা কতিপয় স্বর্গীয় লাবণ্যময়ী মহিলা তাঁহার শিয়রে উপস্থিত ; তাঁহারা বিবি আমেনাকে ঘিরিয়া বসিলেন। বিবি আমেনা অবাক। কাহাকেও কোন খবর দেই নাই, এই মূহূর্ত্তে ইহারা কিরূপে খোঁজ পাইলেন ? কোথা হইতে আসিলেন ? কাহারা ইহারা ? সঙ্গে সঙ্গে পরিচয় দানে তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, আমরা হইতেছি—

বিবি আছিয়া, বিবি মরয়্যম* এবং কতিপয় বেহেশতী হুর (যোরকানী ১—১১২)। এতদ্ভিন্ন বিবি আমেনা আরও অলৌকিক বহু কিছু দেখিতে ছিলেন।

বিবি আমেনার বর্ণনা—প্রসব ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে আমি মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ধরণী বুকে দেখিতে পাইলাম ; ভুমি স্পর্শকালে তিনি উভয় হাতের উপর ভর করিয়া সেজদারত ছিলেন (যোরকানী ১--১১২)। তাঁহার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জল ছিল ; তাঁহার দেহ মোবারক হইতে মোশকের সুবাস ছড়াইতে ছিল (ঐ ১১৫)। ঐ সময় এক অপূর্ব শুভ্র মেঘ সাদৃস্য আসোমালা আসিয়া তাঁহাকে আবৃত করিয়া ফেলিল ; সঙ্গে সঙ্গে আমার কানে ধ্বনিত হইল—"জলে-স্থলে সারা জাহানে তাঁহাকে ভ্রমণ করাইয়া নিয়া আস" ; কিছু সময় তিনি আমার দৃষ্টির অন্তরালে রহিলেন (ঐ ১১২)। তিনি যখন ভূপৃষ্ঠে পদার্পণ করিলেন তাঁহার সঙ্গে এক অসাধারণ নূর—জ্যোতি বা আলো নির্গত হইল যদ্দারা পূর্ব্ব-পশ্চিম সমগ্র জগত যেন আলোকিত হইয়া গিয়াছিল, সেই আলোতে সুদূর সিরিয়ার ইমারতসমূহ উদ্ভাসিত হইয়াছিল ⁑। হযরত (দঃ) মাতৃগর্ভ হইতে সম্পুর্ণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পাক-পবিত্র অবস্থায় আগমন করিয়াছিলেন (ঐ ১১৭)।

---

* বিবি আছিয়া এবং বিবি মরয়্যমের আগমন অতি সামঞ্জস্যপুর্ণ; বিবি আছিয়ার জাগতিক স্বামী "ফেরাউন" চিরজাহান্নামী, আর বিবি মরয়্যামের কোন জাগতিক স্বামী ছিল না। তাঁহারা উভয়ে বেহেশতে নবীজীর চিরসঙ্গীনী হইবেন।

⁑ **সমালোচনা**—মোস্তফা-চরিতে বিবি আমেনার এই নূর বা জ্যোতি দর্শনকে স্বপ্নের দেখা বলা হইয়াছে, ইহা নিছক ভুল। বলা হইয়াছে—"বিবি আমেনা স্বপ্নযোগে ঐ সকল ঘটনা সন্দর্শন করিয়াছেন বলিয়া সকলে সমস্বরে স্বীকার করিতেছেন।" এই উক্তি ডাহা মিথ্যা ; পূর্ব্বাপর কেহই এই ঘটনাকে স্বপ্ন বলেন নাই। সীরতশাস্ত্রে পাঁচশত বৎসরের অধিক পূর্ব্বে বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা কাসতালানী কর্তৃক সঙ্কলিত "মাওআহেবে-লুদুনিয়্যাহ" কেতাবে (২২ পৃঃ) একাধিক ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা এই জ্যোতির বিকাশকে বাস্তব বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। "যোরকানী" নামক কেতাবে (১১৬ পৃঃ) ঐ জ্যোতি-দর্শন স্বপ্নে নয় বরং বাস্তব বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) তাঁহার "নশরুত্ তীবে" (১৬ পৃঃ) এবং মুফতী শফী সাহেব তাঁহার "সীরতে খাতেমুল-আম্বিয়ায়" (২৫ পৃঃ) ঐ জ্যোতি-দর্শনকে বাস্তব বলিয়াছেন। বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার হাদীছ শাস্ত্রের হাফেজ ইবনে-হজর (রঃ) বাস্তবরূপে উক্ত জ্যোতি-দর্শনের বর্ণনাকে ছহীহ-শুদ্ধ-সঠিক বলিয়াছেন এবং ইহার সমর্থনে বিভিন্ন মোহাদ্দেছগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন (যোরকানী ১১৬পৃঃ)।

এমতাবস্থায় মোস্তফা-চরিতের উল্লেখিত উক্তি অলীক ও অমূলক হওয়ায় সন্দেহ থাকে কি? পরিতাপের বিষয় এই অলীক ও অমূলক মত্‌টাকে প্রমাণিত করার জন্য দুইটি আরবী

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

নবীজীর নূরে সারা বিশ্ব আলোকিত হইবে, তাই তাঁহার শুভাগমন লগ্নে এই নূরের বিকাশ ছিল। নবীজী নিজেই সেই নূরের সত্তা ছিলেন ; আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন—

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ

"আসিয়া গিয়াছে আল্লার তরফ হইতে তোমাদের নিকট এক মহান নূর এবং সুস্পষ্ট কেতাব ; এই নূর ও কেতাব দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা শান্তির পথে অগ্রগামী করিবেন ঐ লোকদেরকে যাহারা তাঁহার সন্তুষ্টির অভিলাষী এবং তাহাদেরকে সকল প্রকার অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া নিবেন আলোর দিকে নিজ দয়ায়।"

আলোচ্য আয়াতে যে নূরের উল্লেখ আছে সেই নূর হইলেন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম। সুতরাং তাঁহার শুভাগমনের সঙ্গে নূর বা আলোর বিকাশ চমৎকার সামঞ্জস্যময়ই বটে। উক্ত আলোতে সিরিয়া উদ্ভাসিত হওয়াও সুন্দর অর্থই রাখে ; বর্হিবিশ্বে ঐ আলোর বিকাশ সর্ব্বপ্রথম সিরিয়ায়ই হইয়া ছিল। মোসলমানগণ সর্ব্বপ্রথম সিরিয়া দেশই জয় করিয়া ছিলেন।

সৃষ্টির প্রাণ পেয়ারা রসুল মোস্তফা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাব ও শুভাগমনে আনন্দের হিল্লোল উঠিল সমগ্র ধরণীতে। যাঁহার জন্য সমস্ত মখলুকাতের সৃষ্টি, যাঁহার জন্য আরশ-কুরছি, লৌহ-কলম, আসমান-জমিন, মানুষ-ফেরেশতা ; আজ তিনি আসিয়াছেন শত উর্দ্ধের উর্দ্ধ হইতে এই ধূলির ধরণীতে ; তাই

বাক্যের উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হইয়াছে—উভয়টিই নিছক প্রবঞ্চনা মাত্র। একটি বাক্যে বিবি আমেনার স্বপ্নের কথা উল্লেখ আছে। এই স্বপ্ন ত বিবি আমেনার গর্ভ ধারণ সময়ের ছিল বলিয়া সীরতে-ইবনে-হেশামে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রসবের সময়ও ঐরূপ নূর দেখা সম্পর্কে। অপর বাক্যটি একটি হাদীছ ; উহাতে "رُؤْيَا—রুয়্যা" শব্দ আছে, উহার অনুবাদ "স্বপ্ন দর্শন" প্রবঞ্চনা ও সত্যের অপলাপ বৈ নহে। এই শব্দটি চাক্ষুষ এবং প্রত্যক্ষরূপে দেখার অর্থেও ব্যবহৃত হয় বলিয়া ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—বোখারী শরীফ ৬৮৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পাঠক! একটি আশ্চর্য্যজনক উক্তির কৌতুক উপভোগ করুন। মরহুম খাঁ সাহেব বিবি আমেনার উক্ত জ্যোতি-দর্শন স্বপ্নযোগের ছিল বলিয়া সাব্যস্ত করিতে উল্লেখিত "রুয়্যা" শব্দের অর্থ স্বপ্নে দর্শন সূত্রে নবীজীর উক্তিরূপে হাদীছটির অনুবাদ করিয়াছেন—"এবং আমার মাতা আমাকে প্রসব করার সময় যে স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন……"। সন্তান প্রসবের কঠিন অবস্থায় প্রসূতির এরূপ গভীর ও মধুর নিদ্রা আসিবে যে সে উহাতে রঙ্গীন স্বপ্ন দেখিবে—এই শ্রেণীর হাস্যকর কথা মরহুম খাঁ সাহেবদের ন্যায় হাতুড়ে লোকের পক্ষেই সম্ভব। "মিথ্যার বেসাতিধারীদের স্মরণশক্তি হয় না।"

হর্ষে ও আনন্দে সমাদৃত করিয়াছে তাঁহাকে নিখিলসৃষ্টি, অভিনন্দন জানাইয়াছে তাঁহাকে সমস্ত প্রকৃতি, বহিয়াছে সকলের উপর আনন্দের বন্যাধারা।

ইয়্যা নবী সালামু আলাইকা	আল্লার নবী তুমি; তোমাকে সালাম।
ইয়্যা রসুল সালামু আলাইকা	আল্লার রসুল তুমি; তোমাকে সালাম !!
ইয়্যা হাবীব সালামু আলাইকা	আল্লার হাবীব তুমি; তোমাকে সালাম !!!
ছালাওয়াতুল্লাহ্‌ আলাইকা	তোমার স্মরণে সাদা সালাম সালাম !!!!

হযরতের শুভ জন্মোপলক্ষে অলৌকিক ঘটনাবলী ঃ

হযরতের ভূমিষ্ট হওয়া উপলক্ষে অনেক অলৌকিক ঐতিহাসিক ঘটনাই ঘটিয়াছিল। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কতিপয় ঘটনা এই—

পারস্যের অগ্নিপুজকগণ তাহাদের কেন্দ্রীয় একটি অগ্নিকুণ্ডলী এক হাজার বৎসর হইতে প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিয়াছিল। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভূমিষ্ট হওয়ার রাত্রে হঠাৎ সেই হাজার বৎসরের অগ্নিকুণ্ডলী নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। বিভিন্ন দেব-দেবীর বহু মূর্ত্তি ঐ রাত্রে অধঃমুখী পতিত হইয়া ছিল, কা'বা গৃহের দেব-মূর্ত্তিগুলি ভূলুণ্ঠিত হইয়াছিল। ইঙ্গিত ছিল যে, এক আল্লার এবাদৎ উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে এবং অন্যান্য বস্তু নিচয়ের পূজার অবসান অত্যাসন্ন। এতদ্ভিন্ন তৎকালীন বিশ্বের সর্ব্ববৃহৎ রাজশক্তি পারস্য সম্রাটের শাহী মহলে ঐ রাত্রে ভূমিকম্প হয় এবং উহাতে রাজ প্রাসাদের চৌদ্দটি স্বর্ণ-চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। ইহাতে ইঙ্গিত ছিল যে, কাফেরী শক্তির ভূকম্পন ঘনাইয়া আসিয়াছে এবং উহার পতন আসন্ন। আরও অলৌবিক ঘটনা এইরূপ ঘটে যে পারস্যেরই এক বৃহৎ হ্রদ— চারিদিকে স্থল বেষ্টিত বৃহৎ জলাশয় ঐ রাত্রে হঠাৎ সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইয়া যায়, উহাতে আর পানি আসে নাই। তৎকালীন রোম সাম্রাজের অধীনস্থ সিরিয়া এলাকার একটি ঐরূপ জলাশয়েও হঠাৎ আশ্চর্যজনকভাবে বিরাট পরিবর্ত্তন আসে যে, উহার পানি অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া যায়। ইঙ্গিত ছিল যে, পারস্য ও রোমের তৎকালীন বৃহৎ কাফেরী শক্তি সমূহের সৌর্য-বীর্যে ভাটা আসিয়া গেল ; ঐ সব আর টিকিয়া থাকিতে পারিবে না ⁂। (যোরকানী ১২১ পৃঃ)

⁂ সমালোচনা—মুখবন্ধে বলা হইয়াছে যে, মোস্তফা-চরিতের সঙ্কলক মরহুম আকরম খাঁ সাহেবের মস্ত বড় বাতিক ছিল—তিনি নবীগণের অলৌকিক ঘটনাবলীর প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন ছিলেন। এই বাতিকের কারণে তিনি কোরআন-হাদীছে হাতুড়ে হইয়াও বহু ঐতিহাসিক সত্যকে এবং ছহীহ হাদীছকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহার ঐ ব্যাধি-বশে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের শুভ জন্মোপলক্ষের উল্লেখিত ঘটনাবলীকে নগ্ন ও

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

গগণ-ভুবনের স্বাগত-ধ্বনি, নিখিলের অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা এবং অলৌকিকের মহাসমারোহ-শোভাযাত্রার মাঝে শুভাগমন হইল মহান অথিতির—যাঁহার আগমন পানে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া আশার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিল সারা প্রকৃতি, অধীর আগ্রহে প্রহর গণিতে ছিল সারা সৃষ্টি। ধরণী পৃষ্ঠে শুভ জন্ম তথা রুহানী দুনিয়া হইতে বস্তুজগতে পদার্পণ এবং নূরানী আত্মার নূরানী দেহ সহ জড় দেহের আবরণে আবির্ভাব হইল পেয়ারা রসুল মহানবী মোস্তফার ॥

মারহাবা ইয়া হাবীবাল্লাহ!
মারহাবা ইয়া রসুলাল্লাহ ॥
মারহাবা, ইয়া মারহাবা, ইয়া মারহাবা।
"ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম"

হযরতের আবির্ভাবে বিশ্বজোড়া প্রতিক্রিয়া ঃ

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাব সারা বিশ্বের উপর অতি বড় এক বিরাট ঘটনা ছিল এবং উহার প্রতিক্রিয়াও ছিল বিশ্বজোড়া। প্রথম খণ্ড ৬নং হাদীছে রোম সম্রাট হেরাক্লিসের বিস্তারিত ঘটনায় উল্লেখ হইয়াছে যে, এই

অভদ্র ভাষায় অবাস্তব সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহার রুগ্ন রুচি এই সব ঐতিহাসিক বর্ণনাকে ভালবাসে না বিধায় এই সব ঘটনার উল্লেখ এমন বিকৃত ও অতিরঞ্জিত আকারে করিয়াছেন যে, পাঠক ঐসব সত্যকে যেন আপনা হইতেই বিশ্রী, ঘৃণিত ও হাস্যস্পদ গণ্য করিয়া নেয়। সত্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার কত জঘন্য অপকৌশল ইহা!

আরও অতি দুঃখের বিষয়—তিনি এইসব ঘটনাবলীর উল্লেখের সহিত নিজ হইতে দুই-একটা আজগবী অলীক কথা মিশ্রিত করিয়া দিয়াছেন। যেমন—"সমস্ত রাজসিংহাসন উলটাইয়া পড়িয়া ছিল, পশু মাত্রই মানুষের মত কথা বলিতেছিল" ইত্যাদি (১৮৮ পৃঃ)।

এতদ্ভিন্ন ১৮৭ পৃষ্ঠায় "বলিতে লজ্জা হয়" বলিয়া এমন একটা বিশ্রী অশালীন অশ্লীল কুরুচিময় বিবরণের উল্লেখ করিয়াছেন যাহা একমাত্র তাঁহারই গড়ানো কথা হইবে। আমরা সীরতের কোন গ্রন্থে এই শ্রেণীর বিবরণ দেখি নাই।

চতুর খাঁ সাবেব এই সব অলীক ও লজ্জাকর গর্হিত কথাগুলিকে সত্য ইতিহাসের সহিত জুড়িয়া দিয়াছেন অতি এক জঘন্য কুমতলবে। যে—সাধারণ পাঠক যেন স্বতঃস্ফূর্তই সত্য ইতিহাসগুলিকেও বিনা দ্বিধায় অস্বীকার করে। আমরা যেসব অলৌকিক ঘটনাবলীর আলোচনা করিয়াছি উহা পূর্ব্ববর্ত্তী নোটে উল্লেখিত সমুদয় নির্ভরযোগ্য সীরত গ্রন্থাবলীতেই বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাবে উর্দ্ধ জগতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কোরআনেই উল্লেখ আছে। বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ড জিন সম্পর্কীয় আলোচনা দ্রষ্টব্য। নক্ষত্ররাজির উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে প্রথম খণ্ড ৬ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য। এই ক্ষেত্রে গণক-ঠাকুরদের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান ও হুকুমকে টানিয়া আনা শুধুমাত্র প্রবঞ্চনা উদ্দেশ্যেই হইতে পারে।

প্রতিক্রিয়া নক্ষত্ররাজির উপরও পড়িয়াছিল। তৃতীয় খণ্ডে জ্বিন সম্পর্কে আলোচনায় উল্লেখ হইয়াছে যে, উর্দ্ধ জগতের উপরও বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত হইয়াছিল; যদ্দরুন সারা জ্বিন জাতির মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। জ্বিনদের মধ্যে যে, বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল উহারই একটি প্রামাণ্য ঘটনা নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে :—

১৬৫৯। হাদীছ :—(৫৪৫ পৃঃ) ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র ছাহাবী আবদুল্লাহ (রাঃ) স্বীয় পিতার ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, ওমর (রাঃ) অতিশয় সঠিক অনুমান ও শুদ্ধ ধারণা-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন ; যে কোন বিষয়ে তিনি কোন ধারণা ও অনুমান করিলে আমরা কখনও উহার ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখি নাই।

একদা ওমর (রাঃ) বসিয়াছিলেন ; তাঁহার নিকট দিয়া একজন সুশ্রী মানুষ পথ অতিক্রম করিল। ওমর (রাঃ) তাহার সম্পর্কে বলিলেন, আমার ধারণা—এই ব্যক্তি অমোসলেম হইবে ; আর যদি সে এখন মোসলমান হইয়া থাকে তবে সে পূর্ব্বে নিশ্চ। গণক-ঠাকুর (জ্বিন-ভূতের দ্বারা গোপন খবর সংগ্রহকারী) ছিল। এই মন্তব্য করতঃ লোকটিকে ডাকিয়া আনিবার আদেশ করিলেন। তাহাকে ডাকিয়া আনা হইল ; ওমর (রাঃ) তাহার সম্মুখেও ঐ মন্তব্যই করিলেন। সেই ব্যক্তি বলিল, একজন মোসলমানকে এইরূপ বলার সঙ্গতি কি ? অর্থাৎ আমি ত মোসলমান। তখন ওমর (রাঃ) তাহাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বল ত তুমি পূর্ব্বে কি ছিলে ? সে বলিল, আমি পূর্ব্বে গণক-ঠাকুর ছিলাম। ওমর (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে জ্বিন বা ভূতটির সম্পর্ক তোমার সঙ্গে ছিল সে সর্ব্বাধিক আশ্চর্য্যজনক বিষয় তোমাকে কি জানাইয়াছিল ?

ঐ ব্যক্তি বলিল, একদা আমি বাজারে ছিলাম, অকস্মাৎ সেই জ্বিনটি ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় আমার নিকট উপস্থিত হইল এবং বলিল, তুমি জান কি ? জ্বিনগণ এক ভীষণ দুরবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে। (তাহারা দীর্ঘকাল হইতে মানুষ জাতিকে নানা প্রকার গর্হিত কার্য্যে লিপ্ত রাখিয়া স্বৈরাচারিতার রাজ্য চালাইয়া যাইতেছিল ; সেই অবস্থা আর তাহারা বিরাজমান রাখিতে পারিবে না বলিয়া) তাহারা নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের দুর্দ্দিনের সূচনা হইয়াছে, ফলে তাহারা নিজেদের সব কিছু গুটাইয়া দ্রুত পালাইবার চেষ্টায় লাগিয়া গিয়াছে।

ওমর (রাঃ) ঘটনা শ্রবণান্তে বলিলেন, তোমার জ্বিনটি তোমাকে যে, নূতন পরিস্থিতির খবর দিয়াছিল উহা সত্যই ছিল। আমারও (ইসলাম-পূর্ব্বের) তদ্রূপ একটি ঘটনা আছে—একদা আমি পূজার মূর্ত্তি ঘরে শুইয়া ছিলাম। এক ব্যক্তি আসিয়া মূর্ত্তিগুলির সম্মুখে একটি গোশাবক বলিদান করিল ; তখন বিকট আওয়াজে একটি ঘোষণা শুনিতে পাইলাম —তদপেক্ষা বিকট আওয়াজ আমি জীবনে কখনও

শুনি নাই। সেই আওয়াজের ঘোষণাটি ছিল এই—হে জালীহ্ (কাহারও নাম)। একটি সাফল্য অর্জ্জনকারী কর্ম্মের সূচনা হইয়া গিয়াছে, এক সুপণ্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে—যাঁহার ঘোষণা হইবে, لا اله الا الله—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ "আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই।" উক্ত আওয়াজে উপস্থিত লোকজন সকলেই ভয়ে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। (ওমর (রাঃ) বলেন,) তখন আমি মনে মনে এই পণ করিলাম যে, ইহার তথ্য সঠিক রূপে জ্ঞাত না হওয়া পর্য্যন্ত আমি ইহার পেছনে লাগিয়া থাকিব। কিছু সময় আমি তথায়ই অপেক্ষা করিলাম এবং পুনরায় ঐরূপ বিকট আওয়াজের সেই ঘোষণাই শুনিলাম—"হে জালীহ্। সাফল্য অর্জ্জনকারী কর্ম্মের সূচনা হইয়া গিয়াছে, সুপণ্ডিত ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, যাহার ঘোষণা হইবে—لا اله الا الله। অতঃপর আমি তথা হইতে চলিয়া আসিলাম। অল্প দিনের মধ্যেই খবর ছড়াইয়া পড়িল যে, (হযরত মোহাম্মদ (দঃ)—) নবীর আবির্ভাব হইয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ—এই ধরণের ঘটনা ইতিহাসে আরও অনেক বর্ণিত আছে। "সীরতে-হলবিয়াহ" নামক কেতাবে অনেক ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে—

ছাওয়াদ ইবনে ক্বারেব (রাঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন ; তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাও এইরূপই। তিনি পূর্ব্বে গণকঠাকুর ছিলেন, একটি জ্বিন তাঁহার সংশ্রবে ছিল। একদা তিনি রাত্রিবেলা তন্দ্রাবস্থায় ছিলেন, তখন ঐ জ্বিনটি আসিয়া তাঁহাকে ধাক্কা দিল এবং কয়েকটি আরবী বয়াত পড়িল যাহার মধ্যে বনী-হাশেম গোত্রে এক মহামানবের আবির্ভাবের (নবুয়ত প্রাপ্তির) উল্লেখ ছিল।

প্রথম দিন তিনি ঘটনার কোন গুরুত্ব দিলেন না, কিন্তু পর পর তিন দিন একই রূপ ঘটনা ঘটিলে তিনি মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলেন এবং মক্কায় উপস্থিত হইয়া হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে কতিপয় লোকের মধ্যে দেখিতে পাইলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাওয়াদ ইবনে ক্বারেবকে দেখিয়া তাঁহাকে স্বাদর সম্ভাষণ জানাইলেন এবং বলিলেন, তোমার আগমনের মূল ঘটনা আমি জানি। অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করার ঘোষণায় কয়েকটি আরবী বয়াতে পড়িলেন। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন।

আব্বাস ইবনে মের্‌দাছ (রাঃ) ছাহাবীর ইসলাম গ্রহণে এই ধরণের ঘটনাই বর্ণিত আছে। মাযেন (রাঃ) ছাহাবীর ইসলাম গ্রহণেরও এইরূপ ঘটনা বর্ণিত আছে।

খাতামে-নবুয়ত বা নবুয়তের মোহর তথা নবুয়তের ছাপ (৫০১ পৃঃ)

মানুষের ব্যক্তিগত পরিচয়ের জন্য যেরূপ তাহার visible signe বা Distinctivr Marks তথা বিশেষ চিহ্ন থাকে এবং পরিচয়ের আবশ্যক স্থলে উহার দ্বারা তাহার

পরিচয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নবুয়তের পরিচয়ের একটি visible signe বা Distinctive Marks তথা বিশেষ চিহ্ন ছিল উহাকেই খাতামে-নবুয়ত বা নবুয়তের মোহর বলা হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী আসমানী কেতাব সমূহে যেখানে হযরতের পরিচয়ের উল্লেখ ছিল তথায় এই মোহরে-নবুয়তের উল্লেখ বিশেষরূপে বিদ্যমান ছিল এবং পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের উম্মতের আলেমগণ উহা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন ("প্রথম বহির্দেশ গমন" আলোচনায় বর্ণিত বোহায়রা পাদ্রির ঘটনা এবং "সিরিয়া সফরে হযরত" আলোচনায় নাছ্তূরা পাদ্রির ঘটনা দ্রষ্টব্য)। তাঁহাদের অনেককে ইসলাম গ্রহণের পূর্ব্বক্ষণেও এই মোহরে-নবুয়তের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে দেখা যাইত।

ঈসায়ী বা খৃষ্টান ধর্ম্মীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি সাল্‌মান ফারেসী (রাঃ) যাঁহার উল্লেখ ইতিপূর্ব্বেও হইয়াছে, তিনি শেষ নবীর আবির্ভাবের প্রতিক্ষায় ঐতিহাসিক সাধনা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত মদিনায় পৌছিয়াছিলেন। তিনি হযরতের দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সঠিক পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে হযরতের পেছন দিকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হযরত (দঃ) উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে, সালমান তাঁহার মোহরে-নবুয়ত দেখিতে চাহিতেছে, তাই হযরত (দঃ) তাঁহার গায়ের চাদর কাঁধের উপর হইতে একটু ছাড়িয়া দিয়া মোহরে-নবুয়তকে উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। সালমান উহা দেখা মাত্র তৎক্ষণাৎ উহাকে চুম্বন করতঃ বলিয়া উঠিলেন— اشهد انك رسول الله। "আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আপনি বাস্তবিকই আল্লার রসুল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।" (যোরকানী, ১—১৫৪)

মোহরে-নবুয়তের বিস্তারিত বিবরণ পূর্ণরূপে বিভিন্ন হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে। উহা হযরতের পৃষ্ঠে কাঁধদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত ছিল, ঠিক মধ্যস্থলে নয়, বরং একটু বামদিকে—বাম কাঁধের চৌড়া হাড়ের মাথা বরাবর স্থানে ছিল। চামড়ার নীচে উর্দ্ধমুখী একটি গুট্‌লির ন্যায় ছিল। পরিমাণে কবুতরের ডিমের ন্যায় ছিল। কতিপয় লোমে বেষ্টিত ছিল। উহা হইতে মোশকের সুগন্ধি অনুভূত হইত। উহার উপর নূর পরিদৃষ্ট হইত।

প্রথম খণ্ডে ১৪২নং হাদীছ—ছায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমার খালা আমাকে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার এই ভাগিনাটি রুগ্ন। তৎক্ষণাৎ হযরত (দঃ) আমার মাথার উপর তাঁহার হাত বুলাইলেন এবং আমার জন্য কল্যাণ ও মঙ্গলের দোওয়া করিলেন এবং অজু করিলেন; আমি তাঁহার অজুর অবশিষ্ট বা অঙ্গ-ধৌত পানি পান করিলাম। অতঃপর আমি হযরতের পেছনে আসিয়া দাঁড়াইলাম তখন তাঁহার মোহরে-নবুয়ত আমি দেখিয়াছি; উহা তাঁহার কাঁধদ্বয়ের মধ্যভাগে ছিল পরিমাণে নব বধূর জন্য নির্ম্মিত তাঁবুর ঘুন্টির ন্যায়।

মোহ্‌রে-নবুয়তের পরিমান বুঝাইবার জন্য আলোচ্য হাদীছে যে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইয়াছে উহা আরব দেশে সচরাচর ব্যবহৃত বস্তু ছিল। আমাদের পক্ষে সহজ দৃষ্টান্ত মোছলেম শরীফের এক হাদীছে উল্লেখ আছে—"কবুতরের ডিমের ন্যায়।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—মোহ্‌রে-নবুয়ত হযরতের জন্মগত ছিল, না—পরে উহা সৃষ্টি হইয়াছিল সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। পরে সৃষ্টি হওয়ার সিদ্ধান্তেও কাহারও মতে দুধ মাতার নিকট থাকাকালে বক্ষ বিদীর্ণ করণ সময়ে, কাহারও মতে নবুয়তের বিকাশকালে, কাহারও মতে মে'রাজ উপলক্ষে। (যোরকানী ১৬০)

হযরতের নাম (৫০০ পৃঃ)

নবীজীর নাম করণ সম্পর্কে দুইটি বর্ণনা ইতিহাসে পাওয়া যায়। একটি বর্ণনা— বিবি আমেনা হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, আমার গর্ভকাল ছয় মাস অতিক্রান্ত হইলে একদা আমি স্বপ্নে দেখিলাম, এক আগন্তুক আমাকে বলিতেছে, বিশ্বের সর্ব্বোত্তম ব্যক্তিকে তুমি গর্ভে ধারণ করিয়াছ। ভূমিষ্ট হইলে তাঁহার নাম রাখিবে "মোহাম্মদ" ↑। আর তুমি এই স্বপ্ন গোপন রাখিও। (যোরকানী, ১—১১১) দ্বিতীয় বর্ণনা—নবীজীর ভূমিষ্ট হওয়ার সপ্তম দিন তাঁহার দাদা খাজা আবদুল মোত্তালেব মক্কার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দিলেন। সেই উৎসবের দিন আবদুল মোত্তালেব নবীজীর খাত্‌না করাইলেন এবং নাম রাখিলেন "মোহাম্মদ"। অনেকের মতে হযরত (দঃ) জন্মগতভাবেই খাত্‌নাকৃত ছিলেন (যাদুল-মায়াদ)।

নাম করণ সম্পর্কে উক্ত বর্ণনাদ্বয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। "মোহাম্মদ" নাম করণের আসল উৎস বিবি আমেনার স্বপ্ন। নবীজী ভূমিষ্ট হওয়ার পরই বিবি আমেনা খাজা আবদুল মোত্তালেবকে সংবাদ পাঠাইলেন, আপনার বংশের চেরাগ একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে; আপনি আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যান। আবদুল মোত্তালেব ছুটিয়া আসিলেন এবং আদর সোহাগের সহিত নবজাত শিশুকে দেখিলেন। তখন বিবি আমেনা গর্ভাবস্থায় যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং নাম সম্পর্কে যে আদেশ পাইয়াছিলেন সব কিছু খুলিয়া বলিলেন। আবদুল মোত্তালেব নবাগত শিশুকে কোলে লইয়া আল্লার ঘর কা'বা শরীফে গেলেন এবং দাঁড়াইয়া আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া করিলেন, শোকরগুজারী করিলেন। (সীরতে ইবনে হেশাম ১৬০)।

↑ সমালোচনা—"মোস্তফা-চরিত" এবং "বিশ্বনবী" প্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ের পণ্ডিত লেখকগণ আলোচ্য স্বপ্নের আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই স্বপ্নে প্রাপ্ত নাম "আহমদ" লিখিয়াছেন। তাঁহাদের উক্তির কোন সূত্র আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। আমরা সীরত শাস্ত্রের বিভিন্ন মূল গ্রন্থ দেখিয়াছি; বিশেষতঃ মোস্তফা-চরিতের ফুটনোটে যে, "কামেল" কেতাবের নাম উল্লেখ আছে উহারও মূল কেতাব দেখিয়াছি। সর্ব্বত্রই বিবি আমেনার স্বপ্নের আলোচনায় "মোহাম্মদ" নাম উল্লেখ রহিয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্যের প্রাধান্য চলিতে পারে না।

সুতরাং আবদুল মোত্তালেব ঐ স্বপ্নের আদেশ নিশ্চয়ই মনে রাখিয়াছেন এবং চিরাচরিত নিয়মানুসারে সপ্তম দিন আনন্দ উৎসবের মাঝে সেই স্বপ্নাদিষ্ট "মোহাম্মদ" নাম আনুষ্ঠানিকরূপে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। "ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে অসাল্লাম"

১৬৬০। হাদীছ ঃ— عن جبير بن مطعم رضى الله تعالى عنه قال

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِىْ خَمْسَةُ اَسْمَاءٍ اَنَا مُحَمَّدٌ

وَاَنَا اَحْمَدُ وَاَنَا الْمَاحِىْ الَّذِىْ يَمْحُوا اللّٰهُ بِىَ الْكُفْرَ وَاَنَا الْحَاشِرُ

الَّذِىْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى قَدَمِىْ وَاَنَا الْعَاقِبُ -

অর্থ—জোবায়ের ইবনে মোতয়েম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার বিশিষ্ট নাম পাঁচটি, যথা—আমার নাম "মোহাম্মদ" আমার নাম "আহমদ" এবং আমার নাম "মাহী" মূলোচ্ছেদকারী; আমার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা কুফুরীর মূলোচ্ছেদ করিবেন এবং আমার নাম "হা'শের—সর্ব্বপ্রথম ময়দানে-হাশরের দিকে অগ্রগামী; ময়দানে-হাশরের দিকে অগ্রসর হওয়া কালীন সমস্ত লোক আমার পদাঙ্কে অগ্রসর হইবে এবং আমার নাম "আ'কেব—সর্ব্বশেষে আগমনকারী; (আমার পর কোন নবীর আবির্ভাব হইবে না।)

ব্যাখ্যা ঃ—"মোহাম্মদ" অর্থ অধিক প্রসংশিত; সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টনিচয় পর্য্যন্ত সকলের প্রসংশার পাত্র তিনি; তাই তাঁহার জন্য এই নাম পূর্ব্ব হইতেই বিধাতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। "আহমদ" অর্থ সর্ব্বাধিক প্রসংশাকারী, আল্লাহ তায়ালার প্রসংশাকারীদের মধ্যে হযরত (দঃ) অন্যতম একজন হইবেন, তাই তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতেই এই নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী আসমানী কেতাব সমূহে এবং নবীগণের ভবিষ্যদ্বানীতে তিনি উক্ত দুই নামে বিশেষতঃ "আহমদ" নামে পরিচিত ছিলেন। অন্যান্য নাম সমূহের তাৎপর্য্য মূল হাদীছেই ব্যক্ত হইয়াছে।

১৬৬১। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا تَعْجَبُوْنَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللّٰهُ

عَنِّىْ شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ يَشْتِمُوْنَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَنُوْنَ مُذَمَّمًا وَاَنَا مُحَمَّدٌ -

অর্থ— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি? আমার শত্রু কাফের কোরায়েশেরা আমার প্রতি যে সব গালি ও ভর্ৎসনা প্রয়োগ করিয়া থাকে ঐ সবকে আল্লাহ তায়ালা কিরূপে আমার হইতে সরাইয়া রাখিতেছেন।

তাহারা "মোজাম্মাম" নাম বলিয়া গালি ও ভর্ৎসনা প্রয়োগ করিয়া থাকে, অথচ আমি ত "মোহাম্মদ" নামের।

ব্যাখ্যা :—"মোহাম্মদ" শব্দের অর্থ অত্যধিক প্রসংশিত। কাফের শত্রুরা হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গ্লানি করা কালে তাঁহাকে ঐ নামে ব্যক্ত করিত না যেই নামের মূলে প্রসংশিত হওয়ার অর্থ রহিয়াছে ; "মোহাম্মদ" নামের পরিবর্ত্তে "মোজাম্মাম" শব্দ ব্যবহার করিত যাহার অর্থ "জঘণ্য—কলুষিত।"

হযরত (দঃ) এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই ছাহাবীদের সম্মুখে করুণাময় আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন যে, কি আশ্চর্য্যজনক ভাবে আল্লাহ তায়ালা আমাকে শত্রুর গ্লানি হইতে বাঁচাইতেছেন। শত্রুর মুখের বাক্যই আমার জন্য রক্ষা কবজ স্বরূপ হইয়াছে। তাহারা "মোজাম্মাম" নামের ব্যক্তিকে গালি দেয়, আমার ত ঐ নাম নহে ; আমার নাম ত "মোহাম্মদ"।

হযরতের "মোহাম্মদ" নাম আরশের গায়েও লেখা ছিল এবং হযরত মূছার উপর যে কেতাব অবতীর্ণ হইয়া ছিল "তৌরাত" সেই তৌরাত কেতাবেও যেখানে হযরতের আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করা হইয়াছে এবং হযরতের পরিচয় ও গুণাগুণ উল্লেখ করা হইয়াছে সেখানেও "মোহাম্মদ" নাম উল্লেখ হইয়াছে।

কা'বে আহ্বার যিনি তৌরাত কেতাবের বিশিষ্ট অভিজ্ঞ আলেম ছিলেন এবং তিনি তৌরাতের অভিজ্ঞতার প্রভাবেই ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফতের যুগে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই কা'বে আহ্বার হইতে "মোছনাদে দারামী" কেতাবের প্রথম পৃষ্ঠায় তিনটি রেওয়ায়েত উল্লেখ হইয়াছে—কা'বে আহ্বার বলিয়াছেন, তৌরাত কেতাবে স্পষ্ট ভাষায় লেখা ছিল, "মোহাম্মদ আল্লার রসুল হইবেন তাঁহার গুণাবলী ও পরিচয় এই এই হইবে।"

বিশেষতঃ তৃতীয় রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে যে, বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কা'বে আহ্বারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

كيف تجد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التوراة

"তৌরাত কেতাবে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরিচয় ও গুণাবলীর বিবরণ কিরূপ পাইয়াছেন?" কা'বে আহ্বার তদুত্তরে বলিয়াছেন—

نجده محمد بن عبد الله يولد بمكة ويهاجر الى طيبة ....

"আমরা তৌরাতে তাঁহার সম্পর্কে এই পাইয়াছি যে, তাঁহার নাম হইবে "মোহাম্মদ" আবদুল্লার পুত্র, মক্কায় জন্মগ্রহণ করিবেন, তায়বা তথা মদীনায় হিজরত করিবেন।"

"মোহাম্মদ" অর্থ চরম প্রসংশিত। সারা বিশ্ব এবং বিশ্বাধিপতি রববুল-আলামীন স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার প্রসংশা মুখর এবং তিনি সর্ব্বজনীন প্রসংশিত গুণাবলীতে পরিপূর্ণ হইবেন, তাই সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার জন্য আদিকাল হইতেই এই মহান নাম নির্ব্বাচিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক নবীজীর প্রসংশা পবিত্র কোরআনে অনেক রহিয়াছে। যথা—

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ * يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

"হে বিশ্ববাসী। তোমাদের নিকট আল্লার তরফ হইতে বিশেষ নূর আলো বা সত্যের দিশারী তথা রসুল মোহাম্মদ (দঃ) আসিয়াছেন এবং একটি সুস্পষ্ট কিতাব আসিয়াছে। সেই দিশারী এবং কিতাবের সাহায্যে আল্লাহ্-সন্তুষ্টির আসক্ত ব্যক্তিকে শান্তির পথে পরিচালিত করিবেন আল্লাহ্ তায়ালা এবং সকল প্রকার অন্ধকার মুক্ত করিয়া তাহাদিগকে আলোর দিকে নিয়া আসিবেন নিজ কৃপায় এবং তাহাদিগকে সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করিবেন (৬ পাঃ ৭ রুঃ)।"

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

"তোমাদের নিকট আসিয়াছেন এক রসুল তোমাদেরই শ্রেণীভুক্ত। তোমাদের ক্লেশ তাঁহার পক্ষে অসহনীয়, তোমাদের মঙ্গল ও কল্যাণের লালায়িত, ঈমানদারদের প্রতি অতিশয় মেহেরবান ও দয়ালু (১১ পাঃ ৪ রুঃ)।"

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ

"যাঁহারা অ ল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী তাঁহাদের জন্য রসুলুল্লাহ উত্তম আদর্শ ও নমুনা (২১ পাঃ ১৯ রুঃ)।"

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

"সারা জাহানের জন্য কল্যাণ ও মঙ্গলের বাহকরূপে এবং আমার আশির্বাদরূপে আপনাকে প্রেরণ করিয়াছি।"

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا * وَّدَاعِيًا إِلَى
اللّٰهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا

"হে নবীজী। আমি আপনাকে পাঠায়াছি—সত্যের মাপকাঠিরূপে, সুসংবাদ-দাতা এবং সতর্ককারীরূপে, আল্লার আদেশ মতে আল্লার প্রতি আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল আলোরূপে (২২ পাঃ ৩ রুঃ)।"

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ

"আমি আপনাকে সত্যের বাহকরূপে প্রেরণ করিয়াছি (২২ পাঃ ১৫ রুঃ)।"

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ *

"নিশ্চয় আপনি আমার রসুলগণের একজন এবং আপনি সত্য ও সরল পথের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত (২২ পাঃ ১৮ রুঃ)।"

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ
الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوحَى *

"শপথ করিয়া বলি, তোমাদের নবী সঠিক সত্য পথ হইতে চুল মাত্রও বিচ্যুত নহেন, ভ্রান্তির লেশমাত্র তাঁহার মধ্যে নাই। তিনি প্রবৃত্তির বশে কোন কথা বলেন না ; একমাত্র ওহীপ্রাপ্ত কথাই বলেন (২৭ পাঃ ৫ রুঃ)।"

إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

"নিশ্চয় নিশ্চয় আপনি চরিত্রের চরম উৎকর্ষের অধিকারী (২৯ পাঃ ৩ রুঃ)।"

এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বের আসমানী কেতাবেও আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক নবীজীর অনেক প্রশংসা বর্ণিত রহিয়াছে। যথা—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا وَّحِرْزًا لِّلْأُمِّيِّينَ
أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ
فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلٰكِنْ يَّعْفُو وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَّقْبِضَهُ
اللّٰهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَّقُولُوا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا

প্রতিশ্রুত নবীর জন্য আমার বাণী—

"হে নবী! আমি আপনাকে সত্য-মিথ্যার, হক্-বাতেলের মিমাংসাকারীরূপে পাঠাইয়াছি, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠাইয়াছি, শিক্ষা-দিক্ষাহীন লোকদের জন্যও মুক্তির দিশারীরূপে পাঠাইয়াছি। আপনি আমার বিশিষ্ট বন্দা ও আমার প্রেরিত রসুল। আপনার একটি বিশেষ গুণ আমার প্রতি ভরসা স্থাপন; উহার প্রতিক স্বরূপ আপনার এক নাম "মোতাওয়াক্কেল" রাখিলাম।

আমার এই নবী অত্যন্ত কোমল-হৃদয় বিনয়ী, অতি ভদ্র সভ্য ও সাধু, বাজারে যাইয়াও শালীনতার সহিত কথা বলেন—চেঁচাইয়া কথা বলেন না। খারাব ব্যবহারের উত্তর খারাব ব্যবহার দ্বারা দেন না—মাফ করেন ক্ষমা করেন।

আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া হইতে তাঁহার বিদায় মঞ্জুর করিবেন না যাবৎ না তাঁহার দ্বারা বাঁকা-বক্র সম্প্রদায়কে সোজা করেন যে, তাহারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর স্বীকারোক্তি করে এবং যাবৎ না এই কলেমার দ্বারা অন্ধ চোখে জ্যোতি সৃষ্টি করেন, বন্ধ কানকে খুলিয়া দেন, আবদ্ধ অন্তকরণকে উন্মুক্ত করেন। (মেশকাত শরীফ ৫১৬)

১৬৬২। হাদীছ ঃ—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ইহুদী আলেম নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট কয়েকটি দীনার স্বর্ণমুদ্রা পাইত; সে উহার তাগাদায় আসিল। নবী (দঃ) বলিলেন, এখন আমার নিকট তোমার ঋণ পরিশোধের কিছু নাই। ইহুদী বলিল, আমার ঋণ পরিশোধ না করা পর্য্যন্ত আমি আপনাকে ছাড়িব না—আপনার সঙ্গে জড়াইয়া থাকিব। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তবে আমি তোমার সঙ্গেই বসিয়া থাকিব; সেমতে হযরত (দঃ) ঐ ইহুদীর সঙ্গেই বসিয়া থাকিলেন, এমনকি জোহর, আছর, মগরেব ও এশার নামায ঐ অবস্থায়ই পড়িলেন। ছাহাবীগণ চুপি চুপি ঐ ইহুদীকে ভয় দেখাইতে ছিলেন এবং ধমকাইতে ছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহা অনুভব করিতে পারিলেন; ছাহাবীগণ (ভাবিলেন, হযরত তাঁহাদের প্রতি রাগ হইবেন, তাই তাঁহারা) বলিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! এক ইহুদী আপনাকে আটকাইয়া রাখিবে? হযরত (দঃ) বলিলেন, অমোসলেম প্রজার প্রতিও অন্যায় করিতে আমার পরওয়ারদেগার আমাকে নিষেধ করিয়াছেন।

পর দিন এই অবস্থায়ই অনেক বেলা হইলে ইহুদী ব্যক্তি কলেমা শাহাদৎ পড়িয়া মোসলমান হইয়া গেল এবং বলিল, আমার অর্দ্ধেক ধন-সম্পত্তি আল্লার রাস্তায় দান করিলাম। সে আরও বলিল, আমি আপনার সঙ্গে যে ব্যবহার করিয়াছি তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তায়ালা আপনার যে প্রশংসা তৌরাত কেতাবে করিয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষ করা যে—"তিনি মোহাম্মদ—পিতা আবদুল্লাহ, তাঁহার

জন্মস্থান মক্কায়, হিজরতের দেশ "তায়বা" তাঁহার রাজ্য অচিরেই সিরিয়া পর্য্যন্ত পৌঁছিবে। তিনি কঠোর প্রকৃতির এবং রুক্ষ মেজাযের হইবেন না। (ভদ্র ও সভ্য-শালীন হইবেন যে,) বাজারেও চেঁচাইয়া কথা বলিবেন না। অশ্লীল আচার-ব্যবহার ও অশ্লীল কথা হইতেও পাক-পবিত্র হইবেন।" এই বলিয়া সে পুনরায় স্বীকৃতি ঘোষণা করিল, আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই এবং নিশ্চয় আপনি আল্লার রসুল। ঐ ইহুদী বড় ধনাট্য ছিল ; তাহার সমুদয় মাল হযরতের অধীনে দিয়া দিল যে, আপনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করুন। (মেশকাত শরীফ ৫২১)

সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রশংসার চুড়ান্ত করিয়া দিয়াছেন যখন তিনি স্বয়ং তাঁহারই সৃষ্টি মোহাম্মদ (দঃ)কে স্বীয় "হাবিব" বা বন্ধু ও দোস্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শিল্পী যখন কোন একটি বিশেষ বস্তুকে তাঁহার পছন্দনীয় সমুদয় গুণ-গরিমা মাধুরী-সুষমা মিশাইয়া নিখুঁতভাবে গড়ায় এবং উহা তাঁহার মনোমত ও মনোপূত হয় তখনই সে তাঁহারই হাতে গড়ান বস্তুটিকে ভাল বাসেন উহার প্রতি তাঁহার আকর্ষণ ও আসক্তি জন্মে। সুতরাং কোন শিল্প-বস্তুর প্রতি স্বয়ং শিল্পীর ভালবাসা ও আকর্ষণ শিল্পী কর্ত্তৃক উক্ত বস্তুর চরম প্রশংসা এবং উহাকে সর্ব্বোচ্চ সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বদানের মহা সনদই বটে।

বিশ্বশিল্পী সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়লা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)কে এমন ভালবাসিয়াছেন যে, তাঁহাকে "হাবিবুল্লাহ" আল্লার বন্ধু বা দোস্ত আখ্যা দিয়াছেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—

إِنِّىْ قَائِلٌ قَوْلاً غَيْرَ فَخْرٍ إِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ اللهِ...... وَأَنَا حَبِيْبُ اللهِ

"আমি একটি তথ্য প্রকাশ করিতেছি—গর্ব করার উদ্দেশ্যে নয়, ইব্রাহীম (আঃ) "খলীলুল্লাহ অর্থাৎ আল্লার সঙ্গে দোস্তি করিয়াছেন, আর আমি "হাবিবুল্লাহ" অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ আমার সঙ্গে দোস্তি করিয়াছেন—আমাকে দোস্ত বানাইয়াছেন।"

মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)কে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসিয়াছেন—চরম ভালবাসা দিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি তাঁহার আকার-আকৃতি তথা অনুসরণ অনুকরণ অবলম্বন করিলে আল্লাহ তায়ালা তাহাকেও ভালবাসিবেন। এই তথ্য স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা দিয়াছেন—

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ

"হে আমার প্রিয় নবী। আপনি বিশ্ববাসীকে বলিয়া দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ অনুকরণ অবলম্বন কর ; তাহা হইলে স্বয়ং আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন (৩ পাঃ ১২ রুঃ)।

এই আয়াতের মর্ম্ম হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে আসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ তায়ালার চরম ভালবাসার পাত্র হওয়ার এক উজ্জল প্রমান ; আর ইহাই হইল আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক প্রশংসিত হওয়ার মহা সনদ।

হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অনুসরণ অনুকরণ অবলম্বনে যে কেহ ধন্য হইতে পারিবে সে-ই আল্লাহ তায়ালার ভালবাসার পাত্র হইবে, অতএব স্বয়ং মোহাম্মদ (দঃ) যে আল্লাহ তায়ালার কিরূপ ভালবাসার পাত্র তাহা পরিমাণ করা যাইতে পারিবে কি ? আর সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক এইরূপ ভালবাসা দান ইহা তাঁহার চরম প্রশংসা।

আল্লাহ তায়ালা আদর ও সোহাগ করিয়া নিজের "মাহ্‌মুদ" নামের ধাতু হইতে "মোহাম্মদ" নামকে বাহির করিয়াছেন। এস্থলে আদর ও সোহাগের কি বিচিত্রময় বিকাশ যে, "মাহ্‌মুদ" অর্থ প্রশংসিত এবং "মোহাম্মদ" অর্থ চরম প্রশংসিত।

এই বাক্যটিই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কবি—বিশিষ্ট ছাহাবী হাচ্ছান (রাঃ) কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন—

وَشَقَّ لَهُ مِنْ اِسْمِهِ لِيُجِلَّهُ * فَذُوالْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهٰذَا مُحَمَّدٌ

আল্লাহ (আদর ও সোহাগ করিয়া) নিজের নাম হইতে তাঁহার নামকে বাহির করিয়াছেন, অধিকন্তু মহান আরশের অধিপতি (আল্লাহ্) হইলেন "মাহ্‌মুদ" নামের (যাহার অর্থ প্রশংসিত) এবং হযরতে নাম হইল "মোহাম্মদ" (যাহার অর্থ চরম প্রশংসিত)*

---

* আদর ও সোহাগ ভরা "মোহাম্মদ" নামের বিশ্লেষণে কবি হাচ্ছান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উল্লেখিত উক্তিও আল্লাহ তায়ালার নিকট অতি মকবুল ও পছন্দনীয় হইয়াছে। এমন কি এক বিশিষ্ট বুজুর্গ বলিয়াছেন, উল্লেখিত বয়াতটির নিম্নের অঙ্কিত নকৃশা একটি কাগজ খণ্ডে লিখিয়া সন্তান প্রসবকালীন বিপদগ্রস্ত প্রসূতির গলায় লটকাইয়া দিলে, তাহার উপর আল্লার রহমত নামিয়া আসিবে এবং সহজ ও সরল ভাবে সন্তান প্রসব করিবে। নক্‌শাটি এই—
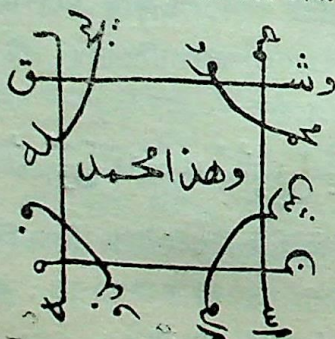
হযরতের অন্যতম দ্বিতীয় নাম হইল "আহমদ"। ইঞ্জিল কেতাবে এবং হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের মুখে তিনি এই নামেই অধিক ব্যক্ত হইয়াছেন, যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) ঘোষণা দিয়া থাকিতেন, "আমার পরে এক নবী আসিতেছেন তাঁহার নাম হইবে আহমদ।"

"আহমদ" অর্থ সর্ব্বাধিক প্রশংসাকারী। আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থানের অধিকারী তিনি হইবেন, তাই আদি হইতেই তাঁহাকে "আহমদ" নামে ভূষিত করা হইয়াছিল।

এই দুইটি প্রসিদ্ধ নাম ছাড়া হযরতের আরও গুণবাচক অনেক নাম আছে, তন্মধ্যে আলোচ্য হাদীছে তিনটি নামের উল্লেখ আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহার তাৎপর্য্যও বর্ণিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন হযরতের আরও অনেক নাম প্রচলিত আছে, যথা—"মোতাওয়াক্কেল" অর্থ আল্লার প্রতি ভরসা স্থাপনকারী। আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভরসা স্থাপনের গুণটি নবীজীর মধ্যে যে পরিমাণ ছিল তাহার পরিমাপও অন্যের জন্য সম্ভব নয়। একটি ঘটনাদৃষ্টে সামান্য অনুমান করা যায়। মক্কা হইতে মদিনায় হিজরত ছফরে নবীজী (দঃ) আবুবকর (রাঃ) সহ "ছওর" পর্ব্বত গুহায় লুকায়িত আছেন; মক্কার রক্ত-পিপাসু শত্রুদল তাঁহাদের খোঁজ করিতে করিতে ঠিক সেই গুহার কিনারায় আসিয়া পৌছিয়াছে। এমনকি গুহার ভিতরস্থ আবুবকরের দৃষ্টিতে ঐ শত্রুদের পা পরিদৃষ্ট হইতেছে। আবুবকর (রাঃ) বিচলিত হইয়াছেন; তিনি বলিতেছেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! শত্রুরা নিজ পায়ের দিকে তাকাইলেই আমাদিগকে দেখিয়া ফেলিবে। সেই মুহূর্ত্তেও নবীজী বলিতেছেন, لا تحزن ان الله معنا "বিচলিত হইও না; আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন" (কোরআন শরীফ)। নবীজীর এই নামটি (অর্থাৎ মোতাওয়াক্কেল) পূর্ব্বের আসমানী কেতাব তৌরাতেও উল্লেখ ছিল।

"আমীন" অর্থ শান্তিকামী বিশ্বস্ত। স্থষ্টিকর্ত্তা ও সৃষ্ট সকলেরই তিনি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল ছিলেন। "বশীর" অর্থ সুসংবাদ দানকারী মোমেনকে বেহেশতের, "নাজীর" সতর্ককারী আল্লার আজাব হইতে। "আবদুল্লাহ" আল্লাহ তায়ালার বিশিষ্ট বন্দা; পবিত্র কোরআনে ছুরা জিন্-এর মধ্যে এই নামটি স্পষ্টরূপে উল্লেখ আছে। আব্‌দিয়ত তথা আল্লার দরবারে আত্মনিবেদিত হওয়া ইহা নবীজীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। "ছাইয়্যেদ" অর্থ সর্দার বা প্রধান; নবীজী নিখিল স্থষ্টির প্রধান, নবী ও রসুলগণের প্রধান। "মোকাফ্‌ফা" অর্থ সর্ব্বশেষে প্রেরিত; হযরত মোহাম্মদ (দঃ) সর্ব্বশেষ পয়গাম্বর ছিলেন। "নবী-উত্‌-তওবা" অর্থ তওবার নবী; নবীজী গোনাহমুক্ত হওয়া সত্বেও তওবা করা অতি ভালবাসিতেন। হযরত (দঃ) বলিতেন, হে লোক সকল! তোমরা প্রভু-পরওয়ারদেগারের দরবারে তওবা করিও;

আমিও প্রতিদিন একশত বার তওবা করিয়া থাকি। নবীজীর সম্মানে তাঁহার উম্মতের তওবা পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মতগণের তুলনায় অধিক এবং শীঘ্র ও সহজে কবুল হইয়া থাকে। "নবী-উল-মাল্‌হামাহ্" অর্থ জেহাদী নবী; হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এবং তাঁহার উম্মতের ন্যায় এত অধিক জেহাদ আর কোন নবী এবং তাঁহার উম্মতের দ্বারা হয় নাই। "ছেরাজুম-মুনীর" অর্থ দীপ্ত সূর্য্য; কুফরী, শেরেকী ও গোমরাহীর অন্ধকার দূর করণে নবীজী (দঃ) দীপ্ত সূর্য্য অপেক্ষা অধিক ভাস্বর ছিলেন।

এতদ্ভিন্ন আল্লাহ তায়ালার গুণবাচক নাম হইতে কোন কোন নাম নবীজীর জন্য পবিত্র কোরআনে উল্লেখ হইয়াছে। যথা—"রউফ" অর্থ অতিশয় স্নেহশীল, "রহীম" অর্থ অতিশয় দয়ালু।

হযরতের উপনাম (৫০১ পৃঃ)

১৬৬৩। হাদীছ ঃ— عن انس رضى الله تعالى عنه قال

كان النبى صلى الله عليه وسلم فى السوق فقال رجل يا ابا القاسم

فالتفت اليه النبى صلى الله عليه وسلم فقال (لم اعنك) انما

دعوت هذا فقال النبى صلى الله عليه وسلم سموا باسمى

ولا تكنوا بكنيتى -

অর্থ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বাজারে ছিলেন। তথায় এক ব্যক্তি "হে আবুল কাসেম!" বলিয়া (কোন ব্যক্তিকে) ডাকিল। হযরত নবী (দঃ) (যেহেতু আবুল কাসেম নামে পরিচিত ছিলেন, তাই তিনি) পেছন দিকে তাকাইলেন। ঐ ব্যক্তি আরজ করিল, আমি ত (আবুল কাসেম বলিয়া) আপনাকে উদ্দেশ্য করি নাই আমি ঐ (অপর) ব্যক্তিকে ডাকিয়াছি। তখন হযরত নবী (দঃ) বলিলেন, তোমরা আমার আসল নামের অনুকরণে নাম রাখিতে পারিবে, কিন্তু আমার যে উপনাম আছে অন্য কেহ সেই উপনাম অবলম্বন করিতে পারিবে না।

১৬৬৪। হাদীছ ঃ— عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه

قال النبى صلى الله عليه وسلم سموا باسمى ولا تكنوا بكنيتى

فانما انا قاسم اقسم بينكم -

অর্থ—জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার আসল নামের অনুকরণে তোমরা নাম রাখিতে পার, কিন্তু আমার উপনামের অনুকরণে উপনাম অবলম্বন করিও না। কারণ, (আমার উপনাম "আবুল কাসেম" যাহার অর্থ বণ্টনাধার—আল্লাহ তায়ালার কল্যাণ ও মঙ্গল ভাণ্ডারকে) আমি তোমাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া থাকি। (৯১৫ পৃঃ)

ব্যাখ্যা—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি প্রসিদ্ধ উপনাম ছিল "আবুল কাসেম" যাহার শব্দার্থ—কাসেম তথা বণ্টনকারীর পিতা। এই উপনামের একটি সাধারণ সূত্র এই ছিল যে, হযরতের বড় ছেলের নাম "কাসেম" ছিল, অতএব তিনি আবুল কাসেম—কাসেমের পিতা ছিলেন। এই সূত্রেই ইহুদী-নাছারারা হযরত (দঃ)কে আবুল কাসেম বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকিত।

কিন্তু স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ণনায় দেখা যায়, তাঁহার এই উপনাম শুধু উহার শাব্দিক অর্থ—কাসেমের পিতা হওয়া সূত্রেই ছিল না, বরং এই উপনামের মধ্যে হযরতের একটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ গুণের প্রকাশও ছিল। "আবুল কাসেম" অর্থ বিতরণকারী; দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণ ও মঙ্গলের যে ভাণ্ডার আল্লাহ তায়ালা হযরতকে দান করিয়া ছিলেন তাহা তিনি আল্লার বন্দাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া থাকিতেন যদ্বারা তিনি رحمة للعلمين, রাহ্‌মাতুল্‌-লিল-আ'লামীন তথা সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য রহমত বা কল্যাণ ও মঙ্গলের উৎস ছিলেন। এমন কি তাঁহার এই গুণটি তাঁহার একটি বিশেষ নামরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই রাহ্‌মাতুল-লিল-আ'লামীন গুণ বা নামেরই একটি বিশেষ অধ্যায় "আবুল কাসেম" উপনামে ব্যক্ত ও প্রকাশ হইয়াছে।

হযরত (দঃ) তাঁহার নামের অনুকরণে নাম রাখার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উপনাম অবলম্বনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়া ছিলেন, যাহার আসল কারণ এই যে, অনেকে বিশেষতঃ ইহুদি-নাছারাগণ এবং তাহাদের দেখা দেখি নবাগত লোকগণ সাধারণতঃ হযরত (দঃ) কে আবুল কাসেম বলিয়া সম্বোধন করিত। এমতাবস্থায় যদি অন্য কাহারও এই নাম থাকে, তবে যখন তাহাকে সম্বোধন করা হইবে তখন স্থান বিশেষে অযথা হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের লক্ষ্য ও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে এবং তিনি বিব্রত হইবেন। তাই উক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হইয়াছিল। কিন্তু মদিনায় ইছলামের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় হযরতকে সাধারণতঃ তাঁহার আসল নামে কেহ সম্বোধন করিত না, তাই ঐ নামে সম্বোধনের বেলায় বিব্রত হওয়ার কোন কারণ ছিল না, সুতরাং ঐ নামের অনুকরণে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয় নাই। এই সূত্রেই অধিকাংশ আলেমগণের মতে "আবুল কাসেম"

নাম অবলম্বনের নিষেধাজ্ঞা হযরতের জীবন কাল পর্য্যন্ত বলবৎ ছিল, তাঁহার পরে সেই নিষেধাজ্ঞা রহিত হইয়া গিয়াছে।

হযরতের দুগ্ধ পানঃ

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হযরত (দঃ) সাত বা নয় দিন স্বীয় মাতা বিবি আমেনার দুগ্ধ পান করিয়া ছিলেন। অতঃপর আবু লাহাবের ক্রীতদাসী "ছুওয়াইবাহ্" মাত্র কতিপয় দিন দুগ্ধ পান করাইয়া ছিলেন; স্থায়ী ধাত্রীর অপেক্ষায় ইহা অস্থায়ী ব্যবস্থা ছিল। ইতিমধ্যেই আরবের প্রথানুযায়ী সায়াদ গোত্রীয় ধাত্রী রমণীদের একটি দল মক্কায় পৌঁছিল; তাহাদের মধ্যে ভাগ্যবতী হালিমাও ছিলেন। বিবি হালিমার নিজ বর্ণনা—

আমি আমার সায়াদ গোত্রীয় ধাত্রী মহিলাদের সহিত দুগ্ধপোষ্য শিশুর সন্ধানে মক্কাপানে যাত্রা করিলাম। এই বৎসর আমাদের অঞ্চলে অভাব ছিল; অনাহারে আমার দুধ খুবই কম হইয়া গিয়াছিল। আমার নিজের যে একটি ছেলে সন্তান ছিল তাহার জন্যই আমার দুধ যথেষ্ট হইত না; ক্ষুধায় সে কাঁদিত; তাহার কান্নায় আমাদের নিদ্রাও পূর্ণ হইত না। আমাদের একটি উট ছিল ঘাসের অভাবে উহারও দুধ ছিল না। এতদসত্বেও অভাবের তাড়নায় আমাকে ধাত্রী ব্যবসায় নামিতে হইল। আমি একটি গাধার উপর আরোহণ করিয়া ছিলাম, গাধাটিও ক্ষীণ এবং দুর্ব্বল ছিল; সঙ্গীদের সহিত চলিতে পারিত না; বহু কষ্টে মক্কায় পৌঁছিতে সক্ষম হইলাম।

ধাত্রী মহিলারা হযরত মোহাম্মদ (দঃ) এতিম শুনিয়া কেহই তাঁহাকে গ্রহণ করিল না। এদিকে বিবি হালিমার দুধ কম দেখিয়া কেহই তাহাকে শিশু দিল না। হালিমার দুগ্ধ কম হওয়াই তাঁহার সৌভাগ্য-নক্ষত্র উদিত হওয়ার কারণ হইল।

হালিমার বর্ণনা—আমি আমার স্বামীকে বলিলাম, খালি-হাত বাড়ী যাওয়া অপেক্ষা ঐ এতিম শিশুটিকে নিয়া যাওয়া উত্তম। স্বামীর মতামতও তাহাই হইল; সে মতে আমি এতিম মোহাম্মদকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) আমার অবস্থান জায়গায় নিয়া আসিলাম। তাঁহাকে দুধ পান করাইতে বসিয়াই বরকত-মঙ্গল ও কল্যাণের আগমন দেখিতে পাইলাম। আমার বুকে দুধের জোয়ার আসিয়া গেল; তিনি এবং আমার ছেলে উভয়েই পূর্ণ তৃপ্ত হইয়া দুধ পান করিল। আমাদের সঙ্গে যে শুষ্ক দুর্ব্বল উটটি ছিল উহাকেও দেখিলাম, উহার কুচ দুধে ভরিয়া বড় হইয়া গিয়াছে। আমার স্বামী উহার দুধ দোহাইয়া আনিলেন; আমরা সকলে উহা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। আজ আমরা দীর্ঘ দিন পর রাত্রে শান্তির নিদ্রা উপভোগ করিলাম। এখন আমার স্বামীও বলিতে লাগিলেন, শিশুটি ত অত্যন্ত কল্যাণ ও মঙ্গলময় দেখা যাইতেছে।

আমরা শিশুকে লইয়া মক্কা হইতে যাত্রা করিলাম ; এইবার আমার যানবাহন গাধাটি এত দ্রুতগামী হইয়া গেল যে সঙ্গীদের কাহারও বাহন উহার সঙ্গে চলিতে সক্ষম নয়। এমনকি এই অবস্থা দৃষ্টে সঙ্গীগণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ইহা কি তোমার পূর্ব্বের যানবাহনটিই ?

আমরা ঐ শিশুকে লইয়া গৃহে পৌঁছিলাম ; দেশে তখন ভয়াবহ অনাবৃষ্টি এবং অভাব ছিল ; পশুর দুগ্ধ পর্য্যন্ত ছিল না। কিন্তু আমি বাড়ী আসিবার সঙ্গে সঙ্গে আমার বকরীগুলি দুধে পূর্ণ হইয়া গেল ; প্রতিদিন আমার বকরীদল মাঠ হইতে দুধে পরিপূর্ণ অবস্থায় ফিরিয়া আসে ; অন্যদের বকরীতে মোটেই দুধ হয় না। দেশীয় লোকগণ তাহাদের রাখালদেরকে বলিয়া দিত, হালিমার বকরীদল যথায় চরে আমাদের পশুপাল তথায়ই চরাইও। কিন্তু একই স্থানে চরা সত্ত্বেও অবস্থা ঐরূপই হইত। দুগ্ধ পানের দুইটি বৎসর পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত আমরা এইরূপ বরকত, মঙ্গল ও কল্যাণ সর্ব্বদাই উপভোগ করিয়াছি। (সীরতে খাতেমুল আম্বিয়া ২৭)

দুই বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর সাধারণ নিয়মানুসারে বালক মোহাম্মদ (দঃ)কে লইয়া আমি তাঁহার মাতার নিকট উপস্থিত হইলাম। কিন্তু শিশুর বরকত, মঙ্গল ও কল্যাণ দৃষ্টে আমার মন তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে রাজি ছিল না। ঘটনাক্রমে ঐ সময় মক্কায় প্লেগের মহামারি ছিল ; আমার একটু সুযোগ হইল ; আমি বিবি আমেনাকে বুঝাইলাম, এখন শিশুকে মক্কায় রাখা ভাল হইবে না ; তিনি শিশুকে পুনরায় আমার নিকট রাখিতে সম্মত হইলেন ; তাঁহাকে লইয়া আমি আমার দেশে পুনঃ পৌঁছিলাম।

একদা বালক মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার দুধভাই এর সঙ্গে গৃহের নিকটবর্ত্তীই পশুপালের রাখালীতে ছিলেন হঠাৎ দুধভ্রাতা দৌড়িয়া আসিল এবং আমার নিকট ও তাহার পিতার নিকট বলিল, আমার কোরায়শী ভাইকে সাদা পোশাক পরিহিত দুই ব্যক্তি ধরাশায়ী করিয়া তাহার পেট ফাড়িয়া ফেলিয়াছে ; আমি তাহাকে এই অবস্থায়ই রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছি।

এই সংবাদে আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে দৌড়িয়া ছুটিলাম ; আমরা যাইয়া দেখি বালক মোহাম্মদ (দঃ) ভীত অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, বাবা কি ঘটনা ? তিনি বলিলেন সাদা পোশাকের দুই ব্যক্তি আমাকে শায়িত করিয়া আমার বক্ষ চিরিয়াছে এবং কি যেন তালাশ করিয়া বাহির করিয়াছে—আমি তাহা পূর্ণ জ্ঞাত নহি। আমরা তাহাকে বাড়ী নিয়া আসিলাম। স্বামী আমাকে বলিলেন, হালিমা! মনে হয় বালকটির উপর জ্বীনের আছর হইয়াছে ; খবর প্রচারিত হওয়ার পূর্বেই তাহাকে তাহার মাতার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া আস। সেমতে আমি বিলম্ব না করিয়া তাহাকে লইয়া তাহার মাতার নিকট পৌঁছিলাম।

বিবি আমেনা জিজ্ঞাসা করিলেন, এত অনুরোধ করিয়া পুনঃ নেওয়ার পর নিজেই ফিরাইয়া আনিলে কেন? আমি বলিলাম, এখন বুঝ-জ্ঞানের হইয়াছে আমারও যাহা করার করিয়াছি তাই এখন নিয়া আসিয়াছি। বিবি আমেনা বলিলেন, ব্যাপার ইহা নয়; সত্য বল। তখন আমি সব ঘটনা খুলিয়া বলিলাম। বিবি আমেনা বলিলেন, তোমার আশঙ্কা—তাহার উপর ভূতের আছর হইয়াছে? খোদার কসম—এই ছেলের উপর কস্মিনকালেও তাহা হইতে পারে না। আমার ছেলের অনেক অবস্থাই অতি অসাধারণ, এই বলিয়া বিবি আমেনা গর্ভাবস্থার এবং ভূমিষ্ট হওয়াকালের অনেক ঘটনা শুনাইলেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা ছিল "শক্কে-ছদর" বা বক্ষ বিদারণ; যাহার বিস্তারিত বিবরণ এক বিশেষ শিরোনামায় বর্ণিত হইবে। ইহা হযরতের এক বিশেষ মোজেযা। এই বারের বক্ষবিদারণই হযরতের সর্ব্বপ্রথম "শক্কে-ছদর" ছিল; এই সময় হযরতের বয়স কত ছিল সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইহা ঘটিয়াছিল কাহারও মতে তৃতীয় বৎসরে কাহারও মতে চতুর্থ বৎসরে, কাহারও মতে পঞ্চম বৎসরে। তবে ইহা সর্ব্ব সম্মত কথা যে, এই ঘটনা বিবি হালিমার নিকট থাকাবস্থায় ঘটিয়া ছিল এবং এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়াই বিবি হালিমা হযরত (দঃ) কে তাঁহার মাতার নিকট প্রত্যার্পণ করিয়া ছিলেন (যোরকানী, ১—১৫০)।

এই সম্পর্কে একটি হাদীছও আছে—

হাদীছ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) বাল্যাবস্থায় বালকদের সহিত খেলায় ছিলেন; এমতাবস্থায় জিব্রায়ীল তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে শায়িত করিলেন এবং তাঁহার বুক চিরিয়া তাঁহার হৃদপিণ্ড বাহির করিলেন। অতঃপর হৃদপিণ্ড (কাটিয়া উহা) হইতে জমাট রক্তখণ্ড বাহির করিলেন এবং বলিলেন, আপনার দেহের মধ্যে যে, শয়তানের অংশ ছিল তাহা ইহা। অতঃপর জিব্রায়ীল ঐ হৃদপিণ্ডকে স্বর্ণের তশ্‌তরিতে রাখিয়া যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করিলেন। তারপর কাটা হৃদপিণ্ডটি জোড়া লাগাইয়া দিলেন এবং যথাস্থানে উহাকে পুনঃস্থাপন করিয়া দিলেন।

এই সময় বালকগণ দৌড়িয়া নবীজীর দুধমাতার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, মোহাম্মদকে হত্যা করিয়া ফেলা হইয়াছে। তাহারা সকলে বালক নবীজীর নিকট পৌঁছিল; তখন নবীজীর চেহারা বিবর্ণ ছিল।

আনাছ (রাঃ) আরও বর্ণনা করিয়াছেন, নবীজীর বক্ষে আমি সিলায়ের চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া থাকিতাম। (মোসলেম শঃ, মেরাজ বর্ণনার সংলগ্নে)

উক্ত ঘটনা যে বিবি হালিমার গৃহে অবস্থানকালে নবীজীর বাল্যাবস্থার ছিল, দ্বিতীয় প্যারায় তাহা স্পষ্টই উল্লেখ রহিয়াছে।*

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—হযরতের প্রথম দুধমাতা "ছুওয়াইবাহ" হযরতের চাচা আবু লাহাবের ক্রীতদাসী ছিলেন। হযরত (দঃ) ভূমিষ্ট হইলে এই ছুওয়াইবাহ দৌড়িয়া যাইয়া আবু লাহাবকে ভাতিজা ভূমিষ্ট হওয়ার সুসংবাদ শুনাইয়াছিলেন। আবু লাহাব আনন্দিত হইয়া এই সুসংবাদ দানের পুরস্কার স্বরূপ তৎক্ষণাৎ ছুওয়াইবাহকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। আবু লাহাব তখন হযরতের বাস্তব পরিচয়ের কোন খোঁজ রাখিত না এবং সে ছিল কাফের, তবুও হযরতের ভূমিষ্ট হওয়ায় আনন্দিত হইয়া যে শ্রদ্ধা দেখাইল উহার অতি বড় সুফলের অধিকারী সে চিরকালের জন্য হইয়া রহিয়াছে।

---

* **সমালোচনা :**—সীরাত সঙ্কলনে কলম ধরিলেই অস্বাভাবিক ঘটনাবলীর আলোচনা আসে। কারণ, নবীগণের ব্যক্তিত্ব ছিল অতি অসাধারণ; নবীগণের নবী নবীজী মোস্তফার কথা ত আরও একধাপ উর্দ্ধে। আর আল্লাহ তায়ালার কুদরত ত অসীম। কিন্তু কোন অস্বাভাবিক ঘটনার আলোচনা আসিলেই বিশেষ বাতিক ব্যাধিগ্রস্ত মরহুম খাঁ সাহেবের ভীতি সৃষ্টি হয় যে, মোস্তফা-চরিতে এই সম্পর্কে নিশ্চয় গোলমাল করা হইয়া থাকিবে।

ইসলামের দুই ভিত্তি কোরআন ও সুন্নাহ; সুন্নাহ তথা হাদীছের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দুই কেতাব —বোখারী শরীফ ও মোসলেম শরীফ। নবীজী মোস্তফার শকে-ছদর বা বক্ষ বিদারণ মে'রাজ ভ্রমণ উপলক্ষে যে হইয়াছিল উহার বর্ণনা ত বোখারী শরীফেও রহিয়াছে, আর আলোচ্য ঘটনার বর্ণনা মোছলেম শরীফে রহিয়াছে—যাহার বিস্তারিত বিবরণ আপনাদের সম্মুখে।

মোস্তফা-চরিতে এই বিবরণটার উদ্ধৃতি দেওয়ার পর বলা হইয়াছে—"যাহা হউক বিবি হালিমার গৃহে অবস্থানকালে ফেরেশতাগণ হযরতের বক্ষ বিদারণ করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদিগের কথকগণ যে গল্পটী বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সহিত সত্যের কোনই সম্বন্ধ নাই (২০৩ পৃঃ)।

পাঠক! মোসলেম শরীফের উল্লেখিত হাদীছটির মূল বর্ণনাকারী হইলেন "ছাহাবী আনাছ (রাঃ)" যিনি দীর্ঘ দশ বৎসরকাল দিবা-রাত্র, ভ্রমণে অবস্থানে সর্ব্বদা নবীজী মোস্তফার খাদেম ও সেবকরূপে তাঁহার সঙ্গে থাকিয়াছেন। তাঁহার হইতে বর্ণনাকারী হইলেন বিশিষ্ট তাবেয়ী "ছাবেৎ বুনানী (রঃ)" যিনি দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ছাহাবী আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সাহচর্য্যে থাকিয়াছেন, বছরা এলাকার সুপ্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ ও নির্ভরশীল ব্যক্তি ছিলেন তিনি, নবীজী মোস্তফার তিরোধানের মাত্র ২৭ বৎসর পরে তাঁহার জন্ম। তাঁহার হইতে বর্ণনাকারী হইলেন বিশিষ্ট তাবেয়ী "হাম্মাদ ইবনে ছালামা (রঃ)" তিনিও বছরা এলাকার বিশিষ্ট আলেম দেশ-বরণ্য মোহাদ্দেছ ছিলেন, অত্যধিক এবাদৎ-বন্দেগী ও ছুন্নতের তাবেদারীতে তিনি অদ্বিতীয়রূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন, নবীজীর শতাব্দিতেই তাঁহার জন্ম। তাঁহার হইতে বর্ণনাকারী

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

বর্ণিত আছে, আবুলাহাবের মৃত্যুর এক বৎসর পর হযরতের অপর চাচা আব্বাস তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া হাল-অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। আবুলাহাব বলিল, দোযখের শাস্তি ভোগ করিতেছি; অবশ্য প্রতি সোমবার রাত্রে আমার দুইটি আঙ্গুলের মধ্য হইতে একটু পানীয় পাইয়া থাকি যাহাতে আমার কষ্টের অনেক লাঘব ঘটে। আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্মের সুসংবাদ দানের উপর ছুওয়াইবাহকে এই আঙ্গুলদ্বয়ের ইশারায় মুক্ত করিয়া ছিলাম; তাহারই সুফল ও প্রতিদানে আমি উহা লাভ করিয়া থাকি। (মূল ঘটনাটির বর্ণনা বোখারী শরীফ ৩ পৃষ্ঠায় আছে; যোরকানী, ১—১৩৮)।

হইলেন ইমাম বোখারী ইমাম মোছলেম ইত্যাদি বড় বড় মোহাদ্দেছগণের ওস্তাদ "শায়বান (রঃ)"; আর তাঁহার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ইমাম মোছলেম (রঃ)।

দেখা গেল—আলোচ্য হাদীছখানা প্রসিদ্ধ ছহীহ মোছলেম শরীফে স্থান লাভ করিয়াছে চারজন অতি মহান লোকের সাক্ষ্য-সূত্রে এবং পঞ্চম জনই হইলেন ইমাম মোছলেম। আনাছ (রাঃ), ছাবেৎ বুনানী (রঃ), হাম্মাদ (রঃ), শায়বান (রঃ), ইমাম মোছলেম (রঃ)—এই পাক-পঞ্চতন পবিত্রাত্মা মহান লোকগণকে "আমাদের কথকগণ" বলিয়া কটাক্ষ ও হেয় প্রতিপন্ন করা এবং তাঁহাদের বর্ণিত হাদীছকে "তাহার সহিত সত্যের কোনই সম্বন্ধ নাই" বলা এবং ছহীহ মোসলেম শরীফের হাদীছকে "গল্প" বলা এবং "তাহার সহিত সত্যের কোন সম্বন্ধ নাই" বলা—এই সব ধৃষ্টতার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশে মোস্তফা-চরিতের ন্যায় সঙ্কলনের প্রতি ক্ষুব্ধ হইলে এবং এই শ্রেণীর কুউক্তিকারকের মুখে থুথু দিলে তাহা অসংগত হইবে কি?

আলোচ্য ঐতিহাসিক সত্যটিকে অস্বীকার করার জন্য মোস্তফা-চরিতে যে সব প্রলাপ করা হইয়াছে এবং যে সব মিথ্যার আশ্রয় লওয়া হইয়াছে তাহা আরও আশ্চর্য্যজনক এবং জঘন্য। যথা—বোখারী শরীফ সহ সমস্ত হাদীছের কেতাবে বর্ণিত মেরাজ ভ্রমণ উপলক্ষে নবীজীর ৫১ বৎসর বয়সে বক্ষ বিদারণ ঘটনার বর্ণনা এবং বিবি হালিমার গৃহে ৪ বৎসর বয়সের ঐরূপ ঘটনার বর্ণনা—এত অধিক ব্যবধানের ভিন্ন ভিন্ন দুইটি ঘটনাকে আকার-আকৃতির সামঞ্জস্যতার কারণে এক ঘটনা গণ্য করা পূর্ব্বক শুধু বর্ণনার গরমিল ঠাওরানো—যেরূপ মোস্তফা চরিতে বলা হইয়াছে, "অসতর্ক রাবীদিগের কল্যাণে মেরাজ সংক্রান্ত—বিবরণটি নানা অত্যাচারের পর বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র" (২০৩ পৃঃ)। এই উক্তিকে পাগলের প্রলাপ বৈ কি বলা যায়?

অপর একটি গরমিলের কাহিনী ত আরও হাস্যকর। তিনটি ঘটনা—(১) বিবি হালিমার গৃহে বাল্যকালে ৪ বৎসর বয়সে বক্ষ-বিদারণ (২) নবুয়ত প্রাপ্তির পর মেরাজ উপলক্ষে ৫১ বৎসর বয়সে বক্ষ বিদারণ (উভয় ঘটনা জাগ্রত অবস্থায়), আর (৩) ৪০ বৎসর বয়সে নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্বে বাস্তব ও মূল মেরাজ ঘটনার অনুরূপ স্বপ্ন দর্শন যাহার বিস্তারিত বিবরণ মেরাজ আলোচনায় আসিবে; এই ঘটনাটি স্বপ্নযোগের ছিল এবং মূল মেরাজ ঘটনার অবিকল

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

হযরত (দঃ) পরবর্ত্তীকালে মাত্র অল্পদিনের দুধমাতা এই ছুওয়াইবার প্রতিও অতিশয় শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন। এত শ্রদ্ধা করিতেন যে, পঁচিশ বৎসর বয়সে হযরত খাদিজা (রাঃ)কে বিবাহ করার পরও হযরত (দঃ) স্বয়ং ছুওয়াইবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া থাকিতেন। মদিনায় হযরত (দঃ) হিজরত করিয়া চলিয়া আসার পরও তিনি ছুওয়াইবার জন্য মদিনা হইতে নানা প্রকার উপঢৌকন পাঠাইয়া থাকিতেন। মক্কা জয় করিয়া হযরত (দঃ) তথাকার সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া "ছুওয়াইবাহ্" এবং তাঁহার পুত্র "মাসরূহ" সম্পর্কে খোঁজ নিয়া জানিতে পারিলেন, তাহারা বাঁচিয়া নাই, তখন হযরত (দঃ) ছুওয়াইবার অন্য আত্মীয়বর্গের খোঁজ করিলেন তাহাদের প্রতি বিশেষ সৌজন্য দেখাইবার জন্য, কিন্তু তাহাদেরও কেহ বাঁচিয়া ছিল না।

প্রদর্শনী ছিল, সুতরাং মূল মেরাজ উপলক্ষে বাস্তব বক্ষ-বিদারণের আকৃতিতে স্বপ্নে উহারও প্রদর্শনী ছিল। এই ভিন্ন ভিন্ন তিনটি ঘটনা বিভিন্ন ছাহাবীগণের সহিত আনাছ (রাঃ)ও বর্ণনা করিয়াছেন সেই জন্য তিনটি ঘটনাকে এক সঙ্গে গোঁজামিল দিয়া একটির বর্ণনা দ্বারা অপরটির বর্ণনাকে মিথ্যা বলা—যেমন, মোস্তফা-চরিতে দ্বিতীয় বর্ণনা দেখাইয়া প্রথম বিবরণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে—"আবুজর গেফারীর বর্ণনা অনুসারে আনাছের এই বিবরণ অসত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইতেছে" (২০১ পৃঃ)। তদ্রূপ তৃতীয় বর্ণনাটি দেখাইয়া প্রথম বর্ণনা সম্পর্কে বলা হইয়াছে—"তাহা হইলে বিবি হালিমার গৃহে অবস্থানকালে জাগ্রত অবস্থায় বক্ষ-বিদারণ ব্যাপারটি··· একেবারে মাঠে মারা যাইবে" (১৯৮ পৃঃ)। এই সব প্রলাপোক্তির গর্হিতাকে কি বলা যায়?

আর একটি অজ্ঞতার কথা এই বলা হইয়াছে যে, "আনাছ যে সময়কার ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন তখন তাঁহার জন্মই হয় নাই" (২০১ পৃঃ)। এই কথাটা সত্য হইলেও হাদীছ শাস্ত্রে ইহার কোন মূল্য নাই। মূল্য হইত যদি আনাছ (রাঃ) ছাহাবী না হইতেন। কোন ছাহাবী এই শ্রেণীর কোন কথা বর্ণনা করিলে তাহা সর্ব্বসম্মত রূপে গৃহীত। কারণ, ছাহাবী নিশ্চয় কোন বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াই উহা বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথায় ছাহাবীকে মিথ্যাবাদী বলিতে হয়। ইহা হাদীছ শাস্ত্রের একটি প্রসিদ্ধ বিধান, কিন্তু অজ্ঞতার ত কোন ঔষধ নাই।

আলোচ্য হাদীছের মধ্যে একটি বিষয় এই আছে যে, জিব্রিল (আঃ) নবীজীর হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া উহা হইতে জমাট রক্ত খণ্ড বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "আপনার দেহে যে, শয়তানের অংশ ছিল তাহা ইহা"। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়া যুক্তি রূপের কতগুলি কথা বলা হইয়াছে যাহা শুধু প্রবঞ্চনাই প্রবঞ্চনা।

একটি মানবীয় দেহে সকল প্রকার অংশাবলীই থাকিবে। ইহাতে নখ থাকিবে, চুল থাকিবে, এমনকি অবাঞ্ছিত লোমও থাকিবে যাহা কাটিয়া ফেলিতে হয়; মল-মূত্রের উদ্রেক-কারী নাড়ীভুঁড়িও থাকিবে। তদ্রূপ মানব যেহেতু আল্লাহ তায়ালায় পরীক্ষার সম্মুখীন জীব

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

কোন কোন আলেমের মত এই যে, ছুওয়াইবাহ্ শেষ পর্য্যন্ত ইস্‌লাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (ছীরাতে মোস্তফা ১—৫৩)।

হযরতের স্থায়ী দাইমাতা ছিলেন বিবি হালিমা; তিনি ছিলেন "বনু-সায়াদ" গোত্রের। বনু-সায়াদ গোত্র সমগ্র আরবের মধ্যে আরবী ভাষার লালিত্যে প্রসিদ্ধ ছিল। তাহাদের ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল সুললিত ও অতিশয় মার্জিত ছিল। আল্লাহ তায়ালার কুদরতে নবীজীর শৈশব সেই বনু-সায়াদ গোত্রেই কাটিল; হযরতের ভাষা উন্নত মানের হওয়ার মধ্যে বাহ্যিক কারণ ইহাও একটি ছিল। স্বয়ং হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, আমি আরবী ভাষায় তোমাদের মধ্যে সর্ব্বাধিক সুদক্ষ ও লালিত্যের অধিকারী; এর (বাহ্যিক) কারণ এই যে, আমার জন্ম কোরেশ বংশে এবং প্রতিপালন হইয়াছে বনু-সায়াদ গোত্রে (সীরত ইবনে হেশাম ১৬৭)।

এবং পরীক্ষা হইবে শয়তান দ্বারা; ইচ্ছা করিলে শয়তানের কুমন্ত্রনা গ্রহণ করিতে পারে এই ক্ষমতার উৎসও মানবীয় দেহে থাকিবে, নতুবা পরীক্ষা হইতে পারে না; ফেরেশতা পরীক্ষার সম্মুখীন জীব নহে, তাই তাহার দেহে এই উৎস নাই।

নবীজীর এই নশ্বর দেহ মানবীয় দেহই বটে, সুতরাং মানবীয় দেহের নিয়মিত সমুদয় অংশই ইহাতে থাকিবে; যাহা অপসারণের তাহা অপসারিত হইবে। যেমন, মল-মুত্র, নখ, অবাঞ্ছিত লোম ইত্যাদি। এইসব অবশ্যই অপসারণের বস্তু, তাই বলিয়া এই সব মানবীয় দেহে থাকিবে না—আল্লার সৃষ্টির বিধান এরূপ নহে। তদ্রূপ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতার উৎস যাহাকে এই হাদীছে "শয়তানের অংশ" বলা হইয়াছে তাহাও অন্যান্য মানব দেহের ন্যায় নিয়মিতরূপে নবীজীর এই নশ্বর দেহেও নিশ্চয়ই থাকিবে। অবশ্য নবীজীর বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহাকে মা'ছুম ও বে-গোনাহ রাখার জন্য অবাঞ্ছিত বস্তুর ন্যায় ঐ অংশকে তাঁহার দেহ হইতে বাল্যকালেই অপসারণ করার ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালা করিয়া দিয়াছেন। এই তথ্য দ্বারা নবীজীর মান-মর্য্যাদা বাড়ে বৈ কমে না বা ক্ষুন্ন হয় না।

সুতরাং "উক্ত তথ্য মতে স্বীকার করিতে হইবে যে, শয়তানের অংশ তাঁহার (নবীজীর দেহের) মধ্যে বলবৎ ছিল" এই ভয় দেখাইয়া তারপর নবীজীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার দোহাই দিয়া আলোচ্য হাদীছকে এনকার করার ফাঁদ তৈরী করা প্রবঞ্চনা বৈ নহে।

চার বৎসর বয়সে—বাল্য অবস্থায় নবীজীর নশ্বর দেহের মধ্যে অবাঞ্ছিত অংশের ন্যায় শয়তানের অংশ বিদ্যমান ছিল বলিয়া স্বীকার করিলে নবীজীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার অভাব দেখা দিবে—এই মায়াকান্না আর একটা অজ্ঞতা। এক হাদীছে আছে, একদা রসুল (দঃ) বলিলেন, প্রত্যেক মানুষের জন্য একজন ফেরেশতা সাথী এবং একজন জীন জাতীয় (শয়তান) সাথী থাকে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার জন্যও আছে? রসুল (দঃ) বলিলেন, আমার জন্যও আছে; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাকে ঐ জীন জাতীয় সাথীর ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন ফলে সে আমার বাধ্য হইয়া গিয়াছে। তাহার অনিষ্ট হইতে আমি বাঁচিয়া আছি—সে আমাকে ভাল ছাড়া মন্দের প্রতি আকৃষ্ট করে না। (মেশকাত শঃ ১৮)

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিবি হালিমার স্বামী তথা হযরতের দুধপিতার নাম ছিল—"হারেস"। বিবি হালিমার এক পুত্র ছিল যে হযরতের সঙ্গে দুগ্ধ পান করিয়াছে; নাম ছিল আব্দুল্লাহ। দুই মেয়ে ছিল—এক মেয়ের নাম "ওনায়সা" অপর মেয়ের আসল নাম হোজায়ফা (উচ্চারণে মতভেদ আছে); তাঁহারই ডাকনাম ছিল "শায়মা" এবং এই নামেই তিনি পরিচিতা ছিলেন। তিনিই সকলের বড় ছিলেন (আছাহহুস সিয়ার ৫১)।

এই হাদীছের তথ্য অনুযায়ী বক্ষ-বিদারণ হাদীছের তথ্যকে নবীজীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার বিরোধী বলা প্রবঞ্চনা ছাড়া কি বলা যায়? আরও অধিক প্রবঞ্চনা করা হইয়াছে এই বলিয়া যে, বক্ষ-বিদারণ হাদীছকে সত্য বলিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, "হযরত জন্মতঃ বা আদৌ মা'ছুম ছিলেন না" (১৯৯)। কত বড় অজ্ঞতা! "মা'ছুম" অর্থ গোনাহ হইতে সুরক্ষিত, অর্থাৎ নবীজীর দ্বারা গোনাহের অনুষ্ঠান হইবে না। ইহার জন্য গোনাহের উৎস সৃষ্টিগতভাবে তাহাও অতি বাল্যকালে শুধু দেহে বিদ্যমান থাকা ক্ষতিকর নহে, বরং বাল্যকালেই ঐ উৎসের অপসারণের দ্বারা মা'ছুম হওয়ার গুণ সপ্রমাণিতই হইল। সুতরাং ঐ তথ্য হযরতের মা'ছুম হওয়ার পরিপন্থী নহে, বরং উহা প্রমাণকারী। যেরূপ শয়তান সঙ্গী হওয়ার হাদীছ মা'ছুম হওয়ার পরিপন্থী নহে, বরং আল্লাহ তায়ালার সাহায্যে ঐ শয়তান বাধ্যগত হইয়া গিয়াছে বলায় ঐ হাদীছ মা'ছুম হওয়ার প্রমাণ গণ্য হইবে।

একাধিকবার বক্ষ-বিদারণ, বিশেষতঃ বোখারী শরীফ সহ সমুদয় হাদীছ গ্রন্থে প্রমাণিত মেরাজ উপলক্ষে বক্ষ-বিদারণের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে যে, "হযরত নবুয়ত পাওয়ার পরেও তাঁহার শয়তানী ভাব ও কুপ্রবৃত্তি দমিত না হওয়ায় মেরাজের রাত্রিতেও আবার হৃদপিণ্ডে অস্ত্র চিকিৎসার আবশ্যক হইয়াছিল" (১৯৯ পৃঃ)। নাউজু বিল্লাহ; কিরূপ শয়তানী কথা! এই শ্রেণীর গর্দভ মার্কা বেয়াদবের বে-ঈমানী উক্তির আলোচনা করিতেও ভয় হয়। কি আশ্চর্য্য যে, প্রবঞ্চনা করায় বে-ঈমানীর উক্তি করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

বিভিন্ন হাদীছে হযরতের একাধিকবার বক্ষ বিদারণের বর্ণনা রহিয়াছে, কিন্তু শয়তানের অংশ অপসারণ করার তথ্য শুধুমাত্র বাল্যকালের বক্ষ-বিদারণের বেলায় উল্লেখ রহিয়াছে; অন্য কোন উপলক্ষের বক্ষ-বিদারণে উহার উল্লেখ নাই। পূর্ব্বাপর সকল ইমামগণও এক এক বারের বক্ষ-বিদারণের হেক্‌মত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—বাল্যকালের বক্ষ-বিদারণে নশ্বর দেহ হইতে শয়তানের অংশ অপসারণ করা হইয়াছে, আর হেরাগুহায় নবুয়ত প্রাপ্তি উপলক্ষে বক্ষ-বিদারণে অহীর গুরুভার সামলাইবার সামর্থের জন্য ছিল (প্রথম খণ্ড ২নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।) এবং মেরাজ উপলক্ষে বক্ষ-বিদারণ উর্দ্ধজগতের ভ্রমণে সামর্থবান হওয়ার জন্য ছিল (মেরাজের বয়ান দ্রষ্টব্য), ইত্যাদি ইত্যাদি। নিজে অজ্ঞ হইয়া বিজ্ঞগণের ধার না ধারিলে গোমরাহ—ভ্রষ্ট হওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি?

আর একটা প্রবঞ্চনায় বলা হইয়াছে, "নবুয়তের পরও হযরতের হৃদয় ঈমান শূন্য ছিল" (১৯৯ পৃঃ)। এই প্রবঞ্চনার উৎস বাক্যটি মেরাজের হাদীছে রহিয়াছে, অতএব ইহার আলোচনা তথায়ই হইবে।

নবীজীর লালন-পালনে তাঁহার বহু দান ছিল; তিনি হযরতের অনেক সেবা করিতেন এবং হযরতকে অত্যধিক ভাল বাসিতেন। শায়মা শিশু নবীজীকে দোলা দিত এবং কোলে নিয়া নাচনা করিত আর গীত গাহিত—

هٰذا أخٌ لَمْ تَلِدْهُ أُمِّي — وَلَيْسَ مِنْ نَسْلِ أَبِيْ وَعَمِّي

فَدَيْتُهُ مِنْ مُخْوِلٍ مُعِمِّي — فَأَنْمِهِ اللّٰهُمَّ فِيْمَا تُنْمِي

"এইটি আমার ভাই—আমার মাতার নয়
আমি তাকে ভালবাসি—আমার পিতার নয়
কোরবান করি মামা-চাচা সবই তাঁহার শানে
খোদা! তাঁহায় বাড়াও তুমি সর্ব্ব গুণে-মানে"

নাচনার তালে শায়মা আরও বলিত—

يَا رَبَّنَا أَبْقِ أَخِي مُحَمَّدًا — حَتّٰى أَرَاهُ يَافِعًا وَأَمْرَدَا

ثُمَّ أَرَاهُ سَيِّدًا مُسَوَّدَا — وَاكْبِتْ أَعَادِيْهِ مَعًا وَالْحُسَّدَا

وَأَعْطِهِ عِزًّا يَدُوْمُ أَبَدَا

"আমার ভ্রাতা মোহাম্মদকে বাঁচাও প্রভু তুমি
কিশোর-তরুণ দীর্ঘজীবী দেখব তাঁকে আমি
দেখব তাঁকে সাহেব-সর্দার সবার চেয়ে বড়
তাঁহার শত্রু তাঁহার হিংসুক সবকে ধ্বংস কর
চিরগৌরব, চিরসম্মান, সদা দৃষ্টি তোমার
তাহার জন্য অটুট রাখ এই কামনা আমার" (যোরকানী, ১—১৪৬)

হালিমা-পরিবারের সকলেই মোসলমান হইয়া ছিলেন বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত রহিয়াছে, শুধু ওনায়সা সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। বিবি হালিমার স্বামী হারেসের ইসলাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে, হযরত (দঃ) নবীরূপে আত্মপ্রকাশ করার পর একদা হারেস মক্কায় আসিলেন। মক্কার লোকেরা তাঁহার নিকট বলিল, তোমার দুধপোষ্য ছেলে কি বলে তাহা জান কি? হারেস জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলে? তাহারা বলিল, সে বলিয়া থাকে, আল্লাহ মানুষকে মৃত্যুর পরে পুনঃ জীবিত করিবেন এবং আল্লার দুই রকম ঘর আছে; নাফরমানদেরকে এক প্রকার

ঘরে শাস্তি দিবেন এবং ফরমাবরদারদিগকে অপর এক প্রকার ঘরে শান্তি ও পুরস্কার দিবেন—এই শ্রেণীর আরও বহু রকম কথার দ্বারা সে আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে, আমাদের ঐক্য নষ্ট করিয়াছে।

হারেস নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, লোকেরা অভিযোগ করে, আপনি না কি বলেন, মানুষ মৃত্যুর পর পুনঃ জীবিত হইবে এবং বেহেশত বা দোযখে যাইবে। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, সত্যই আমি ইহা বলিয়া থাকি; ঐ দিন আসিলে আমি আপনাকে হাতে ধরিয়া আজিকার এই আলোচনার সত্যাসত্য দেখাইয়া দিব। হারেস তৎক্ষণাৎ মোসলমান হইয়া গেলেন এবং খুবই পাকাপোক্তা মোসলমান হইলেন। তিনি বলিতেন, আমার এই ছেলে কেয়ামতের দিন যদি আমার হাত ধরে তবে আমাকে বেহেশতে না পৌঁছাইয়া কি আমার হাত ছাড়িবে? (হাসিয়া সীরতে ইবনে হেশাম ১৬১)

নবীজী আপন পিতামাতার সেবা করিবার সুযোগ পান নাই; জন্মের পূর্বেই পিতাকে এবং অতি শৈশবেই মাতাকে তিনি হারাইয়া ছিলেন। পিতামাতার সেবা সম্পর্কে নবীজীর অতুলনীয় শিক্ষা রহিয়াছে। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন—

হাদীছ—মাতাপিতার ভক্ত সুসন্তান স্বীয় মাতাপিতার প্রতি মায়া-মমতার দৃষ্টি করিলে প্রতি দৃষ্টিতে আল্লার দরবারে এক একটি মকবুল হজ্জের ছওয়াব লাভ করিয়া থাকে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এক দিনে এক শতবার দৃষ্টি করিলেও (ঐরূপ এক শত হজ্জের ছওয়াব পাইবে)? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ—আল্লাহ তায়ালা অতি মহান অতি পবিত্র; (দানে তিনি কুণ্ঠিত নহেন)।

হাদীছ—মাতাপিতার সেবা-শ্রদ্ধায় যে ব্যক্তি আল্লার অনুগত হইবে তাহার জন্য বেহেশতের দুইটি দরওয়াজা খোলা থাকিবে; তাঁহাদের একজনের ব্যাপারে ঐরূপ হইলে বেহেশতের একটি দরওয়াজা খোলা থাকিবে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, যদি মাতাপিতা সন্তানের প্রতি অন্যায়-অত্যাচারকারী হয়? হযরত (দঃ) তিনবার বলিলেন, যদিও তাহার প্রতি অন্যায়-অত্যাচারকারী হয়।

হাদীছ—এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ। সন্তানের উপর মাতা-পিতার হক্ক কি পরিমাণ? হযরত বলিলেন, মাতাপিতাই তোমার বেহেশত-দোযখ।

হাদীছ—রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, মাতাপিতার সন্তুষ্টিতে প্রভু-পরওয়ারদেগারের সন্তুষ্টি; মাতাপিতার অসন্তুষ্টিতে প্রভু-পরওয়ারদেগারের অসন্তুষ্টি।

হাদীছ—এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি জেহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি; আপনার পরামর্শের জন্য আসিয়াছি। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মা আছেন?

ঐ ব্যক্তি বলিল, হাঁ—আছেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, মাতার সেবায় লাগিয়া থাক ; বেহেশ্‌ত জননীর চরনতলে। (সমুদয় হাদীছ মেশকাত শঃ হইতে)

এতদ্ভিন্ন হাদীছে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, মাতার হক পিতার হক অপেক্ষা তিন গুণ।

মাতাপিতাহারা নবীজীকে পুত্ররূপে দেখিবার সুযোগ থাকে নাই, কিন্তু শুধু স্তন্যদায়িনী মাতা হালিমার প্রতি হযরত (দঃ) যে ব্যবহার এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন তাহা হইতে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, নবীজীর আপন মাতা পিতার সেবার সুযোগ পাইলে তিনি কি আদর্শ স্থাপন করিতেন।

হালিমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার প্রতি ত হযরত (দঃ) অতিশয় শ্রদ্ধাবান ছিলেন। হোনায়নের যুদ্ধ বন্দীগণকে যে, হযরত (দঃ) মুক্তি দান করিয়াছিলেন যাহার বিবরণ ৩য় খণ্ডে উল্লেখ হইয়াছে, সেই ঐতিহাসিক উদারতা প্রদর্শনের মধ্যে একটি বিশেষ কারণ ইহাও ছিল যে, যুদ্ধ বন্দীগণের মধ্যে হযরতের দুধ-মা হালিমার বংশীয় নারীগণও ছিল এবং মুক্তির আরজী পেশকারীগণ হযরতের সম্মুখে সেই বিষয়টিকে বিশেষরূপে তুলিয়া ধরিয়াছিল। তাহাদের বিশিষ্ট সুবক্তা যোহায়র বলিয়াছিল—

يا رسول الله انما في الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك
اللاتي كن يكفلنك -

"ইয়া রাসুলুল্লাহ্! বন্দীশালায় বন্দীদের মধ্যে আপনার খালাগণও রহিয়াছেন এবং ঐ রমণীগণ রহিয়াছেন যাহারা শিশুকালে আপনার লালন পালন করিয়াছিলেন।"

যোহায়র এই সম্পর্কে একটি কবিতাও আবৃত্তি করিয়া বলিয়াছিল—

امنن على نسوة قد كنت ترضعها — اذ فوك تملؤه من محضها الدرر

اذ كنت طفلا صغيرا كنت ترضعها — واذ يزينك ما تأتي وما تذر

"দয়া করুন ঐসব রমণীগণের প্রতি যাহাদের (আপন জনের) স্তনের দুগ্ধ আপনি পান করিয়াছেন—যাহাদের দুগ্ধের মুক্তাগুলি (ফোটা সমূহ) আপনার মুখকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাকিত।

আপনি যখন ছোট শিশু ছিলেন তখন আপনি তাহাদের দুগ্ধ পান করিয়া থাকিতেন—যখন আপনি কোন কাজ করিতে বা কিছু হইতে উদ্ধার পাইতে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলেন।" (আল্-বেদায়াহ্ ওয়ান্-নেহায়াহ্ ৪—৩৫২)

এই সব উক্তি হযরতের দুধ-মা—হালিমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার জ্ঞাতি-বর্গের প্রতিই ইঙ্গিত করিতেছিল। অবশেষে হযরত (দঃ) ঐ সব যুদ্ধ বন্দীদেরে মুক্তি দানের ঘোষণা প্রদান করিলেন এবং স্বয়ং মোসলমানগণকে অনুরোধ করিয়া তাহাদিগকে এই ব্যাপারে রাজি করিলেন।

আবু দাউদ শরীফে একটি হাদীছ আছে, আবুত্‌তোফায়েল (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ("হোনায়েন" এলাকায় জেহাদ কালে) হযরত নবী (দঃ) (মক্কা হইতে ১২।১৩ মাইল দূরে) জেয়ে'র্‌রানা নামক স্থানে একদা গোশ্‌ত বণ্টন করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় একটি গ্রাম্য রমণী হযরতের প্রতি অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিলেন। হযরত (দঃ) তাঁহার জন্য নিজের চাদরখানা বিছাইয়া দিলেন। রমণীটি আসিয়া সেই চাদরের উপর বসিলেন। ঘটনা বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন, আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই রমণীটি কে? তখন উপস্থিত সকলে উত্তর করিলেন যে, তিনি হইলেন হযরতের দুধ-মা। (এছাবাহ্ ৪—২৬৬)

ইহার পূর্ব্বে আরও একবার বিবি হালিমা হযরতের নিকট আসিয়া ছিলেন, তখনও হযরত (দঃ) তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখাইয়াছিলেন। খাদিজা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সহিত হযরতের বিবাহের পরের ঘটনা—একবার হালিমার অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল; বিবি হালিমা মক্কায় হযরতের নিকট আসিয়া সাহায্য কামনা করিলেন। হযরত (দঃ) খাদিজা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট বিবি হালিমাকে সাহায্য করার বিষয় আলাপ করিলেন; খাদিজা (রাঃ) বিবি হালিমাকে বিশটি মেষ এবং কতিপয় উট দিয়া দিলেন (যোরকানী, ১—১৫০)।

হযরত (দঃ) তাঁহার সেবাকারিণী দুধ-ভগ্নি শায়মার প্রতিও বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। হোনায়েন যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে আলোচনার জন্য হযরতের নিকট যে প্রতিনিধিদল আসিয়াছিল সেই উপলক্ষে হযরতের সেই ভগ্নি শায়মাও হযরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। হযরত (দঃ) তাঁহার জন্যও স্বীয় চাদর বিছাইয়া দিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইয়া ছিলেন। (যাদুল-মায়াদ)

হযরতের শৈশব ঃ

নবীজী শিশু অবস্থায়ই সব সময় ডান স্তনের দুধ পান করিতেন; উভয় স্তন একা পান করিতেন না, দুধ ভ্রাতার জন্য এক স্তন অবশ্যই ছাড়িয়া রাখিতেন; শিশুকালেই তিনি এতদূর ন্যায়পরায়ন ছিলেন (নশরুত-তীব ২৩)।

নবীজীর দৈহিক-উঠতি সাধারণ শিশুদের অপেক্ষা অসাধারণ ছিল; দুই বৎসর বয়সেই তিনি বেশ বড় দেখাইতেন (সীরাতে-খাতম ২৮)। দুধ ছাড়াইবার পর সর্ব্ব প্রথম তাঁহার মুখে কথা ফুটিয়াছিল ইহা—

الله اكبر كبيرا و الحمد لله كثيرا و سبحان الله بكرة و اصيلا

"আল্লাহ মহান, সর্ব্ব মহান। আল্লার অসংখ্য প্রশংসা, সকাল-বিকাল সর্ব্বদা আল্লার পবিত্র বয়ান করি।" (ঐ ২১)

নবীজী এই বয়সে বাহিরে যাইতেন, কিন্তু খেলা ধূলায় লিপ্ত হইতেন না ; অন্য ছেলেদেরকে খেলিতে দেখিয়াও খেলায় অংশ গ্রহণ করিতেন না। (ঐ)

বিবি হালিমা হযরত (দঃ)কে কোথাও দূরে যাইতে দিতেন না ; একদা বিবি হালিমার অজ্ঞাতে হযরত তাঁহার দুধ-ভগ্নি শায়মার সাথে দ্বিপ্রহরের সময় পশুপাল চড়ান ক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন। বিবি হালিমা হযরতের খোঁজে বাহির হইলেন এবং শায়মার সহিত তাঁহাকে পাইলেন ; বিবি হালিমা শায়মাকে রাগ করিলেন, তুমি এই প্রখর রৌদ্রে এবং উত্তাপের সময়ে কেন তাঁহাকে বাহিরে নিয়া আসিয়াছ ? শায়মা বলিল, আমার ভাই উত্তাপ ভোগ করে নাই ; আমি দেখিয়াছি, একটি মেঘ খণ্ড সর্ব্বদা তাঁহাকে ছায়া দিয়া চলিয়াছে। ভাই যখন চলিত তখন মেঘ খণ্ডটিও চলিত. ভাই যখন থামিয়া থাকিত তখন ঐটিও থামিয়া থাকিত (নশরুত-তীব ২১)।

শৈশবে নবীজীর অছিলায় আল্লাহ্ তায়ালার রহমত লাভের অনেক ঘটনা ঘটিয়াছিল ; বিবি হালিমার বর্ণনায় সেইরূপ অনেক বিবরণ রহিয়াছে। ঐ শ্রেণীর আরও একটি ঘটনা—

মক্কায় ভয়াবহ অনাবৃষ্টির দরুণ দুর্ভিক্ষ ; কোরেশ সর্দ্দারগণ খাজা আবু তালেবের নিকট আসিয়া বলিল, হে আবু তালেব ; সমগ্র মক্কা উপত্যকায় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ; বৃষ্টির জন্য প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করুন। আবু তালেব বালক নবীজীকে সঙ্গে করিয়া কা'বা শরীফের নিকটে আসিলেন। নবীজীকে কা'বা শরীফের সহিত হেলান দেওয়াইয়া বসাইলেন ; নবীজী স্বীয় শাহাদতের আঙ্গুল আকাশ পানে উত্তোলন করতঃ নিবেদনকারীর ন্যায় অবস্থা অবলম্বন করিলেন। তৎক্ষণাৎ মেঘবিহীন পরিষ্কার আকাশে অসাধারণ মেঘমালার সঞ্চারণ হইল এবং প্রবল বারিপাত হইল।

এক সময়ে মক্কাবাসীরা নবীজীর প্রতি শত্রুতায় মাতিয়া উঠিলে নবীজীর প্রশংসায় খাজা আবু তালেব স্বীয় কবিতায় এই বিষয়টিও ইঙ্গিত করিয়াছিলেন এবং সেই পঙ্‌ক্তিটি বোখারী শরীফেও উল্লেখ আছে (১৩৭ পৃঃ)—

وَاَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهٖ — ثِمَالُ الْيَتَامٰى عِصْمَةٌ لِلْاَرَامِلِ

"উজ্জল নূরানী চেহারা তাঁহার ; তাঁহার চেহারা দেখাইয়া মেঘমালা হইতে বৃষ্টি লাভ করা যায়। এতিমদের আশ্রয়স্থল এবং নিরুপায় বিধবাদের প্রতিরক্ষক।"

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদিনায় একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট এক গ্রাম্য ব্যক্তি আসিয়া বলিল, অনাবৃষ্টির দরুন এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে যে, দুধের অভাবে শিশুদের শব্দ করার পর্য্যন্ত শক্তি নাই। তৎক্ষণাৎ রসুল (দঃ) মিম্বারে দাঁড়ানো অবস্থায়ই হাত উত্তোলন পূর্ব্বক দোয়া আরম্ভ করিলেন। দোয়ার হাত নামাইবার পূর্ব্বেই আকাশে মেঘের সঞ্চার হইয়া প্রবল

বৃষ্টি আরম্ভ হইল ; লোকগণ পানিতে ভিজিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। নবীজী হাসিমুখে বলিলেন, আজ আবুতালেব জীবিত থাকিলে এই ঘটনা দৃষ্টে তিনি আনন্দিত হইতেন ; তাঁহার কাব্যের বাস্তবায়ন এই ঘটনায়ও রহিয়াছে। এই বলিয়া নবীজী (দঃ) বলিলেন, কেহ আছে কি যে ঐ কবিতা পাঠ করিয়া শুনায় ? আলী (রাঃ) উল্লেখিত পঙ্‌ক্তিটি পাঠ করিয়া শুনাইলেন। (যোরকানী, ১—১৯১)

হযরতের মাতৃ বিয়োগ ঃ

নবীজীর জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, তাঁহার জন্ম এবং শৈশব ও বাল্য শোক-ব্যথা এবং দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়া কাটিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করিলে তাঁহার হাবীবের জন্য উহার সম্পূর্ণ বিপরিত ব্যবস্থাও করিতে পারিতেন। কিন্তু যাহা ঘটিয়াছে বিশ্বনবীর জন্য তাহারই প্রয়োজন ছিল। বিশ্বের সংখ্যাগুরু দুঃখী-দরদী, তাহাদের দুঃখে-দরদে বিশ্বনবীকে অংশীদার হইতে হইবে, তবেই তিনি দুঃখ-দরদের পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভে সক্ষম হইবেন এবং উহার প্রতিকারের ব্যবস্থায় অভিজ্ঞের ভূমিকা গ্রহণে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ?

এই তথ্যই আল্লাহ তায়ালাও পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করিয়াছেন—
الم يجدك يتيما فاوى "আপনি এতিম ছিলেন ; পরে আল্লাহ আপনার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন।"

ইতিহাসের বিভিন্ন মতামত দৃষ্টে বলিতে হয়, নবীজীর বয়স চার হইতে নয় বৎসরের মধ্যে তাঁহার মাতা ইহধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন।

দুগ্ধ পানের বয়স এবং তাহারও পর বেশ কিছুকাল নবীজী দুধমায়ের প্রতি-পালনে থাকিয়া দীর্ঘ দিন পর আপন মা বিবি আমেনার স্নেহ-ছায়ায় ফিরিয়া আসিলেন ; বিবি আমেনার অন্তরে কতই না আনন্দ। তাঁহার আকাঙ্খা জন্মিল, প্রাণের দুলাল শিশু নবীজীকে লইয়া মদিনায় যাইবেন। নবীজীর পিতামহের মাতুল মদিনায়, নবীজীর পিতার কবর মদিনায়। স্বামীহারা আমেনার সাধ জাগিল শ্বশুরের মাতৃকুলের সকলকে দেখাইবেন—মৃত আবদুল্লার ঘরে আল্লাহ কি সোনার চাঁদ দান করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে শত আবেগপূর্ণ হৃদয় নিয়া জেয়ারত করিবেন স্বামী আবদুল্লার কবর। বিবি আমেনা গর্ভ অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া এই পর্য্যন্ত নবীজী সম্পর্কে বহু কিছুই দেখিয়াছিলেন, বুঝিয়াছিলেন, উপলব্ধি করিয়া

ছিলেন ; কী রত্ন তিনি প্রসব করিয়াছেন তাহা বুঝিবার তাঁহার বাকি ছিল না। অথচ এহেন পুত্ররত্ন লাভের আনন্দ হইতে স্বামী তাঁহার চিরবঞ্চিত ; এই চাঁদের মুখ দেখিবার পূর্ব্বেই তিনি অকালে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। বিবি আমেনা সোনার পুত্র লাভে যে আনন্দ পাইয়াছেন সেই আনন্দের পার্শ্বেই তাঁহার মনোবেদনা উহার সমধিকই ছিল নিশ্চয়। তাই অন্ততঃ স্বামীর মাজারে পুত্রধনকে লইয়া না গিয়া তিনি শান্ত হইতে পারেন কি ?

আনন্দ ও আবেগ ভরা অন্তর লইয়া বিবি আমেনা প্রাণের দুলাল বালক নবীজী সহ মদিনাপানে যাত্রা করিলেন সঙ্গে রহিয়াছে পরিচারিকা উম্মে-আইমান। শিশুপুত্র আর দাসী শুধু এই দুই সঙ্গী লইয়া বিবি আমেনা একাই প্রায় তিনশত মাইলের দীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম করিয়া মদিনায় পৌঁছবেন ; কী দুঃসাহসিক কার্য্য ! ভাঙ্গা বুকের আবেগ তাঁহাকে বাধ্য করিয়াছে সাহসে বুক বাঁধিতে, প্রেরণা যোগাইয়াছে সুদীর্ঘ মরুপ্রান্তর জয় করিতে। শেষ পর্য্যন্ত তিনি মদিনায় উপস্থিত হইতে কৃতকার্য্য হইলেন।

বিবি আমেনা বালক নবীজী সহ মদিনায় একমাস অবস্থান করিলেন ; তৎকালীন মদিনার কোন কোন স্মৃতি নবীজীর স্মরণও রহিয়াছে। হিজরত করিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন মদিনায় আসিয়াছেন তখন তিনি ছাহাবীগণের সঙ্গে আলোচনায় বলিয়াছেন, এই গৃহে আমি আমার আম্মার সহিত অবস্থান করিয়াছিলাম। তখন নবীজী তথায় এক বাড়ীর একটি জলাশয়ে ভালরূপে সাঁতার কাটাও শিখিয়া ছিলেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। (যোরকানী ১—১৬৪)

পরিচারিকা উম্মে-আইমানের বর্ণনা—ইহুদীদের কিছু লোক বালক নবীজীকে উদ্দেশ্য করিয়া যাতায়াত করিতে লাগিল এবং তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় দৃষ্টি করিতে লাগিল। একদা আমি তাহাদের একজনের উক্তি শুনিতে পাইলাম, সে সঙ্গীগণকে বলিতেছে, এই বালক এই যুগের নবী হইবেন এবং এই মদিনা তাঁহার হিজরত স্থান হইবে। তাহার উক্তিগুলি আমি সুরক্ষিত রাখিলাম।

নবীজীর মাতা বিবি আমেনাও ঐ শ্রেণীর উক্তির সংবাদ জানিতে পারিলেন এবং বালক নবীজী সম্পর্কে ইহুদীদের তরফ হইতে আশঙ্কা বোধ করিলেন। সেমতে কালবিলম্ব না করিয়া বিবি আমেনা বালক নবীজী ও পরিচারিকা উম্মে-আইমান সহ মদিনা হইতে মক্কায় ফিরিয়া আসার জন্য যাত্রা করিলেন। মক্কা মদিনার মধ্যে অর্দ্ধ পথ পূর্ণ হওয়ারও পূর্ব্বে "আব্‌ওয়া" নামক স্থানে পৌঁছিয়া বিবি আমেনা অকস্মাৎ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন এবং নিতান্ত অপ্রত্যাশিতরূপে সেখানেই তিনি প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

কী করুণ দৃশ্য! মরুভূমির বুকে উন্মুক্ত আকাশতলে পাহাড়-পর্ব্বতের মাঝে— পিতা নাই, মাতা নাই, আত্মীয়-স্বজন কেহ কাছে নাই; এক দাসীর সহিত একা এই বালক! ইহা অপেক্ষা ভীষণতা আর কি হইতে পারে? এই অবস্থায় দাসী উম্মে-আইমান বিবি আমেনাকে কবর দিয়া নবীজীকে লইয়া মক্কায় পৌঁছিলেন।

নবীজীর দুঃখ-বেদনার কি সীমা থাকিল। পিতার ত মুখই দেখেন নাই; দুনিয়ায় আসিবার পূর্ব্বেই পিতাকে হারাইয়াছেন, এখন আবার শিশু বয়সেই এক হৃদয় বিদারক করুণ দৃশ্য মাঝে মাতাকে হারাইলেন। মক্কা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন মায়ের সাথে; মাত্র এক মাস পরেই আজ মক্কায় ফিরিলেন একা— মাকে পথিমধ্যে দূর প্রান্তরে রাখিয়া আসিলেন কবরে।

এত ব্যথা! কিন্তু এখনও নবীজীর দুঃখের পেয়ালা পূর্ণ হয় নাই; পিতাহারা নবীজী মাকে হারাইয়া যাঁহার আশ্রয়ে আসিলেন মাত্র দুই বৎসরেই আবার তাঁহাকে হারাইবার শোকে আক্রান্ত হইলেন। মাকে চিরবিদায় দিয়া নবীজী মক্কায় পৌঁছিলেন; দাদা আবদুল মোত্তালেব তাঁহার প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। দাসী উম্মে-আইমানও সেই দায়িত্বে অংশীদার।

উম্মে-আইমানঃ

নবীজীর পিতার মুক্ত দাসী ছিলেন তিনি (যাদুল-মায়াদ, যোরকানী ১৬৩)। তিনি হাবশী তথা আবিসিনিয়ার ছিলেন; নবীজীর বাল্য বয়সের বিশিষ্ট সেবাকারিনী ছিলেন তিনি। নবীজী তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন; নবীজী তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বলিয়া থাকিতেন, আমার (গর্ভধারিণী) জননীর পরে আপনিই আমার জননী (যোরকানী, ১—১৮৮)। তিনি বহু পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়া ছিলেন এবং নিঃস্ব অবস্থায় হিজরত করিয়া মদিনায় চলিয়া আসিয়া ছিলেন। নবীজীর নিজের অবস্থাও তদ্রূপই ছিল; মদিনার কোন কোন ছাহাবী নবীজীকে খেজুর গাছ প্রদান করিয়াছিলেন; নবীজী সেই খেজুর গাছ হইতে উম্মে-আইমান (রাঃ)কে দান করিয়াছিলেন। নবীজীর বিশেষ ভালবাসার পাত্র স্বীয় পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসার সহিত নিজ প্রচেষ্টায় উম্মে-আইমানকে বিবাহ দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের পুত্র উসামা (রাঃ)কে নবীজী অত্যধিক ভালবাসিতেন। এমনকি ছাহাবীদের মধ্যে তিনি "হেব্বু-রসুলিল্লাহ" রসুলুল্লার প্রিয়পাত্র আখ্যায় ভূষিত ছিলেন।

উম্মে-আইমান (রাঃ) নবীজীর সেবা করিয়া ইহপরকালে চরম ধৈর্য্য ও পরম সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। লোকমুখে তিনি "বরকত" নামে পরিচিতা ছিলেন। বর্ণিত আছে—একদা "রওহা" নামক মরু প্রান্তরে তিনি পিপাসাতুর হইয়া পড়িলেন; কোথাও পানির ব্যবস্থা নাই। ঐ সময় শুভ্র রেশমী দড়িতে ঝুলানো

পানি ভরা ডোল আকাশ হইতে তাঁহার সম্মুখে ঝুলিয়া পড়িল; তিনি উহার পানি পান করিয়া এরূপ তৃপ্তি লাভ করিলেন যে, পরবর্ত্তী জীবনে তিনি কখনও পিপাসার যাতনা ভোগ করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, ঐ ঘটনার পর উত্তপ্ত দিনে রোযা রাখিয়া দ্বিপ্রহরকালেও আমি পিপাসা অনুভব করি নাই (যোরকানী, ১—১৮৮)।

নবীজীর ইন্তেকালে তিনি অতিশয় শোকাতুর হইয়া পড়িয়া ছিলেন; তাঁহার ক্রন্দনে আবু বকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ) তাঁহাকে শান্তনা দিতে আসিয়াছিলেন। নবীজীর দুনিয়া ত্যাগের ৫।৬ মাস পরই তিনি ইহকাল ত্যাগ করিয়াছিলেন।

দাদাকেও হারাইলেন নবীজী ঃ

পিতা-মাতা হারা নবীজী স্বীয় দাদা আবদুল মোত্তালেবের আশ্রয়ে থাকিতেন। আবদুল মোত্তালেব নবীজীকে সন্তান অপেক্ষা অধিক স্নেহ-মমতা করিতেন। আবদুল মোত্তালেব মক্কার সর্ব্ব প্রধান সর্দার ছিলেন; তাঁহার জন্য প্রত্যহ কা'বা গৃহের সন্নিকটে বিশেষ বিছানা করা হইত; অন্য কেহ এমনকি আবদুল মোত্তালেবের নিজ সন্তানরাও ঐ বিছানার উপর যাইতে পারিত না। বালক নবীজী বিনা বাধায় ঐ বিছানার উপর বিচরণ করিতেন; আবদুল মোত্তালেব আদর ও ভালবাসার দৃষ্টিতে নবীজীর এই আচরণ উপভোগ করিতেন। চাচাগণ নবীজীকে বিছানা হইতে হঠাইতে চাহিলে আবদুল মোত্তালেব বাধা দিয়া বলিতেন, বাছাধনকে বিরক্ত করিও না। আমার এই বাছাধনের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জল। (যোরকানী, ১—১৮৯)

আপদ-বিপদের ঝড়-ঝঞ্ঝায় মানুষের ধৈর্য্য এবং সাহস ও উদ্যম বলিষ্ঠ হয়, তাই যেন বিধাতা নবীজীকে আঘাতের পর আঘাত, দুঃখের পর দুঃখ, ব্যথার পর ব্যথায় ফেলিয়া তাঁহার জীবন-বুনিয়াদকে মজবুতরূপে গড়িয়া তুলিতে ছিলেন। পিতা-মাতা হারাইবার পর দাদা আবদুল মোত্তালেবের ছায়া নবীজীর জন্য সুদীর্ঘ হইল না। নবীজীর মাতৃবিয়োগের মাত্র দুই বৎসর পরেই দাদা আবদুল মোত্তালেব বালক নবীজীকে ছাড়িয়া দুনিয়া হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। আবদুল মোত্তালেব মৃত্যুকালে স্বীয় পুত্র আবুতালেবকে অছিয়্যত করিয়া গেলেন নবীজীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য; তিনি নবীজীর পিতা খাজা আবদুল্লার এক মায়ের গর্ভজাত ভ্রাতা ছিলেন। নবীজী দীর্ঘ দিন আবুতালেবের ছায়ায় ছিলেন; হযরত (দঃ) নবী হওয়ারও সাত বৎসর পর আবুতালেবের মৃত্যু হইয়াছিল। আবুতালেব জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নবীজীর সাহায্য সহায়তায় সাধ্যের সর্বশেষ বিন্দু ব্যয় করিয়া যাইতে ছিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—নবীজী সারা জীবন স্বীয় মাতা-পিতার প্রতি অতিশয়

মক্কা বিজয় বা ষষ্ঠ হিজরী সনে হোদায়বিয়ার ঘটনার ছফরে

মক্কা হইতে মদিনা প্রত্যাবর্ত্তনের পথে "আবওয়া" নামক স্থানে নবীজী স্বীয় মাতার কবর জেয়ারত করিয়াছিলেন। নবীজীর অন্তরে যে কি আবেগ ছিল! মায়ের কবর পার্শে দাঁড়াইয়া নবীজী কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন। মোসলেম শরীফের হাদীছে আছে, আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিজ মাতার কবর জেয়ারত করিয়াছেন; তখন তিনি এইরূপ কাঁদিয়া ছিলেন যে, তাঁহার সঙ্গীগণকে পর্য্যন্ত কাঁদাইয়া ফেলিয়াছিলেন। মায়ের মমতাই মাতৃহারা নবীজীকে এইরূপ অভিভূত করিয়াছিল, এতদ্ভিন্ন তিনি আজ নবী, কিন্তু তাঁহার মা তাঁহাকে নবীরূপে পান নাই—সেই ব্যথাও কম নহে। এত দুঃখ এত ব্যথা। এই অবস্থায় নবীজী আল্লাহ তায়ালার দরবারে মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাহিয়া ব্যর্থ হইলেন। মোসলেম শরীফের উক্ত হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে—নবীজী বলিয়াছেন, "পওয়ারদেগারের নিকট মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাহিয়া ছিলাম; অনুমতি দেওয়া হয় নাই। তাঁহার কবর জেয়ারতের অনুমতি চাহিয়াছি; সেই অনুমতি পাইয়াছি।" ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি না পাইয়া নবীজীর মনের আবেগ ও ব্যথা কি চরম আকার ধারণ করিতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার বিধান—ঈমান ব্যতিরেকে ক্ষমা হইবেই না; আল্লাহ তায়ালার এই বিধান সকলের জন্য সমান। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কি স্বীয় হাবীবের এই ব্যথার লাঘব করিবেন না, এই আবেগের মূল্য দিবেন না? ইহাও ত আল্লার হুজুরে বড় কথা যে, তাঁহার হাবিবের অন্তরে ব্যথা ও অশান্তি। নবীজীর জন্য আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা অঙ্গীকার বিঘোষিত রহিয়াছে—ولسوف يعطيك ربك فترضى "নিশ্চয় আপনার প্রভু আপনার মনোবাঞ্ছা পূরণ পূর্ব্বক আপনার মনোস্তুষ্টি সাধন করিয়া চলিবেন।" এই প্রভু-পরওয়ারদেগার কি স্বীয় হাবিবের অন্তরকে সারা জীবন কাঁদাইবেন? স্বীয় মাতা-পিতার মুক্তি সম্পর্কে কি তাঁহার মনোবেদনা দূর করার ব্যবস্থা করিবেন না?

পূর্ব্বাপর বহু ইমাম ও আলেমগণের সিদ্ধান্ত এই যে, নবীজীর মাতা-পিতা পরকালে মুক্তি প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহাদের মুক্তির সূত্র সম্পর্কে অধিকাংশের মত এই যে, নবীজীর সন্তুষ্টি ও সম্মান উদ্দেশ্যে তাঁহার বৈশিষ্ট্যরূপে আল্লাহ তায়ালা বিশেষ ব্যবস্থা এই করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতা-মাতাকে মুহূর্ত্তের জন্য জীবিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; তাঁহারা জীবিত হইয়া ঈমান গ্রহণ করতঃ পুনঃ মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত আছে (যোরকানী, ১—১৬৬×১৮৮ দ্রষ্টব্য)। এমনকি বোখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবনে হজর (রঃ)ও তাঁহার এক কিতাবে এই বিষয়টির পূর্ণ সমর্থন উল্লেখ করিয়াছেন (ফতহুল-মোলহেম, ১—৩৭৩ দ্রষ্টব্য)।

হযরত (দঃ) প্রথম বহির্দেশ গমনেঃ

মাত্র এক-দুইজন ব্যতীত সকল পয়গাম্বরই চল্লিশ বৎসর বয়সে পয়গাম্বরী লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনের এই সুদীর্ঘ সময়টা ব্যর্থ যাইত না; পয়গাম্বরীর গুরুদায়িত্ব বহনে তাঁহাদেরে প্রস্তুত ও যোগ্য করা হইত। হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বেলায়ও তাহাই ঘটিয়াছে। তিনি ত হইবেন বিশ্বনবী; তাঁহার দায়িত্ব হইবে বিশ্বজোরা, তাই তাঁহাকে প্রস্তুত করিতে এবং গড়িয়া তুলিতে হইবে বিশেষরূপে; তাঁহার পয়গাম্বরী জীবনের বুনিয়াদকে মজবুত করিতে হইবে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া। এই বিশেষ প্রস্তুতি এবং বিশেষরূপে গড়াইবার যোগাড়-আয়োজনেই অতিবাহিত হইয়াছে নবীজীর চল্লিশ বৎসরের সুদীর্ঘ সময়।

নবীজী শৈশব হইতে কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স কম-বেশ বার বৎসর। বিধাতা তাঁহাকে দেশের বাহিরে পাঠাইবেন; বাহিরের বিরাট বিশ্বের সহিত তাঁহার পরিচয়ের প্রয়োজন; বহির্দেশের বিশাল জগতের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক রচনার প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন সমাধার এক সুন্দর মুহূর্ত্ত নবীজীর সম্মুখে উপস্থিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তরেও আবেগের ঢেউ খেলিয়া উঠিল।

নবীজীর মুরুব্বি চাচা আবুতালেব সিরিয়ার বাণিজ্যে যাইবেন; তিনি ছফরের যোগাড়-আয়োজন করিতেছেন, যাত্রার সময় আসিল, তিনি যাত্রা করিবেন। সেই মুহূর্ত্তে নবীজী তাঁহার চাচা আবুতালেবকে ধরিয়া বসিলেন; তিনিও তাহার সঙ্গে যাইবেন। আবুতালেবের স্নেহ-মমতা তাহাকে নবীজীর গোঁ রক্ষা করায় বাধ্য করিল; তিনি নবীজীকে সঙ্গে নিয়াই সিরিয়ার পথে যাত্রা করিলেন।

নবীজীর জীবনের এক নূতন অধ্যায় আজ সূচিত হইল—ভবী বিশ্বনবী বহির্বিশ্বের ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন; বহিঃপ্রকৃতি তাই আজ উল্লসিত ও আনন্দিত। রাজপুত্রের ভ্রমণ পথের উভয় পার্শ্বে যেমন করিয়া সাড়া পড়িয়া যায় তদ্রূপ নবীজীর পথের দুই ধারেও সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। তাঁহার গমনপথের নিকটস্থ পর্ব্বতমালা ও বৃক্ষরাজি সকলেই নিজ নিজ কায়দায় নবীজীকে অভিবাদন ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া ধন্য হইতে লাগিল। নীল আকাশও নবীজীর সেবায় ব্রতি হইল— ঘন মেঘখণ্ড নবীজীকে ছায়া দিয়া চলিল। প্রকৃতিরাজির এই সব লীলা সকলে লক্ষ্য না করিলেও যাহারা দেখিয়াছে তাহারা ভাবী বিশ্বনবীকে চিনিতেও পারিয়াছে; সাক্ষ্য সম্মুখে আসিতেছে।

আবুতালেবের বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়ার এক প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র "বোছ্‌রা" নগরে পৌছিল। তথায় "জিরজীস্" ওরফে "বহিরা" নামীয় এক খাঁটী অভিজ্ঞ পাদ্রি ছিলেন। তিনি তৌরাত ও ইঞ্জিল কেতাব মারফত শেষ জমানার নবীর নিদর্শন ও পরিচয় সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল ছিলেন। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ছিলেন যিশু খৃষ্ট

তথা হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের প্রতিশ্রুত রসুল ; ঈসা (আঃ) নবী মোস্তফা (দঃ) সম্পর্কে অনেক প্রচার ও ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং খৃষ্টান পাদ্রী বহিরা নবীজীর বহু কিছু লক্ষণ অবগত ছিলেন, তাই তিনি নবীজীকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

আবুতালেবের সওদাগরী কাফেলা উক্ত পাদ্রির এবাদত-ঘরের নিকটবর্ত্তী অবতরণ করিল। ঐ পাদ্রি কাফেলার মধ্যে বালক হযরত রাসুলুল্লার চেহারা দেখামাত্রই তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিলেন যে, এই বালকই প্রতিশ্রুত শেষ জমানার নবী। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাফেলার মধ্যে আসিয়া হযরতের হাত ধরিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, এই ত সকল পয়গাম্বরগণের শিরোমণি, এই ত নিখিলের শ্রেষ্ঠ মানব। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহাকে বিশ্বজগতের জন্য আশির্বাদ ও মঙ্গলরূপে দাঁড় করাইবেন। কাফেলার লোকগণ সেই পাদ্রিকে প্রশ্ন করিল, আপনি কিরূপে এই বিষয় জ্ঞাত হইলেন? পাদ্রি বলিলেন, আপনারা রাস্তার মোড় ফিরিয়া এই অঞ্চলে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের সমুদয় গাছ-পালা ও পাহাড়-পর্ব্বত তাঁহার সম্মান প্রদর্শনে তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল। তদুপরি আমি তাঁহার পৃষ্ঠে মোহরে-নবুয়ত দেখিতে পাইতেছি। উহার দ্বারাও তিনি আমাদের নিকট পরিচিত। অতঃপর সেই পাদ্রি শুধু হযরতের খাতিরে সম্পূর্ণ কাফেলার দাওয়াত করিলেন। সকলে খাওয়ার জন্য উপস্থিত হইল, কিন্তু হযরত (দঃ) তাহাদের সঙ্গে ছিলেন না। পাদ্রি তাহাদের নিকট হযরতের অনুপস্থিতের কারণ জিজ্ঞাসা করিল ; সকলে বলিল, তিনি উট চরাইতে গিয়াছেন। পাদ্রি তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া হযরতকে সংবাদ দিয়া আনিলেন। যখন হযরত ময়দান হইতে আসিতেছিলেন তখন ঐ পাদ্রি লক্ষ্য করিতে-ছিলেন যে, তাঁহার মাথার উপর একটি মেঘখণ্ড ছায়া প্রদান করিয়া আসিতেছে। যখন হযরত খাওয়ার স্থলে পৌঁছিলেন যাহা একটি বৃক্ষের ছায়া তলে ছিল ; তিনি বৃক্ষের ছায়ায় স্থান না পাইয়া ছায়াহীন জায়গায় বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষের ডালাগুলি হযরতের মাথার উপর ঝুকিয়া পড়িয়া তাঁহাকে ছায়া দান করিল। পাদ্রি উপস্থিত কাফেলার লোকদিগকে বৃক্ষের এই অস্বাভাবিক ঘটনা দেখাইয়া বলিলেন, আমি তোমাদিগকে খোদার কসম দিয়া বলিতেছি, তোমরা এই বালককে লইয়া তোমাদের গন্তব্য স্থল সিরিয়ায় যাইবে না। তথাকার ইহুদীরা এই বালককে তাঁহার নিদর্শন দেখিয়া চিনিয়া ফেলিবে এবং তাহারা তাঁহাকে মারিয়া ফেলার চেষ্টা করিবে।

ইতিমধ্যেই পাদ্রি দেখিতে পাইলেন সাত জন রোমীয় লোক ঐ স্থানের দিকে আসিতেছে। পাদ্রি অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি খোঁজ করিতেছ? তাহারা বলিল, তৌরাত-ইঞ্জিল কেতাব মারফত আমরা জানি, শেষ জমানার নবী জন্ম লাভ করিয়াছেন, এই মাসে তিনি এই পথে ছফর করিবেন ; আমরা

তাঁহারই তালাশে আসিয়াছি। পাদ্রি তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, খোদার ইচ্ছাকে কি কেহ ঠেকাইতে পারে? তাহারা পাদ্রির এই কথায় তাহাদের চেষ্টা ত্যাগ করিল। অতঃপর পাদ্রি হযরতের চাচা আবুতালেবকে কসম দিয়া বলিলেন, আপনি অবশ্যই এই বালককে সতর্কতার সহিত যথাসম্ভব দেশে পৌঁছাইতে যত্নবান হইবেন। সেমতে আবুতালেব (সযত্নে নবীজীকে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজেও) সিরিয়ার বাণিজ্য সফর সংক্ষিপ্ত করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। (সীরতে-ইবনে হেশাম)।

এই পাদ্রির সহিত হযরতের সামান্য কথাবার্ত্তাও হইয়াছিল—উহার বিবরণও বর্ণিত রহিয়াছে। পাদ্রি বলিলেন, আপনাকে লাৎ ও ওজ্জা দেবীদ্বয়ের কসম দিতেছি—আমার কতিপয় প্রশ্নের উত্তর আপনি অবশ্যই দিবেন। হযরত বলিলেন, আমাকে লাৎ-ওজ্জার কসম দিবেন না; উহাদেরকে আমি অতিশয় ঘৃণা করি। তখন পাদ্রি বলিলেন, আল্লার কসম ··। এইবার হযরত বলিলেন, আপনার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। পাদ্রি তাঁহাকে অনেক বিষযের প্রশ্নই করিলেন—তাঁহার নিদ্রা এবং বিভিন্ন হাল-অবস্থা এবং কার্য্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন।

সর্ব্বশেষ পয়গাম্বরের গুণাগুণ সম্পর্কে তাঁহার যাহা কিছু জানা ছিল উহার পরীক্ষার জন্যই তিনি হযরতকে এই সব জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে লাৎ ও ওজ্জা দেবীর কসমও এই উদ্দেশ্যেই দিয়া ছিলেন যে, তিনি ভাবী সর্বশেষ নবী হইয়া থাকিলে কখনও তিনি এই কসমকে গ্রহণ করিবেন না; বস্তুতঃ হইলও তাহাই। (যোরকানী, ১—১৯৬)*

---

* সমালোচনা—এক শ্রেণীর খৃষ্টান লিখক মাকড়সার জালের উপর ঘর তৈরী করার ন্যায় বহিরা পাদ্রির এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এক আজগবী তথ্য আবিষ্কার করিয়াছে। নবীজী মোস্তফা (দঃ) না-কি এই বহিরা পাদ্রির সাক্ষাৎ হইতেই জ্ঞান-বিদ্যা আহরণ করিয়াছিলেন। কি আজগবী আবিষ্কার! কি আজগবী কথা!

অচিরেই যাঁহার জ্ঞান-দর্শনে সারা জগত স্তম্ভিত হইল, মুগ্ধ হইল। যাঁহার আদর্শ অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশ ও পরিবেশকে এবং কুসংস্কার জর্জ্জরিত জাতিকে আদর্শগত রাজমুকুট পড়াইল। যাঁহার শিক্ষা ও দান বিশ্ববুকে শান্তি, নিরাপত্তা ও সোনালী আদর্শের বন্যা বহাইয়া দিল। তিনি তাঁহার এই অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্র ও অমৃতাদর্শের মহাসাগর লাভ করিলেন এক বিন্দুবৎ হইতে! মুহূর্ত্তের সাক্ষাৎ ও দুই-চার কথার আলাপে! এইরূপ পচা গল্পবাজির উত্তর না দেওয়াই ভাল উত্তর।

আশ্চর্য্যের বিষয় "মোস্তফা-চরিত" খৃষ্টানদের ঐ পচা গল্পবাজিতে মস্তক হেট করিয়া লজ্জা ঢাকিবার জন্য পেরেশান হইয়া পড়িয়াছে। অবশেষে কোন পথ না দেখিয়া বহিরা পাদ্রির ঘটনার ইতিহাসকেই অস্বীকার করতঃ হাঁপ ছাড়িতে চাহিয়াছে। মোস্তফা-চরিতের ভাষায়—"এই গল্পটিই একেবারে ভিত্তিহীন উপকথা" (২২০ পৃঃ)। মোস্তফা-চরিতের স্বভাবগত কুঅভ্যাসই ইহা যে, যাহা তাহার মনপূতঃ না হইবে উহাকেই "গল্প" বলিয়া আখ্যা দিবে যদিও উহা জগতভরা ইতিহাসের পাতায়, এমনকি হাদীছগ্রন্থেও বিদ্যমান থাকে। (পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

সামাজিক ও জনকল্যাণ কাজে হযরতের প্রথম যোগদান ঃ

তখনকার আরবদেশ অন্ধকার দেশ, উহার পরিবেশ অন্ধকার পরিবেশ এবং তখনকার যুগ অন্ধকারযুগ—মারামারি, রক্তারক্তি প্রায় সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে। অন্যায় অবিচার জুলুম-অত্যাচারই সেই দেশ ও সেই যুগের ইতিহাস।

বহিরা পাদ্রির উল্লেখিত ঘটনার বয়ান সীরতশাস্ত্রের সমস্ত গ্রন্থেই বর্ণিত আছে, এমনকি ছেহাহ-ছেত্তা হাদীছগ্রন্থ সমূহের তিরমিজী শরীফেও উল্লেখ আছে। মরহুম খাঁ সাহেব তাঁহার মোস্তফা-চরিতে উল্লেখিত ঘটনাটির প্রতি বিষোদ্গারে প্রবঞ্চনা মূলক দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিভিন্ন রেফারেন্স বা বরাতের মারপেচে দুইটি বিষয় প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন।

প্রথমতঃ তিনি এই ঘটনা বর্ণনার সনদ সম্পর্কে নানারূপ গোঁজামিলের দ্বারা উহার দুর্ব্বলতা দেখাইতে চাহিয়াছেন। এই সম্পর্কে ভূমিকায় বর্ণিত এই বিষয়টি লক্ষ্য করাই যথেষ্ট যে, এই ঘটনার বর্ণনা হইল ইতিহাস। ইতিহাস ভিন্ন জিনিষ এবং হাদীছ তদপেক্ষা বহু উর্দ্ধের ভিন্ন জিনিষ। হাদীছ বলা হয় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কথা, কাজ এবং সমর্থনকে। আলোচ্য বিবরণটি ত নবীজীর পয়গাম্বরী জীবনের বহু পূর্ব্বেকার ঘটনা যাহা ইতিহাসরূপে অন্য লোকদের মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে। হাদীছ গৃহীত হওয়ার জন্য উহার সনদে যেসব কড়াকড়ি আরোপ করা হয় তাহা ইতিহাসের বেলায় প্রয়োগ করিলে ইতিহাস ভাণ্ডার সম্পূর্ণ শূন্য হইয়া যাইবে; গ্রহণযোগ্য উহাতে কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।

সুধী সমাজ! ইতিহাস ভাণ্ডারকে তলাইয়া দেখুন, শতকরা ৫০ ভাগ সনদহীন বর্ণনাই উহাতে পাইবেন; তাহাও ইতিহাসের আরবী গ্রন্থাবলীতে। অন্যান্য ভাষার ইতিহাস বইপুস্তকে ত সনদের কোন বালাই-ই নাই। পূর্ব্বাপর যে সব ইতিহাস গ্রন্থ গৃহিতরূপে প্রচলিত রহিয়াছে উহার অধিকাংশ গ্রন্থাবলীতে এবং সীরত গ্রন্থাবলীতে আলোচ্য বহিরা পাদ্রির ঘটনা বর্ণিত রহিয়াছে। সুতরাং সনদের দুর্ব্বলতার দোহাই দিয়া ইহাকে উপেক্ষা করা প্রতারণার সামিল হইবে। অধিকন্তু এই ইতিহাসটি সুপ্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ তিরমিজী শরীফেও স্থান লাভ করিয়াছে এবং ইমাম তিরমিজী সাহেব ইহার সনদকে গ্রহণীয় বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া দিয়াছেন।

"মোস্তফা-চরিত" পুস্তকে দুই-একজন আলেমের ভিন্ন মত পোষণের উদ্ধৃতিও রহিয়াছে। এইরূপ সামান্য দ্বিমতের দরুণ ইতিহাসের বর্ণনাকে উপেক্ষা করিলে কোন ঐতিহাসিক বর্ণনাই গ্রহণ যোগ্য মিলিবে না।

অসংখ্য ইতিহাস ও সীরত গ্রন্থে এই ঘটনা বর্ণিত হওয়া এবং হাদীছ শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ ছয় ইমামের এক ইমাম তিরমিজী (রঃ) কর্ত্তৃক গ্রহণীয় সাব্যস্ত হওয়া এই ঘটনার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট। সীরত সঙ্কলনে কলিযুগের লিখক মরহুম মাওঃ শিবলী নোমানী এবং মরহুম মাওঃ আকরম খাঁর লেখায়ই এই ঘটনার প্রতি অস্বীকৃতি দেখা যায়, নতুবা পূর্ব্বাপর সকলেই ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। খৃষ্টান লিখকদের অলৌকিক পচা গল্পবাজির ভয়ে ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করা চরম দুর্ব্বলতার পরিচয়ই বটে।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বয়স তখন ১৫-১৬ (আছাহ-হুস্‌-সিয়ার)। কায়েস্‌ গোত্রীয় লোকেরা কোরেশদের সঙ্গে অন্যায়রূপে এক ভয়াবহ যুদ্ধ বাধাইয়া দিল; সেই যুদ্ধই ইতিহাসে "ফেজার যুদ্ধ" নামে প্রসিদ্ধ। আত্মরক্ষা এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ ও প্রতিশোধে কোরেশগণও যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কোরেশদের শাখা গোত্রসমূহ নিজ নিজ সর্দ্দারের নেতৃত্বে ভিন্ন ভিন্ন বাহিনী রূপে সেই যুদ্ধে যোগদান করিল। বনী-হাসেম গোত্রের নেতৃত্ব তাহাদের সর্দার হযরতের দাদা আবদুল মোত্তালেবের উপর ছিল। হযরতের জীবনের সর্ব্বপ্রথম তিনি সেই যুদ্ধে স্বীয় দাদার সহিত দাদার সাহায্যকারী রূপে রণাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন।

মোস্তফা-চরিতে এই বর্ণনার আর একটি দুর্ব্বল দিক দেখান হইয়াছে যে, ঘটনাটির বর্ণনায় ইহা আছে যে, বহিরা পাদ্রির উপদেশ মতে হযরতের মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তনে আবুবকর বেলালকে সঙ্গে দিলেন। এ সম্পর্কে বলা হইয়াছে, ঐ সময় আবুবকরের বয়স ১০ বৎসর ছিল। কারণ, আবুবকর (রাঃ) হযরতের ছোট ছিলেন দুই বৎসরের, আর ঐ সময় হযরতের বয়স ১২ বৎসর ছিল। তবে এই ব্যাপারে কোন প্রমাণ নাই যে, আবুবকর ঐ ছফরে ছিলেন না; তাঁহার থাকা সম্ভব নহে। নবী (দঃ) যদি ১২ বৎসর বয়সে ঐ ছফরে থাকিতে পারেন তবে ১০ বৎসর বয়সের আবুবকরও থাকিতে পারেন। আর ইতিহাসে ইহাও প্রমাণিত যে, আবুবকর হযরতের বাল্যবন্ধু ছিলেন। আর একটি কথা বলা হইয়াছে যে, বেলাল ঐ সময় তথায় থাকিতে পারেনই না। কিন্তু এ সম্পর্কেও দুইটি বক্তব্যের অবকাশ রহিয়াছে—(১) কাহারও মতে বেলাল আবুবকরের সমবয়স্ক ছিলেন (যোরকানী, ১—১৯৬)। সুতরাং আবু বকরের শুধু সঙ্গী হিসাবে বেলালের তথায় থাকা অসম্ভব নহে। (২) এই বেলাল প্রসিদ্ধ বেলাল হাবসী (রাঃ), না—বেলাল নামের অন্য কোন ব্যক্তি তাহা নির্দ্ধারণেরও কোন প্রমাণ নাই (কাওকাবুদ্দুর্রী, ২—৩১২)। বেলাল হাবসী (রাঃ) ভিন্ন অন্য কেহ হইলে কোন প্রশ্নই থাকে না।

সার কথা এই সব ছুতানাতা দুর্ব্বল অজুহাত খণ্ডন করা সহজ, অতএব উহার দরুন একটি ইতিহাসকে অস্বীকার করা যায় না। এছাড়া আরও কয়েকটি ছুতা উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা শুধু বাহুল্যই বটে। যেমন, বর্ণনায় উল্লেখ আছে, বহিরা পাদ্রি নবীজীর পরিচয় লাভ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার আগমনে এতদঞ্চলের সমুদয় পাহাড়-পর্ব্বত, গাছ-পালা সেজদা রত হইয়া ছিল। মরহুম খাঁ সাহেব এই বিবরণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন, "আবুতালেব বা দুনিয়ার আর একটি প্রাণীও তাহা দেখিল না; তাহা দেখিলেন বহু দূরে অবস্থিত বহিরা পাদ্রি তাঁহার মাঠের কোণে বসিয়া ইহা অপেক্ষা আজগবী কথা আর কি হইতে পারে? (২২৪ পৃঃ)।

প্রশ্নটির মূল হেতু খাঁ সাহেবের গর্ভেই জন্ম নিয়াছে; মূল ঘটনায়ত রহিয়াছে—সেজদারত হইয়াছে; আর খাঁ সাহেব বুঝিয়াছেন, "হযরতকে সেজদা করার জন্য ভূপতিত হইয়াছে।" মানুষের সেজদা এবং পাহাড় ইত্যাদির সেজদা তিনি এক আকারেরই বুঝিয়াছেন—এই

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঘন ঘন যুদ্ধবিগ্রহের কারণে মক্কায় এতিম-বিধবা অনাথ দুর্ব্বলদের সংখ্যা অনেক ছিল। এই দুর্ব্বলদের উপর দুর্বৃত্তদের দৌরাত্ম্য চলিত নির্বিবাদে।

মক্কার সুমতি সম্পন্ন কতিপয় সর্দ্দার একটি কল্যাণমুলক সমাজ সেবার সমিতি গঠন বা পুনরুজ্জীবিত করায় সচেষ্ট হইলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) সেই সমাজ সেবা-সমিতির সাংগঠনিক তৎপরতায় অংশ গ্রহণ পূর্ব্বক বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়া ছিলেন। উক্ত সমিতির উদ্দেশ্যাবলী ছিল নিম্নরূপ—

(১) অসহায় দুর্গতদিগকে সাহায্য-সেবা করা।

(২) এতিম-বিধবা ও দুর্ব্বলদেরকে সকল অত্যাচার-উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করা।

বোকামীর ফলেই ঐ প্রশ্ন জন্মিয়াছে। পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত স্পষ্ট উদাহরণ লক্ষ্য করুন—আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ "দুনিয়ার যত জিনিষই আছে উহার প্রত্যেকটিই আল্লার প্রশংসার সহিত তাঁহার তছবীহ পাঠ করিয়া থাকে"।

খাঁ সাহেব শ্রেণীরা বলিবেন, গাছপালা পাহাড়-পর্ব্বতের মুখ নাই, প্রশংসা ও তছবীহ কি রূপে করে? আরও শুনুন—وَلِلّٰهِ یَسْجُدُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ "আল্লার জন্য সেজদা করিয়া থাকে যাহা কিছু আসমান সমুহে এবং ভূপৃষ্ঠে আছে" (১৪ পাঃ ১২ রুঃ)। হে খাঁ সাহেব শ্রেণীর লোকগণ! ১৭ পাঃ ৯ রুকুর আরও একটি আয়াত শুনুন—

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ یَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ

"তুমি কি দেখ না! আল্লার জন্য সেজদা করে যাঁহারা আসমান সমূহে আছেন এবং যাহারা ভূপৃষ্ঠে আছে এবং সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি এবং পর্ব্বতমালা, বৃক্ষরাজি ও বিভিন্ন প্রাণী"। চন্দ্র-সূর্য্য, নক্ষত্ররাজি, পর্ব্বতমালা, বৃক্ষরাজি এবং প্রাণীসমূহকে ত সেজদার জন্য ভূপতিত হইতে দেখা যায় না, সেই জন্য কি কোরআনকেও অস্বীকার করিতে হইবে।

পাঠক! "সেজদা করা" একটি ক্রিয়াপদ, উহার আকার-আকৃতি সাব্যস্ত হইবে উহার কর্ত্তাপদের সামঞ্জস্যে; ঘোড়াকে গাধার সহিত জুড়িলে ত খচ্চর পয়দা হইবেই।

নবীজী মোস্তফার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে পাহাড়-পর্ব্বৎ গাছ-পালার সেজদারত হওয়ার বর্ণনা যেখানে পূর্ব্ববর্ত্তী আসমানী কেতাব সমূহে ছিল সেখানে ঐ সেজদার কোন আকার ও নিদর্শন নিশ্চয় বর্ণিত ছিল। সেই কেতাবের অভিজ্ঞ বিদ্বান ও বিশিষ্ট আলেম তৎকালীন খাঁটী দ্বীনদার বহিরা পাদ্রি তাহা প্রত্যক্ষ ও অবলোকন করিয়াছেন। আবুতালেব এবং অন্যান্যরা ত সেই কেতাবের আলেম—বিদ্বান ছিলেন না; তাঁহারা উহা কিরূপে দেখিবেন?

(৩) কোন বিদেশী বা পথিকের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার করা হইলে উহার আশু প্রতিকার করা।

(৪) সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার প্রতিরোধে অত্যাচারিকে দৃঢ়তার সহিত বাধা দেওয়া এবং অত্যাচারিতকে সাহায্য করা।

(৫) দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

(৬) সকলের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা ও সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করা।

সমিতির সদস্যগণ এই উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন—ইহারই ঐতিহাসিক নাম "হেলফুল-ফজুল"। অন্ধকার যুগে ইহাই ছিল কিঞ্চিৎ আলোর সর্ব্বপ্রথম উদ্ভাসন। যুগযুগান্তের অন্ধকার কাটিয়া ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি, ন্যায়নিষ্ঠতা এবং বিশ্বশান্তির দীপ্ত সূর্য্যের উদয়াভাসে এই শ্রেণীর রশ্মির বিকাশ অতি স্বাভাবিকই ছিল।

দেশ বরেণ্যরূপে হযরতের খেতাব লাভ ঃ

ইতিমধ্যেই হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতিভা সমগ্র মক্কায় ছড়াইয়া পড়িল। সকলের দৃষ্টিতেই তিনি অতুলনীয় রূপে দেখা যাইতে লাগিলেন। মানব-সেবা, মানব-প্রেম, নিঃস্বার্থ মঙ্গলকামী সত্যিকার কল্যাণ প্রচেষ্টা এবং সততা ও বিশ্বস্ততা ইত্যাদি তাঁহার মহৎ গুণাবলীর মাধুর্য্যতায় সমগ্র দেশ ও জাতির দৃষ্টি তাঁহার প্রতি দিনে দিনে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ফলে কাহারও প্রস্তাব-প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে স্বতঃস্ফুর্ত্তরূপে সকলের মুখে তাঁহার জন্য এমন একটি খেতাব বা উপাধি আবিষ্কৃত হইল যাহা মহৎ গুণাবলীর চরম উৎকর্ষের প্রতিক। সারা দেশ তাঁহাকে "আল-আমীন" আখ্যায় ভূষিত করিল। আরবী ভাষায় এই শব্দটি নিতান্তই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু মানবীয় মহত্বের বহু উপাদান এই অক্ষর কয়টির মধ্যে পরিবেষ্টিত। শান্তিপ্রিয়, সম্প্রীতির আধার, চরম সত্যবাদি ও পরম বিশ্বস্ত—এই সব মাহাত্মের আকরকে আরবী ভাষায় বলা হয় "আমীন" এবং উহারই বৈশিষ্ট্যধারীকে বলা হয় "আল-আমীন"। গুণ-মাধুর্য্যতার কত উচ্চ মূল্য জাতির পক্ষ হইতে হযরত (দঃ) পাইলেন যে "আল-আমীন" উপাধি তাঁহার পরিচয়ের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইল; নামের পরিবর্ত্তে সকলে তাঁহাকে আল-আমীন বলিয়া ডাকিত। অন্ধকার যুগ, অন্ধকার দেশ, অন্ধকার পরিবেশ—এই দুর্ধর্ষ জাতির চিত্তে এতখানি স্থান লাভ করা তখনকার দিনে সহজসাধ্য ছিল কি? কিরূপ চারিত্রিক মাধুর্য্য এবং সততা গুণের সুষমা ও মানব-সেবার অকৃত্রিম প্রেরণা থাকিলে ইহা সম্ভব হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। নবীজী মোস্তফা তাঁহার অসাধারন গুণের প্রভাবেই এত বড় গৌরব অর্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন।

হযরতকে শিক্ষা ও ট্রেনিং দান ঃ

শৈশবকালই মানুষের শিক্ষার সময়, কিন্তু নবীজী মোস্তফার দেশ ও যুগ অন্ধকার দেশ ও যুগ ; সেই পরিবেশে মাতা-পিতাহীন নবীজীর শিক্ষার ব্যবস্থা না হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সেই জন্য কি তিনি শিক্ষাহীন ছিলেন, তাঁহার শিক্ষার কি কোন ব্যবস্থাই হয় নাই? "উম্মী নবী" এর কি অর্থ ইহাই যে, তিনি নিরক্ষর অশিক্ষিত ছিলেন? কখনও নয়—ইহা "উম্মী নবী" শব্দের ভুল ব্যাখ্যা। "উম্‌" অর্থ মা; উহার সহিত সম্পৃক্ত "ইয়্যা—ী" সন্নিবেশিত হইয়াছে। অর্থাৎ মায়ের সম্পৃক্তে ও সান্নিধ্যে প্রকৃতির শিক্ষা যেভাবে মানুষ লাভ করে যদিও উহা সীমাবদ্ধ এবং অপর্য্যাপ্ত, কিন্তু উহাও এক সুদীর্ঘ শিক্ষা এবং সেই শিক্ষা কোন গুরু বা শিক্ষক, কেতাব বা বই-পুস্তক, শিক্ষাগার বা বিদ্যালয়ের মাধ্যমে হয় না। তদ্রূপ নবীজী মোস্তফার অপরিসীম শিক্ষা ও পরিধিহীন জ্ঞানার্জন ঐ সব মাধ্যম ব্যতিরেকে সকল জ্ঞানের আকর সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ তা'য়ালার সরাসরি ব্যবস্থাপনায় সুসম্পন্ন হইয়াছে। নবীজী মোস্তফার সুপ্রশস্ত, সুগভীর জ্ঞানের সাক্ষ্য সারা বিশ্ব বহন করে—এই অসাধারণ জ্ঞান তিনি জাগতিক গুরু ও শিক্ষক ব্যতিরেকে মায়ের নিকটে থাকাবস্থায় উপার্জিত প্রাকৃতিক জ্ঞানের ন্যায় জাগতিক ও বাহ্যিক মাধ্যম ব্যতিরেকে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে "নবী-উম্মী" বলা হয়।

বিশ্ব গুরু হইবার জন্য যিনি ধরায় আসিলেন তিনি কেন এই বিশ্বের কোন গুরুকে গ্রহণ করিবেন? তাহা ঘটিলে ত তিনি ছোট হইয়া যাইতেন। এতদ্ভিন্ন মানুষের জ্ঞান অসম্পুর্ণ সেই পাত্রের জ্ঞান বিশ্বনবীর জন্য যথেষ্ট ও পর্য্যাপ্ত হইবে কিরূপে? তাই স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই তাঁহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। নবীজী মোস্তফা "উম্মী" হওয়ার তাৎপর্য্য ইহাই এবং এই মর্ম্মেই আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى "সকল মানুষের ন্যায় আপনিও শিক্ষাহীনরূপে ধরাপৃষ্ঠে আসিয়াছিলেন, তৎপর আমি স্বয়ং আপনাকে সকল জ্ঞানের পথ প্রদর্শন করিয়াছি।"

আল্লাহ তায়ালা পূর্ব্ব হইতেই হযরত (দঃ)কে হাতে-কলমে শিক্ষা ও ট্রেনিং দিয়া তাঁহাকে বিশেব বিশেষ গুণে গুণান্বিত এবং বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ বানাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিধাতা অতি যত্নের সহিত নবীজী মোস্তফার পয়গাম্বরী জবীনের গঠনকার্য্য চালাইয়াছেন। ছুরা ওয়াজ্-জুহার মধ্যে এই শ্রেণীর কতিপয় বিষয়ের উল্লেখও রহিয়াছে। যথা—(১) আল্লাহ তায়ালা হযরত (দঃ)কে প্রথম হইতে পিতা-মাতাহীন এতিম বানাইয়াছিলেন, যেন তিনি প্রত্যক্ষরূপে এতিম নিরাশ্রয়ের দুঃখ দরদ বুঝিতে সক্ষম হন এবং তাহাদের মন রক্ষা করার অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাহাই আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى

"আল্লাহ আপনাকে প্রথমে এতিম বানাইয়া পরে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন।"
"فاما اليتيم فلا تقهر--সুতরাং আপনি এতিমকে ধমক দিয়া কথা বলিবেন না—তাহার প্রতি কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিবেন না।"

(২) আল্লাহ তায়ালা প্রথমে হযরত (দঃ)কে কপর্দ্দক রিক্তহস্ত ও দরিদ্র বানাইয়াছিলেন, যেন তিনি দরিদ্রের দুঃখ-দরদ প্রত্যেক্ষরূপে অনুধাবন করিতে সক্ষম হন এবং সেই দৃষ্টিতে তাহাদের প্রতি উদারতার ব্যবহার করিতে ত্রুটি না করেন; তাহাই আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, ووجدك عائلا فاغنى—আল্লাহ আপনাকে প্রথমে রিক্ত হস্ত দরিদ্র বানাইয়া পরে আপনার সচ্ছলতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, "واما السائل فلا تنهر—সুতরাং আপনি দারিদ্রের আঘাতে যাচ্ঞায় লিপ্ত মানুষকে ধিক্কার দিবেন না।"

(৩) আল্লাহ তায়ালা হযরতকে প্রথমে উম্মী—শিক্ষা-দীক্ষায় নিঃস্বম্বল বানাইয়া পরে তাঁহাকে পরিপক্ক জ্ঞান-ভাণ্ডার দান করিয়াছিলেন, জ্ঞানের আকর বানাইয়াছিলেন, যেমন অন্যত্র পবিত্র কোরআনে আছে—

مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا

"কোরআন কি জিনিষ, ঈমান কি জিনিষ তাহা পূর্ব্বে আপনি কিছুই জানিতেন না; হাঁ—পরে আমি আপনাকে কোরআন দান করিয়াছি এবং আমি উহাকে নূর ও আলো রূপ দিয়াছি।" (আপনাকে সেই কোরআন দান করিয়া আপনাকে পরিপক্ক জ্ঞান-ভাণ্ডারের অধিকারী করিয়াছি।)

আল্লাহ হযরতকে প্রথমে শিক্ষা-দীক্ষায় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিঃস্বম্বল বানাইয়াছিলেন; যেন তিনি শিক্ষা-দীক্ষাহীন পথহারা মানবের অভাবটাকে প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন এবং সেই অনুপাতে তাহাদের অভাব মোচনে সচেষ্ট হন।

ছুরা ওয়াজ্-জুহার মধ্যে আল্লাহ তায়ালা তাহাই বলিতেছেন—

"ووجدك ضالا فهدى—আল্লাহ আপনাকে প্রথমে এইরূপ বানাইয়া ছিলেন যে, আপনি কিছুই জানিতেন না, পরে আপনাকে (পরিপক্ক জ্ঞান-বিজ্ঞানের) পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।"

واما بنعمة ربك فحدث—সুতরাং (বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের) যে সব অমূল্য রত্ন নেয়ামত সমূহ আপনাকে আপনার প্রভু দান করিয়াছেন তাহা অযাচিত ভাবে সকলের মধ্যে ব্যক্ত করতঃ বিতরণ করুন।

এই ট্রেনিং দান প্রসঙ্গই নিম্নে বর্ণিত হাদীছের মর্ম্ম এবং সেই সূত্রেই হযরত নবীজী (দঃ) বিশেষ রূপে এই হাদীছের বিষয় বস্তুটি সর্ব্ব সমক্ষে ব্যক্ত করিয়াছেন।

১৬৬৫। হাদীছ ঃ— اخبرنى جابر بن عبد الله رضى الله عنه

قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ نَجْنِى

الْكِبَاثَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْاَسْوَدِ مِنْهُ فَاِنَّهُ اَطْيَبُ فَقِيْلَ اَكُنْتَ تَرْعَى

الْغَنَمَ قَالَ نَعَمْ وَهَلْ مِنْ نَبِىٍّ اِلَّا رَعَاهَا -

অর্থ—বিশিষ্ট ছাহাবী জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা "মার্‌রুজ্‌-জাহ্‌রান" নামক স্থানে রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তথায় আমরা "পীলু" নামক (এক প্রকার জংলা) গাছের গোটা চয়ন করিতেছিলাম। হযরত (দঃ) আমাদিগকে বলিলেন, যেগুলি (পাকিয়া) কাল হইয়া গিয়াছে ঐগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিও ; ঐগুলি অধিক সুস্বাদু।

তখন এক ব্যক্তি হযরত (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি বকরীর রাখালী করিয়াছেন ? হযরত (দঃ) উত্তর করিলেন, হাঁ ; কোন নবী এই রকম হন নাই যিনি বকরীর রাখালী না করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—"পীলু" গাছ শহরে বন্দরে হয় না, উহা সাধারণতঃ বস্তিবিহীন এলাকায় আগাছার ন্যায় জন্মিয়া থাকে। উহার গোটা বা ফল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা একমাত্র রাখাল শ্রেণীর লোকদেরই হইতে পারে যাহারা ঐ ধরণের এলাকায় পশু পাল লইয়া ঘোরাফিরা করিয়া থাকে। হযরত (দঃ) শহরবাসী ছিলেন, কিন্তু তিনি পীলু গাছের ফল সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন উহা দৃষ্টেই প্রশ্নকারী হযরত (দঃ)কে বকরীর রাখালী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। কারণ, আরব দেশে উট এবং বকরী বা মেষ শ্রেণীর পশুপালই অধিক, কিন্তু উট অতিশয় শক্তিশালী বড় জানোয়ার হওয়ায় উহার জন্য রাখালের আবশ্যক হয় না এবং সাধারণতঃ উহার রাখাল সব সময় রাখাও হয় না।

প্রশ্নকারীর উত্তরে হযরত (দঃ) নিজের সম্পর্কে ত "হাঁ" বলিলেনই ; তদুপরি ইহাও বলিলেন যে, প্রত্যেক নবীর দ্বারাই বকরীর রাখালী করান হইয়াছে। হযরত মূছা (আঃ) দীর্ঘ দশ বৎসরকাল এই রাখালী করিয়াছিলেন যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) রাখালীর কাজ কিছুদিন ত কচি বয়সে করিয়াছিলেন যখন তিনি দুধ-মা বিবি হালিমার গৃহে ছিলেন। এতদ্ভিন্ন মক্কায় থাকিয়াও মক্কাবাসীদের বকরীর রাখালী করিয়াছিলেন। ইহা অবশ্য একটু বয়স্ক অবস্থায় হইয়াছিল, কারণ ইহা তিনি আজুরার বিনিময়ে করিয়াছিলেন, যাহার বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে—

১৬৬৬। হাদীছ :— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ مَا بَعَثَ اللّٰهُ نَبِيًّا اِلَّا رَاعِى غَنَمٍ فَقَالَ

اَصْحَابُهُ وَاَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ اَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيْطَ لِاَهْلِ مَكَّةَ ـ

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যত নবীই পাঠাইয়াছেন প্রত্যেককেই বকরীর রাখালী করিতে হইয়াছিল। এতচ্ছ্রবনে ছাহাবীগণ হযরত (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনিও করিয়াছেন? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ—আমি মক্কাবাসীদের বকরী চরাইয়া থাকিতাম কয়েক "ক্বীরাত" (অতি কম মূল্যমানের মুদ্রা)-এর বিনিময়ে।

ব্যাখ্যা—রাখালী জীবনের সহিত পয়গাম্বরী জীবনের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে; প্রথমতঃ স্বচ্ছ ধ্যান, গভীর চিন্তা ও নির্ম্মল তপস্যার নীরব সুযোগ লাভ হয় এই জীবনে। অন্তর সমুদ্রে ভাবের ঢেউ সৃষ্টির জন্য এই জীবনের এই পরিবেশের মুক্ত বাতাস এক বিশেষ অবলম্বন। উপরে উন্মুক্ত নীল আকাশ, নীচে ভূপৃষ্ঠ—সবুজ শ্যামল বা মরুদ্যান, চতুষ্পার্শ্বে পর্ব্বতমালা বা সবুজ মাঠ, সঙ্গী আছে সর্ব্ব প্রকার সৃষ্টি-রহস্যের বাহক পশুপাল। কি দৃশ্য! কি মনোহর! কি চমৎকার! ভাবুকের জন্য ভাব সৃষ্টির সব উপাদানই একত্রে বিদ্যমান রহিয়াছে চোখের সামনে। এই পরিবেশের সুযোগের প্রতিই ইঙ্গিত দিয়াছেন আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে—

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ

وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

"লক্ষ্য কর না কেন—উটগুলির সৃষ্টি-নৈপুন্যের প্রতি, উর্দ্ধ আকাশের ধারণ-কৌশলের প্রতি, পর্ব্বতমালার গ্রথনবিধির প্রতি, ভূপৃষ্ঠের সুসমতল বিন্যাসের প্রতি?" প্রকৃতির এই নিবিড় নীরবতার প্রশান্তি ভাবুকের জন্য কতই না উপভোগ্য!

রাখাল এই মানচিত্রে মনোনিবেশ করিলে সে সৃষ্টিকর্ত্তার মারেফাতের বিরাট ভূমিকায় পৌঁছিতে সক্ষম হইবে। এই রাখালী জীবনে যদি পদার্পণ করেন কোন নবী তবে তিনি যে এই বিশাল প্রান্তর হইতে কত হীরা-মাণিক্য আহরণ করিতে সক্ষম হইবেন তাহা সহজেই অনুমেয়।

রাখালী জীবনের সহিত পয়গাম্বরী জীবনের আরও গভীর সম্বন্ধ এই যে, একজন রাখালের কর্ত্তব্য এই বিষয়গুলির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা—পশুপাল বিপথগামী না হয়, অপরের শস্যক্ষেত্র নষ্ট না করে, কোনটা হারাইয়া না যায়, বাঘে না

ধরিতে পারে; অথচ প্রতিটি পশু উপযুক্ত আহার পাইয়া সন্ধ্যায় প্রভুর গৃহে নির্বিঘ্নে ফিরিয়া আসে। এই কর্ত্তব্যের সহিত পয়গাম্বরী জীবনের কত নিকটতম সম্বন্ধ! পয়গাম্বর গোটা একটা জাতির পরিচালক। রাখাল পশু চালক, আর পয়গাম্বর মানুষ চালক; আল্লার বন্দাদেরে সুপথে চালনা করা এবং কুপ্রবৃত্তি, কুপরিবেশ ও শয়তানের আক্রমণ হইতে হেফাজত করতঃ ইহ-পরকালের খোরাক জোগাইয়া সকলকে প্রভুর দ্বারে পৌঁছাইয়া দেওয়াই পয়গাম্বরের কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যের দায়িত্ব বহন বাস্তবরূপে উপলব্ধি করিবার এবং উহার কর্ম্মগত অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যেই পয়গাম্বরগণের জন্য রাখালীর অনুশীলন।

রাখালী অনুশীলনের মধ্যে বকরী চারণের অধ্যায় পয়গাম্বরী জীবনের প্রয়োজন পক্ষে নিকটতম সহায়ক। কারণ, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার গুণ অপরিসীমভাবে নবীর মধ্যে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। বিভিন্ন খেয়াল, বিভিন্ন মেজাজ, বিভিন্ন অভ্যাস ও বিভিন্ন মতবাদের লোকদের সম্মুখীন হইতে হয় নবীকে, তাই তাঁহাকে বিনয়ী বিনম্র ও কোমল এবং সহিষ্ণু হইতে হইবে, ক্রোধের বান ডাকার ঘটনায়ও তাঁহাকে পর্ব্বত সমতুল্য হইয়া ধীর স্থির থাকিতে হইবে।

বকরীর রাখালী করার মধ্যে এই গুণগুলি প্রাকৃটিক্যালীরূপে হাসিল হইয়া থাকে। সুধীগণ বলিয়াছেন, কচি-কাচার শিক্ষকতা করিতে হইলে পূর্ব্বে বকরীর রাখালী করার ট্রেনিং দেওয়া অতিশয় লাভজনক হইয়া থাকে।

এই ট্রেনিং-এর উদ্দেশ্যেই প্রত্যেক নবীকে বকরীর রাখালী করিতে হইয়াছে, এমন কি বিশ্ব নবী ছাইয়েদুল-মোরছালীন তাঁহার শান ও মর্য্যাদার সম্পূর্ণ অযোগ্য—অতি কম মূল্য মানের মাত্র কতিপয় মুদ্রার বিনিময়ে রাখালীর মজ্‌দুরীও করিয়াছেন। ট্রেনিং দানে যাইয়া মানুষ কত কিছু করিতেই বাধ্য হয়।

সিরিয়া ছফরে হযরত (দঃ):

মক্কার এক ধনাট্য মহিলা "খাদিজা" তিনি লোকদের দ্বারা লভ্যাংশ প্রদানের ভিত্তিতে ব্যবসা চালাইয়া থাকিতেন। হযরতের বয়স যখন ২৪ বৎসর শেষ প্রায়; তখন একদা হযরতের চাচা আবুতালেব তাঁহাকে বলিলেন, এই বৎসর আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই সঙ্কটাপুর্ণ; সিরিয়ার বাণিজ্যের মৌসুম উপস্থিত হইয়াছে; বহু লোকই বিবি খাদিজার নিকট হইতে পুঁজি লইয়া সিরিয়ায় ব্যবসা করিতে যাইবে; তুমিও যদি সেই পন্থা অবলম্বন করিতে তবে ভাল হইত। তোমাকে সিরিয়ায় প্রেরণ করা যদিও আমার ইচ্ছার বিপরীত, কিন্তু উপর্যুপরি দুর্ভিক্ষের দরুন অর্থনৈতিক চাপে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছি।

হযরত (দঃ) চাচাকে উত্তর দিলেন যে, হয়ত খাদিজা নিজেই আমার নিকট এই ব্যাপারে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবে। তাই আমি স্বয়ং অগ্রসর না হইয়া অপেক্ষা

করি। আবুতালেব বলিলেন, অন্যান্য সকলকে দেওয়া হইয়া গেলে ভয় হয় যে, হয়ত তোমাকে দেওয়ার মত কিছু থাকিবে না।

অতঃপর হযরতের উল্লেখিত ধারণাই বাস্তবায়িত হইল—বিবি খাদিজা স্বয়ং হযরতের নিকট এই বলিয়া লোক পাঠাইলেন যে, আপনার সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও মহানুভবতা এবং চরিত্র-মহিমা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে ; আমি আপনাকে অন্যান্যদের তুলনায় দ্বিগুণ পুঁজি এবং অধিক লভ্যাংশ প্রদান করিয়া ব্যবসায় নিয়োগ করিতে চাই। হযরত (দঃ) স্বীয় চাচাকে এই সংবাদ অবগত করিলেন। চাচা বলিলেন, এই অর্থ নৈতিক সুযোগ আল্লাহ তায়ালা তোমাকে বিশেষরূপে প্রদান করিয়াছেন।

অতঃপর হযরত (দঃ) সিরিয়া গমনের প্রস্তুতি করিলেন। বিবি খাদিজার বিশিষ্ট ভৃত্য ক্রীতদাস মাইসারাহ্ও হযরতের সঙ্গে গেল। হযরত (দঃ) প্রসিদ্ধ ব্যবসা কেন্দ্র বোছরায় পৌঁছিলেন। বোছরা শহরে একটি বৃক্ষের ছায়ায় তিনি বসিলেন। নিকটবর্ত্তী স্থানেই "নাস্তূরা" নামক বিশিষ্ট পাদ্রির অবস্থান ছিল। তিনি হযরতকে ঐ বৃক্ষের ছায়ায় দেখিয়া তৎক্ষণাৎ হযরতের সঙ্গী মাইসারাহ্কে ডাকিয়া নিলেন এবং তাহাকে বলিলেন, এই লোকটি পয়গাম্বর হইবেন। অতঃপর পাদ্রি স্বয়ং হযরতের নিকট আসিয়া তাঁহার কদমবুছী করিলেন এবং হযরতের মোহ্রে-নবুয়তের প্রতি লক্ষ্য করতঃ উহাকে চুম্বন করিলেন এবং বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আপনি আল্লার রসুল হইবেন যাঁহার সম্পর্কে হযরত ঈসা (আঃ) ভবিষ্যদ্বানী করিয়া গিয়াছেন। ঐ পাদ্রী মাইসারার নিকট এই আক্ষেপও প্রকাশ করিলেন যে, কতই না সৌভাগ্য হইবে, যদি আমি তাঁহার আবির্ভাবকাল পাই।

ঐ বোছ্রা শহরেই আর একটি লোক যাহার সঙ্গে হযরতের ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল সেই লোকটিও মাইসারাহ্কে জ্ঞাত করিয়াছিল যে, ইনি পয়গাম্বর হইবেন যাঁহার সম্পর্কে আসমানী কেতাব সমূহে উল্লেখ রহিয়াছে এবং পাদ্রীগণও তাহা অবগত আছেন।

এতদ্ভিন্ন মাইসারাহ্ এই ছফরের মধ্যে সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়াছে যে, রৌদ্রের মধ্যে চলাকালে দুইজন ফেরেশতা হযরতের মাথার উপর ছায়া করিয়া থাকিত।* এমনকি হযরত যখন এই সুদীর্ঘ ছফর হইতে ফিরিয়া আসিলেন তখন তিনি দুপুর বেলা মক্কা নগরীতে পৌঁছিলেন। বিবি খাদিজা স্বীয় দ্বিতল বারান্দা হইতে তাঁহাকে

* প্রাগ ইসলাম যুগেও ফেরেশতা সম্পর্কে মানুষের ধারণা-বিশ্বাস ছিল। এমনকি মোশরেক পৌত্তলিক মক্কাবাসীদেরও ঐ বিশ্বাস ছিল। তাহারাও ফেরেশতাকে দৈব-দূৎ পবিত্রাত্মা ধারণা করিত। নবীজীর উপর ছায়া দানকারী বস্তু ত মেঘ খণ্ডের আকৃতির ছিল, কিন্তু সৎ-সাধু ব্যক্তি নবীজীর উপর বোধমান প্রাণীর ন্যায় ছায়া দিয়া আসিতেছে দেখিয়া দর্শকগণ উহাকে পবিত্রাত্মা ফেরেশতা গণ্য করিয়াছে এবং তাহাই ব্যক্তও করিয়াছে।

দেখিতেছিলেন, তখনও ঐ দুই ফেরেশতা হযরতের মাথার উপর ছায়া করিয়াছিলেন এবং বিবি খাদিজা উহা অবলোকন করিয়াছিলেন। যখন মাইসারাহ্ বিবি খাদিজার নিকট উপস্থিত হইল তখন তিনি তাহাকে উক্ত ঘটনা বলিলেন। মাইসারাহ্ তাঁহাকে বলিলেন, আমি ত আগা-গোড়া সম্পূর্ণ ছফরেই এই অবস্থা বিরাজমান দেখিয়াছি। এতদ্ভিন্ন মাইসারাহ্ বোছ্‌রা শহরের পাদ্রীর এবং অপর লোকটির উপরোল্লিখিত ঘটনাও বিবি খাদিজার নিকট ব্যক্ত করিলেন। ↑

↑ **সমালোচনা**—মোস্তফা-চরিত গ্রন্থের সঙ্কলক মরহুম আকরম খাঁ সাহেবের দুর্ভাগ্য—যখনই নবীগণ সম্পর্কে কোন অসাধারণ বা অস্বাভাবিক (অসম্ভব নয়) ঘটনার উল্লেখ আসিয়াছে তখনই তাঁহার পেটে ব্যথা সৃষ্টি হইয়াছে এবং উদরাময়গ্রস্তের ন্যায় বেসামালরূপে নানা পচা-গলা, মল-ময়লার উদগিরণ আরম্ভ করিয়াছেন। কতিপয় নমুনা পূর্ব্বেও আলোচনা করা হইয়াছে—যেমন, নবীজীর ১২ বৎসর বয়সে প্রথম বহির্দেশ গমন আলোচনায় এই বোছরা শহরেই বহিরা পাদ্রির ঘটনা বর্ণিত ও আলোচিত হইয়াছে। আলোচ্য নাস্তরা পাদ্রির ঘটনার এবং মাইসারার বর্ণনার ব্যাপারে ত খাঁ সাহেবের লেখনী পুরা দস্তর কুৎসিত নর্দ্দমার ন্যায় পূতি-গন্ধের উদগার করিয়াছে।

তিনি ক্ষেপিয়াছেন এই বলিয়া যে—"এই গল্পগুলির দ্বারা প্রকারতঃ ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, বস্তুতঃ কোন প্রকৃতিগত মহিমা ও স্বাভাবিক গুণ-গরিমার জন্য বিবি খাদিজা হযরতের অনুরাগিণী হন নাই। নাস্তরার উক্তি, ইহুদীর উপদেশ বা ফেরেশতার ছায়া না হইলে এই অনুরাগ সৃষ্টির কোন কারণ ছিল না" (২৩৯ পৃঃ)। মনে হয় মস্তিষ্কের শুকতার দরুন খাঁ সাহেবের কর্ণকুহরে এরূপ একটা প্রলাপ ধ্বনিত হইয়াছে যে, একমাত্র এই সব ঘটনায়ই বিবি খাদিজা হযরতের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। এইরূপ প্রলাপ-ধ্বনি যে, তাঁহারই শুষ্ক মস্তিষ্কের জন্ম দেওয়া তাহা তিনি ঠাহর করিতে না পারিয়া পূর্ব্বাপর সীরত সঙ্কলকগণের প্রতি অযথা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। আলোচ্য ঘটনাবলী আরবী উরদু ভাষায় লিখিত সমস্ত সীরত সঙ্কলনেই বিদ্যমান রহিয়াছে। বড় বড় ইমাম ও আলেমগণ সকলেই এই সব বর্ণনা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কাহারও এইরূপ দাবী দূরের কথা কেহই ঘুণাক্ষরেও এইরূপ লেখেন নাই যে, হযরতের প্রতি বিবি খাদিজার অনুরুক্তির কারণ একমাত্র এই ঘটনাবলীই ছিল।

আমাদের ন্যায় সকলেই নবীজী মোস্তফার প্রকৃতিগত মহিমা এবং উদীয়মান গুণ-গরিমাকে হযরতের প্রতি বিবি খাদিজার অনুরাগিণী হওয়ার মূল কারণ সাব্যস্ত করিয়াছেন। অবশ্য মাইসারাহ কর্তৃক আলোচ্য ঘটনাবলীর বর্ণনা বিবি খাদিজাকে অধিক আকৃষ্ট করিয়াছে। নবীজীর প্রকৃতিগত মহিমা ও গুণ-গরিমা খাদিজার হৃদয়ে রেখা না কাটিলে হয়ত খাদিজাও আকরম খাঁ মরহুমের ন্যায় মাইসারার বর্ণনাগুলিকে বাহুল্য বলিয়া উড়াইয়া দিতেন।

বিবি খাদিজা সারা মক্কার বড় বড় লোকদের শত শত বিবাহ প্রস্তাবকে ঘুমন্ত ব্যক্তির ন্যায় উপেক্ষা করিয়া চল্লিশ বৎসর বয়সে পঁচিশ বৎসর বয়ক নবীজীর চরণে যে, অগাধ ধন-দৌলত সহ এইরূপে লুটিয়া পড়িলেন—ইহা নিশ্চয় এক বিরাট বড় অস্বাভাবিক ব্যাপার। ইহার পেছনে নিশ্চয় অন্য অস্বাভাবিক ঘটনাবলী শক্তি যোগাইয়াছে।

বিবি খাদিজার সহিত হযরতের শাদী মোবারক (৫৩৮পৃঃ)

কোরায়েশ বংশেরই এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে "খাদিজা" অতি সুপ্রসিদ্ধ রমণী ছিলেন। তিনি সারা মক্কায় সতিত্বে ও পাক-পবিত্রতায় প্রসিদ্ধ ছিলেন।

এই মহিয়সী মহিলা পবিত্র জীবন-যাপনে অতুলনীয় ইতিহাস প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। অন্তরের শুচিতা ও শুভ্রতায় এবং চরিত্রের পবিত্রতায় তিনি এতই সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে, লোকেরা তাঁহাকে খাদিজা না ডাকিয়া "তাহেরা" (সতী-সাধ্বী পবিত্রা) বলিয়া ডাকিত। (যোরকানী, ১)

প্রথমে একজনের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয় এবং তিনি তাহার ঔরসে দুই পুত্র জন্ম দান করেন। সেই প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর অন্য আর এক জনের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয় এবং তাহার ঔরষেও এক কন্যা জন্ম দান করেন। এই দ্বিতীয় স্বামীরও মৃত্যু ঘটে; অতঃপর তিনি বৈধব্য জীবন যাপন করিতে থাকেন। তাঁহার অগাধ ধন-দৌলত ছিল। তাঁহার পবিত্রতা ও ধনাঢ্যতার দরুণ অনেকেই তাঁহার পরিণয় লাভের অভিলাসী ছিল, কিন্তু তিনি কাহারও প্রতি ভ্রুক্ষেপ করিতেন না। অবশ্য হযরত মোহাম্মদ (দঃ) যদিও তখন নবী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি চরিত্রগুণের প্রসিদ্ধি বিবি খাদিজার অন্তরে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই আকর্ষণেই বিবি খাদিজা নিজে প্রস্তাব দিয়া হযরত (দঃ)কে টাকা প্রদানে বাণিজ্যে পাঠাইয়া ছিলেন। বাণিজ্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর হযরতের সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার চাক্ষুস অভিজ্ঞতায় অধিক মুগ্ধ হইলেন। তদুপরি হযরতের প্রত্যাবর্ত্তন মুহূর্ত্তে খাদিজার স্বচক্ষে অবলোকিত অলৌকিক ঘটনা দৃষ্টে তিনি আরও অভিভূত ছিলেন; তৎসঙ্গে তাঁহারই গোলাম মাইসারার সাক্ষ্য ও বিবৃতি বিবি খাদিজার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিল।

বিবি খাদিজা হযরতের দীপ্ত সূর্য্যের প্রভাতী আলোর ইঙ্গিতে তাঁহার ভবিষ্যৎ অনুধাবন করিতে পারিলেন। এতদ্ব্যতীত বিবি খাদিজার এক দূর সম্পর্কীয় মুরুব্বী চাচা ছিলেন "অরাকাহ্ ইবনে নওফল"; তিনি খাঁটী খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ও আসমানী কেতাব তৌরাত-ইঞ্জিলের পারদর্শী ছিলেন। বিবি খাদিজা তাঁহার নিকট গমন করিয়া সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলেন; নাসতুরা পাদ্রীর উক্তি এবং মাইসারার দেখা ও শুনা ঘটনাবলী এবং নিজের দেখা ঘটনা সবই বর্ণনা করিলেন। সকল বিবরণ শ্রবণান্তে অরাকাহ্ বলিলেন, হে খাদিজা! যদি এই সব ঘটিয়া থাকে তবে নিশ্চয়ই মোহাম্মদ (দঃ) এই যুগের নবী হইবেন; আমি আসমানী কেতবের আলোতে এই নবীর আবির্ভাব সম্পর্কে ওয়াকেফহাল রহিয়াছি; তাঁহার আবির্ভাবকাল অতি নিকটবর্ত্তী আমরা তাঁহার প্রতীক্ষায় আছি। (সীরতে-মোস্তফা, ১—৮৩)

বিবি খাদিজার বয়স তখন চল্লিশের উর্দ্ধে; একে একে দুইটি বিবাহের পর তিনি বিধবা হইয়া ছিলেন, তাঁহার কয়েকটি পুত্র-কন্যা জন্মিয়াছিল। এই অবেলায় তাঁহার অন্তর-তলে এক নূতন স্বপ্ন উঁকি দিল, এক নূতন ভাব জাগিয়া উঠিল। যে সাধের প্রতি তিনি দীর্ঘদিন হইতে সম্পুর্ণ উদাসীন ছিলেন, অননুরক্ত ছিলেন, ভুলেও এতদিন অন্তর উহার প্রতি বিন্দুমাত্র অগ্রসর হয় নাই—সেই স্বপ্ন সেই সাধ আজ তাঁহার অন্তরকে নূতন করিয়া দোলা দিল—কেন? নবীজী মোস্তফার গুণগরিমা এবং তাঁহার অসাধারণ দ্বীপ্ত ভবিষ্যতের কিরণমালায় সৃষ্ট আকর্ষণের দরুনই বিবি খাদিজা এই অবেলায় তাঁহার জীবন-তরীকে এক ভিন্ন শ্রোতে ভাসাইতে উদ্যতই নয় শুধু, বরং উদগ্রীব হইয়া পড়িলেন।

এই নূতন প্রেরণা বিবি খাদিজাকে এমন চঞ্চল করিয়া তুলিল যে, তাঁহার অন্তরকে যেন টানিয়া বাহিরে লইয়া ছুটিল। তিনি নিজকে নিজের মধ্যে সামলাইয়া স্থির রাখিতে পারিলেন না, উদিত ভাবকে নিজ অভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিতে সমর্থ হইলেন না। নবীজী মোস্তফার চরনতলে আশ্রয় লাভের সন্ধানে পাগলপারা হইয়া পড়িলেন। এই ব্যতিব্যস্ততা ও ব্যাকুলতা তাহার চরম বুদ্ধিমত্তার এবং পরম সৌভাগ্যের পরিচায়কই ছিল—যাহা লাভে তিনি ধন্যও হইতে পারিয়া ছিলেন।

নবীজী মোস্তফার সহিত বিবি খাদিজার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়তা ছিল; নবীজীর পঞ্চম উর্দ্ধতন পিতার মধ্যে বিবি খাদিজার বংশ মিলিত; অতএব তাঁহার আবেগ প্রকাশে তিনি কিছুটা সাহস বোধ করিলেন। প্রথমে তিনি তাঁহার এক বিশেষ সহচরী "নফিসা" কে নিয়োগ করিলেন নবীজীর মনোভাব আঁচ করার জন্য ↑। প্রতিকুলতার আশঙ্কা না দেখিয়া দ্বিগুণ সাহসে বিবি খাদিজার বুক ভরিয়া উঠিল। এইবার তিনি নবী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বিবাহের সুস্পষ্ট প্রস্তাব পাঠাইতে সাহস করিলেন।

বিবি খাদিজা শুধু প্রভুত ধন-সম্পত্তির অধিকারিণীই ছিলেন না; ধন অপেক্ষা তাঁহার অন্তরের ঐশ্বর্য ছিল অনেক বেশী। তিনি পরিণত বয়স্কা বিধবা ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে শান্ত শ্রী, স্বর্গীয় পবিত্রতা এবং আত্ম-সৌন্দর্যের গুণাবলী যাহা ছিল তাহা ত অন্ধকার যুগের সমাজ-চোখেও লুকায়িত ছিল না; যদ্দরুন স্বতঃস্ফুর্তরূপে সমাজ তাঁহাকে "তাহেরা"-পবিত্রা বলিয়া সম্বোধন করিত। তাঁহার সেই গুণাবলী এবং চারিত্রিক সৌন্দর্য ও মাধুরী কি নবীজী মোস্তফার চোখে ধরা

↑ বিশ্বনবীর জীবনী লিখক একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি নফিসার ভূমিকাকে কবিত্বের ললিত ভাষায় নাটকীয় রশিকতার ভাব-ভঙ্গিতে যে সাজগোজ দিয়াছেন আমরা উহা নবীজীর জীবনী আলোচনার কোন ইতিহাসে পাই নাই। ঐরূপ না লেখাই বাঞ্ছনীয়; লালিত্য ও রসিকতার মাধুর্য সুন্দর বটে, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে নয়। নবীজী মোস্তফার জীবনী বর্ণনায় অতিশয় সতর্কতা আবশ্যক।

পড়ে নাই ? নিশ্চয় ধরা পড়িয়া থাকিবে। কারণ নবীজী নিজে পবিত্র ; তিনি পবিত্রতার মূল্য না দিয়া পারেন কি ?

قدر گل بلبل بداند یا بداند شاه پری
قدر گوهر شاه بداند یا بداند جوهری

ফুলের সৌরভ ভালবাসে বুলবুলী আর রাজপরী
মণি-মুক্তার কদর করে রাজ-রাজা আর জওহরী

আল্লাহ তায়ালাও বলিয়াছেন— اَلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبَاتِ

"পবিত্র পুরুষদের জন্য পবিত্রা নারীগণ, পবিত্রা নারীদের জন্য পবিত্র পুরুষগণ (ইহাই স্বভাব, ইহাই প্রকৃতি) (১৮ পাঃ ৯ রুঃ)। অতএব স্বভাব ও প্রকৃতির ধর্ম্ম মতেই নবীজী বিবি খাদিজার আবেগের প্রতি সাড়া দিতে বাধ্য ছিলেন।

এতদ্ভিন্ন বিধাতার নির্দ্ধারণেও নবী মোস্তফার জন্য খাদিজা-তাহেরার ন্যায় একজন পবিত্রা, পারদর্শী, অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ শান্তবুদ্ধি সম্পন্না জীবন-সঙ্গীনীর প্রয়োজন ছিল ; যিনি তাঁহার ঘরে-বাহিরে গোছাল ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করিবেন। নবীজীর সম্মুখ জীবনে নানা প্রয়োজন দেখা দিবে ; বিভিন্নমুখী প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যথাযোগ্য সমাধান প্রদানের জন্য আবশ্যক বিরাট প্রতিভার। সে প্রতিভা বিবি খাদিজার মধ্যে কি পরিমাণের ছিল তাহা নবীজীর সহিত তাঁহার দাম্পত্য জীবনের পরম ও চরম সাফল্যই প্রমাণ করিবে। آفتاب آمد دلیل آفتاب "সূর্য্য নিজেই নিজের জন্য উজ্জল প্রমাণ।"

কুদরতের খেলা—দেশে ও সমাজে সর্বত্র নবীজীর সদগুণরাজি এমনই ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া পড়ে যে, "আল-আমীন" (সৎ-সাধু বিশ্বস্ত) নাম হযরতের জন্য সারা মক্কায় তাঁহার অন্য সব নামকে ঢাকিয়া ফেলে। অপর দিকে বিবি খাদিজাও তাঁহার অপরিসীম মহত্ত্বের প্রভাবে "তাহেরা" (সতী-সাধ্বী) নামেই পরিচিতা হইয়া পড়েন। এই দুইটি নামের পরিবর্ত্তন-রহস্য বাস্তবিকই এক অভুতপূর্ব ব্যাপাররূপে স্বর্গের মঙ্গলধারা প্রবাহের ইঙ্গিত বহন করিতে ছিল। কুদরত যেন নিজ হস্তে জগৎ-জননী সতী-সাধ্বী তাহেরাকে বিশ্বনবী আল-আমীনের জন্য সহধর্ম্মিনীর যোগ্য করিয়া তুলিয়া ছিলেন।

প্রথম খণ্ড ৩নং হাদীছের ঘটনায় জিব্রিল ফেরেশতার প্রথম সাক্ষাৎ এবং সর্ব্বপ্রথম অহীর অবতরণ চাপে নবীজী হেরা-গুহা হইতে কাতর হইয়া গৃহে ফিরিলেন। বিবি খাদিজা ঐ সময় সান্ত্বনা ও বুঝ প্রবোধ দানে তাঁহার কাতরতা লাঘবে যে ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে চিরবিদ্যমান

থাকিবে। বিবি খাদিজার অসাধারণ প্রতিভার সুফল নবীজী খাদিজার সহিত দাম্পত্য জীবনে সর্ব্বদাই উপভোগ করিয়াছেন। এই সুখ, এই শান্তি, এই মাধুরী খাদীজার সান্নিধ্যে নবীজী সর্ব্বদাই লাভ করিতেন। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের দাম্পত্য জীবনে বিবি খাদিজা নবীজীর সুখ-শান্তি যোগাইয়া চিরধন্য হইতে পারিয়া ছিলেন। বিবি খাদিজা তাঁহার এই বিরাট সাফল্যের দ্বারাই নবীজী মোস্তফার অন্তরে বিশেষ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উভয়ের পরম তৃপ্তি এবং চরম সন্তুষ্টির মধ্য দিয়া দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। অকৃত্রিম ভালবাসা ও প্রীতির সহিত বিবি খাদিজা নিজকে নবীজীর চরনে বিলাইয়া দিয়া নবীজীর মনকে এতই মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে, বিবি খাদিজা দুনিয়া হইতে বিদায় নিয়াও নবীজী মোস্তফার অন্তর হইতে বিদায় নিতে পারেন নাই। বিবি খাদিজার মৃত্যুতে হযরত (দঃ) গভীর মর্ম্ম বেদনায় শোকাভিভুত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। এমনকি বিবি খাদিজার মৃত্যু বৎসরকে নবী (দঃ) "আমুল-হোয্‌ন"— শোকের বৎসর আখ্যা দিতেন। খাদিজা জীবিত থাকা পর্য্যন্ত নবীজী দ্বিতীয় কোন বিবাহ করিয়াছিলেন না। বিবি খাদিজার মৃত্যুর পরও সকল স্ত্রীর উর্দ্ধে ছিল তাঁহার আসন; তাঁহার আসন কেহই দখল করিতে পারেন নাই।

নবীজীর পরবর্ত্তী জীবনের তরুণ-বয়স্কা সর্ব্বাধিক ভালবাসার স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) এই বিষয়ে ইঙ্গিত বহনের একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

১৬৬৭। হাদীছ ঃ—বিবি খাদিজার প্রতি আমি যেরূপ গায়রত (নিজকে তাঁহার সমকক্ষ না দেখায় আত্ম-যাতনা) অনুভব করিতাম নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোন স্ত্রীর প্রতি সেইরূপ অনুভব করিতাম না, অথচ আমি (খাদিজার সময় পাই নাই—) তাঁহাকে দেখিও নাই। কিন্তু নবী (দঃ) তাঁহার স্মরণ তাঁহার আলোচনা অত্যধিক করিয়া থাকিতেন (বলিয়াই আমার মন তাঁহার প্রতি ঐরূপ ছিল)।

নবী (দঃ) অনেক সময় বকরী জবাই করিতেন এবং উহার সম্পূর্ণ গোশ্‌ত বণ্টন করিয়া খাদজার বান্ধবীদের বাড়ী বাড়ী পাঠাইয়া দিতেন। কোন কোন সময় আমি কটাক্ষ করিয়া বলিতাম, মনে হয় যেন—দুনিয়াতে খাদিজা ভিন্ন আর কোন মহিলা জন্মে নাই! উত্তরে নবী (দঃ) আবার খাদিজার প্রশংসা আরম্ভ করিয়া দিতেন— খাদিজা এরূপ ছিল, ঐরূপ ছিল; তাঁহার হইতে আমার সন্তান-সন্ততি ছিল। (৫৩৯পৃঃ)

বিবি খাদিজা নবীজীর সেবা কিরূপ অন্তরে করিতেন তাহা অন্তর্যামী আল্লাহই জানেন। তাই আল্লাহ তায়ালা বিবি খাদিজাকে নবীজীর সেবার এক বিশেষ ভূমিকায় এমন এক সৌভাগ্য উপহার দিয়াছিলেন যাহা পয়গাম্বর ভিন্ন কাহারও লাভ হয় নাই।

১৬৬৮। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হঠাৎ জিব্রায়ীল (আঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিলেন এবং

বলিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ। এখনই বিবি খাদিজা আপনার খাদ্য সামগ্রী পাত্রে করিয়া নিয়া আসিতেছেন ; তিনি আসিয়া পৌছার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে তাঁহার প্রভু-পরওয়ারদেগারের সালাম বলিবেন এবং আমারও সালাম বলিবেন। আর তাঁহাকে বেহেশতের একটি বিশেষ (শান্তিনিকেতন) মতি-মহলের সুসংবাদ দিবেন যেখানে শান্তি ভঙ্গকারী কোন শব্দও হইবে না, কোন বিষন্নতাও থাকিবে না। (৫৩৯পৃঃ)

বিবি খাদিজা গুণগরিমা ও মহত্ত্বের এত উচ্চ শিখর জয় করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন যাহার নিকটবর্ত্তী হওয়াও জগতের অন্য কোন মহিলার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

১৬৬৯। হাদীছ ঃ—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি—(বনী ইস্রায়ীলের মধ্যে সর্ব্বোত্তম মহিলা ছিলেন, মরিয়ম। আর আসমান-জমিনের মধ্যে সর্ব্বোত্তম মহিলা খাদিজা। (৫৩৮পৃঃ)

মহীয়সী মহিলা বিবি খাদিজার মহত্ত্ব নবীজীর চরন ছায়ায় পূর্ণতা লাভ করিয়া ছিল বটে, কিন্তু উহার মূলের অধিকারিনী তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চয়ই ছিলেন এবং উহার উন্নতির যোগ্য পাত্রীও ছিলেন। অন্ধকার যুগে তাঁহার ন্যায় পবিত্রা মহীয়সীকে ধূলার ধরণীতে বেহেশতী সওগাত বলিলে অত্যুক্তি হইত না। মক্কার গণ্য-মান্য বড় বড় সর্দার কত জনেরই না আকঙ্খা ছিল বিবি খাদিজার প্রতি, অথচ তিনি আবার বিবাহ করা হইতে এতই নির্লিপ্ত ছিলেন যে, সেইরূপ প্রস্তাবের প্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। কিন্তু তাঁহার সৌভাগ্য তাঁহাকে নবীজীর প্রতি আকৃষ্ট করিল এবং তাঁহার মহত্ত্ব তাঁহার প্রস্তাবের প্রতি নবীজীকে আহ্বান করিল। যেরূপ—

"জওহরী জওহর চিনে, ভোমরায় চিনে মধু
ভোমরা কি বসে কভু রং দেখিয়া শুধু ?"

নবীজী মোস্তফার আদর্শ ও সুন্নত হইবে সংসারী জীবন। ইসলাম স্বভাবের ধর্ম্ম ; সুষ্ঠু ও পবিত্র স্বভাবে যাহা আছে ইসলামেও তাহা আছে। নর-মাদীর মিশ্রিত জীবন যাপনই জীবের স্বভাব। "মানুষ" আরবী "মানুছ" শব্দের ভাষান্তর, যাহার ধাতুগত অর্থ প্রেম ও ভালবাসার মিলন-শান্তির প্রত্যাশী ; অতএব নর-নারীর মিলিত জীবনই মানুষের স্বভাব। এই মিলনের পবিত্রতা সংরক্ষণই করা হয় বিবাহের মাধ্যমে, তাই নবীজী বলিয়াছেন, النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني "বিবাহ আমার আদর্শ, যে ব্যক্তি আমার আদর্শ হইতে বিরাগী হইবে সে আমার জমাতভুক্ত নহে।"

নবীজী আরও বলিয়াছেন, لا سياحة في الاسلام "সন্ন্যাস জীবন ইসলামের আদর্শ ও নীতি নহে।" বিশ্ববাসীর জন্য যে আদর্শ ভাবী জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইবেন নবীজী আজ তিনি স্বীয় জীবনে উহার বাস্তবায়নে অগ্রসর হইলেন।

নবীজী হইলেন শত উর্দ্ধের উর্দ্ধ জগতের, কিন্তু তাঁহার আবির্ভাব মাটির জগতের জন্য ; সর্ব্বধিক দিয়া মাটির মানুষ সাজিতে হইবে তাঁহাকে। মাটির মানুষের জন্যই তিনি উর্দ্ধের উর্দ্ধ জগত হইতে নামিয়া আসিয়াছেন, তাই তাঁহাকে মাটির পৃথিবীতেই নীড় রচনা করিতে হইবে। সেই তাকিদেই নবীজী মোস্তফা (দঃ) সম্মতি দিলেন বিবাহ প্রস্তাবে এবং সংসারী হওয়ার পথে তিনি অগ্রসর হইলেন।

নবীজীর সহিত খাদিজার সহচরী নফিসার আলোচনা আশাব্যঞ্জক পাওয়া মাত্র বিবি খাদিজা স্বয়ং বিবাহের প্রস্তাব দিয়া নবীজীর খেদমতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। বিবি খাদিজার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাইয়া নবীজী স্বীয় মুরুব্বী চাচাগণের নিকট তাহা পাঠাইয়া দিলেন। সকলেই আনন্দের সহিত সম্মত হইলেন এবং বিবাহের তারিখ নির্দ্ধারিত হইয়া গেল। নির্দ্ধারিত তারিখে হযরতের চাচা আবুতালেব এবং হামযাহ্, আরও কোরায়েশ বংশের গণ্য-মান্য ব্যক্তিবর্গ বর যাত্রায় যোগদান করিলেন। বিবি খাদিজার পক্ষে তাঁহার পিতা ; কাহারও মতে পিতা তখন জীবিত ছিলেন না, তাই তাঁহার অভিভাবক চাচা আম্র ইবনে আসাদ এবং দূর সম্পর্কীয় চাচা বিশিষ্ট সত-সাধু অরাকা ইবনে নওফল বিবাহ সম্পাদনে উপস্থিত ছিলেন।

বিবাহ মজলিসে খাজা আবুতালেব হযরতের পক্ষে অভিভাষন বা খোৎবা পাঠে বলিলেন, প্রশংসা আল্লার যিনি আমাদিগকে ইব্রাহীমের কুলে ইসমাঈলের বংশে জন্ম দিয়াছেন। আমাদেরে তাঁহার ঘরের সেবক এবং জনসাধারণের নেতা ও নায়করূপে মনোনীত করিয়াছেন। অতঃপর—আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাহ-তনয় মোহাম্মদ সমগ্র কোরেশ গোত্রে জ্ঞানে-গুণে অতুলনীয়; সকলেই মোহাম্মদের নিকট হার মানিতে বাধ্য ; যদিও ধন তাহার কম। কিন্তু ধন ক্ষণস্থায়ী ছায়া মাত্র এবং হাত-বদলের সাময়িক বস্তু মাত্র। মোহাম্মদের আত্মীয়-স্বজনের গৌরব সর্ব বিদিত। মোহাম্মদ খোয়ায়লেদ-তনয়া খাদিজার বিবাহ-পয়গাম বরণ করিয়াছেন। নগদ ও দেইন মহরনার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিলাম।” (যোরকানী, ১—২০২)

বিবি খাদিজার পক্ষে তাঁহার আত্মীয় বিশিষ্ট আলেম সত-সাধু অরাকা ইবনে নওফল আভিভাষন পাঠ করিলেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসার পর স্বীয় কোরায়েশ গোত্রের গৌরব এবং আবুতালেব-বংশের (তথা বনী-হাশেমের) প্রাধান্যের স্বীকৃতি উল্লেখ পূর্ব্বক বলিলেন, আমরা আপনাদের সহিত মিলন লাভের আকাঙ্খা রাখি এবং উহাতে আনন্দ বোধ করি। সকলে সাক্ষী থাকুন—খোয়ায়লেদ-তনয়া খাদিজাকে আবদুল্লাহ-তনয় মোহাম্মদের বিবাহে প্রদান করিলাম।

মহরানা চার শত দেরহাম পরিমাণ স্বর্ণ ছিল ; এসম্পর্কে মতভেদ আছে। নবীজীর বয়স তখন পঁচিশ বৎসর ছিল ; আরও বিভিন্ন মতামত আছে। বিবি খাদিজার বয়স ছিল চল্লিশ ; এ সম্পর্কেও মতভেদ রহিয়াছে। নবীজীর ইহাই প্রথম

বিবাহ ছিল এবং বিবি খাদিজার ইহা তৃতীয় বিবাহ ছিল। বিবি খাদিজার প্রথম বিবাহ আবুহালাহ নামক ব্যক্তির সহিত হইয়াছিল ; সেই পক্ষে তাঁহার দুই ছেলে ছিল—"হিন্দ" এবং "হালাহ" তাঁহারা উভয়ই ইসলাম গ্রহণপূর্ব্বক ছাহাবী হইয়া ছিলেন। একবার "হালাহ" নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসিলেন, নবী (দঃ) তখন নিদ্রিত ছিলেন ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠিয়া "হালাহকে" বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। বিবি খাদিজার প্রথম স্বামী আবুহালার মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহ হইয়াছিল "আতীক" নামক ব্যক্তির সহিত। এই পক্ষে তাঁহার এক কন্যা ছিল নাম "হিন্দ" তিনিও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (যোরকানী, ১—২০০)

নবীজী মোস্তফা এবং বিবি খাদিজার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়া গেল। কি অপুর্ব্ব শাদী ছিল ইহা। যাঁহার গুণ-গরিমার তুলনা নাই, সুখ্যাতি-সুনাম এবং গৌরব ও যশের অভাব নাই। ইচ্ছা করিলে তিনি অনায়াসেই কোন কুমারী তরুণীকে বিবাহ করিতে পারিতেন। কিন্তু যৌবনের স্বভাব ধর্ম্মকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া এই তরুণ যুবক বিবাহ করিলেন চল্লিশ বৎসর বয়স্কা, বহুদিনের যৌবনহারা এক বিধবা মহিলাকে। কারণ—দেহের ক্ষুধা, যৌবনের স্বপ্ন-বিলাস, কামরিপু চরিতার্থের পিপাসা-আকর্ষণে এই বিবাহ ছিল না, তদ্রূপ কোন লালসা বা মোহের বশেও এই বিবাহ ছিল না। ইহার উজ্জল প্রমাণ হইল—মোস্তফা ও তাহেরার সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের পরিচ্ছন্ন মধুর জীবন যাপন। এক দিনের জন্য নয়, এক মাস-এক বৎসরের জন্য নয়—দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল এই জীবন সঙ্গীনীর সহিত হাসিমুখে অনাবিল অন্তরের প্রীতি ও ভালবাসায় কাল কাটাইয়াছেন নবীজী মোস্তফা। খাদিজা জীবিত থাকা পর্যন্ত নবীজী অন্য বিবাহের চিন্তাও কোন দিন করেন নাই। পঁচিশ হইতে পঞ্চাশ তথা যৌবনের আরম্ভ হইতে বার্দ্ধক্যের সুচনা পর্যন্ত গোটা জীবনটাই নবীজী অতিবাহিত করিয়াছেন এই স্ত্রীর সহিত।* এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে এক দিনের তরেও বিরাগী হন নাই, বিরক্ত হন নাই নবীজী খাদিজার প্রতি, কোনও অভাব-অপূরণের অভিযোগ আনেন নাই, অনুযোগ করেন নাই কোন দিন। এই পরম তৃপ্তি ও চরম সন্তুষ্টির দাম্পত্য জীবন কি সম্ভব হইত যদি হইত স্বার্থসিদ্ধির মানসে বা হীন উদ্দেশ্য সাধনের মতলবে এই বিবাহ ? গভীর ভালবাসা ও অকৃত্রিম প্রীতির বন্ধনে সমভাবে আবদ্ধরূপে কাটিয়াছে উভয়ের দীর্ঘ পঁচিশটি বৎসর। বরং

---

* পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পর নবীজী অনেকগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন সেই বহু-বিবাহকে মূলধন বানাইয়া নবীজীর গ্লানী-ব্যবসায়ীরা তাহাদের ব্যবসা গরম করিতে প্রয়াস পায়। এই শ্রেণীর পিশাচ-মনা লোকদের লক্ষ্য করা উচিৎ নবীজীর যৌবন-জীবনের প্রতি। বহু বিবাহের যে তাৎপর্য্য তাহারা দেখাইতে চায় তাহা কি মানুষের বার্দ্ধক্যকালে দেখা দেয়, না—যৌবনকালে ? নবীজী তাঁহার সারাটা যৌবনকাল যেরূপ স্ত্রীর দাম্পত্যে যেভাবে কাটাইয়াছিলেন তাহা লক্ষ্য করিলে কোন সুধী ও সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ বিভ্রান্ত হইতে পারে কি ?

খাদিজার মৃত্যুতে দৈহিক বিচ্ছিন্নতার পরেও ছিন্ন হয় নাই নবীজীর হৃদয়ের বন্ধন; খাদিজার স্মরণে নবীজী কত সৌহার্দ দেখাইয়াছেন খাদিজার বান্ধবীদের প্রতি। খাদিজার ভগ্নির কণ্ঠস্বরে শিহরিয়া উঠিয়াছেন নবীজী খাদিজার কণ্ঠস্বর স্মরণে।

১৬৭০। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (খাদিজা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার মৃত্যুর বহু দিনের পরের ঘটনা—) একদা বিবি খাদিজার ভগ্নি হালাহ বিন্‌তে খোয়ায়লেদ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গৃহদ্বারে আসিয়া প্রবেশের অনুমতি প্রার্থী হইলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণে হযরত (দঃ) বিবি খাদিজার কণ্ঠস্বর স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন, আয় আল্লাহ! ইহা যেন হালার কণ্ঠস্বর হয় (যাহা আমি ভাবিয়াছি)।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, এই অবস্থা দৃষ্টে আমার মনে ক্ষোভ সৃষ্টি হইল; আমি বলিলাম, আপনি এক দাঁতপড়া বুড়ীকে কি স্মরণ করিয়া থাকেন? সে কোন্ জমানায় মরিয়া গিয়াছে! তাহার পরিবর্তে তাহার অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী আল্লাহ তায়ালা আপনাকে দান করিয়াছেন। (হযরত (দঃ) বলিলেন, তাঁহার তুলনায় উত্তম আমাকে আল্লাহ দেন নাই—এই বলিয়া হযরত (দঃ) আমার প্রতি ভীষণ ক্ষুব্ধ হইলেন; যাহাতে আমি বাধ্য হইলাম এই বলিতে—যে খোদা আপনাকে সত্যের বাহকরূপে পাঠাইয়াছেন তাঁহার কসম করিয়া বলিতেছি, আর কোন সময় আমি বিবি খাদিজার আলোচনা ভাল ছাড়া মন্দ করিব না।) (৫৩৯ পৃঃ)

বিবি খাদিজার কত উচ্চ আসন ছিল নবীজীর অন্তরে? কিরূপ আবিষ্ট ছিল নবীজীর অন্তর তাঁহার প্রতি? ক্ষণস্থায়ী লালসায় হৃদয়ের এরূপ চিরবন্ধন কি সৃষ্টি হইতে পারে?

নবীজীর বিবাহ ছিল এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি তাঁহার আসল উদ্দেশ্য সাধনে মিশিয়া যাইবেন মাটির মানুষের সহিত, স্বাভাবিক অধিবাসী হইবেন মাটির জগতে এবং প্রতিষ্ঠিত করিবেন তাঁহার সুন্নতী জীবনের আদর্শ ও নীতি। পাত্রী নির্ব্বাচনে মানুষ সাধারণতঃ বাহ্যিক রূপের সৌন্দর্য ও স্থূল লাবণ্যের পিয়াসী হয়, কিন্তু নবীজী ছিলেন গুণের সৌন্দর্য ও দেহের অন্তরালে লুকায়িত সুষমা পিয়াসী। সেই সৌন্দর্য ও সেই মাধুরীতে পরিপূর্ণ ছিলেন খাদিজা—তাহেরা, তাই তিনি নবী মোস্তফার নির্ব্বাচন লাভে চিরধন্য চিরসৌভাগ্যবতী হইতে পারিয়াছিলেন।

বিবি খাদিজা তাঁহার সমুদয় ধন-সম্পদ হযরতের অধিকারে দিয়া দিলেন। হযরতের জন্য এই সচ্ছলতার ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালারই বিশেষ দান ও রহমত ছিল। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা এই ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই হযরতকে সম্বোধন করিয়াছেন, و وجدك عائلا فاغنى "আপনি ছিলেন নিঃস্ব রিক্তহস্ত অতঃপর আপনার প্রভুই আপনাকে সচ্ছল ধনাঢ্য করিয়াছেন।"

শাদী মোবারকের পর ঃ

নবীজী মোস্তফার ভাবী আদর্শ ও সুন্নত হইবে—মানবীয় আবেষ্টনে থাকিয়াও সর্ব্বদা আল্লাহ্‌পানে নিয়োজিত থাকা। সাংসারিক ও পারিবারিক জীবন গড়িলেও ভোগ-বিলাসে পড়িবে না, কোন আকর্ষণেই লক্ষভ্রষ্ট হইবে না। এই মনোবল ও আত্মসংযম লইয়া সব রকম বেড়াজাল এবং কোলাহলে থাকিয়াও মাওলার সঙ্গে মুক্ত ও নিরালা থাকিবে। কামিনী-কাঞ্চনের ভয়ে সংসার ত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসী হওয়ার প্রয়োজন নাই। বাসনা-কামনার উপাদানের মধ্যে সংযম-সাধনার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়া জীবন প্রান্তর অতিক্রম করিবে ইহাই হইবে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদর্শ ও সুন্নত।

এখন হইতে সেই আদর্শ ও সুন্নতের জীবন আরম্ভ হইল নবীজী মোস্তফার। বিবাহের পর নবুয়ত প্রাপ্তি পর্য্যন্ত পনরটি বৎসর ; এই বৎসর কয়টিতেও নবীজী মোস্তফার জীবন আদর্শমূলকই ছিল। নবীজী পূর্ব্ব হইতেই ব্যবসায় অভিজ্ঞ ছিলেন ; বিবি খাদিজারই ধন নিয়া তিনি কৃতিত্বের সহিত ব্যবসায় করিয়াছেন ; এখন ত বিবি খাদিজার সমুদয় ধন-দৌলত তাঁহায় চরনে নিবেদিত। এতদিন বিবি খাদিজা তাঁহার বিরাট ব্যবসা নিজেই পরিচালনা করিতেন এখন ত তিনি গৃহবধু—নবীজী মোস্তফাই তাঁহার হর্তাকর্তা।

ব্যবসা বা তেজারত নবীজীর একটি বিশেষ ভাবী আদর্শ। নবীজীর হাদীছ—
التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء
"সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ী কেয়ামত দিবসে নবীগণ, ছিদ্দিকগণ ও শহীদ-গণের সহিত একত্রে থাকিবে" (মেশকাত শঃ)। ব্যবসা-বাণিজ্যে মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়, নানা দেশের নানা বৈচিত্রের মধ্য দিয়া তাহার গমনাগমন ঘটে, ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতার গুণ লাভ হয়—নানা মনের নানা স্বভাবের মানুষের সহিত সর্ব্বদা পালা পড়িতে থাকে। এতদ্ভিন্ন মানুষের কঠিন পরীক্ষাও ইহাতে হয় ; একদিকে ধনের সমাগম, অপর দিকে সততা, সাধুতা ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন ; অতএব বাণিজ্যের ভিতর দিয়া মানুষের সুপ্ত যোগ্যতা ও গুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়া থাকে এবং উহার ক্রমোন্নতি লাভ হইতে থাকে।

সুযোগপ্রাপ্তে নবীজী মোস্তফা বাণিজ্যানুরাগী ছিলেন ; বিভিন্ন দেশে তাঁহার বাণিজ্য ছফরের আভাস ইতিহাসে পাওয়া যায়। বোছ্‌রা ও সিরিয়ায় তাঁহার বাণিজ্যের বর্ণনা ত আছেই, এতদ্ভিন্ন ইয়ামান ও বাহরাইনের ছফর সম্পর্কেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় (সীরতুন-নবী দ্রষ্টব্য)।

এই পনর বৎসরে নবীজী মোস্তফার পাঁচটি সন্তান জন্মলাভ করে—এক পুত্র "কাসেম" যিনি সকলের বড় ছিলেন, বাল্য অবস্থায়ই ইহকাল ত্যাগ করিয়াছিলেন।

চার কন্যা—(১) "যয়নব" (রাঃ) বিবি খাদিজার ভাগিনা আবুল-আছেরের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল ; শেষ পর্য্যন্ত তিনি মোসলমান হইয়া হিজরত করিয়া ছিলেন ; বিবি যয়নব তাঁহার বিবাহেই ছিলেন। (২) রোকাইয়্যাহ (রাঃ)। (৩) উম্মে-কুলসুম (রাঃ) ; প্রথমে তাঁহাদের বিবাহ হযরতের চাচা আবুলাহাবের দুই পুত্রের সহিত হইয়াছিল। নবীজী (দঃ) ইসলাম প্রচার আরম্ভ করিলে আবুলাহাব তাঁহার সহিত শত্রুতা সৃষ্টি করে। ফলে তাহার এবং তাহার স্ত্রীর বিরুদ্ধে কোরআন শরীফে ছুরা "লাহাব" অবতীর্ণ হইল ; সেই আক্রোশে আবুলাহাবের পুত্রদ্বয় ক্ষুব্ধ হইয়া নবীজীর কন্যাদেরকে ত্যাগ করে।

রোকাইয়্যা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার দ্বিতীয় বিবাহ ওসমান রাজিয়াল্লাহু আনহুর সহিত হয় ; হিঃ দ্বিতীয় সনে বিবি রোকাইয়্যার ইন্তেকাল হইলে উম্মে-কুলসুম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার দ্বিতীয় বিবাহও তাঁহারই সহিত হয়। হযরতের সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যা হইলেন খাতুনে-জান্নাত বিবি ফাতেমা (রাঃ)। হিজরী দ্বিতীয় সনে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সহিত তাঁহার শাদী হইয়াছিল।

নবীজীর কন্যাদের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কন্যাদ্বয়ের কোন সন্তান জীবিত ছিল না। যয়নব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার শুধু এক কন্যা—উমামাহ (রাঃ) জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্তান ছিলনা। ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার দুই পুত্র জীবিত ছিলেন ; ইমাম হাসান (রাঃ) ইমাম হোসায়ন (রাঃ)। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বংশের সম্পর্ক এই দুইজন হইতেই এই পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে ; প্রকৃত সৈয়্যদগণ তাঁহাদেরই বংশধর। বিবি ফাতেমার এক কন্যাও ছিলেন—উম্মে-কুলসুম তাঁহার বংশ চলে নাই।

নবী হওয়ার পর বিবি খাদিজার পক্ষে হযরতের আরও তিন বা এক পুত্র সন্তান জন্মলাভ করিয়াছিলেন ; আবদুল্লাহ, তৈয়্যব ও তাহের। কাহারও মতে একই ছেলে—নাম আবদুল্লাহ, ডাক নাম তৈয়্যব ও তাহের ছিল ; তিনি বা তাঁহারা কেহই বাঁচিয়া থাকেন নাই। হিজরতের পরেও হযরতের এক পুত্র সন্তান হইয়াছিল—"ইব্রাহীম" তিনি মারিয়াহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গর্ভজাত ছিলেন ; শৈশবেই ইন্তেকাল করিয়াছিলেন।

হযরতের পালক পুত্র ঃ

নবী হওয়ার পরবর্ত্তীকালের একটি বিশেষ গুণ হযরতের এই বর্ণিত আছে—
من راه بديهة هابه ومن خالطه معرفة احبه "নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি প্রথম দৃষ্টি তাঁহার রাজসিক প্রভাব দর্শকের অন্তরকে কাঁপিয়ে তুলিত ; আর অকপটতার সহিত তাঁহার সঙ্গে মেলামেশা তাঁহাকে অত্যন্ত প্রিয় করিয়া তুলিত।"

প্রথম বাক্যের মর্ম্ম ত ঐশ্বরিক দান নবুয়তে প্রভাব ছিল, আর দ্বিতীয় বাক্যের মর্ম্মটি হযরতের স্বাভাবিক চরিত্র মাধুর্য্যের ফল ছিল এবং এই বৈশিষ্ট্য হযরতের প্রথম জীবন হইতেই ছিল। হযরতের দাস ও পালক পুত্র যায়েদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইতিহাস এই সম্পর্কে বিশেষ আকর্ষণীয়।

হারেসা-পুত্র যায়েদ হযরতের দাস ছিল, তাহার দাসত্বের কাহিনী অতি হৃদয়গ্রাহী। আট বৎসর বয়সের শিশু যায়েদকে তাহার মাতা সঙ্গে করিয়া তাহার মামাবাড়ী যাইতে ছিলেন। পথিমধ্যে তাহাদের উপর লুটেরাদের আক্রমণ হয়, শিশু যায়েদকে তাহার মায়ের কোল হইতে লুটেরা দল ছিনাইয়া লইয়া যায় এবং তৎকালীন রীতি অনুযায়ী তাহারা যায়েদকে দাস বানাইয়া লয়। এইভাবে যায়েদ মাতা-পিতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দাসে পরিণত হয় এবং এক সময়ে সিরিয়ার কোন বাজারে বিক্রিত হয়।

বিবি খাদিজার ভ্রাতুষ্পুত্র হাকীম-ইবনে-হেযাম সিরিয়া হইতে কতিপয় দাস ক্রয় করিয়া আনে; তন্মধ্যে যায়েদও ছিল। বিবি খাদিজা (রাঃ) ঐ দাসগুলি দেখিতে গেলে হাকীম বলিলেন, ফুফু আম্মা! আপনি একটি দাস পছন্দ করিয়া নিন। খাদিজা (রাঃ) যায়েদকে নিয়া আসিলেন; হযরত (দঃ) বিবি খাদিজার নিকট যায়েদকে দেখিয়া তাঁহার নিকট উহাকে হেবা চাহিলেন। খাদিজা (রাঃ) হযরতের হস্তে যায়েদকে হেবা করিয়া দিলেন। যায়েদ হযরতের গৃহে যত্নের সহিত প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

এদিকে যায়েদের পিতা-মাতা যায়েদকে হারাইয়া পাগল প্রায় হইয়া গেল। তাহার বিচ্ছেদে মাতা-পিতার মনোবেদনার সীমা রহিল না। যায়েদের পিতা যায়েদের বিচ্ছেদ যাতনায় একটি হৃদয় বিদারক কবিতা রচনা করিল। কবিতাটি এতই হৃদয়স্পর্শী ছিল যে, অচিরেই উহা দেশময় ছড়াইয়া পড়িল; এমনকি ঐ কবিতা মক্কায়ও পৌছিল এবং যায়েদের গোচরেও আসিল। এইভাবে যায়েদের পিতা-মাতার নিকট যায়েদের খোঁজ পৌছিবার ব্যবস্থা হইল। খোঁজ পাইয়া যায়েদের পিতা যায়েদের চাচাকে সঙ্গে নিয়া মক্কায় পৌছিল এবং হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদয় ঘটনা ব্যক্ত করিল। তাহারা হযরতের বংশের সুখ্যাতি, বদান্যতা ও দেশজোরা প্রশংসার উল্লেখ পুর্ব্বক মুক্তি-পণের বিনিময়ে যায়েদের মুক্তি প্রার্থনা করিল। হযরত (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, যায়েদ যদি আপনাদের সহিত চলিয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে কোন প্রকার পণ ব্যতিরেকেই আমি তাহাকে মুক্তি দানে আপনাদের হস্তে অর্পণ করিয়া দিব। আর যদি সে আমার নিকটই থাকিতে চায় তবে যে ব্যক্তি আমাকে ছাড়িতে রাজি না হইবে আমিও তাহাকে কোন বিনিময়েই ছাড়িতে রাজি হইব না। তাহারা বলিল, আপনি ত ন্যায়ের উর্দ্ধে উদারতার প্রস্তাব করিলেন। হযরত (দঃ) যায়েদকে ডাকাইয়া আনিলেন

এবং তাহাকে আগন্তুক ব্যক্তিদ্বয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। যায়েদ ঠিকরূপেই পরিচয় বলিল—তিনি আমার পিতা হারেসা, আর তিনি আমার চাচা কা'য়াব।

হযরত (দঃ) এইবার বলিলেন, যায়েদ! আমি তোমাকে পূর্ণ সুযোগ দিলাম—তুমি ইচ্ছা করিলে তোমার পিতা ও চাচার সহিত চলিয়া যাইতে পার, আর ইচ্ছা করিলে আমার নিকটও থাকিতে পার। যায়েদ তৎক্ষণাৎ দ্বিধাহীনরূপে বলিয়া দিল, আমি আপনার নিকটই থাকিব। তখন যায়েদের পিতা তাহাকে বলিল, হে যায়েদ! তুমি তোমার মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন ও দেশ-খেষ ছাড়িয়া গোলামী ও দাসত্বকে অবলম্বন করিতেছ? যায়েদ উত্তর করিল, আমি এই মহানের যে ব্যক্তিত্ব দেখিয়াছি আমি তাঁহাকে কখনও ছাড়িয়া যাইতে পারিব না। তৎক্ষণাৎ হযরত (দঃ) যায়েদের হাত ধরিয়া কোরেশদের সমাবেশে যাইয়া দাঁড়াইলেন এবং যায়েদের মুক্তিই নয় শুধু, বরং তিনি ঘোষণা করিলেন, তোমরা সকলে সাক্ষী থাকিও—এই যায়েদ আমার পুত্র। এই ঘোষণায় যায়েদের পিতা অত্যধিক সন্তুষ্ট হইল। আরবের শ্রেষ্ঠ কোরেশ বংশের বনী-হাশেম গোত্রে আবদুল মোত্তালেবের গৃহে আল-আমীনের পুত্র হইয়াছে যায়েদ—এই সৌভাগ্যের আনন্দ যায়েদের পিতাকে কিরূপ মুগ্ধ করিয়াছিল তাহা একমাত্র তাহার অন্তরই অনুভব করিতে পারিয়াছে। তখন হইতে "মোহাম্মদের পুত্র যায়েদ" পরিচয়েরই প্রাবল্য হইয়া গেল (ইবনে হেশাম, ১—২৪৭)।

এই যায়েদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ঘটনার বয়ান পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে। লক্ষাধিকছাহাবীর মধ্যে একমাত্র যায়েদেরই এই সৌভাগ্য যে, তাঁহার নাম পবিত্র কোরআনে উল্লেখ হইয়াছে।

যায়েদ (রাঃ) প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি, তাঁহার পূর্ব্বে শুধু মাত্র খাদিজা (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমনকি আবু বকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুরও পূর্ব্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যায়েদ (রাঃ) প্রথম জীবনে হযরতের গৃহভৃত্য ছিলেন; মানুষের সর্ব্বময় অবস্থার অভিজ্ঞতা গৃহসঙ্গীনীর পরেই গৃহভৃত্যের সর্ব্বাধিক বেশী থাকে। মানুষ কৃত্রিমরূপে বাহিরে সব কিছুই সাজিতে পারে, কিন্তু গৃহভ্যন্তরে তাহার কোন কৃত্রিমতা টিকিয়া থাকিতে পারে না। গৃহসঙ্গীনী বা গৃহভৃত্যের নিকট তাহার কৃত্রিমতা অবশ্যই ধরা পড়িয়া যাইবে। অতএব হযরতের প্রতি খাদিজা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সর্ব্বাগ্রে ঈমান গ্রহণ যেরূপ হযরতের সত্য ও খাঁটী হওয়ার বিশেষ প্রমাণ ছিল তদ্রূপ গৃহভৃত্য যায়েদ রাজিয়াল্লাহু আনহুর ঈমান গ্রহণও উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই হইল নবীজীর সাংসারিক জীবনের কিঞ্চিৎ বর্ণনা। আলোচ্য ১৫ বৎসর সময়ে নবীজী মোস্তফার আর একটি বিশেষ তৎপরতা এবং মহতি প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য—

শেরেক বর্জন ও তৌহীদ অন্বেষণে নবীজী ঃ

তৌহীদ বা একত্ববাদের বিপরীত শেরেকী কাজ হইতে নবীজী মোস্তফার যেরূপ ঘৃণা হওয়া এবং পবিত্র থাকার প্রয়োজন ছিল তিনি বাস্তবে তাহাই ছিলেন। ছোট-বড় কোন রকম শেরেকী কাজের সহিত তাঁহার বিন্দুমাত্র সম্পর্কও হইত না। অধিকন্তু তিনি মক্কা এলাকায় সৎ এবং একাত্ববাদী লোকদের অন্বেষণে থাকিতেন এবং ঐ শ্রেণীর লোকদের সহিত যোগাযোগ সৃষ্টির এবং সমাজে শেরেকীর যে অভিশাপ প্রচলিত আছে তাহার বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা আরম্ভের সূত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেন। এই তৎপরতায় নবীজী মোস্তফা (দঃ) মক্কা এলাকার প্রসিদ্ধ একাত্ববাদী যায়েদ-ইবনে-আমর-ইবনে নোফায়লের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং উক্ত উদ্দেশ্য সম্পর্কে কথাবার্ত্তাও বলেন। এই যায়েদ-ইবনে-আম্‌র মূর্ত্তিপূজার প্রতি অত্যধিক ঘৃণা পোষণ করিতেন। সত্য ধর্ম্মের তালাশে তিনি সিরিয়া ইরাক পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি ওমর-ইবনুল-খাত্তাবের চাচাত ভাই ছিলেন; ওমরের পিতা তাঁহাকে তাঁহার মতবাদের জন্য ভীষণ উৎপীড়ন করিত; তাঁহাকে মক্কায় আসিতে দিত না। কিন্তু তিনি একত্ববাদে অত্যন্ত দৃঢ় ছিলেন। নবীজীর নবুয়তের পাঁচ বৎসর পূর্বে ইন্তেকাল করিয়াছিলেন। ইন্তেকালের সময় কা'বা শরীফের গেলাফ ধরিয়া কাঁদিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকিও, আমি সত্য ধর্ম্ম না পাইয়া একত্ববাদের উপরই মৃত্যু বরণ করিতেছি। তাঁহার ছেলে সায়ীদ-ইবনে-যায়েদ (রাঃ) ইসলামের জমানা পাইয়াছিলেন এবং মোসলমান হইয়া অতি বড় মর্ত্তবা লাভ করিয়াছিলেন। আশারা-মোবাশ্‌শারাহ—দশ জন ছাহাবী আনুষ্ঠানিকরূপে রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক বেহেশতী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন; সায়ীদ (রাঃ) তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন।

হযরতের পালক পুত্র যায়েদ-ইবনে হারেসা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্বের ঘটনা—একদা আমি নবীজীর সহিত মক্কার পার্ব্বত্য এলাকায় পৌছিলাম; তথায় যায়েদ-ইবনে-আম্‌রের সহিত নবীজীর সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা উভয়ে অতি সৌজন্যের সহিত পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন। নবীজী তাঁহাকে বলিলেন, হে যায়েদ! আপনার জাতি যে সব অপকর্ম্মে লিপ্ত রহিয়াছে আপনি তাহা অবগত আছেন; উহার প্রতিকারের কোন চিন্তা করেন কি? যায়েদ ইবনে-আম্‌র বলিলেন, সত্য ধর্ম্মের খোঁজে আমি সিরিয়া-ইরাক গিয়াছিলাম। তথায় তৌরাত-ইঞ্জিলের একজন বিশিষ্ট আলেমের নিকট জ্ঞাত হইলাম, সত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পতাকাবাহী অচিরেই মক্কাতে আত্মপ্রকাশ করিবেন, তাঁহার আবির্ভাবের শুভ নক্ষত্র উদিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার আশা-আকাঙ্খা নিয়াই আমি মক্কায় ফিরিয়া আসিয়াছি এবং অপেক্ষায় আছি।

অদৃষ্টের পরিহাস—নবীজীর সঙ্গেই নবীজী সম্পর্কে তাঁহার কথাবার্ত্তা হইল, কিন্তু নবীজীর আবির্ভাবকাল তাঁহার ভাগ্যে জুটে নাই। ইসলামের আবির্ভাব পূর্বে খাঁটী তৌহীদই মুক্তির ভিত্তি ছিল ; নবীজী (দঃ) তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন, কেয়ামত দিবসে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপে উপস্থিত হইবেন। (আছাহ—৫৮)

যায়েদ-ইবনে-আম্‌রের আলোচনায় ইমাম বোখারী (রঃ) একটি বিশেষ পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন ; ৫৪০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

১৬৭১। **হাদীছ**ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণণা করিয়াছেন, নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্বে একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (মক্কার নিকটস্থ) 'বালদাহ' এলাকার শেষ প্রান্তে যায়েদ-ইবনে-আমর-ইবনে-নোফায়লের সঙ্গে মিলিত হইলেন। তথায় কোরায়েশ বংশীয় কাহারও পক্ষ হইতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমীপে দাওয়াতের খানা পরিবেশন করা হইল (উহাতে গোশ্‌ত ছিল)। নবী (দঃ) উহা খাইতে অস্বীকার করতঃ যায়েদ-ইবনে-আম্‌রের সম্মুখে দিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, হে কোরায়েশগণ। তোমরা তোমাদের দেবদেবীর নামে পশু জবাই করিয়া থাক—আমি উহা খাইনা। আল্লার নামে জবাইকৃত ছাড়া আমি খাই না। যায়েদ-ইবনে-আম্‌র সর্ব্বদা কোরায়েশদের জবাই করার রীতির প্রতি ভর্ৎসনা করিতেন। তিনি বলিতেন, ভেড়া-বকরী সৃষ্টি করিয়াছেন আল্লাহ, উহার আহার জমীন হইতে উৎপাদনের জন্য আকাশ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন আল্লাহ ; আর সেই ভেড়া-বকরীকে তোমরা জবাই কর আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামের উপর। এই রীতির প্রতি তিনি ঘৃণা প্রকাশ করিতেন এবং ইহাকে অতি বড় জঘন্য বলিতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আরও বর্ণনা করিয়াছেন, যায়েদ-ইবনে-আম্‌র সিরিয়ায় গিয়াছিলেন সত্য ধর্ম্মের খোঁজ করিতে। তথায় এক ইহুদী আলেমের সঙ্গে তিনি সাক্ষাত করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন, হয়ত আমি আপনাদের ধর্ম্ম অবলম্ব করিব। ঐ আলেম বলিলেন, আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আল্লার গজব নিজের উপর টানিয়া নিও না। যায়েদ বলিলেন, আমি ত আল্লার গজব হইতেই রক্ষা পাইতে চাই ; সাধ্য থাকিতে আমি আল্লার গজব লইব না। আপনি আমাকে অন্য কোন ধর্ম্মের সন্ধান দিবেন কি? তিনি বলিলেন, আমার জানা মতে আপনি একমাত্র হানীফ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন। যায়েদ জিজ্ঞাসা করিলেন, হানীফ ধর্ম্ম কি? তিনি বলিলেন, ইব্রাহীম আলাইহে-চ্ছালামের ধর্ম্ম—তিনি ইহুদীও ছিলেন না, নাছরানীও ছিলেন না। (তাঁহার ধর্ম্মের অনুশাসন ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এখন শুধু এতটুকুর খোঁজ আছে যে,) তিনি একাত্ববাদী ছিলেন—এক আল্লাহ ভিন্ন অন্য কিছুর উপাসনা করিতেন না।

অতঃপর যায়েদ এক খৃষ্টান আলেমের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহার নিকটও ঐরূপ বলিলেন যেরূপ প্রথমে ইহুদী আলেমের নিকট বলিয়াছিলেন। খৃষ্টান আলেম তাঁহাকে বলিলেন, আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আল্লার অভিশাপ কখনও নিজের উপর টানিয়া লইবেন না। যায়েদ বলিলেন, আমিত আল্লার অভিশাপ হইতেই রক্ষা পাইতে চাই; সাধ্য থাকিতে আমি আল্লার অভিশাপের কিঞ্চিতও লইব না, আপনি আমাকে অন্য কোন ধর্ম্মের অনুসন্ধান দিবেন কি? তিনিও হানীফ ধর্ম্ম তথা ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের ধর্ম্মমত সম্পর্কে পূর্ব্বের ন্যায়ই বলিলেন।

যায়েদ যখন সকলের কথায়ই ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের ধর্ম্ম—একত্ববাদের খোঁজ পাইলেন তখন তিনি সিরিয়া হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার দরবারে হস্তদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক বলিলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমাকে সাক্ষী বানাইতেছি, আমি ইব্রাহীমের ধর্ম্মমতের উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম।

আবুবকর (রাঃ) তনয়া আস্‌মা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন আমি যায়েদ-ইবনে-আম্‌রকে দেখিয়াছি, তিনি কা'বা ঘরের সহিত হেলান দেওয়া অবস্থায় দাঁড়াইয়া বলিতেছিলেন, হে কোরায়েশগণ! আমি ভিন্ন তোমাদের কেহই ইব্রাহীমের ধর্ম্ম-মতের উপর নহে; (অর্থাৎ তোমরা হযরত ইব্রাহীমের ধর্ম্মের মিথ্যুক দাবীদার। কারণ, তোমরা মোশরেক, আর ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন নিরেট একাত্ববাদী)।

যায়েদ-ইবনে-আমর অন্ধকার যুগের সব অপকর্ম্ম হইতেই পবিত্র ছিলেন। মেয়ে সন্তানকে জীবিত মাটিতে পুতিয়া দেওয়া হইতে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা তিনি করিতেন। কোন পিতা স্বীয় কন্যাকে ঐরূপে হত্যা করিতে চাহিলে যায়েদ তাহাকে বলিতেন, (তাহার খোরপোষের জন্য তাহাকে হত্যা করিতে চাও!) আমি তাহাকে প্রতিপালন করিব, তাহার ব্যয়-ভার আমি বহন করিব; তাহাকে হত্যা করিও না। এই বলিয়া তিনি ঐ হতভাগীকে নিজ আশ্রয়ে নিয়া যাইতেন এবং প্রতিপালন করিতেন। সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার পিতাকে ডাকিয়া বলিতেন, ইচ্ছা করিলে এখন তোমার কন্যাকে তুমি নিয়া যাইতে পার, নতুবা আমিই তাহার সমুদয় ব্যয়-ভার বহন করিয়া চলিব। (৫৪০ পৃঃ)

মক্কাতে এই শ্রেণীর আরও কতেকজন একাত্ববাদী ছিলেন, যথা—অরাকা-ইবনে নওফল যাঁহার উল্লেখ ১ম খণ্ড ৩নং হাদীছে রহিয়াছে। আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ, ওসমান ইবনুল হোয়াইরেছ এবং কোস্‌-ইবনে-সায়দা।

শেষোক্ত ব্যক্তি ত সুপ্রসিদ্ধও ছিলেন; তাঁহার নামে আদর্শমূলক অনেক ভাষণও বর্ণিত আছে। এমনকি এরূপ বর্ণনাও রহিয়াছে যে, আরবের প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ "ওকাজ" মেলায় তিনি এক ভাষণে নবীজী মোস্তফার আবির্ভাবের আলোচনাও করিয়াছিলেন যে—একজন পয়গাম্বরের আবির্ভাবকাল ঘনাইয়া

আসিয়াছে। ধন্য হইবে তাহারা যাহারা তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবে এবং তিনি তাহাদের জন্য সত্যের দিশারী হইবেন। যাহারা তাঁহার বিরোধিতা করিবে তাহাদের জন্য ধংস। এই ভাষণে নবীজীও উপস্থিত ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

এতদ্ভিন্ন এই সময়ে নবীজী মোস্তফা (দঃ) স্বীয় জাতি ও দেশবাসীর সহিত পূর্ণরূপে মিশিয়া যাইতেও প্রয়াস পাইয়া ছিলেন। এমনকি তাহারা তাহাদের বড় বড় বিরোধ নিষ্পত্তি ও সালিসীতে নবীজীকে পাইলে সকলেই আনন্দ বোধ করিত, সালিসীতে তাঁহার ভূমিকাকে বিশেষ আগ্রহের সহিত বরণ করা হইত।

সামাজিক সালিসীতে হযরত (দঃ)

আমরা যেই সময়ের আলোচনা করিতেছি তখনকার একটি ঘটনা—ঐ সময় কোরেশরা কা'বা শরীফের পুনর্নির্মাণ আরম্ভ করিল। কা'বা গৃহের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণের বহির্দেশে মানুষের বক্ষ পরিমাণ উপরে "হজরে-আসওয়াদ" নামীয় অতি মর্ত্তবা ও মর্য্যাদাশীল বিশেষ পাথর খণ্ড বিদ্ধরূপে আছে। (বর্ত্তমানে উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতিপয় টুক্‌রা আকারে আছে—যাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ড হজ্জের অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন লিখক যাঁহারা উহা দেখার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত; এই ক্ষেত্রে উহার এমন বিবরণ লিখিয়াছেন যাহা বাস্তব অবস্থার হিসাবে হাস্যস্পদ।)

কা'বা গৃহের উক্ত পুনর্নির্মাণে উহার দেয়াল যখন এই পরিমাণ উঁচু হইল যেখানে উক্ত বিশেষ পাথর মোবারক বসাইতে হইবে তখন বিভিন্ন গোত্রীয় সর্দারদের পরস্পর বিরোধ বাঁধিয়া গেল—কে এই মহাবরকতের পাথর খণ্ডকে যথাস্থানে রাখিবার সৌভাগ্যের অধিকারী হইবে? প্রত্যেকে সেই সৌভাগ্য লাভের প্রয়াসী, এমনকি এই কোন্দলে একটা বিরাট যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়ার উপক্রম।

হযরতের বয়স তখন মাত্র পয়ত্রিশ বৎসর—তিনি একজন যুবক; কিন্তু সমগ্র দেশে তাঁহার গুণমাধুর্য্যের এতই প্রভাব ছিল যে, যে ক্ষেত্রে বড় বড় সর্দারদের কাহারও উপর ঐক্যমত স্থাপন সম্ভব হইতে ছিল না সে ক্ষেত্রে হযরত (দঃ) সালীস নিয়োজিত হওয়ার উপর সকল গোত্র সকল দেশবাসী স্বতঃস্ফুর্ত্ত আনন্দের সহিত ঐক্যমত স্থাপন করিয়া নিল। হযরত (দঃ) ও এমন মিমাংসা করিলেন যাহা বিরোধমান সকলকে সমানভাবে সন্তুষ্ট করিল। বিধাতাই যেন নবীজীকে এই বিরোধে সালিসী করার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

মক্কাবাসীদের মধ্যে বিরাট যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়ার উপক্রম হইলে তাহাদের এক বয়ঃবৃদ্ধ আবু-উমাইয়্যা সকলকে পরামর্শ দিল, তোমরা রক্তপাতে লিপ্ত হইও না; আগামি প্রভাতে সর্ব্বাগ্রে যে ব্যক্তি হরম শরীফের মসজিদে প্রবেশ করিবে তাহাকে সালীস বানাইয়া এই বিরোধ মিটাইয়া ফেলিবে। এই প্রস্তাবে সকলেই সম্মত

হইল। পরদিন অনেকেই এই সৌভাগ্যের প্রয়াসী হইয়া হরম শরীফে আসিল, কিন্তু দেখা গেল, সর্ব্বাগ্রে একমাত্র মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) হরম শরীফের মসজিদে প্রবেশ করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে নবী মোস্তফাকে পাইয়া সকলে উল্লাস-ধ্বনী দিয়া উঠিল—هذا محمد الامين , رضينا هذا محمد "এই যে মোহাম্মদ আল-আমীন; আমরা তাঁহাকে পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি।" (সীরতে-মোস্তফা ১—৮৬)

হযরত (দঃ) মিমাংসা করিলেন যে, সকলের প্রতিনিধিরূপে তিনি পাথর খণ্ডকে একটি বড় চাদরের উপর রাখিবেন; প্রত্যেক গোত্রের প্রতিনিধি সর্দার সেই চাদর বহনে অংশ গ্রহণ করিবে। এইরূপে সেই বরকতের পাথর বহনে সকলেই সমভাবে অংশীদার হইবে। অতঃপর হযরত সকলের প্রতিনিধিরূপে চাদর হইতে পাথরখানা যথাস্থানে বসাইয়া দিবেন। হযরতের এই বিচক্ষণতাপূর্ণ মিমাংসায় সকলে মুগ্ধ হইল, সকলে সন্তুষ্ট হইল এবং সেই অনুযায়ী কার্য্য সমাধা হইল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—অন্ধকার যুগে কা'বা গৃহের ছাদ ছিল না; শুধু কেবল চারি দিকের দেয়াল ছিল। উপরোল্লিখিত নির্ম্মাণে কোরেশগণ উহার ছাদ দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিল। জিদ্দা বন্দরে দুর্ঘটনায় একটি জলযান ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, কোরেশগণ উহার কাষ্ঠ ক্রয় করিয়া কা'বা গৃহের ছাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তখন কা'বা শরীফ পূর্ণাঙ্গ গৃহরূপ হইয়াছিল, কিন্তু উহাকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দিকের জায়গা যাহা হরম শরীফের মসজিদ তাহা উন্মুক্তই ছিল।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগেও হরম শরীফ উন্মুক্তই ছিল, এমনকি উহার চতুর্দিকের দেওয়ালও ছিল না; মানুষের বাড়ী-ঘরের আবেষ্টনেই আবদ্ধ ছিল।

১৬৭২। হাদীছ:—হাম্মাদ (রঃ) এবং ওবায়দুল্লাহ (রঃ) বিশিষ্ট তাবেয়ীদ্বয় বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলে বাইতুল্লাহ শরীফের চতুর্দিকে (মসজিদে-হরমের) কোন দেওয়াল ছিল না। (বাড়ী-ঘরে আবেষ্টিত ছিল এবং) ঐ চতুষ্পার্শ্বস্থ জায়গায়ই নামায পড়া হইত। খলীফা ওমরের আমলে (মসজিদে হরমের) চতুর্দিকেও দেয়াল তৈরী হয়, কিন্তু উহা অনুচ্চ ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) (ঐ মসজিদে হরমকে) অধিক প্রশস্ত পূর্ণাঙ্গ গৃহরূপে তৈরী করিয়াছিলেন। ৫৪০ পৃঃ

সময় নিকটবর্তী:

মাটির জগতে মাটির মানুষের নিকট পয়গাম্বরী দায়িত্ব পৌঁছাইবেন নবীজী—সেই উদ্দেশ্যে তাঁহার আবির্ভাব এই জগতে। সেই দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার সময় ঘনাইয়া আসিতেছে; উহার জন্য সমুদয় প্রস্তুতি ও যোগার আয়োজন সম্পন্ন হইয়াছে। সেই নির্দ্ধারিত সময়ের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে নবীজীর জীবন; আর মাত্র দুই বৎসর বাকি আছে—নবীজী মোস্তফার বয়স এখন আটত্রিশ।

মাটির দেহে আবেষ্টিত নবীজীর উপর পয়গাম্বরীসূর্য্যের উদয়ন-পূর্ব্ব আলোক-রশ্মির বিচ্ছুরণ আরম্ভ হইল। হঠাৎ হঠাৎ তাঁহার নেত্রগোচরে স্বর্গীয় আলোর কিরণমালা উদ্ভাসিত হইয়া উঠে—তিনি অপুর্ব্ব জ্যোতি দর্শন করিতে লাগিলেন। আরও তিনি তাঁহার পয়গাম্বরীর সাক্ষ্য-সম্মান পাহাড়-পর্ব্বৎ, বৃক্ষ-লতার প্রাকৃতিক কণ্ঠ হইতে শ্রবণ করিয়া থাকিতেন। এক এক সময় তিনি স্পষ্ট শুনিতে পাইতেন السلام عليك يا رسول الله "আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রসুলুল্লাহ—আপনার প্রতি সালাম হে আল্লার রসুল।" এই সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি কৌতূহল ও বিস্ময়ে চতুর্দিক তাকাইতেন তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে খোঁজ করিতেন—কাহার কণ্ঠ ইহা, কাহার সাক্ষ্য ইহা, কাহার সালাম ইহা? কিন্তু পর্ব্বতমালার পাথর ও বৃক্ষরাজি ছাড়া তথায় তিনি কিছুই দেখিতে পাইতেন না (যোরকানী, ১—২১৯)।

পয়গাম্বরী প্রাপ্তির পরেও তাঁহার এই অবস্থা চলমান ছিল; পয়গাম্বরী প্রাপ্তির সূচনায় প্রথমবার তিনি "অহি" তথা জিব্রিল ফেরেশতার আগমন লাভ করিয়াছিলেন, তারপর দীর্ঘদিন উহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকিল (যাহার বিবরণ সম্মুখে আসিবে), তারপরেও হয়ত কিছুদিন উহার আগমন অপেক্ষাকৃত শিথিল ছিল—এই সময়েও তিনি ঐ আলোকরশ্মির প্রতিভাত অবলোকন করিয়া থাকিতেন এবং অদৃশ্য কণ্ঠের স্বর তাঁহার শ্রবণে আসিত। পয়গাম্বরী প্রাপ্তির দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে সাত বৎসর পর্য্যন্ত নবীজীর এই অবস্থা চলিয়াছিল। মোসলেম শরীফের হাদীছে আছে—يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئا "অদৃশ্য কণ্ঠের স্বর তিনি শুনিতেন, কিন্তু কিছু দেখিতেন না এবং আলোকরশ্মির বিচ্ছুরণ তিনি অবলোকন করিতেন—এই অবস্থা দীর্ঘ সাত বৎসর বিরাজমান ছিল।"

মোসলেম শরীফের আর এক হাদীছে বর্ণিত আছে—

انى لاعرف حجرا بمكة كان يسلم على قبل ان ابعث انى لاعرفه الآن

"মক্কার একটি পাথরকে আমি চিনি—ঐ পাথরটি আমাকে সালাম করিয়া থাকিত আমার পয়গাম্বরী প্রাপ্তির পূর্ব্বে; এখনও ঐ পাথরটি আমার স্মরণে রহিয়াছে।"

তিরমিজী শরীফের এক হাদীছে আছে—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কায় থাকাকালে একদা আমি নবী ছাল্লাল্লোহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এক দিকে যাইতেছিলাম। যত পাহাড় যত বৃক্ষ নবীজীর সম্মুখে পড়িতেছিল প্রত্যেকটিই তাঁহাকে এই বলিয়া সম্ভাষণ জানাইতেছিল—السلام عليك يا رسول الله "আপনার প্রতি সালাম হে রসুলাল্লাহ!"

আর মাত্র ছয় মাস বাকি—নবীজীর বয়স চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইয়া নবুয়ত প্রাপ্তির দ্বারে পৌঁছিতেছে; এই সময় উর্দ্ধজগতের আর এক আলিঙ্গন নবীজীকে অভিভূত

করিল। নবীজী যাহা কিছু স্বপ্নে দেখেন প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে উহার আলোর ন্যায় তাঁহার স্বপ্নের বাস্তবতা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

স্বাভাবিকভাবে নবীজী মোস্তফা (দঃ) অতিশয় চিন্তাশীল ভাবগম্ভীর স্বভাবের ছিলেন। হাদীছ শরীফে আছে— كان النبي صلى الله عليه وسلم دائم الفكر متواصل الاحزان "নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সদা চিন্তামগ্ন ভাবগাম্ভীর্য্যে নিমজ্জমান থাকিতেন।" উল্লেখিত অসাধারণ অবস্থা সমূহ এবং অতিন্দ্রীয় লোকের হাতছানি তাঁহার ঐ স্বভাবকে তীব্রতর করিয়া তুলিল। ভাবের আবেশ তাঁহার ভিতরে-বাহিরে আরও সুগভীর হইয়া উঠিল ; এখন তিনি নির্জ্জন নিরিবিলি স্তব্ধ পরিবেশের প্রতি অতিশয় ঝুঁকিয়া পড়িলেন। জনহীন শব্দহীন লুক্কায়িত স্থানে সর্ব্বেন্দ্রিয় আবদ্ধ অবস্থায় একাগ্রচিত্তে মন ও ধ্যানকে এক প্রভু এক পরওয়ারদেগার এক সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি রুজু ও ধাবিত রাখিতেই ভালবাসিতে লাগিলেন। লোকালয়ের এবং সংসারের কর্ম্মকোলাহল তাঁহার আধ্যাত্মিক চেতনাকে দুর্ব্বল করিয়া দেয় না কি বা সমাজ জীবনের পঙ্কিলতা তাঁহার প্রতি ধাবমান নূর ও জ্যোতির স্রোতকে বাধাগ্রস্ত করে না কি—তিনি যেন এই শঙ্কা, এই ভীতি, ভাবনায় অস্বস্তি ও উদ্বেগ অনুভব করিতে লাগিলেন! তাই নিভৃত নিস্তব্ধ স্থানে জনবসতি হইতে দূরে সরিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকা তাঁহার নিকট প্রিয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

তিনি গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেন, এমন কি রাত্রেও বাড়ী ফিরিতেন না ; কোন পর্ব্বতগুহায় থাকিয়া যাইতেন। অনেক সময় এরূপও হইত যে, বিবি খাদিজা (রাঃ) তাঁহাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া রুটি-পানি পৌঁছাইয়া আসিতেন। (আছাহ—৫৮)। ধীরে ধীরে তাঁহার শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিলেও নিরালা-নির্জন-বাসের স্পৃহা তাঁহার বাড়িয়াই চলিয়াছে। এখন তিনি মক্কা হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত হেরা পর্ব্বতে দেড় মাইল উচ্চ শৃঙ্গের নিভৃত গুহায় একাধারে কতক দিবারাত্র কাটাইবার নিয়ম বাঁধিয়া নিলেন। বিবি খাদিজা (রাঃ) প্রকৃত সহধর্ম্মিনীর ন্যায় স্বামীর এই কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। তিনি দুই-চার দিনের মত খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত করিয়া দিতেন ; নবীজী উহা লইয়া সেই নিভৃত সাধনা-গুহায় পৌঁছিতেন। সেই খোরাকী ফুরাইয়া গেলে গৃহে আসিয়া পুনরায় খাদ্য-পানীয় লইয়া তথায় ফিরিয়া যাইতেন। এইভাবে নবীজী এক বিরাট পরিবর্ত্তনের দিকে আগাইয়া চলিলেন এবং সেই পরিবর্ত্তনটা যেন ক্রমশঃই সাফল্যময় পরিণতির দিকে দ্রুত অগ্রসর বলিয়া মনে হইতেছিল। অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে চিরবাঞ্ছিতকে পাইবার প্রাক্কালে মানুষের যেরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হয় নবীজীর উপর যেন সেই ভাব

পরিলক্ষিত। তিনি শান্ত-শিষ্ট চিত্তে দিবানিশি আল্লাহ তায়ালার জিকর-ফিকরে মগ্ন থাকেন; এইভাবে দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার বয়স চল্লিশ পূর্ণ হইয়াছে; এই সময় তাঁহার ভিতরে বাহিরে কেবল নূর কেবল জ্যোতি।

সত্যের প্রথম প্রকাশ—নবুয়তের প্রারম্ভ (৫৪৩ পৃঃ)

রমজান মাস,* অমাবশ্যা-পূর্ব্ব অন্ধকার, রজনী গভীর, লোকালয় হইতে বহু দূরে হেরা পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গে নিভৃত প্রকোষ্ঠে নবীজী মোস্তফা ধ্যানমগ্ন। এমন সময় হঠাৎ মহাসত্যের আগমন হইল—ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ) ঐ হেরা প্রাকোষ্ঠে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং সালাম করিলেন। ফেরেশতা নূরের তৈরী; বহন করিয়া আনিয়াছেন আল্লাহ তায়ালার কালাম—উহাও নূর; এই সব নূরের আকর্ষণে নবীজী মোস্তফার জড়দেহের আবেষ্টনে লুক্কায়িত মহানূরও প্রতিভাত হইয়াছে অসাধারণভাবে। অতএব হেরা-গুহায় এখন নূর! নূর!! সবই নূর। নবীজী মোস্তফার তিতর বাহির নূরের জৌলুসে নূরই নূর হইয়া গিয়াছে—এই মহা মুহূর্ত্তে তাঁহার দেহমনের অবস্থা একমাত্র তাঁহারই অনুভব করিবার কথা—ব্যক্ত বা বর্ণনা করার আয়ত্ত বহির্ভূত। নিভৃত-গিরিগহ্বরের এই অভূত পূর্ব মূহূর্ত্তটি মোস্তফা-হৃদয়ে কি রেখাপাত করিয়াছিল তাহা কি কোন মানুষ নির্ণয় করিতে পারে?

সব কিছুই সত্য, কিন্তু ইহাও সত্য যে, সব কিছুর মাঝে নবীজী মোস্তফার জ্ঞান, উপলব্ধি ও চেতনা সম্পূর্ণ সুষ্ঠু ও প্রখর ছিল, উহাতে কোনই ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এই পরিস্থিতি অপেক্ষা লক্ষ-কোটি গুণ অস্বাভাবিক ও মহান পরিস্থিতিতেও নবীজী মোস্তফার জ্ঞান-উপলব্ধির কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই; এমনকি চর্ম্ম চোখ পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র ঝলসায় নাই বলিয়া স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে নবীজীর প্রশংসা করিয়াছেন। মে'রাজ ভ্রমণে নবীজী মহান আরশ-কুরছী, ছেদরাতুল-মোনতাহা ইত্যাদি সহ যাহা কিছু পরিদর্শন করিয়া ছিলেন উহা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই বলিয়াছেন, لقد رأى من آيات ربه الكبرى "নবীজী মোস্তফা তাঁহার প্রভু-পরওয়ারদেগারের মহাবড় অপেক্ষা বড় বড় অনেক কুদরতের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়া ছিলেন।" সেই উপলক্ষে আল্লাহ তায়ালা

---

* নবুয়ত ও কোরআন অবতরণ আরম্ভের সময়কাল সম্পর্কে অনেক মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশ সীরত সঙ্কলকগণের সিদ্ধান্ত এবং বিশিষ্ট ইমামগণের মত, ইহাই যে, তাহা রমজান মাসে ছিল। পবিত্র কোরআনের আয়াতও এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে সুস্পষ্ট যদি উহাতে কোন প্রকার হেরফের করা না হয় (যোরকানী, ১—২০৭)। এই হিসাবে নবুয়ত প্রাপ্তি চল্লিশ বৎসর ছয় মাসের ও বেশ কিছু দিন উর্দ্ধের বয়সে ছিল।

বলিয়াছেন, ما زاغ البصر وما طغى "ঐ সব পরিদর্শনে নবীজীর চোখ মোটেই ঝলসায় নাই এবং ব্যতিক্রমও হয় নাই (৫—২৭)।

হেরা-প্রকোষ্ঠে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল উহার মাঝে নবীজী মোস্তফা স্বীয় জ্ঞান, উপলব্ধি ও সুষ্ঠু চেতনার মাধমে ফেরেশতা জিব্রিলকে সম্যকরূপে চিনিতে ও বুঝিতে পারিয়া ছিলেন—ইহাও আল্লাহ তায়ালার এক কুদরতই ছিল।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ পরিচয় ও গুণের উল্লেখ রহিয়াছে এই—الذى اعطى كل شئ خلقه ثم هدى "আল্লাহ তায়ালা সেই মহান যিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে উহার আকৃতি-প্রকৃতি দান করিয়াছেন অতঃপর তিনিই উহাকে উহার স্বাভাবিক ধর্ম্মের প্রতি স্বয়ংক্রিয়রূপে পরিচালিত করিয়াছেন (১৬—১১)।" যথা—কাহার খাদ্য কি? প্রত্যেক সৃষ্টি শিক্ষা ও পরিচয় করানো ছাড়াই উহার সহিত পরিচিত হয় এবং নিজ নিজ আহারের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সদ্য প্রসুত শিশু কাহারও শিক্ষা দান ছাড়াই মাতার বক্ষ হইতে দুগ্ধ আহরণের কৌশল-প্রণালী বুঝিয়া উঠে; এমনকি পরিচয় প্রদান এবং কাহারও হইতে পরিচয় গ্রহণ ব্যতিরেকেই তাহার অন্তর তাহার মায়ের সহিত এত গভীরভাবে পরিচিত হয় যে, সেই পরিচয়ের কোন তুলনা হয় না। এই শ্রেণীর হাজার হাজার পরিচয় ও উপলব্ধি কোথা হইতে আসে? এই সবের প্রবাহ একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতেই পৌঁছিয়া থাকে। সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার এই মহাদানকেই উল্লেখিত আয়াতে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

শিশুর জন্য মায়ের পরিচয় যেরূপ প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজন মিটাইয়া থাকেন সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা; নবীর জন্য জিব্রিলের পরিচয় তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজন এবং হেরা-গুহায় সেই প্রয়োজন সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণরূপে মিটাইয়াছিলেন সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালাই। (যোরকানী, ১—২১৮)

ফেরেশতা জিব্রিল (আঃ) আত্মপ্রকাশের পর রসুল হওয়ার সুসংবাদ দানে নবীজীকে অভিনন্দিত করিলেন। সুস্পষ্ট সুসংবাদ প্রাপ্তে নবীজী সংশয়মুক্তরূপে রসুল হওয়ার একীন লাভ করিলেন। অতঃপর জিব্রিল (আঃ) নবীজীকে বলিলেন, পড়ুন; নবীজী বলিলেন, পড়ার সামর্থবান আমি নহি।

কাহারও মতে ঐ সময় জিব্রিল (আঃ) রেশমীপত্রে নূরানী মণি-মুক্তা খচিত একখানা লিপি নবীজীর হস্তে অর্পণ করিয়া উহাকেই পাঠ করিতে বলিয়াছিলেন। লেখাপড়া না শেখা ব্যক্তি লিপি পাঠে সক্ষম হয় না—তাহাই নবীজী বলিয়াছিলেন পড়ার সামর্থবান আমি নহি। অনেকের মতে জিব্রিল (আঃ) মৌখিক পড়ার কথাই বলিয়াছিলেন; কিন্তু পাঠনীয় কোন বস্তু শুধু শুনিয়া আবৃত্তি করাও লেখাপড়া না শেখা ব্যক্তির পক্ষে কঠিন হয়, এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বালোচিত ভয়াল দৃশ্যাবলীর চাপে ঐ

সময় নবীজীর উপর সৃষ্ট শিহরণ ও কম্পন কোন কিছু পাঠ বা আবৃত্তি করিতে প্রতিবন্ধক হইতেছিল—তাহাই নবীজী বলিয়াছিলেন, পড়ার সামর্থবান আমি নহি (সীরতে মোস্তফা, ১—১০০)। যাহাই হউক জিব্রিল (আঃ) নবীজীর সাহস ভাঙ্গা দেখিয়া তাঁহার মনোবল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে স্বীয় দৈবশক্তি প্রয়োগে নবীজীর আধ্যাত্মিক শক্তিকে উচ্ছলিত করার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি স্বীয় বক্ষে নবীজীর বক্ষ নিবেশনপূর্ব্বক আলিঙ্গনের মাধ্যমে সজোরে চাপ দিলেন; এমনকি চাপের দরুন নবীজী ক্লেশ অনুভব করিলেন। প্রথমবার আলিঙ্গণে নবীজীর সাহস সতেজ হইল না, তাই পর পর তিনবার আলিঙ্গন করিলেন; তৃতীয় বার আলিঙ্গনের পর জিব্রাইলের পঠিত পাঁচটি আয়াত নবীজী অনায়াসে পড়িতে পারিলেন।

হেরা-গুহার ঘটনায় সব কিছুকে চেনা, বুঝা ও উপলব্ধি করার মধ্যে নবীজীর বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। কিন্তু এই দুনিয়াতে তিনি মানবীয় মাটির দেহে আবির্ভূত; আত্মা তাঁহার বহু উর্দ্ধের, কিন্তু তাঁহার দেহ ও দেহভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি মাটির জগতের। অতএব তাঁহার দেহের উপর কোন বিশেষ ঘটনার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হইয়া যাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না—এই দৃষ্টিতে হেরা-গুহার ঘটনার কতিপয় খুঁটিনাটি বিষয় লক্ষ করুন।

(১) নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশ।
(২) অন্ধকারময় গভীর রজনী।
(৩) লোকালয় হইতে বহু দূরে।
(৪) পর্ব্বত শৃঙ্গের নিভৃত গুহায়।
(৫) পরে পরিচয় হইলেও আগন্তুকের অকস্মাৎ আগমন।

এতগুলি ভীতির কারণ সমাবেশে মানবীয় দেহের উপর সাময়িক শিহরণ ও কম্পন সৃষ্টি হওয়া কতই না স্বাভাবিক।

সর্ব্বপরি কথা—নবীজী মোস্তফা ঘটনার মর্ম্ম সবই বুঝিতে পারিয়াছিলেন; পারিবেন না কেন? তিনি ত পাহাড়-পর্ব্বত বৃক্ষ-লতার সাক্ষ্য শুনিয়া আসিতে ছিলেন, انك لرسول الله "নিশ্চয় আপনি মহাপুরুষ আল্লার রসুল"। লুক্কায়িত সাক্ষ্যের আজ চূড়ান্ত বিকাশ, তাই গুরুদায়িত্বের চেতনাও আজ পূর্ণমাত্রায়। তাঁহার নিকট যে সত্য আসিয়াছিল, যে কর্ত্তব্য পালনের জন্য তাঁহাকে প্রস্তুত করা হইয়াছিল তাহা সহজ কাজ নহে। তাঁহাকে মুক্তির পতাকা দিয়া পাঠান হইয়াছিল বিশ্বের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে। কর্ম্ম ও সাধনা যুগপৎ ভাবে উভয়কে লইয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইবে এই বিশাল ধরাপৃষ্ঠে।

এতদ্ভিন্ন আরও একটি ভীষণ চাপের বস্তু ছিল "অহী"। ফেরেশতা জিব্রিল (আঃ) নিজ জাতীয় ব্যক্তিগত অবস্থায় থাকিয়া অহী পৌঁছাইলে সেই অহীর গুরুচাপ সম্পর্কে

হাদীছেই উল্লেখ আছে যে, অত্যধিক শীতের সময়ও নবীজী ঘর্মাক্ত হইয়া যাইতেন; ঘর্মের ধারা তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে বহিয়া পড়িত, তাঁহার গলগণ্ড হইতে গোঙ্গানি শব্দ নির্গত হইত, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া যাইত (প্রথম খণ্ড ২নং হাদীছ)। অহীর আভ্যন্তরীণ গুরুচাপ সম্পর্কেও যায়েদ-ইবনে ছাবেৎ (রাঃ) ছাহাবীর বর্ণনা রহিয়াছে—একদা মাত্র একটি শব্দের অহী অবতীর্ণ হইল; ঐ সময় আমি নবীজীর পার্শ্বে বসা ছিলাম; তাঁহার উরু আমার উরুর উপরে ছিল; অহীর ভীষণ চাপে আমার উরু চূর্ণ হইয়া যাইবে মনে হইতেছিল। হেরা-গুহার ঘটনায় বাহ্যিক চাপ ততটা না হইলেও আভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক চাপ ত অবশ্যই ছিল। তদুপরি একবার নয়, দুইবার নয়, তিনবার জিব্রিল ফেরেশতার আলিঙ্গন চাপও ছিল। বিদ্যুৎ-স্পর্শের চাপ বাহ্যিকরূপে দৃশ্য না হইলেও আভ্যন্তরীণ চাপ কতই না বিরাট হইয়া থাকে এবং সেই চাপে বিদ্যুৎ-শলাকায় কম্পনও সৃষ্টি হইতে পারে। এস্থলে নির্ম্মল জ্যোতির সৃষ্টি ফেরেশতা জিব্রিল চির জোতির্ময় বস্তু "অহী" নিয়া আসিয়াছেন; তাঁহার স্পর্শনে নবীজীর প্রাণে শিহরণ জাগিয়া উঠা মোটেই বিচিত্র ছিল না, বরং এই ক্ষেত্রে শিহরণ সৃষ্টি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। হাদীছে ও ইতিহাসে যদি শিহরণের উল্লেখ না থাকিত তবে তাহা অস্বাভাবিক পরিগণিত হইত।

ভয়াল দৃশ্যে এবং অহীর চাপে ও ফেরেশতা জিব্রিলের আলিঙ্গন ক্রিয়ায় সৃষ্ট শিহরণ এবং বিশাল দায়িত্বের গুরুভার বোধে সৃষ্ট শঙ্কা ও ভীতিসহ হেরা-গুহায় সর্ব্বপ্রথম অবতারিত...... اقرأ باسم ربك الذى خلق পবিত্র কোরআনের পাঁচটি আয়াত লইয়া নবীজী মোস্তফা (দঃ) গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং বিবি খাদিজা (রাঃ)কে কম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, আমাকে আবৃত কর—আমাকে আবৃত কর। গৃহের সকলে নবীজীকে কম্বলে আবৃত করিয়া নিলেন; ক্ষণেকের মধ্যে তাঁহার শিহরণ ও কম্পন দূরীভূত হইল। তিনি স্বাভাবিক শান্ত অবস্থায় প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, হে খাদিজা! অসাধারণ আশ্চর্য্যজনক অবস্থা আমার উপর প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—এই বলিয়া সকল বৃত্তান্ত তিনি খুলিয়া বলিলেন। নবীজী বিবি খাদিজাকে আরও বলিলেন, আমার কিন্তু প্রাণের ভয় হয়।

নবীজী (দঃ) স্বীয় দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও চেতনা হেরা-গুহা হইতেই নিয়া আসিয়াছিলেন; এখন থাকিয়া থাকিয়া সেই কর্ত্তব্যের কঠোরতা বিশেষতঃ কর্ম্মস্থলের ভয়াবহতা তাঁহার চোখে ভাসিয়া উঠিতেছিল। বিশ্বজোড়া আল্লাহ-ভোলা মানব শেরেক ও মূর্ত্তিপূজায় পরিবেষ্টিত, আর সেই কাজে সকলের গুরু হইল মক্কাবাসী—সেই মক্কায়ই নবীজীকে প্রথম দাঁড়াইতে হইবে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" ধ্বনি লইয়া, আঘাত হানিতে হইবে শেরেক ও মূর্ত্তিপূজার প্রতি।

এই পরিস্থিতিতে দেশজোড়া বিশ্বজোড়া শত্রুর হাতে প্রাণ হারাইবার শঙ্কা ও ভীতি কি অমূলক ? কত নবীই ত এই পরিস্থিতিতে প্রাণ হারাইয়া ছিলেন।

বিবি খাদিজা (রাঃ) নবীজীকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা ও অভয় দিতে লাগিলেন। তিনি নবীজীর জনসেবামূলক ও উন্নত চরিত্রের মহিমা ও গুণাবলী উল্লেখ পূর্ব্বক দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত বলিলেন, কস্মিনকালেও আল্লাহ আপনার প্রতি বিমুখ হইবেন না। তিনি নিজেই আপনার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য অর্পণ করিয়াছেন উহা যথাযথ পালন করিয়া যাওয়ার সুযোগ ও শক্তি প্রদান না করার অর্থ আপনাকে অপমান করা ; আল্লাহ তায়ালা আপনাকে অপদস্ত-অপমান নিশ্চয়ই করিবেন না। এই সময়ে বিবি খাদিজা নবীজীর চারিত্রিক গুণাবলীর যে কয়টি গুণ উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহা বিশেষভাবে অনুধাবন যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—আপনি স্বজনবর্গের চিরশুভাকাঙ্খী মঙ্গলকামী বন্ধু, আপনি পর-দুঃখভার বহনকারী মহাজন, আপনি গরীব-কাঙ্গাল দুঃখীজনের সেবক, যাহার কেহ নাই কিছু নাই আপনি তাহার আপন জন এবং সব কিছু। এরূপ পূণ্যবান মহামতি মহাত্মাকে কি আল্লাহ তায়ালা বিপর্যস্ত ও অপদস্ত অপমান করিবেন ? কস্মিনকালেও নয়।

এই পরিস্থিতিতে বিবি খাদিজা (রাঃ) উপযুক্ত সহধর্ম্মিণীর দায়িত্বই পালন করিয়াছিলেন। নবীজীর এই কঠিন মুহূর্ত্তে যেভাবে তিনি তাঁহার জন্য সান্ত্বনা যোগাইয়া ছিলেন—উহা তাঁহার চিরসৌভাগ্যের প্রতীক এবং প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ হইয়া থাকিবে ; বিবি খাদিজার এই চিত্রের তুলনা নাই।

বিবি খাদিজা (রাঃ) কিন্তু ধীর-স্থির, শান্ত-অচঞ্চল ; এইরূপ হইবেন না কেন ? তিনি ত নবীজীর উদিয়মান সূর্য্যের প্রভাতী আলো পূর্ব্ব হইতেই প্রত্যক্ষ করিতে ছিলেন। তাকাইয়া ছিলেন—সেই সূর্য্য দৃষ্ট হওয়ার শুভলগ্নের প্রতি। সেই চির আকাঙ্খিত সূর্য্য আজ উঁকি দিয়াছে ; মনে কি আনন্দের ঠাই হয় ? প্রাণে কি উল্লাসের সঙ্কুলান হয় বিবি খাদিজার ?

বিবি খাদিজার সম্পর্কীয় চাচা মুরব্বি জ্ঞানবৃদ্ধ তাপস সৎ-সাধু অরাকা ইবনে নওফল—যাঁহার সহিত বিবি খাদিজা পূর্ব্ব হইতেই নবীজী সম্পর্কে যোগাযোগ রাখিয়া ছিলেন, দাম্পত্য প্রণয়নে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া ছিলেন ; ঐ সময় তাঁহার নিকট মায়সারার বর্ণিত ঘটনা ইত্যাদি বর্ণনা করিলে এই অরাকাই নবীজীর উজ্জল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এবং নবী হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া খাদিজা (রাঃ)কে বিবাহের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। বিবি খাদিজা (রাঃ) সেই আশায় বুক বাঁধিয়াই অসময়ে বিবাহে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আজ যখন সেই আশার সূর্য্যোদয়ের ধারণা করার সুস্পষ্ট ঘটনাবলীর খোঁজ পাইলেন এবং

সেই ঘটনাবলীর নিদর্শন চোখে দেখিলেন তখন কি আর খাদিজা (রাঃ) এই মুহূর্ত্তেই অরাক্কার নিকট না যাইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন? স্বাভাবিকভাবেই বিবি খাদিজা (রাঃ) এই নূতন ঘটনাবলীর বর্ণনা অরাক্কাকে শুনাইয়া তাঁহার পূর্ব্ব ধারণার বাস্তবতা জ্ঞাত করিতে এবং নিজের আকাঙ্খিত সৌভাগ্য ও গৌরবের উদয়ন-খবর প্রদানে ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। অন্যের মুখে ও সাক্ষ্যে নয়, বরং স্বয়ং যাঁহার ঘটনা তাঁহার মুখেই বিস্তারিত বিবরণ অরাক্কাকে শুনাইবার আগ্রহে বিবি খাদিজা নবীজীকেও সঙ্গে লইলেন। বিবি খাদিজার ন্যায় সর্ব্বোৎসর্গকারিণী জীবন-সঙ্গীনীর আগ্রহ ও আকাঙ্খাকে নবীজী কি উপেক্ষা করিবেন? তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য নবীজী তাঁহার সঙ্গে গেলেন। নবীজী তাঁহার ঘটনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত শুনিয়া কোন সংশয় দূর করার জন্য নিজ আগ্রহে অরাক্কার নিকট গিয়া ছিলেন—এইরূপ বিবৃতি কোন ইতিহাসেও নাই হাদীছেও নাই; শত্রুরা প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডারূপে এই শ্রেণীর কথা গড়াইয়া থাকে।

আসমানী কেতাবের অভিজ্ঞ সাধু অরাক্কা সকল বৃত্তান্ত শ্রবণে সেই মুহূর্ত্তেই সত্যকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং অকাতরে উহার স্বীকৃতি দানে দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত বলিলেন, এ ত সেই চিরমঙ্গলময় বার্ত্তাবাহক দূত ফেরেশতা যিনি মুছা ও ঈসা পয়গাম্বরদ্বয়ের নিকট আল্লার বাণী ও অহী বহন করিয়া আনিতেন। নবীজী মোস্তফার পয়গাম্বরী প্রসার লাভের সময় পর্য্যন্ত জীবিত থাকার আকাঙ্খাও তিনি প্রকাশ করিলেন। আসমানী কেতাবের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিনি দেশময় নবীজীর শত্রুতা সৃষ্টির সংবাদ দানে বলিলেন, মক্কাবাসীরা আপনাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করিবে। নবীজী স্তম্ভিত স্বরে বলিলেন, মক্কাবাসীরা আমাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবে! অরাক্কা বলিলেন, হাঁ—আপনার শ্রেণীর প্রত্যেকের সহিতই এইরূপ শত্রুতা করা হইয়াছে। অরাক্কা ইহাও বলিলেন যে, ঐ সময় যদি আমি জীবিত থাকি তবে আমি আমার শক্তি ও সাধ্যের সর্ব্বশেষ বিন্দু ব্যয়ে আপনার সাহায্য সহায়তা করিয়া যাইব। সেই মুহূর্ত্তে অরাকার ন্যায় ব্যক্তির এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয়ের স্বীকৃতি পাইয়া বিবি খাদিজা (রাঃ) নিজ বিশ্বাসের ও সৌভাগ্যের গৌরবে কিরূপ পুলকিত হইয়া ছিলেন তাহা অনুভব ও উপলব্ধি করার বস্তু; ব্যক্ত করার বস্তু নহে।

অরাক্কা বিবি খাদিজা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিলেন। তিনি কি তাঁহাকে ভুলিতে পারেন? নবীজীর চরণতলে ছায়া লাভে তিনিই খাদিজা (রাঃ)কে প্রথম উৎসাহ যোগাইয়াছিলেন এবং আকাঙ্খিত সৌভাগ্যের উদয়ন মুহূর্ত্তেও তিনি সত্যের সঠিক স্বীকৃতি ও উপযুক্ত মূল্য দানে বিবি খাদিজার অন্তরকে গৌরবে ও আনন্দে ভরিয়া দিলেন। অরাক্কার নিজের আকাঙ্খা পূর্ণ হইল না; অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ইন্তেকাল করিয়া গেলেন—নবীজীর পয়গাম্বরীর

প্রসারকাল তিনি পাইলেন না। একদা খাদিজা (রাঃ) নবী (দঃ)কে বলিলেন, অরাক্বা ত আপনার পয়গাম্বরীতে পূর্ণ বিশ্বাস ও স্বীকৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। নবী (দঃ) বলিলেন, আমি অরাক্বাকে স্বপ্নে সাদা পোষাকে দেখিয়াছি; সে নরকী হইলে (আমার স্বপ্নে) তাহার এই পোশাক হইত না। আরও বর্ণিত আছে— নবী (দঃ) বলিয়াছেন, অরাক্বাকে মন্দ বলিও না; আমি বেহেশতে তাহার জন্য বাগান দেখিয়াছি (সীরতে মোস্তফা, ১—১০৭)।

সর্ব্বপ্রথম অহী ঃ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اِقْرَأْ وَرَبُّكَ

الْاَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ *

"তোমার প্রভু-পরওয়ারদেগারের নামের সাহায্য লইয়া পড়—যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন রক্তপিণ্ড হইতে। পড়; তোমার প্রভু-পরওয়ারদেগার মহামহিম। তিনি জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন কলমের দ্বারা। তিনি মানুষকে অজ্ঞাতপূর্ব্ব জ্ঞান দান করিয়াছেন।"

যেই মহাসত্যের প্রতীক্ষায় ছিল সারা জাহান; যুগযুগান্তর হইতে ধরণীপৃষ্ঠে কত নবী-রসুল আল্লাহ তায়ালার প্রতিশ্রুতি শুনাইয়া গিয়াছেন যেই মহাবাণী সম্পর্কে। সেই মহাসত্য মহাবাণীই আল্লার পাক-কালাম; আজ উহার প্রথম অবতরণ। উহার প্রথম প্রকাশই কত সুন্দর। মানুষের ধ্যান-ধারণায় বিপ্লব সৃষ্টি করিতে কত সুগভীর ক্রীয়াশীল।

মানুষ সৃষ্টিগতভাবে মোহতাজ—মুখাপেক্ষী ও অন্যের প্রত্যাশী, অনেক ক্ষেত্রে দুর্ব্বল ও অক্ষম। আল্লাহ-ভোলা মানুষ তাহার মোহতাজী পূরণে এবং অক্ষমতা দূর করণে সৃষ্টিকর্ত্তাকে ছাড়িয়া শত দুয়ারে ছুটাছুটি করে—ইহা হইতেই আল্লাহ ভিন্ন অন্যের পূজার সূচনা হইয়াছে; যাহার উচ্ছেদের জন্য ইসলামের আবির্ভাব কোরআনের অবতরণ। তাই কোরআনের সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা—যে কোন মোহতাজী বা প্রত্যাশা পূরণে এবং শক্তি-সামর্থের কামনায় প্রত্যেকে আল্লার প্রতি ধাবিত হইবে। প্রথম আয়াতের মর্ম্ম ও মূল তাৎপর্য্য ইহাই; নবীজীকে সম্বোধন করা এবং পড়ার উল্লেখ করা আয়াতটির অবতরণ ক্ষেত্রের সামঞ্জস্যে উদাহরণ মাত্র। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রত্যেক কার্য্যে সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার সাহায্য কামনা করিয়া উহাতে অবতীর্ণ হইবে; তাহা করিলে শক্তি-সাহসের অভাব থাকিলেও সাফল্য লাভ হইবে। আল্লাহ অতি মহান অতি মহান—ইহজগতে বন্দা আল্লার

সাহায্য চাহিবার জন্য আল্লাহকে পাইবে কোথায়? এই জটিলতার সহজ সমাধানেই বলা হইয়াছে; আল্লার নামের সাহায্য সম্বল করিয়া কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়া পড়।

বিশ্বজোরা ভুল ধ্যান-ধারণা—আল্লার দুয়ার ছাড়িয়া অন্যের দুয়ারে যাওয়া ইহার আমূল পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক সাহায্য সহায়তার প্রত্যাশী একমাত্র আল্লাহ তায়ালার নিকট হওয়ার আদর্শ ও নীতি শিক্ষা দেওয়াই প্রথম আয়াতের মূল তাৎপর্য্য। এই আদর্শ ও নীতি হইতে বিচ্যুত হওয়াই তৌহিদের বিপরীত শির্কের সূত্র; তাই সর্ব্বপ্রথম অহী এই আদর্শ ও নীতি প্রবর্ত্তনে অতি সুন্দর আরম্ভই বটে।

সঙ্গে সঙ্গে সেই নীতির যৌক্তিকতায় আল্লাহ তায়ালা স্বীয় পরিচয় দানে বলিতেছেন, তিনিই বিশ্বনিখিলের "রব্" তথা সৃষ্টিকর্ত্তা রক্ষাকর্ত্তা পালনকর্ত্তা—সকল সৃষ্টিকে তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টি সম্পর্কে কতইনা মানবগর্হিত মতবাদ ছিল—যে সব মতবাদ মানুষকে আল্লাহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া শির্কে লিপ্ত করিয়াছে। পবিত্র কোরআন তাহার প্রথম প্রকাশেই সৃষ্টি সম্পর্কে সমস্ত গর্হিত মতবাদ ও ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন করিয়া স্পষ্ট ঘোষণা দিয়াছে—একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই খালেক ও স্রষ্টা। পৃথিবীতে ধর্ম্মের নামে যত অনাচার অবিচার ও গর্হিত মতবাদের ছড়াছড়ি সংঘটিত হইয়াছে সবের মূলেই একটি মহাদোষ দৃষ্ট হয় যে, মানব সৃষ্টিকর্ত্তার যথাযথ মর্য্যাদা দানে ভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত হইয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তাকে তাঁহার আসন হইতে নামাইয়া সৃষ্টিকে তাঁহার আসনে বসাইবার চেষ্টা করিয়াছে। অধুনা খোদা নাই মতবাদের ধ্বজাধারীরাও ন্যাচার বা স্বভাবকে সেই আসনেই আসীন করিতেছে। অথচ ন্যাচার বা স্বভাব ও প্রকৃতিও আল্লাহ তায়ালারই সৃষ্টি। সৃষ্টিকে সৃষ্টিকর্ত্তার আসনে টানিয়া আনা এই মূল রোগের বিনাশ সাধনে কোরআন তাহার প্রথম কথায় বলিয়া দিতেছে—বিশ্বচরাচরের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, বিশ্বের যাহা কিছু সমস্তই একমাত্র তাঁহারই সৃষ্টি।

এস্থলে সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লার অসংখ্য গুণবাচক নাম হইতে "রব" নাম গ্রহণ করা হইয়াছে। সৃষ্টির বিবরণের সহিত এই নামের বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধ অতি চমৎকার। "রব" শব্দের অর্থ বস্তুকে উহার নগণ্য ও ছোট পর্য্যায় হইতে উন্নত ও বড় হওয়ার জন্য পোষিয়া ধাপে ধাপে ক্রমে ক্রমে পূর্ণতায় উপনীতকারী। বিশ্ব-চরাচরের সৃষ্টিসমূহের যে ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিবর্ত্তন তাহা ন্যাচার বা স্বভাবের ক্রিয়া নহে; উহা সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালারই সৃষ্টির নিয়ম ও পদ্ধতি। "রব" শব্দের দ্বারা তাহা বুঝানই উদ্দেশ্য এবং উহারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এখানে করা হইয়াছে। সৃষ্টির সেরা মানব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"যিনি মানবকে "আলাক"—রক্তপিণ্ড হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।" কি বিচিত্রময় ক্রমবিকাশ ও ক্রমবিবর্ত্তন মানব সৃষ্টির মধ্যে। পবিত্র কোরআনেই বর্ণিত রহিয়াছে—

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ * ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا * ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ * فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ * ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ * ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ

(১৮ পাঃ ১ রুঃ)

অর্থাৎ—আমি মানবকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহার মূল হইল মাটি হইতে নিষ্কাশিতবস্তু (তথা খাদ্য যাহা মাটির রসে উৎপন্ন।) অতঃপর সেই বস্তুকে বীর্য্য বানাইয়াছি (খাদ্য হইতে রক্ত, রক্ত হইতে বীর্য্য)—যাহাকে জড়ায়ু-প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ রাখিয়াছি। অতঃপর বীর্য্যকে রক্তপিণ্ড বানাইয়াছি। তারপর রক্তপিণ্ডকে মাংসখণ্ড বানাইয়াছি। তারপর ঐ মাংস খণ্ডের কিছু অংশকে হাড় বানাইয়া উহাকে মাংসে আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছি। তারপর (আত্মার সংযোজনে) ইহাকে (ঐ বস্তুসমূহ হইতে সম্পূর্ণ) ভিন্ন এক (বহুমুখী গুণাধার এবং বিচিত্রময় রূপ-লাবণ্য ও সুন্দর নকশা-আকৃতির) সৃষ্টিরূপে দাড় করিয়াছি। কত বড় মহান সেই আল্লাহ যিনি সুন্দর রূপদানে অতুলনীয়। তারপর হে মানব! তোমাকে মরিতে হইবে, অতঃপর কেয়ামত দিবসে তোমাকে পুনর্জীবিত হইতে হইবে (—সেই জীবনের আর শেষ নাই)।

ক্রম-বিকাশের এবং ক্রমবিবর্ত্তনের কি সুন্দর বিবরণ! প্রত্যেক ক্রম ও ধাপের বর্ণনার সহিত আল্লাহ তায়ালা "খালাকনা" উল্লেখ করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে, এক ধাপ হইতে অপর ধাপে যাওয়া ইহা একমাত্র আমার সৃষ্টি ও কার্য্যেই হইয়াছে; স্বয়ংকৃত ও স্বয়ম্ভুরূপে বা অন্য কোন কর্ত্তার ক্রিয়ায় নহে। মানবের আদি হইতে অন্ত এবং অনন্ত পর্য্যন্তের সর্ব্বময় ক্রম-বিকাশের কি সুন্দর বর্ণনা ইহা। সর্ব্বপ্রথম অহীর মধ্যে এই দৃষ্টান্তেরই সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত দানপূর্ব্বক আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্বকে ব্যাপক আকারে দেখাইয়া শিরকের মূলোচ্ছেদ করা হইয়াছে।

আল্লাহ তায়ালা স্রষ্টা, ইহার বিকাশ-পাত্রের নমুনারূপে মানব-সৃষ্টির আদিকথা উল্লেখ করিয়াছেন—এখানেই আসিয়া গেল মানুষের পরিচয়। মানুষ কোথা হইতে আসিল? কে পয়দা করিল? এক্ষেত্রেও কোরআন যাবতীয় মতবাদকে বাতিল করিয়া দিয়া স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছে যে, মানুষকে আল্লাহ তায়ালাই পয়দা করিয়াছেন অতি নিকৃষ্ট ঘৃণারবস্তু বীর্য্য এবং রক্তপিণ্ড হইতে।

মহান আল্লার সর্ব্বশক্তিমত্তার কি সুস্পষ্ট বিকাশ! একটা নিকৃষ্টবস্তু রক্তপিণ্ডের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা মানুষের অসাধারণ শক্তি ও সম্ভাবনাকে পুতিয়া রাখিয়াছেন, তারপর ক্রমবিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া সেই রক্তপিণ্ডকে তিনি জ্ঞান বিবেকসম্পন্ন শক্তিশালী মানুষে পরিণত করিয়াছেন!

মানুষের মহারত্ন জ্ঞান সম্পর্কেও কোরআন সুস্পষ্ট ধারণা ও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালাই মানুষকে জ্ঞান দান করিয়াছেন। এই ব্যাপারেও আল্লার মহাশক্তিমত্তার উল্লেখ পূর্ব্বক বলা হইয়াছে—এই মহারত্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দিয়াছেন নির্জীব লেখনীর মাধ্যমে। জগতের দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় লেখনীর মাধ্যমেই জন্মলাভ করিয়া প্রসারিত হয় এবং মানুষ তাহা আহরণ করে। তারপর আরও বলা হইয়াছে, বহু অজানা জ্ঞান আল্লাহ তায়ালা মানবকে বিভিন্ন উপায়ে দান করিয়াছেন।

জ্ঞান দুই প্রকার—(১) জাহেরী অর্থাৎ যেই জ্ঞানলব্ধ বিষয়বস্তু বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ; যেমন—জাগতিক দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, ইতিহাস ইত্যাদি। (২) বাতেনী অর্থাৎ যেই জ্ঞানলব্ধ বিষয়বস্তু বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে ; যেমন—"হাকায়েক" তথা তত্ত্বজ্ঞান এবং "মাআরেফ" তথা অধ্যাত্মজ্ঞান। জাহেরী জ্ঞান সাধারণতঃ লেখনীলব্ধ, আর বাতেনী জ্ঞান মুলতঃ প্রত্যক্ষ সত্যদর্শন বা সত্যের সাক্ষাৎলব্ধ, কিন্তু বাহ্যিক উপকরণ বা বাহ্যিক চর্চ্চার মাধ্যমে ইহার অধিক উন্মেষ হইতে পারে। এই উভয় প্রকারের জ্ঞানই মানুষের দুই পথে লাভ হইতে পারে—(১) লেখনী, চর্চ্চা শিক্ষা ইত্যাদি কোন উপকরণ বা বাহনের মাধ্যমে ; ইহাকে "এল্‌মে-কস্‌বী" বলা হয়। (২) কোন উপকরণ বা বাহনের মাধ্যম ব্যতিরেকে শুধু আল্লার দান ও অনুগ্রহে ; ইহাকে "এল্‌মে-লতুন্নী" বলা হয়।

এখানে প্রথমে কলমের সাহায্যে জ্ঞান দানের উল্লেখ পূর্ব্বক এল্‌মে-কসবীর ইঙ্গিত করিয়া অতঃপর বলা হইয়াছে, মানুষকে আল্লাহ তায়ালা বহু অজানা জ্ঞান দান করিয়াছেন। অর্থাৎ উভয় পথের জ্ঞান তাহাকে দেওয়া হইয়াছে।

লক্ষ্য করুন! অহী ও পবিত্র কোরআনের আরম্ভ বা উদ্বোধন (Opening) এবং প্রথম প্রকাশ (Biginig) কত মধুর, কত গুরুত্বপুর্ণ, কত সুন্দর! সব রকম আরম্ভের উৎকর্ষসাধন-প্রণালী শিক্ষা দানে উহার আরম্ভ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে—প্রত্যেক কাজের আরম্ভে আল্লার নামের সাহায্য-সম্বল গ্রহণ করিবে ; অর্থাৎ "বিছমিল্লাহ" বলিয়া আরম্ভ করিবে ; যাহার অর্থ হইবে—হে আল্লাহ! আমি তোমারই সাহায্য কামনা করি, তোমারই প্রত্যাশা রাখি ; তুমি সর্ব্বশক্তিমান ভিন্ন অন্য কোন শক্তির প্রতি আমার প্রত্যাশা নাই।

এই আদর্শের ইঙ্গিতের পর সম্পুর্ণ কোরআন এই আদর্শের উপরই অবতীর্ণ হইয়াছে—কোরআনের প্রতিটি ছুরার আরম্ভেই "বিসমিল্লাহির-রাহমানির-রাহীম"

অবতীর্ণ হইয়াছে। আরম্ভের আদর্শ সর্ব্বাগ্রেই ব্যক্ত হইতে হইবে, অতএব সর্ব্বাগ্রে এই আয়াত নাযেল হওয়াই অতি সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়াছে। ↑

এই আদর্শ অতি গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ; ইহাতেই শির্কের ছিদ্রপথ বন্ধ হইবে যাহা তৌহীদ একাত্ববাদের প্রথম সোপান; যেই তৌহীদের জন্যই ইসলাম, কোরআন ও রসুল। ইহারই সঙ্গে সঠিক ধারণা ও সত্যজ্ঞান দান করা হইয়াছে সর্ব্ব উর্দ্ধের দর্শন সম্পর্কে—(১) আল্লার পরিচয় (২) নিখিল সৃষ্টি কোথা হইতে আসিল? (৩) বিশেষতঃ মানুষের সৃষ্টি-বৃত্তান্ত কি? (৪) মানুষের মূল বৈশিষ্ট্য জ্ঞান—যাহার দ্বারা মানুষ আশ্‌রাফুল-মখলুক্বাত তথা সৃষ্টির সেরারূপে যাবতীয় জীব হইতে পৃথক ও উর্দ্ধের স্থান লাভ করিয়াছে; সেই জ্ঞান রত্ন কোথা হইতে লাভ হইয়াছে? এই সব তত্ত্বের রহস্য উদ্‌ঘাটনই সকল দর্শনের সেরা দর্শন।

পবিত্র কোরআন তাহার প্রথম প্রকাশেই এই গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল প্রশ্নসমূহের সমাধান ঘোষণা করিয়াছে যে—এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে একজন সৃষ্টিকর্ত্তা ও নিয়ন্তা আছেন; তিনিই এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহার ইঙ্গিতেই ইহা পরিচালিত হইতেছে। সমস্ত সৃষ্টি তাঁহার সৃষ্টি করা হইতেই আসিয়াছে; মানুষকে তিনিই পয়দা করিয়াছেন; মানুষের বৈশিষ্ট্য জ্ঞানরত্ন তিনিই তাহাকে দান করিয়াছেন। এই বিজ্ঞানের যুগে বৈজ্ঞানিকগণ এই সব প্রশ্নের উত্তর হাতড়াইয়া বিভিন্ন মতবাদ আবিষ্কার করিয়াছে—তাহা সবই শুধুমাত্র কল্পনা ও ধারণা তথা ধরিয়া নেওয়া; তাই ঐ সব মতবাদে ভাঙ্গা-গড়া হইয়াছে। বিজ্ঞান আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বেই পবিত্র কোরআন এই সব প্রশ্নের সমাধানে সত্যের সন্ধান দান করিয়াছে—উহাই পবিত্র কোরআনের আরম্ভ।

১৬৭৩। হাদীছ:—ইবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি সর্ব্ব প্রথম ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে (তথা তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়াছেন) যখন তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। নবুয়ত প্রাপ্তির পর তিনি তের বৎসর মক্কায় অবস্থান করিয়াছিলেন। অতঃপর আল্লার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মদিনায় হিজরত করিয়া আসেন এবং তথায় দশ বৎসরকাল অতিবাহিত করার পর ইহজগত ত্যাগ করিয়াছিলেন।

↑ "বিসমিল্লা-হির-রাহমানির-রাহীম" ইহা পবিত্র কোরআনের একটি বিচ্ছিন্ন আয়াত, কোন ছুরার অংশবিশেষ নহে। প্রত্যেক ছুরার আরম্ভেই উহা বার বার শুভ আরম্ভরূপে অবতীর্ণ হইত। ছুরা "এক্‌রা"-এর আরম্ভে উহা অবতীর্ণ হয় নাই বটে, কারণ উহার দ্বারা আরম্ভের আদর্শ ত এই ছুরায়ই ব্যক্ত হইয়াছে। অবশ্য পরে ঐ আদর্শের সামঞ্জস্যে এই ছুরার শুভ আরম্ভেও "বিসমিল্লাহ" রাখা হইয়াছে; ছাহাবীগণের যুগ হইতেই ইহা করা হইয়াছে। (যোরকানী, ১—২১২)

ব্যাখ্যা ঃ—সপ্তাহের যে দিনে হযরত নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, উহা ছিল সোমবার দিন। ইহা সর্ব্ব সম্মত সিদ্ধান্ত। (একমাল ১—৩০)

এই সম্পর্কে মোসলেম শরীফে একখানা হাদীছও উল্লেখ আছে—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সোমবারে নফল রোযা রাখিয়া থাকিতেন ; সেই সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছেন, ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت او انزل على فيه অর্থাৎ এই সোমবার দিন আমি জন্ম লাভ করিয়াছি এবং এই সোমবার দিন আমি নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়াছি বা আমার উপর ওহী অবতরণ আরম্ভ হইয়াছে।

ঐ দিনটি কোন মাসের কোন তারিখে ছিল সে সম্পর্কে নবুয়তের ইতিহাস বর্ণনাকারীদের অনেক মতভেদ আছে। কাহারও মতে রবিউল আউয়াল মাসের আট তারিখে ছিল। এই সূত্রে হযরতের নবুয়ত প্রাপ্তি সঠিকরূপে তাঁহার বয়সের চল্লিশ বৎসরের সময়েই ছিল ; যেরূপ উল্লেখিত হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে নবুয়ত প্রাপ্তি নবীজীর বয়স চল্লিশ বৎসর পার হইয়া যাওয়ার পর রমজান মাসে ছিল। অনেকের মতে রমজান মাসের শেষ দশকের কোন রাত্রে ছিল যেই রাত্র "লাইলাতুল-কদর" ছিল। এই সূত্রে নবুয়ত প্রাপ্তিকালে হযরতের বয়স চল্লিশ বৎসর ছয় মাস আরও কিছু দিন ছিল। পবিত্র কোরআনে ইহার ইঙ্গিত ও সমর্থন পাওয়া যায়— شهر رمضان الذى انزل فيه القران "রমজান মাসে কোরআন অবতারিত হইয়াছে।" আর কোরআন অবতরণ হইতেই নবুয়তের আরম্ভ ছিল। এতদ্ভিন্ন এই সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের আরও মতামত বর্ণিত আছে।

প্রথম প্রকাশের পর ঃ

হেরা-গুহায় নবীজী মোস্তফা (দঃ) আল্লাহ তায়ালার সদ্য অবতারিত কালাম প্রাপ্ত হইলেন ; আল্লার প্রেরিত দূত নূরে পয়দা ফেরেশতা জিব্রিল আলাইহেচ্ছা-লামের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। তারপর আর অহী আসে না ; জিব্রিল ফেরেশতার আনুষ্ঠানিক আগমন হয় না। অহীর এই বিরহ যাতনা নবীজীর জন্য কিরূপ হইয়া দাঁড়াইল তাহা ব্যক্ত করা ত সম্ভব নহে, তবে লক্ষ-কোটি ভাগের এক ভাগরূপে আংশিক উপলব্ধি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে লাভ হইতে পারে।

রাজত্বের মোহে মোহমান ব্যক্তি উহা লাভ করার পর রাজ্যহারা হইলে, ধনের মায়া ও আকর্ষণে নিমজ্জমান ধনী ধনহারা হইয়া পড়িলে, সন্তানের মায়া-মহব্বতে ব্যাকুল একটি মাত্র সন্তানের মা সন্তানহারা হইলে—এই সব ক্ষেত্রে প্রিয়হারা ব্যক্তি তাহার ক্ষণস্থায়ী প্রিয় বস্তুকে হারাইয়া যেরূপ মানসিক পীড়া ও যাতনায় পতিত হয় আধ্যাত্মিক জগতে সাফল্য ও উন্নতিকামীগণ আল্লার নৈকট্য আল্লার মারেফাৎ, আল্লার দেওয়া ঐ জগতের যত সম্পদ উহাতে বিন্দুমাত্র লাঘব

দেখিলে তাঁহারা ঐ ক্ষণস্থায়ী প্রিয়হারাদের অপেক্ষা লক্ষ-কোটি গুণ অধিক পীড়া ও যাতনায় পতিত হইয়া থাকেন। দার্শনিক রুমী বলিয়াছেন—

گر زباغ دل خلالے کم بود — بر دل سالک هزاران غم بود

"সালেকের অন্তর-বাগানে একটি তৃণেরও যদি লাঘব ঘটে তবে তাঁহার অন্তরে হাজার হাজার ব্যাকুলতার ঢেউ খেলিতে থাকে।"

আধ্যাত্মিক জগতের ছোট্ট শিশু যে সবেমাত্র ঐ পথে হাটা আরম্ভ করিয়াছে তাহাকে সুফীবাদের পরিভাষায় "সালেক" বলা হয়। আধ্যাত্মিক জগতে এই শিশু সালেকের তুলনায় নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শ্রেণী ও স্থান কত উর্দ্ধে তাহা সহজেই অনুমেয় এবং সেই পরিমাণেই ঐরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার ব্যাকুলতার পরিমাপ হইবে।

তদুপরি আলোচ্য ক্ষেত্রে নবীজী মোস্তফা (দঃ) আধ্যাত্মিক জগতের তৃণহারা হইয়া ছিলেন না, বরং মহারত্নহারা হইয়াছিলেন; চিরবাঞ্ছিত বস্তুকে পাইয়া উহা হইতে বঞ্চিত মনে হইতেছিলেন। অহী তথা আল্লার বাণী প্রাপ্তির সময় আল্লার সঙ্গে যেই দৃঢ় ও নিকটবর্ত্তীর সম্পর্ক ও যোগ সৃষ্টি হয় এবং আল্লার নৈকট্য ও সান্নিধ্যের যে স্বাদ লাভ হয় উহা অতুলনীয়। অতএব তাঁহার ব্যাকুলতা, তাঁহার উৎকণ্ঠা, তাঁহার উদ্বেগ ছিল বর্ণনাতীত। অহীর বিরহ যাতনা নবীজীর জন্য কোন কোন সময় অসহনীয় হইয়া উঠিত; পর্বত্শৃঙ্গ হইতে নিজকে ফেলিয়া দিয়া ইহলোক ত্যাগ করার ন্যায় উত্তেজনা পর্য্যন্ত তাঁহার মধ্যে সৃষ্টি হইতে চাহিত*। এইরূপ মুহূর্ত্তে জিব্রিল (আঃ) আত্মপ্রকাশ করিয়া দেখা দিতেন এবং

---

* সমালোচনা—অহীর বিচ্ছেদে নবীজীর বিরহ যাতনায় সৃষ্ট এই শ্রেণীর ত্রাস ও উত্তেজনাকে "মোস্তফা-চরিত" গ্রন্থে অস্বীকার করা হইয়াছে, অথচ তথায়ই এই বর্ণনার প্রমাণও উল্লেখ রহিয়াছে। ছনদের মারপেঁচে ফেলিয়া প্রমাণটাকে খণ্ডন করা হইয়াছে। জানিনা এই বর্ণনায় খাঁ সাহেবের গাত্রদাহ কেন জন্মিল? তবে তাঁহার ত চিরাচরিত স্বভাব—পাণ্ডিত্ব ত তাঁহার আছেই; তিনি কোন বর্ণনাকে এন্কার করার ইচ্ছা করিলে তিনি উহাকে অতি বক্র ভাষায় ব্যক্ত করেন, যেন পাঠক নিজেই উহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। যেমন, আলোচ্য বিষয়ের বর্ণনায় বলেন—"তিনি (নবীজী) মধ্যে মধ্যে পর্ব্বৎ শিখর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন" (২৬৫ পৃঃ)। বিবরণ উদ্ধৃতির কি জঘন্য ভঙ্গি! খাঁ সাহেবের এই বিবরণ ভঙ্গিতে মনে হয় তিনি বলিতে চান—আত্মহত্যা মহাপাপ, নবীজী উহার সংকল্প কিরূপে করিতে পারেন?

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

আশার ইঙ্গিত দানে সান্ত্বনা-বাণী শুনাইতেন—يا محمد انك رسول الله حقا "হে মোহাম্মদ। নিশ্চয় আপনি আল্লাহ তায়ালার বরহক্ক রসুল।" অর্থাৎ আপনি বিচলিত হইবেন না, আপনার হারা নিধী আপনার নিকট আসিবেই। জিব্রিলকে দেখিলে এবং ঐ বাণী শুনিলে নবীজীর অন্তর অগ্নিতে কিছুটা পানির ছিটা পড়িত। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৌলত আল্লাহ তায়ালার অহী ও বাণী পুনঃ না পাওয়ায় যে ব্যাকুলতা ছিল তাহা বিদূরিত হইত না।

এতদ্ভিন্ন রত্নহারা প্রিয়হারা মানুষের অন্তরে কতই না সংশয়ের সৃষ্টি হয়। কত ধারণারই না জন্ম হয়। সত্য প্রবাদ—عشق است هزار بد گمانی "ভালবাসা হাযার হাযার দ্বিধা ও সংশয়ের কারণ হয়"। প্রাণ প্রিয় অহী হারাইয়া নবীজী মোস্তফার অন্তরে কত শত সংশয় ও আতঙ্কেরই না সৃষ্টি হইতেছিল। এমনকি এইরূপ আতঙ্কের ভাব সৃষ্টিও বিচিত্রময় ছিল না যে, প্রভু কি আমাকে ছাড়িয়া দিলেন? আমার প্রতি তিনি কি বিরাগী হইয়া গেলেন?

শায়খুল-ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ (রঃ) ফাওয়ায়েদে কোরআনে তফছীর-ইবনে কাছীরের বরাত দানে লিখিয়াছেন—নবীজীর নবুয়ত প্রাপ্তির সংবাদকে যাহারা শত্রুতার সহিত গ্রহণ করিয়াছিল ঐ শ্রেণীর শত্রুরা এই সুযোগে নবীজীর কাঁটা ঘায়ে লেবুর রস দেওয়ার ন্যায় কটাক্ষ করিয়া থাকিত, উপহাস করিত—"মোহাম্মদের প্রভু তাহার প্রতি রাগ করিয়াছেন, তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন।" মনোব্যথার প্রতিক্রিয়ায় নবীজীর দেহেও অবসাদ ছিল, তাই রাত্রের এবাদতে তিনি কতেক দিন জাগ্রত হন নাই; ইহা লক্ষ্য করিয়া এক হতভাগিনী শত্রুও ঐরূপ কটাক্ষপাত ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উক্তি করিয়া বেড়াইত।

এরই মধ্যে আর একটি ছোট্ট ছুরা নাযেল হইয়া নবীজীর ব্যথিত হৃদয়ে মহাপ্রলেপের ক্রিয়া করিল এবং তাঁহার ভাঙ্গা বুককে শক্তিশালী করিয়া তুলিল।

কি দুর্ব্বল ও অহেতুক চিন্তা! ইহা ত আভ্যন্তরীণ মনোবেদনা ও বিরহ জ্বালায় মনের ক্ষোভ প্রকাশ করা মাত্র; কার্য্যে বাস্তবায়িত করার দৃঢ় সংকল্প করিয়া নেওয়া মোটেই উদ্দেশ্য নহে। যেমন হাদীছে আছে—নবীজী বলিয়াছেন, "যাহারা নামাযের জমাতে উপস্থিত হয় না; আমার ইচ্ছা হয়—তাহাদেরে তাহাদের গৃহে রাখিয়া তাহাদের গৃহে আগুন লাগাইয়া দেই।" অথচ এইরূপ করা কি মহাপাপ নয়? এইরূপ ক্ষেত্রে পাপ-পুণ্যের মছআলার অবতারণা নিছক বোকামী। যেমন কেহ ক্রোধে ক্ষুব্ধ হইয়া বলে—"মন চায়, তোকে কাঁচা মরিচের ন্যায় চিবাইয়া খাইয়া ফেলি"। এক্ষেত্রে কি প্রশ্ন হইবে যে, পেটে মল-মূত্র রহিয়াছে; কিরূপে চিবাইয়া খাইবেন?

দীপ্ত প্রভাত ও গভীর রজনীর শপথ—আপনার প্রভু আপনাকে ত্যাগ করেন নাই, আপনার প্রতি বিরাগীও হন নাই। আপনার ভবিষ্যৎ অতীত অপেক্ষা নিশ্চয় অনেক উজ্জ্বল। আপনার প্রভু আপনার প্রতি মহাদানে অবশ্যই আপনাকে সন্তুষ্ট করিবেন। আপনি কি ছিলেন না এতিম; সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপনাকে আশ্রয় দিয়াছেন? সত্যের সন্ধানে আপনি ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে-ছিলেন, তিনি আপনাকে মহাসত্যের পথ দান করিয়াছেন। আপনি ছিলেন নিঃস্ব, তিনি আপনাকে ধনাঢ্য করিয়াছেন।

وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى مَا
وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى * وَلَلْاٰخِرَةُ
خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى * وَلَسَوْفَ
يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى * اَلَمْ يَجِدْكَ
يَتِيْمًا فَاٰوٰى * وَوَجَدَكَ ضَاۤلًّا فَهَدٰى *
وَوَجَدَكَ عَاۤئِلًا فَاَغْنٰى *

দীপ্ত প্রভাত ও গভীর রজনীর উল্লেখ এই ক্ষেত্রে কতই না সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। আলোর পরে অন্ধকার, দিনের পরে রাত্রি ইহা স্বভাব—সৃষ্টির ধারা ও নীতি; ইহা দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির বিচার ও সিদ্ধান্ত নেওয়া ভুল। রাত্রির অন্ধকার আসিলে কি বলা হইবে, প্রভু বিশ্ববাসীর প্রতি অসন্তুষ্ট বিরাগী হইয়াছেন? শান্তির অবলম্বন নিদ্রার জন্য কি রাত্রি ও অন্ধকার বড় নিয়ামত নহে? জোয়ারের পরে কি ভাটা আসেনা? ভাটার পরে কি জোয়ার হয় না? আপনার এই ভাটা মহাজোয়ারের পূর্বাভাস। বর্ত্তমানের সাময়িক অন্ধকার দৃষ্টে আপনি মোটেই মন ভাঙ্গিবেন না; অতীতে আপনার জীবনের কত অন্ধকারে প্রভু আপনাকে আলো দান করিয়াছেন। এতিমীর অন্ধকারে আশ্রয়ের আলো দিয়াছেন, সত্যের জন্য ব্যাকুলতার অন্ধকারে মহাসত্যের আলো দান করিয়াছেন, দারিদ্রের অন্ধকারে অভাবমুক্তির আলো দিয়াছেন। তদ্রূপই বর্ত্তমানের অতি সাময়িক অন্ধকারের পরেই দীপ্ত প্রভাতের আশা লইয়া অগ্রসর হউন—ভয় নাই, আশঙ্কা নাই; আপনার সাফল্য সুনিশ্চিত।*

এরপর আর ভীতি কী? কুণ্ঠা কী? নবীজী মোস্তফা (দঃ) উৎসাহ-উদ্দীপনার উৎস পাইয়াছেন; আর কোন বাধা-বিঘ্ন, অত্যাচার-উৎপীড়ন কার্য্যধারাই পাঠককে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিবে।

---

* ছুরা-অজ্জুহার অবতরণ যে, "ফাত্‌রাত" তথা সাময়িক অহী বন্ধের উপলক্ষে ও সংলগ্নে ছিল—ইহা মাওলানা শাব্বীর আহমদ (রঃ) ও তাঁহার ফাওয়ায়েদে-কোরআনে উল্লেখ করিয়াছেন।

সত্য প্রচারের আদেশ ঃ

দীর্ঘ দিন—চল্লিশ দিন বা ছয় মাস কাহারও মতে আরও অধিক দিন অতিবাহিত হইল; নূতন কোন বাণী আসে না, জিব্রিল ফেরেশতার আনুষ্ঠানিক আগমন এবং সাক্ষাৎ হয় না। তাই নবীজী (দঃ) ব্যাকুলতার মধ্যেই কালাতিপাত করিতেছেন। অবশেষে তিনি সেই হেরা-গুহায় যাইয়া দিবানিশি অবস্থান করিতে লাগিলেন; হয়ত ভাবিলেন, যেস্থানে একবার প্রাণ প্রিয় লাভ হইয়াছিল তথায়ই ধরনা পাতিয়া থাকি। সেমতে দীর্ঘ এক মাসের এতেকাফ নিয়্যতে তিনি তথায় থাকিলেন; এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি গৃহাভিমুখে আসিতেছেন। স্বয়ং নবীজীর বর্ণনা—হেরা পর্ব্বৎ হইতে অবতরণ করিয়া উহার পদস্থ নিম্ন ভূমি অতিক্রম করাকালে মধ্যবর্ত্তী আসিলে পর আমি একটা আহ্বান শুনিতে পাইলাম। ডানে-বামে, সমুখে-পেছনে তাকাইলাম কোন কিছু দেখিলাম না। অতঃপর উপর দিকে তাকাইলাম; দেখিলাম, পুর্বপরিচিত সেই ফেরেশতা জিব্রাইল যিনি হেরা-গুহায় প্রথমবার আল্লার বাণী অহী নিয়া আসিয়াছিলেন। অবশ্য তিনি সেই আকৃতিতে নহেন; তাঁহার ব্যক্তিগত আসল আকৃতিতে তিনি। বিরাট অপেক্ষা বিরাট তাঁহার আকৃতি, সবুজ রং ভেলবেট বা মখমলরূপের ছয় শত ডানাবিশিষ্ট—তিনি কুর্সির উপর আকাশ প্রান্তে এক আসনে উপবিষ্ট। এত বড় বিরাট তাঁহার আকৃতি যে, আসমান-জমিনের মধ্যবর্ত্তী সমগ্র প্রান্তকে পরিপূর্ণ করিয়া আছেন।

হযরত নবী (দঃ) জিব্রিল (আঃ)কে এই আকৃতিতে সারা জীবনে দুইবারই দেখিয়াছেন; দ্বিতীয় বার মে'রাজ ভ্রমণ উপলক্ষে সপ্তম আসমানের উপর সেদ্‌রাতুল-মোন্তাহার নিকটে—যাহার আলোচনা পবিত্র কোরআন ছুরা নজমে রহিয়াছে। ঐ সময় নবীজী মোস্তফা (দঃ) স্বীয় শক্তি-সামর্থে পাকাপোক্তা হইয়াছিলেন তদুপরি মে'রাজ ভ্রমণ উপলক্ষে বক্ষবিদীর্ণের দ্বারা বেহেশ্‌তী পরিপুষ্টিকর বস্তুতে তাঁহাকে অধিক শক্তিমান করিয়া তোলা হইয়াছিল। আলোচ্য ঘটনায় নবুয়তের প্রারম্ভ, দীর্ঘ দিন হইতে বিরহ যাতনার বিহ্বলতায় ভুগিতেছেন, দীর্ঘ একমাস পর্ব্বত-গুহায় কাটিয়া সবেমাত্র বাহিরে আসিয়াছেন—এমতাবস্থায় চর্ম্ম চোখের দৃষ্টিতে অতি অস্বাভাবিক বস্তু দর্শনের প্রতিক্রিয়া মানবীয় দেহের উপর তিনি সামলাইতে পারিলেন না। নবীজী (দঃ) ঐ দৈবদেহীকে চিনিতে পারেন নাই তাহা নহে; তিনি নিজেই বর্ণনা দিয়াছেন, উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে হেরা-গুহার সেই পূর্ব পরিচিত ফেরেশতাকে দেখিতে পাইলাম (প্রথম খণ্ড ৪ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)। এতদসত্তেও নবীজী (দঃ) বলেন, আমি চমকিত ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম। ঐ অবস্থায় জিব্রাইল মানুষবেশে নিকটে আসিয়া আমাকে সান্ত্বনা দিলেন। তথা হইতে উঠিয়া বাড়ী আসিলাম; তখনও সেই চমকের শিহরণ আমার উপর ছিল,

তাই গৃহবাসীদেরকে আমি বলিলাম—دثروني دثروني وصبوا علي ماء باردا
“আমাকে চাদর মোড়িয়া দাও, আমাকে চাদর মোড়িয়া দাও এবং আমার উপর ঠাণ্ডা পানি ঢাল।” তাহারা আমাকে ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করাইয়া দিল এবং চাদর মোড়িয়া দিল। সেই অবস্থাতেই জিব্রিল ফেরেশতা অহী নিয়া আসিলেন—

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ *
وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ * وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ-

“হে চাদর মোড়ি দেওয়া! উঠ; (চাদর মোড়ি দিয়া শুইয়া থাকার সময় নয়; এখন উঠ) এবং বিশ্ববাসীকে সতর্ক কর, নিজ প্রভু-পরওয়ারদেগারের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা কর, নিজের বাহির-ভিতরকে পবিত্র রাখ, ভিতর-বাহিরের সমস্ত দেবদেবীকে পরিহার করার উপর দৃঢ় থাক। উপকার করিয়া অধিকতর প্রত্যুপকার প্রাপ্তির ইচ্ছা ও আশা পোষণ করিও না। স্বীয় প্রভুর জন্য (তাঁহার পথে) ধৈর্য্যবলম্বন করিও।”

সমস্ত যোগার-আয়োজন সম্পন্ন হইয়াছে, জ্ঞান-সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইয়াছে; আজ হইতে মহাপুরুষের কর্ম্ম-সাধনা আরম্ভ হইবে। মৌনী ভাবুক, ধ্যানগম্ভীর মহত্মাকে কর্ত্তব্যপালনে দৃঢ়তার সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের আদেশ আসিল। ইহা পবিত্র কোরআনের দ্বিতীয় প্রকাশ—কত সুন্দর! কত আবেগময়ী! কিরূপ মধুর স্বরে বিপ্লবের আহ্বান!

প্রথমে জড়তা পরিহারে সংগ্রামী পদক্ষেপের নির্দ্দেশ দেওয়া হইল; সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্য-কর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ এবং মূল বিষয়বস্তু স্পষ্টতঃ বলিয়া দেওয়া হইল—বিশ্ববুকে আল্লার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহই শ্রেষ্ঠ, আল্লাহই বড় সর্ব্বক্ষেত্রে ইহার বিকাশ সাধন করিতে হইবে; ইহাই হইল ইসলাম ধর্ম্ম ও মোসলেম জাতীয়তার একমাত্র স্মারক—“আল্লাহু আকবার” আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম মহত্তম বিরাটতম। প্রতিটি মোসলমান জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই আল্লাহু-আকবারেই আবেষ্টিত। জন্মঘরে শিশুর কর্ণকুহরে সর্ব্বপ্রথম এই ধ্বনিই প্রবেশ করে, প্রতিদিন দিবারাত্রে পাঁচ বার মোসলেম জাতির সর্ব্বত্র এই ধ্বনি বারংবার গর্জ্জিত হয় এবং ঈদে, আনন্দ-উৎসবে এই ধ্বনি উচ্চারিত হয়। সর্ব্বশেষে প্রতিটি মোসলমানকে এই ধরণী হইতে চিরবিদায় দানকালে তাহার প্রতি আল্লাহু-আকবারের চারিটি ধ্বনি দিয়া তাহাকে সমাহিত করা হয়। মোসলেম জীবনের সহিত আল্লাহু-আকবার—আল্লার মহত্ত্ব ও বড়ত্বের ধ্বনি এমনিভাবে ওতপ্রোতরূপে বিজড়িত। আলোচ্য আয়াতে সেই আল্লার মহত্ত্ব ও বড়ত্বেরই প্রতিষ্ঠার আদেশ করা হইয়াছে।

নবীজী মোস্তফা (দঃ)কে বিশ্বনেতৃত্বের পটভূমিতে দাঁড় করান হইতেছে, তাই নেতৃত্ব পদের জন্য যাহা বিশেষ প্রয়োজন উহারও আদেশ এস্থলে করা হইয়াছে। নেতৃত্বের পদে যিনি বৃত হইবেন সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে আত্মশুদ্ধি করিতে হইবে সকল প্রকার কলুষ হইতে ; দৈহিক এবং মানসিক আত্মশুদ্ধি ও বিকার সম্পূর্ণরূপে পরিহার ও বর্জ্জন করিতে হইবে এবং সাধনার পথে পর্বতের ন্যায় অটল, আকাশের ন্যায় বিশাল হৃদয় লইয়া দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। এইসব গুরুত্বপূর্ণ নির্দ্দেশই দেওয়া হইয়াছে এই ছোট ছোট আয়াত কয়টিতে। নবীজী তথা ইসলামের কর্ম্ম ময়দানে যাত্রার প্রাকালে এই নির্দ্দেশসমূহ কতই না সুন্দর! কতই না প্রিয়!!

তারপর ঘণ ঘণই অহীর আগমন হইতে থাকিল ; কোরআন শরীফের আয়াতও নাযেল হইত এবং শরীয়তের হুকুম-আহকামও নাযেল হইত। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায ত নবুয়ত প্রাপ্তির দশ বৎসর পর মে'রাজ শরীফে ফরজ হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বে এই প্রথম অবস্থায় সকাল-বিকালের দুই ওয়াক্ত নামায ফরজ হইয়াছিল।

সর্ব্ব প্রথম ফরজ—নামায ঃ

একদা জিব্রিল (আঃ) নবী (দঃ)কে এক পাহাড়ের আড়ালে নিয়া গেলেন এবং পায়ের গোড়ালি দ্বারা জমিনে আঘাত করিলেন, তাহাতে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হইল। জিব্রিল (আঃ) স্বয়ং অজু করিয়া নবী (দঃ)কে অজু শিক্ষা দিলেন, অতঃপর জিব্রিল (আঃ) ইমাম হইয়া দুই রাকাত নামায পড়াইলেন। নবী (দঃ) মোক্তাদী হইয়া নামাযে শরীক হইলেন এবং নামাযের পদ্ধতি শিক্ষা করিলেন। তথা হইতে নবীজী (দঃ) বাড়ী আসিয়া বিবি খাদিজা (রাঃ)কে এবং যে কতিপয় লোক মোসলমান হইয়া ছিলেন সকলকে অজু এবং নামাজ শিক্ষা দিলেন। সকলেই পাহাড়-পর্ব্বতের আড়ালে গোপনে লুকাইয়া লুকাইয়া নামায পড়িতেন। প্রথমে শুধু সকাল-বিকাল দুই ওয়াক্ত দুই দুই রাকাতের নামাযই ফরজ ছিল; তারপর ছুরা মোজাম্মেল নাযেল হইয়া তাহাজ্জোদ নামাযেরও আদেশ হয়— اقم الصلوة طرفی النهار و زلفا من الليل—"দিনের দুইদিকে এবং রাত্রের অংশে নামায আদায় করিবে।" (সীরতে মোস্তফা, ১—১১৪)

একদা নবী (দঃ) আলী (রাঃ)কে সহ গোপনে এক জায়গায় নামায পড়িতে ছিলেন। হযরতের চাচা আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পিতা আবুতালেব হঠাৎ তথায় পৌঁছিলেন ; নামায শেষে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি করিলে? নবীজী (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ পাক আমাকে তাঁহার রসুল বানাইয়াছেন, মূর্ত্তিপূজা নিষিদ্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহার এক বিশেষ এবাদৎ ফরজ করিয়াছেন—ইহা সেই এবাদৎ ছিল। চাচাজান! আপনিও এই ধর্ম্ম গ্রহণ করুন।

আবুতালেব বলিলেন, বাপদাদার ধর্ম্ম ত্যাগ করা ত সম্ভব নহে তবে তোমরা তোমাদের কাজ চালাইয়া যাও; সর্ব্বদা আমার সাহায্য তোমাদের পক্ষে থাকিবে। আলী (রাঃ)কেও অভয় দিলেন। (আছাহ, ৭১)

পবিত্র কোরআনের এই বিশেষ অহীতে যে আদেশ ছিল, قم فانذر "উঠুন। সতর্ক করুন।" এই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে নবীজী (দঃ) ইসলামের প্রচার আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অতি গোপনে। নবীজী (দঃ) তাঁহার কর্ত্তব্য লইয়া প্রথম দাঁড়াইলেন; যে পয়গাম তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে মানুষের প্রাণের দুয়ারে উহা পৌঁছাইবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন। এই শুভযাত্রায় নবীজী মোস্তফা (দঃ) আপন সহধর্মিণী বিবি খাদিজা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার পূর্ণ সমর্থন-সহায়তা লাভ করিলেন।

সর্ব্বপ্রথম মোসলমান বিবি খাদিজা (রাঃ)

বিবি খাদিজা (রাঃ) ইসলামের সূর্য্যোদয়ের প্রথম প্রভাতেই নবীজীর প্রতি ঈমান আনিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক ছিল। খাদিজা (রাঃ) অপেক্ষা নবীজীকে কে বেশী চিনিতে পারে? কে তাঁহার ভিতর-বাহির এমন সুন্দরভাবে দেখিতে পারিয়াছে। তিনি ত তাঁহার জীবন-সঙ্গিনী।

১। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আহাইহে অসাল্লামের প্রথম জীবনের সুনাম-সুখ্যাতিতে বিবি খাদিজা (রাঃ) পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন।

২। সিরিয়ার বাণিজ্য সফরে বিবি খাদিজার ক্রীতদাস মাইসারাহ নবীজীর অনেক অলৌকিক সাক্ষ্য বহন করিয়াছিল।

৩। দীর্ঘ পনর বৎসরকাল নবীজীর জীবনসঙ্গীনী থাকিয়া খাদিজা (রাঃ) তাঁহার বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ছিলেন।

৪। হেরাগুহার সমস্ত ঘটনা নবীজী বিবি খাদিজাকে খুলিয়া বলিয়াছিলেন।

৫। অবশেষে বিবি খাদিজার মুরব্বি সৎ-সাধু অভিজ্ঞ আলেম অরাক্কার স্পষ্ট সাক্ষ্য ও উক্তি বিবি খাদিজার সম্মুখেই ছিল।

এই সব কারণে অতি সহযেই বিবি খাদিজা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিয়া নিলেন; ইহাতে স্বাভাবিক ভাবেই নবীজীর মনোবল বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তাই ইসলামের জয়যাত্রার পথে বিবি খাদিজার দান ও নৈতিক সহযোগিতার মূল্য ছিল অনেক বেশী। চারিপাশে সংশয়, ভয়-ভীতি ও নিরাশার অন্ধকার—কোথাও কোন বন্ধু নাই, সহায় নাই এই সময় সত্যের অভিযানের প্রথম পদক্ষেপেই নবীজী নিজ স্ত্রীকে আপন দোসররূপে পাইলেন—ইহা নবীজীর জন্য এক বিরাট সাফল্য ছিল।

নবীজী মোস্তফা (দঃ) যে, সত্য পয়গাম্বর, তিনি যে, তাঁহার দাবীতে অকপট সত্যবাদী—মিথ্যা নয়, কৃত্রিম নয় ইহারও সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে বিবি খাদিজার ইসলাম গ্রহণে। স্বামীর মধ্যে কোন শঠতা বা ভণ্ডামি থাকিলে স্বীয় গৃহিণীর

কাছে তাহা গোপন থাকিতে পারে না; তাই কোন মানুষের সততার পক্ষে তাহার স্ত্রীর সাক্ষ্য সর্ব্বপ্রকার সাক্ষ্যের ঊর্দ্ধে বিবেচিত হয়। ইসলামের কঠিন দিনে বিবি খাদিজার ভূমিকা নারী জাতির জন্য বিশেষ গৌরবই বটে।

দ্বিতীয় মোসলমান আলী (রাঃ)

নবীজীর চাচা ছিলেন আবুতালেব; আবু তালেবের আয় অপেক্ষা ব্যয় ছিল বেশী; তাঁহার পরিবারে লোক সংখ্যা বেশী ছিল। নবীজী (দঃ) খাদিজা (রাঃ)কে শাদী করার পর দৈন্যমুক্ত হইয়াছিলেন; আবুতালেবের সাহায্যার্থে তাঁহার পুত্র আলীকে নবীজী (দঃ) নিজ প্রতিপালনে নিয়া আসিলেন; আলী (রঃ) নবীজীর গৃহেই এবং তাঁহারই ব্যয় বহনে থাকিতেন।

একদা নবীজী (দঃ) বিবি খাদিজা (রাঃ) সহ নামায পড়িতেছেন; তখন আলীর বয়স দশ-বার বৎসর; আলী (রাঃ) নবীজী (দঃ)কে নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। নবীজী (দঃ) বলিলেন, ইহা আল্লার দ্বীনের কাজ; সমস্ত পয়গাম্বরগণ আল্লার দ্বীন লইয়াই দুনিয়াতে আগমন করিয়াছিলেন। আমি তোমাকে এই দ্বীন গ্রহণের আহ্বান জানাই; তুমি লাত-ওজ্জা—দেবদেবীকে বর্জ্জন কর। আলী (রাঃ) বলিলেন, ইহাত স'পুর্ণ নূতন কথা। আব্বাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি কিছু বলিতে পারি না। এই কথায় নবীজী (দঃ) বিব্রত হইলেন যে, সম্পুর্ণ ব্যাপারটা ফাস হইয়া যাইবে, তাই তিনি আলী (রাঃ)কে বলিলেন, হে আলী! তুমি যদি গ্রহণ না-ও কর তবুও তুমি কাহারও নিকট ইহা প্রকাশ করিও না। আলী (রাঃ) তখন চুপ থাকিলেন; রাত্র অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলীর অন্তরের পরি-বর্ত্তন ঘটিল; প্রভাত হইতেই আলী (রাঃ) নবীজী সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কিসের আহ্বান করিয়া থাকেন? নবীজী বলিলেন, এই স্বীকৃতি গ্রহণ করিতে হইবে যে, আল্লাহ এক, তাঁহার কোন শরীক নাই এবং লাত-ওজ্জা ইত্যাদি দেবদেবীকে বর্জ্জন করিতে হইবে, মূর্ত্তিপূজাকে চিরতরে ঘৃণা ও পরিহার করিতে হইবে। আলী (রাঃ) তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করিলেন, কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার ইসলাম গ্রহণ গোপন রাখিলেন।

তৃতীয় মোসলমান যায়েদ (রাঃ)

নবীজীর গৃহ-খাদেম যায়েদ ইবনে হায়েছা (রাঃ)—নবীজী (দঃ) তাঁহাকে পালক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সদা নবীজীর নিকটই থাকিতেন; আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণও নবীজী মোস্তফার সত্যতার বিশেষ প্রমাণ ছিল; কারণ, স্ত্রীর ন্যায়ই গৃহভৃত্যের নিকটও মানুষের আসল স্বরূপ লুক্কায়িত থাকে না।

চতুর্থ মোসলমান আবুবকর (রাঃ)

নবীজীর গৃহবাসী সকলে ঈমান গ্রহণ করিলে পর নবীজী (দঃ) নিজ বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেও ইসলামের প্রচার চালাইলেন, কিন্তু গোপনে গোপনে। এই প্রচেষ্টায় সর্ব্বপ্রথম আবুবকর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

আবুবকরের ইসলাম গ্রহণ নবীজীর সাফল্যের এক বিরাট অধ্যায় ছিল; কারণ ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা মোসলমান হইয়াছিলেন তাঁহারা ছিলেন নবীজীরই করতলগত লোকগণ; তদুপরি তাঁহাদের ইসলামের বিশেষ কোন প্রভাব ছিল না। একজন মহিলা, অপরজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, আর একজন ত ক্রীতদাস গৃহভৃত্য। এতদ্ভিন্ন মহিলা ও গৃহভৃত্যের ত বাহিরের সঙ্গে সম্পর্ক কম ছিল, আর আলী (রাঃ) ত তখনও ইসলাম প্রকাশ করিয়াছিলেন না।

এই সব দিক দিয়া আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইসলাম গ্রহণ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আবুবকর (রাঃ) বেশী বয়সের ছিলেন, এমনকি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রায় সমবয়স্ক—মাত্র দুই বৎসরের ছোট ছিলেন। ধন-জন, মান-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির দিক দিয়া গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একজন পরিগণিত ছিলেন এবং সৎ-সাধু সুচরিত্রে সনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন।

বিবি খাদিজার ভাইপো হাকীম-ইবনে হেযামের নিকট একদা আবুবকর বসিয়া ছিলেন; ঐ সময় হাকীমের ক্রীতদাসিনী আসিয়া বলিল, আপনার ফুফুআম্মা খাদিজা বলেন, তাঁহার স্বামী মূছা পয়গাম্বরের ন্যায় পয়গাম্বরী লাভ করিয়াছেন। এতচ্ছ্রবণে আবুবকর তথা হইতে সরিয়া পড়িলেন এবং দৌড়িয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলেন। নবী (দঃ) তাঁহাকে ইসলামের আহ্বান জানাইলে তৎক্ষণাৎ তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন। এইরূপে শুনিবা মাত্র বিনা দ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ করিয়া নেওয়া ঐ সময় অতি বিরল ও বিচিত্রময় ছিল; তাই তিনি "সিদ্দীক" অতিশয় বিশ্বাসী আখ্যা লাভ করিয়া ছিলেন।

হাদীছে বর্ণিত আছে, নবী (দঃ) বলিয়াছেন, আমি যে কোন ব্যক্তিকে ইসলামের আহ্বান জানাইয়াছি প্রত্যেকেই প্রথমে কিছু না কিছু দ্বিধা প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু আবুবকর ইসলামের আহ্বান শুনা মাত্রই বিনা দ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে।

আবুবকর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে সকলের সম্মুখে তাঁহার ইসলাম প্রকাশ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং নবী (দঃ) হইতে শত্রুদের অত্যাচারও যথাসাধ্য নিবারণ করার চেষ্টায় ব্রতী থাকিলেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণে মক্কায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল, তাই তিনি সাধারণ্যে সর্ব্বপ্রথম মোসলমানরূপে প্রসিদ্ধ; তাঁহার ইসলাম গ্রহণের পূর্ব্বে কাহারও ইসলাম সম্পর্কে কেহ কোন খোঁজ রাখিত না।

১৬৭৪। হাদীছ ঃ—হাম্মাম (রঃ) বলিয়াছেন, আম্মার (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে প্রথম এরূপ অবস্থায় দেখিয়াছি যে, তাঁহার সঙ্গে মাত্র পাঁচ জন ক্রীতদাস, দুইজন মহিলা আর শুধু আবুবকর ছিলেন। (৫১৬ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—পাঁচজন ক্রীতদাস হইলেন, যায়েদ, বেলাল, আমের ইবনে-ফোহায়রা আবু ফোকায়হা এবং আম্মার রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম। আর মহিলাদ্বয় হইলেন, খাদিজা এবং আম্মারের মাতা—স্থমাইয়্যা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা।

যায়েদ (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ক্রীতদাস ছিলেন তাঁহাকে মুক্ত করিয়া নবী (দঃ) স্বীয় পালকপুত্র বানাইয়াছিলেন। বেলাল (রাঃ) মক্কার এক সর্দ্দার উমাইয়্যা ইবনে খলফের ক্রীতদাস ছিলেন; ইসলাম গ্রহণের কারণে বেলাল (রাঃ) ভীষণ অত্যাচারিত হইতে ছিলেন, তাই আবুবকর (রাঃ) তাঁহাকে ক্রয় করিয়া মুক্ত করিয়া ছিলেন। আমের (রাঃ) আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ক্রীতদাস ছিলেন। উক্ত সাত জনের দুইজন আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পূর্ব্বে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করিয়া ছিলেন, আলী (রাঃ)ও মোসলমান ছিলেন, কিন্তু গোপনে।

আবুবকর (রাঃ) মোসলমান হইয়া গোপনে গোপনে বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার আহ্বানে ওসমান, যোবায়ের, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, তাল্‌হা এবং সায়াদ ইবনে আবু ওয়াক্কাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক হইলেন। আবুবকর (রাঃ) তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইলেন; সকলে নবীজীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। এই পাঁচজন সকলেই মক্কার বিশিষ্ট শ্রেণীর লোক ছিলেন। (সীরতে-মোস্তফা, ১—১১৯)

এইরূপে ধীরে ধীরে অতি মন্থর গতিতে হইলেও ইসলামের কাজ সম্মুখপানে অগ্রসর হইতে লাগিল। নবীজীর কার্য্যকলাপ নিতান্তই বিক্ষিপ্ত আকারে চলিতে ছিল; যথায় তথায় সুযোগ প্রাপ্তে তিনি গোপনে ইসলাম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। ইতিমধ্যেই সপ্তম বা দশম সংখ্যায় আর্‌কাম (রাঃ) মোসলমান হইলেন; তাহার বাড়ী ছিল ছাফা পর্ব্বতের পাদদেশে। মোসলমানগণের পরামর্শে স্থির হইল যে, নবী (দঃ) আরকাম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর গৃহে বসিবেন; মোসলমানগণ অনাড়ম্বররূপে লুকাইয়া লুকাইয়া তথায় একত্রিত হইবেন; নবী (দঃ) হইতে ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করিবেন এবং সকলে পরামর্শ করিয়া পরিকল্পিত ভাবে কাজ চালাইবেন। তখন হইতে নবী (দঃ) "দারে-আরকাম"—আরকাম রাজিয়াল্লাহু আনহুর গৃহে* নিয়মিতরূপে বসিতেন এবং মোসলমানগণ গোপনে তথায় একত্রিত হইতেন; ইসলামের শিক্ষা লাভ করিতেন এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেন।

* ১৯৫০ ইং সনের হজ্জে এই গৃহ জেয়ারতের সৌভাগ্য হইয়াছিল; এখন হরম শরীফের আওতায় আসিয়া গিয়াছে।

নবুয়তের তৃতীয় বৎসর—প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার :

দীর্ঘ তিন বৎসর কাল ইসলামের কার্য্যকলাপ মক্কা নগরীর সীমার মধ্যে গোপনে গোপনেই চলিল। নবুয়তের তৃতীয় বৎসরের শেষের দিকে পবিত্র কোরআনের দুই ছুরার দুইটি আয়াত নাযেল হইল যাহাতে আল্লাহ তায়ালা হযরত (দঃ)কে প্রকাশ্যে সুস্পষ্টরূপে ইসলামের আহ্বান ব্যাপকভাবে প্রচার করার নির্দ্দেশ দান করিলেন।

(১) فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ - إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِءِينَ ۙ

"বিশ্ববাসীকে যাহা পৌঁছাইবার জন্য আপনাকে আদেশ করা হইয়াছে আপনি উহা সর্ব্ব সমক্ষে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ্যে প্রচার করুন; মোশরেকদের কোন পরওয়া করিবেন না। উপহাসকারীদের মোকাবিলায় আপনার পক্ষে আমিই যথেষ্ট হইব। (ছুরা হেজ্‌র—১৪ পাঃ ৬ রুঃ)

(২) وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ -

"আপনি (ইসলামের প্রকাশ্য প্রচার আরম্ভ করিতে যাইয়া প্রথমতঃ) আপনার নিকটতম জ্ঞাতি-গোষ্ঠিকে (আল্লার আজাব হইতে) সতর্ক করুন।"

(ছুরা শোয়ারা—১৯ পাঃ ১৫ রুঃ)

এই নির্দ্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বিশেষ ব্যবস্থাপনার সহিত স্বীয় আত্মীয়-স্বজন সহ মক্কার সকল প্রধানগণকে তৌহীদ ও ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইবার চেষ্টায় লাগিয়া গেলেন।

ঐ উদ্দেশ্যে নিকট আত্মীয়গণকে একত্রিত করার জন্য এক দিন নবীজী (দঃ) নিজ গৃহে দাওয়াতের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি আলী (রাঃ)কে বলিলেন, এক ছা'—প্রায় চার সের আটা, বকরির একটি সম্মুখ রান এবং সাধারণ এক পেয়ালা দুধ যোগার কর। অতঃপর আত্মীয়-স্বজন সহ কোরেশ দলপতিগণকে দাওয়াত কর। সেমতে আলী (রাঃ) সব যোগার-আয়োজন সম্পন্ন করিয়া দাওয়াত প্রদান করিলেন। আবুতালেব, হামযা, আব্বাস, আবুলাহাব—হযরতের চাচাগণ সহ প্রায় চল্লিশ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি উক্ত দাওয়াতে সমবেত হইলেন।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অলৌকিক বরকত ছিল যে, ১০।১২ জনের খাদ্য পরিমাণ ঐ খানা চল্লিশ জন তৃপ্ত হইয়া খাওয়ার পরও খাদ্য অবশিষ্ট থাকিল। অতঃপর হযরত (দঃ) দুধের পেয়ালা উপস্থিত করিতে

বলিলেন ; ইহাও তদ্রূপই—সাধারণ এক পেয়ালা দুধ চল্লিশ জনে পরিতৃপ্তির সহিত পান করিলেন। পানাহার শেষে নবীজী (দঃ) নিজের কথা প্রকাশ করিবেন তাহার পূর্ব্বেই আবুলাহাব বলিয়া উঠিল, হে লোকসকল ; মোহাম্মদ ত আজ তোমাদের খাদ্যেও যাদু চালাইয়াছে—এইরূপ যাদু আর দেখি নাই। ইহা বলিতেই সকলে ছুটাছুটি করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল ; সেই দিন নবীজী মোস্তফা (দঃ) কোন কথাই বলিবার সুযোগ পাইলেন না।

এই দিনের অকৃতকার্য্যতা নবীজী মোস্তফা (দঃ)কে দমাইতে পারিল না, তিনি চেষ্টার পর চেষ্টা বারংবার চেষ্টার নীতি অবলম্বন করিলেন।

আবার আর একদিন ঐরূপ দাওয়াতের ব্যবস্থা করিয়া লোকজনকে একত্রিত করিলেন। আজ পানাহার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নবীজী মোস্তফা (দঃ) তৌহীদ ও ইসলামের আহ্বান জানাইয়া বলিলেন, সমবেত ব্যক্তিবৃন্দ! আমি আপনাদের জন্য এমন কল্যাণ ও মঙ্গল লইয়া আসিয়াছি যাহা কোন মানুষ তাহার জাতির জন্য আনয়ন করিতে পারে নাই। আমি আপনাদের জন্য ইহকাল ও পরকাল উভয়ের কল্যাণ ও মঙ্গল লইয়া আসিয়াছি (সীরতে মোস্তফা, ১—১২৮)।

কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ ছাড়াই দাওয়াতী সম্মেলন সমাপ্ত হইয়া গেল সকলে নিজ নিজ পথে চলিয়া গেল। এইরূপে গৃহভ্যন্তরে সত্যের ডাক শুনাইবার পর নবীজী মোস্তফা (দঃ) নিজ সাধনায় আর এক ধাপ অগ্রসর হইলেন—দেশ ও জাতিকে চরম আহ্বান জানাইবার আরও এক বিশেষ ব্যবস্থা তিনি অবলম্বন করিলেন।

আরবের প্রথা ছিল, সমাগত কোন ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে দেশ ও জাতিকে সতর্ক করিতে হইলে পর্ব্বৎ শিখরে চড়িয়া চিৎকার করিতে হইত। সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মঙ্গলবাহক বিপদনিবারক নবীজী মোস্তফা (দঃ) সেই কায়দায় দেশ ও জাতিকে চিরস্থায়ী জীবনের চিরস্থায়ী আজাব হইতে সতর্ককরণ পূর্ব্বক তৌহীদ ও ইসলামের আহ্বান জানাইবেন। সেমতে একদিন নবীজী (দঃ) প্রভাতে কা'বা শরীফের সম্মুখস্ত ছাফা পর্ব্বৎ শিখরে আরোহন করিলেন এবং সমগ্র কোরায়েশকে বিশেষভাবে নিজ আত্মীয়-স্বজনকে বিপদ সঙ্কেতের ন্যায় ধ্বনি দ্বারা আহ্বান করিলেন। সকলে ছুটিয়া আসিয়া ছাফা পর্ব্বৎ প্রান্তে সমবেত হইল ; এমনকি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যে উপস্থিত হইতে সক্ষম হয় নাই সে নিজ প্রতিনিধি পাঠাইল। পর্ব্বৎ শৃঙ্গ হইতে নবীজী মোস্তফা (দঃ) সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যদি সংবাদ দেই যে, এই পর্ব্বতের পেছন হইতে একদল শত্রুসৈন্য তোমাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবার জন্য আসিতেছে—তোমরা আমার এই কথা বিশ্বাস করিবে কি? সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, নিশ্চয় করিব ; আমরা কখনই তোমাকে কোন মিথ্যার সংস্পর্শে আসিতে দেখি নাই। নবীজী (দঃ) তখন জলদ-গম্ভীর

স্বরে বলিলেন, যদি তাহাই হয় তবে শুন। আমি তোমাদিগকে কঠিন আজাব হইতে সতর্ক করিতেছি (যদি তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া না দাও)।

নিম্নে বর্ণিত হাদীছদ্বয়ে এই বিষয়ের বর্ণনা রহিয়াছে—

১৬৭৫। হাদীছ ঃ— (৭০২ পৃঃ) عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه

قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ صَعِدَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِىْ يَا بَنِىْ فِهْرٍ يَا بَنِىْ عَدِىٍّ لِبُطُوْنِ

قُرَيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوْا فَجَعَلَ الرَّجُلُ اِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ اَنْ يَّخْرُجَ اَرْسَلَ

رَسُوْلًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ فَجَاءَ اَبُوْ لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ فَقَالَ اَرَئَيْتَكُمْ لَوْ اَخْبَرْتُكُمْ

اَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِىْ تُرِيْدُ اَنْ تُغِيْرَ عَلَيْكُمْ اَكُنْتُمْ مُصَدِّقِىَّ قَالُوْا نَعَمْ

مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ اِلَّا صِدْقًا قَالَ فَاِنِّىْ نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ

شَدِيْدٍ فَقَالَ اَبُوْ لَهَبٍ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا فَنَزَلَتْ

"تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ"

অর্থ—ইবনে আব্বাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন পবিত্র কোরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হইল, وانذر عشيرتك الاقربين "আপনি আপনার নিকটতম আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করুন।" তখন হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা ছাফা পর্ব্বতে আরোহন করিলেন এবং (হে জনমণ্ডলী! সতর্ক হও, সতর্ক হও বলিয়া সকলকে উদ্বুদ্ধ করিলেন এবং *) হে বনী-ফেহ্‌র গোত্রীয় লোকগণ! হে বনী-আ'দী গোত্রীয় লোকগণ!—এইরূপে কোরায়েশ বংশীয় গোত্র সমূহকে ডাকিলেন। তাহারা সকলে তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়া তথায় উপস্থিত হইল, এমনকি কোন কোন গোত্রের সর্দ্দার উপস্থিত হইতে সক্ষম না হইয়া তাহার পক্ষের পর্য্যবেক্ষককে ব্যাপারটা দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। তথায় আবুলাহাব সহ কোরায়েশদের সর্দ্দারগণ উপস্থিত হইল।

হযরত নবী (দঃ) তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা বল ত। যদি আমি তোমাদিগকে এই ভয়ঙ্কর সংবাদ প্রদান করি যে, একদল শত্রু সেনা নিকটবর্ত্তী উপত্যকা বা গিরিপথ বহিয়া (আজই সকাল বেলা বা বিকাল বেলা*) তোমাদের উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে (এই পাহাড়ের পিছন হইতে*) আসিয়া পড়িতেছে, তবে তোমরা আমাকে সত্য সংবাদদাতা মনে করিবে কি? সর্দ্দারগণ সকলেই এক বাক্যে বলিল, হাঁ—কারণ আমরা কখনও আপনার মধ্যে সত্য ছাড়া মিথ্যার লেশ মাত্র দেখি নাই। তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, (তোমরা যে শেরেক ও বুৎপরস্তির মধ্যে আছ যদি ইহা ত্যাগ না কর তবে কেয়ামত বা পরজীবনে তোমাদের উপর ভীষণ আজাব আসিবে ; সেই) ভীষণ আজাব আসিবার পূর্ব্বেই আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছি। (এবং সেই আজাব হইতে পরিত্রাণ পাইবার ব্যবস্থা তোমাদিগকে বাতাইবার জন্য আমি আসিয়াছি।)

তখন আবুলাহাব (ক্রোধস্বরে) বলিল, সর্ব্বদার জন্য তোমার সর্ব্বনাশ হউক—তুমি আমাদিগকে (তোমার ধর্ম্মের) এই কথা শুনাইবার জন্য একত্র করিয়াছ ?

আবুলাহাবের এই উক্তির প্রতিবাদেই এই ছুরা নাযেল হয়—

تبت يدا ابى لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب

"আবুলাহাবের সমুদয় চেষ্টা-তদবীর ধ্বংস হইয়াছে এবং সে নিজেও ধ্বংস হইয়াছে তাহার ধন-সম্পদ এবং স্বীয় অর্জিত প্রভাব প্রতিপত্তি কোনই কাজে আসে নাই (—আল্লার আজাব হইতে তাহাকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে।)

১৬৭৬। হাদীছঃ—(৭০২ পৃঃ) عن ابى هريرة رضى الله تعالى

قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل الله وانذر عشيرتك الاقربين قال يا معشر قريش اشتروا انفسكم لا اغنى عنكم من الله شيئا يا بنى عبد مناف لا اغنى عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا اغنى عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله لا اغنى عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالى لا اغنى عنك من الله شيئا ـ

---

* চিহ্নিত তিনটি বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী বিষয়গুলি ৭৪৩ পৃষ্ঠায় রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে।

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন আল্লাহ তায়ালা وانذر عشيرتك الاقربين আয়াত নাযেল করিলেন তখন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (উক্ত আয়াতের নির্দ্দেশানুসারে স্বীয় আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে) দণ্ডায়মান হইলেন এবং আত্মীয়বর্গকে সমবেতভাবে,, আর কভেক জনকে বিশেষ বিশেষরূপে আহ্বান করিলেন—হে (আমার বংশধর) কোরায়েশ বংশীয় লোকগণ। তোমরা নিজদিগকে আল্লার আজাব হইতে বাঁচাইতে সচেষ্ট হও; (আজাব হইতে পরিত্রাণের মূল ব্যবস্থা তোমরা গ্রহণ না করিলে) আমি তোমাদিগকে আল্লার আজাব হইতে বাঁচাইবার জন্য কোন সাহায্যই করিতে পারিব না।

হে (নিকটতম আত্মীয়বর্গ—) আব্‌দে মনাফ গোত্রীয় লোকগণ! (তোমরাও আজাব হইতে পরিত্রাণের মূল ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে) আমি তোমাদিগকে আল্লার আজাব হইতে বাঁচাইবার জন্য কোন সাহায্যই করিতে পারিব না।

হে আমার চাচা—আবদুল মোত্তালেবের পুত্র আব্বাছ। (আপনিও যদি আজাব হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তবে) আমি আল্লার আজাব হইতে বাঁচাইবার জন্য আপনাকেও কোন সাহায্য করিতে পারিব না।

হে আল্লার রসুলের ফুফু ছফিয়্যা। (আজাব হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে) আপনাকেও আমি কোন সাহায্য পৌঁছাইতে পারিব না।

হে মোহাম্মদের কন্যা ফাতেমা। তুমি আমার ধন-সম্পদের যতটুকু ইচ্ছা দাবী করিতে পার, কিন্তু (আজাব হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা স্বয়ং গ্রহণ না করিলে) আমি তোমাকেও আল্লার আজাব হইতে বাঁচাইবার জন্য কোন রকম সাহায্য করিতে পারিব না। (অর্থাৎ নাজাত ও পরিত্রাণের মূল-বস্তু ঈমান ও ইসলাম ব্যতিরেকে কাহারও কোন সম্পর্ক, এমনকি নবীর সম্পর্কও কোন কাজে আসিবে না।)

এই হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা এবং আহ্বানও উপস্থিত ক্ষেত্রে কোন ফলদায়ক মনে হইল না। আবুলাহাব এই ক্ষেত্রেও নবীজী মোস্তফার উদ্দেশ্য বানচাল করার উদ্দেশ্যে হট্টগোল সৃষ্টি করিয়া দিল; সকলেই বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিয়া গেল।

নবীজী মোস্তফার উৎসাহ-উদ্যমের সীমা নাই; ভণ্ড ধোকাবাজ লোক আত্ম-বিশ্বাসহীন দূর্ব্বলচেতা হয়; প্রাথমিক অকৃতকার্য্যতায় তাহারা বিহ্বল হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে অনাবিল সত্য ও অকৃত্রিম উদ্দেশ্য লইয়া যাঁহারা কর্ত্তব্যের জন্যই কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হন তাঁহাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মবল হয় পর্ব্বত সমতুল্য এবং অকৃতকার্য্যতার উপরও তাঁহারা সাফল্যের কল্যাণ সৌধ নির্ম্মাণে সাধনা করেন। আত্মবিশ্বাসহীন ভণ্ড লোকেরা যেই পরিস্থিতিতে অকৃতকার্য্যতার প্রথম আঘাতেই মুহ্যমান হইয়া পড়ে সত্যের সেবকগণ সেই পরিস্থিতিতে অধিকতর উৎসাহ, অধিকতর সাহস এবং বজ্রকঠিন দৃঢ়তা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে

থাকেন। সত্যের মহাসেবক ও কর্ত্তব্যের মহাসাধক হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উহার পূর্ণতম বাস্তব আদর্শ। দেশ ও জাতির এই উপেক্ষা ও উদাসিনতায়, আত্মীয় স্বজনের দুর্ব্ব্যবহারে তিনি একটুও বিচলিত বা ক্ষুব্ধ হইলেন না, বরং তাঁহার উদ্যম-উৎসাহ এবং সাধনার গতি আরও বাড়িয়া গেল। "হয় উদ্দেশ্যের সাধন না হয় জীবনের পতন" এই আদর্শের চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন নবীজী মোস্তফা (দঃ) এই কঠিন ময়দানে।

দাওয়াত-ব্যবস্থায় করুণ আহ্বানে বিফল হইলেন, পর্ব্বৎ শৃঙ্গের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সতর্কবাণীতে অকৃতকার্য্য হইলেন, কিন্তু নবীজী মোস্তফার মনোবল অক্ষুণ্ণ, কর্ম্মস্পৃহা অদম্য। এখন তিনি তৌহীদ ও ইসলামের বাণী—"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-মোহাম্মাদুর-রসুলুল্লাহ," ঘরে ঘরে পৌঁছাইবার জন্য পথে-প্রান্তরে নামিয়া পড়িলেন।

عن ربيعة بن عباد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس فى منازلهم يقول ان الله يامركم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وابولهب وراءه يقول يا يها الناس ان هذا يامركم ان تتركوا دين اباءكم -

"রবিয়া ইবনে আব্বাদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম লোকদের ঘরে ঘরে গৃহে গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং বলিতেছেন, আল্লাহ তোমাদিগকে আদেশ করিতেছেন—তোমরা একমাত্র তাঁহারই এবাদৎ-উপাসনা কর, অন্য কোন কিছুকে তাঁহার সঙ্গী, শরীক, অংশীদার সাব্যস্ত করিও না। নবীজী এই আহ্বান বলিয়া বেড়াইতেন আর আবু লাহাব তাঁহার পেছনে পেছনে বলিতে থাকিত হে লোক সকল। এই লোকটা তোমাদিগকে পরামর্শ দেয় তোমাদের বাপদাদার ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে; তোমরা সতর্ক থাকিও।"

ইহার উপরও ক্ষান্ত নহে—আবুলাহাব, আবুজহল-গোষ্ঠি তাঁহাকে যাদুকর, গণক ঠাকুর, কল্পী, মিথ্যাবাদী পাগল বলিয়া লোকদের নিকট হেয় ও উপেক্ষণীয় সাব্যস্ত করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিত। কিন্তু তাহাদের কোন প্রচেষ্টাই নবীজী মোস্তফার দৃঢ় মনোবল, অদম্য কর্ম্মস্পৃহাকে তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ করিতে পারিত না। তিনি পথে-প্রান্তে, হাটে-মাঠে, মেলা-উৎসবে সর্ব্বত্র ইসলাম প্রচারে অদমনীয় হইয়া উঠিলেন।

মুনীব-গামেদী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লালাহু আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়াছি, তিনি বলিতেছিলেন—হে লোক সকল! তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু গ্রহণ কর; তোমাদের মঙ্গল হইবে। ঐ সময় হতভাগাদের কেহ তাঁহাকে গালি দিতেছিল, কেহ তাঁহার উপর থুথু ফেলিতেছিল, কেহ তাঁহার

উপর ধুলা-বালু ছুড়িতেছিল। এমন সময় একটি মেয়ে পানি নিয়া আসিয়া নবীজীর মুখমণ্ডল ও হাত ধৌত করিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, মেয়েটি নবীজী-তনয়া জয়নব (রাঃ)। নবীজী (দঃ) মেয়েটিকে বলিলেন, হে বৎসে! পিতার দুঃখে ও মানহানীতে ভীত হইও না (সীরতে মোস্তফা, ১—১৪৭)।

তারেক ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "জুল-মজায" হাটে আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়াছি—তিনি বলিয়া যাইতেছিলেন, হে লোক সকল! তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ গ্রহণ কর তোমাদের মঙ্গল হইবে। এক হতভাগা তাঁহার পেছনে পেছনে তাঁহার উপর পাথর মারিতেছিল এবং বলিতেছিল, এই মিথ্যাবাদীর কথা কেহ শুনিও না। নবীজীর দেহ মোবারক রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছিল (ঐ)।

আর একজন ছাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন, জুল-মজায হাটে আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়াছি—তিনি বলিয়া যাইতেছিলেন, হে লোক সকল! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু গ্রহণ কর তোমাদের মঙ্গল হইবে। আবুজহল তাঁহার প্রতি ধূলা-বালু ছুড়িতেছিল এবং লোকদিগকে বলিতেছিল, তোমরা তাহার ধোকায় পড়িও না; সে তোমাদিগকে তোমাদের দেবদেবী হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চায়। নবীজী (দঃ) তাহার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিতেছিলেন না (ঐ)।

রবিয়া ইবনে আববাদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, "ওকাজ" হাটে এবং "জুলমজায" হাটে আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়াছি—তিনি বলিতেছিলেন, হে লোক সকল! তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ গ্রহণ কর তোমাদের মঙ্গল হইবে। আর একটা লোক টেরা মানুষ তাঁহার পেছনে পেছনে বলিতেছিল, এই লোকটা বেদ্বীন মিথ্যাবাদী। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, ঐ টেরা মানুষটা নবীজীরই চাচা আবুলাহাব। (সীরতে মোস্তফা, ১—১৬১)।

নবুয়তের চতুর্থ বৎসর—মোশরেকদের শত্রুতার ঝড়ঃ

দীর্ঘ তিন বৎসর ইসলাম প্রচার গোপনে চলিয়া প্রকাশ্যে ইসলামের প্রচার আরম্ভ হইলে পর আবুলাহাব শ্রেণীর কেহ কেহ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিরোধী হইল এবং মক্কার জনসাধারণ পথে ঘাটে ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্তক ঠেস মারিতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহারা হযরতের আত্মঘাতি শত্রুতায় লিপ্ত হইয়া ছিল না।

চতুর্থ বৎসরের শেষ দিকে হযরত (দঃ) মোশরেকীনদের গর্হিত মাবুদ দেবদেবী ও ঠাকুর-প্রতিমা গুলির নিষ্কর্ম্মণ্যতা, অপদার্থতা ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া ঐ সবের প্রতি ঘৃণা ও উপেক্ষা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং অবতারিত পবিত্র কোরআনের এই শ্রেণীর আয়াতও প্রচার করিতে লাগিলেন।

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ ‐

لَوْ كَانَ هٰؤُلَاءِ اٰلِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا ‐ وَكُلٌّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ‐

"হে মোশরেকগণ! নিশ্চয় তোমরা এবং আল্লাহ্ ভিন্ন তোমাদের গর্হিত পূজনীয় দেবদেবীসমূহ সবই জাহান্নামের জ্বালানিতে পরিণত হইবে; তোমরা পূজারী ও পূজনীয় উভয়েই নরকে প্রবেশ করিবে। (এখন ভাবিয়া দেখ।) যদি এই গর্হিত পূজনীয় দেবদেবীগুলি বাস্তবিকই মাবুদ হইত তবে এইগুলি কখনও জাহান্নামে দগ্ধ হইত না, অথচ ঐ পূজণীয় দেবদেবীগুলি সহ তোমাদের সকলেরই জাহান্নামে চিরকাল পতিত থাকিতে হইবে। (১৭ পাঃ ১৭ রুঃ)

এইরূপ আয়াত পবিত্র কোরআনে আরও রহিয়াছে, যথা—

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ‐ إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ‐ وَإِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ‐ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ * مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ‐ إِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ *

"হে লোক সকল! একটি কৌতুহলজনক কথা বর্ণনা করা হইতেছে—তোমরা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। আল্লাহ ভিন্ন অন্য যেসব দেবদেবী-মূর্ত্তির পূজা-উপাসনা তোমরা করিয়া থাক ঐ সব সকলে একত্রিত হইয়া এক যোগে চেষ্টা করিলেও তাহারা কিছুতেই একটি মাত্র মাছিও সৃষ্টি করিতে পারিবে না। আরও শুন—মাছি যদি তাহাদের হইতে (বা তাহাদের জন্য দেওয়া ভোগ-ভেট হইতে) কোন বস্তু ছিনাইয়া নিয়া যায় তবে সেই বস্তুটি মাছি হইতে ছাড়াইয়া রাখিবার শক্তিও তাহাদের নাই। উপাসক ত অক্ষম-দূর্ব্বল আছেই উপাস্য ত আরও অধিক অক্ষম-দূর্ব্বল। এই শ্রেণীর লোকেরা বস্তুতঃ আল্লাহ তথা উপাস্যের পূর্ণ মর্য্যাদা বুঝেও নাই দেয়ও নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ তথা উপাস্য ত নিশ্চয় সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বোপরি প্রাধান্যের অধিকারী হইবেন" (১৭ পাঃ ১৭ রুঃ)।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اِتَّخَذَتْ

بَيْتًا - وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ - لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ *

"যাহারা আল্লাহ ভিন্ন অন্য পূজণীয় সাহায্যকারী অবলম্বন করে তাহাদের আশ্চার্য্যজনক অবস্থা মাকড়সার ন্যায়। মাকড়সা নিজের রক্ষার জন্য ঘর তৈরী করে, অথচ দুনিয়ার সমস্ত গৃহের মধ্যে সর্ব্বাধিক দূর্ব্বল গৃহ মাকড়সার গৃহ। (তদ্রূপ যাহারা সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ছাড়িয়া দূর্বলদের সাহায্য-আশায় তাহাদের পূজা করিয়া থাকে। কতই না অযৌক্তিক তাহাদের এই আশা,) যদি তাহাদের জ্ঞান থাকিত !! (২০ পাঃ ১৬ রুঃ)

মোশরেকদের ধর্ম্ম এবং তাহাদের ধর্ম্মীয় দেবদেবীদের এইরূপ নিন্দা-মন্দ এবং বেইজ্জতী ও অপমানের বহু আয়াত কোরআন শরীফে নাযেল হইতে লাগিল। নবীজী (দঃ) সেই সব আয়াত নির্ভিকভাবে যথারীতি প্রচার করিয়া চলিলেন।

এতদিন কাফেররা নবীজীর প্রতি বেশীর ভাগ বিদ্রূপ, উপহাস, উপেক্ষা, করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেছিল। এখন যখন তিনি তাহাদের পূজণীয় দেবদেবীদের নিন্দা-মন্দ ও পৌত্তলিকতার অসারতা প্রচার করিতে লাগিলেন এবং তাহাদের পূজণীয় মহাপুরুষগণ সহ তাহাদেরে নরকী বলিয়া বক্তৃতা করিতে লাগিলেন তখন কোরেশ দলপতিগণ সমবেতভাবে নবীজীকে বাধা দানে এবং ইসলাম প্রচার বন্ধ করিয়া দিতে উদ্যত হইল। এই পর্য্যায়ে তাহাদের সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা হইল— নবীজীর আশ্রয়দাতা বনী হাশেম সর্দ্দার আবুতালেব দ্বারা এই কাজ সমাধা করা। তাহারা ভাবিল, আবুতালেবের আশ্রয়ে থাকিয়াই মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) তাহার আন্দোলন চালাইতে সক্ষম হইতেছে; আবুতালেব আমাদের সর্দ্দার আমাদেরই ধর্ম্ম মতের। সুতরাং তিনি তাহাকে বাধা দিলে সহজেই সে ঐ সব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। কোরেশ দলপতিগণ এই উদ্দেশ্য লইয়া আবুতালেবের সহিত পরপর তিনবার বৈঠক বসিল।

আবুতালেবের সহিত প্রথম বৈঠকঃ

কোরেশ দলপতিগণ আবুতালেবের নিকট নবীজী (দঃ) সম্পর্কে অভিযোগ করিল, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের পূজণীয় দেবদেবীর নিন্দা-মন্দ প্রচার করে, আমাদের ধর্ম্ম মতকে ভ্রষ্টতা বলে, আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণকে নাদান-আহমক পথভ্রষ্ট নরকী সাব্যস্ত করে। আপনি হয় তাহাকে এই সব কথা ও কাজ না করিতে বাধ্য করুন, না হয় তাহাকে আমাদের জন্য ছাড়িয়া দিন; আমরাই তাহার মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করিব—আপনি মধ্যে পড়িবেন না।

এই দিন আবুতালেব কোরেশ দলপতিগণকে মোলায়েমভাবে পাঁচ রকম নরম কথায় ঠাণ্ডা করিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। (বেদায়াহ, ৩—৪৭)

আবুতালেবের সহিত দ্বিতীয় বৈঠক ঃ

প্রথম বৈঠকে আবুতালেব নরম কথায় কোরেশ দলপতিগণকেই ঠাণ্ডা করিয়াছেন, নবীজীকে কোন কিছু বলেন নাই। নবীজী (দঃ) যথারীতি তাঁহার কার্য্য চালাইয়াই যাইতেছেন। এই অবস্থায় কোরেশ দলপতিদের উত্তেজনা বাড়িয়া চলিল ; তাহারা পুনরায় আবুতালেবের সহিত বৈঠকে মিলিত হইল। তাহারা আবুতালেবকে বলিল, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদিগকে যাতনা দিয়া থাকে আমাদের সভা-সমাবেশে আমাদের মসজিদে-মন্দিরে। আপনি তাহাকে আমাদের যাতনা দেওয়া হইতে বারণ করুন। আবুতালেব তৎক্ষণাৎ তাহার পুত্র আকীলকে বলিলেন, যাও মোহাম্মদকে ডাকিয়া নিয়া আস। আকীল যাইয়া তাঁহাকে কাহারও কুড়ে ঘর হইতে ডাকিয়া আনিল। কোরেশ দলপতিগণ আবুতালেবের সম্মুখে বসিয়া আছে ; দ্বিপ্রহর বেলা, নবীজী (দঃ) ঐ সময়ই তথায় উপস্থিত হইলেন। আবুতালেব নবীজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনার গোষ্ঠির এই সব লোকেরা বলিতেছে, আপনি তাহাদের সভা-সমাবেশে, মসজিদে-মন্দিরে তাহাদেরে যাতনা দিয়া থাকেন ; আপনি এইরূপ কাজ হইতে বিরত থাকুন। নবী (দঃ) আকাশপানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা সূর্য্য দেখেন কি ? তাহারা বলিল, হাঁ। নবী (দঃ) বলিলেন, আপনারা এই সূর্য্য হইতে কিছু অংশ নিয়া আসিতে যে পরিমাণ অক্ষম আমি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত্যাগ করিতে তদপেক্ষা বিন্দুমাত্র কম অক্ষম নহি। আবুতালেব নবীজী মোস্তফার এরূপ দৃঢ়তা দৃষ্টে তাহাদিগকে বলিলেন, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কখনও মিথ্যা বলে না ; বাস্তবিকই সে অক্ষম না হইলে কখনও এইরূপ বলিত না ; অতএব আপনারা চলিয়া যান। (বেদায়াহ্ ১—৪২)

ইতিমধ্যে নবীজী (দঃ) তথা হইতে চলিয়া গেলেন ; কোরেশ দলপতিগণ আবুতালেবের প্রতি ভীষণ ক্ষুব্ধ হইল। তাহারা আবুতালেবকে বলিল, বয়সে, বংশে মান-সম্মানে আপনি আমাদের অনেক উর্দ্ধে। আমরা চাহিয়াছিলাম, আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বারণ করিবেন ; আপনি তাহা করিলেন না ; এই বলিয়া তাহারা তাহাদের কঠোর মনোভাব প্রকাশে বলিল, আমাদের পূজণীয় দেবদেবীদের নিন্দা-মন্দ, আমাদের পূর্বপুরুষদের বেইজ্জতী অপমান আমরা কিছুতেই বরদাশত করিব না। আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বারণ করুন, নতুবা তাহার এবং আপনার মোকাবিলায় রক্তারক্তির মাধ্যমে এক পক্ষ নিপাত হইয়া ঝগড়ার অবসান হইবে। এই কথা বলিয়াই কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তাহারা উঠিয়া চলিয়া গেল।

কোরেশ দলপতিদের ভীতি-প্রদর্শনে আবুতালেব বিচলিত হইলেন ; সমগ্র দেশ ও জাতির শত্রুতার প্রতিক্রিয়া তাঁহাকে প্রভাবান্বিত করিল। আবুতালেব নবীজীকে ডাকিয়া আনিলেন এবং বলিলেন, দেশের ও বংশের লোকজন আমার

নিকট আসিয়াছিল তাহারা এই এই বলিয়া গিয়াছে। সুতরাং তুমি নিজের উপরও রহম কর, আমার উপরও রহম কর; তুমি সংযত হও—আমার সাধ্যের অধিক বোঝা আমার উপর চাপাইও না।

আবুতালেবের এই আলাপে নবীজী (দঃ) ধারণা করিলেন, চাচা আবুতালেব বোধ হয় আমার সাহায্য সহায়তা হইতে অব্যাহতি পাইতে চান। তাই নবীজী মোস্তফা (দঃ) তাঁহার দৃঢ়তার আসল রূপ প্রকাশে স্পষ্ট ভাষায় দ্বিধাহীনভাবে বলিলেন—"হে চাচা! মহান আল্লা'র শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহারা যদি আমার দক্ষিণ হস্তে সূর্য্য এবং বাম হস্তে চাঁদ আনিয়া দেয় আর বলে যে, আমি যেন আমার এই কর্ত্তব্য কাজ ত্যাগ করি আমি আমার কাজ—সত্যের সেবা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ক্ষান্ত করিব না। হয় আল্লাহ আমার সাধনাকে জয়যুক্ত করিবেন, না হয় আমি ধ্বংস হইয়া যাইব।" এই কথা বলিয়া নবীজী মোস্তফা (দঃ) কাঁদিয়া দিলেন—তাঁহার অশ্রু বহিতে লাগিল এবং আবু তালেবের সম্মুখ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যখন তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন তখন আবুতালেব তাঁহাকে ডাকিয়া নিকটে আনিলেন এবং বলিলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! যাও এবং তোমার যাহা ইচ্ছা কর এবং যাহা ইচ্ছা বল। আল্লার কসম—আমি কোন অবস্থাতেই তোমাকে শত্রুর হাতে ছাড়িয়া দিব না। এই প্রসঙ্গে আবুতালেব একটি পদ্যও রচনা করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিলেন।

وَاللّٰهِ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ — حَتّٰى أُوَسَّدَ فِي التُّرَابِ دَفِيْنًا

আল্লার শপথ—বিরুদ্ধবাদীরা সর্ব্বশক্তি ব্যয় করিয়াও আপনার পর্য্যন্ত পৌছিতে পারিবে না; যাবৎ না আমি মাটির নীচে দাফন হইয়া যাই।

فَامْضِ لِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَاضَةٌ — أَبْشِرْ وَقَرَّ بِذَاكَ مِنْكَ عُيُوْنًا

অতএব নির্ভিক চিত্তে আপনি আপনার কর্ত্তব্যে অগ্রসর হইতে থাকুন; সুসংবাদ গ্রহণ করুন এবং চক্ষু শীতল করুন—কোন বাধাই আপনাকে কিছু করিতে পারিবে না।

وَدَعَوْتَنِيْ وَعَلِمْتُ أَنَّكَ نَاصِحِيْ — فَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ قَبْلُ أَمِيْنًا

আপনি আমাকেও আহ্বান জানাইয়াছেন এবং আমি জানি, আপনি আমার মঙ্গলকামী। নিশ্চয় আপনি সত্য এবং পূর্ব্ব হইতেই আপনি "আমীন" সত্যবাদী।

وَعَرَضْتَ دِيْنًا قَدْ عَرَفْتُ بِأَنَّهُ — مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِيْنًا

আপনি এক সুন্দর ধর্ম্ম পরিবেশন করিয়াছেন ; আমি উপলব্ধি করি, ঐ ধর্ম্ম সকল জাতির ধর্ম্মমত অপেক্ষা উত্তম।

لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِذَارُ مَسَبَّةٍ — لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِيْنًا

লোকের লান-তান ও গালাগালির ভয় যদি আমার না হইত তবে নিশ্চয় আমাকে দেখিতেন, আমি সরল ও সুষ্ঠুরূপে এই ধর্ম্মমতকে গ্রহণ করিয়া নিতাম। (বেদায়াহ ৩—৪২)

আবুতালেবের সহিত তৃতীয় বৈঠক ঃ

মক্কায় আবুতালেবের অসাধারণ প্রভাব ছিল, তাই কোরেশ দলপতিরা রাগের বশীভূত হইয়া হুমকি-ধমকির কথা বলিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু উহা শুধু তাহাদের অধৈর্য্য প্রকাশের কথা ছিল, বাস্তবায়িত হওয়ার মত কথা ছিল না। গরমের পর এইবার তাহারা ঠাণ্ডাভাবে আবুতালেবের সহিত তৃতীয় বৈঠকে মিলিত হইল।

এইবার তাহারা ওমারাহ্-ইবনে অলীদ নামক যৌবনের এক অতি সুশ্রী সুদর্শন যুবককে সঙ্গে আনিয়া আবুতালেবের নিকট উপস্থিত করতঃ বলিল, এই যুবকটি আপনাকে নিদাবীরূপে দিয়া দিতেছি ; তাহার পরিবর্ত্তে আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমাদের হস্তে অর্পণ করিয়া দিন। সে ত আপনার এবং আপনার পূর্ব্বপুরুষদের ধর্ম্মমত বিরোধী এবং আপনারই দলের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে এবং আমাদের সকলকে বুদ্ধি-বিবেকহীন বলিয়া প্রচার করিতেছে। আমরা তাহাকে হত্যা করিয়া দেই ; আপনার কোন ক্ষতি হইল না—একজনের পরিবর্ত্তে একজনকে আপনি পাইয়া গেলেন।

আবুতালেব বিস্ময়ের সহিত এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতঃ বলিলেন, কি অযৌক্তিক বিনিময়! আমার পুত্র তোমাদের হস্তে অর্পণ করিব হত্যার জন্য, আর তোমাদের পুত্রের ব্যয়ভার আমি বহন করিয়া যাইব! খোদার কসম—কস্মিনকালেও ইহা হইবে না। এইবারও আবার উত্তেজনার সহিত কোরেশ দলপতিগণ নৈরাশ্য নিয়া চলিয়া গেল। (বেদায়াহ, ৩—৪৮)

নবীজীর সহিত কোরেশদের সরাসরি কথাবার্ত্তা ও প্রলোভন দান ঃ

বার বার আবুতালেবের সহিত মিলিত হইয়া ব্যর্থ হওয়ার পর কোরেশগণ স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে সরাসরি প্রস্তাব পেশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করিল।

একদা কোরেশ দলপতিগণ সন্ধ্যার পর কা'বা শরীফের নিকটে একত্রিত হইয়া স্থির করিল, মোহাম্মদকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) খবর পাঠাইয়া ডাকিয়া

আন এবং সরাসরি তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া যুক্তি-তর্কে তাহাকে নিরুত্তর কর যেন ওজর-আপত্তির কোন অবকাশ তাহার জন্য না থাকে। সেমতে তাহারা নবীজীর নিকট লোক পাঠাইল এই সংবাদ দিল যে, আপনার বংশীয় মুরব্বিগণ আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য একত্রিত হইয়াছেন।

রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদের হেদায়েতের প্রতি অত্যধিক লালায়িত ছিলেন ; তিনি ভাবিলেন, হয়ত তাহাদের শুভবুদ্ধির উদয় হইয়াছে। এই ভাবিয়া নবীজী (দঃ) দ্রুত তাহাদের বৈঠকে আগমন করিলেন। তাহারা বলিল, আমরা আপনাকে সংবাদ দিয়াছি শেষ কথা শুনিবার জন্য—যাহাতে কোন ওজর-আপত্তির অবকাশ না থাকে। সমগ্র আরবে আপনার ন্যায় কোন মানুষ তাহার জাতির জন্য মাথা ব্যথার কারণ হয় নাই ; আপনি নিজের পূর্বপুরুষদেরে মন্দ বলেন, তাহাদের ধর্ম্মমতের নিন্দা করেন, তাহাদেরকে বিবেক-বুদ্ধিহীন বলেন, তাহাদের পূজনীয় দেবদেবীকে গালি দেন—এই করিয়া আপনি আমাদের একতায় ভাঙ্গন সৃষ্টি করিয়াছেন, যত রকম অনাচার এবং বিবাদ-বিরোধ আছে আপনি আমাদের ও আপনার মধ্যে সেই সবের সৃষ্টি করিয়াছেন।

আপনি যদি এই সব করিয়া থাকেন ধন লাভের আশায় তবে আপনাকে এই পরিমাণ ধন যোগাড় করিয়া দেই যাহাতে আপনি আমাদের মধ্যে সর্বোচ্চ ধনবান হইয়া যান। আর যদি আপনি প্রাধান্যের আশায় করেন তবে আমরা আপনাকে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সর্দার রূপে বরণ করিয়া নেই। যদি রাজত্বের আশায় করেন তবে আমরা আপনাকে আমাদের রাজা বানাইয়া নেই। আর যদি জিন-ভূতের তাছিরে আপনার বিকৃতি ঘটিয়া থাকে তবে আমরা সর্বপ্রকার ব্যয় বহনে আপনার চিকিৎসা করি ; চিকিৎসা বিফল হইলে আমরা আপনাকে ক্ষমার্হ গণ্য করিব।

রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আমার সম্পর্কে আপনাদের একটি কথাও সত্য নয়। ধনের আশায় বা প্রাধান্যের আশায় বা রাজত্বের আশায় আমি কাজ করিতেছিনা। আমাকে আল্লাহ তায়ালা আপনাদের প্রতি রসুলরূপে পাঠাইয়াছেন এবং আমাকে কেতাব দান করিতেছেন। তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন, আমি আপনাদেরে বেহেশতের পথ দেখাইয়া সুসংবাদ দেই এবং দোযখ হইতে সতর্ক করি। সেমতে প্রভুর দেওয়া দায়িত্ব আমি পৌঁছাইতেছি এবং আপনাদের মঙ্গল কামনা করিতেছি। যদি আপনারা আমার কথা আমার জিনিষ গ্রহণ করেন তবে আপনাদের ইহপরকালের সৌভাগ্য লাভ হইবে। আর যদি প্রত্যাখ্যান করেন তবে আমি আল্লার আদেশ পালনে দৃঢ় ও ধৈর্য্যধারী হইয়া থাকিব যাবৎ না আল্লাহই আপনাদের ও আমার মধ্যে শেষ ফয়ছালা করিয়া দেন।

এর পর কোরেশ দলপতিরা কতকগুলি বাহুল্য প্রস্তাবের অবতারনা করিল। তাহারা বলিল, আপনি জানেন, আমাদের এই শহরটি অতি সঙ্কীর্ণ, আমাদের জীবনমানও অতি নিম্নের, আমরা গরীব ; যেই প্রভু আপনাকে রসুল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহার নিকট আবেদন করুন, তিনি যেন আমাদের দেশের পাহাড়গুলি হঠাইয়া দিয়া আমাদের দেশকে সুপ্রশস্ত করিয়া দেন এবং আমাদের দেশে নদ-নদী প্রবাহের ব্যবস্থা করিয়া দেন যেরূপ সিরিয়া ও ইরাকে রহিয়াছে। আর আমাদের বাপ-দাদা মৃত পূর্বপুরুষদেরকে জীবিত করিয়া দেন—তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিব, আপনার দাবী সত্য কি মিথ্যা ?

রসুলুল্লাহ (দঃ) উত্তরে এতটুকুই বলিলেন যে, এই সব উদ্দেশ্যে আমি প্রেরিত হই নাই। যে ধর্ম্মমত প্রদানে আল্লাহ আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন আমি উহা নিয়াই আসিয়াছি ; আপনারা উহা গ্রহণ করিলে দুনিয়া-আখেরাতের মঙ্গল হইবে, আর গ্রহণ না করিলে আমি আল্লার আদেশের উপর অটল ধৈর্য্যশীল হইয়া থাকিব যাবৎ না আল্লাহ শেষ ফয়ছালা করিয়া দেন।

অতঃপর তাহারা বলিল, যদি আমাদের জন্য ইহা না করেন তবে আপনি নিজের জন্য এই আবেদন করুন, আপনার প্রভু যেন ফেরেশতা পাঠাইয়া দেন যে আপনার সমর্থন করিবে। আর আপনার জন্য বাগ-বাগিচা, স্বর্ণ-রৌপ্যের অট্টালিকা এবং ধন-দৌলতের খাজানা দান করেন যেন আপনাকে আমাদের ন্যায় জীবিকা উপার্জ্জনে যাইতে না হয়। আপনার এই সব বৈশিষ্ট্য দেখিলে আমরা বিশ্বাস করিতে পারিব যে, আপনি আল্লার রসুল।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি প্রভুর নিকট এই আবেদন করিতে পারিব না ; প্রভু আমাকে এই জন্য পাঠান নাই ; এই সঙ্গে নবীজী (দঃ) আবুতালেবের সহিত দ্বিতীয় বৈঠক কালের তাঁহার পূর্ব উক্তিরও পুনরাবৃত্তি করিলেন।

অতঃপর তাহারা বলিল, আমরা ত আপনার প্রতি ঈমান আনিব না ; আপনি আমাদের উপর আসমান ভাঙ্গিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করুন। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এইরূপ কাজ ত আল্লাহ তায়ালার ; তিনি যদি ইচ্ছা করেন করিতে পারেন।

এই ধরনের কথাবার্ত্তার পর নবীজী মোস্তফা (দঃ) তাঁহার আশার বিপরীত পরিস্থিতি দৃষ্টে অত্যন্ত মনক্ষুন্ন অবস্থায় গৃহে ফিরিয়া আসিলেন (বেদায়াহ, ৩—৫০)। এই শ্রেণীর কথোপকথনের আলোচনা পবিত্র কোরআনেও আছে—

وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا * أَوْ تَكُونَ

لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا * أَوْ تُسْقِطَ

اَلسَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰئِكَةِ قَبِيْلًا *

اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِى السَّمَاءِ - وَلَنْ نُّؤْمِنَ

لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ - قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ

اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا *

"কাফেররা বলিল, আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনিব না যাবৎ না আপনি আমাদের জন্য প্রবাহিত করেন আমাদের দেশে নদ-নদী। অথবা আপনার জন্য আঙ্গুর ও খেজুরের বাগান হয় যাহার মধ্যে নদী-নালা প্রবাহিত থাকে। কিম্বা আপনি আসমান ভাঙ্গিয়া আমাদের উপর ফেলিবার ব্যবস্থা করেন বা আল্লাহ এবং ফেরেশতা জামীনরূপে নিয়া আসেন। অথবা সোনা-চান্দির ঘর-বাড়ী আপনার হয়, কিম্বা আপনি আসমানে চড়িতে পারেন; আমরা আপনার আসমানে আরোহনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিব না যাবৎ না আপনি তথা হইতে কোন লিপি নিয়া আসেন যাহা আমরা পড়িতে পারি। আপনি বলুন ছোব্‌হানল্লাহ; কি সব আশ্চার্য্যের কথা! আমি ত মানুষ শ্রেণীর রসুল বৈ নহি!" ১৫ পাঃ ১০ রুঃ

আর এই শ্রেণীর ফরমাইশ পুরণ না করা সম্পর্কেও আল্লাহ তায়ালার বক্তব্য পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রহিয়াছে—

وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ - وَاٰتَيْنَا

ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا *

"ফরমায়েশী মোজেযা প্রদানে একমাত্র বাধা ইহাই যে, পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরাও এইরূপ ফরমায়েশ করিয়াছিল এবং উহা পুরন করার পরও তাহারা সত্যকে অস্বীকার করিয়াছিল; (ফলে তাহারা ধ্বংস হইয়াছে। যেমন—) ছামূদ জাতীকে তাহাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী উষ্ট্রী দিয়াছিলাম, সত্যকে তাহাদের চোখে প্রকাশ করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা উহার সঙ্গেও অন্যায় করিয়াছিল (এবং ধ্বংস হইয়াছিল)। মোজেযা ত আমি শুধু সতর্ক করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ করি। (সত্যকে বুঝিয়া নেওয়া এবং গ্রহণ করা ত জ্ঞান-বিবেকের দ্বারা হইবে)। (১৫ পাঃ ৬ রুঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আল্লাহ তায়ালার সাধারণ নিয়ম এই যে, তাঁহার রসুলকে যদি কোন নির্দ্ধারিত মোজেযা সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ বা ফরমায়েশ করা হয় এবং আল্লাহ তায়ালা রসুলকে সেই মোজেযা প্রদান করেন—এইরূপ ক্ষেত্রে সেই মোজেযা প্রকাশের পরও সত্যকে অস্বীকার করা হইলে আল্লাহ তায়ালার গজব সেই ক্ষেত্রে বিলম্ব করে না; অস্বীকারকারীদেরকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। যেরূপ ছামূদ জাতি তাহাদের নবী ছালেহ আলাইহেচ্ছালামকে বলিয়াছিল, এই পাহাড় বা বড় পাথরটি হইতে একটি উট বাহির করিয়া দেখাইতে পারিলে আমরা ঈমান গ্রহণ করিব। আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিয়া ছালেহ (আঃ) তাহা করিলেন; তাহাদের চোখের সম্মুখে ঐ পাহাড় বা পাথরটি কম্পমান হইয়া ফাটিয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ উহা হইতে একটি বিরাটকায় উষ্ট্রী বাহির হইয়া আসিল। কাফেররা উহাকে যাদু বলিয়া উড়াইয়া দিল; সত্যকে গ্রহণ করিল না, ফলে সমগ্র জাতি ধ্বংস হইয়া গেল। পবিত্র কোরআনে এই ঘটনা এবং এই শ্রেণীর আরও বহু ঘটনা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

উল্লেখিত আয়াতে এই ঈঙ্গিতই দেওয়া হইয়াছে যে, মক্কাবাসীদের ফরমায়েশ পূর্ণ করা হইলেও তাহারা এই মুহূর্ত্তে সত্যকে গ্রহণ করিবে না সে ক্ষেত্রে তাহারা অবিলম্বে ধ্বংস হইয়া যাইবে। অথচ আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরে সময় ও সুযোগ দেওয়ার ইচ্ছা রাখেন, তাই তাহাদের ফরমায়েশ পূর্ণ করা হয় নাই; রসুলুল্লাহ (দঃ)ও সেই উদ্যোগ নেন নাই।

হাদীছ শরীফে আছে—মক্কাবাসীরা রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিয়াছিল, আপনি ছাফা পর্ব্বতকে স্বর্ণে পরিণত করুন কিম্বা মক্কার পাহাড়গুলিকে হঠাইয়া দিন (যাহাতে আমরা ক্ষেত খামার করিতে প্রয়াস পাই। তখন আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে) রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলা হইল, ইচ্ছা করিলে আপনি তাহাদের সুযোগ দেওয়ার পথ অবলম্বন করিতে পারেন। আর ইচ্ছা করিলে তাহাদের ফরমায়েশ পূর্ণও করিতে পারেন, কিন্তু সে ক্ষেত্রে তাহারা সত্যকে অস্বীকার করিলে ধ্বংস হইবে যেরূপ তাহাদের পূর্ব্বে অনেক জাতি এই কারণে ধ্বংস হইয়াছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, না—আমি তাহাদের সুযোগ দেওয়ার পথই চাই। এই প্রসঙ্গেই আয়াত নাযেল হয়......وما منعنا (নেছায়ী শরীফ)। বেদায়াহ, ৩—৫২

প্রাইভেটভাবে নবীজীকে প্রলুব্ধ করা ঃ

কোরেশ দলপতিদের উল্লেখিত আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর তাহারা আর একটি উদ্যোগ নিল যে, নবীজীর বাড়ী যাইয়া প্রাইভেটভাবে প্রলোভন মূলক প্রস্তাব দানে তাঁহাকে প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করা হউক। সে মতে একদা তাহারা

সকলে পরামর্শে বসিল এবং সিদ্ধান্ত নিল যে, আমাদের মধ্যে সর্বাধিক বাকপটু, চতুর, পণ্ডিত শ্রেণীর এক ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হউক ; সে যাইয়া ঐ লোকটার সহিত কথা বলিবে যে আমাদের ঐক্য বিনষ্ট করিয়াছে আর আমাদের ধর্ম্মকে মন্দ বলে। সেমতে রবিয়ার পুত্র ওৎবাকে তাহারা এই কাজের জন্য নির্বাচন করিল। ওৎবা নবীজীর নিকট যাইয়া বলিল, আপনি একটি কথার উত্তর দিন—আপনি উত্তম, না—আপনার পিতা আবদুল্লাহ উত্তম ছিলেন? আপনি উত্তম, না—আপনার দাদা আবদুল মোত্তালেব উত্তম ছিলেন? নবীজী (দঃ) এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। ওৎবা বলিল, যদি তাঁহারা উত্তম ছিলেন তবে তাঁহারা ত এই সব দেবদেবীরই সেবাইত ছিলেন যাহাদের নিন্দা-মন্দ আপনি করিয়া থাকেন ; আর যদি আপনি নিজকে উত্তম মনে করেন তবে সেই কথা স্পষ্ট বলুন। আপনার ন্যায় এমন পুত্র দেখি নাই যে নিজ বংশের দুর্ভাগ্যের কারণ হয় ; আপনি আমাদের ঐক্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাদের পূজনীয়দের নিন্দা-মন্দ করেন। আপনি সমগ্র আরবে আমাদেরে লজ্জিত করিয়াছেন ; সর্বত্র বলা হয়, কোরেশদের মধ্যে একজন যাদুকর হইয়াছে, কেহ বলে পাগল হইয়াছে ইত্যাদি।

অতঃপর ওৎবা তাহার আসল কথা প্রকাশ করিল—সে নবীজী মোস্তফা (দঃ)কে লোভ-লালসার ফাঁদে ফেলিবার অপচেষ্টা করিল। ধন, প্রাধান্য ও রাজত্ব এই সর্ব্বোচ্চ লোভের বস্তু যাহার প্রস্তাব কোরেশ দলপতিগণ নবীজীর সম্মুখে প্রকাশ্য বৈঠকে দিয়াছিল ওৎবা সেই প্রস্তাবই (Praivet Poshing রূপে) পেশ করিল এবং তদুপরি একটি চতুর্থ বস্তুরও লোভ দেখাইল।

প্রবাদে বলা হয়, كل اناء يترشح بما فيه—"প্রত্যেক পাত্র হইতে ঐ বস্তুরই ফোটা নির্গত হয় যাহা উহার মধ্যে থাকে।" ওৎবা তাহার নিজ শ্রেণীর লোকদেরকে প্রলোভন দেখাইবার ন্যায় অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে ইহাও বলিল যে, আপনার যদি কামিনী-কাঞ্চনের মোহ থাকিয়া থাকে তবে তাহা বলুন ; কোরেশদের মধ্যে যে কোন রূপসী আপনি পছন্দ করিবেন দশজন চাহিলে তাহাও সংগ্রহ করিয়া আপনার বিবাহে দিয়া দেওয়া হইবে।

নবীজী মোস্তফা (দঃ) গম্ভীর স্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার বক্তব্য শেষ হইয়াছে? ওৎবা বলিল, হাঁ। নবীজী (দঃ) জ্ঞাত ছিলেন, ওৎবা আরবের একজন সুপণ্ডিত ও কবি ব্যক্তি ; সে কোরআনের মাধুর্য্য ও লালিত্ব অনুধাবন করিতে পারিবে। তাই নবী (দঃ) তাহার অশোভনীয় প্রলোভন প্রস্তাবে ক্ষুব্ধ না হইয়া পবিত্র কোরআনের সুদীর্ঘ অংশ তেলাওয়াত করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। ২৪ পারা ছুরা হা-মীম্-সেছদার প্রথম ১৩টি আয়াত তেলাওয়াত করিলেন। উক্ত আয়াত সমূহে পবিত্র কোরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং উহার প্রতি লোকদের বিরোধিতার বিবরণ দানে নবীজীর কর্ত্তব্য কর্ম্মের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে যে—বলিয়া দিন,

আমি তোমাদেরই ন্যায় মানুষ শ্রেণীর, কিন্তু আমার নিকট আল্লার অহী আসে। তোমাদের একমাত্র উপাস্য ও পূজনীয় শুধুমাত্র এক আল্লাহ; অতএব তোমরা সকলে একরোখাভাবে তাঁহারই প্রতি নিজ নিজ লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও। ভীষণ দুর্ভাগ্য ও আজাব ঐ লোকদের জন্য যাহারা আল্লার শরীক সাব্যস্ত করে, যাহারা আত্মশুদ্ধি করে না এবং পরকালকে অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে যাহারা ঈমান গ্রহণ পূর্বক নেক আমল করিবে তাহাদের জন্য অফুরন্ত প্রতিদান ও সুফল রহিয়াছে। অতঃপর সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতের বর্ণনা রহিয়াছে যে, তিনি আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্য্য ও নক্ষত্র পয়দা করিয়াছেন—সেই সর্বশক্তিমান আল্লার সঙ্গে কুফুরী-শেরেকী করার উপর বিস্ময় প্রকাশ করা হইয়াছে। অতঃপর সতর্ক করনে বলা হইয়াছে—যদি তাহারা আপনার কথা গ্রহণ না করে তবে বলিয়া দিন, আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছি, ঐরূপ আসমানী আজাব হইতে যে আজাব "আ'দ" ও "ছামুদ" জাতিকে ধ্বংস করিয়াছিল।

নবীজীর ধারনা সত্য হইল—পবিত্র কোরআনের মাধুরী মাদকের ন্যায় ওৎবাকে মত্ত করিয়া ফেলিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, একমাত্র এই মহারত্নই আপনার উদ্দেশ্য অন্য আর কোন উদ্দেশ্য নাই? নবীজী (দঃ) বলিলেন, না। তখন সে সোজা কোরেশ দলপতিদের নিকট চলিয়া গেল। ওৎবার উপর পবিত্র কোরআনের প্রতিক্রিয়া এরূপ পড়িয়াছিল যে, তাহারা তাহাকে দেখা মাত্র বলিয়া উঠিল, হায়! ওৎবা ত পূর্ব্বের ওৎবা নাই; সে ত ধর্ম্মত্যাগী (মোসলমান) হইয়া গিয়াছে! ওৎবা তাহাদের নিকট বর্ণনা দিল, আমি তাঁহার—কালাম শুনিয়াছি, খোদার কসম, আমি ঐরূপ বস্তু আর শুনি নাই। উহা কবিতাও নয়, যাদুও নয়, মন্ত্রও নয়—উহা এক অতুলনীয় ভিন্ন জিনিষ। হে আমার জাতি! তোমরা আমার পরামর্শ গ্রহণ কর; তোমরা মোহাম্মদকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) তাঁহার অবস্থার উপর স্বাধীন ছাড়িয়া দাও। খোদার কসম তাঁহার মুখে যে কালাম বা বাণী শুনিয়াছি অচিরেই উহা বিশ্বব্যাপী মহাআলোড়ন সৃষ্টিকারী হইবে। তোমরা তাঁহাকে তাঁহার কাজে স্বাধীন ছাড়িয়া দেওয়ার পর যদি আরবের অন্য লোকেরা তাঁহার দফা-রফা করিয়া দেয় তবে তোমরা নিস্তার পাইলে, আর যদি তিনি সমগ্র আরবের উপর জয়ী হয় তবে তাঁহার সম্মান তোমাদের সম্মান, তাঁহার বিজয় তোমাদের বিজয়; কারণ, তিনি তোমাদের বংশীয়। কোরেশরা ওৎবার এই উক্তি শুনিয়া বলিতে লাগিল, হায়; ওৎবা! তোমার উপর ত মোহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালাম) যাদু ক্রিয়া করিয়া ফেলিয়াছে! ওৎবা বলিল, আমার যাহা বলিবার বলিয়াছি! তোমাদের যাহা করার ইচ্ছা হয় করিতে পার। (সীরতে-মোস্তফা ১—১৩৭)

ইহুদীদের সহিত কোরেশদের যোগাযোগ ঃ

সব দিকের ব্যর্থতায় কোরেশরা বিচলিত হইয়া পড়িল; এইবার তাহারা সত্য-অসত্যের খোঁজ লাগাইবার উদ্যোগ গ্রহণ করিল। তাহাদের দুই ব্যক্তিকে ইহুদী আলেমদের নিকট মদিনায় পাঠাইয়া দিল; তাহাদের নিকট নবীগণের অনেক ইতিহাস রহিয়াছে। তাহারা ইহুদী আলেমদের নিকট নবীজীর বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাঁহার সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা সকল বৃত্তান্ত শ্রবনে বলিল, তাঁহার নিকট তিনটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে, যদি তিনি ঐ সবের উত্তর দিতে সক্ষম হন তবে বাস্তবিকই তিনি রসুল। নতুবা মিথ্যা দাবীদার; চিন্তা করিয়া তোমরা তাহার সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। (১) অতীত যুগের কতিপয় যুবক যাহারা তাহাদের দেশ ও রাজশক্তির বিরুদ্ধে এক আল্লার প্রতি ঈমান লইয়া আত্মগোপন করিয়াছিল (যাঁহাদেরে আছহাবে-কাহাফ বলা হয়—) তাঁহাদের বাস্তব ও মূল্যবান ইতিহাস আছে; সেই ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিবে। (২) অতীতে একজন এমন বাদশাহ ছিলেন যিনি দুনিয়ার সমগ্র বসতি পর্য্যটন করিয়া ছিলেন; (যাঁহাকে জুলকরনাইন বলা হয়) তাহারও ইতিহাস আছে— সেই ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিবে। (৩) রুহ বা আত্মা কি জিনিষ তাহাও জিজ্ঞাসা করিবে। এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হইলে প্রমাণ হইবে, বাস্তবিকই তিনি আল্লার রসুল; তোমরা তাঁহার কথা গ্রহণ করিবে। আর উত্তর দানে সক্ষম না হইলে মিথ্যা দাবীদার প্রমাণিত হইবে; তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় তোমরা তাহার সঙ্গে তাহাই করিবে।

ব্যক্তিদ্বয় মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কোরেশদের নিকট বলিল, সত্য-মিথ্যার বিচারের বিষয়বস্তু নিয়া আসিয়াছি—এই বলিয়া বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিল। কোরেশ দলপতিগণ ছুটাছুটি করিয়া নবীজী মোস্তফার নিকট উপস্থিত হইল এবং উক্ত তিন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল।

নবীজী (দঃ) একটু বেখেয়ালীর সহিত বলিয়া ফেলিলেন, আগামি কল্য তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিব। এইরূপ ক্ষেত্রে "ইনশাআল্লাহ—যদি আল্লাহ তৌফিক দেন" বলা প্রয়োজন সেই ব্যাপারে নবীজীর ত্রুটি হইয়া গেল। আল্লাহ তায়ালা উহার পরিণতি হইতে নবীজী (দঃ)কে রেহায়ী দিলেন না; অহীর আগমন বন্ধ রহিল। নবীজীর আশা ছিল জিব্রিল (আঃ) আসিলেই কাফেরদের প্রশ্ন জ্ঞাত করিবেন বা এমনিতেই সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে অহী আসিয়া যাইবে এবং সব অবগত হইয়া তাহাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়া দিবেন, তাই তিনি বলিয়াছিলেন, আগামি কল্য তোমাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়া দিব। কিন্তু "ইনশা-আল্লাহ" না বলার কারণে দীর্ঘ পনর বা আঠার দিন জিব্রিলের আগমন স্থগিত

রহিল। আগামি কল্যের স্থলে যতই দিন কাটিতে লাগিল কাফেরদের জয়ঢাক পিটানো ততই বাড়িয়া চলিল যে, মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) বলিয়াছিলেন, আগামি কল্যই আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিবেন; অথচ দীর্ঘদিন চলিল তিনি উত্তর দানে সক্ষম হইলেন না। নবীজীও অত্যন্ত বিচলিত ও চিন্তিত হইলেন; এক দিকে অহীর আগমণ বন্ধ হওয়া অপর দিকে কাফেরদের ঢাক-ঢোল পিটাইয়া দুর্ণাম ছড়ানো। পনর বা আঠার দিনের ভোর বেলা হইতে ঐ অবস্থা চরম আকার ধারণ করিল; ঠিক ঐ দিনই ছুরা কাহাফের সুদীর্ঘ বর্ণনা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের ঘটনাদ্বয়ের বিবরণে নাযেল রইল। উহার মধ্যেই নবীজী (দঃ)কে সর্ব্বদার জন্য সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল—

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ -

وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ -

"কস্মিনকালেও কোন বিষয় সম্পর্কে এই কথা "ইনশাআল্লাহ" ব্যতিত বলিবেন না যে, আমি আগামি কল্য এই কাজ করিব; যদি ভুল হইয়া যায় তবে যথাসত্তর স্মরণ করিয়া নিবেন আপনার প্রভুকে।"

এইছুরার মধ্যে বর্ণিত আছহাবে কাহাফের ঘটনা এবং বাদশাহ জুল-করনাইনের ঘটনা সুদীর্ঘরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে ১৫ পারা ১০ রুকুর প্রথম আয়াতটি নাযেল হইল*—

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ - قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا

أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا -

"তাহারা আপনাকে রুহ বা আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; আপনি উত্তরে বলুন, রুহ আমার প্রভুর আদেশে সৃষ্ট একটি বস্তু। (অর্থাৎ কোন metreal) উপাদান ছাড়া শুধু আল্লাহ তায়ালার "কুন—হইয়া যাও" আদেশে সৃষ্ট। যেহেতু উপাদান ছাড়া সৃষ্ট বস্তু, তাই উহা তোমাদের অথবা কোন মানুষের বোধগম্য হইবে না।) তোমাদিগকে অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান-বিন্দুই দান করা হইয়াছে।

---

* মদিনাতে স্বয়ং ইহুদীরাও নবী (দঃ)কে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছিল তাহাদের উত্তর দানেও নবী (দঃ) এই আয়াত তেলওয়াত করিয়াছিলেন। বেদায়াহ ৩—৫৩

প্রশ্নত্রয়ের উত্তর পাইয়া সত্যকে উপলব্ধি করার সুযোগ তাহাদের হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের পলীদ—অপবিত্র অন্তর সেই পথে অগ্রসর হইল না; তাহারা বিকল্প পথ আবিষ্কারের চেষ্টা করিল।

আপোশ প্রচেষ্টা ঃ

কোরেশ দলপতিগণ এক পর্য্যায়ে একটা আপোশ মিমাংসার প্রস্তাবও নবীজীর নিকট পেশ করিল। তাহাদের প্রস্তাব ছিল এই যে, আমাদের উভয় পক্ষের পরস্পর একে অন্যের ধর্ম্ম মতের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইতে হইবে। সে মতে আমরা এক বৎসর আপনার খোদার উপাসনা করিয়া নিব; উহার বিনিময়ে আপনি আমাদের দেবদেবীদের উপাসনা এক বৎসর করিবেন—এইভাবে বৎসরের পর বৎসর চলিতে থাকিবে। এই প্রস্তাব বাতিল ও প্রত্যাখ্যান করার জন্য কোরআনের ছুরা "কুল-ইয়া আইয়্যুহাল-কাফেরুন" নাযেল হয়; যার মর্ম্ম এই—

আপনি বলিয়া দিন, হে কাফেরের দল। আমি উপাসনা করি না যাহাদের উপাসনা তোমরা কর; তোমরাও বন্দেগী কর না যাহার বন্দেগী আমি করি। (আমার ও তোমাদের মধ্যেকার এই ব্যবধান চিরস্থায়ী; সংমিশ্রনের আপোষ সুদূর পরাহতই নয় শুধু অসম্ভবও বটে।) তোমাদের উপাস্যদের উপাসনা আমি করিব আর আমার উপাস্যের উপাসনা তোমরা করিবে—এই পরিকল্পনা কখনও বাস্তবতার মুখ দেখিবে না। (হাঁ—এখনকার মত আপোশ এই হইতে পারে যে—) তোমরা ত তোমাদের ধর্ম্মে স্বাধীন আছ; আমিও আমার ধর্ম্মে স্বাধীন থাকিব। (আমি তোমাদেরকে বাধা দিব না, তোমরাও আমাকে বাধা দিবে না।)

নির্য্যাতনের তুফান আরম্ভ হইয়া গেল ঃ

মক্কাবাসীরা নবীজী মোস্তফাকে দমাইবার সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হইল; এই ব্যর্থতা তাহাদেরে বেসামাল করিয়া তুলিল। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গোত্রীয় প্রভাব এবং আবুতালেবের ন্যায় ব্যক্তির আশ্রয় বাহ্যিকরূপে এক সুকঠিন বাধা ছিল তাঁহার জীবন সংহার ব্যবস্থা গ্রহণে। তাই অগ্নিমূর্ত্তি দস্যুদল লেলীহান হইয়া উঠিল নবীজীর শিষ্য ও ভক্তদের প্রতি; বিশেষতঃ যাঁহারা ছিলেন দুর্ব্বল। দস্যুরা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, মোসলমানদিগকে নানা অত্যাচারে জর্জ্জরিত করিয়া ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করিতে হইবে। এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না; পুরা দমে চলিল অত্যাচার, উৎপীড়ন ও নির্য্যাতন—যাহাতে অনেকে জীবনও হারাইলেন। কোরেশরা মোসলেমদের প্রতি কিরূপ অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্তে তাহা উপলব্ধি করা পাঠকের জন্য সহজ হইবে।

সায়্যেদুনা বেলাল রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ঃ

তিনি ছিলেন আফ্রিকার কালা মানুষ ; মক্কার সর্দ্দার এবং ইসলামের অন্যতম শত্রু উমাইয়্যার ক্রীতদাস। সায়েদ্যনা বেলাল (রাঃ) ইসলামের জন্য অমানুষিক অত্যাচার ভোগে এবং সর্ব্বপ্রকার উৎপীড়নের মধ্যেও দৃঢ়পদ থাকায় যে ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া ছিলেন উহা নজীরহীন। বেলালের প্রভু নরাধম উমাইয়্যা যখন শুনিতে পাইল, তাহারই গৃহে তাহার দাস মোসলমান হইয়াছে তখন সে ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল। বেলালকে ডাকিয়া সম্মুখে আনিল এবং চাবুক লইয়া ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িল। চাবুকের আঘাতে আঘাতে বেলাল রক্তাক্ত হইয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে আহাদ্. আহাদ্—মাবুদ এক, মাবুদ এক এই শব্দ ছাড়া আর কিছু নয়। বেলালের অনমনীয় ভাব দেখিয়া উমাইয়্যা আরও ক্রোধ হইল—এত বড় আস্পর্দ্ধা। অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিল। দুপুর বেলা আরবের অগ্নিময় উত্তাপে প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত পাথরের উপর উন্মুক্ত আকাশ তলে বেলালকে চিতভাবে শোওয়াইয়া দেওয়া হইত এবং বুকের উপর ভারী পাথরের চাপা দিয়া দেওয়া হইত যেন পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে না পারে, কোন সময় তাপদগ্ধ মরু বালুকার উপর ঐরূপ অবস্থা করা হইত। এই অবস্থায় বেলালকে বলা হইত, বাঁচিতে চাহিলে মোহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) ধর্ম্ম ত্যাগ কর, কিন্তু বেলালের মুখে একই শব্দ আহাদ, আহাদ।

কোন সময় গরুর কাঁচা চামড়ায় লেপটাইয়া কোন সময় লৌহবর্ম্ম পড়াইয়া অগ্নিবৎ রোদ্রে ফেলিয়া রাখা হইত ; সর্বাবস্থায় বেলালের একই জপনা—আহাদ, আহাদ। এই শ্রেণীর লোমহর্ষক অত্যাচারেও যখন বেলালের জপে পরিবর্ত্তন আসিল না তখন পাষাণ্ড উমাইয়্যা এক অদ্ভুত শাস্তির ব্যবস্থা করিল। নিকৃষ্ট পশুর ন্যায় বেলালের গলায় দড়ি বাঁধিয়া তাঁহাকে দুষ্ট ছেলেদের হাতে অর্পণ করা হইত। ঐ নিষ্ঠুররা বেলালের গলরজ্জু ধরিয়া টানিতে টানিতে মক্কার পথে হৈ হৈ রবে তামাশা করিয়া বেড়াইত এবং টানিয়া হেচড়াইয়া মারিয়া পিটিয়া আধমরা অবস্থায় সন্ধাবেলা বেলালকে উমাইয়্যার বাড়ী দিয়া আসিত। রাত্রি বেলায় বেলাল যখন সারা দিন ক্ষুধার যন্ত্রণায় অবসন্ন তখন তাঁহাকে এক সঙ্কীর্ণ নির্জ্জন প্রকোষ্টে আবদ্ধ করিয়া চাবুক মারা হইত এবং বলা হইত এখনও ইসলাম ত্যাগ কর, কিন্তু বেলাল অনড় অটল।

কি দৃশ্য ! ক্ষুধার তাড়নায় প্রাণ বাহির হইতে উদ্যত, বেত্রাঘাতে দেহ জর্জ্জরিত রক্তঝরায় সর্বাঙ্গ অভিসিক্ত বটে, কিন্তু নরাধম উমাইয়্যার কোন উদ্দেশ্যই সফল হয় না ; বেলাল তাঁহার ধৈর্য্য দৃঢ়তা ও বিশ্বাসে পর্ব্বত সদৃশ্য, তাঁহার মুখে একই ঘোষণা—আহাদ, আহাদ, আহাদ।

সায়্যেদুনা বেলাল (রাঃ) অগ্নি পরীক্ষায় চরম সাফল্য লাভ করিলেন; আল্লাহ তায়ালার করুনা তাঁহার জন্য নামিয়া আসিল। একদা আবুবকর (রাঃ) চলার পথে বেলালের মর্ম্মান্তিক দুর্দশা দেখিয়া দারুণ মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি পাষণ্ড উমাইয়্যাকে বলিলেন, এই গরীবকে আর কত অত্যাচার করিবে? তোর কি খোদার ভয় হয় না? উমাইয়্যা বলিল, তোমরাই ত তাহাকে খারাব করিয়াছ; এখন তোমরাই তাহাকে ছাড়াইয়া নেও। আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ভাল কথা—আমার একটি ক্রীতদাস আছে তোমাদের ধর্ম্মমতের এবং খুব শক্তিশালী; তাহার সঙ্গে বিনিময় করিয়া নেও। উমাইয়্যা সম্মত হইল; আবুবকর (রাঃ) ঐরূপে সায়্যেদুনা বেলাল (রাঃ)কে ছাড়াইয়া আনিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন। সায়্যেদুনা বেলাল (রাঃ) মোসলমানদের নিকট এতই সম্মানিত ছিলেন যে, খলীফা ওমর (রাঃ) বলিয়া থাকিতেন, আবুবকর (রাঃ) আমাদের সর্দার ও মহান তিনি আমাদের আর এক সর্দার ও মহানকে মুক্ত করিয়াছেন। (সীরতে-মোস্তফা, ১—১৬০)

খাব্বাব (রাঃ)

ইসলামের জন্য অগ্নি পরীক্ষার আর এক শিকার তিনি; উম্মে-আনমার নামক এক দুরাত্মা নারীর ক্রীতদাস ছিলেন তিনি। সেই হতভাগিনী তাঁহাকে সর্বদা অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট করিত, এমনকি একদা জলন্ত অঙ্গার বিছাইয়া উহার উপর তাঁহাকে শোয়াইয়া দেওয়া হইল, আর এক পাষণ্ড তাঁহার বুকের উপর পা দিয়া চাপিয়া রাখিল। খাব্বাবের গায়ের চর্ব্বি বিগলিত হইয়া উহাতে সেই অগ্নি-অঙ্গার নির্ব্বাপিত হইল। খাব্বাব (রাঃ) বাঁচিয়া থাকিলেন, কিন্তু তাঁহার পিঠে ধবল কুষ্ঠের ন্যায় ঐ দাহের চিহ্ন বসিয়া ছিল।

অনেক সময় তাঁহাকে লৌহবর্ম্ম পরাইয়া অগ্নিবৎ উত্তাপে ফেলিয়া রাখা হইত। কোন সময় উলঙ্গ শরীরে উত্তপ্ত বালুর উপর শোয়াইয়া রাখা হইত; চামড়ার নীচের চর্ব্বি বিগলিত হইয়া চামড়া বিদীর্ণ হইত এবং বিগলিত চর্ব্বি বহিয়া পড়িত। তাঁহার কোমরে ঐরূপ জখমের বহু চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। খলীফা ওমর (রাঃ) একদা তাঁহার অত্যাচারিত হওয়ার চিহ্ন দেখিতে চাহিলে তিনি তাঁহাকে নিজ কোমরের ঐ চিহ্ন সমূহ দেখাইয়া ছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার মালিক পাষণ্ডিনীর অন্তরও হয়ত নরম হইতে বাধ্য হইল সে তাঁহাকে মুক্তি দিয়া দিল।

আম্মার পরিবার:

ইসলামের জন্য অকথ্য অত্যাচার ভোগের আর এক শিকার আম্মার (রাঃ) এবং তাঁহার মাতাপিতা। তাঁহার পিতার নাম "ইয়াসের" অন্য দেশের বাসিন্দা;

ইয়াসের মক্কায় আসিয়া আবু হোযায়ফা নামক ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব করেন এবং তথায়ই বসবাস অবলম্বন করেন। আবু হোযায়ফার একটি দাসী ছিল "সুমাইয়্যা" ঐ দাসীকে সে ইয়াসেরের নিকট বিবাহ দিয়া দেয়; তাঁহার গর্ভে আম্মার জন্ম লাভ করেন; এই সূত্রে আম্মার (রাঃ) আবু হোযায়ফার দাস পরিগণিত হন, কিন্তু সে তাঁহাকে মুক্তি দিয়া দেয়।

আম্মার (রাঃ) এবং তাঁহার মাতাপিতা সকলেই মক্কায় অতিশয় দুর্বল ও নিম্ন শ্রেণীর পরিগণিত ছিলেন। তাঁহারা তিন জনই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং প্রত্যেকেই ভীষণভাবে অত্যাচারিত হন; এমনকি সেই অত্যাচারেই প্রথমত পিতা ইয়াসের (রাঃ) ইন্তেকাল করেন। অতঃপর একদা মাতা সুমাইয়্যা (রাঃ)কে অগ্নিবৎ রৌদ্রে দাঁড় করিয়া শাস্ত দেওয়া হইতেছিল নর পিশাচ আবুজহল ঐ পথে যাইতে ছিল; সেই পাষণ্ড পিশাচ সুমাইয়্যা (রাঃ)কে তাঁহার লজ্জাস্থানে বর্শাঘাত করে; তথায়ই তিনি শাহাদতবরণ করেন। অনেকের মতে ইসলামের পথে সর্ব্বপ্রথম যাঁহার রক্তে জমিন রঞ্জিত হয় তিনি ছিলেন এই সুমাইয়্যা (রাঃ)। ইসলামের পথে পিতা এবং মাতা উভয়েই দুনিয়া ত্যাগ করিলেন, আম্মার (রাঃ) বাঁচিয়া আছেন; তাঁহার উপর অস্বাভাবিক অত্যাচার চলিল। তাঁহাকেও উত্তপ্ত বালুর উপর শোয়াইয়া রাখা হইত; কোন সময় জলন্ত অঙ্গার বিছাইয়া উহার উপর শোয়ানো হইত। একদা এই অবস্থায় নবী (দঃ) তাঁহার নিকট দিয়া যাইতে ছিলেন; নবীজী মোস্তফা (দঃ) স্বীয় মোবারক হস্ত তাঁহার মাথায় বুলাইলেন এবং দোয়া করিলেন— "হে আগুন! আম্মারের জন্য শান্তিদায়ক ঠাণ্ডা হইয়া যাও; যেরূপ ইব্রাহীমের জন্য হইয়াছিলে" (আলাইহেচ্ছালাম)।

আম্মার (রাঃ)কে তাঁহার পিতামাতাসহ একত্রে তিন জনকে শাস্তি দান অবস্থায় কোন কোন সময় নবীজী (দঃ) নিজ চোখে দেখিতেন। নবীজী (দঃ) ঐ অবস্থায় তাহাদিগকে বলিতেন, হে ইয়াসের-পরিবার; ছবর কর ধৈর্য্য ধর। কোন সময় দোয়া করিতেন—হে আল্লাহ! ইয়াসের-পরিবারের মাগফেরাত করিয়া দাও। কোন সময় নবীজী (দঃ) তাহাদের সৌভাগ্যকে চরমে পৌঁছাইয়া বলিতেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর: বেহেশ্‌ত তোমাদের আকাঙ্খায় রহিয়াছে। (সীরতে মোস্তফা, ১—১৬২)

আবুফোকায়হা—য়্যাসার (রাঃ) ঃ

সায়্যেদুনা বেলালের অত্যাচারী মনিব পাষণ্ড উমাইয়্যারই পুত্র ছাফওয়ানের ক্রীতদাস ছিলেন আবুফোকায়হা (রাঃ)। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে পাষণ্ড উমাইয়্যা তাঁহার পায়ে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া-হেচড়াইয়া তাঁহাকে নির্য্যাতন করিত। কোন সময় পায়ে লোহার বেড়ী লাগাইয়া উত্তপ্ত বালুর উপর অধঃমুখী শোয়াইয়া

রাখিত। একদিন দুরাত্মা উমাইয়্যা তাঁহাকে উর্দ্ধমুখী শোয়াইয়া তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিল; ঐ সময় পাপিষ্ঠ উমাইয়্যার ভ্রাতা আর এক নরাধম উবাই আসিয়া বলিল, আরও শক্ত ও কঠিনভাবে তাহার গলা টিপিয়া ধর। পাপিষ্ঠ উমাইয়্যা তাহাই করিল, এমন কি সকলেই ভাবিল, আবুফোকায়হার জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়া পাপিষ্ঠেরা তথা হইতে চলিয়া গেল; তিনি সচেতন হইলেন এবং সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

আবুবকর (রাঃ) একদা তাঁহার চরম দুর্দশা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলেন এবং তাঁহাকে ক্রয় করিয়া নিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন। (সীরতে-মোস্তফা ১,-১৬৪)

যনীরাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা ঃ

তিনিও ক্রীতদাসী ছিলেন; ইসলামের অপরাধে তাঁহার উপরও অমানুষিক অত্যাচার হইতে লাগিল। অসহনীয় অত্যাচারের ফলে তাঁহার চক্ষুদ্বয় বিনষ্ট হইয়া গেল; পাষণ্ডরা বলিতে লাগিল, আমাদের দেবী "লাৎ" এবং "ওজ্জা" তাহাকে অন্ধ করিয়া দিয়াছে। তিনি বলিলেন, লাৎ ও ওজ্জা ত এরূপ অপদার্থ যে, তাহাদের পূজারী সম্পর্কেও তাহাদের কোন খবর নাই। আমার যাহা হইয়াছে আল্লার আদেশে হইয়াছে; আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করিলে আমার চক্ষু ভালও হইয়া যাইতে পারে। সত্য সত্যই ঐ দিনই ভোর বেলা নিদ্রা হইতে উঠিলে তাঁহার চক্ষুদ্বয় সম্পুর্ণ ভাল ছিল। তাঁহাকেও আবুবকর (রাঃ) ক্রয় করিয়া মুক্তি দান করিয়াছিলেন। (সীরতে-মোস্তফা, ১—১৬৫)

এতদ্ভিন্ন নাহ্‌দিয়াহ্‌ এবং তাঁহার কন্যা, লবীনা, মোয়াম্মেলিয়্যাহ্‌, উম্মে-আব্‌স— তাঁহারা সকলেই ক্রীতদাসী ছিলেন এবং মোসলমান হওয়ার অপরাধে অত্যাচারের জাঁতাকলে পিষ্ট হইতেছিলেন। আবুবকর (রাঃ) একে একে প্রত্যেককেই ক্রয় করিয়া মুক্তি দান করতঃ নির্য্যাতন হইতে বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যেরূপ পুরুষদের মধ্যে বেলাল, আবুফোকায়হা এবং আমের ইবনে ফোহায়রা তাঁহারাও ক্রীতদাস ছিলেন; মোসলমান হওয়ার অপরাধে অত্যাচারে নিষ্পেষিত হইতেছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেককে আবুবকর (রাঃ) ক্রয় করিয়া মুক্তিদানে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। (সীরতে-মোস্তফা, ১—১৬৬)

দুনিয়ার কোন লাভ বা স্বার্থ ছাড়া শুধু নিপীড়িত মোসলমানকে উদ্ধারকরণে আবুবকর (রাঃ) তাঁহার ধন এইরূপ অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন। নবী (দঃ) তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন, "আমার উপর জান-মালের সর্ব্বাধিক উপকার যাঁহার রহিয়াছে তিনি হইলেন আবুবকর" (রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু)।

১৬৭৭। হাদীছ:— (৫৪৩ পৃ:) عن قيس قال سمعت خبابا

يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في

ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقلت ألا تدعو الله

فقعد وهو محمر وجهه فقال لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد

ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه عن دينه ويوضع الميشار

على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه وليتمن

الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما

يخاف إلا الله والذئب على غنمه (ولكنكم تستعجلون*)

অর্থ—খাব্বাব (রা:)↑ বর্ণনা করিয়াছেন, (যখন আমরা মুষ্টিমেয় ইসলাম গ্রহণকারী লোক মোশরেকদের জুলুম অত্যাচারের ষ্টিম রোলারে নিষ্পেষিত হইতে ছিলাম তখনকার ঘটনা—) একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কা'বা গৃহের ছায়ায় স্বীয় চাদর খানা মাথার নীচে দিয়া শোয়া অবস্থায় ছিলেন। তখন আমি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম, (আমরা ত কাফেরদের অত্যাচারে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছি;) আমাদের জন্য আল্লার নিকট দোয়া করুন, আল্লার নিকট সাহায্য তলব করুন! এতচ্ছ্রবণে হযরত (দঃ) শোয়াবস্থা হইতে উঠিয়া বসিলেন এবং (রাগের দরুন) তাঁহার চেহারা মোবারক রক্তবর্ণ হইয়া গেল। অত:পর তিনি বলিলেন, তোমাদের পুর্ব্বেও ঈমান ও ইসলামের জন্য মানুষকে বহু কষ্ট যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছে—এক একজন মানুষকে দ্বীন ও ঈমান হইতে ফিরাইবার জন্য লোহার চিরুণী দ্বারা শরীরের মাংস ও হাড়ের উপরের মাংসপেশী পর্য্যন্ত আঁচড়াইয়া ফেলা হইত; এত কষ্ট যাতনাও তাহাকে দ্বীন-ঈমান হইতে ফিরাইতে পারিত না এবং (জমিনের মধ্যে তাহার পা গাড়িয়া*) করাত দ্বারা মাথা হইতে চিরিয়া তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া

---

* বন্ধনীর মধ্যবর্তী বাক্যটি ৫১০ পৃষ্ঠার রেওয়ায়াতে উল্লেখ আছে।

↑ খাব্বাব (রা:) বিশিষ্ট ছাহাবী ছিলেন, তিনি প্রাথমিক ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম একজন ছিলেন। তিনিও বেলাল রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় কাফেরদের অমানুষিক অত্যাচারে নিষ্পেষিত হইয়াও দীন ঈমানকে আঁকড়াইয়া ছিলেন; পূর্ণ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

ফেলা হইত, তাহাও তাহাকে দ্বীন-ঈমান হইতে ফিরাইতে পারিত না—সব কিছু সহ্য করতঃ দ্বীন-ঈমানকে আঁকড়াইয়া থাকিত।

(তোমরা ধৈর্য্য ধর, দ্বীন-ইসলামের এই অবস্থা থাকিবে না,) নিশ্চয় নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা দ্বীন-ইসলামকে অতিশয় শক্তিশালী করিবেন, সারা বিশ্বে ইহার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিবেন। এমনকি একজন মোসলমান ইয়ামন দেশের সানা এলাকা হইতে সুদূর হাজ্‌রামউত পর্য্যন্ত একা একা ছফর করিতে পারিবে; এক আল্লাহ ভিন্ন এবং বন-জঙ্গলের বাঘ-ভাল্লুক ছাড়া কোন মানুষের ভয় তাহাকে করিতে হইবে না। (দ্বীন-ইসলামের এইরূপ প্রভাব-প্রতিপত্তি, শক্তি ও শান্তির দিন নিশ্চয় আসিবে, অবশ্য উহা একটু সময় সাপেক্ষ।) কিন্তু তোমরা ঐ অবস্থা অতি তাড়াতাড়ি চাহিতেছ (যাহা বাঞ্ছনীয় নহে—তোমাদিগকে সময়ের অপেক্ষায় ধৈর্য্য ধারণ করিতে হইবে।)

পরীক্ষার ফল :

হেনা বা মেহেদি পাতা দুলালীদের হাতকে কত সুন্দর রং দেয়; পেষিত না হইয়া কি সেই পাতা ঐ রং দিতে পারে? رنگ لاتی ہے حنا پس جانے کے بعد— "পেষিত হওয়ার পরেই হেনার রং বিকশিত হয়।" ইসলামের অপূর্ব্ব প্রাণশক্তিও ঠিক তদ্রূপই। ইসলামের জন্য নিষ্পেষণের মাত্রা যতই বাড়িতে থাকে ভিতর হইতে খাঁটী ইসলামের শক্তি ততই প্রকাশ পাইতে থাকে। ইতিহাস এইরূপ একটি নজীরও পেশ করিতে পারিবে না যে, ঐ সকল অমানুষিক উৎপীড়ন ও নির্য্যাতনে মোসলমান একটি প্রাণীও ইসলাম হইতে চুল পরিমাণ বিচ্যুত হইয়াছিল। দুরাচার বিধর্ম্মীরা তাহাদের পাশবিকতা প্রকাশের শক্তির সর্ব্বশেষ বিন্দু ব্যয় করিত আর ইসলামের অনুরক্ত ভক্তগণ আত্মত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা এবং অসাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত ইসলামের গৌরব ও মহিমা অকাতরে প্রকাশ করিয়া যাইতেন। كذلك الايمان اذا خالط بشاشته القلوب "ঈমান ও ইসলামের আভা-প্রতিভা যখন অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া যায় তখন উহার স্থিরতা এইরূপ পর্ব্বত সদৃশই হইয়া থাকে" (৬ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)।

সম্ভ্রান্তগণের উপরও অত্যাচার :

বলা বাহুল্য—শুধু কেবল নিঃস্ব দরিদ্র দুর্ব্বল মোসলমানদের উপরই অত্যাচার উৎপীড়ন সীমাবদ্ধ ছিল না। দেশ জোড়া যখন মোসলমানদের উপর অত্যাচারের ঝড় সৃষ্টি হইল এবং অত্যাচারিরা উগ্র হইয়া পড়িল তখন উত্তেজনার মুখে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও কোন কোন ঘটনায় অমানুষিক অত্যাচারের কবলে পতিত হইলেন।

আবুবকর সিদ্দীক রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর একটি ঘটনা—মোসলমানদের সংখ্যা চল্লিশ পৌঁছিতেছে এই সময় আবুবকর (রাঃ) অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন, ইসলামের আহ্বান প্রকাশ্যে চালাইবার। নবী (দঃ) প্রথমে অস্বীকার করিলেন, কিন্তু আবুবকরের পীড়াপীড়িতে পরে তাহা মঞ্জুর করিলেন। এমনকি সকল মোসলমানগণ সহ হরম শরীফের মসজিদে উপস্থিত হইলেন। তথায় প্রকাশ্য ভাষণ দানে আবুবকর দণ্ডায়মান হইলেন। একজন মোসলমানের পক্ষ হইতে ইসলামের সাধারণ বক্তৃতা সর্ব্বপ্রথম উহাই। বক্তৃতা শুধু আরম্ভই ছিল তৎক্ষণাৎ কাফের-মোশরেক দল চতুর্দিক হইতে মোসলমানদের উপর ঝাপিয়া পড়িল। আবুবকর (রাঃ) বিশিষ্ট সম্ভ্রান্তরূপে গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু উত্তেজনার মুখে তিনিও রেহাই পাইলেন না—তাঁহার উপরও ভীষণ প্রহার পড়িল। বেদম প্রহারে তাঁহার মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত এরূপ জখম ও রক্তাক্ত হইল যে, তাঁহাকে চেনা যাইত না, তিনি বেহুশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার বংশের লোকেরা সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিল এবং অচৈতন্য অবস্থায় তাঁহাকে উঠাইয়া বাড়ী নিয়া যাওয়া হইল। কাহারও আশা ছিল না যে তিনি এত আঘাতে বাঁচিতে পারিবেন; তাই তাঁহার বংশের লোকেরা ঘোষণা দিল, যদি আবুবকরের মৃত্যু হইয়া যায় তবে প্রতিশোধে আমরা রবিয়া-পুত্র-ওৎবাকে খুন করিব, কারণ আবুবকর (রাঃ)কে প্রহারে সে-ই সর্ব্বাগ্রে ছিল।

আবুবকর (রাঃ) সারাদিন অচেতন অবস্থায় রহিলেন, এমনকি শত ডাকিলেও উত্তর পাওয়া যাইত না। সন্ধার দিকে ডাক দেওয়া হইলে তিনি কথা বলিলেন; চেতনা লাভের পর তাঁহার সর্বপ্রথম কথা ছিল এই যে, নবীজীর কি অবস্থা?

এই কথায় বংশের লোকেরা ভীষণ দুঃখিত ও বিরক্ত হইল যে, যাহার সঙ্গে থাকায় এত বিপদ এই মুহূর্ত্তে আবার তাহারই নাম। বিরক্ত হইয়া সকলে তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গেল; তাঁহার মাতাকে বলিয়া গেল যে, তাঁহাকে কিছু খাওয়াইবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার মাতা কিছু খাদ্য তৈরী করিয়া আনিলে তিনি মাতাকে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, নবীজীর অবস্থা কি? বিরক্তির সহিত মাতা বলিলেন, আমি তাহা কি জানি?

উম্মে-জমীল নাম্নী এক মোসলমান মহিলা ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার ইসলাম সাধারণভাবে গোপন রাখিয়াছিলেন। আবুবকর (রাঃ) তাঁহার ইসলাম জ্ঞাত ছিলেন, তাই তিনি আশা করিলেন, ঐ মহিলা হয়ত নবীজীর সংবাদ নিশ্চয় জ্ঞাত হইবেন। সে মতে আবুবকর (রাঃ) তাঁহার মাতাকে বলিলেন, আপনি উম্মে-জমীলের নিকট যাইয়া নবীজীর অবস্থা জ্ঞাত হইয়া আসুন, তারপরে আমি খানা খাইব। মা তাহাই করিলেন, কিন্তু তিনি উম্মে-জমীলের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নবীজীকে চিনেন বলিয়াও স্বীকার করিলেন না। তবে তিনি বলিলেন, তোমার

পুত্রের সংবাদে মনে খুব ব্যথা লাগিয়াছে ; চল আমি তাহাকে দেখিয়া আসিব। উম্মে-জমীল (রাঃ) আবুবকর (রাঃ)কে দেখিয়া কাঁদিয়া দিলেন ; আবুবকর (রাঃ) তাঁহাকে নবীজীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি গোপনে আবুবকরের মাতার ভয় প্রকাশ করিলেন। আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, তাঁহার কোন ভয় করিও না, তখন উম্মে-জমীল বলিলেন, নবীজী (দঃ) অক্ষত ও সুস্থ আছেন। আবুবকর জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি এখন কোথায় আছেন ? উম্মে-জমীল বলিলেন, তিনি এখন আরক্বামের গৃহে আছেন। তখন আবুবকর (রাঃ) কসম করিয়া বলিলেন—যাবৎ নবীজীকে দুই নয়নে না দেখিব তাবৎ কোন পানাহার গ্রহণ করিব না।

এই অবস্থায় আবুবকর পানাহার গ্রহণ করিবেন না—ইহা কি মায়ের প্রাণ মানিয়া লইতে পারে ? রজনী যখন গভীর হইয়া আসিল ; লোকজনের চলাচল বন্ধ হইয়া গেল তখন মা আবুবকর (রাঃ)কে গোপনে আরক্বামের গৃহে পৌঁছাইলেন। নবীজী (দঃ)কে পাইয়া আবুবকর (রাঃ) তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন ; নবীজী (দঃ)ও আবুবকরকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিলেন। উপস্থিত মোসলমানগণও আবুবকর (রাঃ)কে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন ; কারণ তাঁহার অবস্থা দেখাও অসহনীয় ছিল।

আবুবকর (রাঃ) ঐ সময়ই স্বীয় মাতার ইসলামের জন্য নবীজীর নিকট দোয়ার দরখাস্ত করিলেন। নবীজী (দঃ) দোয়া করিলেন এবং তাঁহাকে ইসলামের আহ্বান জানাইলে তৎক্ষণাৎ তিনি মোসলমান হইয়া গেলেন। (হেকায়াতে-ছাহাবা—৩০৩)

এতদ্ভিন্ন অভিজাত সম্ভ্রান্তদের কেহ মোসলমান হইলে তিনি দুর্ব্বলদের ন্যায় যত্রতত্র সকলের যথেচ্ছ দুর্ব্যবহারের শিকার না হইলেও নিজ গোত্রীয় ও বংশীয় লোকদের দ্বারা এবং আত্মীয়-স্বজনের দ্বারা অবশ্যই উৎপীড়িত হইতেন।

ওসমান (রাঃ) মক্কার একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ও সম্পদশালী লোক ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলে তাঁহার বংশীয় লোকেরা তাঁহার উপর ক্ষেপিয়া উঠিল ; তাঁহার পিতৃব্য হস্তপদ বাধিয়া তাঁহাকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করিত। তাহাদের অত্যাচারে তিনি বাধ্য হইয়া সস্ত্রীক দেশ ত্যাগ করতঃ আবিসিনিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

নরাধম নরপিশাচরা মোসলমানদের প্রতি অত্যাচার করিতে করিতে এতই উগ্র ও উন্মাদ হইয়া পড়িল যে, স্বয়ং নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবনেও নানারূপ কষ্ট-যাতনার সৃষ্টি করিতে লাগিল। হযরতের ঘরে-দুয়ারে মরা-পঁচা, গান্ধ-গলিত ফেলিয়া তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল (তবকাতে-ইবনে সায়াদ ১—২০১)।

পথে-ঘাটে হযরতের মাথার উপর ধূলা-বালু ছুড়িয়া মারিত এবং তাঁহার উপর আঘাত করিতে এবং তাঁহাকে উৎপীড়ন উত্যক্ত করিতেও কুণ্ঠিত হইত না।

প্রথম খণ্ড হাদীছ ১৭১ নং হাদীছে তাহাদের ঐরূপ একটি জঘন্য ঘটনার বিবরণ রহিয়াছে। নিম্নের হাদীছটিও উহারই নমুনা—

১৬৭৮। হাদীছ ঃ—(৫১৯ পৃঃ) عن عروة بن الزبير قال

سَأَلْتُ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبِرْنِي بِأَشَدِّ شَيْءٍ صَنَعَهُ الْمُشْرِكُونَ

بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُصَلِّي فِي حِجْرِ الْكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ فِي

عُنُقِهِ فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى أَخَذَ بِمَنْكِبِهِ وَدَفَعَهُ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ

اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ *

অর্থ—ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম ছাহাবী) আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)কে আমি বলিলাম, মক্কার মোশরেকেরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর যে অমানুষিক জুলুম-অত্যাচার করিয়াছে উহা হইতে একটা জঘণ্যতম ঘটনা শুনান ত।

তিনি বলিলেন, একদা নবী (দঃ) বাইতুল্লাহ্ শরীফের হাতীমে নামায পড়িতে ছিলেন। হঠাৎ দুষ্ট ওক্বাহ্ ইবনে আবী-মোয়া'য়েৎ তথায় আসিয়া হযরতের কাপড় গলায় জড়াইয়া ভীষণভাবে হযরতের গলায় চিপা দিল।

আবুবকর (রাঃ) দৌড়িয়া আসিলেন এবং ওক্বার কাঁধে ধরিয়া ধাক্কা দিয়া তাহাকে নবী (দঃ) হইতে হটাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, তোমরা একটি লোককে এই জন্য মারিয়া ফেলিতে চাও যে, তিনি বলেন, আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার আল্লাহ; অথচ তিনি তাঁহার দাবীর উপর তোমাদের প্রভূর তরফ হইতে কত কত উজ্জ্বল প্রমাণ পেশ করিয়াছেন!

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং ছাহাবাদের উপর মোশরেকদের তরফ হইতে যে সব লোমহর্ষক জুলুম-অত্যাচার হইয়াছিল উহা ইসলামের ইতিহাসে রক্তাক্ষরে বর্ণিত রহিয়াছে। এ স্থলে ঐ সবের নমুনা উল্লেখ করিলেও উহাতেই বড় বই হইয়া যাইবে। মোট কথা এই যে, নবুয়তের চতুর্থ বৎসর হইতে ঐসব জুলুম-অত্যাচার আরম্ভ হয় এবং ক্রমান্বয়ে উহা বিভিষিকাময় আকার ধারণ করিতে থাকে।

আবুতালেব কর্ত্তৃক হযরতকে রক্ষা করার ভার গ্রহণ ঃ

মোসলমানদের সেই ঐতিহাসিক দুর্দ্দিনে কতেক জন মোসলমান ছিলেন বেলাল (রাঃ) ও ছোহায়েব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় ক্রীতদাস শ্রেণীর, তাঁহাদের উপর ত জুলুম-অত্যাচারের কোন সীমাই ছিল না। তদ্রূপ যাঁহারা মুক্ত কিন্তু দুর্ব্বল শ্রেণীর ছিলেন তাঁহাদের উপরও পৈশাচিক অত্যাচারই হইতেছিল। আর যাঁহারা প্রভাবশালী ছিলেন তাঁহাদের উপরও অত্যাচার হইত, কিন্তু তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও গোত্রীয় রক্ষাবুহ্য কিছুটা সহায়কের কাজ করিত। বিশেষতঃ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পক্ষে ঐরূপ সহায়তার অছিলা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতের লীলাই ছিল—

হযরতের পিতার স্থলে তাঁহার লালন-পালনের ভার বহনকারী দাদা আবদুল মোত্তালেবের মৃত্যুও হযরতের শৈশবকালে হইয়া যায়, তৎপর হযরতের চাচা আবুতালেব তাঁহার লালন-পালনের ভার লইয়াছিলেন। আট বৎসর বয়স হইতে হযরতের ন্যায় চরিত্রবান ছেলের লালন-পালনকারী আবুতালেবের অন্তর হযরতের মায়া-মহব্বত ও স্নেহ-মমতায় পরিপূর্ণ ছিল এবং দীর্ঘ দিনের এই স্নেহ-মমতার ছাপ তাঁহার অন্তরে এমন ভাবে পাকা পোক্তা হইয়া গিয়াছিল যে, কোন পরিস্থিতিতেই তিনি উহাকে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না।

হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই দুর্দ্দিনে আবুতালেবের সেই অকৃত্রিম স্নেহ-মমতাকেই আল্লাহ তায়ালা হযরতের জন্য বাহ্যিক রক্ষাবুহ্য বানাইয়া দিলেন। তখন আবুতালেব মক্কার মধ্যে একজন অন্যতম শক্তিশালী ও প্রভাবশালী সরদার পরিগণিত ছিলেন। তাঁহার ইশারার উপর কোরায়েশ বংশীয় বৃহত্তম দুইটি গোত্র বনু হাশেম ও বনু-মোত্তালেবের প্রতিটি মানুষ জীবন দানে দাঁড়াইয়া যাইত। সেই আবুতালেব হযরতের রক্ষণাবেক্ষণে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। এই বিষয়টি মক্কার মোশরেকদের পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা ব্যক্তিগত ভাবে এবং একাধিকবার প্রতিনিধিত্ব মূলক রূপে আবুতালেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে বারণ করার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল।

মোশরেকেরা হযরতের বিরুদ্ধে যতই ষড়যন্ত্র আঁটিল আবুতালেব ততই হযরতের সাহায্যে দৃঢ়তা অবলম্বন করিলেন, এমনকি শেষ পর্য্যন্ত আবুতালেব মক্কাবাসীদের মোকাবিলায় স্বীয় শক্তিকে দৃঢ়তর করার জন্য বনী-হাশেম ও বনী-মোত্তালেবের সকলকে একত্রিত করিয়া হযরতের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিতে উদ্বুদ্ধ করিলেন। সকলেই তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিল এবং সমবেতভাবে সর্ব্বাবস্থায় হযরতকে সাহায্য সহায়তা করার ঘোষণা জারী করিয়া দিল।

নবুয়তের পঞ্চম বৎসর—আবিসিনিয়া বা হাব্‌সায় হিজরত (৫৪৬ পৃঃ)

মক্কার প্রভাবশালী দুইটি গোত্র বনী-হাসেম ও বনী-মোত্তালেবের শক্তি ও সমর্থনে পুষ্ট আবুতালেবের সাহায্য সহায়তার দরুন হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে মোশরেকগণ তাহাদের ইচ্ছানুরূপ জুলুম-অত্যাচার করিতে কিছুটা বাধার সম্মুখীন হইয়া ছাহাবীগণের উপর তাহাদের সমুদয় ঝাল মিটাইবার উন্মাদনায় মত্ত হইয়া পড়িল। তাহাদের উপর এমন ভাবে অত্যাচারের ঝড় বহাইয়া দিল যে, উহা সহ্য করিয়া নেওয়া কোন প্রাণীর পক্ষেই সাধ্যকর ছিল না।

তদুপরি বড় কষ্ট মোসলমানদের এই ছিল যে, তাঁহারা সকলে এবাদৎ-বন্দেগী আদায় করার সুযোগ পাইতেন না, কোরআন পাঠ করিতে পারিতেন না! দৈহিক নির্যাতন অপেক্ষা এই নির্যাতন মোসলমানদের পক্ষে অধিক বেদনাদায়ক ছিল।

এতদৃষ্টে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবীগণকে বলিলেন, যাহার ইচ্ছা হয় জীবন বাঁচাইয়া স্বীয় দ্বীন-ঈমান রক্ষার জন্য আবাসিনিয়ায় চলিয়া যাইতে পার। তথাকার শাসনকর্ত্তা একজন সুপ্রকৃতির লোক, সে কাহারও উপর কোন জুলুম-অত্যাচার করে না। নবুয়তের পঞ্চম বৎসর রজব মাসে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এই অনুমতি প্রদান করেন, সেমতে ছাহাবীগণের মধ্যে হইতে বার জন আবিসিনিয়ায় হিজরত করিলেন। তন্মধ্যে মাত্র চার জন নিজের সঙ্গে স্ত্রীকেও লইয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং আট জন স্ত্রী-পুত্র সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতঃ নিঃসঙ্গরূপেই হিজরত করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ মত অনুসারে মোট ষোল জনের একটি দল মক্কা ত্যাগ করতঃ আবিসিনিয়ার দিকে রওয়ানা হইলেন। (১) ওসমান গনী (রাঃ) (২) এবং তাঁহার স্ত্রী হযরতের কন্যা রোকেয়া (রাঃ) (৩) আবু হোজায়ফা (রাঃ) (৪) এবং তাঁহার স্ত্রী সাহ্‌লা বিনতে সোহায়ল (রাঃ) (৫) আবু সালামাহ্ (রাঃ) (৬) এবং তাঁহার স্ত্রী উম্মে-সালামাহ (রাঃ) (৭) আমের ইবনে রবীয়া'হ (রাঃ) (৮) এবং তাঁহার স্ত্রী লায়লা (৯) সোহায়েল (রাঃ) (১০) আবু সোবরাহ্ (রাঃ) (১১) হাতেব ইবনে আমর (রাঃ) (১২) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) (১৩) আবদুর রহমান ইবনে আ'উফ (রাঃ) (১৪) যোবায়ের (রাঃ) (১৫) মোছয়া'ব ইবনে ওমায়ের (১৬) এবং দলপতি ওসমান ইবনে মজউ'ন (রাঃ)।

এই দলটিই ছিল এই উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম আল্লার জন্য এবং দ্বীন ও ঈমানের জন্য স্বীয় দেশ-খেস সর্বস্ব ত্যাগকারী। দ্বীন-ইসলামের জন্য তাঁহারা জন্মভূমি ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজনের মায়া ত্যাগে দেশান্তরিত হইতে বাধ্য হইলেন। নরপিশাচরা জানিতে পারিলে এই কাজেও বাধার সৃষ্টি করিবে, তাই তাঁহারা গোপনে মক্কা

হইতে পদব্রজে বাহির হইয়া পড়েন এবং (লোহিত সাগরের কিনারায় পৌঁছিয়া বাণিজ্য নৌকায় আরোহন করেন। মক্কার কাফেররা সংবাদ পাইয়া তাঁহাদিগকে পাকড়াও করিবার জন্য পেছনে ধাওয়া করে, কিন্তু তাহাদের পৌঁছিবার পূর্বেই নৌকা ছাড়িয়া যায়। (যোরকানী ১—২৭১)

মক্কাবাসীদের মোসলমান হইয়া যাওয়ার গুজব ঃ

মোসলমানগণ আবিসিনিয়ায় পৌঁছিলেন, হযরতের বাক্য অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হইল—তাঁহারা তথায় পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করিলেন। ইতিমধ্যে মক্কায় একটি ঘটনা ঘটিল—"একদা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসালাম ছুরা "নজ্‌ম" তেলাওয়াত করিলেন, উহাতে সেজদার আয়াত আছে; তিনি সেজদা করিলেন, তাঁহার সঙ্গে উপস্থিত মোসলমানগণ সেজদা করিলেন সঙ্গে সঙ্গে তথায় উপস্থিত মোশরেকরাও সেজদায় পড়িয়া গেল।" ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ ১ম খণ্ড ৫৬৯ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

মোসলমানদের সঙ্গে মোশরেকরাও সেজদা করিয়াছে এই সংবাদটি চতুর্দিকে এই আকারে ছড়াইয়া পড়িল যে, মক্কাবাসী মোশরেকগণ মোসলমান হইয়া গিয়াছে, এমনকি এই খবর আবিসিনিয়ায়ও পৌঁছিয়া গেল। মোসলমানগণ তথায় রজব মাসে পৌঁছিয়াছিলেন। রমজান মাসে সেজদার ঘটনা ঘটিয়াছিল (তব্‌কাতে ইবনে সায়া'দ ১—২০৬)। শাওয়াল মাসেই কিছু সংখ্যক মোসলমান আবিসিনিয়া হইতে মক্কাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মক্কার নিকটবর্ত্তী পৌঁছিলে পর তাঁহারা মূল বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং ইহাও জানিতে পারিলেন যে, বর্ত্তমানে মক্কায় জুলুম-অত্যাচারের ঝড় অধিক বেগে বহিতেছে। তখন কতেক জন ত পুনঃ আবিসিনিয়ায় চলিয়া আসিলেন এবং কতেক জন মক্কায় আসিয়া কাহারও আশ্রয়ে রহিলেন। (আছাহ্‌-হুস্‌সিয়ার ৮৮)

কিন্তু মক্কায় মোসলমানদের উপর বিশেষতঃ যাহারা আবিসিনিয়া হইতে ফিরিয়া আসিলেন তাঁহাদের উপর ভয়াবহ জুলুম-অত্যাচার চলিতে লাগিল। অবস্থা দৃষ্টে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম পুনরায় ছাহাবীগণকে আবিসিনিয়ায় চলিয়া যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। ছাহাবীগণ দ্বিতীয়বার গোপনে গোপনে আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া যাইতে লাগিলেন। এইবার দলবদ্ধাকারে না যাইয়া ভিন্ন ভিন্ন গেলেন। এইবার সর্ব্বপ্রথম আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ভ্রাতা জা'ফর (রাঃ) গিয়াছিলেন।

নবুয়তের ষষ্ঠ বৎসর—মোসলমানদের পক্ষে কতিপয় শুভ লক্ষণ ঃ

"কষ্টের সঙ্গেই মিষ্ট লাভ" ইহা নির্দ্ধারিত সাধারণ নিয়ম। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন,—

إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا নিশ্চয় কষ্টের সঙ্গে মিষ্ট আছে, দুঃখের সঙ্গে সুখ আছে, দুর্ভোগের সঙ্গে মঙ্গল আছে। নিশ্চয় কষ্টের সঙ্গে মিষ্ট আছে………।

মোসলমানদের পক্ষেও এই নীতির উদয় হইল। মক্কার দুরাচাররা মোসলমানদেরে দমাইবার ও ধর্ম্মান্তর করার জন্য অত্যাচারের শেষ সীমা ছাড়াইয়া গেল, কিন্তু মোসলমানগণ বিন্দুমাত্র দমিলেন না, দীন-ঈমানের জন্য যথা সর্ব্বস্ব ত্যাগে দেশান্তরিত হইতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হইলেন না, ভীষণতম দুর্ভোগও তাঁহাদের সত্য-সাধনের অগ্রাভিযানে বাধার সৃষ্টি করিতে পারিল না। প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহারা নূতন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিয়া দ্বীন-ঈমানে পর্ব্বত অপেক্ষা অধিক অটল হইয়া রহিলেন। এই শঙ্কা উদ্বেগ অগ্নি-পরীক্ষা ও কঠোর নির্য্যাতনের অন্ধকার মাঝে মঙ্গলের বিজলী চমকিতে আরম্ভ করিল।

নবুয়তের ষষ্ঠ বৎসর মোসলমানদের ভাগ্যাকাশে মঙ্গল ও শুভ লক্ষণের তিনটি নক্ষত্র উদিত হইল।

প্রথমটি হইল এক নব ইতিহাসের সূচনা—মোসলমানদের বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতম ষড়যন্ত্র করিতে গিয়া মক্কার কাফেরদের জঘন্যরূপে পরাজয় বরণ। ঘটনার বিবরণ এই—মোসলমানগণ পর পর মক্কা ত্যাগ করতঃ আবিসিনিয়ায় যাইতে লাগিলেন কেহ একা আর কেহ পরিবারবর্গ সহ। এইরূপে সর্ব্বমোট ৮৩ জন পুরুষ এবং ১৮ জন মহিলা তথায় পৌঁছিলেন।

তথাকার শাসনকর্ত্তা বাদশাহ ছিলেন অতিশয় ভাল লোক, তাঁহার নাম ছিল "আছ্‌হা'মাহ্‌" তিনি ঈসায়ী বা খৃষ্টান ধর্ম্মের ছিলেন, কিন্তু তিনি মোসলমানদিগকে অতি আদর যত্নের সহিত তথায় বসবাসের সুযোগ প্রদান করিলেন।

মক্কার মোশরেকদের নিকট আবিসিনিয়ায় মোসলমানদের সুখ-শান্তি ও সুযোগ-সুবিধার খবর পৌঁছিতে লাগিল, ইহাতে তাহারা খুবই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাহারা মোসলমানদের তথাকার সুখ-শান্তি নষ্ট করার চেষ্টা তদবীরে লাগিয়া গেল। এমনকি নবুয়তের ষষ্ঠ বৎসরের শেষ দিকে আবিসিনিয়ার বাদশাহকে প্রভাবান্বিত করার জন্য এবং তথা হইতে প্রবাসী মোসলমানদিগকে বাহির করিয়া দিতে সম্মত করার জন্য তাহারা একটি প্রতিনিধি দল পাঠাইবার ব্যবস্থা করিল। তাহারা আরবের প্রসিদ্ধ কুটনীতিবিদ আম্‌র-ইব্‌নুল-আছ* এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবী রবীয়া'হকে* বহু রকম উপঢৌকন সঙ্গে দিয়া তথায় পাঠাইল। তাহারা দুইজন আবিসিনিয়ায় যাইয়া প্রথমতঃ তথাকার সরদারগণকে অনেক রকম উপঢৌকন পেশ করিয়া বুঝাইল যে, মক্কার কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোক তাহারা স্বীয় বাপ-দাদার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া দেশে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতেছিল মক্কাবাসীগণ তাহাদিগকে

* তাঁহারা উভয়ে [illegible] করিয়াছিলেন।

শাস্তি প্রদান করিয়াছে; তাহারা তথা হইতে পলায়ন করিয়া আপনাদের দেশে আসিয়া স্থান লইয়াছে, আমরা তাহাদিগকে ধরিয়া দেশে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি। আপনারা এই দেশের সরদার, আপনারা বাদশাহকে এই ব্যাপারে আমাদের কথায় সম্মত করাইবার জন্য আমাদের সাহায্য করিবেন। বাদশাহ যেন তাহাদিগকে কিছু বলিবার সুযোগ না দিয়া তাহাদিগকে আমাদের হাতে সোপর্দ্দ করেন, কারণ আমরা তাহাদের সম্পর্কে সব কিছু জানি।

অতঃপর তাহারা সরদারগণকে লইয়া বাদশার দরবারে উপস্থিত হইল এবং অনেক কিছু উপঢৌকন পেশ করতঃ মোসলমানদের সম্পর্কে ঐরূপ মন্তব্যই করিল এবং তাহাদিগকে দেশে লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব পেশ করিল। সরদারগণও বাদশাহকে অনুরোধ করিল যে, তাহাদিগকে ইহাদের হাতে সোপর্দ্দ করিয়া দেওয়া হউক। ইহাতে বাদশাহ রাগান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, তাহারা আমার আশ্রয় লইয়াছে; অতএব আমি তাহাদিগকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিতে পারি না। অবশ্য তাহাদিগকে সম্মুখেই ডাকিয়া আনিতেছি। উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে সকলেরই বক্তব্য শুনা হইবে। যদি তোমাদের বক্তব্য সত্য হয় তবে তাহাদিগকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করা হইবে, নতুবা তাহাদিগকে অধিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হইবে।

অতঃপর মোসলমানগণকে ডাকা হইল; তাঁহারা অবিলম্বে কিংকর্ত্তব্য স্থির করার জন্য তাড়াহুড়ার মধ্যে একত্রে সমবেত হইয়া পরামর্শ করিলেন। তাঁহারা জা'ফর (রাঃ)কে বক্তব্য পেশকারী মনোনীত করিলেন এবং এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আমাদিগকে ধর্ম্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে আমরা ইসলাম ও ঈমানের খাঁটি বক্তব্যই পেশ করিব; নবীজী (দঃ) আমাদিগকে যাহা কিছু শিক্ষা দিয়াছেন সবই প্রকাশ করিয়া দিব কিছুই গোপন করিব না; তাহাতে আমাদের পরিণাম যাহাই হউক হইবে।

মোসলমান দল বাদশার দরবারে উপস্থিত হইলেন। বাদশার দরবারে তাঁহার সকল পরিষদবর্গ তাহাদের ধর্ম্মীয় পুস্তক লইয়া উপস্থিত আছে এবং মক্কা হইতে আগত প্রতিনিধিদ্বয় বাদশার দুই দিকে উপবিষ্ট রহিয়াছে। তখনকার রীতি ছিল—বাদশার দরবারে উপস্থিত হইয়া প্রথমে তাঁহাকে সেজদা করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইত। মোসলমান দল বাদশার দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সুধু সালাম করিলেন, সেজদা মোটেই করিলেন না। উপস্থিত সকলেই আপত্তি জানাইল যে, তোমরা বাদশাকে সেজদা কেন করিলে না? মোসলমানদের পক্ষে জা'ফর (রাঃ) বলিলেন, আমরা একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও সেজদা করি না। তাহারা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতি তাঁহার রসুল প্রেরণ করিয়াছেন,

সেই রসুল আমাদিগকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, আমরা যেন এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহাকেও সেজদা না করি। (যোরকানী ১—২৮৮)

অতঃপর স্বয়ং বাদশার তরফ হইতে মোসলমানগণকে প্রশ্ন করা হইল যে, তোমরা আমার ধর্ম্মেও নও বর্ত্তমান যুগের কোন ধর্ম্মেও নও—সব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যে ধর্ম্ম তোমরা লইয়াছ উহা কি ধর্ম্ম? তদুত্তরে জা'ফর (রাঃ) এক সুদীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন—

হে বাদশাহ! আমরা অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত বর্ব্বর জাতি ছিলাম, আমরা গর্হিত দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকিতাম। মরা খাইতে এবং ব্যভিচার করিতে দ্বিধা বোধ করিতাম না, আত্মীয়তা ছেদন করিতাম, পাড়া-প্রতিবেশীর উপর জুলুম অত্যাচার করিতাম; আমাদের মধ্যে সবল দুর্ব্বলকে গ্রাস করিয়া ফেলিত; আমাদের গোটা জাতির অবস্থাই এইরূপ ছিল। এমতাবস্থায় আমাদের প্রতি আল্লার রসুল প্রেরিত হইয়াছেন, যিনি আমাদের মধ্যকারই একজন লোক, আমরা তাঁহার বংশ পরিচয় পূর্ণরূপে অবগত আছি এবং তাঁহার সত্যবাদিতা, আমানতদারী ও পবিত্রতা সম্পর্কেও পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছি। তিনি আমাদিগকে এই আহ্বান জানাইয়াছেন যে, আমরা যেন আল্লার প্রতি ঈমান আনি, আল্লাকে এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া বিশ্বাস করি এবং একমাত্র তাঁহারই উপাসনা ও এবাদৎ করি। আর আমরা এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ, যে পাথর ইত্যাদি দ্বারা তৈরী মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকিতাম আমরা যেন ঐসব ত্যাগ করি। তিনি আমাদিগকে সত্যবাদিতা আমানতদারী, আত্মীয়তা রক্ষা, প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার এবং হারামকারী ও নরহত্যা হইতে বাঁচিয়া থাকার আদেশ করিয়াছেন। ব্যভিচার, মিথ্যা, এতিমের মাল হরণ এবং কাহারও প্রতি মিথ্যা তোহ্‌মত লাগাইতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে বিশেষরূপে আদেশ করিয়াছেন, আমরা যেন আল্লার সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক না করি। এতদ্ভিন্ন তিনি আমাদিগকে নামায, যাকাত ও রোযার আদেশ করিয়াছেন। জা'ফর (রাঃ) এইরূপে ইসলামের আহকামসমূহ বাদশার সম্মুখে ব্যক্ত করিয়া বলিলেন যে, আমরা সেই রসুলকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া নিয়াছি। তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং তিনি আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে আমাদের জন্য যে জীবন-বিধান আনিয়াছেন আমরা উহার অনুসারী হইয়াছি, ফলে আমরা এক আল্লার এবাদত করি, আল্লার সঙ্গে কোন বস্তুকে শরীক বা সাথী সাব্যস্ত করি না। আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য যাহা বৈধ করিয়াছেন উহাকে আমরা বৈধরূপে গ্রহণ করিয়াছি এবং যাহা অবৈধ করিয়াছেন উহা বর্জ্জন করিয়াছি।

আমাদের উক্ত কার্য্যধারার উপরই মক্কাবাসীরা আমাদের উপর অমানুষিক জুলুম অত্যাচার করিয়াছে, আমাদিগকে ভয়াবহ কষ্ট-যাতনা দিয়াছে এবং আমাদিগকে আমাদের প্রাণ প্রিয় ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, যেন আমরা আল্লার এবাদত ছাড়িয়া মূর্ত্তি পূজায় লিপ্ত হই, অবৈধসমূহকে বৈধরূপে গ্রহণ করি। যখন তাহারা আমাদের উপর জুলুম-অত্যাচার করিয়াছে এবং আমাদিগকে নিষ্পেষিত করিয়াছে এবং আমাদের ধর্ম্ম পালনে তাহারা আমাদের সম্মুখে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন আমরা বাধ্য হইয়া আমাদের দেশ ত্যাগ করিয়াছি। আপনার ন্যায়-নিষ্ঠার সুখ্যাতি থাকায় অন্য কোন বাদশার প্রতি খেয়াল না করিয়া আপনার রাজ্যে আসিয়াছি ; আমরা আপনার আশ্রয়ের আশা করিয়াছি। হে বাদশাহ। আমরা আশা রাখি, আপনার আশ্রয়ে থাকিয়া কাহারও দ্বারা অত্যাচারিত হইব না।

বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের রসুল আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে যাহা লাভ করিয়াছেন উহার কোন অংশ কি এখন আপনার স্মরণে আছে ?

অতি বিচক্ষন আল্লাহভক্ত ছাহাবী জা'ফর (রাঃ) স্থান কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া পবিত্র কোরআন ছুরা মরয়্যামের প্রথম অংশ সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। উহাতে মনোমুগ্ধকর সুমধুর ও সুগম্ভীর ভাষায় হযরত ঈসা (আঃ) এবং তাঁহারই একান্ত ঘনিষ্ট হযরত ইয়্যাহ্ইয়ার জন্ম বৃত্তান্ত ও মহত্ত্ব বর্ণিত ছিল। হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে সরল সুবোধগম্য যুক্তির মাধ্যমে ইহুদী ও খৃষ্টান উভয়ের চরমপন্থীদের বিভিন্ন গর্হিত মতবাদ ও বিশ্বাসের প্রতিবাদ ছিল। উল্লেখিত বিষয়বস্তু এবং ইসলামের উদার সত্য প্রিয়তা—এই সব এক সঙ্গে সভাস্থলে একটা নূতন ভাবের তরঙ্গ বহাইয়া দিল। ঐ বাদশাহ ঈসায়ী বা খৃষ্টান ছিলেন এবং অতিশয় ন্যায়-নিষ্ঠাবান ছিলেন ; হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত সত্যের আলো পাইয়া তিনি মুগ্ধ, স্তম্ভিত ও অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এমনকি তিনি আত্মসম্বরণ শূন্য হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন ; তাঁহার অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল।

ঘটনার বর্ণনাকারী শপথ করিয়া বলেন, সমুদয় বৃত্তান্ত ও পবিত্র কোরআন শুনিয়া বাদশা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার দাড়ি ভিজাইয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার উপস্থিত পরিষদবর্গও কাঁদিয়া সম্মুখস্থ পুস্তক ভিজাইয়া ফেলিল। বাদশাহ পবিত্র কোরআন সম্পর্কে মন্তব্য করিলেন যে, ইহা এবং হযরত ঈসা যেই বাণী নিয়া আসিয়াছিলেন (তথা ইঞ্জিল কেতাব) উভয় একই জ্যোতিঃকেন্দ্র হইতে আবির্ভূত।

বাদশাহ মক্কা হইতে আগত ব্যক্তিদ্বয়কে দরবার হইতে—বাহির হইয়া যাওয়ার নির্দ্দেশ দিলেন এবং পরিষ্কার বলিয়া দিলেন যে, খোদার কসম—তোমাদের হস্তে এই লোকগণকে কখনও সোপর্দ্দ করিব না এবং তাঁহাদিগকে কোন প্রকার বিব্রতও করা হইবে না, তাঁহারা আমার দেশে শান্তিতে বসবাস করিবে।

মক্কা হইতে আগত লোকদ্বয় বাদশার দরবার হইতে বহিষ্কৃত হইয়াও স্বীয় চেষ্টা পরিত্যাগ করিল না। আম্‌র ইবনুল আ'ছ স্বীয় সঙ্গীকে বলিল, আগামী কল্য মোসলমানদের এমন একটি অভিযোগ খাড়া করিব যদ্দারা তাহারা অবশ্যই সুযোগ-সুবিধা হারাইবে। বাদশাহ নাছরানী—তাহাদের আক্বিদা এই যে, হযরত ঈসা খোদার বেটা। আমি আগামী কল্য বাদশাহকে বলিয়া দিব যে, মোসলমানগণ হযরত ঈসাকে খোদার বান্দা বলিয়া থাকে—খোদার বেটা স্বীকার করে না।

সত্য সত্যই পরদিন তাহারা বাদশার দরবারে উপস্থিত হইল এবং বলিল, হে বাদশাহ! মোসলমানগণ হযরত ঈসা সম্পর্কে সাংঘাতিক কথা বলিয়া থাকে। তাহাদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করুন, তাহারা হযরত ঈসা সম্পর্কে কি বলে ?

বাদশাহ মোসলমানগণকে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। মোসলমানগণ প্রথমে নিজেরা একত্র হইয়া পরামর্শ করিলেন যে, হযরত ঈসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দেওয়া হইবে। নাছরানী বাদশার সম্মুখে এই বিষয়টি মোসলমানদের পক্ষে সর্ব্বাধিক বড় বিপদ ছিল, কিন্তু সকলে এই সিদ্ধান্তই করিলেন যে, আমাদের পরিণাম যাহাই হউক, আমরা হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে উহাই বলিব, যাহা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। মোসলমানগণ বাদশার দরবারে উপস্থিত হইলে বাদশাহ তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিলেন, হযরত ঈসা সম্পর্কে আপনারা কি বলিয়া থাকেন ? তাঁহার সম্পর্কে আপনাদের মতবাদ কি ?

জা'ফর (রাঃ) উত্তর করিলেন, আমরা উহাই বলি যাহা আমাদের নবী (দঃ) আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, তিনি আল্লার বান্দা ও আল্লার রসুল ছিলেন ; তাঁহার আত্মা আল্লার বিশেষ আদেশ বলে পাক পবিত্র কুমারী মরয়্যামের গর্ভে পৌঁছিয়া ছিল।

এই বক্তব্য শুনিয়া বাদশাহ মাটি হইতে একটি খড় বা কুটা উঠাইয়া উহার প্রতি ইশারা করতঃ মন্তব্য করিলেন, হযরত ঈসার মর্ত্তবা উক্ত বর্ণনা হইতে এই খড় পরিমাণও অধিক নহে। বাদশার এই মন্তব্যে তাহার পরিষদবর্গ নাক ছিট্‌কাইয়া উঠিল, তাই বাদশাহ ইহাও বলিলেন যে, যদিও তোমরা নাক ছিট্‌কাও।

অতঃপর বাদশাহ মোসলানগণকে বলিয়া দিলেন, আপনারা আমার দেশে সর্ব্বপ্রকার নিরাপত্তা ভোগ করিবেন এবং তিনবার ইহাও বলিলেন যে, যে কেহ আপনাদিগকে মন্দ বলিবে তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আমাকে যদি স্বর্ণের পাহাড়ও দেওয়া হয় তবুও আমি আপনাদের কোন ব্যক্তিকে একটু মাত্র কষ্ট দিব না। বাদশাহ মক্কা হইতে আগত সমুদয় উপঢৌকন ফেরৎ দেওয়ার নির্দ্দেশও দিলেন, ফলে মক্কা হইতে প্রেরিত লোকদ্বয় ব্যর্থ ও অপদস্ত হইয়া তথা হইতে বিতাড়িত হইল এবং মোসলমানগণ সুখ-শান্তির সহিত নিরাপদে তথায় বসবাস করার অধিক সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। (সীরতে ইবনে হেশাম ১)

বাদশাহ আবিসিনিয়াবাসী জনসাধারণ এবং তথাকার পাদ্রীগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমি বিশ্বাস করি যে, (মোসলমানগণ যাঁহার কথা বলিতেছেন) তিনি আল্লার রসুল এবং তিনি ঐ রসুল যাঁহার সম্পর্কে হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামের ইঞ্জিল কেতাবের মধ্যে ভবিষ্যদ্বানী রহিয়াছে। আমি যদি রাষ্ট্রিয় কর্য্যে আবদ্ধ না থাকিতাম তবে আমি তাঁহার নিকট অবশ্যই উপস্থিত হইতাম।

এই বাদশার অন্তরে তখন হইতেই ইসলাম স্থান লাভ করে, অতঃপর চৌদ্দ বৎসর পরে তথা হিজরী সাত সনে যখন হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) সারা বিশ্বের প্রধান ব্যক্তিদের নিকট ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইয়া পত্র লিখিয়া ছিলেন তখন সর্ব্বপ্রথম এই বাদশার প্রতি বিশেষ দূত ছাহাবী আম্‌র ইবনে উমাইয়া জামরী (রাঃ) মারফত দুইটি পত্র লিখিয়া ছিলেন। একটি ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইয়া, দ্বিতীয়টি ব্যক্তিগত একটি বিষয়ে এবং মক্কা হইতে আবিসিনিয়ায় আগত সকল মোসলমানকে মদিনায় প্রেরণ করার জন্য।

হযরতের লিপি তাঁহার দরবারে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তিনি লিপির সম্মানার্থে স্বীয় সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন এবং লিপিখানাকে মাথার উপর বরণ করিয়া লইলেন। আর জা'ফর (রাঃ)কে ডাকিয়া তাঁহার হস্তে আনুষ্ঠানিক রূপে ইসলাম গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ণ শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রকাশ করিয়া হযরতের লিপির উত্তর প্রদান করিলেন এবং দ্বিতীয় পত্রের মর্ম্মানুযায়ী দুইটি বড় বড় সামুদ্রিক নৌকায় তথাকার মক্কাবাসী মোসলমানগণকে পাঠাইয়া দিলেন।

অষ্টম বা নবম হিজরী সনে আবিসিনিয়ায়ই তাঁহার মৃত্যু হয় (তবকাতে ইবনে ছা'য়াদ ১—২৫৮)। মদিনায় থাকিয়া নবী (দঃ) ওহী মারফত তাঁহার মৃত্যু সংবাদ অবগত হইয়া মদিনার ছাহাবীগণ সহ তাঁহার গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করেন* এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ সৌভাগ্যসূচক মন্তব্য করেন যাহা হাদীছে আছে—

* সম্রাট আছ্‌হা'মাহ্‌ শাহে আবিসিনিয়া যিনি মোসলমানগণকে তাঁহার দেশে আশ্রয় দিয়াছিলেন। সপ্তম হিজরী সনে তাঁহারই নিকট হযরতের লিপি প্রেরিত হইয়াছিল এবং তিনি পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য রাষ্ট্রীয় কার্য্যে আবদ্ধতার দরুন তিনি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। অবশেষে অষ্টম হিজরীতে বা নবম হিজরীর প্রারম্ভে আবিসিনিয়ায় তাঁহার মৃত্যু হইলে পর মদিনায় থাকিয়া হযরত নবী (দঃ) তাঁহার জানাযার নামায আদায় করিয়াছিলেন।

তাঁহার পর আবিসিনিয়ার সিংহাসনের অধিকারী যে ব্যক্তি হইয়াছিলেন হযরত নবী (দঃ) তাঁহার নিকটও নবম হিজরী সনে লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম সম্পর্কে এবং ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কোন তথ্য জানা নাই, বরং অনেকে তাহাকে কাফের বলিয়াছেন।

মোসলেম শরীফের এক হাদীছে এই দ্বিতীয় বাদশাহ এবং তাহার প্রতি লিপি যাহা নবম হিজরীতে লেখা হইয়াছিল উহারই উল্লেখ রহিয়াছে। (ফতহুল বারী ৮—১০৫)

১৬৭৯। হাদীছ ঃ— (৫৪৭ পৃঃ) عن جابر رضى الله تعالى عنه

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ مَاتَ النَّجَاشِىُّ مَاتَ الْيَوْمَ

رَجُلٌ صَالِحٌ فَقُوْمُوْا عَلَى أَخِيْكُمْ أَصْحَمَةَ -

অর্থ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যেদিন নাজাশী—আবাসিনিয়ার বাদশার মৃত্যু হইল ঐ দিনই হযরত নবী (দঃ) বলিলেন, অদ্য একজন নেককার লোকের মৃত্যু হইয়াছে ; তোমরা সকলে চল, তোমাদেরই ভ্রাতা (আবিসিনিয়ার বাদশাহ) আছ্‌হামার জানাযার নামায আদায় কর।

(রসুলের মুখে "নেককার" আখ্যা কতই না সৌভাগ্য জনক।)

১৬৮০। হাদীছ ঃ— عن جابر رضى الله تعالى عنه

أَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِىِّ فَصَفَّنَا وَرَاءَهُ

فَكُنْتُ فِى الصَّفِّ الثَّانِىْ أَوِ الثَّالِثِ -

অর্থ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (মদিনায় থাকিয়া) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আবিসিনিয়ার বাদশার জন্য জানাযার নামায পড়িয়াছেন। আমাদিগকে নিয়মিতভাবে তাঁহার পেছনে সারিবদ্ধরূপে দাঁড় করাইলেন ; আমি দ্বিতীয় বা তৃতীয় সারিতে উপস্থিত ছিলাম।

১৬৮১। হাদীছ ঃ—(৫৪৮ পৃঃ) عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لَهُمُ النَّجَاشِىَّ صَاحِبَ

الْحَبَشَةِ فِى الْيَوْمِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ وَقَالَ اِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ - صَفَّ بِهِمْ

فِى الْمُصَلّٰى فَصَلّٰى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যেদিন আবিসিনিয়ার বাদশার মৃত্যু হইল ঐ দিনই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) (মদিনায়) ছাহাবীগণকে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ জানাইলেন এবং সকলকে বলিলেন, তোমরা তোমাদের ভ্রাতার জন্য মাগফেরাতের দোয়া কর এবং জানাযার নামায পড়ার নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া সকলকে সারিবদ্ধ রূপে দাঁড় করাইলেন। অতঃপর তাঁহার প্রতি জানাযার নামায পড়িলেন এবং চারি তকবীরে নামায আদায় করিলেন।

আবুবকরের আবিসিনিয়া হিজরতের প্রস্তুতি ঃ

দীর্ঘ দিন যাবৎ বিভিন্ন ছাহাবীগণ পর পর হাব্‌শা বা আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া যাইতেছিলেন। আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুও নিজ গোষ্টি-জ্ঞাতি মোশরেকদের অত্যাচারে অতিষ্ট হইয়া পড়িলেন। মন ভরিয়া নামাজ পড়া প্রাণ খুলিয়া পবিত্র কোরআন তেলাওত করার অভাব ও বাধা তাঁহাকে এতই ব্যথিত করিল যে, এই ব্যথা-বেদনাকে তিনি কোন মতেই সহ্য করিয়া উঠিতে পারিলেন না। নিরুপায় হইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট তিনিও আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি চাহিলেন। হযরত (দঃ) তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। আবুবকর (রাঃ) মক্কা হইতে যাত্রা করিলেন; দুই দিনের পথ অতিক্রমের পর মক্কার পার্শ্ববর্ত্তী এলাকার প্রসিদ্ধ "কারাহ" গোত্রের সর্দ্দার ইবনে-দাগেনার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহাকে মক্কা ত্যাগে বাধা দিলেন এবং যাত্রা ভঙ্গ করিয়া মক্কায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য করিলেন (বেদায়াহ, ৩—৯৩)। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নের হাদীছে রহিয়াছে।

১৬৮২। হাদীছ ঃ—(৫৫২ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মাতা-পিতাকে চিনিবার বয়স হইতেই আমি তাঁহাদের উভয়কে দ্বীন-ইসলামের উপর দেখিতে পাইয়াছি এবং আমাদের সঙ্গে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এত অধিক ঘনিষ্টতা ছিল যে, একটি দিনও ফাঁক যাইত না যে, হযরত (দঃ) সকালে বা বিকালে আমাদের বাড়ীতে তশরীফ না আনিতেন।

সেই সময় মক্কার কাফেরদের তরফ হইতে মোসলমানদের উপর ভয়াবহ অত্যাচার ও নির্য্যাতন চলিতেছিল (এবং মোসলমানগণ মক্কা ত্যাগ করতঃ আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া যাইতেছিলেন।) তখন (আমার পিতা) আবুবকর (রাঃ) আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করতঃ মক্কা ত্যাগ করিলেন। (মক্কা হইতে দুই দিনের পথে) "বরকুল-গেমাদ" নামক স্থানে পৌঁছার পর তাঁহার সঙ্গে (আরবের প্রসিদ্ধ "কারাহ্" গোত্রের সর্দ্দার ইবনে-দাগেনার সাক্ষাত হইল। তিনি আবুবকর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় যাইতেছেন? আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, আমার বংশীয়গণ আমাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করিয়াছে, সুতরাং স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারের গোলামী ও বন্দেগী সুষ্ঠুরূপে করিয়া যাইতে পারি এই উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি; (আবিসিনিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্য গোপন রাখিলেন।)

ইবনে দাগেনা বলিলেন, হে আবুবকর! আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তি দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইতে পারে না এবং আপনার ন্যায় ব্যক্তিকে দেশ ত্যাগ করিতেও দেওয়া যায় না। (আপনি হইলেন মহৎ গুণাবলীর আকর, যথা—) আপনি বেকার-রোজগারহীনের রুজির ব্যবস্থাকারী, আত্মীয় স্বজনের আত্মীয়তার পূর্ণ হক আদায়কারী নিরুপায়ের উপায় বহনকারী, অতিথির সেবায় আত্মনিয়োগকারী এবং সত্যের

জন্য আগত আপদ-বিপদে সাহায্য দানকারী। আমি আপনার নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের ভার গ্রহণ করিলাম, আপনি নিজ দেশে থাকিয়াই আপনার প্রভু-পরওয়ার-দেগারের এবাদত বন্দেগী করিতে থাকুন।

সেমতে আবুবকর মক্কার দিকে ফিরিয়া আসিলেন এবং ইবনে দাগেনাহ্ও তাঁহার সঙ্গে মক্কায় আসিলেন। ইবনে দাগেনাহ্ কোরায়েশ প্রধানদের সকলের নিকট ঐ দাবীই জানাইল যে, আবুবকরের ন্যায় মহান ব্যক্তিকে দেশ হইতে বহিস্কৃত করা যায় না এবং তাঁহাকে দেশ ত্যাগ করিতেও দেওয়া যায় না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মহৎ গুণাবলীরও উল্লেখ করিলেন। কোরায়েশ প্রধানগণ আবুবকরের জন্য ইবনে দাগেনার নিরাপত্তা দানকে সমর্থনই করিল, বিরোধিতা করিল না। অবশ্য তাহারা ইবনে দাগেনাহ্কে বলিল, আপনি আবুবকরকে বলিয়া দিন, তিনি যেন স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারের এবাদত বন্দেগী নিজের ঘরের ভিতরে থাকিয়াই করেন। ঘরের ভিতরে থাকিয়াই যেন নামাজ আদায় করেন এবং তথায় যত ইচ্ছা কোরআন পাঠ করেন। তিনি যেন খোলাখুলি প্রকাশ্যে কোরআন পাঠ করিয়া আমাদের উৎকণ্ঠা সৃষ্টি না করেন; তাঁহার কোরআন পাঠ শ্রবণে আমাদের স্ত্রী-পুত্রগণ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িবে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা হয়।

ইবনে দাগেনাহ্ আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট তাহাদের ঐ কথাগুলি পেশ করিলেন। সেমতে আবুবকর (রাঃ) কিছু দিন ঐ ভাবেই এবাদত বন্দেগী করিয়া যাইতে লাগিলেন—প্রকাশ্যে নামাজও পড়িতেন না এবং ঘরের ভিতর ছাড়া কোরআন পাঠও করিতেন না। কিন্তু তিনি বেশী দিন এই বাধ্য-বাধকতার মধ্যে থাকিতে পারিলেন না। তিনি স্বীয় বাড়ীর বহির্ভাগে একখানা মসজিদ তৈরী করিলেন। তথায় তিনি নামাজ আদায় ও কোরআন পাঠ আরম্ভ করিলেন। আবুবকর (রাঃ) অতিশয় কান্না কাটার সহিত কোরআন পাঠ করিয়া থাকিতেন, কোরআন পাঠকালে তিনি নয়নযুগলের অশ্রু ধারা সামলাইয়া রাখিতে পারিতেন না। কাফেরদের স্ত্রী-পুত্রগণ তাঁহার কোরআন পাঠের দৃশ্য দেখিবার জন্য ভীড় জমাইয়া বসিত এবং তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিত, তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইত।

কোরায়েশ প্রধানগণ এই অবস্থা দৃষ্টে ভীত হইয়া পড়িল; তাহারা ইবনে দাগেনাহ্কে সংবাদ দিল। ইবনে দাগেনাহ্ তাহাদের নিকট আসিলে পর তাহারা বলিল, আমরা আবুবকরের জন্য আপনার নিরাপত্তা দানকে এই শর্তে গ্রহণ করিয়াছিলাম যে, তিনি প্রকাশ্যে নামাজ পড়িবেন না এবং প্রকাশ্যে কোরআন পাঠ হইতে বিরত থাকিবেন। এখন তিনি প্রকাশ্যেই নামাজ পড়িয়া থাকেন এবং প্রকাশ্যেই কোরআন পাঠ করিয়া থাকেন, যাহাতে আমাদের স্ত্রী-পুত্রগণের ব্যাপারে

আমাদের আশঙ্কা হইতেছে। আবুবকরকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিয়া দেন। তিনি যদি ঘরের ভিতরে থাকিয়া এবাদৎ বন্দেগী করিতে রাজি হন তবে ভাল, অন্যথায় তাঁহাকে বলুন, তিনি যেন আপনার নিরাপত্তা দানকে ফেরৎ দিয়া দেন; আমরা আপনার নিরাপত্তা দানকে ভঙ্গ করা ভাল মনে করিনা। অপর দিকে আমরা কিছুতেই বরদাশত করিতে পারিব না যে, আবুবকর তাঁহার কার্য্যকলাপ প্রকাশ্যেই করিয়া যাইবে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, তাহাদের কথা মতে ইবনে দাগেনাহ্ আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট আসিলেন এবং কোরায়েশ প্রধানদের অভিপ্রায় তাঁহাকে জ্ঞাত করিয়া বলিলেন, আপনি জানেন আমি আপনাকে কি বলিয়াছিলাম। এখন আপনি হয়ত তাহাদের কথা রক্ষা করিয়া চলুন, না হয় আমার প্রদত্ত নিরাপত্তা ফিরাইয়া দিন। আমি ইহাতে বড়ই মর্ম্মাহত হইব যে, আরবের লোকগণ শুনিতে পাইবে যে, একটি লোকের পক্ষে আমার প্রদত্ত নিরাপত্তাকে ভঙ্গ করা হইয়াছে।

এতচ্ছ্রবণে আবুবকর (রাঃ) স্পষ্ট ভাষায় ইবনে দাগেনাহ্‌কে বলিয়া দিলেন যে, আপনার প্রদত্ত নিরাপত্তা আপনাকে ফেরৎ দিয়া দিলাম। আমি একমাত্র আল্লাহ তায়ালার আশ্রয়ের উপরই সন্তুষ্ট রহিলাম। এই সময় হযরত নবী (দঃ) মক্কায়ই অবস্থান করিতেছিলেন। (আবুবকর (রাঃ) ঐ অবস্থায়ই মক্কায় থাকিয়া গেলেন পরে মদিনায় হিজরত করিলেন।)

আবিসিনিয়ায় প্রবাসী মোসলমানদের দ্বারা তথায় ইসলামের প্রভাব ঃ

মৌখিক তবলীগ অপেক্ষা আদর্শ ও চরিত্রের তবলীগ অধিক শক্তিশালী ও ক্রীয়াশীল হইয়া থাকে। আবিসিনিয়ার প্রবাসী মোসলেম নর-নারীগণ তথায় নিয়মিত ধর্ম্ম প্রচারের তেমন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চয় পান নাই। বাদশার উদারতায় তাঁহারা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও শান্তির সুবিধা পাইয়া থাকিলেও পরদেশ, চতুর্দিক হইতে শত্রুতার পরিবেশ যেখানে প্রাণ বাঁচানোই দুষ্কর হইয়া পড়িতেছিল সেক্ষেত্রে আবার ধর্ম্ম প্রচারের অবকাশ কোথায়? কিন্তু তাঁহাদের জীবন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদর্শে এমনভাবে গঠিত হইয়াছিল যে, তাঁহাদিগকে দেখিলেই লোকের মনে তাঁহাদের ধর্ম্মের ও আদর্শের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিত; প্রকৃত মোসলমানের লক্ষ্যনই ইহা। সেমতে প্রবাসী মোসলমানদের দ্বারা আবিসিনিয়ায় মৌখিক ইসলাম প্রচার না চলিলেও আদর্শ ও চরিত্রের নির্ব্বাক প্রচার অবশ্যই চলিল। এমনকি তথাকার খৃষ্টানদের অনেকের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি হইল—যেই নবীর উম্মত ইহারা সেই নবীকে দেখা

দরকার। এই আকর্ষনের ফলে আবিসিনিয়ার কুড়িজন খৃষ্টান মক্কায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নবীজী একা একা হরম শরীফের মসজিদে বসিয়া ছিলেন। আর নিকটেই দারে-নোদওয়া তথা মক্কার বিশেষ মিলনায়তনে আবু জহল গোষ্টি বসিয়াছিল।

ঐ খৃষ্টানগণ নবীজী মোস্তফার সাক্ষাতে আসিয়া কতিপয় তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। নবীজী (দঃ) উত্তর দিলেন এবং তাঁহাদিগকে পাক কালাম কোরআন তেলাওত করিয়া শুনাইলেন। তাহাতে তাঁহারা এতই অভিভূত হইলেন যে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া ফেলিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণে ধন্য হইলেন। তাঁহাদের কাঁদা ও অশ্রু বর্ষনের দৃশ্য এবং তাঁহাদের হৃদয়পটে পবিত্র কোরআনের সুগভীর রেখাপাত এতই আকর্ষণীয় ছিল যে, সেই দৃশ্য ও রেখাপাতের উল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহাদের এবং তাঁহাদের শ্রেণীর ইসায়ী সম্প্রদায়ের প্রশংসা করিয়া পবিত্র কোরআনের সুদীর্ঘ বর্ণনা অবতীর্ণ হইল। সেই বর্ণনায় তাঁহাদের অশ্রুপাত এবং পবিত্র কোরআন দ্বারা তাঁহাদের হৃদয়ের ভাবাবিষ্টতা হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে—

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا
مِنَ الْحَقِّ - يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ * وَمَا لَنَا
لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ
الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ * فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا - وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ *

"তাহারা যখন শুনিলেন ঐ মহাবাণী যাহা রসুলের প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তখন তুমি দেখিতে তাঁহাদের নয়নযুগল অশ্রু-প্রবাহমান সত্যকে অনুধাবন করার দরুণ। তাঁহারা বলিতেছিলেন, হে প্রভু। আমরা ঈমানকে গ্রহণ করিয়াছি, অতএব ঈমান ঘোষণাকারীদের দলভুক্তিতে আমাদের নাম লিখিয়া নিন। আল্লার প্রতি এবং ঐ সত্যের প্রতি যাহা আমাদের নিকট আসিয়া গিয়াছে উহার প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া আমরা আশা রাখিব, আল্লাহ আমাদেরে সৎ লোকদের দলভুক্ত করিয়া দিবেন—এইরূপ আশা রাখা আমাদের জন্য কি ফলদায়ক ও সঙ্গত হইবে? এই হৃদয়তাপূর্ণ উক্তির ফলে আল্লাহ তাঁহাদেরে মহাপ্রতিদান দিবেন—বেহেশ্‌ত, যাহার বাগ-বাগিচায় প্রবাহমান রহিয়াছে নদী-নালা। তাঁহারা তথায় চিরস্থায়ীরূপে থাকিবেন। সৎ-সুধীগণের প্রতিদান ইহাই। (৭ পাঃ আরম্ভ)

ঐ আগন্তুকগণ ইসলাম বরণ করিয়া নবীজী হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ দেশে যাত্রা করিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই আবুজহল এবং তাহার দলীয় কতিপয় দুস্কৃতী আসিয়া তাঁহাদেরকে ভর্ৎসনা পূর্ব্বক বলিল, তোমাদের ন্যায় বেকুফের দল আর দেখি নাই। তোমরা এইরূপে হঠাৎ নিজেদের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ফেলিলে? তাঁহারা বলিলেন, তোমাদের সঙ্গে কথা বলা হইতে সালাম—তোমাদের সঙ্গে কোন কিছু বলিতে চাইনা, তোমাদের মতে তোমরা থাক; আমাদেরকে আমাদের মতে থাকিতে দাও। (আছাহ ৯৮)

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীগণের ফজিলত ঃ

১৬৮৩। হাদীছ ঃ—(৬০৭পৃঃ) আবুমুছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মদিনায় হিজরতের সংবাদ আমরা অবগত হইলাম তখন আমরা (আমাদের দেশ—) ইয়ামন দেশই (মোসলমান হইয়া) অবস্থান করিতে ছিলাম। নবীজীর হিজরত সংবাদে আমি এবং আমার বড় দুই সহোদর সহ তিপ্পান্ন জন জ্ঞাতি-গোষ্ঠি লোকের সহিত মদিনায় হিজরত উদ্দেশ্যে আমরা ইয়ামন হইতে যাত্রা করিলাম। আমরা একটি সমুদ্রযানে আরোহন করিলাম; প্রতিকূল ঝড়োয়া বাতাসে আমাদের জলযানটি আমাদেরকে নাজাশী বাদশার দেশ হাবশা তথা আবিসিনিয়ায় পৌঁছাইয়া দিল।

তথায় জাফর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। আমরা কিছুকাল তথায় অবস্থান করিলাম। (৭ম হিজরী সনে) যখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম খায়বর দেশ জয় করিয়াছেন তখন আমরা আবিসিনিয়া হইতে সকল প্রবাসী মোসলমান একটি সামুদ্রিক নৌকায় চড়িয়া মদিনায় পৌছিলাম। যাঁহারা আমাদের পূর্ব্বে মদিনায় পৌঁছিয়াছিলেন তাঁহারা এই নৌকায় আগত আমাদিগকে (কৌতুক করিয়া) বলিতেন, আমরা আপনাদের (অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যশালী কারণ আমরা আপনাদের) পূর্ব্বে হিজরত করিয়া নবীজীর নিকটে পৌছাইয়াছি।

আমাদের নৌকায় আগতদের মধ্যে "আস্মা" নাম্নী এক মহিলা ছিলেন; তিনি নবী গৃহিনী—হাফছা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সহিত সাক্ষাতের জন্য তাঁহার গৃহে আসিলেন। তিনি পূর্ব্বে হাবশায় হিজরত করিয়াছিলেন, তথায় তাঁহাদের উভয়ের পরিচয় ছিল। আসমা (রাঃ) ঐ গৃহে উপস্থিত এমন সময় (হাফছা-পিতা) ওমর (রাঃ) তথায় আসিলেন এবং আসমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হাফছা (রাঃ) বলিলেন, তিনি ওমায়ছ-তনয়া আস্মা। ওমর (রাঃ) বলিলেন, আবিসিনিয়া হইতে আগত সমুদ্রযানে আগত? আস্মা বলিলেন, হাঁ। তখন ওমর (রাঃ) সেই কথাটিই বলিলেন—আমরা মদিনায় তোমাদের পূর্ব্বে হিজরত

করিয়া আসিয়াছি ; আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অধিক নৈকট্য লাভকারী। এতশ্রবণে আসমা ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, (আমাদের অপেক্ষা আপনারা অধিক নৈকট্যের অধিকারী—) ইহা কখনও নহে ; কসম খোদার। আপনারা (আরামে ছিলেন ;) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন ; তিনি আপনাদের অনাহারীর আহার যোগাইয়াছেন, অশিক্ষিতকে শিক্ষা ও উপদেশ দান করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আমরা রসুলুল্লাহ (দঃ) হইতে দূরে ছিলাম, শত্রুদের দেশে ছিলাম ; (আমরা কত কষ্ট করিয়াছি।) এবং আমাদের এই সব কষ্ট ভোগ একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের সন্তুষ্টি লাভ উদ্দেশ্যে ছিল।

আমি শপথ করিলাম—আপনার এই কথার অভিযোগ রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট পেশ না করিয়া আমি পানাহার করিব না। আমরা কত প্রকারে উৎপীড়ীত হইয়াছি। কত রকম ভয়-ভীতির মধ্যে কালতিপাত করিয়াছি ; সব কিছু আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমীপে ব্যক্ত করিব এবং (উহার প্রতিফল সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করিব। খোদার কসম। আমি একটুও মিথ্যা বা গর্হিত অতিরঞ্জিত কথা বলিব না।

ইতিমধ্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গৃহে আসিলেন। তখন আসমা (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লার নবী। ওমর এইরূপ বলিয়াছেন। নবী (দঃ) আসমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তাহাকে কি উত্তর দিয়াছ? আসমা বলিলেন, উত্তরে আমি এই এই বলিয়াছি। নবী (দঃ) বলিলেন, ওমর শ্রেণীর লোকেরা তোমাদের অপেক্ষা অধিক নৈকট্যের অধিকারী কখনও নহে। ওমর এবং তাহার শ্রেণীর লোকদের একটি মাত্র হিজরত হইয়াছে ; (মক্কা হইতে মদিনায়।) আর নৌকাযোগে আগত তোমাদের দুইটি হিজরত হইয়াছে (একটি নিজ নিজ দেশ হইতে আবিসিনিয়ায় এবং অপরটি আবিসিনিয়া হইতে মদিনায়)।

আসমা (রাঃ) বলেন, আবুমুছা (রাঃ) এবং নৌকায় আগত ছাহাবীগণ দলে দলে আমার নিকট আসিতেন এবং এই হাদীছ আমার নিকট শুনিয়া যাইতেন। দুনিয়ার কোন বস্তু তাঁহাদের নিকট অধিক আনন্দদায়ক ও অধিক বড় ছিল না উহা অপেক্ষা যাহা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাদের সম্পর্কে বলিয়াছিলেন। ছাহাবী আবুমুছা (রাঃ)ত এই হাদীছখানা পুনঃ পুনঃ আমার নিকট খোঁজ করিয়া শুনিয়া থাকিতেন।

● নবুয়তের ষষ্ঠ বৎসর মোসলমানদের পক্ষে শুভ লক্ষণের উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় ঘটনা হইল শেরে-খোদা হাম্‌যা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইসলাম গ্রহণ।*

---

* কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে হাম্‌যা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইসলাম গ্রহণ নবুয়তের দ্বিতীয় বৎসর ছিল।

মোসলমানদের বিরুদ্ধে মোশরেকগণ কর্তৃক আবিসিনিয়ায় প্রতিনিধি প্রেরিত হওয়ার সময়ই হাম্যা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন।

হামযা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ ঃ

একদা নবী (দঃ) ছাফা পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী পথে যাইতেছিলেন ; ঐ সময় আবু জহলের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দুরাচার আবুজহল নবীজী (দঃ)কে পথে পাইয়া অশ্লীল অশোভনীয় কথাবার্ত্তা ও গালিগালাজ শুনাইল। সে দ্বীন-ইসলামের বিরুদ্ধেও জঘন্য কথা বলিল। নবীজী (দঃ) তাহার কথার কোন প্রতিউত্তর করিলেন না ; অসভ্যের কথার উত্তরই চুপ থাকা—নবীজী (দঃ) তাহাই করিলেন। মক্কারই এক ব্যক্তির দাসী সব ঘটনা দেখিয়াছিল ; ইতিমধ্যেই বীরবর হামযা শিকার করিয়া তীর-ধনু সহ বাড়ী যাইতে ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ঐ দাসীর সাক্ষাত হইল ; সে তাঁহাকে বলিল, আপনি যদি দেখিতেন। কীভাবে আবুজহল আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে গালিগালাজ করিয়াছে। ইহা শুনামাত্র বীর হামযা অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ আবুজহলের তালাশে ছুটিলেন। হরম শরীফে যাইয়া তাহাকে লোকদের সহিত বসা পাইলেন ; ঐ অবস্থায়ই বীর হামযা স্বীয় ধনু দ্বারা আবুজহলের মাথায় আঘাত করিলেন ; তাহার মাথা ফাটিয়া গেল। হামযা (রাঃ) উত্তেজিতভাবে তাহাকে বলিলেন, তুমি না-কি মোহাম্মদ (দঃ)কে গালাগালি করিয়াছ? শুনিয়া রাখ। আমি তাঁহার ধর্ম্মে রহিয়াছি। উপস্থিত কেহ কেহ আবুজহলের পক্ষে উত্তেজিত হইতেছিল ; কিন্তু আবুজহল তাহাদের বারণ করিতে বলিল, হামযাকে কিছু বলিওনা ; সত্যই আমি আজ তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে শক্ত কথা বলিয়াছি। আমি অন্যায়ভাবে তাহাকে জুলুম করিয়াছি। পাষণ্ড আবুজহল সাংঘাতিকরূপে অপমানিত হইয়াও সাধু সাজিল! কারণটা সহজেই অনুমেয় যে, বীর হামযার অবস্থায় সে বুঝিতে পারিয়াছিল—সর্ব্বনাশ উপস্থিত। এখন সদ্ব্যহার ও সাধুতার দ্বারা হামযাকে শান্ত না করিলে আরবের একজন প্রধানতম বীর তাহাদের দল ছাড়া হইয়া যাইবে এবং কোরেশরা এই সর্ব্বনাশের জন্য তাহাকেই দায়ী করিবে। আবুজহল কুটবুদ্ধি খাটাইল, কিন্তু বীর হামযাকে স্বর্গীয় মঙ্গলের আলিঙ্গন হইতে বারণ করিতে পারিলনা।

উপস্থিত এক ব্যক্তি চমকিত হইয়া বীরবর হামযাকে জিজ্ঞাসা করিল, সত্যই কি আপনি ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) যে, সত্য তাহা আমার হৃদয়পটে বিদ্ধ হইয়া গিয়াছে ; আমি ঘোষণা দিতেছি, তিনি আল্লার রসুল ; তাঁহার সব কথা সত্য। তথা হইতে বাড়ী আসিলে পর শয়তান তাঁহার পেছনে লাগিল ; কুমন্ত্রনা দিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, এমনকি রাত্রেও

তাহার নিদ্রা আসিল না। তিনি এই বলিয়া আল্লাহ তায়ালার দরবারে আরাধনা করিলেন, আয় আল্লাহ। যদি ইহা (ইসলাম) সত্য হইয়া থাকে তবে আমার অন্তরকে ইহার প্রতি স্থির করিয়া দাও; আর যদি অসত্য হয় তবে ইহা হইতে বাহির হওয়ার ব্যবস্থা আমার জন্য করিয়া দাও। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন এই আরাধনা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরের সকল দ্বিধা দূর হইয়া গেল এবং ইসলামের বিশ্বাসে অন্তর ভরিয়া গেল। ভোরবেলা নবীজীর দরবারে উপস্থিত হইলাম এবং সব ঘটনা ব্যক্ত করিলাম; তিনি আমার দ্বীন-ইসলামের মজবুতির জন্য দোয়া করিলেন। আমি আনুষ্ঠানিকরূপে ঘোষণা দিলাম, আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আপনি সত্য, আপনার সব কিছু সত্য এবং আপনি সত্যের দিশারী।

(সীরতে মোস্তফা, ১—১৩৩)

ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ ঃ

হামযা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইসলাম গ্রহণের তিন দিন পরেই তদপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইসলামের ষষ্ঠ বৎসরের তৃতীয় শুভ লক্ষণ ছিল ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইসলাম গ্রহণ।

ধীরে ধীরে মোসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এমনকি বহু সংখ্যক মোসলমান আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া যাওয়ার পরও মক্কায় অবস্থানকারী মোসলমানদের সংখ্যা চল্লিশে পৌঁছিল এবং বীরবর হামযা (রাঃ) ইসলামের দলে আসিলেন। কোরেশরা নিজেদের প্রমাদ গোনিতে লাগিল। তাহারা পরামর্শে বসিল এবং নবীজী মোস্তফা (দঃ)কে প্রাণে বধ করা সাব্যস্ত করিল। অতঃপর তাহারা ব্যতিব্যস্ত হইল হত্যাকারী সাহসী বীর পুরুষের তালাশে। ওমর উহার জন্য প্রস্তুত হইল এবং তরবারী লইয়া নবীজীর খোঁজে বাহির হইল। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাহার উদ্দেশ্য অবগত হইয়া বলিল, প্রথমে নিজের ঘর সামলাও; তোমার ভগ্নি ফাতেমা এবং ভগ্নিপতি সায়ীদ তাঁহারা উভয়ে মোসলমান হইয়া গিয়াছেন। এই সংবাদে ওমর অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিল এবং সোজা ভগ্নির বাড়ী রওয়ানা হইল। ঐ সময় ভগ্নি এবং ভগ্নিপতি উভয়ই তাঁহাদের গৃহে ছিলেন; (পূর্ব্বালোচিত) খাব্বাব (রাঃ) তাঁহাদিগকে পত্রে লিখিত পবিত্র কোরআন শিক্ষা দিতে ছিলেন; গৃহদ্বার বন্ধ ছিল।

ওমর আসিয়া গৃহদ্বারে করাঘাত করিলে খাব্বাব (রাঃ) লুকাইয়া গেলেন; ভগ্নি আসিয়া দরওয়াজা খুলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ওমর তাঁহার শিরে আঘাত করিয়া রক্তস্রোত বহাইয়া দিলেন এবং শাসাইয়া বলিলেন, তুই ধর্ম্মত্যাগী হইয়া গিয়াছিস? ঘরে আসিয়া ভগ্নিপতিকেও ক্রোধভরে জিজ্ঞাসা করিল, নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া

অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ ? তিনি বলিলেন, যদি অন্য ধর্ম্মটি সত্য হয় ? এই উত্তর শুনার সঙ্গে সঙ্গে ওমর তাঁহার উপরও ঝাপাইয়া পড়িলেন এবং মাটিতে ফেলিয়া বেদম প্রহার করিলেন। ভগ্নি তাঁহাকে ছাড়াইতে আসিলে পুনরায় ভগ্নিকেও প্রহারে রক্তাক্ত করিয়া ফেলিলেন। এইবার ভগ্নি উর্দ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, মোসলমান হওয়ার কারণে আমাদের মারা হইতেছে। নিশ্চয় আমরা মোসলমান হইয়াছি ; যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।

মারপিট করিয়া ওমর ক্ষান্ত হইয়াছেন এখন তাঁহার দৃষ্টি পড়িল ঐ পত্রের প্রতি যে পত্রে কোরআন শরীফের আয়াত লিখা ছিল। তিনি বলিলেন, উহা কি ? আমার হাতে দেও ত। ভগ্নি বলিলেন, আপনি অপবিত্র ; অপবিত্র হাত উহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ওমর বিনা বাক্য ব্যয়ে অজু-গোসল করিয়া আসিলেন এবং ঐ পত্র পাঠ করিলেন ; উহাতে ছুরা তা-হার এই আয়াত লিখা ছিল—

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي -

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ - فَلَا

يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ

"একমাত্র আমি আল্লাহ—মাবুদ, আমি ভিন্ন আর কোন মাবুদ বা উপাস্য নাই, অতএব আমারই বন্দেগী কর এবং আমাকে স্মরণ করিতে নামায আদায় কর। নিশ্চয় কেয়ামত আসিবে যেন প্রতিটি মানুষ তাহার কৃত কর্ম্মের ফল পায়—অবশ্য উহার তারিখ আমি গোপন রাখিয়াছি। যাহারা সেই কেয়ামত বিশ্বাস করে না এবং প্রবৃত্তের দাস হইয়া চলে তাহারা যেন উহার প্রতি আস্থা স্থাপনে তোমাকে বিরত রাখিতে না পারে ; অন্যথায় তুমি ধ্বংস হইয়া যাইবে।" এই আয়াত কয়টির বিষয়বস্তু ওমরের অন্তরকে কাঁপাইয়া তুলিল।

ইতিপূর্ব্বে আরও একবার পবিত্র কোরআন লৌহমানব ওমরকে সত্যের প্রতি ধাক্কা দিয়াছিল। ঘটনা এই—একদা গভীর রাত্রে ওমর কা'বা ঘরের নিকট গেলেন ; তখন নবীজী (দঃ) তথায় নামায পড়িতেছিলেন। ওমর বলেন, আমি লুকাইয়া তাঁহার পড়া শুনিবার ইচ্ছা করিলাম। সেমতে আমি কাবা'র গেলাফের ভিতরে আত্মগোপন করিয়া তাঁহার সম্মুখ বরাবর যাইয়া দাঁড়াইলাম। নবীজী (দঃ) ছুরা "আল্‌হাক্কাহ্‌" (২৯ পাঃ) পাঠ করিতে ছিলেন। আমি উহা শুনিতে ছিলাম ; আমার মনে তখন নূতন নূতন ভাবের উদয় হইতে লাগিল। এই সময় আমার

মনে হইতেছিল, কোরেশগণ যাহা বলিয়া থাকে তাহাই ঠিক—ইনি একজন বিশিষ্ট কবি। সেই মুহূর্ত্তেই নবীজী (দঃ) উক্ত ছুরার এই আয়াত পাঠ করিতেছিলেন—

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ - إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ -

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ

অর্থাৎ তোমাদের দৃশ্য, অদৃশ্য সমুদয় বস্তুর শপথ—এই কোরআন আল্লার কালাম, আল্লার (অদৃশ্য) বিশিষ্ট দূতের মারফত তাঁহার (দৃশ্য) রসুলের নিকট প্রেরিত। ইহা কোন কবির রচনা নহে। পরিতাপের বিষয় তোমরা ইহার প্রতি কমই বিশ্বাস স্থাপন কর।"

ওমর বলেন—ইহা শ্রবণে আমি ভাবিলাম, এ ত আমারই মনের কথার উত্তর! অতএব নিশ্চয় মোহাম্মদ (দঃ) বড় গণৎকার। আমার মনে এই ভাবের উদয় হইতেছিল আর নবী (দঃ) উক্ত ছুরার এই আয়াত পাঠ করিতেছিলেন—

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

"এবং উহা কোন গণৎকারের উক্তিও নহে; তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণমূলকরূপে গভীর চিন্তার সহিত শুনিয়া থাক।"

ওমর বলেন, এই আয়াতসমূহ আমার অন্তরে যথেষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিল।

এই আয়াতগুলি ওমরের অন্তরকে ধাক্কা দিল বটে, কিন্তু তাঁহাকে দীর্ঘদিনের বদ্ধমূল কুফ্‌র ও শেরেক ত্যাগে নত করিতে পারিল না। অতঃপর পুনরায় উপরোল্লেখিত ঘটনায় ছুরা তা-হার আয়াতসমূহে যে ধাক্কা ওমরের অন্তরে লাগিল তাহা তিনি সামলাইয়া উঠিতে পারিলেন না। এইবার তিনি সম্পূর্ণরূপে সত্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়া গেলেন।

ছুরা তা-হার আয়াত সমূহের প্রতি লক্ষ্য করা মাত্র ওমরের অন্তরে পরিবর্ত্তন আসিয়া গেল। উপস্থিত খাব্বাব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট জানিতে পারিলেন, নবীজী (দঃ) আরকাম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর গৃহে আছেন। নবীজীর চরণে নিজকে উৎসর্গ করিয়া ইসলাম গ্রহণ উদ্দেশ্য সেইদিকে ছুটিলেন। এই বিরাট পরিবর্ত্তনের সংবাদ কাহারও গোচরে আসে নাই, ধারণায়ও আসিতে পারে না।

আরকামের গৃহদ্বারে পৌঁছিয়া ওমর দরওয়াযায় করাঘাত করিলেন; তাঁহার হস্তে তরবারি ছিল। ভিতরে অবস্থিত ছাহাবীগণ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন; হামযা (রাঃ) তথায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলিলেন, ভাল উদ্দেশ্যে আসিয়া থাকিলে ভাল হইবে, নতুবা তাহার তরবারি দ্বারাই তাহার শিরোচ্ছেদ করা হইবে।

দরওয়াজা খোলা হইলে ওমর ভিতরে পা রাখিতেই নবীজী মোস্তফা (দঃ) নিজেই অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং গায়ে হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ ওমর? ওমর অতি মোলায়েম স্বরে উত্তর করিলেন, ঈমান লাভের উদ্দেশ্যে।

এই উত্তর শুনার সঙ্গে সঙ্গে ভাবাবেগে নবীজীর মুখে "আল্লাহু-আকবর" ধ্বনি আসিয়া গেল। উপস্থিত ছাহাবীগণও সজোরে "আল্লাহু-আকবর" ধ্বনি দিয়া উঠিলেন; এলাকাস্থ পর্ব্বতমালা গুঞ্জিয়া উঠিল। এখন তিনি ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু; তখন তাঁহার বয়স ছিল ত্রিশের উর্দ্ধে (সীরতুন-নবী)।

ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ভগ্নিপতি সায়ীদ (রাঃ) আশারা-মোবাশ্শারাহ তথা রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক বেহেশতের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রাপ্ত দশজন ছাহাবীর একজন। তিনি আরবের প্রসিদ্ধ ইসলামপূর্ব্ব একত্ববাদী যায়েদের পুত্র (যায়েদের একত্ববাদ সম্পর্কে পূর্ব্বে আলোচনা হইয়াছে)। তিনি ওমরের চাচাত ভাইও ছিলেন; তিনি নিজ ইসলাম সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন—

১৬৮৪। হাদীছঃ—সায়ীদ (রাঃ) একদা কুফার মসজিদে বলিতে ছিলেন, আমার এই অবস্থাও আমি দেখিয়াছি যে, ইসলাম গ্রহণের অপরাধে ওমর আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন; তখনও ওমর মোসলমান হন নাই। (৫৪৫ পৃঃ)

ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইসলাম গ্রহণে ইসলাম ও মোসলমানদের নবশক্তির সূচনা হইল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা নবী (দঃ) দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ اَعِزَّ الْاِسْلَامَ بِاَبِىْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ اَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

"হে আল্লাহ! ইসলামকে শক্তিশালী কর আবুজহল বা ওমর দ্বারা।" পর দিনই দিনের প্রথম দিকেই ওমর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন; তখন হইতে মোসলমানগণ হরম শরীফ মসজিদে প্রকাশ্যে নামায পড়িতে পারিলেন (মেশকাত শরীফ ৫৫৭)।

নবী (দঃ) প্রথমে দুই জনের মধ্যে অনির্দ্দিষ্টভাবে কোন এক জনের ইসলাম প্রার্থনা করিয়াছিলেন; পরে নবী (দঃ) বিশেষভাবে ওমরের নাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া পুনঃ দোয়া করিয়াছিলেন— اَللّٰهُمَّ اَيِّدِ الْاِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَاصَّةً

"হে আল্লাহ! খাত্তাব-পুত্র ওমর দ্বারাই ইসলামের সাহায্য কর" (সীরতে-মোস্তফা)।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দোয়া বাস্তবায়িত হইল; ওমর (রাঃ) মোসলমান হইলেন এবং তাঁহার ইসলাম গ্রহণে মোসলমানদের নবযুগের সূচনা হইল।

১৬৮৫। হাদীছ ঃ—(ষষ্ঠ নম্বরের মোসলমান) আবদুল্লাহ ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলিয়াছেন, ওমর (রাঃ) মোসলমান হওয়ার পর হইতে আমরা শক্তিলাভ করিয়াছিলাম। (৫৪৫ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—কাফেরদের বাধাদানে মোসলমানগণ হরম শরীফ মসজিদে নামায পড়িতে পারিতেন না; পাহাড়-পর্ব্বতের আড়ালে লুকাইয়া লুকাইয়া নামায পড়া হইত। ওমর (রাঃ) মোসলমান হইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! কাফেরগণ গর্হিত মূর্ত্তি পূজা প্রকাশ্যে করিবে আর আমরা সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার এবাদত পলাইয়া পলাইয়া করিব? এরূপ হইতে পারে না। আল্লাহ তায়ালার এবাদত প্রকাশ্যে আদায় হওয়া চাই। তখন হইতে হরম শরীফের মসজিদে মোসলমানগণ প্রকাশ্যে নামায আদায় করা আরম্ভ করিয়া দিলেন। (আছাহ্‌হুছ্‌ সীয়ার—৯২)

প্রথমে ওমর (রাঃ) এবং হামযা (রাঃ) নবীজীকে সঙ্গে নিয়া কা'বা শরীফের দিকে অগ্রসর হইলেন; তাঁহারা দুইজন নবীজীর দেহ রক্ষীরূপে অগ্রভাগে চলিলেন। কা'বা শরীফের তওয়াফ এবং দুপুর বেলার নামায নির্বিঘ্নে আদায় করিয়া আসিলেন। (বেদায়াহ, ৩—৩১)

তারপর ওমর (রাঃ) সংগ্রামের মাধ্যমে মোসলমানদের জন্য কা'বা শরীফ সম্মুখে হরম শরীফে নামাজ পড়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং মক্কাস্থিত সমস্ত মোসলমান সমভিব্যাহারে তথায় নামায আদায় করিয়া যাইতে লাগিলেন। কাফেররা ইহাতে বাধা দিবে সেই সাহস আর তাহাদের হইল না। (বেদায়াহ, ৩—৭৯)

এতদ্ভিন্ন এতদিন ত দারে-আরকাম—আরকাম রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর রুদ্ধগৃহে লুকাইয়া নবী (দঃ) এবং মোসলমানগণ একত্রিত হইতেন; ওমর (রাঃ) মোসলমান হওয়ার পর যে কোন স্থানে ইচ্ছা করিলে নবী (দঃ) এবং মোসলমানগণ একত্রিত হইতে পারিতেন (সীরতে মোস্তফা, ১—১২৬)।

ইতিপূর্ব্বে কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিলে সে যথাসাধ্য ইসলাম লুকাইয়া রাখায় সচেষ্ট হইত, কিন্তু ওমর (রাঃ) মোসলমান হইয়া সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্র তাঁহার ইসলাম প্রকাশ করিয়া বেড়াইলেন। এমনকি ইসলাম পূর্ব্বে তিনি যথায় যথায় উঠা-বসা করিতেন, যাহাদের সঙ্গে মেলামেশা করিতেন ঐরূপ সকল স্থানে এবং সকলের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের ইসলাম-গ্রহণ প্রচার করিলেন। (বেদায়াহ ৩—৩১)

ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়া চিন্তা করিলাম মক্কায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সর্ব্বাধিক কঠিন শত্রু কে আছে— তাহাকেই আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পৌঁছাইব। তখন আবুজহলের নাম আমার মনে পড়িল। আমি ভোর বেলা তাহার বাড়ী উপস্থিত হইলাম। সে

আমাকে অতিশয় সমাদর দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই সময় তোমার আগমন কি উদ্দেশ্যে? আমি বলিলাম, তোমাকে এই সংবাদ পৌঁছাইবার জন্য যে, আমি মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। ইহা শুনিতেই সে গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া দিল। (ইবনে-হেশাম)

মোশরেকদের তরফ হইতে প্রথম প্রথম তাঁহার প্রতি আক্রোশের বিভিন্ন ঘটনাবলীর সম্মুখীন তিনি হইতেছিলেন বটে, কিন্তু আল্লার রহমতে সাহস এবং সংগ্রাম ও স্থিতিশীলতার দ্বারা সর্ব্বত্র প্রাবল্য প্রতিষ্ঠায় তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন।

১৬৮৬। হাদীছ ঃ—ওমর-পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ওমর (রাঃ) মোসলমান হইয়াছেন এই সংবাদে মক্কায় বিশেষ চাঞ্চল্যের এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। অসংখ্য মানুষ আসিয়া ওমরের বাড়ী ঘেরাও করিল; আমি আমাদের গৃহছাদে উঠিয়া সব ঘটনা দেখিতে ছিলাম। ওমর (রাঃ) উত্তেজনার মুখে সন্ত্রস্ত হইয়া ঘরে বসিয়াছিলেন; এমন সময় রেশমের জুব্বা পরিহিত একজন লোক ঘরের ভিতরে আসিয়া ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার? তিনি বলিলেন, তোমার জাতির লোকেরা বলিতেছে, আমি মোসলমান হওয়ার অপরাধে আমাকে মারিয়া ফেলিবে। ঐ লোকটি বলিলেন, একটি মানুষও আপনার নিকট আসিতে পারিবে না। ঐ লোকটি ছিলেন আমাদের মিত্র গোত্র বনু-সাহমের সর্দ্দার। তৎকালীন প্রথানুযায়ী এই শ্রেণীর সর্দ্দারের এইরূপ কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইত; সুতরাং উপস্থিত উত্তেজনার মুখে তাঁহার এই কথায় আমরা আশ্বস্ত হইলাম।

অতঃপর ঐ সর্দ্দার বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, সমগ্র প্রান্তর জুড়িয়া দলে দলে মানুষ ভিড় করিয়া আসিতেছে। তিনি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথায় যাইতেছ? তাহারা বলিল, ওমরের বাড়ীর দিকে যাইতেছি; সে নাকি ধর্ম্মত্যাগী হইয়া গিয়াছে। ঐ সর্দ্দার ব্যক্তি বলিলেন, তাহাতে কি হইয়াছে? আমি তাঁহার আশ্রয়দাতা সহায়ক। তখন আমি গৃহছাদ হইতে দেখিলাম, সমস্ত লোকজন তথা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিয়া গেল। (৫৫৫ পৃঃ)

নবুয়তের সপ্তম বৎসর—হযরতের বিরুদ্ধে মোশরেকদের বয়কট ও অসহযোগ আন্দোলন (৫৪৮ পৃঃ)

নবুয়তের ষষ্ঠ বৎসরের শেষাংশে পর পর তিনটি ঘটনার দ্বারা মোসলমানদের শুভ লক্ষণের সূচনা হইল, মোসলমানদের সুদিনের সূর্য্য যেন উদয়ের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল—(১) আবিসিনিয়া হইতে মোশরেকদের প্রতিনিধি দলের সম্পূর্ণ ব্যর্থ ও অপদস্তরূপে ফিরিয়া আসা এবং তথায় মোসলমানদের অধিক সুযোগ-সুবিধা

ও সুখ-শান্তি লাভ। (২) শেরে-খোদা হামযা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইসলাম গ্রহণ। (৩) সারা মক্কার সুপ্রসিদ্ধ লৌহমানব ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইসলাম গ্রহণ; যাঁহার প্রভাবে মোসলমানগণ প্রকাশ্যে ইসলামের আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে, হরম শরীফে নামায পড়িতে সাহসী হইয়াছে। এই সব কারণে সাধারণভাবে মোসলমানদের অন্তরে শক্তি ও সাহসের সঞ্চার হইল এবং বিভিন্ন গোত্রে ইসলামের প্রসার আরম্ভ হইয়া গেল।

এইসব দেখিয়া মক্কার মোশরেকদের গাত্রদাহ চরমে পৌঁছিয়া গেল, তাহাদের চোখে যেন বর্শাঘাত লাগিতে লাগিল। তাহারা এই অবস্থা বরদাশত করিতে না পারিয়া এইবার তাহারা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রাণে বধ করিয়া সর্ব্বদার জন্য নিশ্চিত হওয়ার সিদ্ধান্ত অধিক দৃঢ়তা ও তৎপরতার সহিত গ্রহণ করিল।

আবুতালেব এই সংবাদ জানিতে পারিয়া বনী-হাশেম ও বনী-মোত্তালেব গোত্রীয় সকলকে একত্র করিয়া এই পরিস্থিতে হযরত (দঃ)কে হেফাজত করার আহ্বান জানাইলেন। তাহারা সকলে আবুতালেবের আহ্বানে সাড়া দিল; যদিও তাহারা কাফের ছিল, কিন্তু "স্বজনকে রক্ষা করার" আরবের রীতি অনুযায়ী এবং আবুতালেবের প্রতি তাহাদের পূর্ণ সমর্থন বিদ্যমান থাকায় তাহারা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত আবুতালেবের আহ্বানে সম্মতি প্রদান করিল। এমনকি তাহারা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে "শে'বে-আবীতালেব" নামক স্থানে তথা পার্ব্বত্যাঞ্চল মক্কা নগরীর পর্ব্বত বেষ্টিত একটি ভূখণ্ড যে স্থানের মহল্লায় আবুতালেবের বসবাস ছিল এবং তাহার আধিপত্য ছিল সেই মহল্লায় নিয়া আসিল এবং বনু-হাশেম ও বনু-মোত্তালেব অমোসলমান মোসলমান সকলেই তথায় একত্রিত ভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া নিল। যেন সর্ব্বদা হযরত (দঃ)কে তাহারা চোখের উপর রাখিয়া হেফাজত করিতে পারে এবং সকলে একতাবদ্ধরূপে সম্ভাব্য সব রকম আপদ-বিপদের প্রতিরোধ করিতে পারে।

মক্কার মোশরেকগণ অবস্থা দৃষ্টে যখন বুঝিতে পারিল যে, হযরত (দঃ)কে বনী-হাশেম ও বনী-মোত্তালেব গোত্রদ্বয়ের কারণে কোন কিছু করা সম্ভব হইবে না তখন হযরত (দঃ) সহ বনী-হাশেম ও বনী-মোত্তালেব গোত্রদ্বয়ের বিরুদ্ধে বয়কট ও অসহযোগিতা চালাইয়া যাওয়ার এবং একঘরে করিয়া রাখার উপর মক্কা নগরী ও উহার আশে পাশের কোরায়েশ বংশীয় সমুদয় গোত্র এবং অন্যান্য যে সব গোত্র তাহাদের মিত্র ছিল সকলে শপথ বা হলফ করিল। তৎকালে মক্কা নগরীতে বনী-হাশেম ও বনী-মোত্তালেব ছাড়া কোরায়েশ বংশীয় অন্ততঃ নয়টি গোত্র ছিল—(১) বনী আব্‌দে শাম্‌ছ বা বনী উমাইয়া, (২) বনী নওফল, (৩) বনী আব্‌দিদ-দার, (৪) বনী আছাদ, (৫) বনী তাইম্‌, (৬) বনী আ'দী, (৮) বনী জুমাহ, (৯) বনী সাহ্‌ম। (আরজুল কোরআন ২—৯৮)

এতদ্ভিন্ন কোরায়েশ বংশ ছাড়া তাহাদের দুই পুরুষ পূর্ব্বের "কেনানাহ্" হইতেও কতিপয় গোত্র তথায় ছিল।

কোরায়েশ ও কেনানাহ্ বংশের সকল গোত্রের লোকগণ "খায়ফে-বনী কেনানাহ্" বা "মোহাচ্ছাব" নামক স্থানে একত্রিত হইয়া আনুষ্ঠানিকরূপে শপথ করিল যে, বনী-হাশেম ও বনী-মোত্তালেবের সঙ্গে লেন-দেন, আদান-প্রদান, কেনা-বেচা, বিবাহ-শাদী ইত্যাদি কোন প্রকার আচার অনুষ্ঠান করা চলিবে না যাবৎ না তাহারা মোহাম্মদ (দঃ)কে আমাদের হাতে ছাড়িয়া দেয়। এই সম্পর্কে ২য় খণ্ডে একখানা হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে যাহার নম্বর ৯০৫।

এই শপথকে লিপিবদ্ধ করতঃ তাহারা উহাকে কা'বা ঘরে লটকাইয়া দিল। মনে হয় যেন কা'বা গৃহে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর-দেবতাকে তাহারা তাহাদের এই শপথের সাক্ষী বানাইতে ছিল এবং শপথনামাকে তাহাদেরই তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিল। অবস্থা দৃষ্টে বনী-হাশেম ও বনী-মোত্তালেবগণ তাহাদের সর্দ্দার আবুতালেবের নিকট একত্রিত হইল এবং সমবেত ভাবে এই বিপদের মোকাবিলা করার জন্য এবং সম্ভাব্য সকল প্রকার আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত রূপে সকলে শে'বে-আবুতালেব বা আবুতালেবের গিরিসঙ্কটে একত্রিত ভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করিল। তাহাদের প্রতিজ্ঞা ও বজ্রকঠিন শপথ ইহাই ছিল যে, হযরতকে কোন মূল্যেই শত্রুর হস্তে অর্পণ করিবে না। বরং হযরতকে সর্ব্বদা চোখের উপর রাখার উদ্দেশ্যে তাঁহাকেও ঐ গিরিসঙ্কটে নিয়া আসিল। নবুয়তের সপ্তম বৎসর মহরম মাসে এই ঘটনা ঘটিল।*

হঠাৎ এই ঘটনা ঘটিবে তাহা কাহারও জানা ছিল না। কাজেই খাদ্য এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রি তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করার সময় পান নাই। যাহার নিকট যাহা কিছু কিছু ছিল তাহাই লইয়া তাঁহারা ঐ গিরিসঙ্কটে প্রস্থান করিলেন এই অবস্থায় বনী-হাশেম ও বনী-মোত্তালেব নিদারুণ খাদ্যাভাব সহ অনেক রকম সঙ্কটেরই সম্মুখীন হইলেন। গাছের পাতা ভক্ষণ এবং শুষ্ক চামড়া-সিদ্ধ পানি পান করতঃ এই নিদারুণ কষ্টের মোকাবিলা তাঁহারা করিতে লাগিলেন তবুও কিন্তু তাঁহারা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে শত্রুদের হস্তে অর্পণ করতঃ তাহাদের দাবী পূরণ করিয়া তাহাদের সঙ্গে মীমাংসা করিতে রাজী হইলেন না।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এইভাবে তাহাদের অতিবাহিত হইতে লাগিল। মক্কাবাসীরা তাহাদের উপর হাট-ঘাট এমনভাবে বন্ধ করিয়াছে যে, বাহির হইতে কোন কিছু সংগ্রহ করাও তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। আবদ্ধ

* তবকাতে ইবনে সা'আদ ১—২০৯ এবং যোরকানী ১—২৭৮।

পরিবারবর্গের কচিকাচা শিশু সন্তানগুলি ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া চিৎকার করিত। তাহাদের ক্রন্দন ধ্বনিও মক্কাবাসীদের পাষাণ হৃদয়ে কোন তাছির করিত না। এই সঙ্কটাপূর্ণ অবস্থায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সহ সকল বনী-হাশেম ও বনী-মোত্তালেবগণ দীর্ঘ তিন বৎসর কাল সেই গিরিসঙ্কটে আবদ্ধ জীবন-যাপন করিলেন। ↑

মোসলমানদের শুভ যুগের সূর্য্য উদিত হওয়ার পর মক্কা জয় করিয়া মক্কার আশ-পাশ জয় করা কালে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) অতীতের ইতিহাস স্মরণ করতঃ অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে সর্ব্বশক্তিমান রহমানুর-রহীম প্রভু-পরওয়ারদেগারের শোকরগুজারী আদায় করার উদ্দেশ্যে দশ হাজার ছাহাবী সহ ঐ খায়ফে-বনী কেনানাহ্ বা মোহাচ্ছাব নামক স্থানে এক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন—

১৬৮৭। হাদীছ ঃ—(৫৪৮ পৃঃ) عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اراد حنينا منزلنا غدا

ان شاء الله بخيف بنى كنانة حيث تقاسموا على الكفر-

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (মক্কা জয় করার পর মক্কা হইতে) যখন "হোনায়ন" এলাকা জয় করার জন্য যাওয়ার প্রস্তুতি করিতেছিলেন তখন বলিয়াছিলেন, আগামী কল্য আমাদের অবস্থান খায়ফে-বনী কেনানাহ্ নামক স্থানে হইবে—যে স্থানে মোশরেকরা কুফুরী তথা আল্লাহ ও আল্লার রসুলের বিদ্রোহিতার উপর সকলে শপথ করিয়াছিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ইস্‌লাম ও মোসলমানদের উন্নতির চরম বিকাশকালে তথা বিদায় হজ্জকালে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এক লক্ষ ছাহাবী সহ মিনা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালেও ঐ খায়ফে বনী-কেনানাহ্ বা মোহাচ্ছাবে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং এই অবস্থান শুধু কোন সুযোগ-সুবিধা জনিতই ছিল না, বরং পূর্ব্বাহ্নে মিনায় থাকাবস্থায়ই আলোচ্য হাদীছের বিবৃতির ন্যায় উক্ত অবস্থানের ঘোষণা জারী করিয়া দিয়াছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডে ৯০৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় দেখুন।

নবুয়তের এই সপ্তম বৎসরের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল "শাক্কুল-কামার" বা হযরত (দঃ) কর্ত্তৃক চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মোজেযা, যাহার বিস্তারিত বিবরণ "মো'জেযার বয়ানে" দেওয়া হইবে।

↑ কাহারও মতে আবদ্ধ জীবন যাপনের কাল দুই বৎসর ছিল এবং তাহাদের মতে অসহযোগিতার আরম্ভ নবুয়তের অষ্টম বৎসর হইতে ছিল। (যোরকানী ১—২৭৮)

নবুয়তের দশম বৎসর—অসহযোগীতা ও বয়কট ভঙ্গের এবং হযরতের "শোকের বৎসর" ঃ

নবুয়তের সপ্তম, অষ্টম, নবম বৎসর হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বনী-হাশেম ও বনী-মোত্তালেবের সঙ্গে সঙ্কটাপূর্ণ জীবন যাপন করিলেন। নবীজী মোস্তফা সহ সমস্ত বনী-মোত্তালেব এবং বনী-হাশেমগণের প্রতি মক্কা-বাসীদের এই নির্ম্মম ও অন্যায় ব্যবহারের পরিণতি চরমে পৌঁছিল। ঐ পাষণ্ডদের মধ্যে দুই-চার জন সহৃদয় ব্যক্তিও ছিলেন; বিভীষিকার চরম অবস্থা দৃষ্টে তাঁহাদের মন বিচলিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা এই বয়কটকে ব্যর্থ করার প্রচেষ্টায় লাগিয়া গেলেন। সর্ব্বপ্রথমে "হেশাম" নামক এক ব্যক্তি এই কার্য্যে অগ্রসর হইলেন; বনী-হাশেমের সহিত তাঁহার একটু ঘনিষ্টতা ছিল। বনী-হাশেমের মূল ব্যক্তি হাশেমের পরিত্যক্ত স্ত্রী উক্ত হেশামের দাদী ছিল। হেশামের প্রথম প্রচেষ্টা হইল কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তিবর্গকে এই কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করা। সেমতে তিনি যোহায়র নামক ব্যক্তির নিকট গেলেন; তিনি আবদুল মোত্তালেবের দৌহিত্র—আবুতালেবের ভাগিনেয়। তিনি তাঁহার মাতুলকুল বনী-মোত্তালেবগণের দুর্দ্দশায় পূর্ব্ব হইতেই ব্যথিত ও চিন্তিত ছিলেন, কিন্তু নিজকে একা ভাবিয়া কিছু করার সাহস করিতে ছিলেন না। হেশাম যোহায়রের নিকট যাইয়া বনী-হাশেম ও বনী-মোত্তালেবগণের চরম দুর্দ্দশা ও দুরাবস্থার কথা ব্যক্ত করিলেন এবং বলিলেন, আপনি কি ইহাতে সন্তুষ্ট যে, খাইয়া পড়িয়া বিবি-বাচ্চার সহিত আনন্দ ভোগে আছেন আর আপনারই মাতুলগোষ্ঠি দুঃখে-কষ্টে মৃত্যুর মুহূর্ত্ত গুণিতেছে? যোহায়ের ব্যথিতস্বরে উত্তর করিলেন—কথা ত সবই ঠিক, কিন্তু একা আমি কি করিতে পারি? তখন হেশাম বলিলেন, এই লক্ষ্যে আপনি একা নন; আমি আপনার সঙ্গী আছি। অতঃপর তাঁহারা উভয়ে মোৎএম ইবনে আদী নামক সর্দারের নিকট গেলেন এবং বলিলেন, কোরেশদের দুইটি বংশ নিচিহ্ন হইয়া যাইবে আর আপনি তাহা দেখিয়া থাকিবেন? তিনি বলিলেন, আমি একা কি করিব? তাঁহারা উভয়ে বলিলেন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। তারপর আবুল-বোখতারীকে এবং তারপর যম্‌আ ইবনে আসওয়াদকেও ঐরূপে সম্মত করা হইল। এখন বয়কট ব্যর্থ করার ব্যাপারে পাঁচজন একমত হইলেন। (যোরকানী, ১—২৯০)

তাঁহারা পাঁচজনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, দারে-নোদ্‌ওয়া তথা মক্কার বিশেষ মিলনায়তনে যোহায়ের এই আলোচনা প্রথমে উত্থাপন করিবেন এবং সুযোগ দেখিয়া অপর চারজন পর পর সমর্থন জ্ঞাপন করিবেন। সেমতে পর দিন প্রাতে সেই মিলনায়তনের মজলিসে হেশাম এই ব্যাপারে বক্তৃতা দানে

বলিলেন, "হে মক্কাবাসী! আমরা উদর পুরিয়া খাইব, উত্তম বস্ত্র পরিধান করিব আর বনী-হাশেম ও বনী-মোত্তালেব ধ্বংস হইয়া যাইবে—ইহা কি সমীচীন? এই নৃশংসতার প্রতিজ্ঞাপত্র বা শপথনামাকে ছিন্নভিন্ন না করিয়া আমি ক্ষান্ত হইব না।" তথায় আবুজহল উপস্থিত ছিল, সেই পাষণ্ড ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল এবং বলিল, তুমি মিথ্যা বুলির অবতারণা করিতেছ। আমাদের প্রতিজ্ঞাপত্র শপথনামা কখনও বিনষ্ট করা যাইবে না। আবুজহলের দম্ভোক্তি শেষ হইতে না হইতেই যমআ বলিয়া উঠিলেন, আসল মিথ্যাবাদী তুমি। এই অন্যায় প্রতিজ্ঞা-পত্রের উপর আমরা পূর্ব্বেও সম্মত ছিলাম না। যমআর সুরে সুর মিলাইয়া আবুল-বোখতারী বলিলেন, যম্‌আ ঠিক বলিয়াছেন; এই প্রতিজ্ঞার বিষয়বস্তুতে আমরা পূর্ব্বেও সম্মত ছিলাম না, এখনও উহার প্রতি আমাদের সমর্থন মোটেই নাই। মোৎএম এবং হেশামও একই মন্তব্য করিলেন। এই বিতর্ক চলাকালে তথায় আবুতালেবও উপস্থিত হইলেন; তিনি এই পরিস্থিতির মধ্যে আর একটি বিষয় উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) একটি অদৃশ্য ও অসাধারণ সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তোমাদের প্রতিজ্ঞাপত্র—শপথনামার লেখাগুলি পোকায় খাইয়া ফেলিয়াছে; তোমাদের অন্যায় অত্যাচার অবিচারের কথাগুলি আল্লার নামের সহিত বিজড়িত থাকে নাই। (প্রতিজ্ঞাপত্র বা শপথনামার দুইটি কপি বা প্রতিলিপি ছিল; একটি সুরক্ষিত ছিল অপরটি কা'বায় লটকানো ছিল। এক কপির মধ্যে পোকা অন্যায়-অত্যাচারে কথাগুলি খাইয়া ফেলিয়াছিল, শুধু আল্লার নামের শব্দগুলি অবশিষ্ট ছিল। অপর কপির মধ্যে ইহার বিপরিত শুধু অন্যায় অত্যাচারের কথা-গুলি অবশিষ্ট ছিল আল্লার নামের শব্দগুলি খাইয়া ফেলিয়াছিল। ইহাতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এই বুঝা যায় যে, এইরূপ অন্যায়-অত্যাচারের কথার সহিত আল্লার নাম বিজড়িত থাকিবে না। (যোরকানী, ১—২৯০)

কোন কিছু না দেখিয়া মোহম্মদ (দঃ) এই সংবাদ দিয়াছেন; যদি এই সংবাদ সঠিক বাহির হয় তবে ইহা তাঁহার সত্যবাদিতার অলৌকিক প্রমাণ হইবে, এবং প্রমাণ হইবে যে এই প্রতিজ্ঞা ও শপথের বিষয়বস্তুর প্রতি আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট; তোমাদের অন্যায় এবং আত্মীয়তা ছেদনের প্রতিজ্ঞা হইতে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার নামের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। অতএব তোমরা শুভ বুদ্ধির পরিচয় দানে তোমাদের এই অন্যায়ের প্রতিজ্ঞাপত্রকে ছিন্ন করিয়া ফেল। আমরা কস্মিন-কালেও আমাদের একটি প্রাণী বাঁচিয়া থাকিতে মোহাম্মদকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিব না। আর যদি মোহাম্মদের এই সংবাদ অঠিক বাহির হয় তবে আমি নিশ্চয় তাঁহাকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিয়া দিব।

উপস্থিত সকলের উপর এই কথার একটা বিশেষ প্রভাব পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে মোৎএম ইবনে আদী কা'বায় লটকানো প্রতিজ্ঞাপত্রটাকে নামাইয়া নিয়া আসিলেন। সত্য সত্যই দেখা গেল, উহার সমস্ত লেখাই পোকায় খাইয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে, শুধু কেবল আল্লার নাম লেখাই অবশিষ্ট রহিয়াছে (এবং অপর কপির অবস্থা ইহার বিপরীত ছিল)। এদিকে আর একটি অসাধারণ ঘটনাও ঘটিয়া গিয়াছিল যে, এই প্রতিজ্ঞাপত্রের লিখক মনছুর ইবনে একরেমা—তাহার হাত অবশ হইয়া গিয়াছিল (আছাহ ৯৫)। অবশেষে প্রতিজ্ঞাপত্র ও শপথনামাকে ছিড়িয়া ফেলা হইল এবং অন্যায় প্রতিজ্ঞার অবসান হইয়া গেল। এমনকি এই কাজে অগ্রগামী উল্লেখিত পাঁচ ব্যক্তি তাঁহারা সকলে অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গিরি-সঙ্কটে গেলেন এবং তথা হইতে বনী-হাশেম ও বনী-মোত্তালেবগণকে নবীজী (দঃ) সহ বাহির করিয়া নগরে নিয়া আসিলেন।

দীর্ঘ দুই বা তিন বৎসর নবীজীর উপর কি বিপদই না গেল! তদুপরি এই মানসিক যাতনাও তাঁহার জন্য কম কষ্টের কারণ ছিল না যে, একমাত্র তাঁহার দরুন বনী-হাশেম ও বনী মোত্তালেবের সমস্ত লোকগণ এত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন। তবে আদর্শবান মহামানবগণ বিপদকেও আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত ও বিশেষ দানে পরিণত করিয়া নেন, তাঁহারা বিপদকেও সুযোগরূপে গ্রহণ করেন, বিপদকেও নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মের এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের বিশেষ অবলম্বন ও অছিলা বানাইয়া নেন। নবীজী মোস্তফা (দঃ) তাহাই করিয়াছিলেন এই দুই-তিন বৎসরের বিপদকালে। এই সময়ে বনী-হাশেম ও বনী-মোত্তালেব এবং তাঁহাদের বন্ধুদের সঙ্গে নবীজী মোস্তফার অনাবিল মেলামেশার সুযোগ হইল। তাঁহারা শান্ত, ধীরস্থির এবং দীর্ঘ দৃষ্টিতে নবীজী মোস্তফার প্রকৃত স্বরূপ দর্শনের সুযোগ পাইলেন। তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা, চরিত্রের মধুরতা ও শিক্ষার সৌন্দর্য্য তাঁহাদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল। এতদ্ভিন্ন শত্রুদের মোকাবিলায় আত্মক্রোধের উত্তেজনায় বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবগণ নবীজী মোস্তফার রক্ষণা-বেক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৃঢ় এবং একতাবদ্ধ হইলেন। এই সুযোগে নবীজী মোস্তফা (দঃ) তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ইসলামের প্রচার এবং উহার দাওয়াত দানে দুর্বার গতিতে কর্ম্মচঞ্চল থাকিলেন, এই সোনালী সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার তিনি করিলেন। ইহার ফলে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইসলামের প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন এবং অনেক অভিযাত শ্রেণীর মানুষ তাঁহাদের সময়-সুযোগে মোসলমান হইতে লাগিলেন। যথা—বয়কট ব্যর্থ করার ব্যাপারে যাঁহারা অগ্র-গামী হইয়াছিলেন তাঁহাদের প্রথম ব্যক্তি হেশাম এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি যোহায়র উভয়ে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হইতে পারিয়াছিলেন (যোরকানী, ১—২৯০)। এতদ্ভিন্ন কোরেশ বংশীয় বিশিষ্ট পালোয়ান রোকানাও ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

রোকানা পালোয়ানের ইসলাম গ্রহণ ঃ

কোরেশদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রসিদ্ধ কুস্তিগীর পালোয়ান ছিলেন রোকানা; তিনি বনী-হাশেম তথা নবীজী মোস্তফার বংশীয় ছিলেন। একদা গিরিপথে রোকানার সহিত নবীজী মোস্তফার সাক্ষাৎ হইল। নবী (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, খোদার ভয় তোমার অন্তরে আসে না কি? আমার আহ্বানে সাড়া দিবে না কি? রোকানা বলিলেন, আপনার ধর্ম্ম সত্য প্রমাণিত হইলে আমি আপনার অনুসরণ করিব। নবীজী (দঃ) বলিলেন, আমি যদি কুস্তিতে তোমাকে পরাজিত করিয়া দিতে পারি তবে (অস্বাভাবিক ক্ষমতা দৃষ্টে) আমাকে সত্যবাদী বিশ্বাস করিবে কি? রোকানা বলিলেন, নিশ্চয়। নবীজী বলিলেন, তবে দাঁড়াও। তিনি দাঁড়াইয়া নবীজীকে কুস্তির কায়দায় কাবু করিতে চাহিলে নবীজী তাঁহাকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিলেন। রোকানা দ্বিতীয় বার লড়িবার অনুরোধ করিলে নবীজী পুনরায় তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। তৃতীয় বারও নবীজী (দঃ) তাঁহাকে ধরাশায়ী করিলেন। রোকানা বলিলেন, আপনি আমাকে কুস্তিতে পরাজিত করিলেন ইহাত অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। নবীজী (দঃ) বলিলেন, আল্লাহকে ভয় করার এবং আমার অনুসারী হওয়ার ইচ্ছা করিলে আমি তোমাকে ইহা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যজনক ঘটনা দেখাইতে পারি। রোকানা বলিলেন, তাহা কি? নবীজী (দঃ) দূরবর্ত্তী একটি বৃক্ষের প্রতি ইশারা করিয়া বলিলেন, আমি ঐ বৃক্ষটিকে ডাকিলে সে আমার নিকটে আসিয়া যাইবে। সত্য সত্য তাহাই হইল, অতঃপর নবীজী বৃক্ষটিকে তাহার স্থানে ফিরিয়া যাইতে বলিলে বৃক্ষটি তাহার পূর্ব স্থানে চলিয়া গেল। রোকানা বলিলেন, হে মোহাম্মদ (দঃ) আপনার পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি আমার পৃষ্ঠ মাটিতে ঠেকাইতে পারে নাই। ইতিপূর্ব্বে আমার নিকট আপনি অপেক্ষা বিরাগ ভাজন আর কেউ ছিল না। কিন্তু এখন আমি আন্তরিক সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি— لا اله الا الله وانك رسول الله "আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই এবং আপনি নিশ্চয় আল্লার রসুল।* (বেদায়াহ-অন্-নেহায়াহ, ৩—১০৩)

সত্যের গতি অপ্রতিহত ঃ

সত্য নিজেই আপন স্থান করিয়া লয়, আলো তাহার প্রবেশপথ নিজেই বাহির করে। এই সব চিরন্তন প্রবাদ নবীজীর সাফল্যে ও ইসলামের আত্মপ্রকাশে প্রথম হইতেই ধীরে ধীরে হইলেও দিনের পর দিন বাস্তবায়িত হইতে লাগিল।

আবুজহল, আবুলাহাব, উমাইয়া গোষ্ঠি নবীজীর বিরুদ্ধে এবং তাঁহার ধর্ম্ম ইসলামের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন পর্য্যন্ত সর্ব্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইয়া ব্যর্থ হইল।

---

* কোন কোন ঐতিহাসিক রোকানার মোসলমান হওয়া অস্বীকার করিয়াছেন।

অবশেষে বয়কট অভিমানেও পর্যুদস্ত হইল ; এখন তাহারা হতভম্ব ও দিশাহারা। তাহারা কেমন যেন অবসন্ন হইয়া পড়িল। কোন চেষ্টাই তাহাদের ফলবতী হইতেছে না ; একটা না একটা বাধা আসিয়া তাহাদের অনেক রকম আয়োজনকে পণ্ড করিয়া দিয়াছে—ইহা লক্ষ্য করিয়া তাহারা বিমর্ষ হইল নিশ্চয়। কিন্তু অভিমান, গোঁড়ামি ও বদ্ধমূল কুসংস্কারের মোহে কিছুতেই তাহারা নূতন সত্যকে বরণ করিয়া লইতে পারিল না। বরং চরম ব্যর্থতার মুখে তাহারা দুর্বলচেতা সংগ্রামের আশ্রয় নিল। তাহারা নবীজী মোস্তফা (দঃ)কে পাগল, যাদুকর, গণকঠাকুর, মিথ্যাবাদী, ধোকাবাজ ইত্যাদি বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল এবং হজ্জ-ওমরা ইত্যাদি উপলক্ষে মক্কায় আগত লোকদেরকে নবীজী হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বহিরাগত লোককে কোরেশরা ঘিরিয়া ধরিত তাহার নিকট নবীজীর কুৎসা, নিন্দা ও গ্লানি করিত, কিন্তু তাহাদের এই অপপ্রচার ও অপচেষ্ট ই আগন্তুকদের মনে নবীজীর প্রতি আকর্ষণ জন্মাইতে বিশেষ ক্রিয়াশীল প্রতিপন্ন হইল।

তদ্রূপ কোরেশ শত্রুরা নবীজীর বিরুদ্ধে এমন ব্যাপক প্রচারণা চালাইল যে, তাহাদের প্রচারণা দেশে-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। তাহাদের সেই প্রচারই নবীজীর প্রসিদ্ধির জন্য মহাপ্রচারের কাজ করিল। দূর দেশের লোক নিজ নিজ দেশে থাকিয়াই নবীজীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। ইহা শুধু ভাবাবেগের কল্পনা নহে ; বাস্তব সত্য ইতিহাস যাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। যথা—

তোফায়েল দৌসীর ইসলাম গ্রহণ ঃ

আরবের প্রসিদ্ধ গোত্র দৌসের প্রধান সর্দ্দার ছিলেন তোফায়েল ইবনে আমর। তিনি অতিশয় প্রভাবশালী এবং বিশেষ অভিজাত শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। তিনি একবার মক্কায় আসিলেন ; তখন নবীজী (দঃ) গিরিসঙ্কট হইতে মুক্ত। তোফায়েল মক্কায় আসিলে মক্কার সর্দ্দারবৃন্দ সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল এবং তাঁহাকে অত্যন্ত কঠোরভাবে সতর্ক করিল—তিনি যেন রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটে না যান, তাঁহার সহিত মোটেই সাক্ষাৎ না করেন, তাঁহার কোন কথাও যেন না শুনেন।

তোফায়েল নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারা আমাকে এতই কঠোরভাবে সতর্ক করিয়াছে যে, আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—আমি তাঁহার কোন কথা শুনিব না। এমনকি হরম শরীফের মসজিদে যেহেতু নবীজী (দঃ) প্রায়শঃ ইসলামের আহ্বানে বক্তৃতা করিতেন, তাই আমি মসজিদে যাইতে কর্ণকুহরে তূলা ঠাসিয়া যাইতাম ; যেন অনিচ্ছায়ও তাঁহার কথা আমার কর্ণে প্রবেশ না করে।

একদা আমি সকালবেলা মসজিদে গেলাম ; দেখিলাম, রসূলুল্লাহ (দঃ) কা'বা শরীফের সম্মুখে নামাজ পড়িতেছেন। অতঃপর আমি তাঁহার নিকটে গেলাম ;

আমার শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার কিছু কথা আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি একটু লক্ষ্য করিলাম যে, এই সব কথা ত কতই না সুন্দর! কতই না মধুর!! অতঃপর আমি মনে মনে ভাবিলাম, আমি ত একজন বিশিষ্ট জ্ঞানী এবং পণ্ডিত কবি। ভাল, মন্দ পার্থক্য করা আমার জন্য কঠিন নহে; তবে কেন আমি এই লোকটির (তথা নবীজীর) কথা শুনিব না? তাঁহার কথা ভালটি গ্রহণ করিব এবং মন্দটি বর্জন করিব। সেমতে আমি তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিলাম এবং তাঁহার সান্নিধ্যেই বসিয়া থাকিলাম। এমনকি তিনি মসজিদ হইতে উঠিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার গৃহে যাইয়া সাক্ষাৎ করিলাম এবং বলিলাম, আপনার জাতি আপনার সম্পর্কে আমার নিকট এই, এই বলিয়াছে। এমনকি আপনার কথা না শুনিবার জন্য আমি আমার কর্ণে তূলা ঠাসিয়া রাখিতাম। কিন্তু আল্লাহ আমাকে আপনার কথা না শুনাইয়া ছাড়েন নাই এবং আপনার কথা যাহা শুনিয়াছি তাহা অতি সুন্দর ও অতি মধুর। আপনি আপনার ধর্ম্ম আমার নিকট ভালরূপে ব্যক্ত করুন ত। তৎক্ষণাৎ রসুলুল্লাহ (দঃ) আমার সম্মুখে ইসলাম ব্যক্ত করিলেন এবং পবিত্র কোরআন তেলাওত করিয়া শুনাইলেন। খোদার কসম—এত সুন্দর বাণী আর জীবনেও আমি শুনি নাই, এত সুন্দর ও উত্তম ধর্ম্ম জীবনেও আমি পাই নাই। আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়া নিলাম এবং সত্য ধর্ম্ম গ্রহণের ঘোষণা দিয়া দিলাম।

অতঃপর আমি আরজ করিলাম, হে আল্লার নবী। আমি আমার গোত্রের প্রধান, সকলে আমাকে মান্য করিয়া চলে। আমি এখন তাহাদের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিব এবং তাহাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করিব। আমার বৈশিষ্টের জন্য কোন নিদর্শন আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করুন; সেই নিদর্শন যেন আমার প্রচার কার্য্যের জন্য তাহাদের নিকট সাহায্যকারী হয়। সেমতে নবী (দঃ) দোয়া করিলেন, "হে আল্লাহ! তাহাকে কোন নিদর্শন দান করুন"। অতঃপর আমি আমার দেশের দিকে যাত্রা করিলাম; রাস্তার যেই মোড় অতিক্রম করিলে আমি দেশবাসীর দৃষ্টিগোচর হইব—ঐ মোড়ে পৌছিলে আমার ললাটে চক্ষুদ্বয়ের মধ্যস্থল হইতে একটি আলোকরশ্মি প্রদীপের ন্যায় বিকশিত হইল। আমি দোয়া করিলাম, ইয়া আল্লাহ! আমার চেহারা ভিন্ন অন্য কোন বস্তুতে আমার এই নিদর্শন দান কর। আমার ভয় হয়—লোকেরা ভাবিবে, তাহাদের ধর্ম্ম ত্যাগের কারণে আমার চেহারা বিকৃত হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ ঐ আলোকরশ্মি আমার চাবুকের মাথায় পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। লোকেরা ঐ আলো সুস্পষ্টরূপে প্রদীপের ন্যায় দেখিল।

আমি বাড়ী পৌছিলে আমার বৃদ্ধ পিতা আমার নিকট আসিলেন; আমি তাঁহাকে বলিলাম, আজ হইতে আপনি আমার হইতে বিচ্ছিন্ন আমি আপনার হইতে বিচ্ছিন্ন; আমাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই। পিতা বলিলেন কেন হে

বৎস? আমি বলিলাম, আমি মোসলমান হইয়া গিয়াছি; মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিয়াছি। পিতা বলিলেন, হে বৎস। তোমার ধর্ম্মই আমারও ধর্ম্ম। আমি বলিলাম, তবে গোসল করিয়া পাক পবিত্র পোশাক লইয়া আসুন। তিনি তাহাই করিলেন; আমি তাঁহার সম্মুখে ইসলাম পেশ করিলাম; তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন। আমার স্ত্রী আমার নিকট আসিলে তাহার সহিতও ঐরূপ কথোপকথন হইল এবং সেও ইসলাম গ্রহণ করিল।

আমি আমার দৌস গোত্রেও ইসলাম প্রচার করিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহারা সাড়া দিল না। আমি পুনঃ মক্কায় আসিয়া নবীজীর নিকট দৌস গোত্র সম্পর্কে অভিযোগ করিলাম এবং তাহাদের প্রতি বদদোয়ার জন্য বলিলাম। নবীজী (দঃ) তাহাদের জন্য দোয়া করিলেন—"হে আল্লাহ! দৌস গোত্রকে হেদায়েত দান কর"। নবীজী (দঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি তোমার গোত্রে ফিরিয়া যাও; তাহাদিগকে ইসলামের দিকে আহ্বান কর এবং তাহাদের প্রতি উদার থাকিও। আমি তাহাই করিতে থাকিলাম, এমনকি নবীজী (দঃ) মক্কা হইতে মদিনায় হিজরত করিয়া গেলেন। হিজরতেরও ছয় বৎসর পর আমি আমার সঙ্গী মোসলমানগণকে লইয়া মদিনায় চলিয়া আসিলাম; আমরা সত্তর বা আশিটি পরিবার ছিলাম। আবুবকর ছিদ্দিক রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফৎ আমলে মিথ্যা নবী মোছায়লামার বিরুদ্ধে য়্যামামার জেহাদে তোফায়েল (রাঃ) শহীদ হইয়াছিলেন। (বেদায়াহ, ৩—৯৮)

গুণীন জেমাদের ইসলাম গ্রহণঃ

মক্কা হইতে বহু দূরে অবস্থিত "আয্‌দ" গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন জেমাদ। তিনি আরবের প্রসিদ্ধ গুণীন ছিলেন; খুব বড় ওঝা ও মন্ত্রতন্ত্রবিদ রূপে তাঁহার বিরাট সুখ্যাতি ছিল। একবার জেমাদ মক্কায় আসিলেন এবং মক্কার বেকুফদেরকে বলিতে শুনিলেন যে, মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) পাগল বা তাঁহাকে ভূতে পাইয়াছে। সেমতে ঐ গুণীন সাহেব হযরতের নিকটে আসিয়া বলিলেন, আমি ভূত ছাড়ানোর মন্ত্র জানি; আল্লাহ অনেক মানুষকে আমার হাতে আরোগ্য দান করেন।

নবীজী মোস্তফা (দঃ) সাধারণতঃ কোন ভাষণ দান ক্ষেত্রে প্রথমে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও সাহায্য কামনায় যাহা পাঠ করিতেন তাহা পাঠ করিলেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْ

فَلَا هَادِىَ لَهٗ - اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ -

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার ; আমরা তাঁহারই প্রশংসা করি এবং তাঁহারই সাহায্য কামনা করি। আল্লাহ যাহাকে সৎ পথ দান করিবেন পারিবে না কেউ তাহাকে ভ্রষ্ট করিতে এবং আল্লাহ যাহাকে থাকিতে দিবেন ভ্রষ্টতায় পারিবে না কেউ তাহাকে সৎ পথে আনিতে। আমি মনে-প্রাণে ঘোষণা দিতেছি, আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ ও উপাস্য বা পূজনীয় নাই—তিনি এক, তাঁহার কোন সঙ্গী সাথী অংশীদার নাই।"

জেমাদ এই ভূমিকা শুনিতেই অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া তিনবার নবীজীর এই বাণী শ্রবণ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আমি মন্ত্রতন্ত্রবাদী অনেক গুণীনের কথা শুনিয়াছি অনেক যাদুকরের যাদুমন্ত্র শুনিয়াছি বড় বড় কবিদিগের রচনা শুনিয়াছি। কিন্তু আপনার বাণীর ন্যায় এমনটি ত আর কখনও শুনি নাই। এই বাণী ত সমুদ্রের ন্যায় সুগভীর ও সুপ্রসস্ত যাহার গভীরতায় অসংখ্য মণিমুক্তা লুক্কায়িত। আপনার হস্ত প্রদান করুন উহা ধারণ করিয়া আমি ইসলাম গ্রহণ করি। সেমতে তিনি নবীজীর হস্ত ধারণ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং স্বীয় গোত্রে ইসলাম প্রচারের স্বীকৃতি দান করিলেন। (বেদায়াহ, ৩—৩৬)

আবুজর গেফারীর ইসলাম গ্রহণ ঃ

"গেফার" গোত্র মক্কা হইতে বহু দূরে অবস্থান করে, আবুজর গেফারী তথায় বসবাস করেন। কোরেশদের বিরূপ প্রচারনার ফলে নবীজী মোস্তফার চর্চ্চা আরবের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সুদূর গেফার গোত্রেও এই চর্চ্চা ব্যাপ্ত হইয়াছে। এমতাবস্থায় আবুজর তাঁহার সহোদর ওনায়ছকে নবীজীর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার জন্য মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন। ওনায়ছ মক্কায় আসিয়া কয়েকদিন অবস্থান করতঃ নবীজীর সন্ধান লাভে প্রত্যাগমন করিল এবং ভ্রাতা আবুজরকে নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিল। এই বর্ণনায় আবুজরের তৃপ্তি হইল না ; তাঁহার পিপাসা আরও বাড়িয়া গেল। তিনি অবিলম্বে মক্কা যাত্রা করিলেন। বহু সাধনায় তিনি নবীজীর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হওয়ার সুযোগ পাইলেন। প্রথম সাক্ষাতেই আবুজর নবীজীর চরনে লুটিয়া পড়িলেন এবং ইসলাম বরণ করিয়া নিলেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনায় ইমাম বোখারী (রঃ) ৫৪৪ পৃষ্ঠায় একটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়া এই হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

১৬৮৮। হাদীছ ঃ—(৪৯৯ ও ৫৪৪) আবুজমরাহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আবুজরের ইসলাম-গ্রহণ ঘটনা তোমাদেরে শুনাইব কি? আমরা বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, আবুজর (রাঃ) নিজেই

উহার বর্ণনা দিয়াছেন যে, আমি গেফার গোত্রের লোক। আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছিল, মক্কায় একজন লোকের আবির্ভাব হইয়াছে—তিনি দাবী করেন, তিনি নবী। আমি আমার সহোদর (ওনায়ছ)-কে বলিলাম, তুমি মক্কায় ঐ লোকটির নিকটে যাও যে দাবী করে—তাঁহার নিকট উর্দ্ধজগতের সংবাদ সরবরাহ হয়। তাঁহার কথাবার্ত্তাও সরাসরি তাহার মুখে শুনিবে এবং সব তথ্য লইয়া আমার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

সেমতে ভ্রাতা যাত্রা করিল এবং মক্কায় আসিয়া নবীজীর সাক্ষাতে আসিল, তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিল অতঃপর মক্কা হইতে প্রত্যাগমন করিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কি সংবাদ? সে বলিল, আমি ঐ মহান ব্যক্তিকে দেখিয়াছি; তিনি সৎকর্ম্ম ও সচ্চরিত্রের উপদেশ দিয়া থাকেন, অসৎ কর্ম্ম হইতে নিষেধ করিয়া থাকেন। আর তাহার বাণীও শুনিয়াছি উহা কবির রচনা মোটেই নহে (ওনায়ছ উত্তম কবি ছিল)। আমি ভ্রাতাকে বলিলাম, আমার যে পিপাসা রহিয়াছে তোমার বর্ণনায় তাহা মিটিল না। সেমতে অনতিবিলম্বে আমি পাথেয় এবং ছোট এক মশক পানি সঙ্গে লইয়া মক্কা পানে যাত্রা করিলাম। (ভ্রাতা আমাকে বলিয়াদিল, মক্কায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন। তথাকার লোক ঐ মহানের বড় শত্রু এবং সকলে তাহার বিরুদ্ধে দলবদ্ধ। বেদায়াহ, ৩—৩৫)

মক্কায় পৌঁছিয়া আমি হরম শরীফের মসজিদে অবস্থান করিলাম; জমজমের পানি পান করিতাম এবং নিজে নিজে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে খোঁজ করিতাম, কিন্তু তাঁহার খোঁজ পাইতে পারিলাম না। তাঁহার খোঁজ সম্পর্কে কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করিব তাহাও আমি সমীচীন মনে করিলাম না। এই অবস্থায়ই আমি সারাদিন মসজিদে পড়িয়া রহিলাম; এমনকি রাত্র আসিয়া গেল। এই অবস্থায় আলী (রাঃ) আমার নিকট দিয়া গমন করিলেন; তিনি বলিলেন, বোধ হইতেছে লোকটি বিদেশী। আমি উত্তর করিলাম, হাঁ—আমি বিদেশী। আলী (রাঃ) বলিলেন, তবে আপনি আমার অতিথী; আপনি আমার বাড়ী চলুন। সেমতে আমি তাঁহার সঙ্গে চলিলাম; আমিও তাঁহাকে আমার মূল উদ্দেশ্যের কিছু বলি না, তিনিও আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। আমি তাঁহার গৃহেই রাত্রি যাপন করিলাম এবং ভোর হইলে আবার মসজিদে চলিয়া আসিলাম। আজও নবীজীর কোন খোঁজ লাভ করিতে পারিলাম না; কাহারও নিকট জিজ্ঞাসাও করিলাম না এবং এমন কোন মানুষ পাইলাম না যাহার হইতে খোঁজ লইতে পারি। দিনের শেষে আজও আলী (রাঃ) আমার নিকট দিয়া গমন করিলেন এবং বলিলেন, নিশ্চয় লোকটি এখনও উদ্দেশ্যস্থলের খোঁজ লাভে সক্ষম হয় নাই। আমি বলিলাম, ঠিকই সক্ষম হই নাই। আজও তিনি বলিলেন, আমার সঙ্গে আমার গৃহে চলুন। আজও পূর্ব্ব দিনের ন্যায়ই তাঁহার সঙ্গে যাইয়া তাঁহার গৃহে রাত্রি

যাপন করিলাম এবং ভোর হইলে মসজিদে চলিয়া আসিলাম। এইভাবেই তিন দিন অতিবাহিত হইল। তৃতীয় দিন আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন ; আপনার ব্যাপার কি ? উদ্দেশ্য কি ? কেনইবা আপনি এই শহরে আসিয়াছেন ? আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনি যদি আমার কথা সম্পূর্ণ গোপন রাখেন, কাহারও নিকট প্রকাশ না করেন, আর প্রতিজ্ঞা করেন যে, আমার উদ্দেশ্যের সাফল্যে আপনি আমার সাহায্য করিবেন আমাকে পথ দেখাইবেন তবে আমি বলিতে পারি। আলী (রাঃ) আমার উভয় শর্ত্তে সম্মতি দান করিলেন—বলিলেন, আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহাই আমি করিব।

আমি বলিলাম, আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, এই নগরে একজন লোকের আবির্ভাব হইয়াছে যিনি দাবী করিয়া থাকেন তিনি নবী। ইহার সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য অবগত হওয়ার জন্য পূর্ব্বে আমি আমার সহোদরকে এখানে পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু সে আমার পুর্ণ তৃপ্তি যোগাইতে পারে নাই, তাই আমি স্বয়ং তাঁহার সাক্ষাৎ লাভের আশায় এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আলী (রাঃ) বলিলেন, ঠিক জায়গায়ই আপনি আপনার কথা রাখিয়াছেন—আপনার উদ্দেশ্য সাফল্যের পথে। যাঁহার বিষয় আপনি বলিতেছেন তিনি সত্য ; তিনি আল্লার রসুলই বটেন। এই রাত্র আপনি আমার গৃহেই অবস্থান করুন। প্রভাতে আমি আপনাকে তাঁহার নিকট পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিব।

ভোর হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, সেই মহানের পথ এই দিকে ; আমি এই পথে যাইতে থাকিব, আপনি দূরে দূরে থাকিয়া আমার অনুসরণ করিবেন। আমি যদি আপনার জন্য কোন বিপদের আশঙ্কা দেখি তবে আমি প্রশ্রাব করার ন্যায় ভান করিয়া থামিয়া যাইব বা জুতা ঠিক ভাবে পায়ে দেওয়ার ন্যায় পথের কিনারায় দাঁড়াইব। আপনি অন্য দিকের পথ ধরিয়া চলিয়া যাইবেন ; (যেন কেহ আপনার মূল উদ্দেশ্য আঁচ করিতে না পারে।) আর যদি আমি সরাসরি চলিয়া যাই তবে আপনিও আমার অনুসরণে চলিতে থাকিবেন এবং আমি যেই গৃহে প্রবেশ করি আপনিও সেই গৃহে ঢুকিয়া পড়িবেন।

সেমতে তিনি চলিতে লাগিলেন ; আমি তাঁহার অনুসরণে চলিতে লাগিলাম। পথে কোন বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই তিনি সরাসরি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকটে পৌঁছিলেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছিলাম। আমি নবীজী সমীপে আরজ করিলাম, আমাকে ইসলাম বুঝাইয়া দিন ; তিনি ইসলামের ব্যাখ্যা দান করিলেন। তাঁহার মুখ-নিঃসৃত অমীয় বাণী শ্রবণে আমি ঐ মুহূর্ত্তে ঐ স্থানেই ইসলাম গ্রহণ ও বরণ করিয়া নিলাম।

নবীজী আমাকে স্নেহভরে বলিলেন, আবুজর! এই এলাকায় তুমি তোমার অবস্থা গোপন রাখিও, প্রকাশ করিও না। এখন তুমি তোমার দেশে যাইয়া দেশের লোককে এই ধর্ম্মের খোঁজ দিতে থাক। আমাদের পূর্ণ বিকাশ এবং জয়যুক্ত হওয়ার সংবাদ অবগত হইলে তুমি আমার কাছে চলিয়া আসিও।

আমি আরজ করিলাম, যেই মহাশক্তিমান প্রভু আপনাকে সত্য ধর্ম্ম দানে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার শপথ ও কসম—আমি যে সত্যের কলেমা পাইয়াছি উহাকে মক্কার লোকদের কর্ণকুহরে না ঢুকাইয়া ক্ষান্ত হইব না।

ঠিকই তৎক্ষানাৎ আবুজর (রাঃ) হরম শরীফের মসজিদে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, তথায় কোরেশের অনেক লোক সমবেত ছিল। আবুজর (রাঃ) তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, হে কোরেশগণ।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

"আমি অন্তর হইতে ঘোষণা দিতেছি, একমাত্র আল্লাহই মাবুদ; আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই। আরও ঘোষণা দিতেছি, মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার বিশিষ্ট বন্দা এবং তাঁহার রসুল।"

এই ধ্বনি দিতেই কোরেশ দুর্ব্বৃত্তরা মার মার করিয়া ছুটিয়া আসিল এবং পরস্পর বলিতে লাগিল, এই ধর্ম্ম ত্যাগী বেদ্বীনকে ধর। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক হইতে আমার উপর বেদম প্রহার আরম্ভ হইয়া গেল। আমাকে প্রাণে শেষ করিয়া মারিয়া ফেলিবে সেইরূপ প্রহারই তাহারা করিতে লাগিল। এই সময় (নবীজীর পিতৃব্য) আব্বাস (রাঃ) ছুটিয়া আসিয়া আমাকে তাঁহার দেহের আশ্রয়ে নিলেন এবং মারমুখী দুর্ব্বৃত্তদেরে বলিলেন, তোমরা কি সর্ব্বনাশ করিতেছ! এ যে গেফার গোত্রের লোক। সিরিয়ার বাণিজ্য যাত্রায় এবং সাধারণভাবেও তোমাদের চলাচলের পথ গেফার গোত্রের পল্লী দিয়াই। আব্বাসের এই সতর্কবাণী শুনিয়া তাহারা ক্ষান্ত হইল এবং আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

পর দিন ভোর হইতে না হইতেই আমার সেই অভিযান পুনঃ চলিল,—আমি মসজিদে আসিলাম এবং পূর্ব্ব দিনের ন্যায় আমার সেই ঘোষণার ধ্বনিই দিতে লাগিলাম। তাহাদেরও প্রহার-অভিযান পূর্ব্ব দিনের ন্যায়ই আমার উপর চলিল। আজও আব্বাস (রাঃ) ছুটিয়া আসিয়া নিজের দেহ দ্বারা আমাকে আশ্রয় দিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় দুর্ব্বৃত্তদেরে সতর্কবাণী শুনাইলেন; তাহাতে তাহারা ক্ষান্ত হইল।

পাঠক! লক্ষ্য করিলেন? ঈমানের বল-বিক্রম কত অধিক! সাহস, শক্তি ও উদ্যম কত প্রখর! ক্ষণেক পূর্ব্বে যেই আবুজর কোন ব্যক্তির নিকট নবীজীর খোঁজ জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী ছিলেন না, ভীত ও ত্রস্ত ছিলেন; ঈমান গ্রহণের

সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত্তের মধ্যে আবুজর আর সেই আবুজর নাই। ভীত ও ত্রস্ত আবুজর (রাঃ) এখন তাঁহার হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে নূতন বল-শক্তি এবং অসীম সাহস ও উৎসাহ উদ্যমের স্পন্দন তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন। এমনকি সেই বল-বিক্রম, সাহস-উদ্যমের বাণকে চাপিয়া রাখা তাঁহার জন্য সম্ভব হইল না। সকল প্রকার ভয়-ভীতির বাঁধ ভাঙ্গিয়া, প্রাণের মায়ার বাঁধন ছিন্ন করিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন কলেমা শাহাদতের বিজয়ধ্বনি তুলিতে, তৌহীদ এবং নবীজীর স্বীকৃতি-ঘোষণা মক্কার পাষণ্ডদের ঘাড়ে চাপিয়া ধরিতে। এই মহাশক্তি ও অদম্য সাহস একমাত্র ঈমানেরই ক্রিয়া ছিল; আবুজর (রাঃ) এখনও পেয়াজ বা গরুর গোশ্‌ত খাইয়া ছিলেন না। নবীজীর হাত হইতে আবুজর (রাঃ) তৌহীদ ও ঈমানের এমন মদিরাই পান করিয়াছিলেন যে, উহার তেজস্ক্রিয়ায় নবীজীর স্নেহসুলভ পরামর্শকেও তখন লক্ষ্যে রাখিতে পারেন নাই তিনি।

● বিগত তিন বৎসর কাল গিরিসঙ্কটে সঙ্কটাপূর্ণ জীবন-যাপনের পর নবুয়তের দশম বৎসরে বয়কট বা অসহযোগিতা প্রত্যাহৃত হইয়াছিল।

দীর্ঘ তিন বৎসর কাল কষ্ট যাতনা হইতে খালাস পাওয়া হযরতের পক্ষে অবশ্যই একটি সুখের বিষয় ছিল, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই সে সুখ অপেক্ষা শত গুণ অধিক পর পর দুইটি দুঃখজনক শোকের ছায়া হযরতের উপর নামিয়া আসিল।

আবুতালেবের মৃত্যু ঃ

অসহযোগীতা হইতে খালাস পাওয়ার মাত্র ছয় মাস বা আট মাস বিশ দিন পর ঐ বৎসরই হযরতের বাহ্যিক সাহায্য সহায়তার সর্ব্ব প্রধান অছিলা—চাচা আবুতালেবের মৃত্যু হয়; যাহা হযরতের পক্ষে অপূরণীয় শূন্যতা ছিল। এত দিন সারা মক্কাবাসীদের মোকাবিলায় হযরতের পক্ষে আবুতালেবই ছিলেন একমাত্র প্রতিরোধ ও প্রতিবাদকারী। আজ সেই অছিলা চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়া গেল। বাহিকরূপে হযরত (দঃ) সম্পূর্ণ অসহায় হইয়া পড়িলেন।

আবুতালেবের সর্ব্বশেষ অবস্থা ঃ (৫৪৮ পৃঃ)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের লালন-পালন হইতে আরম্ভ করিয়া নবুয়তের পরও সারা মক্কার শত্রুদের মোকাবিলায় সাহায্য সহায়তার যে ভূমিকা আবুতালেব গ্রহণ করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত উহা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন উহার নজীর ইতিহাসে নাই। নবীজী মোস্তফার পয়গাম্বরী জীবনে সফলতার ব্যাপারে বাহ্যিক অছিলারূপে আবুতালেবের দান ছিল অপরিসীম। তিনি নবীজী মোস্তফা:কে তাঁহার অন্তরে

যে স্থান দান করিয়াছিলেন উহার দৃষ্টান্তও অতি বিরল। কিন্তু আবুতালেব এত ভালবাসা সত্ত্বেও হযরতের আনীত ধর্ম্ম ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন না, তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের শেরেকী ধর্ম্মের উপরই ছিলেন। হায়! সারা বিশ্ব যেই প্রদীপের আলোতে উজ্জ্বল সেই প্রদীপের সর্ব্বাধিক নিকটবর্ত্তী আবুতালেব উহার আলো হইতে বঞ্চিত। এ যেন প্রদীপের নীচের অন্ধকার।

এই বিষয়টি হযরতের পক্ষে যে কতদূর পীড়াদায়ক ছিল তাহা বলা বাহুল্য। যখন আবুতালেবের অন্তিমকাল ও জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল তখন হযরত (দঃ) সর্ব্বশেষ চেষ্টার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু মানুষ-বেশী শয়তান আবুজহল ও তাহার সাঙ্গ-পাঙ্গগণ পূর্ব হইতেই আবুতালেবের শয্যা পার্শ্বে ভীড় জমাইয়া রহিয়াছিল। হযরত (দঃ) আবুতালেবকে ইসলামের কলেমা পাঠ করার জন্য অত্যধিক অনুরোধ ও পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন, এমনকি তিনি অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে আদর ও সোহাগের ডাক দিয়া বলিলেন, "হে আমার চাচা! আপনি একটি বাক্যের (ইসলামের কলেমার) স্বীকারোক্তি করিয়া আমার পক্ষে কেয়ামতের দিন আপনার জন্য শাফায়া'ত করার পথ সুগম করিয়া দিন; আমি এই বাক্যটি নিয়াই আপনার পক্ষ সমর্থনে আল্লার দরবারে দাঁড়াইব। এইভাবে হযরত (দঃ) তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। অপরদিকে আবুজহল ও তাহার সাঙ্গ-পাঙ্গগণ তাঁহাকে বলিতেছিল, হে আবুতালেব! জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে স্বীয় পুর্বপুরুষদের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আরবের নারীদেরকে তিরস্কারের সুযোগ দিও না যে, আবুতালেব কাপুরুষ ছিল—ভাতিজার কথায় আজাবের ভয়ে ভীত হইয়া স্বীয় বাপ-দাদার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে।

অবশেষে আবুতালেব এই দুর্ভাগ্যজনক উক্তির উপরই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন যে, স্বীয় পিতা আবদুল মোত্তালেবের ধর্ম্মের উপরই রহিলাম।

হযরত (দঃ) স্বীয় আশ্রয়স্থল চাচাকে হারাইয়া যতদূর শোক পাইয়াছিলেন উহার হাযার গুণ অধিক শোক পাইলেন চাচার মৃত্যু বে-দীনীর উপর হওয়ায়। হযরত (দঃ) এই শোক ও দুঃখে বে-হাল হইয়া ইসলাম না থাকা সত্ত্বেও চাচার মাগফেরাতের দোয়া করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু কোরআনের আয়াত নাযেল হইয়া তাঁহাকে উহা হইতে বারণ করিল এবং আরও আয়াত নাযেল করিয়া আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন যাহার বিবরণ নিম্নের হাদীছে আছে—

১৬৮৯। হাদীছ ঃ— (৫৪৮ পৃঃ) عن ابن المسيب عن ابيه رضى الله عنه

إِنَّ اَبَا طَالِبٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ أَيْ عَمِّ قُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ

بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ يَا أَبَا طَالِبٍ

تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَالَا يُكَلِّمَانِهِ حَتّٰى قَالَ آخِرَ شَيْءٍ

كَلَّمَهُمْ بِهٖ عَلٰى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ ـ فَنَزَلَتْ "مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ

آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ

لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيْمِ" وَنَزَلَتْ "إِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ"

অর্থ—সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ী' ছায়ীদ-ইবনে মোছাইয়্যেব (রঃ) তাঁহার পিতা ছাহাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবুতালেবের যখন মৃত্যু অতি নিকটবর্ত্তী হইল তখন নবী (দঃ) তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। আবুজহল পূর্ব্বাহ্নেই তথায় পৌঁছিয়াছিল।

হযরত (দঃ) আবুতালেবকে বলিলেন, হে আমার চাচা! আপনি ইসলামের কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌...এর স্বীকারোক্তি করুন। ইহাকে লইয়াই আমি আপনার পক্ষ সমর্থন করিয়া আল্লার দরবারে দাঁড়াইব। তখন আবুজহল এবং তাহার আর এক সাথী বলিল, হে আবুতালেব! তুমি তোমার পিতা আবদুল মোত্তালেবের ধর্ম্ম ছাড়িয়া দিবে কি? এই ধরণের বহু রকমের কথা তাহারা দুইজনে আবুতালেবকে বলিতে লাগিল, এমনকি আবুতালেবের সর্ব্বশেষ উক্তি এই হইল যে, আবদুল মোত্তালেবের ধর্ম্মের উপরই...।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি আবুতালেবের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিয়া যাইব যাবৎ আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে আমাকে নিষেধ না করা হয়। তখনই পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযেল হইল—

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا.........

অর্থাৎ নবীর জন্য এবং মোমেনদের জন্য এই অনুমতি নাই যে, তাহারা কোন মোশরেকের পক্ষে মাগফেরাতের দোয়া করে, ইহা প্রতীয়মান হইয়া যাওয়ার পর যে, ঐ মোশরেক শিরকের উপর মৃত্যুবরণ করিয়া জাহান্নামী সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে যদিও সেই মোশরেক কোন ঘনিষ্টতর আত্মীয় হয়।

এতদ্ভিন্ন এই আয়াতও নাযেল হইল…… إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ

অর্থাৎ হেদায়েত দান করার ক্ষমতা আপনার হাতে ন্যাস্ত নহে যে, আপনি আপনার প্রিয়পাত্রকে (জোর করিয়া) হেদায়েত দিয়া দিবেন। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা (মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও কর্ম্মশক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ দেখিয়া) যাহাকে ইচ্ছা করেন হেদায়েত পাওয়ার তৌফিক দান করিয়া থাকেন। হেদায়েত পাওয়ার উপযুক্ত কাহারা তাহা আল্লাহ তায়ালা ভাল রূপই অবগত আছেন।

১৬৯০। হাদীছঃ—(৫৪৮ পৃ:) عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمِّكَ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ -

অর্থ—হযরতের চাচা আব্বাস (রাঃ) একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, (কেয়ামতের দিন) আপনার চাচা আবু তালেবকে কি সাহায্য করিতে পারিবেন? তিনি ত আপনার অত্যধিক সাহায্য সহায়তা করিয়া থাকিতেন এবং আপনার পক্ষ সমর্থন করিয়া সংগ্রাম চালাইয়া থাকিতেন। নবী (দঃ) তদুত্তরে বলিলেন, তিনি অল্প—তথা পায়ের গিঁট পর্য্যন্ত দোযখের আগুনে থাকিবেন। (তাঁহার শাস্তির এই লাঘব আমারই বদৌলতে হইবে।) যদি আমার সম্পর্কীয় ব্যাপার না থাকিত তবে তিনি দোযখের সর্ব্বশেষ তবক্কার নিম্নস্তরে থাকিতেন।

১৬৯১। হাদীছঃ—(৫৪৮ পৃ:) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ تَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ -

অর্থ—আবু সায়ী'দ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে তাঁহার চাচা আবু তালেবের বিষয় উল্লেখ করা হইল। হযরত (দঃ) বলিলেন, আশা করি, কেয়ামতের দিন আমার সুপারিশ তাহাকে সাহায্য করিবে তাহার শাস্তি লাঘব করিতে—তাহাকে অল্প পরিমাণ দোযখের আগুনে

রাখা হইবে ; দোযখের আগুন তাহার পায়ের গিঁট পর্য্যন্ত থাকিবে, কিন্তু উহার দ্বারাই তাহার মাথার মগজ পর্য্যন্ত টগবগ করিতে থাকিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—এস্থলে একটু চিন্তা করিলে ঈমান যে কি অমূল্য ধন এবং দোযখ হইতে নাজাত ও পরিত্রাণ পাইবার জন্য ঈমান যে, অপরিহার্য্য তাহা পরিস্কাররূপে উপলব্ধি করা যায়। আল্লার রসুলের সাহায্য সহায়তা করা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেক কাজ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ছাহাবীগণ এই নেকের দ্বারাই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আবুতালেবের মধ্যে সেই নেক কাজটি অত্যধিক পরিমানে বিদ্যমান ছিল, তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাহায্য সহায়তায় সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু উল্লেখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এইসব কোন কিছুই দোযখ হইতে তাহাকে নাজাত ও পরিত্রাণ দিতে পারিল না; তাহার একমাত্র কারণ হইল ঈমান রত্ন হইতে আবুতালেবের বঞ্চিত থাকা ; এই জন্যই তাহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার ঈমানের জন্য সর্ব্বাত্মক চেষ্টা চালাইয়াছিলেন।

আর একটি বিষয় এস্থলে পরিস্কাররূপে উপলব্ধি করা যায়, তাহা এই যে, আল্লার রসুলকে মমতা করা তাঁহাকে রসুল জানা, সত্যবাদী জানা—শুধু জানার পর্য্যায়কে ঈমান বলা হইবে না। শুধু জানার পর্য্যায়ে আবুতালেব কাহারও পশ্চাতে ছিলেন না, তাহার কাব্যের এক বিরাট অংশ এইসব বিষয়ে আজও ইতিহাসে বিদ্যমান রহিয়াছে। কাব্যে তাহার পরিস্কার উক্তি ছিল—

ودعوتنى وزعمت انك ناصحى + ولقد صدقت وكنت ثم امينا

আপনি আমাকে সত্য ধর্ম্মের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন এবং আপনি আমার শুভাকাঙ্খী বলিয়া দাবী করিয়াছেন ; বাস্তবিকই আপনি সত্যবাদী এবং পূর্ব্ব হইতেই আপনি অকৃত্রিম।

وعرضت دينا لامحالة انه + من خير اديان البرية دينا

আর আপনি বিশ্ববাসীর সম্মুখে এমন এক ধর্ম্ম পেশ করিয়াছেন যাহা অবশ্যই সারা বিশ্বের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং ইসলাম সম্পর্কে এই ধরণের উক্তি আবুতালেবের কাব্যে ভূরি ভূরি বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু এই ধরনের উক্তিকে ঈমান গণ্য করা হয় নাই। কারণ, শুধু জানার পর্য্যায়কে ঈমান বলা হয় না, বরং রসুলকে এবং ইসলামকে মানা ও গ্রহণ করার উপরই ঈমানের ভিত্তি। আবুতালেবের মধ্যে ইহারই অভাব ছিল। ইহার অভাব আজ আমাদের সমাজে মোসলেম নামধারী অনেকের মধ্যেই দেখা যায়।

আবুতালেবের মৃত্যুশয্যায় আবুজহল সহ কোরেশ সর্দ্দারগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আপনার প্রতি আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা আপনার অবিদিত নহে। আপনার শেষ সময় নিকটবর্ত্তী যাহা আপনিও বুঝিতেছেন। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত আমাদের যে বিরোধ রহিয়াছে তাহাও আপনি অবগত আছেন। আমাদের অনুরোধ—আপনি তাহাকে ডাকিয়া আনুন এবং তাহার হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করুন. সে যেন আমাদের প্রতি অন্যায় না করে; আমাদের হইতেও অঙ্গীকার গ্রহণ করুন, আমরাও তাহার প্রতি কোন অন্যায় করিব না।

সেমতে আবুতালেব নবীজীকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং বলিলেন হে ভ্রাতুষ্পুত্র। তোমার বংশীয় সর্দ্দারগণ সমবেত হইয়াছে। তাহারা তোমার সহিত আপোষ-মীমাংসার প্রস্তাব করিতেছে; তুমিও অঙ্গীকার করিবে, তাহারাও অঙ্গীকার করিবে।

নবীজী বলিলেন, ভাল কথা! আপনারা আমাকে একটিমাত্র উক্তি প্রদান করিবেন; উহার দ্বারা আপনারা সমগ্র আরবে প্রাধান্য লাভ করিবেন এবং ঐ উক্তির বদৌলতে সারা বহির্জগৎ আপনাদের পদানত হইবে।

আবুজহল বলিল, এইরূপ একটি কেন! দশটি উক্তির অঙ্গীকার আপনি আমাদের হইতে আদায় করুন।

নবীজী বলিলেন, আপনারা অঙ্গীকার করিবেন, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" আল্লাহ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই। আর আপনাদের বর্ত্তমান পুজনীয় দেবদেবী ঠাকুর-মূর্ত্তিগুলিকে চিরতরে পরিত্যাগ ও বর্জ্জন করিবেন।

এই কথা শুনিয়া কোরেশ দলপতিগণ বলাবলি করিল, তোমরা যাহা চাও সেইরূপ একটি অক্ষরও এই ব্যক্তি হইতে আদায় করিতে পারিবে না, অতএব নিজেদের পূর্ব্বপুরুষগণের ধর্ম্মমতের উপর অবিচল থাক; এই ব্যক্তির সহিত আল্লাহই যদি ফয়ছালা করিয়া দেন। (ইবনে-হেশাম)

সর্ব্বশেষ পর্য্যায়ে আবুতালেব কোরেশ দলপতিগণকে কতকগুলি অমূল্য উপদেশ দিয়া গেলেন যাহা তাঁহার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। তিনি তাহাদের উদ্দেশ্যে বলিলেন—

হে কোরেশগণ! তোমরা মানব জাতির শ্রেষ্ঠ এবং আরবীয়দের হৃৎপিণ্ড তুল্য। তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ রহিয়াছে—সকলেই যাহাদের অনুগত। তোমাদের মধ্যে বাহাদুর এবং ধনে-জনে শক্তিশালী ব্যক্তিগণও রহিয়াছে। তোমাদের মধ্যে আরব জাতির সর্ব্বময় মহিমা বিদ্যমান রহিয়াছে যদ্দরুন তোমাদের প্রাধান্য। তোমরা কা'বা শরীফের যথাযথ সম্মান করিবে; ইহাতে তোমাদের প্রতি প্রভু পরওয়ারদেগার সন্তুষ্ট হইবেন, তোমাদের জীবিকার অবলম্বন হইবে এবং তোমাদের প্রাধান্য বজায় থাকিবে। আর তোমরা পরস্পর আত্মীয়তার হক্ আদায়

করিও ; তাহাতে নেকনামী বাকি থাকে জীবনের মূল্য বাড়ে এবং বংশের উন্নতি হয়। জুলুম-অত্যাচার এবং পরস্পর শত্রুতা বর্জ্জন করিও ; এই দুই জিনিষের দ্বারা অতীতে অনেক জাতি ধ্বংস হইয়াছে। আর কেহ ডাকিলে তাহার ডাকে সাড়া দিও, প্রার্থীকে দান করিও এবং সদা সত্য কথা বলিও, আমানত পূর্ণরূপে আদায় করিও।

আর আমি তোমাদিগকে বিশেষরূপে উপদেশ দিতেছি—তোমরা মোহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) সহিত ভাল ও উত্তম ব্যবহ.র বজায় রাখিও। তিনি সমগ্র কোরেশ বংশের আমানতদার এবং সমগ্র আরবে সত্যবাদীরূপে প্রসিদ্ধ। আমি তোমাদের যতগুলি সং উপদেশ দান করিলাম মোহাম্মদের মধ্যে ঐ সব গুণাবলী বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি আমাদের নিকট যেই ধর্ম্ম নিয়া আসিয়াছেন অনেকে:ই হৃদয় উহাকে গ্রহণ করে যদিও মানুষের নিন্দার ভয়ে মুখে গ্রহণ করে না।

খোদার কসম ! আমি যেন চোখে দেখিতেছি—আমার পূর্ণ বিশ্বাস আরবের এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী এলাকার দরিদ্র দুর্ব্বল লোকগণ মুহাম্মদের ডাকে সাড়া দিয়া এবং তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এবং তাঁহার আদেশের শ্রদ্ধা করিয়া মৃত্যুর মুখে ঝাপাইয়া পড়িতেছে। ফলে কোরেশ দলপতিগণ অন্যের লেজুর হইয়া যাইতেছে, তাহাদের বাড়ী-ঘর উজাড় হইয়া যাইতেছে এবং ঐ গরীব-কাঙ্গালগণ তাহাদের উপর প্রাধান্য লাভ করিতেছে।

হে কোরেশ বংশ। তোমরা মোহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) সাহায্যকারী এবং তাঁহার দ:লর সহায়তাকারী হইয়া যাও। যে ব্যক্তি তাঁহার পথের পথিক হইবে এবং তাঁহার আদর্শের অনুসারী হইবে সে নিশ্চয় ভাগ্যবান হইবে। আমার জীবনের আরও অংশ যদি বাকি থাকিত এবং আমার মৃত্যু যদি বিলম্ব করিত নিশ্চয় আমি মোহাম্মদ হইতে সর্ব্বপ্রকার আক্রমণকে প্রতিহত করিয়া চলিতাম এবং তাঁহার হইতে সকল রকম আপদ-বিপদের প্রতিরোধ করিতাম।

(যোরকানী, ১—২৯৫)

অতঃপর সমবেত কোরেশ দলপতিগণ তথা হইতে প্রস্থান করিলে আবুতালেব নবীজীকে পুনঃ ডাকিয়া আনিলেন এবং বলিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি কোরেশ দলপতিদের নিকট কোন অন্যায় দাবী কর নাই।

নবীজী (দঃ) আবুতালেবের এই আলাপে তাঁহার ঈমান সম্পর্কে আশান্বিত হইয়া বলিলেন, হে চাচাজান! আপনি আমার ঐ দাবীর কলেমাটা পড়িয়া নিন। যদ্দারা কেয়ামত দিবসে আমি আপনার জন্য শাফায়াত বা সুপারিশের সুযোগ লাভ করিব।

উত্তরে আবুতালেব বলিলেন, আমার যদি আশঙ্কা না হইত যে, আমার মৃত্যুর পর তোমাদেরে কটাক্ষ করিয়া লোকেরা বলিবে, আবুতালেব ভয়ে ভীত হইয়া মৃত্যু সময় কাপুরুষের ন্যায় এই কলেমা পড়িয়াছে তবে নিশ্চয় আমি এই কলেমা পড়িয়া নিতাম। (ইবনে-হেশাম)

খাদিজা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হার মৃত্যু ঃ

বিপদের অন্ধকার যেন অন্ধকার রজনীর ন্যায় ঘনিভূত হইয়া আসিতে থাকে। আবুতালেবের মৃত্যু হইল, তাহার ঈমান সম্পর্কে হযরতের সর্ব্বাত্মক চেষ্টা ব্যর্থ হইল। এই নিদারুন শোক-তরঙ্গে ভাসিতে থাকা অবস্থায়ই হযরতের উপর আর এক শোকের পাহাড় ধ্বসিয়া পড়িল।

এই দশম বৎসরেই—রমজান মাসে আবুতালেবের মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন পর* হযরতের দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের জীবন-সঙ্গিনী বিবি খাদিজা (রাঃ) ৬৫ বৎসর বয়সে এন্তেকাল করিলেন। বিবি খাদিজা (রাঃ) হযরতের জন্য অর্থ-সামর্থ, ঘর-সংসার শান্তি ও শৃঙ্খলারই শুধু সংস্থাপক ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন প্রত্যেক পরিস্থিতিতে হযরতকে সান্ত্বনা দানকারিণী, হযরতের অন্তরে বল-ভরসা আনয়নকারিণী। আজ হযরত (দঃ) এইরূপ জীবন-সঙ্গিনীকেও হারাইয়া ফেলিলেন ; ইহাতে তাঁহার শোকের সীমা থাকিতে পারে কি ? এমনকি স্বয়ং হযরত (দঃ) এই বৎসরকে عام الحزن "শোকের বৎসর" বলিয় আখ্যায়িত করিলেন।

বিবি খাদিজাকে হারাইয়া হযরত অন্তরে কি ভীষণ আঘাতই না পাইলেন! দুনিয়ার এক শ্রেষ্ঠ নেয়ামত যেন তিনি আজ হারাইলেন। বিবি খাদিজা হযরতের অন্তর ও জীবনের এত বড় বিরাট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন যে, উহাকে অন্য কাহারও দ্বারা পূরণ করা সম্ভব ছিলনা। তাঁহার ন্যায় ভাগ্যবতী ও পূণ্যবতী আদর্শ মহিলা জগতে অল্পই জন্ম নেয়। হযরতের অতীত জীবনের দীর্ঘ পঁচিশটি বৎসর বিবি খাদিজা (রাঃ) হযরতের সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠায়, পারিবারিক ও সামাজিক ময়দানে তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠায় যে ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন উহার স্মৃতি-রেখা হযরতের হৃদয়পট হইতে মুছিয়া যাওয়ার মত ছিল না।

পয়গাম্বরীর সূচনায় যখন নবীজীর সম্পুর্ণ জীবনটা এলোমেলো শৃঙ্খলাহীন হইয়া পড়িয়াছিল ; তাঁহার পানাহারের খোঁজ ছিল না, শোয়া-বসার খবর ছিল না। পথে-প্রান্তরে গিরিকন্দরে তিনি উদাসীন বেড়াইতেন, পড়িয়া থাকিতেন তখন বিবি খাদিজাই তাঁহার তত্ত্ব লইতেন, খোঁজ করিয়া পানাহার পৌঁছাইতেন, শৃঙ্খলায় ফিরাইয়া আনার ব্যবস্থা করিয়া থাকিতেন। পয়গাম্বরী জীবনের সর্ব্বপ্রথম অধ্যায়ে যখন নবীজী আশা-নিরাশার দোলায় দুলিয়া ব্যস্তত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, হেরা-গুহা হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহে আসিয়াছিলেন তখন বিবি খাদিজাই আদর্শ সহধর্ম্মিণীরূপে নবীজীর সান্ত্বনা, প্রেরণা ও বল-ভরসা যোগাইয়া ছিলেন। জগতের সকলে যখন

---

* কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বিবি খাদিজার মৃত্যু আবুতালেবের মৃত্যুর পূর্ব্বে হইয়াছিল। কিন্তু ইহার বিপরীত মতামতই প্রসিদ্ধ এবং অধিক নির্ভরযোগ্য। (বেদায়াহ, ৩ ১২১)

নবীজীর কথাকে পাগলের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল তখন এই পুণ্যবতী মহীয়সীই সর্ব্বপ্রথম তাহার সত্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। জাতি ও দেশের সকলে যখন নবীজীকে উপেক্ষা ও বর্জন করিয়াছিল তখন এই ভাগ্যবতী খাদিজাই তাঁহাকে বরণ করিয়াছিলেন। চতুর্দিকে যখন নবীজীর জন্য নিরাশার অন্ধকার, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ লাঞ্ছনা ও উৎপীড়নের ঝড় তখন সেই ঘোর সঙ্কটকালে কর্ম্ম জীবনের সর্ব্বপ্রথম সঙ্গিনী এবং ধর্ম্ম জগতের সর্ব্বপ্রথম মুরীদ বিবি খাদিজাই নবীজীর জন্য আলো বহনকারিণী এবং জানে মালে সর্ব্বপ্রকারে ঝড়-ঝঞ্ঝা হইতে আশ্রয় দানকারিণী ছিলেন। সারা দিনের কর্ম্মব্যস্ততা ও দেশ জোড়া শত্রুদের উৎপীড়নে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া দিনের শেষে নবীজী বাড়ী ফিরিতেন তখন বিবি খাদিজা প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্ম মতেই হৃদয়ের সর্ব্বময় ভক্তি-শ্রদ্ধা অন্তরের সবটুকু মায়া-মমতা তাঁহার চরণে নিবেদিত করিয়া তাঁহার দৈহিক ও আত্মিক শ্রান্তি দূর ক রণে এবং সুখ-সান্ত্বনা প্রদানে নিজকে লুটাইয়া দিতেন। নবীজী মোস্তফা (দঃ) প্রতি দিন এইভাবে খাদিজার সেবায় সারা দিনের ক্লান্তি ও শ্রান্তি দূর করিয়া নবোদ্যমের সহিত কর্ম্ম ক্ষেত্রে পুনঃ অবতীর্ণ হইতেন। সুখে-দুঃখে আপদে-বিপদে সর্ব্বদা বিবি খাদিজা নবীজীর সহিত ছায়ার মত জড়াইয়া থাকিতেন; মুহূর্ত্তের জন্যও বিবি খাদিজা নবীজীর সেবায় উদাসীন হইতেন না। বিবি খাদীজা ছিলেন নবীজীর আদর্শ সহধর্ম্মিণী সর্ব্বক্ষেত্রের সহকর্ম্মিণী এবং সর্ব্বাবস্থার সহযোগিণী। অন্তরের ভক্তি ও আসক্তির সহিত বিবি খাদিজা নিজেকে এবং নিজের সর্ব্বস্বকে নবীজী মোস্তফার চরণে যেভাবে লুটাইয়া ও বিলাইয়াছিলেন উহার দৃষ্টান্ত জগতে মিলিবে না। নবীজীও বিবি খাদিজার প্রতি কিরূপ আকৃষ্ট ছিলেন তাঁহাকে কিরূপ স্বীকৃতিদান করিয়াছিলেন উহার কিঞ্চিৎ বিবরণ "শাদী মোবারক" আলোচনায় আলোচিত হইয়াছে। বিবি খাদিজার প্রতি নবীজী মোস্তফার আকর্ষণ ও স্বীকৃতি প্রমাণে এতটুকুই যথেষ্ট যে, বিবি খাদিজার বিরহ-ব্যথা চিরকাল নবীজীর হৃদয়ে দাগ কাটিয়াছে—ইহারও আলোচনা পূর্ব্বে হইয়াছে।

এহেন জীবন-সঙ্গিনী ইহকালের চিরবিদায় নিলেন নবীজী হইতে; নবীজীর সেই বিচ্ছেদ-বেদনার পরিমাপ করা কি সহজ? এই শ্রেণীর ব্যথা-বেদনায় সাধারণ মানুষ ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া পারে না। বিশেষতঃ নবীজী তাঁহার প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দির লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণকারী উপকারীজন পিতৃব্য আবুতালেবের শোক ভুলিতে না ভুলিতেই এই মহাশোকের আঘাত লাগিল নবীজীর অন্তরে। আঘাতের উপর আঘাত, শোকের উপর শোক; স্বয়ং নবীজী কর্তৃক এই বৎসরকে "আমুল-হোযন" শোকের বৎসর আখ্যা প্রদানই তাঁহার অন্তরের প্রতিক্রিয়াকে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছে।

আ'য়েশা (রাঃ)-এর সঙ্গে বিবাহ ঃ

নবুয়তের দশম বৎসর রমজান মাসে বিবি খাদিজা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হার ইন্তেকাল হইল। হযরত (দঃ) শোকে জর্জ্জরিত, তদুপরি তাঁহার ঘর-সংসার দেখিবার ও শৃঙ্খলা করিবার মত কেহ নাই, তাই হযরত (দঃ) পরবর্ত্তী মাস তথা শাওয়াল মাসেই পুনঃবিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন এবং পর পর দুইটি বিবাহ হইল। একটি উম্মুল-মোমেনীন সওদাহ্ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হার সঙ্গে। তিনি বিধবা ছিলেন— তাঁহার স্বামীর নাম ছিল "সাক্‌রান-বিন-আম্‌র" তিনি এবং তাঁহার স্বামী অনেক পূর্ব্বেই ইসলাম গ্রহণ করতঃ আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া গিয়াছিলেন। তথায় থাকাকালীন বা মক্কায় ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হয় এবং তিনি বিধবা হইয়া থাকেন। পুনঃ বিবাহের প্রস্তাবে তিনি প্রথম দ্বিধা করিয়াছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে দ্বিধাবোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, আমার মহব্বত আপনার প্রতি সর্ব্বাধিক, কিন্তু আমার পাঁচ-ছয়টি সন্তান রহিয়াছে; তাহারা সকাল-বিকাল আপনাকে বিরক্ত করিবে। আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আমাকে এই কারণে বাধা দেয়। নবী (দঃ) বলিলেন, দ্বিধার আর কোন কারণ নাই ত? তিনি বলিলেন, খোদার কসম—আর কোন কারণ নাই (বেদায়াহ, ৩—১৩৩)। বিবি সওদার পিতা তখন জীবিত ছিলেন এবং অমোসলেম ছিলেন, কিন্তু তিনি হযরতের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবে রাজি হইয়া সওদাহ্ (রাঃ)কে হযরতের হাতে তুলিয়া দিলেন।

অপর বিবাহটি হইয়াছিল আ'য়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সঙ্গে। কিন্তু এই বিবাহটি শুধু আনুষ্ঠানিক এবং কেবল মাত্র ইজাব-কবুলের বিবাহ ছিল; অন্য কোন রুছুমতই হইয়াছিল না। বিবাহের সময় হযরতের বয়স ছিল পঞ্চাশ বৎসর আর আ'য়েশার বয়স ছিল মাত্র ছয় বৎসর।

আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ন্যায় একনিষ্ঠ বন্ধুর মেয়ে হিসাবে আদর ও সোহাগের নিদর্শন স্বরূপ এই বিবাহের আক্‌দ্‌ বা ইজাব-কবুল হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন এই বিবাহ সম্পর্কে মালায়ে-আ'লা তথা আল্লার দরবার হইতেও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আসিয়াছিল যাহার বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে—

১৬৯২। হাদীছ ঃ— (৭৬০ পৃঃ) عن عائشة رضى الله تعالى عنها

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُرِيْتُكِ فِى الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ

اِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكِ فِىْ سَرَقَةِ حَرِيْرٍ فَيَقُوْلُ هٰذِهِ اِمْرَأَتُكَ فَاكْشِفْهَا

فَاِذَا هِىَ اَنْتِ فَاَقُوْلُ اِنْ يَكُنْ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهِ -

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাকে বলিয়াছেন, স্বপ্নে আমায় দুইবার তোমাকে দেখান হইয়াছে—একটি লোক রেশমী কাপড়ে তোমাকে বহন করিয়া নিয়া আসিয়াছে, অতঃপর সে যেন আমাকে বলিতেছে, এইটি আপনার স্ত্রী। সে মতে আমি রেশমী কাপড়ের আবরণ উন্মোচন করিলাম এবং দেখিতে পাইলাম যে, তুমি-ই।

নিদ্রা ভঙ্গের পর আমি ভাবিলাম, ইহা যখন আল্লার তরফ হইতে তবে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই ইহাকে বাস্তবায়িত করিবেন।

১৬৯৩। হাদীছ ঃ—(৫৫১ পৃঃ) ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (আয়েশা (রাঃ) হইতে) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদিনায় হিজরত করিয়া আসিবার পূর্ব্বের তৃতীয় বৎসর বিবি খাদিজা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার মৃত্যু হইয়াছিল। অতঃপর হযরত (দঃ) দুই বৎসর বা দুই বৎসরের নিকটবর্ত্তী (অর্থাৎ দুই বৎসরের অধিক, কিন্তু তিন অপেক্ষা অনেক কম—দুই বৎসর চার মাস মক্কায়) অবস্থান করিয়াছেন। (এই সময়েই) আয়েশা (রাঃ)কে বিবাহের ইজাব-কবুলে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ছয় বৎসর ছিল। অতঃপর তাঁহাকে ব্যবহারে আনিয়াছিলেন (মদিনায় পৌঁছিয়া;) তখন তাঁহার বয়স নয় বৎসর ছিল।

১৬৯৪। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি বলিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি যদি কোথাও অবতরণ করেন এবং তথায় একটি বৃক্ষ দেখেন যাহাকে কাহারও পশু খাইয়াছে; আর একটি বৃক্ষ দেখেন যাহাকে কাহারও পশু খায় নাই। এমতাবস্থায় আপনি আপনার পশুকে উক্ত বৃক্ষদ্বয়ের কোন্‌টি খাইতে দিবেন? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, যেই বৃক্ষটি খাওয়া হয় নাই।

আয়েশা (রাঃ) এই দৃষ্টান্তে বুঝাইতে চাহিতেছিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবিগণের মধ্যে একমাত্র আয়েশা (রাঃ)ই কুমারী ছিলেন। ৭৬০ পৃঃ

ব্যাখ্যা ঃ—হযরতের সহিত বিবি আয়েশার ভালবাসা ও অন্তরঙ্গতার ভঙ্গিমা-সুলভ খোশ-আলাপের একটি অধ্যায় ছিল এই প্রশ্নোত্তর। নবীজীর হৃদয়কে আকৃষ্ট করার জন্য সকলেই সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। বিবি আয়েশার উল্লেখিত খোশ-আলাপটা সেই উদ্দেশ্যেরই ছিল।

১৬৯৫। হাদীছ ঃ—ওরওয়া (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আবুবকর রাজিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর নিকট বিবি আয়েশার বিবাহ-প্রস্তাব পাঠাইলে আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, আপনি ত আমাকে ভ্রাতা বলিয়া থাকেন (সেই হিসাবে আয়েশা আপনার ভাগনী)। নবী (দঃ) বলিলেন, আপনি আমার ধর্ম্মীয় ভ্রাতা এবং কোরআনের উক্তিরূপের ভ্রাতা সুতরাং আয়েশাকে বিবাহ করার বৈধতায় আমার জন্য কোন বাধা নাই। ৭৬০ পৃঃ

ব্যাখ্যা :—পবিত্র কোরআনে আছে— إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ "সকল মোসলমান পরস্পর ভাই ভাই।" এই আয়াতের প্রতিই নবী (দঃ) ইঙ্গিত করিয়াছেন।

উর্দ্ধজগত হইতে ইঙ্গিত পাওয়ার পর নবীজী (দঃ) এই বিবাহের প্রস্তাবদানে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। নবীর স্বপ্নত অকাট্য অহী, সেমতে এই বিবাহ প্রস্তাব অহী দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছিল। তাই পঞ্চাশ বৎসরের বর, ছয় বৎসরের কন্যা—বয়সের এই অসামঞ্জস্যতা সত্ত্বেও এই প্রস্তাব প্রদান ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। নবীজীর প্রাণও হয়ত এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানাইয়া ছিল; কারণ, নবীজীর সেবা ও শ্রদ্ধায় আবুবকরের যে অপরিসীম দান ছিল তাহার স্বীকৃতি স্বয়ং নবী (দঃ) এই ভাষায় দিয়া থাকিতেন—

إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا
خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ

"বিশ্বজোড়া মানুষের মধ্যে স্বীয় জান ও মাল দ্বারা আমার প্রতি সর্ব্বাধিক উপকার করিয়াছেন আবুবকর। আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার ভিন্ন অন্য কাহাকেও অন্তরঙ্গ বন্ধু বানানো আমার জন্য সম্ভব হইলে অবশ্যই আবুবকরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাইতাম। তবে ইসলামের ভ্রাতৃত্ব এবং উহার ভালবাসা তাহার জন্য (আমার অন্তরে সর্ব্বাধিক) রহিয়াছে।" এই আন্তরিক স্বীকৃতিকে কার্য্যতঃও প্রকাশ করার সুযোগ পাইয়া নবীজীও হয়ত পুলকিত ও আনন্দিত ছিলেন। আবুবকরের আনন্দের ত কোন সীমাই ছিল না। যাঁহার চরণে আবুবকরের সর্ব্বস্ব উৎসর্গ তাঁহারই চরণে তাঁহারই সেবায় স্বীয় স্নেহের দুলালীকে অর্পণ করিবেন—এই গৌরব এই আনন্দ কি আবুবকরের অন্তরে সামাই হয়?

১৬৯৬। হাদীছ :—(৫৫১ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন তখন আমার বয়স ছয় বৎসর (পূর্ণ হইয়া সপ্তম বৎসর আরম্ভ) হইয়াছিল।

(আবুবকর (রাঃ) একাই হযরতের সঙ্গে হিজরত করিয়া মদিনায় পৌঁছিয়াছিলেন, মদিনায় আসিয়া বসবাসের ব্যবস্থা করার পর তাঁহারা উভয়েই নিজ নিজ পরিবার-বর্গকে নিয়া আসিবার জন্য মক্কায় লোক পাঠাইয়াছিলেন।) অতঃপর আমরা মদিনায় পৌঁছিলাম এবং বনুল-হারেছ-এর মহল্লায় অবস্থান করিলাম। আমি ভয়ানক জ্বরে পতিত হইলাম, এমনকি আমার মাথার চুল ঝড়িয়া গেল। অতঃপর

জ্বর হইতে আরোগ্য লাভ করতঃ চেষ্টা তদবীর করিয়া চুলগুলা একটু বড় করা হইল যে, উহা কাঁধ পর্য্যন্ত পৌঁছিল।

একদা আমি আমার কতিপয় বান্ধবীর সহিত ঝুলনায় বসিয়া ঝুলিয়া খেলা করিতেছিলাম, হঠাৎ আমার মাতা আসিয়া আমাকে ডাকিয়া নিয়া গেলেন; আমি কিছুই বুঝিতে ছিলাম না যে, কি উদ্দেশ্যে আমাকে ডাকিয়া আনিলেন। তিনি আমাকে হাত ধরিয়া বাড়ী নিয়া আসিলেন, তখনও আমার শ্বাস ফুলিতেছিল। আমার শ্বাস স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবার পর তিনি আমার মাথা ও মুখ-মণ্ডল পানি দ্বারা মুছিয়া দিলেন এবং আমাকে ঘরের ভিতর নিয়া আসিলেন; তথায় মদিনাবাসীনী কতিপয় মহিলা বসিয়াছিলেন। তাঁহারা আমার প্রতি শুভ এবং মঙ্গল ও কল্যাণের আশীর্ব্বাদবাণীর ধ্বনি দিয়া উঠিলেন। আমার মাতা আমাকে তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিয়া দিলেন। তাঁহারা আমার বেশ-ভূষার পরিপাটি করিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরের ভিতর হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তশরীফ আনিলেন, তখন বেলা উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছিল। অতঃপর ঐ মহিলাগণ আমাকে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমীপে সমর্পণ করিয়া দিল। আমার বয়স তখন নয় বৎসর।

তায়েফের ছফর ঃ

খাজা আবুতালেব এবং বিবি খাদিজা (রাঃ) আর দুনিয়ায় নাই; নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বাহ্যিক আশ্রয়স্থলও আর দুনিয়াতে নাই। বিবি খাদিজা (রাঃ) ছিলেন নবীজীর গৃহ-অঙ্গনের আশ্রয়, আর খাজা আবুতালেব ছিলেন বাহিরের আশ্রয়; এখন নবীজীর উভয় দিক উজাড় হইয়া গিয়াছে। নবীজীর শান্তির নীরই শুধু ভাঙ্গে নাই, উহার বৃক্ষেরও পতন হইয়াছে। স্বাভাবিক ভাবেই নবীজীর ভৌতিক দেহ-মন ভাঙ্গিয়া পড়ার কথা। তদুপরি মক্কার দুর্বৃত্ত শত্রুরা নবীজীর উপর জুলুম অত্যাচারে স্বরাজ পাইয়াছে, তাহাদের জন্য অত্যাচারের পথ একেবারে নিষ্কণ্টক হইয়া গিয়াছে। এত দিন আবুতালেবের জন্য বিশেষ কিছু করিতে পারিত না; এখন সেই বাধা দূর হইয়াছে। তাহাদের ধারনায় নবীজী এখন নিরাশ্রয়। তাঁহাকে লইয়া যাহা খুশি করা যায়—নবীজীর প্রতি অত্যাচার ও নির্য্যাতন চালাইতে এই ভাবিয়া কোরেশরা দ্বিগুণ উৎসাহে মাতিয়া উঠিল। মনের ক্ষোভ মিটাইয়া তাহারা নবীজী (দঃ)কে উৎপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল।

নবীজীর গৃহভ্যন্তরে আহার্য্য রান্নার পাত্রে দুর্বৃত্তরা ময়লা-গলিজ পচা-গান্দা আবর্জ্জনা ফেলিয়া যাইত (বেদায়াহ, ৩—১৩৪)। নবীজীর গৃহে মরা-পচা ফেলিয়া যাইত; নবীজী উহা লাঠির মাথায় উঠাইয়া অপসারিত করিতেন এবং উচ্চ কণ্ঠে বলিতেন, হে আবদে-মনাফের বংশধর (কোরায়েশ)! এই কি প্রতিবেশ ধর্ম্ম?

নবীজী আল্লার ঘরের নিকটে নামায পড়িতেন ; সেজদাবস্থায় দুরাচাররা কখনও উটের উজড়ী কখনও বা সদ্যপ্রসূতা ছাগীর ফুল ইত্যাদি আবর্জ্জনা তাঁহার উপর ফেলিয়া দিত ; নবীজীর অসহায় শোকাতুর মেয়েদের কেহ সংবাদ পাইয়া উহা অপসারণ করিতেন। একদা নবীজী (দঃ) পথ বহিয়া চলিয়াছেন ; এক নরাধম ছুটিয়া আসিয়া কতকগুলি ধূলা-বালি ও আবর্জ্জনা নবীজীর মাথার উপর ফেলিয়া গেল। নবীজী সেই অবস্থায় গৃহে আসিলেন ; এখন তাঁহার গৃহে কে আছে যে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবে, তাঁহার সেবা করিবে ? নবীজীর এক কন্যা আসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার মাথা পরিষ্কার করিয়া দিতে লাগিলেন। শোকাবিষ্টা মা-হারা কন্যার অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে দেখিয়া নবীজী তাঁহাকে স্নেহভরে বলিলেন, মা! কাঁদিও না ; আল্লাহ তোমার পিতাকে রক্ষা করিবেন। নরাধমেরা এই শ্রেণীর অসভ্যপনা চালাইয়া যাইতে লাগিল ; পথে-ঘাটে নীচ ভাষায় গালাগালি ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ত কথাই ছিল না। এতদ্ভিন্ন দৈহিক নির্য্যাতন চালাইতেও তাহারা দ্বিধা করিত না। নবীজী (দঃ) কা'বা শরীফের নিকটে নামায পড়িতেছিলেন এক দুরাচার পাপাত্মা আসিয়া তাঁহার গলায় চাদর দিয়া ফাঁস লাগাইয়া দিল, এমনকি নবীজীর শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। আবুবকর (রাঃ) ছুটিয়া আসিলেন এবং নিজের উপর বিপদের ঝুঁকি লইয়া দুর্বৃত্তকে সজোরে ধাক্কা দিলেন ; সে দূরে সরিয়া পড়িল— এইরূপে নবীজী রেহায়ী পাইলেন। এই শ্রেণীরই আর একটি ঘটনা নিয়ে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে—

১৬৯৭। হাদীছ ঃ— (৭৪০ পৃঃ) عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه

قَالَ اَبُو جَهْلٍ لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّى عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَاَطَأَنَّ عَلَى عُنُقِهٖ

فَبَلَغَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ فَعَلَهٗ لَاَخَذَتْهُ الْمَلٰئِكَةُ

অর্থ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা (পাষণ্ড খবিশ) আবুজহল তাহার সংকল্প প্রকাশ করিল, আমি যদি মোহাম্মদকে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) কা'বা ঘরের নিকটে নামায পড়িতে দেখি তবে কসম করিয়া বলি, আমি তাহার ঘাড় পাড়াইয়া পিষ্ট করিয়া দিব। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহার এই সংকল্পের সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, সেইরূপ করিলে (আল্লাহ তায়ালার) ফেরেশতা তাহাকে ধরিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিবেন।

ব্যাখ্যা ঃ—পবিত্র কোরআনে "একরা" ছুরায় এই বিষয়ের আলোচনা রহিয়াছে—

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ - عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ - أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ -

أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ........ كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ - نَاصِيَةٍ

كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ - فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ *

"দেখ ত! ঐ পাপিষ্টের দৌরাত্ম যে, আমার বিশিষ্ট বন্দা যখন নামায পড়েন তখন সে বাধার সৃষ্টি করিতে চায়। দেখ ত, তাহার পাপাচরণ! আমার ঐ বন্দা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আমার ভয়-ভক্তি শিক্ষাদানকারী, আর এই পাপিষ্ঠ সত্যকে স্বীকার করে না, আমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখে। তাহার এই দৌরাত্ম কিছুতেই চলিতে দেওয়া হইবে না। যদি সে বিরত না থাকে তবে পাপ ও মিথ্যা তথা অহঙ্কারের প্রতীক তাহার মাথার লম্বা চুলগুলি ধরিয়া তাহাকে হেঁচড়াইয়া টানিয়া আনিব। সে যেন তাহার দলবলকে সাহায্যের জন্য ডাকিয়া আনে; আমি নরকের পেয়াদা ফেরেশতাকে ডাকিব। (ঐ ফেরেশতা তাহাকে সেইভাবে হেঁচড়াইয়া অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দিবে।)"

নাছায়ী শরীফের হাদীছে উল্লেখ আছে—ঐ দুরাত্মা পাপিষ্ঠ আবুজহল একদা তাহার ঐ নরকীয় সংকল্প বাস্তবায়িত করার জন্য অগ্রসর হইয়া হঠাৎ ভীত-সন্ত্রস্তরূপে ত্রাসের সহিত পেছনে হটিয়া আসিল। তাহার লোকেরা তাহাকে এইরূপ ভীতি ও ত্রাসের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল,লেলীহান অগ্নির খন্দক ও ভয়াল আকৃতি; আমি পা বাড়াইলেই আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিত।

মক্কার দুরাচার নরকীয় আত্মার পাষণ্ডদের পক্ষ হইতে এইভাবে দিনের পর দিন লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ চলিতে লাগিল। অথচ দুনিয়ায় আজ নবীজীর এমন কোন দরদী নাই যে এই দুর্দিনে তাঁহার সান্ত্বনা যোগাইবে। বাহিরের জন্য তাহার কেহ মুরব্বি আশ্রয়ের সম্বল নাই, গৃহে তাঁহার স্ত্রী নাই। নবীজীর জন্য আছে শুধু চতুর্দিকের অন্ধকার—আবুতালেবের ন্যায় পিতৃব্যের বিয়োগ, পূণ্যবতী খাদিজার ন্যায় স্বর্গীয় সুষমাময়ী স্ত্রী সহধর্ম্মিণীর বিচ্ছেদ, আর মাতৃহারা কন্যাগণের বিষাদমাখা ম্লান মুখ। আর আছে এই চরম হতাশাময় অবস্থায় নরাধম পাপিষ্ঠদের অকথ্য অত্যাচার।

একদিকে এতগুলি বিপদের একত্র সমাবেশ, অপর দিকে নবুয়তের দায়িত্ব—ইসলাম-প্রচার-কর্ত্তব্যের অলঙ্ঘনীয় আদেশ। এই চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াও নবীজী মোস্তফার হৃদয় স্বীয় দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালনে এক বিন্দু দমিত বা বিচলিত হইল না, তাঁহার লক্ষ্য বিচ্যুত হইল না, তাঁহার জ্ঞানে-ধ্যানে মনে-প্রাণে একই বিষয়—আল্লার দ্বীন প্রচার করা। কিন্তু তাঁহার ইহা বুঝিতেও বাকি থাকিল না যে, মক্কায়

ইসলাম প্রচার বর্ত্তমানে অসম্ভব ও নিষ্ফল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই নবীজী মোস্তফা (দঃ) কর্ত্তব্যে দৃঢ় ও কর্ম্মের পিয়াসী হইয়া ধীরস্থির চিত্তে বিকল্প পন্থার চিন্তা করিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি তায়েফ গমন করিতে মনস্থ করিলেন।

মক্কা হইতে প্রায় ৭০।৮০ মাইল দূরে অবস্থিত তায়েফ নগরী; উহা এতই সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা যে, উহা স্বর্গ বা বেহেশ্‌ত হইতে বিচ্যুত ভূখণ্ড বলিয়া কথিত। ব্যবসা-বাণিজ্যে মক্কাবাসীদের সহিত তায়েফবাসীদের পরিচয়ও ছিল, পরস্পর বৈবাহিক আদান-প্রদানও প্রচলিত ছিল। বিশেষতঃ কা'বা শরীফই তায়েফবাসীদেরও তীর্থস্থান ছিল: হজ্জ উপলক্ষে তায়েফবাসীদেরও মক্কায় আগমন হইত। কোরেশ প্রধান অনেকেরই তায়েফে বাগ-বাগিচাও ছিল। মক্কার পর এই তায়েফকেই নবীজী মোস্তফা (দঃ) নিজ কর্ম্মস্থল ও ইসলামের প্রচার-কেন্দ্র বানাইবার পরিকল্পনা করিলেন।

সেমতে পূর্ব্বালোচিত উম্মুল-মোমেনীন ছওদা (রাঃ)কে যিনি বেশী বয়সেরও ছিলেন এবং সংসার পরিচালনার অভিজ্ঞতা সম্পন্নাও ছিলেন, পাঁচ-ছয়টি সন্তানের মা হইয়া ছিলেন—তাঁহাকে বিবাহ করিয়া নবীজী (দঃ) নিজের ঘরের শৃঙ্খলা আনয়নের ব্যবস্থা করিলেন। ঘরে তাঁহার বিবাহিতা অবিবাহিতা চারিটি কন্যা ছিল—এই মাতৃহারা কন্যাদের জন্য গৃহ সামলাইবার ব্যবস্থা করিয়া নবীজী মোস্তফা (দঃ) তায়েফ গমনের ব্যবস্থা সম্পন্ন করিলেন।

নবীজী মোস্তফা (দঃ) তায়েফের পথে যাত্রা করিলেন; তাঁহার একমাত্র সঙ্গী হইলেন তাঁহার প্রিয় ভক্ত অনুরক্ত পালিত পুত্র যায়েদ (রাঃ)। দুর্গম গিরি-কান্তার পার হইয়া নবীজী (দঃ) যায়েদ (রাঃ) সহ তায়েফ নগরীতে উপনীত হইলেন। তাঁহারা তায়েফ পর্য্যন্ত ৭০।৮০ মাইলের দীর্ঘ পথ পদব্রজে অতিক্রম করিলেন (যোরকানী ১—৩০৫)। তায়েফ অঞ্চলে যে সকল গোত্র বাস করিত "বনীছকীফ" গোত্র তাহাদের মধ্যে প্রধান ছিল। সেই ছকীফ গোত্রে আব্দেয়্যালীল, মসউদ ও হাবীব এই ভ্রাতাত্রয় বংশ-প্রধান এবং তথাকার সর্দার বা সমাজপতি ছিল। তাহাদের একজনের নিকট কোরেশবংশীয়া একটি কন্যাও বিবাহিতা ছিল। নবী (দঃ) সর্ব্বপ্রথমে ইহাদের নিকটই গমন করিলেন। এই প্রধানগণের নিকট উপস্থিত হইয়া নবীজী (দঃ) তাহাদিগকে আল্লাহ পানে আহ্বান করিলেন। এবং সত্যের প্রচারে কোরেশদের অন্যায়পূর্ব্বক বাধা দানের ঘটনাবলী ব্যক্ত করিয়া তাহাদিগকে সত্যের সহায়তা করিতে অনুরোধ করিলেন। তায়েফবাসীরাও কোরেশদের ন্যায় পৌত্তলিক ছিল এবং তাহারা শস্য-শ্যামল দেশে অর্থ-সম্পদের অধিকারী ছিল—সেই অহঙ্কার এবং গর্ব্বও ছিল তাহাদের ভিতরে বদ্ধমূল। ছকীফ দলপতিগণ নবীজীর আহ্বান-অনুরোধকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করিল। তাহাদের একজনে ত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া ইহাও বলিল, "আল্লাহ বুঝি খুঁজিয়া খুঁজিয়া আর লোক পাইল না, তোমাকেই পয়গাম্বর করিল!"

নবীজী মোস্তফা (দঃ) উপস্থিত তাহাদের আশা ত্যাগ করিলেন। অবশেষে নবীজী (দঃ) তাহাদেরে অনুরোধ করিলেন, তাহারা যেন নবীজী সম্পর্কে তাহাদের এই মনোভাব গোপন রাখে। তিনি ভাবিলেন, তাহারা যদি তাহাদের এই বিষাক্ত মনোভাব প্রচার করিয়া বেড়ায় তবে জনসাধারণের মধ্যে সত্যের প্রচার দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। তাহাদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইবে, ফলে তায়েফের অবস্থাও মক্কার ন্যায় হইয়া উঠিবে ; নবীজী এবং ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা ব্যাপক আকারে ছড়াইয়া পরিবে। ছকীফ-প্রধানগণ নবীজীর এই অনুরোধও রক্ষা করিল না। তাহারা তায়েফের দুষ্ট দুরাত্মা দুরাচার লোকদেরকে লেলাইয়া দিল, দেশবাসীকে নবীজীর বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিল। এমনকি তাহাদের চাকর ও দাসগুলিকে পর্য্যন্ত নবীজীর পেছনে লাগাইয়া দিল। এখন নবীজী কোথাও বাহির হইলেই ঐ সব লোকেরা হৈ হৈ করিয়া তাঁহার চারিদিকে সমবেত হইতে থাকে। পথ চলিতে লাগিলে পেছনে পেছনে বিদ্রূপ গালাগালি বর্ষণ করিয়া চলে, শুধু তাহাই নহে—পাষণ্ডেরা তাঁহার প্রতি ইট-পাথর মারিতে মারিতে তাঁহার দেহ মোবারক রক্তাক্ত করিয়া ফেলে। অনেক সময় মর্দ্দেরা পথের দুই ধারে সারি দিয়া বসিয়া থাকিত ; নবীজী পথ চলার সময় তাঁহার চরণযুগল লক্ষ্য করিয়া পাথর বর্ষন করিতে থাকিত। ফলে নবীজীর কোমল চরণদ্বয় রক্তাক্ত হইয়া যাইত, এমনকি পায়ের রক্ত শুকাইয়া জমাট বাঁধিয়া জুতা পায়ে আটকিয়া যাইত।

অসহণীয় প্রস্তরাঘাতে সময় সময় নবীজী অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িতেন ; তখন পাষাণ্ডরা তাঁহাকে দুই বাহু ধরিয়া তুলিয়া দিত এবং তিনি চলিতে আরম্ভ করিলে তাহারা পুনরায় প্রস্তর বর্ষণ আরম্ভ করিত। এই সময় নরাধমদের বিকট হাস্যরোল জমিয়া উঠিত এবং হৈ হৈ ধ্বনির রোল পড়িয়া যাইত।

তায়েফ প্রবাসে নবীজীর উপর যে অত্যাচার হইয়াছিল, তিনি যে দুঃখ কষ্ট ও নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন উহার অনুমান করার জন্য তৃতীয় খণ্ডের ১৫১৪ নং হাদীছখানা লক্ষ্য করা যথেষ্ট। উহাতে স্বয়ং হযরতের মুখের বিবৃতি বর্ণিত রহিয়াছে—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি একদা হযরতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওহোদ রণাঙ্গনের অবস্থা অপেক্ষা কঠিনতর অবস্থা আপনার জীবনে আর কখনও উপস্থিত হইয়াছিল কি ? উত্তরে হযরত (দঃ) তায়েফবাসীদের নির্য্যাতনে সর্ব্বাধিক দুঃখ কষ্ট পাওয়ার কথা উল্লেখ পূর্ব্বক তাহাদের অত্যাচারের লোমহর্ষক কাহিনী তুলিয়া ধরিলেন।

ওহোদের জেহাদে স্বয়ং নবীজীর দাঁত ভাঙ্গিয়াছিল, মাথা ভাঙ্গিয়াছিল, তদুপরি সারা দেহ মোবারকে একশতের অধিক আঘাত লাগিয়াছিল। প্রিয় পিতৃব্য হামজা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মর্ম্মান্তিক শাহাদৎ বরণ এবং আবুসুফিয়ান-স্ত্রী হেন্দা কর্তৃক তাঁহার বক্ষ ফাড়িয়া কলিজা চিবানোর দৃশ্য সহ সত্তর জন ছাহাবীর শাহাদতের

মানসিক আঘাতও কম ছিল না। নিকটবর্ত্তী সময়ের সেই ওহোদের দুঃখ-কষ্ট অপেক্ষা প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা তায়েফের ঘটনার দুঃখ কষ্টকে অধিক বলা কতই না তাৎপর্য্যপূর্ণ! বিশেষতঃ এত দীর্ঘ দিন পর্য্যন্ত তায়েফের দুঃখ-কষ্টের বিষয় নবীর অন্তরে দাগ কাটিয়া থাকা কি সহজ কথা!

নবীজীর সঙ্গী ভক্ত অনুরক্ত পালিত পুত্র যায়েদ নিজের জান-প্রাণ দিয়া নবীজীকে রক্ষা কারার ব্যবস্থা নিশ্চয় করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি একা এই পরিস্থিতিতে কি করিতে পারেন? তিনিও মাথায় ভীষণভাবে আঘাত খাইয়াছিলেন।

আঘাতের উপর আঘাতে আল্লার পেয়ারা রসুল নবীজী মোস্তফা (দঃ) ক্রমশঃ অবসন্ন ও অচৈতন্য হইয়া পড়িতে লাগিলেন। পাষাণ্ডদের অত্যাচার ভীষণ হইতে ভীষণতর আকার ধারণ করিল; এমতাবস্থায় তিনি পথিপার্শে একটি বাগানের নিকট পৌঁছিলেন; বাগানটি ছিল মক্কার দুই ভ্রাতা রবিআ-পুত্র ওৎবা ও শায়বার। মালিকদ্বয় বাগানে উপস্থিত ছিল, নবীজী (দঃ) ঐ বাগানে আঙ্গুর গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন; তাঁহার দেহ এবং পা হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল। এই সময় দুর্বৃত্তেরা চলিয়া গিয়াছে; নবীজীর চেতনা ও কিঞ্চিৎ স্বস্তি ফিরিয়া আসিয়াছে, এখন তিনি ক্ষতবিক্ষত দেহের প্রতি লক্ষ্য করিতে পারিলেন, অবস্থার অনুভূতি করার মত জ্ঞান-বোধ তাহার ফিরিয়াছে। এই সময় তিনি শান্তি লাভের জন্য শান্তির মূল কেন্দ্র রহমানুর-রহীম রাব্বুল-আলামীন সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু-পরওয়ারদেগারের দরবারে উপস্থিতির ব্যবস্থা করিলেন। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছুন্নত এবং তাঁহার নীতি ছিল—

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى

"ছাহাবী হোযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অভ্যাস ছিল—কোন বিষয়ে যখন তিনি বিব্রত হইতেন, চিন্তা ও অশান্তি অনুভব করিতেন তখন তিনি নামাযের আশ্রয় নিতেন। (মেশকাত শরীফ ১১৭)

সেমতে নবীজী মোস্তফা (দঃ) এই চরম দুঃখ-বেদনা, দুরবস্থা ও দুর্দশার সময়ে শরণাপন্ন হইলেন পরম আপন আল্লাহ তায়ালার এবং দুই রাকাত নামায পড়িলেন। নামাযান্তে তিনি ঐ মহানের দরবারে মোনাজাতের হাত তুলিলেন যাঁহার পথে তিনি এই দুর্দশা ও দূর্ভোগের শিকার হইয়াছেন (যোরকানী, ১—৩০৫)। নবীজী সেই মহানকেই একমাত্র আপনজনরূপে সম্বোধন করিয়া দোয়া ও প্রার্থনা করিলেন। দুরবস্থার চরম দৃশ্যের সম্মুখে নবীজীর ঐ প্রার্থনার প্রতিটি পদ ও বাক্যই ভাবের আবেগে পরিপূর্ণ এবং আল্লাহতে আত্ম-নির্ভরশীলতায় পূর্ণতম ও পূণ্যতম আদর্শ।

নবীজী মোস্তফার বিশাল অন্তরে যে অসীম প্রেরণার ভীষণ উচ্ছ্বাস ছিল, আল্লাহতে প্রগাঢ় বিশ্বাসের যে অটুট বন্ধন ছিল, আল্লাহমুখিতার যে অসাধারণ ভাবাবেশ ছিল— এই প্রার্থনা বা দোয়াটি উহার উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি।

দোয়াটির আবেগপূর্ণ ভাষা ও ভঙ্গিমায় শত্রুও বলিতে বাধ্য হয়—বিশ্বের প্রতি নবীজী মোস্তফার ডাক ও আহ্বান যে, স্বর্গীয় ও ঐশ্বরিক উহার প্রচুর বিশ্বাসের উপর তীব্র আলোকপাত করে তাঁহার এই প্রার্থনা বা দোয়া।

নবীজীর জীবনী রচনার নামে নিকৃষ্টতম শত্রুতার অবতারণাকারীও আলোচ্য দোয়াটির ভাবাবেগে মুগ্ধ হইয়া স্বীকার করিয়াছে—

"It sheds a strong Light on the intensity of his belief in the divine origin of his calling (life of mohamet, by mwir)। দোয়াটি এই—

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُوْ ضُعْفَ قُوَّتِىْ وَقِلَّةَ حِيْلَتِىْ وَهَوَانِىْ عَلَى النَّاسِ

اَللّٰهُمَّ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَاَنْتَ رَبِّىْ -

اِلٰى مَنْ تَكِلُنِىْ اِلٰى بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِىْ اَوْ اِلٰى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهٗ اَمْرِىْ

اِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَىَّ فَلَا اُبَالِىْ وَلٰكِنْ عَافِيَتُكَ هِىَ اَوْسَعُ لِىْ -

اَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِىْ اَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ اَمْرُ

الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مِنْ اَنْ يَنْزِلَ بِىْ غَضَبُكَ اَوْ يَحِلَّ عَلَىَّ سَخَطُكَ لَكَ

الْعُتْبٰى حَتّٰى تَرْضٰى لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ

"আয় আল্লাহ! তোমারই নিকট ব্যক্ত করিতেছি, আমার দুর্ব্বলতা এবং এই লোকদের দৃষ্টিতে আমার হেয়তা। হে আল্লাহ হে পরম দয়াময়! তুমি সকল দুর্ব্বলদের পালনকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা, তুমিই আমারও পালনকর্ত্তা রক্ষাকর্ত্তা। তুমি আমাকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিতেছ? অপরের হস্তে—যে আমার প্রতি আক্রমণে উদ্যত হইয়া আসে? বা শত্রুর হস্তে—যাহার ক্ষমতায় দিয়া দিয়াছ আমার সব কিছু? প্রভু হে! (আমার একমাত্র কাম্য তোমার সন্তোষ;) আমার প্রতি তোমার অসন্তোষ না থাকিলে আমি এই সব বিপদ-আপদের কোন পরওয়া করি না; তবে তোমার নিরাপত্তা ও শান্তির দান আমার জন্যও প্রশস্ত; (আমি উহা হইতে বঞ্চিত হইব কেন?) প্রভু হে! তোমার যেই পুণ্য জ্যোতির প্রভাবে সকল অন্ধকার তিরোহিত হইয়া যায়, যাহার কল্যাণে ইহ-পরকালের সর্ব্ববিষয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা

প্রতিষ্ঠিত হয়—সেই পুণ্য জ্যোতির শরণ লইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তোমার অসন্তোষ যেন আমাকে ছুঁইতেও না পারে, তোমার কোপ বা অনল-দৃষ্টি যেন আমার উপর পতিত না হয়। তোমার সন্তোষই আমার একমাত্র কাম্য; আমি যেন সর্ব্বদা তোমার সন্তোষ লাভ করিতে পারি। তুমি আমার প্রতি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাক ইহাই আমার আরাধনা। আমার বল-ভরসা একমাত্র তুমিই, তুমি ভিন্ন আমার কোন সম্বল নাই; আমার শক্তি-সামর্থ সব কিছু তোমার উপর নির্ভর করে। (বেদায়াহ, ৩—১৩৬)

বাগানের মালিক ওৎবা ও শায়বা কাফের এবং ইসলাম ও নবীজীর পরম শত্রু ছিল, এমনকি শেষ পর্য্যন্ত তাহারা কাফের থাকিয়া বদর রণাঙ্গনে নিহত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের বাগানে উপস্থিত নবীজী মোস্তফার রক্ত-ঝরা দেহের এমনই মর্ম্মান্তিক দৃশ্য ছিল যে, উহা দেখিলে আত্মঘাতি পরম শত্রুও চরম নিষ্ঠুর না হইলে নিশ্চয় তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের করুণ অবস্থা দৃষ্টে ওৎবা ও শায়বার ন্যায় পরম শত্রুর অন্তরেও দয়া সৃষ্টি হইল। তাহাদের বাগানের মালী ছিল এক খৃষ্টান "আদ্দাছ রুমী"; তাহারা মালীকে বলিল, গাছের এক ছড়া আঙ্গুর পাত্রে করিয়া ঐ লোকটিকে দিয়া আস; তাঁহাকে উহা খাইতে বলিবা। আদ্দাস হযরতের সম্মুখে আঙ্গুরের ছড়া রাখিয়া দিল। হযরত (দঃ) বিছমিল্লাহের-রহমানের-রাহীম বলিয়া উহা হইতে গ্রহণ করা আরম্ভ করিলেন। আদ্দাস উক্ত বাক্য শ্রবনে হযরতের নূরানী চেহেরার প্রতি তাকাইল এবং বলিল, এইরূপ বাক্য ত এই দেশের লোকের মুখে কখনও শুনা যায় না। হযরত (দঃ) তাহার ধর্ম্ম ও দেশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, আমি ঈসায়ী ধর্ম্মের, আমার দেশ হইল (ইরাকস্থিত "মাসুল" এলাকায়) "নীনওয়া" অঞ্চলে। হযরত (দঃ) বলিলেন, উহা ত এক বিশিষ্ট ব্যক্তি—ইউনুস (আলাইহেচ্ছালাম)-এর দেশ। হযরতের এই উক্তিতে আদ্দাস আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি তাহা জানেন কিরূপে? হযরত (দঃ) বলিলেন, তিনি আমার সম শ্রেণীর ভ্রাতা—তিনি আমার মতই একজন নবী ছিলেন। এতচ্ছ্রবনে আদ্দাস হযরতের হাত, পা, মাথা চুম্বন করতঃ ইসলাম গ্রহণ করিলেন।*

---

* ১৯৬১ সনে পবিত্র হজ্জের সুযোগে আল্লাহ তায়ালা এই নরাধমকে তায়েফ উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করিয়াছিলেন। এখনও তথাকার বড় একটি রাস্তা "শারেয়ে-আদ্দাস—আদ্দাস রোড" নামে বিদ্যমান রহিয়াছে।

বহু চেষ্টা ও কষ্ট করিয়া উক্ত বাগান স্থানেও পৌছার তৌফিক হইয়াছিল। এখনও তথায় আঙ্গুর, শফরি, আঞ্জির ইত্যাদি বিভিন্ন ফল-ফলাদির সমাবেশে একটি উর্ব্বর বাগান রহিয়াছে।

(পর পৃষ্ঠায় নীচে দেখুন)

এইরূপ অসহনীয় কষ্ট যাতনার ভিতর দিয়া হযরত (দঃ) শুধু তায়েফ নগরীতে দশ দিন এবং উহার আশে-পাশে আরও কতেক দিন ইসলাম প্রচারের কাজ চালাইলেন। এই সফরে তাঁহার সর্ব্বমোট এক মাস ব্যয় হয়, কিন্তু তিনি যে উদ্দেশ্য নিয়া তায়েফের সফর করিয়াছিলেন তাঁহার সেই উদ্দেশ্য হাসিল হইল না— তায়েফবাসী বনু-সাক্বীফ গোত্র ইসলামের আহ্বানে সাড়া দিল না।

তায়েফবাসীরা হযরতের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে; অত্যাচারী জালিমদের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ ও বদ-দোয়া করিবার এবং তাহাদের ধ্বংস কামনা করিবার জন্য ইহাই বোধ হয় প্রকৃষ্ট সময় ছিল। কিন্তু হযরত তাহাদের প্রতি বদ-দোয়া করেন নাই; কি বলিষ্ঠ ছিল বিশ্ব নবীর বিশ্ব প্রেম! কি প্রাণ-ঢালা মমতা ছিল মানুষের প্রতি! কত প্রশস্ত ছিল তাঁহার হৃদয়! এমনকি আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে ফেরেশতাগণ আসিয়া হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়াছে; হযরত তাঁহাদিগকে অনুমতি দিলেই তাঁহারা সমস্ত তায়েফবাসীকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিবেন, কিন্তু দয়ার সাগর, ধৈর্য্যের পাহাড় রাহ্‌মাতুল্‌লিল-আ'লামীন সেইরূপ অনুমতি মোটেই দেন নাই। বরং তাহারা তাঁহাকে চিনে না বলিয়া তিনি তাহাদিগকে ক্ষমার্হ গণ্য করার জন্য আল্লার দরবারে সুপারিশ করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে হেদায়েত দান করার জন্য দোয়া করিয়াছেন। তাঁহার আশা এত সুদূর প্রসারী ছিল যে, এই উপলক্ষে তিনি বলিয়াছিলেন, যদিও বর্ত্তমান তায়েফবাসী আমার প্রতি ঈমান আনিল না, আমাকে আঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিল, কিন্তু তাহারা বাঁচিয়া থাকিলে তাহাদের ঔরষের সন্তান-সন্ততি হয়ত ঈমান আনিবে। এইসব বিষয় আল্লার দরবারে উল্লেখ করিয়া হযরত (দঃ) তাহাদিগকে আল্লার গজব হইতে রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন। তৃতীয় খণ্ডে ১৫৯৪ নং হাদীছে স্বয়ং নবীজীর বর্ণনায় এই সব তথ্য বর্ণিত আছে।

সাধনার ফলে ধারণা বহির্ভূত আল্লার রহমত আসেঃ

নবীজী মোস্তফা (দঃ) তায়েফ এলাকায় আল্লার দ্বীন প্রচারের জন্য কি সাধনাই না করিলেন! তায়েফবাসীকে আল্লার দ্বীন বুঝাইবার চেষ্টায় কত অত্যাচার ও নির্য্যাতনই না ভোগ করিলেন! কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি তায়েফে তাঁহার উদ্দেশ্যের সফলতা হইতে নিরাশ হইলেন এবং সফর সমাপ্তে ব্যর্থতার ব্যথা ও নিরাশার ম্লান

বাগানের এক স্থানে ছোট একটি মসজিদ রহিয়াছে যাহা "মসজিদে-আদ্দাস" নামে আখ্যায়িত মনে হয় এই স্থানটিতেই হযরত (দঃ) বসিয়াছিলেন এবং আদ্দাস আঙ্গুরের ছড়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়াছিল। এই নরাধমকে আল্লাহ তায়ালা ঐ মোবারক মসজিদে দুই রাকাত নামায আদায় করার সুযোগ দান করিয়াছিলেন।

লইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তনে তায়েফ হইতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার এই সাধনা, এই নির্য্যাতন ভোগ কি একেবারে বিফল যাইবে? আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ "নিশ্চয় আল্লাহ নিষ্ঠাবান লোকদেরে প্রতিদান হইতে বঞ্চিত করেন না।" আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"যে ব্যক্তি আল্লাহনুরাগী হইবে আল্লাহ তাহার উদ্ধার লাভের পথ করিয়া দিবেন এবং তাহার রিজিক (তথা সাফল্য) যোগাইবেন এমন জায়গা হইতে যথা হইতে রিজিক লাভের ধারণাও তাহার ছিল না।"

তায়েফের সাধনার ফল এবং চেষ্টার সাফল্য নবীজী তায়েফে লাভ করিতে পারিলেন না। আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র হইতে নবীজীর ধারণা বহির্ভূত এক সাফল্য দান করিয়া তাঁহার ভাঙ্গা হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চারের আশাতীত ব্যবস্থা করিলেন।

নবীজী তায়েফ হইতে যাত্রা করিয়াছেন; তায়েফের লোকদেরকে আল্লার দ্বীন গ্রহণ করাইতে পারিলেন না—মনে তাঁহার কত ব্যথা! কত নিরাশা! ইহারই মাঝে আনন্দ লাভের এক বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন আল্লাহ তায়ালা। নবীজী মোস্তফা (দঃ) শুধু মানুষেরই নবী নন, তিনি জ্বিনদেরও নবী। জ্বিনদেরকে আল্লার দ্বীন গ্রহণ করানোও তাঁহার দায়িত্ব।

তায়েফ হইতে ফিরার পথে মক্কা হইতে মাত্র এক দিনের পথ ব্যবধানে "নাখ্‌লা" নামক জায়গা; নবীজী (দঃ) তথায় রাত্রি যাপন করিলেন। গভীর রাত্রে নবীজী নামাযে দাঁড়াইয়াছেন; অন্ধকার রজনীতে প্রাণ-ঢালা আবেগ মিশাইয়া মধুর সুরে তিনি মাবুদের কালাম পবিত্র কোরআন সশব্দে তেলাওত করিয়া যাইতেছেন। জ্বিনদের সাত বা নয় সংখ্যক একটি দল ঐ পথে যাইতেছিল। তাহারা পবিত্র কোরআন শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ঈমান গ্রহণ করিল এবং নবীজীর সঙ্গে তাহাদের আলাপও হইল। নবীজী (দঃ) তাহাদের সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করিয়াছেন। তৃতীয় খণ্ড ১৬১৯ নং হাদীছে এই জ্বিন দলেরই উল্লেখ রহিয়াছে। জ্বিনদের এই অপ্রত্যাশিত ঈমান গ্রহণের আলোচনা পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে—

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ - فَلَمَّا حَضَرُوْهُ
قَالُوْا أَنْصِتُوْا - فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ....

(আপনার প্রতি আমার বিশেষ রহমতের একটি ঘটনা—) যখন ধাবমান করিলাম আপনার দিকে জ্বিনদের একটি দল; তাহারা কোরআন শুনিল এবং

নিকটবর্ত্তী আসিয়া পরস্পর বলিল, চুপ করিয়া শোন। যখন (আপনার পড়া) শেষ হইল তখন তাহারা (ঈমান গ্রহণ পূর্ব্বক) নিজেদের জাতির প্রতি চলিয়া গেল ; তাহাদেরে পরকাল সম্পর্কে সতর্ক করিতে লাগিল। তাহারা দেশে যাইয়া বলিল, হে আমাদের জাতি ! আমরা এক মহান কেতাবের পড়া শুনিয়া আসিয়াছি যাহা মূছা নবীর পরে অবতীর্ণ হইয়াছে, উহার পূর্ব্ববর্ত্তী কেতাবসমূহের সমর্থনকারীই বটে। ঐ মহান কেতাব সত্যের প্রতি এবং (আল্লাহ পর্য্যন্ত পৌঁছার) সঠিক পথের প্রতি উজ্জ্বল দিশারী। হে আমাদের জাতি ! সাড়া দাও আল্লার প্রতি আহ্বানকারীর ডাকে এবং তাঁহার প্রতি ঈমান গ্রহণ কর ; পরওয়ারদেগার তোমাদের গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন এবং কষ্টদায়ক আজাব হইতে তোমাদেরে বাঁচাইয়া রাখিবেন। পক্ষান্তরে যে আল্লার প্রতি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিবেনা আল্লার আজাবকে সে কোন মতেই ঠেকাইতে পারিবে না এবং আল্লাহ ভিন্ন তাহার কোন সাহায্যকারীও হইবে না। ঐ শ্রেণীর লোক সুস্পষ্ট ভ্রষ্ট সাব্যস্ত হইবে। (২৬ পাঃ ৪ রুঃ)

আল্লাহ তায়ালার কি রহমত! তায়েফবাসীদের হেদায়েতের জন্য নবীজী কত কষ্ট করিলেন। তাহারা হেদায়েত গ্রহণ করিল না। আল্লাহ তায়ালা নবীজীর সাধনা ও ধৈর্য্যের সুফল ও সাফল্য অন্যত্র হইতে দান করিলেন যে, সুদূর "নছীবীন" নামক এলাকার বাসিন্দা জ্বিনদের এই দলটিকে এই পথে নিয়া আসিলেন। কোন প্রকার চেষ্টা-কষ্ট ব্যতিরেকে তাহাদিগকে মোসলমান দলভূক্ত পাওয়া গেল। তাহারা অনায়াসে ঈমান গ্রহণ করিল এবং নিজেদের বিরাট সম্প্রদায়ে দ্বীন-ইসলামের বড় কর্ম্মী ও প্রচারকের দায়িত্ব পালন করিল। সাধনা ও ধৈর্য্যের ফল এইভাবেই লাভ হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—দীর্ঘ দিন পূর্ব্বে নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম দিকে একদা নবীজী মোস্তফা (দঃ) দ্বীন-ইসলামের প্রচার কার্য্যে আরবের প্রসিদ্ধ বাৎসরিক হাট "ওকায" মেলায় উপস্থিত হওয়ার জন্য এই পথে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ও নবীজী (দঃ) সঙ্গীগণ সহ এই "নখ্‌লা" এলাকায় রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন এবং জমাত করিয়া প্রভাতী নামায পড়িয়াছিলেন। তখনও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, একদল জ্বিন তথায় উপস্থিত হইয়াছিল এবং পবিত্র কোরআন শ্রবণে মোসলমান হইয়াছিল! তাহাদের দ্বারাও জ্বিন সম্প্রদায়ে ইসলাম প্রচারের বিরাট কাজ সমাধা হইতেছিল। তাহাদের ঘটনা বর্ণনায়ও পবিত্র কোরআনের একটি ছুরা অবতীর্ণ হইয়াছিল—যাহা ২৯ পারায় "ছুরা-জ্বিন" নামে প্রসিদ্ধ। তৃতীয় খণ্ড ১৬১৭ নং হাদীছে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণিত আছে।

তায়েফ হইতে মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন ঃ

দীর্ঘ এক মাসের ছফর শেষ করিয়া হযরত (দঃ) মক্কাপানে ফিরিলেন—এবং মক্কা নগরীর হেরা পর্ব্বত এলাকায় আসিয়া থামিলেন। মক্কা নগরীতে হযরতের কোন

বাহ্যিক সাহায্যকারী ছিল না, অথচ এখন ঐরূপ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। কারণ, মক্কার শত্রুদের জুলুম-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া তায়েফ গিয়াছিলেন; তথা হইতে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে; এখন স্বাভাবিক রূপেই মক্কার শত্রুগণ আরও অধিক জুলুম-অত্যাচারে মাতিয়া উঠিবে। এমতাবস্থায় বাহ্যিক আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

আল্লার উপর ভরসা স্থাপনে নবীজী মোস্তফা (দঃ) অপেক্ষা অধিক দৃঢ় দুনিয়াতে কেহ হয় নাই, হইবেও না। মদিনায় হিজরত উপলক্ষে ছৌর পর্ব্বত গুহায় লুকাইয়া থাকাবস্থায় প্রাণঘাতী শত্রুরা খুঁজিতে খুঁজিতে ঠিক ঐ গুহার কিনারায় পৌঁছিল। গুহার ভিতর হইতে সঙ্গী আবুবকর পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ। শত্রুরা নিজেদের পায়ের দিকে তাকাইলেই আমাদেরে দেখিয়া ফেলিবে। এই ভয়াবহ সঙ্কটাপূর্ণ মুহূর্ত্তেও নবীজী মোস্তফা (দঃ) পূর্ণ অবিচল ছিলেন, পর্ব্বৎ অপেক্ষা অধিক অটল ছিলেন; তিনি ধীরস্থির, শান্ত ও গম্ভীর স্বরে আবুবকরকে সান্ত্বনা দানে বলিলেন, لا تحزن ان الله معنا "চিন্তা করিও না; আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।" এই শ্রেণীর ঘটনা ভূরি ভূরি রহিয়াছে।

কিন্তু নবীজী মোস্তফা (দঃ) ছিলেন আদর্শ মানব অনুসরণীয় নমুনা; বিশ্ব-মানবের জন্য করণীয়-পন্থা নির্দ্ধারক। মানুষের জন্য আল্লাহ তায়ালার বিধান হইল—মানুষ তাহার সাধ্য-সামর্থানুযায়ী অছিলা বা অবলম্বন গ্রহণ করিবে; কার্যাকারণ-জগতে উহার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার দান লাভ হইবে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে অবলম্বন গ্রহণ ব্যতিরেকে আল্লার নিকট তাঁহার দান চাওয়া হইলে উহা বেয়াদবী গণ্য হয়।

আলোচ্য ঘটনায় মক্কায় প্রবেশ করিতে আল্লার উপর ভরসা স্থাপনে নবীজীর বিন্দুমাত্র সংশয় বা দুর্ব্বলতা ছিল না। কিন্তু তিনি মানুষ হিসাবে মানুষের জন্য আদর্শ ও ইসলামের নীতি নির্দ্ধারক কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিলেন। তিনি হেরা পর্বত এলাকায় থামিয়া আরবের রীতি অনুযায়ী কোন একজন শক্তিশালী ও প্রভাবশালী ব্যক্তির সমাজগত আশ্রয় লাভ করার চেষ্টা করিলেন। কতিপয় ব্যক্তি বিশেষের নিকট হযরত (দঃ) এই মর্ম্মে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু সকলেই পাশ কাটিয়া গেল। অবশেষে মক্কার বিশিষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তি—মোতয়ে'ম ইবনে আ'দী যিনি পূর্ব্ব হইতেই হযরতের দরদী ছিলেন; হযরত এবং বনী-হাশেম ও বনী-মোত্তালেবের বিরুদ্ধে অসহযোগিতা খণ্ডন করার ব্যাপারে এই মোত্‌য়ে'ম ইবনে আ'দী একজন অন্যতম প্রচেষ্টাকারী ছিলেন। আজও সেই মোত্‌য়ে'ম ইবনে আ'দী হযরত (দঃ)কে আশ্রয় প্রদানের সৌজন্যতা বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করিল। হযরত (দঃ) তাহার আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করিলেন এবং তাহার বাড়ীতেই রাত্রি যাপন করিলেন।

সকাল বেলা আনুষ্ঠানিকরূপে আশ্রয় প্রদানের ঘোষণা জারী করার জন্য মোত্‌য়ে'ম ইবনে আ'দী তাহার সাত পুত্র সহ সকলে অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া হযরতকে লইয়া কা'বা ঘরের তওয়াফ করার জন্য উপস্থিত হইল এবং তাহাদের প্রহরার মধ্যে হযরতকে তওয়াফ করার অনুরোধ করিল। হযরত (দঃ) তওয়াফ করিতে লাগিলেন। মোত্‌য়ে'ম ইবনে আ'দী স্বীয় যানবাহনের উপর দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিল—

يا معشر قريش انى قد اجرت محمدا فلا يهجه احد منكم

"হে কোরায়েশগণ! তোমরা জানিয়া লও যে, আমি মোহাম্মদকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছি; খবরদার! তোমাদের মধ্য হইতে কেহ যেন তাঁহাকে কোন প্রকারে বিব্রত না করে। (তবকাতে ইবনে সায়া'দ ১—২১২)

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) উপকারী জনের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শনে অভ্যস্ত ছিলেন। মোত্‌য়ে'ম ইবনে আ'দীর এই উপকারকে হযরত (দঃ) সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়াছেন, এমনকি বদরের যুদ্ধ-বন্দীগণকে ছাড়িয়া দেওয়া সম্পর্কে সকলের সুপারিশকেই হযরত প্রত্যাখান করিয়াছিলেন, কিন্তু তখনও তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি আজ মোত্‌য়ে'ম ইবনে আ'দী জীবিত থাকিত তবে তাহার সুপারিশে আমি ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিতাম"—

১৬৯৮। হাদীছ :—(৫৭৩ পৃঃ) عن جبير ابن مطعم رضى الله عنه

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِىْ اُسَارٰى بَدْرٍ لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِىٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِىْ فِىْ هٰٓؤُلَاءِ النَّتْنٰى لَتَرَكْتُهُمْ لَهٗ

অর্থ—মোত্‌য়ে'ম ইবনে আ'দীর পুত্র—ছাহাবী জোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বদর-জেহাদের যুদ্ধবন্দীগণ সম্পর্কে বলিয়াছেন, যদি আজ মোত্‌য়ে'ম ইবনে আ'দী জীবিত থাকিত এবং সে এই (বন্দী) অপদার্থগুলি সম্পর্কে আমার নিকট সুপারিশ করিত তবে আমি তাহার খাতিরে এইগুলিকে (মুক্তি পণ ব্যতিরেকেই) ছাড়িয়া দিতাম।

বিভিন্ন গোত্র ও এলাকায় ইসলাম প্রচারে নবীজীর তৎপরতা :

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন"

دست از طلب ندارم تا کام من برآید
یاتن رسد بجانان یا جاں زتن برآید

"উদ্দেশ্যে সাফল্য লাভ না করিয়া ক্ষান্ত হইব না।

হয়—উদ্দেশ্যে সফল হইব, না-হয়—জীবন বিলাইয়া দিব।"

এই সব প্রবাদ মানুষ মুখে বলে; নবীজী মোস্তফা (দঃ) এই প্রবাদকে কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। মানুষের নিকট আল্লার বাণী পৌঁছাইতে এবং মানুষকে আল্লার পথে আকৃষ্ট করিতে বিরামহীন সংগ্রাম-সাধনা করিয়া চলিয়াছেন তিনি। দীর্ঘ দশ বৎসর সর্ব্বপ্রকার আপদ-বিপদ ঝড়-ঝঞ্ঝা মাথায় নিয়া ঐ সাধনা চালাইলেন স্বীয় জন্মভূমি মক্কায়। চরম অত্যাচার এবং চরম বাধাবিঘ্ন বিন্দুমাত্র দমাইতে পারিল না নবীজীকে তাঁহার সংগ্রাম-সাধনায়, কিন্তু আবুতালেবের ও বিবি খাদিজার মৃত্যুর পর মক্কা এলাকায় আর ঐ কাজ চালাইবার কোন অবকাশই থাকিল না। তবুও নবীজী ক্ষান্ত হইলেন না নিজ দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য হইতে; ৭০।৮০ মাইল দুর্গম পথ পায়ে হাটিয়া কত কত গিরি-কান্তার পার হইয়া পৌঁছিলেন তিনি তায়েফে। তথায় বিঘ্ন-বিপত্তির বিভীষিকা ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া দাঁড়াইল, নিরাশার অন্ধকার ঘন হইতে ঘনতর হইয়া আসিল, সফলতার কোন আলোই দৃষ্টিগোচর হয় না। উদ্দেশ্যের সংগ্রামে কোন সম্বল নাই আশ্রয় নাই, কিন্তু আছে তাঁহার অদম্য সাহস-উদ্যম এবং কর্ত্তব্যের প্রতি একনিষ্ঠ লক্ষ্য ও দায়িত্ব পালনের আকুল আগ্রহ ও সুদৃঢ় স্পৃহা। তাই তিনি শত দুঃখ-কষ্ট, অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করিয়া বেশ কিছু দিন চেষ্টা-সাধনার মধ্যে তায়েফে অতিবাহিত করিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তায়েফ হইতেও নবীজীকে নিরাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। এখনও কিন্তু তাঁহার মধ্যে বিন্দুমাত্র শিথিলতা আসে নাই; এখনও তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে ও দায়িত্ব বহনে পর্ব্বৎ অপেক্ষা অধিক অনড় অটল।

মানুষকে তাহার কর্ম্মস্পৃহাই বিভিন্ন পথের খোঁজ এবং বিভিন্ন কৌশলের সন্ধান বাহির করিয়া দেয়। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অবস্থা তাহাই ছিল। তিনি মক্কায় স্বীয় কৃতকার্য্যতার পথ রুদ্ধ দেখিয়া তায়েফে গেলেন; তায়েফ হইতে নিরাশরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দ্বীন-ইসলামের প্রচার অভিযানে আর এক সুযোগ উপস্থিত দেখিলেন এবং অবিলম্বে উহার সদ্ব্যবহারে ঝাপাইয়া পড়িলেন।

ইসলাম প্রচারে পূর্ব্ব হইতেই নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি বিশেষ প্রচেষ্টা ইহাও ছিল যে, তিনি বিভিন্ন এলাকা ও দেশ হইতে আগন্তুকদের সমাবেশস্থল যথা বড় বড় বাৎসরিক হাট বা মেলায় বিশেষতঃ হজ্জের মৌসুমে মিনায় যখন দেশ-দেশান্তরের বিভিন্ন গোত্রীয় লোকদের বিপুল সমাবেশ হইত তখন নবীজী মোস্তফা (দঃ) নিজকে এক এক গোত্রের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া আকর্ষণীয় উদাত্ত আহ্বানে তাহাদেরে চমকিত করিয়া তুলিতেন।

রবিয়া ইবনে আব্বাদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইসলাম গ্রহণ পূর্ব্বে আমি দেখিয়াছি—"জুল-মাজায" মেলায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম লোকদের সমাবেশে এই আহ্বান জানাইতে ছিলেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا

"হে জনমণ্ডলী! তোমরা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" গ্রহণ কর; তোমাদের মঙ্গল হইবে।"
হজ্জ উপলক্ষে মিনায়ও নবী (দঃ) বিভিন্ন গোত্রের নিকট যাইয়া আহ্বান করিতেন—

يَا بَنِي فُلَانٍ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ آمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَخْلَعُوا مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ هٰذِهِ الْأَنْدَادِ وَأَنْ تُؤْمِنُوا بِي وَتُصَدِّقُوا بِي وَتَمْنَعُونِي حَتّٰى أُبَيِّنَ عَنِ اللهِ مَا بَعَثَنِي بِهِ

"হে অমুক গোত্রীয় লোকগণ! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ কর্ত্তৃক প্রেরিত রসুল। আমি তোমাদেরকে এই কথাই বলি যে, তোমরা এক আল্লার উপাসনা কর—তাঁহার সহিত কোন বস্তুকে শরীক করিও না। আর তোমরা ত্যাগ কর আল্লাহ ভিন্ন ঐ সব দেব দেবী ঠাকুর-মূর্ত্তি যে সবের পূজা তোমরা করিয়া থাক। আর তোমরা আমার প্রতি ঈমান আন, আমাকে বিশ্বাস কর এবং আমি আল্লাহ প্রদত্ব ধর্ম্মকে প্রচার করিতে পারি সেই জন্য তোমরা আমার রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা কর।" (বেদায়াহ, ৩—১৩৮)

কোন কোন সময় হযরতের অনুরোধ এইরূপ হইত—

لَا أُكْرِهُ أَحَدًا مِنْكُمْ عَلٰى شَيْءٍ بَلْ أُرِيدُ أَنْ تَمْنَعُوا مَنْ يُؤْذِينِي حَتّٰى أُبَلِّغَ رِسَالَاتِ رَبِّي -

"আমি তোমাদের কাহারও উপর কোন বিষয়ে জবরদস্তি করিব না, আমি তোমাদের নিকট শুধু এতটুকুই চাই যে, তোমরা কাহাকেও আমার উপর জুলুম অত্যাচার করিতে দিও না; আমি যেন আমার প্রভু পরওয়ারদেগারের প্রেরিত বিষয় সমূহকে তাঁহার বন্দাদের সম্মুখে প্রচার করিয়া যাইতে পারি।"

কোন কোন সময় হযরত (দঃ) এইরূপও বলিতেন—

هَلْ مِنْ رَجُلٍ يَحْمِلُنِي إِلٰى قَوْمِهِ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي -

"আছে কেউ ? যে আমাকে তাহার দেশে-খেসে লইয়া যায়, আমি তাহার আশ্রয়ে পরওয়ারদেগারের বাণী পৌঁছাইতে পারি ; আমার জাতি কোরায়েশরা আমাকে আমার প্রভু-পরওয়াদেগারের বাণী পৌঁছাইতে দেয় না।" (যোরকানী, ১—৩০৯)

এই হৃদয়গ্রাহী আহ্বানকে সকলেই এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিত যে, প্রত্যেক মানুষকে তাহার বংশধরগণই ভালরূপে জানিয়া থাকে। অর্থাৎ আপনার বংশধর কোরায়েশ আপনাকে গ্রহণ করে নাই ; আমরা গ্রহণ করিব কেন ?

তায়েফ হইতে ব্যর্থ, ক্লান্ত এবং উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর মূহূর্ত্তেই নবীজী (দঃ) তাঁহার উল্লেখিত প্রচেষ্টার একটি সোনালী সুযোগ সম্মুখে উপস্থিত পাইলেন। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারেই নবীজী (দঃ) তাঁহার সাধনায় সিদ্ধির দ্বারে পৌঁছিলেন, তাঁহার তের বৎসরে ধৈর্য্য ও ছবরে যেন মেওয়া ফলার মৌসুম আসিল। ইসলামের উন্নতি, প্রগতি ও গৌরব লাভের কেন্দ্র সোনার মদিনায় ইসলামের ও নবীজীর আশ্রয় লাভের সুবর্ণ সুযোগের সূচনা হইল।

ইসলাম মদিনা পানে ঃ

মক্কায় ইসলামের আশ্রয় লাভ হইবে সেই আশা মোটেই থাকিল না, তাই নবীজী মোস্তফা (দঃ) তায়েফে গেলেন। তায়েফের ভাগ্যেও এই মঙ্গল জুটিল না ; নবীজী মোস্তফা (দঃ) তায়েফ হইতে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

নবুয়তের দশম বৎসর শাওয়াল মাসের শেষ দিকে নবীজী তায়েফ পানে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং এই সফরে এক মাস সময় ব্যয় হইয়াছিল। সুতরাং নবীজী জিল-কদ মাসের শেষ দিকে তায়েফ হইতে মক্কায় পৌঁছিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী মাসই হইল হজ্জের মাস—জিলহজ্জ মাস ; এই মাসের ১০, ১১, ১২ তারিখে হজ্জ উপলক্ষে মিনায় বহু লোকের সমাবেশ হইবে। দূর দূর এলাকা হইতে হজ্জের জন্য আগত অসংখ্য লোক জমায়েত হইবে এই মিনায়। নবীজী মোস্তফা (দঃ) এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহারে প্রস্তুত হইলেন পূর্ণ উদ্যমে। মক্কার পিশাচরাও বসিয়া নয় ; তাহারাও নবীজীর সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য, তাঁহার কুৎসা করিবার জন্য সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিল এবং লোকদের নিকট তাঁহাকে ভণ্ড, পাগল, যাদুকর, গণৎকার ইত্যাদি সাব্যস্ত করার অভিযানে ঝাপাইয়া পড়িল।

হজ্জ উপলক্ষে মিনায় জনসমাগম হইল ; কোরেশ দুষ্ট-দুরাচাররা লোকদের ঘাটিতে ঘাটিতে আড্ডায় আড্ডায় যাইয়া নবীজীর কুৎসা করিতে লাগিল। পিশাচ আবুলাহাব ত নবীজীর পেছনে সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকিত। একজন প্রত্যক্ষ দর্শী বর্ণনা করিয়াছেন—আমি আমার পিতার সঙ্গে হজ্জে গমন করিয়াছিলাম। আমরা

মিনায় অবস্থান করিতেছি এমন সময় হযরত (দঃ) সেখানে আগমন করিলেন এবং বিভিন্ন গোত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—"তোমরা শুন, আল্লাহ্ আমাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তোমরা এক আল্লারই উপাসনা কর; তাঁহার সহিত শরীক সাব্যস্ত করিও না। দেব-দেবী ঠাকুর-প্রতিমার পূজা ছাড়িয়া দাও।" তখন হযরতের পেছনে পেছনে একজন টেরা মানুষ চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, সাবধান! হে লোক সকল! এই বেটা তোমাদেরে নিজের নূতন ধর্ম্ম এবং ভ্রষ্টতার দলে ভিড়াইয়া লাৎ-ওজ্জা দেবীদের হইতে এবং তোমাদের মিত্রদল জ্বিনদের হইতে ছিন্ন করিয়া দিতে চায়। তোমরা তাহার কথা মানিও না, তাহার কথা শুনিও না। এই বেটা মিথ্যাবাদী, বিধর্ম্মী।

ঘটনা বর্ণনাকারী বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই পেছনে পেছনে ধাবমান লোকটি কে? তিনি বলিলেন, সে ঐ লোকটিরই পিতৃব্য আবুলাহাব। (বেদায়াহ, ১—১৩৮)

আবুজহল-আবুলাহাব গোষ্ঠি যাহারা হযরতেরই স্বজন বলিয়া পরিচিত তাহাদের এহেন প্রচারে হযরতের পক্ষে ইসলামের প্রচার-কার্য্য অধিকতর দুঃসাধ্য হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিরুৎসাহ বা ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। তিনি বিভিন্ন গোত্রের আড্ডায় আড্ডায় যাইয়া সত্যের প্রচার করিতে লাগিলেন। এইভাবে অটল সঙ্কল্প ও অটুট বিশ্বাস লইয়া যিনি কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হইতে পারেন সত্যের সাধনা তাঁহারই সার্থক হইয়া থাকে এবং এইরূপ সত্যের সেবক ও সাধক জনই আদর্শ মহাপুরুষ বলিয়া বরিত হওয়ার যোগ্যপাত্র। এই ভূমিকায় নবীজী মোস্তফার সুন্নত ও আদর্শ এই প্রতিয়মান হয় যে, কর্ত্তব্যের খাতিরেই কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতে হইবে। ফলাফল মানুষের হাতে নহে, অতএব উহার জন্য ব্যতিব্যস্ত চঞ্চল হইয়া পড়া উচিৎ নহে। কর্ত্তব্য পালন না করিলে আল্লার নিকট অপরাধী হইতে হইবে এই তাকিদে কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাওয়াকেই বৃহত্তম সফলতা বিবেচনা করা চাই।

একদিকে কোরেশ সর্দ্দারগণ নবীজীকে মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, যাদুকর ইত্যাদি বলিয়া লোক সম্মুখে অপদস্ত করার চেষ্টা চালাইতেছে, তাঁহার উপর ধূলা-বালু নিক্ষেপ করিতেছে, প্রস্তরাঘাতে তাঁহার সর্ব্বশরীর জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিতেছে। অপর দিকে নবীজী মোস্তফা (দঃ) মুখে ঘোষণা দিতেছেন—"জোর নাই জবরদস্তি নাই—আমার কথাগুলি যাহার পছন্দ হইবে সে উহা গ্রহণ করিবে। আমি কাহারও উপর জবরদস্তি করিতে চাই না। আমি কেবল ইহাই চাই যে, আমার প্রভুর বাণীগুলি পৌঁছাইয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত যেন কেহ আমাকে হত্যা করিয়া ফেলিতে না পারে—যাহার ফলে আমার কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।"

এই মৌখিক শান্তিপ্রিয় ঘোষণা অপেক্ষা নবীজী মোস্তফার চরিত্র-মাহাত্ম্যের ঘোষণা আরও অধিক উন্নত ও অমিয় ছিল যে, বিতণ্ডা নাই, বাদ নাই, হানাহানি নাই, বিতর্ক নাই, গালির পরিবর্ত্তে গালি নাই, এমনকি অপবাদ ও মিথ্যা দোষারোপের প্রতিবাদ পর্য্যন্ত নাই। আছে শুধু একনিষ্টতার সহিত দায়িত্ব পালন এবং কর্ত্তব্যের খাতিরে কর্ত্তব্য পালন। আর আছে, ধীর গম্ভীর কণ্ঠে পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করিয়া যাওয়া।

মানুষ প্রতি পদক্ষেপে সফলতা দেখিয়া, জনকণ্ঠের প্রশংসাধ্বনিতে আনন্দ পাইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে পুলুকিত ও উৎসাহিত এবং অধিক উদ্দমে অগ্রগামী হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু এই উদ্যম ও এই উৎসাহ-প্রদর্শনে বিশেষ বাহাদুরী নাই। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে দৃষ্টির প্রশস্ত আয়তনে সফলতার নামমাত্র নাই, প্রশংসা ও উৎসাহ প্রদানের শব্দমাত্র নাই। আছে কেবল দুর দুর, ছি ছি, গালাগালি, নিন্দা-মন্দ, মিথ্যারোপ ও দোষারোপ—এইরূপ ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য পালনকে আঁকড়িয়া থাকা, সত্যকে বলিষ্ঠ হস্তে মুষ্ঠিগত করিয়া রাখা, সত্য প্রচারের অগ্রাভিযানে দৃঢ়পদ থাকা, উৎসাহ-উদ্দীপনাকে প্রখর ও অটুট রাখা একমাত্র মহত্ত্বের মহাপালোয়ান এবং আদর্শের মহাপুরুষ জনেরই কাজ। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সেই মহত্ত্বের ও আদর্শের যেই পরিচয় তাঁহার আলোচ্য ভূমিকায় দিতে ছিলেন উহার তুলনা জগতে মিলিবে না।

নবীজীর এই সাধনা এই ধৈর্য্য কি সত্যই বিফল যাইতেছিল? কখনও নয়। নবীজী যে, বিভিন্ন সম্মেলন-সমাবেশে এতদিন অবিশ্রান্তভাবে সত্য ধর্ম্ম ও আল্লার বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইলেন তাহাতে বিভিন্ন দেশের সমাগত হাযার হাযার মানুব নবীজীর মুখ হইতে আল্লার মহিমা-গান শ্রবণ করিল, আল্লার স্বত্তা ও গুণাবলীর স্বরূপ সম্বন্ধে অজানা তথ্যাবলী অবগত হইল, সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ এবং তাঁহার সৃষ্টির প্রতি নিজেদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্পর্কে অশ্রুতপূর্ব্ব উপদেশাবলী প্রাপ্ত হইল। নিজেদের স্বহস্ত নির্ম্মিত দেবতা-প্রতিমাগুলির অপদার্থতা ও অক্ষমতার অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। মদ্যপান, জেনা-ব্যভিচার, অন্যায়-অত্যাচার ইত্যাদি মহাপাপ সমূহের অনিষ্টতা অবগত হইতে পারিল। এইসব সত্যের ঝঙ্কার কোন দিন কাহারও কর্ণ হইতে মর্ম্মে নামিয়া আসিবে—এইরূপ কি হইবে না? নিশ্চয় হইবে এবং ইহাই চরম সাফল্য। নবীজী মোস্তফা (দঃ) তাঁহার আলোচ্য ভূমিকায় এই ছুন্নত ও আদর্শই কার্য্যতঃ শিক্ষা দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সফল জীবনে তিনি ইহাই মৌখিক শিক্ষাদানে বলিয়াছেন—

لَأَنْ يَّهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

"তোমার চেষ্টা সাধনায় একটি মানুষের হেদায়েত লাভ হয়—ইহা তোমার জন্য দুনিয়ার সর্ব্বোত্তম সম্পদ অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যের বস্তু।"

ইসলামের তবলীগ উদ্দেশ্যে হযরত (দঃ) লোক সমাবেশের প্রতিটি সুযোগস্থলে উপস্থিত হইতেন এবং সত্যের ডাক ইসলামের আহ্বান প্রতি কানে কানে ও ঘরে ঘরে পৌঁছাইবার সর্ব্বাত্মক চেষ্টা চালাইয়া যাইতেন। এমনকি সেই যুগের "ওকাজ", "জুল-মাজায", "মাজান্নাহ্‌" ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ বাৎসরিক হাট বা মেলায়ও হযরত (দঃ) উপস্থিত হইতেন এবং লোকদিগকে সত্যের প্রতি—ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইতেন। বিশেষতঃ দীর্ঘ তিন বৎসর কাল অসহযোগিতা ও বয়কটের সঙ্কট হইতে বাহির হইয়া এই ১০ম বৎসর ত হযরত (দঃ) রজব মাস হইতেই বিভিন্ন গোত্রের বস্তি সমূহে উপস্থিত হইয়া ঘরে ঘরে ইসলামের ডাক পৌঁছাইবার এক অভিযান আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে হযরত (দঃ) ঐতিহাসিক তায়েফ ছফর ছাড়াও আশে-পাশের পনরটি গোত্রের বস্তিতে ছফর করিয়াছিলেন।

(সীরতুন-নবী ১—১৯২ এবং আছাহ্‌হুস্‌-সীয়ার ১০৩)

সত্যের সাধনায় স্বর্ণ ফলে, ছবরে মেওয়া ফলে। অসংখ্য ঝিনুক কুড়ানো হয়—উহারই কোন একটার মধ্যে মোতি-মুক্তা হাত লাগিয়া যায়। নবীজীর এক দশকের সাধনা এবং ধৈর্য্যও এই পর্য্যায়ে উপনীত হইল। নিরাশার অন্ধকারের অন্তরালে, চরম ব্যর্থতার দূর প্রান্ত হইতে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি স্থান হইতে সহসা একটা আশার আলো, সাফল্যের সূচনা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"মিনা" এলাকার সীমা সংলগ্নেই, একটি "আকাবাহ"* তথা গিরিপথ। হজ্জ মৌসুমে মিনা এলাকায় নবীজী মোস্তফা তাঁহার ব্যতি-ব্যস্ততা ও ছুটাছুটিকালে ঐ আকাবা নিকটবর্ত্তী ছয় বা আট জন লোককে দেখিতে পাইলেন। নবীজী (দঃ) তাহাদের নিকটে আসিলেন এবং তাহাদের পরিচয় জানিতে চাহিলেন; তাহারা মদিনাবাসী খয্‌রজ গোত্রের বলিয়া পরিচয় দিল। হযরত (দঃ) তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইলেন এবং পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন।

---

* "আকাবাহ" সাধারণতঃ কোন বিশেষ স্থানের নাম নয়; পর্ব্বতমালার ফাঁকে—আঁকে-বাঁকে যে দুর্গম পথ থাকে উহাকেই বলে "আকাবাহ"। মিনার পশ্চিম প্রান্তে ঐরূপ একটি পথ ছিল এবং ঐপথে পর্ব্বত বেষ্টনীর ভিতরে ঢুকিলেই মস্তবড় ময়দান যাহার চতুষ্পার্শ্ব উঁচু পাহাড় দ্বারা এইরূপে বেষ্টিত যে, ময়দানটি একটা মস্তবড় গভীর পুকুর বা তালাবের ন্যায় দেখা যায়। উত্তর দিক হইতে ভিতরে প্রবেশ করিবার যে পার্ব্বত্য পথটি ছিল, যাহাকে "আকাবাহ" বলা হয় উক্ত পথটুকু ছাড়া ঐ ময়দানের চতুর্দ্দিকে উঁচু পাহাড় ভিন্ন কোনরূপ ছিদ্রও ছিল না, সুতরাং ঐ ময়দানে হাজার হাজার লোক বসিয়া কোন গোপন কাজ করিলে বাহির হইতে উহার কোন আভাস পাওয়ার সম্ভাবনাই ছিল না। (অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

আল্লার কুদরতের লীলা—মদিনায় ইহুদী জাতির আধিক্য এবং তাহারা আসমানী কেতাবের জ্ঞান বাহক। তাহারা জানিত এবং এই বলিয়া থাকিত যে, একজন সর্ব্বশেষ পয়গাম্বরের আবির্ভাব হইবে এবং তাঁহার আবির্ভাবকাল অতি নিকটবর্ত্তী। এমনকি তাহারা তাহাদের ভেজাল তৌরাত কেতাবের মর্ম্মানুসারে অন্য জাতীয় লোকদিগকে তর্ক ও বিবাদস্থলে বলিয়া থাকিত যে, সেই নবীর আবির্ভাব হইলে পর তিনি আমাদের দলে যোগদান করিবেন এবং আমরা তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া তোমাদিগকে ধ্বংস করিব। এই ধরণের কথা মদিনাবাসী লোকগণ ইহুদীদের মুখে অনেক সময়ই শুনিয়া থাকিত। (যোরকানী ১—৩১০)

আজ মদিনার লোকগণ হযরতের প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া এবং তাঁহার কথাবার্ত্তা ও কোরআন তেলাওয়াত শুনিয়া ইহুদীদের সেই কথা স্মরণে আনিল এবং পরস্পর বলিল, মনে হয় ইহুদীদের আলোচিত নবী ইনিই, অতএব আমরা এই স্বুবর্ণ স্বুযোগ ছাড়িব না; ইহুদীরা যেন আমাদের অগ্রগামী না হইয়া যায়।

মদিনায় ইসলামের প্রসার এবং তথায় বিশ্ব ইসলামের কেন্দ্র স্থাপিত হওয়া এবং মদিনার আকাশে প্রিয় নবীর চন্দ্রোদয়ের ব্যাপারে উল্লেখিত আকাবার ময়দানটি ইতিহাস আলোচনার শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কারণ, এই স্থানেই নবুয়তের দশম বৎসরে আলোচ্য ঘটনায় মদিনার ছয় জন লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়া এই ইতিহাসের স্বচনা করেন। পরবর্ত্তী বৎসর ঐ স্থানেই বার জন মদিনাবাসী হজ্জ উপলক্ষে হযরতের সঙ্গে মিলিত হন এবং ইসলামের খেদমতে আত্মোৎসর্গ করার বায়য়া'ৎ বা অঙ্গীকার করেন। তৃতীয় বৎসর এই সময়ে এই স্থানেই সত্তর জনের অধিক মদিনাবাসী হযরতের সঙ্গে মিলিত হন এবং বিস্তারিতভাবে কথোপকথন হইয়া বায়য়া'ৎ ও অঙ্গীকারাবন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া হযরত (দঃ) ব্যাপক ভাবে মোসলমানগণকে মদিনায় হিজরত করার পরামর্শ দান করেন, শেষ পর্য্যন্ত স্বয়ং হযরত (দঃ) ও হিজরত করেন। বিস্তারিত বিবরণ সম্মুখে বর্ণিত হইবে।

এইসব ঘটনা উল্লেখিত ময়দানের দক্ষিণ পার্শে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, যদ্দরুন পরবর্ত্তীকালে মক্কায় তুরস্কের শাসন আমলে ঐ ময়দানের দক্ষিণ পার্শে একটি মসজিদ নির্ম্মিত হয় যাহা "মসজিদে-আকাবাহ" নামে প্রসিদ্ধ।

১৯৫০ ইং সনের হজ্জ উপলক্ষে আমি নরাধমের উক্ত মসজিদে হাজির হওয়ার এবং নামায পড়িবার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। সেই সময় উক্ত ময়দান ও এলাকাটি সম্পূর্ণরূপে পুরাতন দৃশ্য বহন করিতেছিল যাহা উপরে উল্লেখ করিয়াছি। পরবর্ত্তীকালে উক্ত ময়দানের দক্ষিণ পার্শস্থ পর্ব্বতমালাকে সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া দিয়া মিনা হইতে মক্কায় মটর-বাস যাতায়াতের প্রশস্ত পাকা রাস্তা তৈরী করিয়া দেওয়ায় এখন মসজিদটি বড় রাস্তার পার্শে দাঁড়ান দেখা যায় এবং ঐতিহাসিক গুপ্ত ময়দানটির দক্ষিণ দিক সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইয়া ঐ এলাকাটির দৃশ্যই অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে। এমনকি ১৯৫৭ ইং সনে স্বয়ং আমি ঐ এলাকায় দাঁড়াইয়া সব কিছুই যেন নূতন অনুভব করিতেছিলাম। বর্ত্তমান দৃশ্যে ঐ এলাকার বিশেষ কোন গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব নহে!

এই বলিয়া তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা ছয় বা আট জন ছিলেন; সকলের নাম ও পরিচয় সীরাতের কিতাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।*

এই ছয় বা আট জন লোক ইসলামকে উহার আশ্রয়স্থল মদিনায় সর্ব্বপ্রথম বহন করিয়া নিয়া আসেন। ইসলামের ইতিহাসে তাঁহাদের নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। বিশেষ বরকত লাভ উদ্দেশ্যে নিম্নে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা হইল। বস্তুতঃ তাঁহারা সমগ্র মোসলেম জাতির জন্য বিশেষ উপকারী জন ছিলেন। তাঁহাদের নির্দ্ধারণে ঐতিহাসিকগণের কিছু মতভেদ আছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণের মতানুসারে ছয় জনের নাম এই—

১। আস্‌আদ ইবনে যোরারা (রাঃ); তিনি এই আকাবায় পর পর তিনটি সম্মেলনের প্রত্যেকটিতে উপস্থিত ছিলেন। হিঃ প্রথম বৎসরই মদিনায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

২। আওফ ইবনে হারেছ (রাঃ)। তিনি বদর-জেহাদে শহীদ হইয়াছেন।

৩। রাফে ইবনে মালেক (রাঃ)। তিনি ওহোদ-জেহাদে শহীদ হইয়াছেন।

৪। কোৎবা ইবনে আমের (রাঃ)। তিনিও আকাবার তিন সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। বদরসহ বহু জেহাদে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। খলীফা ওমর বা ওসমানের আমলে তাঁহার মৃত্যু হয়।

৫। ওক্‌বা ইবনে আমের (রাঃ)। তিনি বদরসহ সমস্ত জেহাদে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবুবকর সিদ্দীকের আমলে ইয়ামামার-জেহাদে শহীদ হইয়াছেন।

৬। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)। তিনি বদর জেহাদ এবং আরও অনেক জেহাদে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি হাদীছ বর্ণনার প্রসিদ্ধ ছাহাবী জাবের নন; ঐ জাবের রাজিয়াল্লাহু আনহুর বয়স এই সময় খুবই কম ছিল।

---

* পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মদিনায় ইসলামের কেন্দ্র স্থাপিত হওয়া তথা ইসলামের উন্নতির গোড়া পত্তনের সূচনার ভিত্তি মূল ছিল এই আকাবার মধ্যে হযরতের সঙ্গে মদিনাবাসীদের গোপন সম্মেলন। কোন কোন ঐতিহাসিক এই সম্মেলনকে "বায়য়া'তে-আ'কাবাহ্‌, বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া থাকেন। "বায়য়া'ত" অর্থ হাতে হাত দিয়া দৃঢ়তার সহিত অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া। এই সম্মেলন পর পর তিন বৎসরে তিন বার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকগণ তিন বৎসরে তিনটি সম্মেলনকে তিনটি "বায়য়া'তে-আ'কাবাহ্‌" গণ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ মোহাদ্দেছগণ এবং বিশিষ্ট ঐতিহাসিকগণের মতে আলোচ্য দশম বৎসরের তথা প্রথম সম্মেলনটিকে "বায়য়া'ৎ" নামে আখ্যায়িত করা ঠিক নহে। কারণ, এই উপলক্ষে শুধু মদিনাবাসী ছয় বা আট জনের ইসলাম গ্রহণই ছিল, কোন প্রকার অঙ্গীকার গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল না, যেরূপ পরবর্তী দুই বৎসরে হইয়াছিল। এই সূত্রে "বায়য়াতে-আ'কাবাহ্‌" দুইটি গণ্য হইবে। (সীরতে হলবিয়াহ্‌, ২—৮ ও আল্‌বেদায়াহ্‌, ওয়ান্‌-নেহায়াহ্‌)

মদিনাবাসীদের সঙ্গে এই প্রথম মিলন এবং ছয় বা আট জনের ইসলাম গ্রহণ যে নবুয়তের দশম বৎসরে হইয়াছিল তাহা সীরতুন-নবী ১ম খণ্ড ১৯২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।

আরও ছয় জনের নাম উল্লেখ করা হইল যাঁহাদের নাম কোন কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাদের কোন দুই জন হয় ত উপস্থিত ছিলেন।

(১) বরা ইবনে মারুর (রাঃ)। (২) কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ)। (৩) মোআজ ইবনে আফরা (রাঃ)। ওবাদাহ ইবনে ছামেৎ (রাঃ)। (৫) জাকওয়ান ইবনে কায়স(রাঃ)। (৬) আবুল হাইছম ইবনে তায়্যেহান (রাঃ)।

নবীজী (দঃ) তাঁহাদের নিকট অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে, আমার মাবুদের পয়গাম পৌঁছাইবার জন্য (তোমাদের দেশে) তোমরা আমার পৃষ্ঠপোষকতা করিবে ? তাঁহারা বলিলেন, বোয়াছ-যুদ্ধ* গত বৎসরও আমাদের মধ্যে প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়াছিল। এমতাবস্থায় আপনি আমাদের দেশে পদার্পণ করিলে আমরা আপনার পশ্চাতে একমত হইয়া একত্রিত হইতে পারিব না; (ফলে শক্তি অর্জ্জন করা সম্ভব হইবে না।) অতএব এখন আমাদেরকে দেশে যাইতে দিন। হয়ত অচিরেই আল্লাহ আমাদের পরস্পর সম্পর্ক ভাল করিয়া দিবেন এবং আমরা সকলকে ইসলাম ঐরূপে বুঝাইব যেমন আপনি আমাদেরে বুঝাইয়াছেন। তখন আমরা আশা করিতে পারিব যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে আপনার পশ্চাতে একত্রিত করিয়া দিবেন। যদি ঐরূপ হইয়া যায় এবং আমাদের সকলে একত্রিতভাবে এক বাক্যে আপনার সঙ্গী হইয়া যায়, আপনার অনুসারী হইয়া যায় তবে আপনার ন্যায় শক্তিশালী আর কেউ হইবে না। সুতরাং আগামী বৎসর পুনরায় আপনার সহিত মিলিত হওয়ার কথা থাকিল। এই বলিয়া তাঁহারা মদিনায় চলিয়া গেলেন। (যোরকানী, ১—৩:২)

তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করতঃ হযরত (দঃ)কে বলিলেন, আপনি এখন বর্ত্তমান অবস্থার উপর মক্কায়ই অবস্থান করুন। আমরা মদিনায় যাইয়া ইসলামের চর্চ্চা করিব এবং তথাকার প্রধান গোত্রদ্বয়কে ইসলামের উপর একত্রিত করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিব, আগামী বৎসর এইস্থানে এই সময়ে আপনার সঙ্গে পুনঃর্মিলনের ওয়াদা আমাদের রহিল। (সীরতে হলবিয়াহ ২—৮)

এইরূপে সকলের অলক্ষ্যে ইসলামের জ্যোতি মদিনা নগরে প্রবেশ করিল। নবীজী ইসলাম ও আল্লার বাণী মন ভরিয়া প্রচার করিবেন এইরূপ স্থানের তালাশেই নবীজীর দীর্ঘ সাধনা ও দীর্ঘ ত্যাগ ; আজ সেই ত্যাগ ও সাধনার বৃক্ষে ফুল ফুটিয়াছে। নবীজী এখন ফলের প্রতিক্ষায় আশার সূত্রে দুলিতে আছেন।

---

* মদিনায় ইহুদী জাতি প্রবল ছিল, আর প্রবল ছিল পৌত্তলিক দুইটি গোত্র—"আউস" এবং "খয্‌রজ"। দীর্ঘকাল হইতে এই দুইটি গোত্রের মধ্যে রক্তক্ষয়ী প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ চলিয়া আসিতেছিল। যদ্দরুন তাহাদের মধ্যে পরস্পর ভীষণ বিরোধ বিরাজমান ছিল ; এক পক্ষ কোন কাজে অগ্রসর হইলেই অপর পক্ষ বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাইত।

নবুয়তের একাদশ বৎসর—ঐতিহাসিক

বায়আ'তে আ'ক্বাবাহ* (৫৫০ পৃঃ)

উল্লেখিত ছয় বা আট জন যাঁহারা ইসলাম লইয়া মদিনায় ফিরিলেন বাস্তবিকই তাঁহাদের অন্তরে এক বিরাট জয্‌বা ও প্রেরণা ছিল মদিনার মধ্যে ইসলামকে ফুটাইয়া তোলার। তাঁহারা কার্য্যতঃ প্রমাণ করিয়া দিয়াছিলেন যে, ইসলাম গ্রহণে মানুষের সাধনা শেষ হয় না; সাধনার সূত্রপাত হয় মাত্র। তাঁহারা সত্য সেবক ও খাঁটী প্রচারক হইয়া মদিনায় আসিলেন এবং মদিনা ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী এলাকায় ইসলাম প্রচারে অবিশ্রান্ত চেষ্টা চালাইয়া যাইতে লাগিলেন।

তাঁহাদের চেষ্টা অনেকটা ফলপ্রসূ হইল; মদিনার ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়া গেল। কিছু কিছু লোক ইসলাম গ্রহণও করিলেন, এমনকি এই বৎসর হজ্জ উপলক্ষে নূতন পুরাতন মিলাইয়া বার জনের একটি প্রতিনিধি দল সেই পূর্ব্ব বর্ণিত "আ'ক্বাবাহ্" স্থানে হযরতের সঙ্গে মিলিত হইলেন; তন্মধ্যে গত বৎসরের পাঁচ জন ছিলেন এবং অবশিষ্ট সাত জন এই বৎসরের নূতন ছিলেন। বারজনের মোট দশজন ছিলেন খয্‌রজ গোত্রের, আর দুইজন ছিলেন আউস গোত্রের। প্রথমবারের ছয় জন হইতে জাবের (রাঃ) ব্যতীত পাঁচ জন এবং অপর সাত জন এই—

(১) মোয়াজ ইবনে আফ্‌রা (রাঃ)। তিনি সহ তাঁহার মা-শরীক সাত ভাই বদর-জেহাদে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ওহোদ-জেহাদেও উপস্থিত ছিলেন।

(২) জাকওয়ান ইবনে-কায়স (রাঃ)। তিনি ওহোদের জেহাদে শহীদ হইয়াছেন।

(৩) ওবাদা ইবনে ছামেৎ (রাঃ)। তিনি সব জেহাদে উপস্থিত ছিলেন।

(৪) আব্বাছ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)। তিনি ওহোদের জেহাদে শহীদ হইয়াছেন।

(৫) এযীদ ইবনে ছা'লাবাহ (রাঃ)। এই দশ জন সকলই খায্‌রাজ গোত্রের ছিলেন। পরবর্ত্তী দুইজন ছিলেন আউস গোত্রের।

(৬) আবুল-হায়ছম ইবনে তায়্যেহান (রাঃ)। তিনি বদর ও ওহোদ সহ সব জেহাদেই অংশ গ্রহণকারী ছিলেন।

(৭) ওয়াইম ইবনে সাএদা (রাঃ)। তিনিও বদর ও ওহোদ সহ সব জেহাদেই অংশ গ্রহণকারী ছিলেন। (যোরকানী, ১—৩১৩)

---

* আমরা নবুয়তের বৎসর নির্দ্ধারণে চাঁদের বৎসরের সাধারণ সীমা তথা "মহরম" হইতে "জিলহজ্জ" পর্য্যন্তকেই গণ্য করিয়াছি। কোন কোন লিখক "রবিউল-আউয়াল" হইতে "ছফর" পর্য্যন্ত উহার সীমা ধরিয়াছেন যেহেতু হযরতের জন্ম রবিউল আউয়ালে ছিল; এই সূত্রে অনেক স্থানে বৎসরের সংখ্যা নির্দ্ধারণে এক বৎসরের বেশ-কম হইবে।

এইবার আকাবায় যেই সাক্ষাৎকার হইল প্রথমবার অপেক্ষা ইহাতে একটি বিশেষ কাজ হইল যাহা প্রথমবারের সাক্ষাৎকারে হইয়া ছিল না। প্রথমবারের উপস্থিতবৃন্দ ইসলাম গ্রহণপুর্ব্বক শুধু আশ্বাস প্রদানেই মদিনায় চলিয়া গিয়াছিলেন, অঙ্গীকার গ্রহণপর্ব্বের ব্যবস্থা হইয়া ছিল না। এইবারের আগন্তুকবৃন্দ ইসলাম গ্রহণের পর নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন—যাহাকে বায়আ'ৎ বলা হয়।

বায়আতে আক্কাবা (৫০৫)

"বায়আৎ" আরবী শব্দটি আভিধানিক দৃষ্টিতে "بَيْعٌ—বাইওন" শব্দের অনুরূপ, যাহার অর্থ বিক্রয় করা। বিক্রয় ক্ষেত্রে ক্রয়ও হয়; এক পক্ষ হইতে বিক্রয় অপর পক্ষ হইতে ক্রয়। উভয়ের কার্য্যকে আরবীতে "মোবায়াআৎ" বলা হয়; যাহার ক্রিয়াপদ বায়াআ' য়ুবাএউ'। পরিভাষায় "বাইআৎ" বলা হয় কোন মহানের হস্ত ধারণ করিয়া বিশেষ প্রতিজ্ঞা বা অঙ্গীকারের উপর দীক্ষা গ্রহণ করা। এই ক্ষেত্রেও দুই পক্ষ; এক পক্ষ হস্ত ধারণকারী অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞাকারী, অপর পক্ষ যাহার হস্ত ধারণ করা হয় যাহার নিকট অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা করা হয়। এই ক্ষেত্রেও উভয়ের কার্য্যকে "মোবায়াআৎ" বলা হইবে, ক্রিয়াপদও ঐরূপই হইবে। ইসলামে যে বায়আৎ হয় সেই বায়আতে কোন মহান মানুষের হস্তই ধারণ করা হয় যেমন ছাহাবীগণ নবীজীর হস্ত ধারণ করিতেন এবং তদ্রূপ কোন পীর বুজুর্গের হস্ত ধারণ করা হয়। কিন্তু ইসলামের বায়আৎকে কঠোরতর সা্যস্তকরণ উদ্দেশ্যে পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, এই বায়আতে যদিও বাহ্যতঃ কোন মানুষের হস্ত ধারণ করা হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লার হস্ত ধারণ গণ্য করিবে।

আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন—

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ - يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ
فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ - وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ
فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا *

"নিশ্চয় যাহারা আপনার নিকট বায়আৎ করে বস্তুতঃ তাহারা আল্লার নিকট বায়আৎ করে। তাহাদের হস্তের উপর বস্তুতঃ আল্লার হস্ত রহিয়াছে। অতএব যে এই বায়আৎ ভঙ্গ করিবে সে নিজেরই সর্ব্বনাশ করিবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লার সহিত কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারকে পূর্ণ করিবে, আল্লাহ তাহাকে অচিরেই অতি বড় পুরস্কার দান করিবেন।" (২৬ পাঃ ৯ রুঃ)

বায়আতের মূল অর্থ যেহেতু বিক্রয় করা এবং উভয় পক্ষের ক্রিয়া হইল মোবায়াআৎ যাহার মূল অর্থ ক্রয়-বিক্রয় তথা আদান-প্রদান। সুতরাং পরিভাষায় ক্ষেত্রেও ঐ মূল অর্থের তথা ক্রয়-বিক্রয় আদান-প্রদানের তাৎপর্য্য লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সেমতে ইসলামের বায়আৎ ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় আদান-প্রদানের বস্তুদ্বয় কি তাহা নির্ণয়ে পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা—

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ -

يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ ....

"নিশ্চয় আল্লাহ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন মোমেনদের হইতে তাহাদের জান এবং মাল এই বিনিময়ে যে, তাহারা বেহেশ্‌ত পাইবে। (বিক্রিত বস্তু—তাহাদের জান ও মাল ক্রেতা তথা আল্লাহ তায়ালা সমীপে সমর্পনের ব্যবস্থা এই হইবে—) তাহারা (ঐ জান ও মাল ব্যয়ে) জেহাদ করিবে আল্লার পথে ; যাহার পরিণামে সে আল্লার পথের শত্রুকে মারিবে (—নিজে বাঁচিয়া থাকিবে) বা শত্রুর হাতে মরিবে। (—উভয় অবস্থায়ই তাহার পক্ষ হইতে বিক্রিত বস্তু জান ও মাল সমর্পণ সাব্যস্ত হইয়া যাইবে। এখন তাহার প্রাপ্য হইল বিনিময় বা মূল্য বেহেশ্‌ত। সেই বেহেশ্‌ত ইহজগতে দেওয়ার নয় ; পরজগতে দেওয়ার) অকাট্য ওয়াদা থাকিল। এই ওয়াদা-অঙ্গীকার তৌরাৎ ইঞ্জিল ও কোরআন সমস্ত আসমানী কেতাবেই বর্ণিত আছে। আল্লাহ অপেক্ষা অধিক অঙ্গীকার রক্ষাকারী আর কে আছে? (তোমাদের ক্ষণস্থায়ী জান-মাল বিক্রয়ে চিরস্থায়ী বেহেশ্‌ত ক্রয়—ইহা কতই না লাভ জনক)। অতএব তোমরা আনন্দিত হও এই ব্যবসায়ে। আর জানিয়া রাখ, (মোছলেম জীবনের) চরম সফলতা ইহাই। (১১ পাঃ ৯ রুঃ)

ইসলামের বায়আৎ তথা ক্রয়-বিক্রয়ের সর্বদিক উক্ত আয়াতে এই নির্দ্ধারিত হইল—

১। বিক্রিত বস্তু হইল—মোসলমানের জান ও মাল।

২ মূল্য হইল—বেহেশ্‌ত।

৩। বিক্রিত বস্তু ক্রেতার নিকট সমর্পণের ব্যবস্থা হইল—মোসলমান কর্তৃক তাহার জান-মাল আল্লার পথে উৎসর্গ করা।

৪। ক্রেতা হইলেন আল্লাহ তায়ালা যিনি মূল্য প্রাদান করিবেন ; তিনি মূল্য তথা বেহেশ্‌ত প্রস্তুত করিয়া আসমানী কেতাব সমূহে উহা প্রদানের ওয়াদায় আবদ্ধ হইয়া আছেন।

৫। বিক্রেতা হইল মোমেন ব্যক্তি। সে বিক্রিত বস্তু—তাহার জান ও মাল উল্লেখিত পদ্ধতিতে ক্রেতা সমীপে সমর্পণ করিবে—এই প্রস্তুতি ও প্রতিজ্ঞার দীক্ষা গ্রহণের নামই "বায়আৎ"।

ইসলামী বায়আতের মূল তাৎপর্য্য এই এবং উহার মৌলিক বিষয় ঐ। বায়আৎ ক্ষেত্রে উক্ত মৌলিক বিষয়টিকে মনে-প্রাণে, ধ্যানে-জ্ঞানে নির্দ্ধারিত লক্ষ্যস্থিত ও উপস্থিত রাখিয়া সময়োপযোগী প্রয়োজনীয় কোন কোন আনুষাঙ্গিক বিষয়ের অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞাও গৃহীত হয়। আলোচ্য বায়আতে-আকাবায় নবীজী মোস্তফা (দঃ) কর্তৃক মদিনাবাসী নবদীক্ষিত মোসলমানগণ হইতে গৃহীত ঐ শ্রেণীর অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞাগুলিও বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। প্রতিজ্ঞাগুলি ছিল নিম্নরূপ—

১। আমরা আল্লার সহিত তাঁহার উপাসনায়, তাঁহার গুণাবলীতে এবং তাঁহার আধিপত্য ও অধিকারে কোন অংশীদার বা শরীক সাব্যস্থ করিব না।

২। আমরা চুরি, ডাকাতি তথা কোন প্রকারে পরের সত্ব হরণ করিব না।

৩। ব্যাভিচার করিব না।

৪। সন্তান-নিধনের পন্থা ও নীতি অবলম্বন করিব না।

৫। মিথ্যা গড়ানো অপবাদ ও দোষারোপ করিব না।

৬। আমরা সৎকর্ম্মে, ন্যায় কাজে আপনার অবাধ্য কখনও হইব না।

৭। শক্ত হউক বা নরম, কঠিন হউক বা সহজ, মনোমত হউক বা মনোবিরোধী—সর্ব্ব বিষয়ে এবং সর্ব্বাবস্থায় আপনার পূর্ণ অনুগত বাধ্য থাকিব, আপনার আদেশে চলিব।

৮। নিজের স্বার্থ বিরোধী অন্যের স্বার্থমুখী আদেশ এবং পরিস্থিতিতেও আপনার পূর্ণ অনুগত ও বাধ্য থাকিব।

৯। ক্ষমতা ও পদের বেলায় যোগ্য ব্যক্তির বিরোধিতায় অংশ নিব না।

১০। সর্ব্বপ্রকার পরিস্থিতিতে হক্‌ ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ় থাকিব। আল্লার দ্বীনের ব্যাপারে নিন্দা-নন্দ, বদনাম-অখ্যাতির কোন ভয় কখনও করিব না।

এই সব অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞার দীক্ষা গ্রহণ সমাপ্তে নবী (দঃ) বলিলেন, এই সব প্রতিজ্ঞা পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া চলিলে তোমরা বেহেশ্‌তের অধিকারী হইবে, ক্রটি করিলে (বেহেশত লাভের অধিকার থাকিবে না) আল্লাহ শাস্তিও দিতে পারেন, ক্ষমাও করিতে পারেন (যদি ক্ষমার ব্যবস্থা কর)। যোরকানী, ১—৩১৪

ছয় নম্বর প্রতিজ্ঞা "নবীজীর অবাধ্য হইবে না"—ইহাতে একটি শব্দ বলা হইয়াছে, فى معروف "সৎ কর্ম্মে, ন্যায় কার্য্যে"। রসুল (দঃ) কি সৎ ও ন্যায়ের পরিপন্থি আদেশ করিবেন? তবুও ইহা বলা হইয়াছে। ইসলামী শাসন-ব্যবস্থা এবং ক্ষমতাধীকারী হওয়ার গোড়াপত্তনের প্রথম দিনেই নবীজী মোস্তফা (দঃ) তাঁহার সুন্নত ও আদর্শের কাঠামো দেখাইলেন এবং এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার আলো দেখাইলেন বিশ্বকে যে—শাসন

এবং ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় লোকদেরকে বাধ্যগত ও অনুগত বানাইতে শক্তি ও ক্ষমতার ব্যবহার, বলপ্রয়োগ এবং জোর-জবরদস্তির পন্থা অবলম্বন করিবে না। সততার প্রতিষ্ঠা, ন্যায় অবলম্বন, সৎকর্ম্ম ও সত্যনিষ্ঠার দ্বারা মানুষকে বশ্ করিতে এবং বাধ্য ও অনুগত বানাইতে চেষ্টা করিবে। ন্যায়-অন্যায়ের বাছ-বিচার ছাড়া আমার আদেশ আমার কথা মানিতেই হইবে, হক-নাহক, সৎ-অসৎ যাচাই না করিয়া আমার অনুসরণ করিতেই হইবে—এইরূপ দম্ভ ও ঔদ্ধত্যের উক্তিও করিবে না, ভাবও দেখাইবে না, এই পন্থা অবলম্বনও করিবে না।

বলপ্রয়োগ এবং জোর-জবরদস্তি দ্বারা মানুষকে বশ করিলে, তাহাদেরে অধীনস্থ ও অনুগত বানাইলে সেই বশ্যতা এবং সেই আনুগত্য মোটেই টেকসই হয় না। পক্ষান্তরে সৎকর্ম্ম, সততা বিস্তার এবং ন্যায়-নিষ্ঠা দ্বারা অনুগত ও বশ করিতে পারিলে তাহা সুদীর্ঘ হয় এবং বস্তুতঃ সেই ক্ষেত্রেই প্রকৃত আনুগত্য ও বশ্যতা হইয়া থাকে।

নবীজী মোস্তফার ক্ষেত্রে আনুগত্য প্রকাশে "সৎকর্ম্মে ও ন্যায় কার্য্যে" শর্ত্ত আরোপের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সকালের জন্য সুন্নত ও আদর্শ স্থাপন কল্পে নবী (দঃ) নিজের বেলায়ও এই শর্ত্ত আরোপ করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন এই শর্ত্ত আরোপে নবীজী মোস্তফার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের আভাসও পাওয়া যায় যে, ন্যায় ও সততার মাপ কাঠিতে আমার প্রতিটি আদেশ-নিষেধ পরিমাপ করিয়া অনুসরণ করিতে চাহিলে নিশ্চয় তোমরা আমার অনুগত হইতে বাধ্য হইবে। কতখানি সততা, সাহস ও আত্মবিশ্বাস থাকিলে এইরূপ চ্যালেঞ্জ দেওয়া যায়? স্বীয় আদর্শ ও ন্যায় নিতীর অটুট আত্মবিশ্বাস এবং নিঃস্বার্থ নিষ্কলঙ্ক অভ্রান্ত মতবাদের দৃঢ় প্রত্যয় না হইলে এই দাবী কখনও সহজ হইত না। নবীজী (দঃ) অতি সরল এবং দ্ব্যর্থ ও দ্বিধাহীনরূপে এই চ্যালেঞ্জ ও দাবীর সহিত লোকদেরে স্বীয় আনুগত্যের আহ্বান জানাইলেন। বস্তুতঃ এই বাস্তব আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শক্তির এক বিশেষ উৎস ছিল। শক্তির এই উৎস হাসিলের শিক্ষাই বিশ্বকে প্রদান করিয়াছেন বিশ্ব নবী (দঃ)।

এই শর্ত্ত আরোপে আরও একটি জরুরী বিষয়ের ইঙ্গিত দিয়াছেন নবীজী মোস্তফা (দঃ) যে, ক্ষমতাধীকারী লোকদের কর্ত্তব্য—বাস্তব ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দের অধীনস্থ রাখা ক্ষমতাকে। ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দকে ক্ষমতার অধীনস্থ করা চাই না। বর্ত্তমান যুগে শাসন-ব্যবস্থার বহু কেলেঙ্কারী এই একটি আদর্শের অভাবেই জন্ম নেয়। এই যুগের ক্ষমতাধারী শাসকগোষ্ঠি ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দকে ক্ষমতার অধীনে রাখে। অর্থাৎ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠি যাহাকে ন্যায় ও ভাল বলিবে উহাই ন্যায় ও ভাল পরিগনিত হইবে; জনগণ উহাকেই ন্যায় ও ভাল বলিতে বাধ্য থাকিবে। ইহারই ফলে ভাল ও ন্যায়ের নামে শত শত অনাচার অবিচার চালু

হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে নবীজী মোস্তফার সুন্নত ও আদর্শ হইল ইহার বিপরীত যে, ক্ষমতাকে ভাল ও ন্যায়ের অধীন রাখিতে হইবে। অর্থাৎ যাহা ভাল ও ন্যায় সাব্যস্ত ক্ষমতাধারীরা একমাত্র উহারই অনুসরণ করিবে এবং জনগণ একমাত্র উহাতেই তাহার আনুগত্যে বাধ্য থাকিবে। নবী (দঃ) বলিয়াছেন—

لَا طَاعَةَ لِلْمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

"সৃষ্টিকর্ত্তার নাফরমানীতে সৃষ্টির আনুগত্য চলিবে না।"

আকাবায় এই সম্মেলনও গোপনীয়তার মধ্যে হইল, দীক্ষা গ্রহণও ঐ রূপেই হইল। সব কিছুই মক্কার শত্রুদের অবগতির অন্তরালে সমাপ্ত হইল এবং মদিনার লোকগণ স্বদেশে যাত্রা করিলেন। মদিনার এই সব লোকেরা নবীজীর নিকট অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন—আমাদিগকে পবিত্র কোরআন পড়াইতে পারেন এবং ইসলাম শিক্ষা দিতে পারেন এমন একজন লোক আমাদিগকে প্রদান করিবেন। সেমতে নবী (দঃ) বিশিষ্ট ছাহাবী মোছআ'ব ইবনে ওমায়র (রাঃ)কে মদিনায় প্রেরণ করিলেন।

মদিনায় প্রথম মোহাজের ঃ

মোছআ'ব (রাঃ) সর্ব্বপ্রথম স্বদেশ মক্কা হইতে মদিনায় পৌঁছিলেন। তিনি ছিলেন এক অসাধারণ ত্যাগী পুরুষ; দ্বীন-ইসলামের জন্য তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন ইতিহাসে উহার দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। মোছআ'ব (রাঃ) ছিলেন মক্কার এক ভোগ-বিলাসপূর্ণ পরিবারের নয়নমণি তুলাল। তাঁহার পিতার অগাধ ধন-দৌলত ছিল। কত জাক-জমকপূর্ণ হইত তাঁহার পোশাক-পরিচ্ছদ! কত মূল্যবান হইত তাঁহার পরিধেয়! কত আরামপ্রিয় ছিলেন তিনি! ইসলাম গ্রহণের কারণে তিনি পিতার সব ধন-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া গিয়াছিলেন। এখন তিনি দীন-দরিদ্র কাঙ্গাল; শত শত টাকা মূল্যের জোড়ার পরিবর্ত্তে এখন তাঁহার অঙ্গ-আবরণ আছে কেবল এক টুকরা ছেঁড়া কম্বল। ইহা পরিধানে তিনি সোজা হইয়া দাঁড়াইতেও সঙ্কোচিত হইতেন যে, ছতর খুলিয়া যায় না কি। একদা নবী (দঃ) তাঁহাকে এই অসহায় অবস্থায় দেখিয়া তাঁহার পূর্ব্বেকার অবস্থা স্মরণে বর্ত্তমান ত্যাগের দৃশ্যে কাঁদিয়া ফেলিলেন। এই করুণ দৃশ্য লইয়াই তিনি ইহজীবনের বিদায় নিয়াছিলেন। ওহোদের জেহাদে তিনি শহীদ হইয়াছিলেন; তাঁহার কাফনের সম্বল একমাত্র ঐ ছেঁড়া কম্বল টুকড়াই ছিল। উহা এত ছোট যে, মাথার দিকে টানিয়া মাথা আবৃত করিলে পা বাহির হইয়া পাড়িত, পা আবৃত করিলে মাথা বাহির হইয়া পড়িত। এতদৃষ্টে নবী (দঃ) বলিয়াছিলেন, মাথা কম্বলে আবৃত কর, আর

"এয্খের" ঘাস দ্বারা পা আবৃত করিয়া মোছআ'বকে সমাধিস্ত কর। নবী (দঃ) ঐ দৃশ্য দৃষ্টে ইহাও বলিয়াছিলেন যে, আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ইসলামের পাকা ফল লাভের তথা ইসলামের অছিলায় উপকৃত হওয়ার সুযোগ পাইয়াছে। অর্থাৎ মোছআ'ব ইসলাম এবং ইসালামের জন্য ত্যাগ স্বীকারের বিনিময় ও সুফল দুনিয়াতে বিন্দুমাত্রও ভোগ করিয়া যায় নাই ; সবটুকুই আখেরাতের জন্য জমা রাখিয়া দুনিয়া হইতে বিদায় নিল (তৃতীয় খণ্ড ১৪৫৮ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)।

মদিনায় ইসলামের প্রভাব ঃ

গত এক বৎসর হইতে মদিনার ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। এই বৎসর নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হস্ত ধারণে দীক্ষা গ্রহণকারী বার জন ভক্ত অনুরক্তের সর্ব্বাত্মক প্রচেষ্টায় সারা মদিনাতে ইসলামের প্রচার ও প্রসার অনেক গুণে বাড়িয়া গেল। অধিকন্তু মোছআ'ব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আগমনে ত ইসলামের জন্য কর্ম্ম তৎপরতা ব্যাপক আকার ধারণ করিল।

বিশেষতঃ মহাত্যাগী মোছআ'ব (রাঃ) এবং দীক্ষা গ্রহণকারী বার জন নিষ্ঠাবান ভক্তের চরিত্র-প্রভাব লোক চক্ষের অগোচরে ক্রমে ক্রমে মদিনাবাসীদের হৃদয়ে সুদৃঢ় স্থান করিয়া নিল এবং সমগ্র মদিনায় উহার প্রভাব ছড়াইয়া পড়িল।

চরিত্র ও আদর্শের প্রভাব সর্ব্বাধিক ব্যাপক ও শক্তিশালী হইয়া থাকে এবং এই প্রভাব আপনা আপনিই বিস্তার লাভ করে ; বিস্তারিত করিতে হয় না। যেমন সূর্য্য যখন তাহার জ্যোতি ও আভা লইয়া আত্মপ্রকাশ করে তখন আপনা আপনিই উহার আলো ও কিরণমালা বিশ্বচরাচরের সব কিছুর উপর পতিত হইয়া থাকে। তদ্রূপ নিষ্ঠাবান আদর্শবাদী মহামতিগণের চরিত্র ও আদর্শের প্রভাবও বিস্তারিত করার প্রয়োজন রাখে না ; আপনা আপনিই ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করিয়া থাকে। মদিনায় মোছআ'ব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং তথাকার দ্বাদশ মহানের চরিত্র ও আদর্শের প্রভাবে ইসলামের প্রভাব ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হইল।

মোছআ'ব (রাঃ) মদিনায় আসিয়া আস্আদ ইবনে যোরারা (রাঃ) যিনি আকাবার প্রথম বৎসরের সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ছিলেন এবং দ্বিতীয় সম্মেলনেও অংশগ্রহণকারী ছিলেন তাঁহার গৃহে অবস্থান করিলেন। মোছআ'ব (রাঃ) মদিনায় ইসলামের ও পবিত্র কোরআনের শিক্ষা ব্যাপকভাবে চালাইলেন, এমনকি তিনি "মুক্‌রীল-মদিনা" মদিনার শিক্ষক বা অধ্যাপক নামের খ্যাতি লাভ করিলেন। তিনি মদিনার মোসলমানগণের ইমামও ছিলেন ; জমাতে নামায পড়াইয়া থাকিতেন। এই সময় মদিনার মোসলমানদের সাধারণ সংখ্যা চল্লিশে পৌছিয়াছে (যোরকানী, ১—৩১৫)।

তখনও জুমার নামায ফরজ হয় নাই, আসআদ (রাঃ) সপ্তাহে একদিন সকল মোসলমানদের একত্রিত হওয়ার এবং বিশেষভাবে এবাদৎ করার ব্যবস্থা করিলেন; উহার জন্য তাঁহারা শুক্রবার দিন ধার্য্য করিয়া নিলেন। আসআদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ইহা একটি বড় সৌভাগ্য যে, তিনিই সর্ব্বপ্রথম শুক্রবার দিনে মোসলমাদের একত্রিত হওয়ার এবং বিশেষভাবে এবাদৎ-বন্দেগী করার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যেই নবী (দঃ) আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে ওহী মারফৎ শুক্রবারে ঐরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইলেন। কিন্তু মক্কায় তাহা করা সম্ভব নয়; নবীজী (দঃ) মদিনায় মোছআ'ব (রাঃ)কে পত্র যোগে এই ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দ্দেশ পাঠাইলেন। বিশেষভাবে ইহাও লিখিলেন যে, দুপুর বেলায় সূর্য্য ঢলিবার পর সমবেতভাবে দুই রাকাত নামাযও পড়িবে। মোছআ'ব (রাঃ) মদিনায় মোসলমানদের ইমাম ছিলেন, তাই তিনিই সর্ব্বপ্রথম জুমার নামাযের অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী। অতঃপর নবী (দঃ) হিজরত করিয়া মদিনায় পৌঁছিলে আনুষ্ঠানিকরূপে জুমার নামায ফরজ হওয়ার নির্দ্দেশ পবিত্র কোরআন ছুরা-জুমার মধ্যে নাযেল হয়; তখন হইতে নবী (দঃ) ফরজরূপে জুমার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। (যোরকানী, ১—৩:৫)

গোটা একটি বংশের ইসলাম গ্রহণ ঃ

মদিনার দুইটি প্রসিদ্ধ বংশ—বনু-জফর ও বনু-আব্দিল-আশহাল। একদা আসআদ (রাঃ) মোছআ'ব (রাঃ)কে সঙ্গে করিয়া ঐ বংশদ্বয়ের মহল্লায় ইসলাম প্রচারের চেষ্টা করার জন্য রওয়ানা হইলেন এবং ঐ মহল্লার নিকটবর্ত্তী যাইয়া তাঁহারা উভয়ে একটি বাগানে বসিলেন। ইসলামে দীক্ষিত আরও কতিপয় লোক তথায় আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন।

আব্দুল-আশহাল গোত্রের দুইজন সর্দার ছিলেন—একজন সায়াদ ইবনে মোআজ, অপর জন ওসায়দ-ইবনে-হোযায়ের। তন্মধ্যে সায়াদ ছিলেন আসআদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খালাত ভাই। এই সর্দারদ্বয় সংবাদ পাইলেন যে, আসআদ (রাঃ) এবং মোছআব (রাঃ) সহ মোসলমানগণ অমুক বাগানে একত্রিত হইয়াছেন। এই সংবাদে মোয়াজ ওসায়দকে বলিলেন, তাহারা আমাদের মহল্লায় আসিয়াছে; আমাদের কাঁচা ও দুর্ব্বল লোকগুলাকে গোমরাহ করিয়া ফেলিবে। তুমি যাইয়া উহাদিগকে খুব করিয়া ধমকাইয়া আস। আমার জন্য একটু অসুবিধা যে, তাহাদের আসআদ আমার খালাত ভাই; তাই ধমকাইবার জন্য তাহার সম্মুখে আমার যাইতে মন চলে না। নতুবা আমিই যাইতাম।

সেমতে ওসায়েদ একটি বর্শা হাতে লইয়া ঐ বাগানের দিকে যাইতে লাগিল। আসআদ (রাঃ) দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া নিজ সঙ্গী মোছআব (রাঃ)কে বলিলেন, ঐ যে লোকটি আসিতেছে সে নিজ গোষ্টি আব্দুল-আশহাল গোত্রের একজন সর্দার, আপনার নিকট আসিতেছে, তাহাকে আল্লার দ্বীনের কথা পরিষ্কার ভাষায় বলিবেন, সত্যকে প্রকাশ করিতে কোন কিছুর খাতির করিবেন না। মোছআব (রাঃ) বলিলেন, আমার নিকটে বসিলে আমি নিশ্চয় বলিব এবং বুঝাইব।

ইতিমধ্যেই ওসায়দ তাঁহাদের নিকট পেঁছার সঙ্গে সঙ্গে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ পুর্ব্বক কঠোর ভাষায় গালাগালি করিয়া বলিল, তোমরা আমাদের সরল লোকগুলিকে বিভ্রান্ত করিতে কেন আসিয়াছ? যদি তোমাদের প্রাণের মায়া থাকে তবে দূর হইয়া যাও। বিকারগ্রস্ত রোগীর গালাগালিতে বুদ্ধিমান ডাক্তার রোগীর প্রতি রাগ না করিয়া দয়াপরবশই হইয়া থাকেন। সেমতেই মোছআব (রাঃ) ওসায়দকে নম্র ও মোলায়েমভাবে বলিলেন, শান্তভাবে একটু বসুন এবং আমার কিছু কথা শুনুন; পছন্দ হইলে উহা গ্রহণ করিবেন, পছন্দ না হইলে উহাকে এড়াইয়া যাইবেন। গরমের উত্তরে এরূপ নরম! ওসায়দের অন্তরে ইহা রেখাপাত করিল। তিনি বলিলেন, আপনি ত ন্যায় কথা বলিয়াছেন; এই বলিয়া ওসায়েদ তাঁহার বর্শাটা মাটিতে গাড়িয়া দিলেন এবং তাঁহাদের নিকট বসিয়া পড়িলেন। মোছআব (রাঃ) খুব সুন্দরভাবে ইসলামের মাহাত্ম্য তাঁহাকে বুঝাইলেন এবং কোরআন শরীফের কিছু অংশ তেলাওত করিয়া শুনাইলেন। ওসায়দ বলিলেন, ইহা ত অতীব সুন্দর, অতীব চমৎকার! তিনি আরও বলিলেন, আপনারা কাহাকেও আপনাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করাকালে কি করিয়া থাকেন? এখন আসআদ (রাঃ) এবং মোছআব (রাঃ) উভয়ে তাঁহাকে বলিলেন, গোসল করিয়া পাক পবিত্র হইয়া আসুন, পাক পবিত্র কাপড় পরিধান করুন এবং সত্য ধর্ম্ম গ্রহণের ঘোষণা প্রদান পূর্ব্বক নামায আদায় করুন। ওসায়দ তৎক্ষণাৎ সব কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া আসিলেন এবং সত্য ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণের ঘোষণা প্রদান করিয়া দুই রাকাত নামায আদায় করিলেন। এখন তিনি ওসায়দ-ইবনে-হোযায়র রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু। অতঃপর তিনি আসআদ (রাঃ) এবং মোছআব (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমার পেছনে আর একজন লোক আছেন "সায়াদ" তিনিও যদি আপনাদের ধর্ম্মে আসিয়া যান তবে আব্দুল-আশহাল গোত্রের ছোট-বড় কেহই আপনাদের ধর্ম্ম-মত হইতে বাহিরে থাকিবে না। আমি এখনই তাঁহাকে আপনাদের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব। এই বলিয়া ওসায়দ (রাঃ) তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সায়াদ ত ওসায়দকে পাঠাইয়া দিয়া অপেক্ষায় বসিয়াছিল; ওসায়দ (রাঃ) তাহারই নিকট আসিতেছেন। দূর হইতে তাঁহাকে দেখা মাত্র সায়াদ বলিয়া উঠিল,

খোদার কসম—ওসায়দ যেই অবস্থায় গিয়াছিল সেই অবস্থা হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। নিকটে আসিলে ওসায়দকে সায়াদ জিজ্ঞাসা করিল, তোমাকে যেই কাজে পাঠাইয়াছিলাম উহার কি করিয়াছ? ওসায়দ (রাঃ) বলিলেন, উহাদের উভয়ের সঙ্গে কথা বলিয়াছি; উহাদের দ্বারা আমার কোন আশঙ্কা মনে হইল না, আমি উহাদেরকে নিষেধও করিয়াছি এবং তাহারাও আমাকে বলিয়াছে—আপনি যাহা বলেন আমরা সেইরূপই করিব।

তবে একটি বিপদের সংবাদ এই পাইলাম যে, বনু-হারেছা বংশের লোক-জন বাহির হইয়া পড়িয়াছে আসআদকে হত্যা করিবার জন্য, যেহেতু তাহারা জানিতে পারিয়াছে, তিনি আপনার খালাত ভাই। তাই তাহারা মনস্থ করিয়াছে, তাঁহাকে হত্যা করিয়া আপনাকে অপদস্থ করিবে।

সায়াদ এই সংবাদে ভীষণ উত্তেজিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ওসায়দের হাতের বর্শাটি লইয়া ছুটিয়া পড়িল যে, বনু-হারেছা কোন অপকর্ম্ম না করিয়া বসে। যাত্রাকালে ওসায়দকে ইহাও বলিল যে, মনে হয় তুমি কিছুই কর নাই। সায়াদ ঐ বাগানে পৌঁছিল এবং দেখিল, আসআদ কোন প্রকারে শঙ্কিত ও ভীত মনে হয় না, তাই সায়াদ ভাবিল যে, আসআদকে হত্যার ষড়যন্ত্রের সংবাদটা সত্য নয়। এখন সায়াদ মোছআব (রাঃ) এবং আসআদ (রাঃ)কে কঠোর ভাষায় গালাগালি করিতে লাগিল। মোছআব (রাঃ) পূর্ব্বের ন্যায় অতি নরম ও মোলায়েম ভাষায় সায়াদকে ঐ কথাই বলিলেন যাহা ওসায়দকে বলিয়াছিলেন। ফলে ওসায়দের ন্যায় সায়াদও নরম হইয়া পড়িলেন এবং মোসআব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মুখে ইসলামের ব্যাখ্যা ও পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত শুনিলেন। অতঃপর পাক পবিত্র হইয়া আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন; এখন তিনি সায়াদ ইবনে মোআয (রাঃ)।

ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ওসায়দ (রাঃ) সহ স্বীয় বংশ আশহাল গোত্রের লোকদের নিকট উপস্থিত হইলেন। আশহাল গোত্রীয় লোকদের সমাগম হইল। সায়াদ (রাঃ) তাঁহার জাতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা আমাকে কিরূপ গণ্য কর? সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, আপনি আমাদের সর্দার, অতি বিজ্ঞ-বিচক্ষন, ন্যায়-নিষ্ঠাবান। তখন সায়াদ (রাঃ) বলিলেন, শুনিয়া রাখ—তোমাদের নারী-পুরুষ কাহারও সহিত আমি কথাও বলিব না যাবৎ না তোমরা এক আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলের প্রতি ঈমান গ্রহণ কর।

সায়াদ (রাঃ) এবং ওসায়দ (রাঃ) তাঁহারা উভয়ই আশহাল বংশের প্রধান; তাঁহাদের এই ঘোষণায় সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই ঐ বংশের নর-নারী আবাল-বৃদ্ধ সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিয়া নিলেন, তাঁহাদের একটি প্রাণীও ইসলামের সুশীতল ছায়া বহির্ভূত থাকিল না।

"সত্যের গতি অপ্রতিহত" "ছবরে মেওয়া ফলে" "আল্লার পথে যাঁহারা সাধনা করেন আল্লাহ তাঁহাদের সাধনায় সিদ্ধি দান করেন"। তায়েফে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অসীম ছবর এবং অসাধারণ সাধনা ও ত্যাগ ছিল; আজ মদিনার ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চ্চা, নবীজী মোস্তফার সাফল্য। মদিনায় এইরূপ পরিবার কমই ছিল যেই পরিবারে ইসলাম প্রবেশ করিয়াছিল না।

মোছআব (রাঃ) এবং আসআদ (রাঃ) গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনায় তাঁহাদের অন্তর ভরিয়া গেল, কর্ম্মশক্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ইসলামের মহিমা চর্চ্চায় সমগ্র মদিনা মুখরিত হইয়া উঠিল।

নবুয়তের দ্বাদশ বৎসর—আকাবায় বিশেষ সম্মেলনঃ*

মদিনায় ইসলামের দ্বিতীয় বৎসর ইহা—তুই বৎসর শেষ হইয়াছে তৃতীয় বৎসর আগত এই বৎসর মদিনায় ইসলামের বিস্তার পুরাদমে চলিয়াছে। মদিনার বিশিষ্ট তুইটি বংশ "আউস" ও "খাযরাজ" উভয় গোত্রেই ইসলাম প্রসার লাভ করিয়াছে; মদিনার ঘরে ঘরে প্রতিটি পরিবারেই ইসলাম প্রবেশ করিয়াছে। এখন হইতেই মক্কার মজলুম অত্যাচারিত মোসলমানদের মধ্যে কাহারও কাহারও দৃষ্টি মদিনার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া আরম্ভ হইল। ঐ সময়ে অসহনীয় নির্য্যাতনে জর্জ্জরিত হইয়া কোরেশ বংশের বনু-মখযুম গোত্রীয় আবু সালামা (রাঃ) মক্কা হইতে মদিনায় হিজরত করেন। তাঁহার হিজরতের কাহিনী অত্যন্ত হৃদয় বিদারক।

আবু সালামাহ (রাঃ) প্রথমে স্ত্রীকে নিয়া হাব্সা তথা আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়াছিলেন। মক্কাবাসীরা মোসলমান হইয়া গিয়াছে এই ভুল সংবাদে যাঁহারা আবিসিনিয়া হইতে মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন আবুসালামা (রাঃ) তাঁহাদেরই এক জন। প্রত্যাবর্ত্তনের পর মক্কায় অবস্থান করিলেন, কিন্তু তুরাচাররা তাঁহার প্রিতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অত্যাচার নির্য্যাতন চালাইল। এমনকি পুনরায় আবিসিনিয়ায় চলিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। ইতি মধ্যেই তিনি জানিতে পারিলেন, মদিনায় মোসলমান আছেন—তাঁহারা প্রবাসী মোসলমানকে সহোদররূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সংবাদে তিনি আবিসিনিয়ায় পুনঃ না যাইয়া মদিনায় যাওয়া সাব্যস্ত করিলেন। সেমতে তিনি শিশুপুত্র "সালামা" এবং স্ত্রী উম্মে-সালামা সহ

* নবীজীর মদিনা প্রয়ানের শুভ সূচনা—আকাবার এই বিশেষ সম্মেলন নবুয়তের ১২শ সনের হজ্জ মৌসুমেই হইয়াছিল, ১৩শ সনে নহে। কারণ, নবীজীর হিজরত তথা মদিনায় প্রয়ান নবুয়তের ১৩শ সনের রবিউল আউয়াল মাসে ছিল বলিয়া নির্দ্ধারিত (বেদায়াহ, ৩—১৭৭)। সুতরাং উহার শুভ সূচনা এবং উক্ত সম্মেলন ১২শ সনের হজ্জের মাস জিলহজ্জ মাসে হওয়া অবধারিত।

উটে চড়িয়া মদিনা পানে যাত্রা করিলেন। ইতিমধ্যেই উম্মে-সালামার গোষ্টির লোকেরা আসিয়া আবুসালামা (রাঃ)কে গালাগালি দিয়া বলিল, তোকে ত আমরা বারণ করিতে পারিলাম না, কিন্তু আমাদের মেয়েকে বিদেশে নিয়া যাইতে দিব কেন ? এই বলিয়া তাহারা উটের লাগাম-দড়িটা আবুসালামার হাত হইতে ছিনাইয়া নিয়া স্ত্রী উম্মে-সালামাকে বলপূর্ব্বক লইয়া গেল। শিশু-পুত্রটি উম্মে-সালামায় ক্রোড়ে ছিল, এমন সময় আবুসালামার গোষ্টির লোকেরা আসিয়া দাবী করিল, আমাদের বংশের শিশু তোমাদেরকে নিয়া যাইতে দিব কেন ? এই বলিয়া তাহারা শিশুটিকে মাতা উম্মে-সালামার ক্রোড় হইতে ছিনাইয়া নিজেদের মধ্যে নিয়া গেল। এখন পিতা, পুত্র মাতা পরস্পর ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

কী মর্ম্মান্তিক ও হৃদয়-বিদারক দৃশ্য ! স্বামীর নিকট হইতে স্ত্রীকে জোর করিয়া ছিনাইয়া নেওয়া হইল—তাহার আর্ত্তনাদ, মায়ের বুক হইতে শিশু-পুত্রকে ছিনাইয়া লইয়াছে—তাহার ক্রন্দন। কিন্তু কোরেশ নর-পশুদের নিকট এ সবই তুচ্ছ ; পাষণ্ডরা এই সমস্তের প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করিল না। তাহাদের কর্ম্ম তাহারা করিয়া নিজেদের গৃহে চলিয়া গেল ; নির্ম্মম অভিনয় সাঙ্গ হইল। আবুসালামা (রাঃ) মুহূর্ত্তের মধ্যে নিঃসঙ্গ একা হইয়া গেলেন ; নির্ব্বাক, হতভম্ভ, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় দাঁড়াই রহিলেন। কিন্তু তিনি ত "মোসলেম" আল্লাহতে আত্মসমর্পণকারী ইসলামে আত্মোৎস্বর্গকারী ; এই বিভৎস কাণ্ডও তাঁহাকে লক্ষ্যচ্যুত করিতে পারিল না। মোসলেমের ইসলাম পরীক্ষার সম্মুখে উজ্জ্বল, দৃঢ় ও দৃপ্ত হইয়া উঠে ; সেই মুহূর্ত্তেই আবুসালামা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সত্যের তেজ এবং ত্যাগের সঙ্কল্প উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি তাঁহার উটকে প্রিয় মদিনার দিকে ফিরাইয়া দিলেন ; সব কিছু পেছনে ফেলিয়া তিনি চলিলেন ইসলামের আশ্রয় পানে। ইসলাম ও ঈমান রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করতঃ দ্বীনের আশ্রয় স্থলে চলিয়া যাইবে— মোমেন ও মোসলেমের পরিচয় ইহাই। আবুসালামা (রাঃ) এই অনল পরীক্ষায় খাঁটী মোসলেম হওয়ার পরিচয় দানে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইলেন।

এদিকে উম্মে-সালামার যে দশা হইল তাহার বর্ণনায়ও বুক ফাটিয়া যায়। স্বামী-পুত্রের বিচ্ছেদ-বেদনায় তিনি ভীষণ কাতর ; লোকালয় হইতে দূরে যে স্থানে ঐ মর্ম্মবিদারক ঘটনা ঘটিয়াছিল, প্রতিদিন সেই স্থানে যাইয়া তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় কাঁদিতেন, স্বামী-পুত্র স্মরণের অশ্রু ধারায় শোকাতুর প্রাণকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করিতেন। উম্মে-সালামা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার এই করুন অবস্থার উপর প্রায় একটি বৎসর কাটিয়া গেল।

নিরাশার আঁধারে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার রহমতই আশার আলো। উম্মে-সালামা (রাঃ) নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন—আমার এই মর্ম্মস্পর্শী অবস্থায় আমার এক

নিকট আত্মীয়ের অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল। তাহার অনুরোধে আমার স্বজনগণ আমাকে স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিতে রাজি হইল এবং আবুসালামার আত্মীয়গণও শিশু-পুত্রটিকে প্রত্যার্পণ করিতে সম্মত হইল। সব কিছুই ঠিক হইল, কিন্তু আমি মদিনার পথ চিনি না, পথের কোন সম্বল আমার নাই, আমার সঙ্গী কেহ নাই। তবুও আমি শিশু-পুত্রকে কোলে লইয়া উটের পিঠে আরোহন করিলাম এবং মহান আল্লার উপর ভরসা করিয়া মদিনা পানে পাড়ি জমাইলাম। একটি শোকাতুর মহিলা, কোলে আছে শিশু পুত্র সঙ্গে পাথেয় নাই, সঙ্গী নাই, পথের পরিচয় নাই, একাকী চলিয়াছে মরুভূমীর পথে। দেশের মায়া, আত্মীয়-স্বজনের মমতা বাধা দানে ব্যর্থ, পথের দুঃখ-কষ্ট এবং ভীষণতার ভাবনাও তাহার নিকট তুচ্ছ। তাহার একই আবেগ—দ্বীন-ঈমান রক্ষার জন্য স্বামী যেখানে গিয়াছেন সেও সেখানে পৌঁছিবে।

আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা—"আমার পথে যে সাধনা করিবে আমিই তাহাকে আমার পর্য্যন্ত পৌঁছিবার পথ অতিক্রম করাইয়া দিব" (কোরআন)। আল্লাহ তায়ালার মহিমার কি শেষ আছে? উম্মে-সালামাহ (রাঃ) বলেন—মক্কা হইতে মদিনার পথে প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রমে "তানয়ীম" জায়গায় পৌঁছিতেই মক্কার এক সহৃদয় ব্যক্তি ওসমান ইবনে তাল্‌হার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তখনও তিনি মোসলমান হন নাই, তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবুউমাইয়্যা-তনয়া কোথায় চলিয়াছ? আমি বলিলাম, মদিনায় স্বামীর নিকট। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সঙ্গে কেহ নাই? আমি বলিলাম, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সঙ্গে আছেন, আর আছে এই শিশু। তিনি বলিলেন, তোমাকে এই অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া সমীচীন হইবে না; এই বলিয়া তিনি আমার উটের লাগাম ধরিলেন এবং আমার উটকে চালাইয়া মদিনার পথে চলিলেন। তাঁহার ন্যায় মহনুভব ব্যক্তি জীবনে আমি দেখি নাই। পথে বিশ্রাম-মঞ্জিলে পৌঁছিলেই তিনি আমার উটটিকে বসাইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেন এবং আমি সুন্দরভাবে অবতরণ করিয়া সারিলে তিনি উটটিকে কোন বৃক্ষের সহিত বাঁধিয়া দিতেন, উহার পিঠের বোঝা নামাইতেন, তারপর নিকটবর্ত্তী কোন বৃক্ষ ছায়ায় তিনি আরাম করিতেন এবং যাত্রা করার সময় হইলে উটটি গদি ইত্যাদি বাঁধিয়া আমার নিকটে রাখিয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেন। আমি সুস্থিরভাবে আরোহণ করিয়া সুন্দররূপে বসিলে পর তিনি উটের দড়ি ধরিয়া চলিতে থাকিতেন। (মক্কা-মদিনার প্রায় তিন শত মাইল) দীর্ঘ পথ তিনি এইরূপ পবিত্রতা ও শৃঙ্খলার সহিত আমাকে পার করাইলেন। প্রাণ প্রিয় মদিনা দূর হইতে দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠিল। মদিনার "কোবা" পল্লিতে স্বামী আবুসালামা (রাঃ) বাস করিতেন; উহার নিকটবর্ত্তী পৌঁছিয়া ওসমান আমাকে বলিলেন, আপনার স্বামী এই স্থানে বাস করেন, আপনি

তাঁহার সমীপে যাইয়া উপস্থিত হউন—আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। এইভাবে আমাকে স্বামীর আশ্রয়ে পৌঁছাইয়া ওসমান মক্কার পথ ধরিলেন। বেদায়াহ, ৩—১৬৯

পূণ্যবান ও পূণ্যবতী ঃ

আবুসালামা (রাঃ) এবং উম্মে-সালামা (রাঃ)—স্বামী-স্ত্রীর সাধনার এই চিত্র কতই না সুন্দর। দ্বীনের জন্য দুঃখ-কষ্ট সহনের এবং ত্যাগ স্বীকারের কি অত্যুজ্জল দৃষ্টান্ত ইহা। ইহার পরিণাম যে আরও কত সুন্দর হইবে তাহার আভাস ইহজগতেই উম্মে-সালামা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার জীবনে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নবীজী (দঃ) হিজরত করিয়া মদিনায় আসিবার দুই-তিন বৎসর পর পূণ্যবান স্বামী আবুসালামা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মদিনায় ইন্তেকাল করেন। নবীজী (দঃ) তাহার সম্পর্কে সুসংবাদ দানে বলিয়াছেন, কেয়ামত দিবসে ডান হস্তে আমলনামা পাইবার সৌভাগ্য সর্ব্বপ্রথম লাভ করিবেন আবুসালামা (রাঃ) (যোরকানী, ১—৩১৯)। সুন্দর সাধনার কী সুন্দর প্রতিদান। আল্লার পথে নির্য্যাতন ভোগে সর্ব্বপ্রথম সপরিবারে মোহাজের—দেশত্যাগী তিনি; তাই চিরসাফল্যের প্রতিক ডান হস্তে আমলনামা লাভের চিরসৌভাগ্য সর্ব্বপ্রথম লাভ করিবেন তিনি।

আবুসালামা ও উম্মে-সালামার দুঃখী জীবনের চরম ভালবাসার যে চিত্র উপরোল্লেখিত বর্ণনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে উহার কি তুলনা হয়! আবুসালামা (রাঃ) মৃত্যু মুহূর্ত্তে স্বীয় প্রাণপ্রিয় পরিবারের জন্য একটি অতি মূল্যবান সওগাত রাখিয়া গেলেন—আল্লাহ তায়ালার মহান দরবারে মোনাজাত ও দোয়া করিয়া গেলেন—

اَللّٰهُمَّ اَخْلُفْ فِىْ اَهْلِىْ خَيْرًا مِّنِّىْ

"হে আল্লাহ! আমার স্থলে আমার পরিবারকে আমার অপেক্ষা উত্তমটি দান কর"।

উম্মে-সালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছিলাম, যে মোসলমান তাঁহার কোন (ক্ষয়-ক্ষতির) বিপদে এই দোয়া পড়িবে আল্লাহ তাহাকে উত্তম ক্ষতিপূরণ দান করিবেন।

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ اَحْتَسِبُ مُصِيْبَتِىْ فَاْجُرْنِىْ فِيْهَا وَاَخْلِفْ لِىْ خَيْرًا مِّنْهَا

"আমরা সকলেই আল্লার এবং তাঁহার নিকট আমাদের সকলেরই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। হে আল্লাহ। আমার বিপদের ছওয়াব আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি; অতএব তুমি আমাকে বিপদের ছওয়াব দান কর। এবং আমার যাহা চলিয়া গিয়াছে উহা অপেক্ষা উত্তমটি আমাকে দান কর।" মেশকাত শরীফ ১৪১ পৃঃ

উম্মে-সালামা (রাঃ) বলিয়াছেন, যখন আমার প্রাণপ্রিয় স্বামী আবুসালামা ইন্তেকাল করিলেন তখন সেই বিপদে এই দোয়া পাঠ করিতে আমার অন্তরে দ্বিধার সৃষ্টি হইল, আবুসালামা অপেক্ষা কোন মোসলমান উত্তম হইবে? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের (হিজরত স্থানের) দিকে সপরিবারে সর্ব্বপ্রথম হিজরতকারী ছিলেন তিনি। অবশ্য এই দ্বিধা সত্ত্বেও আমি এই দোয়া পাঠ করিলাম। ফলে আল্লাহ তায়ালা রসুলুল্লাহ (দঃ)কে আমায় বদলরূপে দান করিলেন। (রসুলুল্লাহ (দঃ) উম্মে-সালামা (রাঃ)কে সহধর্ম্মিনীরূপে গ্রহণ করিলেন।)

মদিনার প্রতিনিধি দল ঃ

নবুয়তের এই দ্বাদশ বৎসর শেষে হজ্জ-মৌসুম নিকটবর্ত্তী হইয়াছে; মদিনার মোসলমানগণ পরামর্শে বসিলেন; তাঁহারা আলোচনা করিলেন—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আর কত দিন এইভাবে ছাড়িয়া রাখা যায় যে, তিনি ভীত সন্ত্রস্ত এবং অবহেলীত অবস্থায় মক্কার পর্ব্বতমালার আঁকে বাঁকে ঘুরিয়া বেড়াইবেন?

সাব্যস্ত এই হইল যে, নবীজীকে মক্কা হইতে মদিনায় নিয়া আসা বাঞ্ছনীয়। সেমতে মদিনার মোসলমানদের মধ্যে বিরাট প্রাণচাঞ্চল্য এবং কর্ম্ম তৎপরতা আরম্ভ হইল। তাঁহারা এইবার নবীজী মোস্তফা (দঃ)কে মদিনায় আগমনের অনুরোধ করিবেন, সুতরাং সব শ্রেণীর বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হজ্জ-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এমনকি মদিনায় ইসলামী শিক্ষার জন্য নবীজী কর্ত্তৃক প্রেরিত অধ্যাপক মোছআব (রাঃ)ও এই উপলক্ষে মক্কায় আসিলেন (বেদায়াহ, ৩—১৫৮)।

মোশরেক কাফেররাও হজ্জের তীর্থ উদ্দেশ্যে মক্কায় যায়; মদিনা হইতে ঐ শ্রেণীর পাঁচশত জনের তীর্থ যাত্রী কাফেলা রওয়ানা হইল। মোসলমানদের দুইজন মহিলা হজ্জযাত্রীসহ মোট ৭৫ জনের দলও মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের ১১ জন আউস গোত্রীয় অবশিষ্ট সবই খাযরাজ গোত্রীয়। তাঁহাদের মধ্যে ৩০ জনই ছিলেন যুবক শ্রেণীর, বাকি বয়স্ক মুরব্বি শ্রেণীর।

এই ৭৫ জন স্বর্গীয় মানুষের মনে কত উল্লাস! কত উৎসাহ-উদ্দীপনা! তাঁহারা সুদূর মক্কা হইতে নিয়া আসিবেন আল্লার রসুলকে নিজেদের দেশে; সেবা ও রক্ষণাবেক্ষন করিবেন আল্লার নবীর; তাঁহার ছায়া তলে থাকিয়া ইসলামী পতাকা সমুন্নত করিবেন তাঁহারা। ইসলামের ইতিহাসে তাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহাদের বরকতভরা নামসমুহ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১। ওসায়দ ইবনে হোযায়র (রাঃ) ২। সায়াদ ইবনে খায়ছমা (রাঃ) ৩। রেফাআহ ইবনে আবদুল মোনজের (রাঃ) ৪। আবুল-হায়ছম (রাঃ) ৫। যোহায়র ইবনে রাফে (রাঃ) ৬। সালামাহ ইবনে সুলামাহ (রাঃ) ৭। আবু-বোর্দাহ (রাঃ) ৮। নোহায়র ইবনে হায়ছম (রাঃ) ৯। আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) ১০। মাআ'ন ইবনে

আদী (রাঃ) ১১। ওয়ায়েম ইবনে সায়েদা (রাঃ) (উক্ত ১১ জন আউস গোত্রীয় অবশিষ্ট ৬২ জন পুরুষ খাযরাজ গোত্রীয়।) ১২। আসআদ ইবনে যোরারা (রাঃ) ১৩। সা'দ ইবনে রবী (রাঃ) ১৪। আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওআহা (রাঃ) ১৫। রাফে ইবনে মালেক (রাঃ) ১৬। বরা ইবনে মা'রূর (রাঃ) ১৭। আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ) ১৮। ওবাদাহ ইবনে ছামেৎ (রাঃ) ১৯। সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) ২০। মোনজের ইবনে আম্‌র (রাঃ) ২১। আবু আইউব (রাঃ) ২২। মোআজ ইবনে হারেছ (রাঃ) ২৩। আউফ ইবনে আফরা (রাঃ) ২৪। মোআওয়াজ ইবনে আফরা (রাঃ) ২৫। ওমারাহ ইবনে হযম (রাঃ) ২৬। সাহ্‌ল ইবনে আতীক (রাঃ) ২৭। আউস্ ইবনে ছাবেৎ (রাঃ) ২৮। আবু তাল্‌হা (রাঃ) ২৯। কায়স ইবনে আবু ছা'ছাআ'হ (রাঃ) ৩০। আম্‌র ইবনে গাযিয়্যা (রাঃ) ৩১। খারেজা ইবনে যায়েদ (রাঃ) ৩২। বোশায়র ইবনে সায়াদ (বাঃ) ৩৩। আবদুল্লাহ ইবনে সায়াদ (রাঃ) ৩৪। খাল্লাদ ইবনে সোয়ায়েদ (রাঃ) ৩৫। ওক্‌বা ইবনে আম্‌র (রাঃ) ৩৬। যেয়াদ ইবনে লবীদ (রাঃ) ৩৭। ফরওয়া ইবনে আম্‌র রাঃ) ২৮। খালেদ ইবনে কায়স (রাঃ) ৩৯। যাকওয়ান ইবনে আব্দে-কায়স (রাঃ) ৪০। আব্বাদ ইবনে কায়স (রাঃ) ৪১। হারেস ইবনে কায়স (রাঃ) ৪২। বিশ্‌র ইবনে বরা (রাঃ) ৪৩। সেনান ইবনে ছায়ফী (রাঃ) ৪৪। তোফায়ল ইবনে নোমান (রাঃ) ৪৫। মা'ক্কেল ইবনে মোনজের (রাঃ) ৪৬। এযীদ ইবনে মোনজের (রাঃ) ৪৭। মসউদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) ৪৮। জাহ্‌হাক ইবনে হারেছা (রাঃ) ৪৯। এযীদ ইবনে খেযাম (রাঃ) ৫০। জাব্বার ইবনে ছখ্‌র (রাঃ) ৫১। তোফায়ল ইবনে মালেক (রাঃ) ৫২। কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) ৫৩। সোলায়ম ইবনে আমের (রাঃ) ৫৪। কোৎবা ইবনে আমের (রাঃ) ৫৫। আবদুল-মোনজের—এযীদ ইবনে আমের (রাঃ) ৫৬। আবুল-ইউস্‌র কা'ব ইবনে আম্‌র (রাঃ) ৫৮। ছয়ফী ইবনে সাওআদ ৫৮। ছা'লাবাহ ইবনে গানামাহ (রাঃ) ৫৯। আমর ইবনে গানামাহ (রাঃ) ৬০। আব্‌স্ ইবনে আমের (রাঃ) ৭১। খালেদ ইবনে আম্‌র (রাঃ) ৬২। আবদুল্লাহ ইবনে ওনায়স্ (রাঃ) ৬৩। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) ৬৪। মোআজ ইবনে আম্‌র (রাঃ) ৬৫। ছাবেৎ ইবনে জাযা' (রাঃ) ৬৬। ওমায়র ইবনে হারেস (বাঃ) ৬৭। খাদীজ ইবনে সোলামাহ (রাঃ) ৬৮। মোআজ ইবনে জাবাল (রাঃ) ৬৯। আব্বাস ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) ৭০। আবু আবদুর রহমান এযীদ ইবনে ছা'লাবাহ (রাঃ) ৭১। আমর ইবনে হারেস (রাঃ) ৭২। রেফাআ' ইবনে আম্‌র (রাঃ) ৭৩। ওকবা ইবনে ওয়াহ্‌ব (রাঃ)। বেদায়াহ, ৩—১৬৭

যেই দুই জন মহীয়সী মহিলা হজ্জ ব্রত পালনে আসিয়াছিলেন তাঁহারাও এই মহতী সম্মেলনে সামিল হইয়াছিলেন তাঁহাদের নাম—

৭৪। আসমা বিন্‌ত অ.ম্‌র (রাঃ) ৭৫। উম্মে ওমারাহ—নাসীবাহ (রাঃ)।

শেষোক্ত মহিলা নাসীবাহ (রাঃ) ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ একটি নাম। কাহারও মতে তিনি তাঁহার স্বামী যায়দ ইবনে আছেম (রাঃ) এবং দুই পুত্র—হাবীব (রাঃ) ও আবদুল্লাহ (রাঃ) তাঁহাদের সহ এই হজ্জে আসিয়াছিলেন এবং সম্মেলনে সামিল হইয়াছিলেন (যোরকারী, ১—৩১৬)। তিনি তাঁহার স্বামী ও পুত্রদ্বয়ের সাথে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে জেহাদেও উপস্থিত হইয়া থাকিতেন। তাঁহার পুত্র হাবীব (রাঃ)কে ভণ্ড নবী মোসায়লামা নিজ হাতে নির্ম্মম ভাবে শহীদ করিয়াছিল। খলীফা আবুবকরের আমলে যখন ঐ ভণ্ড নবীকে নির্ম্মূল করার জন্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ য়্যামামার যুদ্ধ হয় তখন এই বীর মহিলা নাসীবাহ যুদ্ধ ময়দানে পৌঁছিয়াছিলেন এবং তাঁহার যোগ্য বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করিতে যাইয়া ভীষণভাবে আহত হইয়াছিলেন। তীর-বর্শার বারটি আঘাত নিয়া তিনি তথা হইতে মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। (বেদায়াহ, ৩—১৬৮)

কাফেলার একজন বিশিষ্ট সদস্য কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) তিনি তাঁহাদের মনের আবেগ বর্ণনা করিতে যাইয়া বলেন, মক্কায় পৌঁছিয়া আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলাম। এমনকি আমি এবং আমার আর একজন সাথী বরা ইবনে মা'রূর (রাঃ) যিনি একজন সর্দার এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন—আমরা দুইজন ভাবাবেগ সামলাইতে না পারিয়া নবীজীর সাক্ষাতের জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু আমরা কেহই তাঁহাকে চিনিতাম না। খোঁজ করিয়া জানিতে পারিলাম, তিনি পিতৃব্য আব্বাসের সহিত কা'বা শরীফের নিকটে আছেন। আমরা দ্রুত তথায় উপস্থিত হইলাম এবং সালাম করিয়া এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম। নবীজী (দঃ) পিতৃব্যকে আমাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যবসা উপলক্ষে তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় ছিল, তাই তিনি বলিলেন, ইনি বরা ইবনে মা'রূর—মদিনার একজন সম্ভ্রান্ত সর্দার। আর আমারও নাম বলিলেন, মালেক-পুত্র কা'ব। আমি জীবনে বিস্মৃত হইব না—নবীজী যে, আমার নাম শুনিয়া বলিয়াছিলেন, কা'ব যিনি কবি? নবীজীর পিতৃব্য আব্বাস বলিয়াছিলেন, হাঁ।

কা'ব (রাঃ) আরও বলিয়াছেন, আমরা মদিনাবাসী মোসলমানগণ নবীজীর সঙ্গে সম্মেলনের বিষয় সতর্কতার সহিত গোপন রাখিতেছিলাম। এমনকি আমাদের মদিনা হইতে যে সব অমোসলেম হজ্জব্রতে আসিয়াছিল তাহাদের হইতেও গোপন রাখিতে ছিলাম। তবে আম্‌র-ইবনে-হারাম নামক একজন বিশিষ্ট গোষ্টিপতি অমোসলেম আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমি একদা তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলাম এবং বলিলাম, আপনি আমাদের একজন বিশিষ্ট সমাজপতি এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আমাদের আন্তরিক আকাঙ্খা, আপনার বর্ত্তমান ধর্ম্মমত যদ্দরুন আপনি সম্মুখ

জীবনে নরকী হইবেন—ঐ ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করুন। এই বলিয়া তাঁহাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইলাম এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সহিত সম্মেলনের কথাও তাঁহাকে বলিলাম। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং আমাদের সহিত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করিলেন। এমনকি ঐ সম্মেলনে নির্ব্বাচিত বার জন প্রধানের একজন তিনি হইলেন। (বেদায়াহ, ৩—১৫৮)

মদিনা হইতে আগত মোসলমানগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে গোপন সূত্রে পূর্ব্ববর্ণিত "আক্কাবাহ" স্থানে ১২ জিলহজ্জ রাত্রে বিশেষ গোপনীয়তার সহিত সম্মেলন অনুষ্ঠান সাব্যস্ত করিলেন। সকলের একই লক্ষ্য যে, খুব সাবধান হইয়া কাজ করিতে হইবে, কেহ কাহারও জন্য অপেক্ষা করিবে না ডাকাডাকি করিবেনা।

নির্দ্ধারিত রাত্রে উহার এক তৃতীয়াংশ কাটিয়া যাওয়ার পর—যখন সাধারণভাবে লোকজন শুইয়া পড়িল তখন মদিনাবাসী মোসলমানগণ এক-দুই জন করিয়া নিরবে নিস্তব্ধে ঐ আক্কাবায় পৌছিতে লাগিলেন; এইভাবে তাঁহারা সমবেত হইলেন এখন অপেক্ষা শুধু নবীজী মোস্তফার। ইতিমধ্যে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তথায় পৌছিলেন, তাঁহার চাচা আব্বাস (তখন মোসলমান হন নাই) তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার প্রতি হযরতের পূর্ণ আস্থা ছিল। তিনি মদিনাবাসীদের অভিপ্রায় জ্ঞাত ছিলেন। তাই ভ্রাতুষ্পুত্র নবীজীর রক্ষণাবেক্ষন সম্পর্কীয় কথাবার্ত্তা ও ব্যবস্থাদি সরাসরি অবহিত হইয়া আশ্বস্ত হওয়ার জন্য তিনি উপস্থিত থাকিলেন।

আবুবকর (রাঃ) ও আলী (রাঃ)—এই দুই জনকে দুইটি পথে দাঁড় করিয়া রাখা হইল শত্রুদের গমনাগমন লক্ষ্য রাখার জন্য। এইভাবে বিশেষ গোপনতার সহিত সম্মেলন আরম্ভ হইল। সর্ব্বপ্রথমে হযরত (দঃ) সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, প্রত্যেকে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করুন, কিন্তু সংক্ষেপ করিতে হইবে, কারণ মোশরেকদের পক্ষে গুপ্তচরের আশঙ্কা আছে। অতঃপর প্রথমে আব্বাস দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, হে খাযরাজ বংশীয় ভাইগণ! মোহাম্মদ (দঃ) আমাদের মধ্যে যে মর্য্যাদার লোক তাহা আপনারা অবগত আছেন। আমরা তাঁহাকে শত্রুদের হইতে হেফাজত করিয়া রাখিয়াছি, তিনি স্বীয় (বনী হাশেম) বংশীয় লোকদের মধ্যে মর্য্যাদা ও হেফাজতের সহিতই রহিয়াছেন। তিনি আপনাদের নিকট চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, যে ইচ্ছা তিনি ত্যাগ করিতেছেন না।

এখন যদি আপনারা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত তাঁহার আহ্বানে সাড়া দেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলায় তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য সমর্থন দান করেন তবেত আপনারা এই গুরুভার বহনে অগ্রসর হউন। আর যদি একটুও আশঙ্কা থাকে যে, তিনি আপনাদের নিকট যাওয়ার পর আপনারা শত্রুর মোকাবিলায়

তাঁহার সাহায্য সমর্থন ছাড়িয়া দিবেন, তবে আপনারা সে পথ এখনই অবলম্বন করুন, তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন ; তিনি নিজ দেশে আপন জনের মধ্যে মান-মর্য্যাদা ও হেফাজতের সহিতই থাকিবেন।

মদিনাবাসীগণ আব্বাসের ভাষণের উত্তরে বলিলেন, আমরা আপনার কথাগুলি পূর্ণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। অতঃপর তাঁহারা হযরত (দঃ)কে লক্ষ্য করিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনি বলুন—প্রভু-পরওয়ারদেগার সম্পর্কে যতদূর ইচ্ছা আমাদের ওয়াদাহ্ অঙ্গীকার গ্রহণ করুন, তারপর আপনার ব্যক্তিগত বিষয়েও প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করুন। এবং ইহাও বলুন যে, সেই সব ওয়াদা-অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া চলিলে আমাদের পুরস্কার কি লাভ হইবে ?

হযরত (দঃ) বলিলেন, প্রভু-পরওয়ারদেগার সম্পর্কে আপনাদের কর্ত্তব্য এই যে, একমাত্র তাঁহারই বন্দেগী করিবেন অন্য কোন কিছুকে তাঁহার সঙ্গী সাথী বা সমকক্ষ ও শরীক তুল্য মর্য্যাদা দিবেন না। আর আমার এবং আমার জামাতের জন্য আপনাদের উপর এই কর্ত্তব্য হইবে যে, আমাদিগকে আশ্রয়ের স্থান দিবেন, সাহায্য সমর্থন দান করিবেন এবং যেই ভাবে নিজেদের জান-মাল ও ইজ্জৎ-হুরমতের হেফাজত করিয়া থাকেন আমাদের হেফাজতও তদ্রুপ করিয়া যাইবেন। আপনারা আপনাদের স্বজনকে কেহ আক্রমণ করিলে যেমন তাহাদিগকে রক্ষা করার চেষ্টা করিয়া থাকেন, আমার এবং আপনাদের দেশে গমনকারী মোসলমানদিগকেও কেহ আক্রমণ করিলে আপনারা তাহা প্রতিরোধ করিবেন—সত্যের সহায়তা করিবেন। এইসব কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলিলে ইহার প্রতিদানে আপনারা বেহেশত লাভ করিবেন। মদিনাবাসীগণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উক্তির প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত্ত সমর্থন জ্ঞাপন করিলেন। আনন্দে উৎফুল্লে তাঁহাদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার তরঙ্গ বহিয়া গেল।

ঐ মুহূর্ত্তেই সর্ব্বপ্রথম বরা ইবনে মা'রূর (রাঃ), আর কাহারও মতে সর্ব্বপ্রথম পূর্ব্ব বর্ণিত আসআদ (রাঃ) তাঁহার পর বরা (রাঃ) তাঁহার পর ওসায়দ (রাঃ) পর পর নবীজীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা তথা বায়আৎ—দীক্ষা গ্রহণ করিলেন যে, আমরা আপনাদেরে নিশ্চয় নিজ পরিবার-পরিজনের ন্যায় রক্ষা করার চেষ্টা করিব—যদিও আমাদের সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হয়। (যোরকানী, ১—৩১৭)

ওবাদাহ্ ইবনে ছামেৎ (রাঃ)—মদীনাবাসী ছাহাবী যিনি এই ঘটনায় উপস্থিতবর্গের অন্যতম একজন ছিলেন, এই ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করিয়াছেন যে—

إِنَّا بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ

فِى النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ وَالنَّفَقَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَعَلَى الْاَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَعَلَى اَنْ نَقُوْلَ فِى اللّٰهِ لَا تَاْخُذُنَا فِيْهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ وَعَلَى اَنْ نَنْصُرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَدِمَ عَلَيْنَا يَثْرِبَ مِمَّا نَمْنَعُ بِهٖ اَنْفُسَنَا وَاَزْوَاجَنَا وَاَبْنَاءَنَا وَلَنَا الْجَنَّةُ - فَهٰذِهٖ بَيْعَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِىْ بَايَعْنَاهُ عَلَيْهِ *

"আমরা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হাতে হাত দিয়া বায়য়া'ত—ওয়াদা ও অঙ্গীকার করিয়াছি যে, মনপুতঃ ও অমনপুতঃ—প্রত্যেক অবস্থায় দ্বীন ও ইস্‌লামের আদর্শের অনুসরণ ও অনুকরণ করিয়া যাইব। স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতা—প্রত্যেক অবস্থায়ই দ্বীন ও ইস্‌লামের জন্য ব্যয় বহন করিব। ইস্‌লামী আদর্শের প্রচার এবং ইস্‌লাম বিরোধী মতবাদ ও ব্যস্থার প্রতিরোধ করিয়া যাইব। আল্লাহ-অর্পিত দায়িত্বপালনরূপে হক প্রকাশ ও প্রচার করিয়া যাইব—এই ব্যাপারে কাহারও কোন তিরস্কার ভৎ'সনা বা বিরোধিতার পরওয়া করিব না। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদের দেশ ইয়াছ্‌রেব—মদিনায় তশরীফ আনয়ন করিলে আমরা তাঁহার হেফাজত করিয়া যাইব যেভাবে আমরা নিজেদের জান-জীবনের ও বিবি-বাচ্চাদের রহেফাজত করিয়া থাকি। এইসব কর্তব্য পালনের প্রতিদানে আমরা বেহেশত লাভ করিব। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আমাদের ওয়াদা-অঙ্গীকার এইরূপ ছিল।"

মদিনাকে ইস্‌লামের একটি শক্তিশালী কেন্দ্ররূপে পাইবার আগ্রহই হযরতের অন্তরে বিশেষরূপে জাগিতেছিল, তাই তিনি মোসলেম জামাতকে সাহায্য সমর্থন করিয়া যাওয়ার উপরই মদিনাবাসীগণ হইতে বিশেষভাবে অঙ্গীকার গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন—

اُبَايِعُكُمْ عَلَى اَنْ تَمْنَعُوْنِىْ مِمَّا تَمْنَعُوْنَ بِهٖ نِسَائَكُمْ وَاَبْنَائَكُمْ

"আমি আপনাদিগকে এই প্রতিজ্ঞা অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিতেছি যে, আপনারা আপনাদের নিজ নিজ পরিবার পরিজনকে যেইভাবে হেফাজত করিয়া থাকেন আমার (তথা আমার জামাতের) হেফাজতও তদ্রূপ করিবেন।"

উপস্থিত মদিনাবাসীগণ এই অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। আবুল হায়ছম (রাঃ) নামক একজন মদিনাবাসী দাঁড়াইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ!

আমাদের এবং আমাদের দেশের বিশিষ্ট জাতি ইহুদীদের মধ্যে পরস্পর একটা সহ-অবস্থান ও সদ্ভাব বিরাজমান রহিয়াছে। এখন আপনার জন্য আমাদের মধ্যকার সেই সদ্ভাবের অবসান ঘটিবে। আপনার উন্নতি সাধিত হইলে পর আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া নিজ দেশে-খেসে চলিয়া আসিবেন এরূপ সম্ভাবনা আছে কি? হযরত (দঃ) মুস্কি হাসি দিয়া বলিলেন, না—না, আমি আপনাদিগকে কখনও পরিত্যাগ করিব না, বরং আমার এবং আপনাদের মধ্যে এমন দৃঢ় সম্বন্ধ হইবে যে, আমার জান-প্রাণ আপনাদের জান-প্রাণের জন্য এবং আপনাদের জান-প্রাণ আমার জান-প্রাণের জন্য। আমাদের উভয়ের দায়িত্ব ও সংগ্রাম এবং আমাদের উভয়ের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা এক হইবে। আমি আপনাদের এবং আপনারা আমার অঙ্গরূপে পরিণত হইবেন।

উপস্থিত কাফেলার আর একজন সদস্য আব্বাস ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) মদিনাবাসীগণকে আর একটি জরুরী কথা বলিলেন। সম্মেলনে সদস্যবর্গের সাত ভাগের প্রায় ছয় ভাগই ছিলেন খাযরাজ গোত্রের এবং বক্তার নিজ গোত্রও ছিল খাযরাজ, তাই তাহাদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

হে খাযরাজ বংশ। এই মহানের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক যে প্রতিজ্ঞা তোমরা গ্রহণ করিতেছ তাহার গুরুত্ব তোমরা অনুধাবন করিয়াছ কি? সকলেই বলিলেন, নিশ্চয়। তবুও তিনি বলিলেন, তোমাদের এই প্রতিজ্ঞার অর্থ হইতেছে সাদা-কাল সকল শ্রেণীর লোকদের লড়াই ক্রয় করা। সুতরাং যদি তোমাদের ধারণার এরূপ আশঙ্কা থাকে যে, সেই লড়াইয়ে তোমাদের ধন-সম্পত্তি ক্ষয় হইলে এবং তোমাদের বড় বড় লোক প্রাণ হারাইলে তোমরা নবীজী মোস্তফাকে ছাড়িয়া দিবে তবে এখনই তোমরা তাহা কর। অবশ্য তাহা করা দুনিয়া ও আখেরাতের ধ্বংস ও অপমান। আর যদি ধন-সম্পদের ক্ষতি সত্তেও এবং বড় বড় লোকদের প্রাণ যাওয়া সত্তেও তোমাদের বর্ত্তমান অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করিয়া যাইবে বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প কর; তবে নবীজীকে দিলে-জানে মজবুতরূপে ধর—তোমাদের ইহপরকালের সৌভাগ্য হইবেই।

এই উক্তির প্রতিউত্তরে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি দিয়া উঠিলেন—নিশ্চয় আমরা আমাদের মালের ক্ষতি ও জানের ক্ষতি ইত্যাদি বিপদের ঝুঁকি লইয়াই নবীজীকে গ্রহণ ও বরণ করিতেছি। তাঁহারা আরও বলিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ বাস্তবায়িত করিলে আমাদের কি সুফল লাভ হইবে? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আপনারা বেহেশত লাভ করিবেন।

দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে এইসব কথাবার্ত্তাও হইয়াছে এবং তৎপরই বিপুল উৎসাহের সহিত মদিনাবাসীগণ দীক্ষা গ্রহণে ঝাপাইয়া পড়িয়াছেন। (বেদায়াহ, ৩—১৬২

আর একজন যুবক শ্রেণীর তেজস্বী সদস্য আসআদ (রাঃ); যিনি পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসরের আক্বাবাহ সম্মেলনের প্রত্যেকটিতে উপস্থিত ছিলেন এবং মদিনায় ইসলাম প্রচার ও প্রসারে তাঁহার অসীম দান ছিল। নবীজীর প্রেরিত শিক্ষক অধ্যাপক মোছআব (রাঃ)কে তিনি নিজ বাড়ীতে রাখিয়া তাঁহাকে লইয়া সমগ্র মদিনায় ইসলাম প্রচারের অভিযান চালাইতেন; সেই প্রচেষ্টায়ই আবদুল-আশহাল গোটা একটি বংশ এক দিনে সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

এই আসআদ (রাঃ)ও দীক্ষা গ্রহণ উপলক্ষে মদিনাবাসীগণকে ঐরূপে বিশেষভাবে সতর্ক করিলেন। তিনি নিজে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে য়্যাছরেব-বাসীগণ! ধীরস্থিরভাবে ভাবিয়া-চিন্তিয়া কাজ করুন। আমরা নবীজীকে আল্লার রসুল বিশ্বাস করিয়াই এত দূর হইতে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আমরা ইহাও খুব ভালরূপে জানি যে, তাঁহাকে মক্কা হইতে বাহির করিয়া নিয়া যাওয়া সমগ্রআরবের সহিত যুদ্ধ ঘোষণার সামিল এবং আপনাদের বহু মূল্যবান প্রাণ বিনষ্টেরআশঙ্কা এবং চতুর্দিক হইতে তরবারির কোপ পড়িবার ভয়। হয়—আপনারা ঐক্যবদ্ধরূপে ঐ সব বিপদে ধৈর্য্য ধারণের জন্য প্রস্তুত হউন; তবে নবীজীকে গ্রহণ ও বরণ করুন—দেশে লইয়া চলুন। অন্যথায় যদি আপনারা নিজেদের মধ্যে ভয়-ভীতি অনুভবকরেন তবে নবীজীকে তাঁহার অবস্থার উপর ছাড়িয়া দিন এবং তাঁহার সমীপে নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া দিন; আল্লাহ তায়ালাও আপনাদেরে অক্ষম ক্ষমার্হ গণ্য করিবেন।

আসআদের এই বক্তব্য শ্রবণে মদিনাবাসীগণ বলিয়া উঠিলেন, ক্ষান্ত হও হে আসআদ! আজ আমরা যেই প্রতিজ্ঞা ও দীক্ষা লইয়া যাইব কখনও ইহা ভঙ্গ করিব না, উহা হইতে তিল পরিমাণ বিচ্যুত হইব না। এই বলিয়া সকলেই উৎসাহের সঙ্গিত অগ্রসর হইয়া দীক্ষা গ্রহণে ধন্য হইলেন। (বেদায়াহ, ৩—১৫৯)

বিগত বৎসর আক্বাবায় দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে ১২ জন প্রতিনিধিবর্গ কর্ত্তৃক যে দীক্ষা গ্রহণ ছিল উহাতে ১০টি বিষয়ের উপর প্রতিজ্ঞা ছিল। এইবারের এই তৃতীয় সম্মেলনের দীক্ষা গ্রহণে মদিনাবাসী মোসলমানগণ বিশেষভাবে এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা মদিনায় ইসলাম প্রচারে ব্রতী থাকিবেন, প্রবাসী মোসলমান ভ্রাতা-ভগ্নিদিগকে আপন সহোদরের ন্যায় গণ্য করিবেন, এবং তাঁহাদের ও নবীজীর উপর সম্ভাব্য সকল প্রকার আক্রমণ প্রতিহত করা পূর্ব্বক তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষনের সর্ব্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইবেন।

মদিনাবাসীগণের প্রতিজ্ঞা ও শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনকালে নবীজীর পার্শে তাঁহার পিতৃব্য আব্বাস তাঁহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্য্যায়ে নবীজী (দঃ) বলিলেন, আপনাদের প্রতিজ্ঞাকে মঞ্জুর করিলাম, অনুমোদন ও স্বীকৃতিদান করিলাম। (বেদায়াহ, ৩—২৬০)

এই সম্মেলন এবং এই প্রতিজ্ঞা ও দীক্ষাপর্ব্ব জগতের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তৌহীদ ও শেরেক, ইসলাম ও কুফর, সত্য ও মিথ্যা, পাপ ও পুণ্যের জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান হইল এই দিন এবং ইসলাম ও সত্যের বিজয় সূচিত হইল এই দিন। যদি এই দিন মদিনাবাসী মোসলমানগণ তাঁহাদের এই সৌর্য্য-বির্য্য, সত্যের প্রতি তাঁহাদের এই অপরিসীম আগ্রহ, নবীজী এবং ইসলাম ও মোসলেম জাতির জন্য তাঁহারা এমন করিয়া যথাসর্ব্বস্ব বিলাইয়া দেওয়ার এই প্রস্তুতি না দেখাইতেন এবং প্রতিশ্রুতি না দিতেন তবে ইসলামের বিজয়-অভিযান কেমন করিয়া কোন্ পথে অগ্রসর হইত তাহা বুঝা কঠিন ছিল। মদিনাবাসীগণের এই অবদান শুধু মোসলমান জাতির জন্যই নয় সমগ্র মানবকুলের জন্য এক মহা সৌভাগ্য। জগতের বুকে কল্যাণ ও মুক্তির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইতেছিল, পাপ ও অনাচারের স্রোতে সমগ্র ধরণী ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। ধন্য ও পুণ্যবান মদিনাবাসীগণের দৃঢ় সঙ্কল্প পৃথিবীকে ঐ চরম অভিশাপ হইতে রক্ষার সুচনা করিল। তাই সেই যুগের মদিনাবাসী মোসলমানগণ বাস্তবিকই "আনছার"—সাহায্যকারী অর্থাৎ ইসলামের তথা কল্যাণ ও মঙ্গলের, সত্য ও ন্যায়ের সাহায্যকারী আখ্যার যোগ্য পাত্র; পুণ্য ও মানবতার তাঁহারা সুযোগ্য মিত্র। তাঁহাদের ভূমিকাই তাঁহাদের এই নামকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে, তাই আল্লাহ তায়ালাই পবিত্র কোরআনে মদিনাবাসী মোসলমানগণকে "আনছার" নামের আখ্যা দিয়াছেন।

১৬৯৯। হাদীছ ঃ—(৫৩৩ পৃঃ) حدثنا غيلان بن جرير قال

قُلْتُ لِأَنَسٍ أَرَأَيْتَ اسْمَ الْأَنْصَارِ كُنْتُمْ تُسَمَّوْنَ بِهِ أَمْ سَمَّاكُمُ اللّٰهُ

قَالَ بَلْ سَمَّانَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ

অর্থ—গায়লান ইবনে জরীর (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, বলুন ত—"আনছার" নামটি আপনারা নিজেরাই পরস্পর প্রয়োগ করিতেন, না—আল্লাহ আপনাদেরে এই নামের আখ্যা দিয়াছেন? আনাছ (রাঃ) বলিলেন, বরং সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহই আমাদিগকে এই নামের আখ্যা দান করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা ঃ—আনাছ (রাঃ) ইঙ্গিত দিলেন যে, মদিনাবাসী মোসলমানদিগকে পবিত্র কোরআনের একাধিক আয়াতে "আনছার" নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। যথা—

وَالسَّابِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ

بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ.........

"মোহাজের ও আনছারগণের অগ্রগামীগণ এবং যাঁহারা তাঁহাদের অনুসারী হইয়াছেন পূর্ণ ও উত্তমরূপে—সকলের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহারাও আল্লার দানে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আর আল্লাহ তাঁহাদের জন্য বেহেশত তৈরী রাখিয়াছেন; তাঁহারা উহার চিরনিবাসী হইবেন। ইহা অতি বড় সাফল্য।" (১০ পাঃ ১ রুঃ)

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ......

"নিশ্চয় আল্লাহ মেহেরবাণী করিয়াছেন নবীর প্রতি এবং মোহাজের ও আনছার-গণের প্রতি—যাঁহারা নবীর সঙ্গ অবলম্বন করিয়াছেন ভীষণ কঠিন সময়ে।"১১পাঃ ৩রুঃ

সম্মেলন সমাপ্তেঃ

সম্মেলনের সর্ব্বদিক সমাপ্ত হইলে রসুলুল্লাহ (দঃ) সকলকে বলিলেন, সতর্কতার সহিত সকলে নিজ নিজ বাসস্থানে চলিয়া যান। একজন সদস্য আব্বাস ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লার রসুল। শপথ করিয়া বলি, আপনার আদেশ হইলে আমরা আগামীকল্যই মিনায় উপস্থিত সমস্ত লোকদের উপর তরবারির অভিযান চালাইয়া দিতে পারি। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ আমাদিগকে এরূপ আদেশ দেন নাই; আপনারা শান্তভাবে আপনাদের বাসস্থানে প্রস্থান করুন। সেমতে সকলে বাসস্থানে পৌঁছিয়া নিদ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। (বেদায়াহ, ৩—১৬৪)

দীক্ষা গ্রহণ পর্ব্ব শেষ হওয়ার পর হযরতের চাচা আব্বাস বলিলেন, তোমাদের এই দায়িত্ব ও প্রতিজ্ঞা গ্রহণ এবং অঙ্গীকার প্রদান আল্লার সম্মুখে, এই পবিত্র মাসে, এই পবিত্র শহরে হইতেছে—তোমাদের হাত আল্লার হাতে দিয়া অঙ্গীকার করিতেছ যে, নিশ্চয় নিশ্চয় তোমরা মোহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) সাহায্য সহায়তায় সর্ব্বাধিক প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইবে এবং তাঁহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবে। মদিনাবাসীগণ সমবেত কণ্ঠে "হাঁ—হাঁ" বলিয়া উঠিলেন। আব্বাস এই সব অঙ্গীকারের উপর মহান আল্লাহকে সাক্ষী বানাইলেন।

তারপর মদিনায় মোসলমানগণকে সুশৃঙ্খল রূপে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে হযরত (দঃ) তাঁহাদের বারটি শাখা গোত্রের জন্য উপস্থিত লোকগণ হইতে বার জন নেতা নির্ব্বাচনের আদেশ করিলেন। সেমতে আউস বংশ হইতে তিন জন ১,২,৩ নং এবং খাযরাজ বংশ হইতে নয়জন ১২ হইতে ২০নং পর্য্যন্ত ব্যক্তিবর্গকে নেতা নির্ব্বাচন করা হইল। হযরত (দঃ) তাঁহাদের উপর মদিনাবাসীদের দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। নির্ব্বাচিত নেতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া নবীজী (দঃ) বলিলেন, (আমি আপনাদের দেশে না যাওয়া পর্য্যন্ত যেরূপ) আমার উপর দায়িত্ব থাকিবে আমার দেশের লোকদের, তদ্রূপ আপনাদের দেশের লোকদের দায়িত্ব থাকিবে আপনাদের উপর।

আপনারা আমার প্রতিনিধি ; যেরূপ মরিয়ম তনয় ঈসা নবীর প্রতিনিধি ছিলেন তাঁহার দ্বাদশ শিষ্যবর্গ। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ গভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন হাঁ—আমরা প্রস্তুত আছি। বেদায়াহ, ৩—১৬২

ভোর হইতেই কতিপয় কোরেশ-প্রধান মিনায় মদিনাবাসীদের বাসস্থানে উপস্থিত হইল। তাহারা বলিল, হে খাযরাজ বংশ! এমন কিছু আভাস আমাদের গোচরে আসিয়াছে যে, আপনারা আমাদের (ঐ নবুয়তের দাবীদার) লোকটাকে আমাদের দেশ হইতে আপনাদের দেশে নিয়া যাইতেছেন এবং আমাদের সঙ্গে লড়াই-যুদ্ধ করার জন্য তাহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আপনাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার ন্যায় ঘৃণার যুদ্ধ আমাদের নিকট আর নাই। মদিনার মোসলমানগণ ইহার উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বেই মদিনা হইতে আগত অমোসলেম হজ্জ যাত্রীরা শপথ করিয়া বলিয়া উঠিল, এইরূপ কোন কথা হয় নাই, কোন ঘটনাও ঘটে নাই। বস্তুতঃ তাহাদের শপথ সত্যই ছিল, কারণ ঐ অমোসলেমরা ত সম্মেলন এবং প্রতিজ্ঞা ও দীক্ষা সম্পর্কে কিছুই অবগত ছিল না। এই কথাবার্ত্তাকালে মদিনাবাসী মোসলমানগণ পরস্পর তাকাইতে ছিলেন ; তাঁহারা কিছুই বলেন নাই।

মদিনার কাফেলা রওয়ানা হইয়া গেল, কোরেশ দলপতিরা চলিয়া আসিল, কিন্তু তাহারা এই বিষয়ে খুব খোঁজাখোঁজি করিল। অবশেষে তাহারা এই ধারণাই উপনিত হইল যে, ঐরূপ কথা সাব্যস্ত হইয়াছে। তাই কোরেশরা মদিনাবাসী মোসলমানদিগকে ধরিবার জন্য তাঁহাদের পেছনে ধাওয়া করিল। কাফেলা তাহাদের নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু বার প্রধানের দুই প্রধান—সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) এবং মোনজের ইবনে আম্‌র (রাঃ) তাঁহারা দুই জন পেছনে ছিলেন। মক্কার কাফেররা তাঁহাদের দুই জনকে নাগালে পাইল বটে, কিন্তু মোনজের (রাঃ)কে কাবু করিয়া রাখিতে পারিল না। শেষ পর্য্যন্ত তাহারা সা'দ (রাঃ)কে বন্দী করিয়া নিয়া আসিল এবং তাঁহার উপর অত্যাচার চালাইল।

মক্কাতে দুই-চারজন মহামতি মানুষ ছিল ; যেমন মোৎএম ইবনে আদি—নবীজীর প্রতি যাহার অবদান ছিল অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে এবং তায়েফ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর আশ্রয়দানে। তদ্রূপ আবুল-বোখতারী, তাহারও অবদান ছিল অসহযোগের বিরুদ্ধে। সা'দ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপর মক্কার দুরাচারদের অত্যাচার দেখিয়া আবুল-বোখতারীর মনে দয়া আসিল ; সে সা'দ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, মক্কার কোন মানুষের সঙ্গে আপনার মৈত্রি নাই কি ? সা'দ (রাঃ) বলিলেন, আছে। তিনি মোৎএম ইবনে আদী এবং হারেছ ইবনে হরবের নাম উল্লেখ করিলেন। আবুল-বোখতারী তৎক্ষণাৎ যাইয়া ঐ দুই ব্যক্তিকে সা'দের দুরবস্থার সংবাদ দিল। তাহারা বলিল, সত্যিই মদীনার খাযরাজ গোত্রের সা'দ আমাদের বিশিষ্ট মিত্র।

বাণিজ্য ছফরে মদিনা এলাকায় তিনি আমাদেরে আশ্রয় ও সাহায্য দিয়া থাকেন। এই বলিয়া তাহারা সা'দের নিকট দৌড়িয়া পৌছিল এবং তাঁহাকে দুর্বৃত্তদের কবল হইতে ছুটাইয়া মদিনায় পৌছিবার সুব্যবস্থা করিয়া দিল। মদিনার মোসলমানদের সাহায্য পৌছিবার পুর্ব্বেই তিনি মদিনায় যাইয়া পৌছিলেন।

এই সম্মেলন হইতে মদিনাবাসী মোসলমানগণ প্রতিজ্ঞা লইয়া মদিনায় পৌছিলেন এবং নিজ নিজ কায়দা-কৌশলে প্রত্যেক ব্যক্তি ও শ্রেণী ইসলাম প্রচারে ব্যাপক আকারের তৎপরতায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তরুণরাও বেশ কাজ করিতে লাগিলেন; তাঁহারা কোন কোন ক্ষেত্রে তরুণসুলভ কূটকৌশলে বড় বড় সাফল্য লাভ করিতেন। যেমন একটি সুন্দর ঘটনা—

তরুণদের একটি মজার কাণ্ড ঃ

সম্মেলনের দীক্ষায় দীক্ষিত এক তরুণ মোআজ ইবনে আমর (রাঃ), তিনি বাড়ী আসিলেন; তাঁহার পিতা "আম্‌র ইবন্নুল-জমূহ" বৃদ্ধ, স্বীয় গোত্র প্রধান। ঐ সময় গোত্র প্রধানরা অনেকে নিজ নিজ ব্যক্তিগত দেবমূর্ত্তি রাখিত এবং তাহার গোত্রে উহার পুজা চলিত। মোআজ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পিতা আম্‌র এখনও মোশরেক, তাহার একটি কাঠের তৈরী "মনাৎ" নামের মূর্ত্তি আছে। পুত্র মোআজ ইবনে আম্‌র (রাঃ) এবং তাঁহারই আর এক তরুণ বন্ধু মোআজ ইবনে জাবাল (রাঃ) তাঁহারা উভয়ে রাত্রি বেলা গোপনে ঐ মূর্ত্তিটাকে এক ময়লার খন্দকে ফেলিয়া আসিলেন। ভোরবেলা আম্‌র তাহার পূজনীয় মূর্ত্তিটা না পাইয়া ভীষণ চটিয়া গেল। বহু খোঁজাখোঁজির পর ময়লার খন্দকে মূর্ত্তিটা পাইয়া উহাকে উঠাইয়া নিয়া আসিল এবং ধুইয়া মুছিয়া আতর-গোলাপ লাগাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল; আর প্রতিজ্ঞা করিল, এই অপকর্ম্মকারীদেরে ধরিতে পারিলে ভীষণ শাস্তি দিব। পরবর্ত্তী রাত্রেও ঐ ঘটনাই; ভোরবেলা আম্‌র পুনরায় ঐ ময়লার খন্দক হইতে মূর্ত্তিটা উদ্ধার করিয়া আনিল এবং ঐরূপে পুনঃস্থাপন করিল। কতেকদিন এই ঘটনা ঘটিবার পর আম্‌র একদিন মূর্ত্তিটাকে ময়লার খন্দক হইতে উদ্ধার করিয়া পুনঃস্থাপনকালে উহার গলায় একটি তরবারি লটকাইয়া দিয়া বলিল, হে দেবতা! তোমার প্রতি এই দুর্ব্যবহার কে করে তাহার খোঁজ বাহির করিতে আমি অক্ষম হইয়াছি। তোমাকে অস্ত্র দিয়া দিলাম; তুমি দুস্কৃতিকারীকে শাস্তি দিও। এইবার অধিক মজার কাণ্ড—তরবারিখানা নিয়া গিয়াছে, আর কোথাও হইতে একটা মরা কুকুর আমদানি করিয়া দেবতাকে উহার সহিত জড়াইয়া বাঁধিয়া সেই ময়লার খন্দকে ফেলিয়া রাখিয়াছে। আম্‌র

আজও দেবতার খোঁজে বাহির হইয়াছে এবং সেই ময়লার খন্দকে অধিক দুরবস্থায় মরা কুকুরের সহিত জড়ানো অবস্থায় দেবতাকে পাইয়াছে। এইবার আম্রের চৈতন্য হইল, এইবার আর সে দেবতাকে উদ্ধার করিল না, বরং গোষ্ঠির মোসলমানদের নিকট হইতে ইসলামের শিক্ষা জ্ঞাত হইয়া শের্‌ক ও মূর্ত্তিপূজার অসারতা বুঝিতে পারিল, তৌহীদের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিল এবং মনে প্রাণে ইসলাম গ্রহণপূর্ব্বক খাঁটী মোসলমান হইয়া গেল। এখন তিনি আম্‌র ইবনুল-জমূহ (রাঃ)।

এই ঘটনার উপদেশ ও শিক্ষাকে স্বয়ং আম্‌র (রাঃ) কাব্যে প্রকাশ করিয়াছেন, উহার একটি পংক্তি এই—

وَاللّٰهِ لَوْ كُنْتَ اِلٰهًا لَمْ تَكُنْ — اَنْتَ وَكَلْبٌ وَسْطَ بِئْرٍ فِي قَرَنٍ

"খোদার কসম হইতে যদি তুমি আমার প্রভু
খন্দকেতে কুকুর সাথে না থাকিতে কভু" (বেদায়াহ, ৩—১৬৫)

এই সম্মেলনের পরই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ব্যাপকভাবে মোসলমানগণকে মদিনায় হিজরত করার পরামর্শ দিতে লাগিলেন। নিজেও হিজরতের প্রস্তুতি করিয়া আল্লার তরফ হইতে অনুমতির অপেক্ষায় রহিলেন। কারণ, নবীর পক্ষে আল্লাহ তায়ালার স্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে দেশ ত্যাগ করা অপরাধ গণ্য হয়, যাহার নমুনা হযরত ইউনুস আলাইহেচ্ছালামের ঘটনা ৪র্থ খণ্ডে ব্যক্ত হইয়াছে।

মদিনায় ইস্‌লামের কেন্দ্র স্থাপন তথা ইস্‌লামের উন্নতির সূচনায় আকাবাহ সম্মেলনের গুরুত্ব যে কতদূর ছিল তাহা বলা বাহুল্য। এই কারণেই দ্বীন-দরদী ছাহাবীগণের অন্তরে আকাবাহ্ সম্মেলনের মর্য্যাদা ছিল অনেক বেশী। নিম্নে বর্ণিত হাদীছটি তাহাই প্রকাশ করিতেছে—

১৭০০। হাদীছ ঃ— (৫৫০) কাআ'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপস্থিতিতে যে আকাবাহ্ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং আমরা (মদিনাবাসীগণ) ইস্‌লামের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম, সেই সম্মেলনে আমি উপস্থিত ছিলাম। যদ্দরুন আমি নিজেকে ধন্য মনে করি এবং বদরের জেহাদে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য অপেক্ষাও অধিক সৌভাগ্যের বস্তু আকাবাহ্ সম্মেলনকে মনে করিয়া থাকি। যদিও বদরের জেহাদ (অত্যধিক ফজিলতের বস্তু হিসাবে) লোকদের মধ্যে অধিক প্রসিদ্ধ।

ব্যাখ্যা—কাআ'ব ইবনে মালেক (রাঃ) সর্ব্বশেষ আকাবাহ্ সম্মেলনে পচাত্তর জনের অন্যতম একজন ছিলেন এবং তিনি ঐ উপলক্ষে বিশেষ কর্ম্ম তৎপরতা বহন করিয়াছিলেন। (বেদায়াহ্-ওয়ান্-নেহায়াহ এবং যোরকানী দ্রষ্টব্য)

মদিনায় ইসলামের কৃতকার্য্যতা—কারণ কি ?

ইসলামের জীবন এক হইতে তের বৎসর মক্কায় কাটিল ; এই দীর্ঘ তের বৎসর স্বয়ং নবী (দঃ) মক্কায় থাকিয়া কত কত সাধনা করিলেন। চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এই দীর্ঘ তের বৎসরে মক্কায় ইসলাম যতটুকু উন্নতি ও প্রসার লাভ করার স্বপ্নও দেখিতে পারে নাই শুধু দুই বৎসরে মদিনায় তদপেক্ষাও অধিক সাফল্য, উন্নতি ও প্রসার লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল—এই আকাশ-পাতাল ব্যবধানের রহস্য কি ?

দেশে ও সমাজে একটি অভিজ্ঞাত শ্রেণীর সম্প্রদায় থাকে ; যাহারা হয় দেশ ও সমাজের সর্দার-মাতব্বর, পতি-প্রধান। জনগণের উপর প্রভাব-প্রতিপত্তি জমাইয়া রাখা হয় তাহাদের মজ্জাগত স্বভাব। সাধারণ জনগণের জ্ঞান-বিবেক ও স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে তাহাদের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতঃ জনমণ্ডলীকে নিজেদের দাস করিয়া রাখিবার জন্য এবং জনশক্তিকে নিজেদের মাতব্বরীর রক্ষী বানাইয়া রাখিবার জন্য সদা তাহারা আগ্রাহান্বিত ও তৎপর থাকে। তাহারা স্বভাবতঃই প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্বের অতি অভিলাসী হইয়া থাকে। গর্ব্ব, অহঙ্কার, অভিমান ও কৌলীন্য হয় তাহাদের অন্তরে বদ্ধমূল।

দেশে বা সমাজে যাহারা ঐ সম্প্রদায়ের সদস্যপদ দখল করিয়া লইতে পারিয়াছে, সর্দার-মাতব্বররূপে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইয়াছে তাহাদের সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি থাকে—অন্য কেহ যেন ঐরূপ আত্মপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইতে না পারে, তাহাদের শ্রেণীর সদস্যপদে আসিতে না পারে। অন্য কাহারও বিশেষতঃ পক্ষান্তররূপে কাহারও সামান্য একটু আত্মপ্রতিষ্ঠার ভবিষ্যৎ আঁচ করিলেই ঐ সর্দার-মাতব্বর সম্প্রদায়ের মনে মগজে অভিমান অহঙ্কার হিংসা ও ঘৃণার জঘন্য ভাব এমন করিয়া উত্থিত হইয়া উঠে যে, উহা বিক্ষোভ ও ভীষণ ক্রোধে পরিণত হয় এবং তাহাদেরকে ক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। সেই ক্ষোভ ও ক্রোধ তাহাদের মন-মস্তিষ্ক ও জ্ঞান-বিবেককে কঠিন লৌহ-মুষ্টিতে এমনই ভাবে চাপিয়া ধরে যে, সত্যাসত্য ও ন্যায়-অন্যায়ের বিচার শক্তিই তাহাদের লোপ পাইয়া যায় এবং বিপক্ষকে জব্দ করা, হেয় করা পরাজিত করা, উৎখাত ও নিঃচিহ্ন করার চেষ্টায় তাহারা উন্মাদ হইয়া পড়ে। ফলে বিপক্ষের শত সত্য শত ন্যায়কেও স্বীয় অন্তরে বা দৃষ্টিতে তিল পরিমাণ স্থান দেওয়া তাহাদের নিকট আত্মহত্যা বলিয়া গণ্য হয়।

বিপক্ষের ন্যায় ও সত্যকে তাহারা নিজেদের দৃষ্টিতে স্থান দিবে দূরের কথা ঐ সত্য যেন দেশে বা সমাজে এক বিন্দু শিকড় জমাইতে সুযোগও না পায় সেই উদ্দেশ্যে দেশ ও জাতিকে ক্ষেপাইয়া মাতাইয়া তুলে ঐ সত্য ও উহার বাহকের বিরুদ্ধে। কারণ, জনশক্তিই হইল তাহাদের একমাত্র বল-ভরসা, অতএব জনশক্তিকে যেন কেহ তাহাদের পক্ষ ও দল হইতে বিরূপ ভাবাপন্ন করিতে না পারে সর্ব্বদা

তাহাদের সেই চেষ্টা অব্যাহত থাকে। জনগণও ভেড়ীর পালরূপ—সকলে একদিকে ছুটিতে অভ্যস্ত, বিশেষতঃ যখন জনসাধারণের বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষ এই সর্দার মাতব্বরদের দাসত্বে ও অধীনে জীবন কাটাইয়াছে। ফলে দেশ ও জাতির সর্ব্বসংসার ঐ সত্য ও উহার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত ও মাতাল হইয়া উঠে, ঐ সত্য ও উহার সেবকদেরকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলে।

শত শত দেশ ও সমাজের ঐ কুখ্যাত সর্দার মাতব্বর সম্প্রদায়ের ইতিহাস চিরবিদ্যমান রহিয়াছে যে, তাহারা ঐ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়া কত কত সত্য ও সত্যের আহ্বায়ককে দেশ ও সমাজ হইতে চিরবিদায় দিয়াছে, নির্বাসিত করিয়াছে। "তায়েফ" নগরে মহাসত্য ইসলামের বিপর্য্যয় এবং নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ব্যর্থতার মূলে ঐ কুখ্যাত সম্প্রদায়ের সৃষ্ট উক্ত পরিস্থিতিই ছিল। তায়েফে ত ঐ কুখ্যাতদের সংখ্যা মাত্র তিন ছিল।

মক্কা নগরে ঐ কুখ্যাত সম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল অনেক। ওৎবা, শায়বা, আবু ছুফিয়ান, আ'ছ, আসওয়াদ, ওলীদ, উমাইয়্যা, উবাই আবুজহল এবং আরও অনেক। এই সব দুরাচারদের হাতে সর্দারী মাতববরী ত ছিলই এতদ্ভিন্ন সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ও একমাত্র আল্লার ঘর কা'বা শরীফকে তীর্থ মন্দির বানাইয়া উহার সেবা এত ও প্রধান হইয়াছিল তাহারাই। এই সূত্রে তাহাদের মধ্যে যাজন ও পৌরোহিত্যের গর্ব্ব-অহঙ্কারও ছিল সমধিক।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মক্কী জীবনের ইতিহাসে পাতায় পাতায় উল্লেখিত বাস্তব প্রকৃত সত্যটিই নজরে পড়ে যে, ঐ কুখ্যাত সর্দার সম্প্রদায় দুরাচার মাতববর শ্রেণীই ইসলামকে এবং নবীজী (দঃ)কে মক্কায় শিকড় জমাইতে দেয় নাই। আবহমান কাল হইতে দেশে দেশে সমাজে সমাজে যাহা ঘটিয়া আসিতেছিল এবং ঘটিয়া থাকে ইসলাম এবং নবীজী (দঃ) সম্বন্ধে মক্কায় এবং কোরেশ সমাজে তাহাই ঘটিয়াছিল। ঐ কুখ্যাত সর্দার সম্প্রদায় নিজেরা ত মহাসত্য ইসলামকে এবং উহার বাহক মহানবী (দঃ)কে গ্রহণ করেই না, অধিকন্তু তাহারাই সমাজ এবং জনসাধারণকে ঐ সত্য ও উহার বাহকের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিয়াছে, ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে। নানা প্রকার ষড়যন্ত্র পাকাইয়া, মিথ্যা অপবাদ রটাইয়া সত্যকে চাপিয়া মারিবার সর্বাত্মক চেষ্টা তাহারা করিয়াছে। ফলে মক্কায় ইসলামের দ্রুত সাফল্য সম্ভব হইয়া উঠে নাই।

পক্ষান্তরে মদিনায় তখন একটা ভিন্ন অবস্থা বিরাজমান ছিল। মদিনার সর্বাধিক প্রভাবশালী পৌত্তলিক দুইটি বংশ; "আউস" এবং "খাযরাজ"। দুই সহোদর হইতেই দুইটি গোত্রের উৎপত্তি; তাহাদের পরস্পর গৃহযুদ্ধ ও আত্মকলহ দীর্ঘ দিন হইতে অতি বিকট আকার ধারণ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যকার সুদীর্ঘ ১২০ বৎসর

স্থায়ী বোআছ-যুদ্ধের ইতিহাস অতি ভয়ঙ্কর। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের ভীষন ক্ষয়ক্ষতি হয় যাহাতে উভয় পক্ষের তথা উভয় গোত্রের ঐ কুখ্যাত সর্দার সম্প্রদায় প্রায় নির্ম্মূল হইয়া যায়। ফলে সমাজ এবং জনসাধারণ মুক্ত স্বাধীন চিন্তা করার অবকাশ পায়, সর্দার-মাতববর দুরাচারদের প্রভাবমুক্ত হইয়া নিজ নিজ জ্ঞান-বিবেকে সত্যাসত্যের ও ন্যায়-অন্যায়ের বাছ-বিচার করার ভাল সুযোগ পায়। মদিনাবাসী সমাজ ও জনগণের উপর সর্দারী ও মাতববরীর কঠোর লৌহ-মুষ্ঠির বাঁধ না থাকায় তাহারা ইসলামের সত্যাসত্য ধীরস্থিরভাবে শান্ত মস্তিস্কে চিন্তা করিয়া দেখার সুযোগ পাইল। বিঘ্ন ও প্রতিবন্ধক না থাকিলে সত্য নিজেই নিজের স্থান খুঁজিয়া লয়—সেমতে মাত্র কতিপয় মোসলমানের পবিত্র কোরআন প্রচারের ফলে এবং ই লামের আভ্যন্তরীণ শিক্ষা ও সদগুণাবলীর মাহাত্মে আকৃষ্ট হইয়া মদিনাবাসীগণ দলে দলে ইসলামের ছায়ায় স্থান গ্রহণ করিতেছিল। ইতিমধ্যেই নবীজী মোস্তফা (দঃ) মদিনায় আসিয়া পড়িলে ত তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণের ভিড় লাগিয়া গেল। এই সত্যটিই নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে—

১৭০১। হাদীছঃ—(৫৩৩ পৃঃ) عن عائشة رضى الله تعالى عنها

قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم

فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملؤهم وقتلت

سرواتهم وجرحوا فقدمه الله لرسوله فى دخولهم الاسلام

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, বোআছ-যুদ্ধের ঘটনাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য আল্লাহ তায়ালা অগ্রিম সুযোগ করিয়া দিয়া ছিলেন। মদিনায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পদার্পণ এমন অবস্থায় হইয়াছিল যে, বোআছ-যুদ্ধের কারণে মদিনাবাসীরা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের সর্দারগণ নিহত হইয়া গিয়াছিল এবং তাহারা আঘাতে জর্জ্জরিত ছিল। ইসলামের প্রতি মদিনাবাসীদের সহজে আকৃষ্ট হওয়ার মূলে এই সব কারণ ছিল এবং এই কারণগুলি মদিনায় নবীজীর আগমনের পূর্বেই বোআছ-যুদ্ধের দ্বারা সংঘটিত হইয়া রহিয়াছিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবুয়তের একাদশ বা দ্বাদশ বৎসরেই **মে'রাজ শরীফের** ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। উহা অতি বড় এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং উহার বিবরণও সুদীর্ঘ। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মোজেযা আলোচনায় উহার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হইবে।

মদিনায় ইসলামের দুইটি বৎসর ঃ

নবুয়তের দশম বৎসরের শেষ দিকে হজ্জের মৌসুমে আক্বাবায় প্রথম সাক্ষাতে ছয় বা আট জন মদিনাবাসী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা মদিনায় ইসলাম প্রবেশ করিয়াছিল এবং মদিনায় ইসলামের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। একাদশ বৎসর ঐ হজ্জ মৌসুমে আক্বাবায় নবীজীর সঙ্গে বার জন মদিনাবাসীর সম্মেলন ও ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করার প্রতিজ্ঞা সহ কতিপয় বিষয়ের প্রতিজ্ঞায় দীক্ষা-গ্রহণ হইয়াছিল। অধিকন্তু বিশিষ্ট ছাহাবী মোছআব (রাঃ) এবং তাঁহার পরে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে-মক্তুম (রাঃ) ইসলাম ও পবিত্র কোরআনের শিক্ষাদান এবং প্রচারকার্য্যে নেতৃত্ব দানের জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক মদিনায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। তখন হইতেই মদিনায় ইসলামের কেন্দ্র-রূপ ধারণ করিয়া উঠিয়াছিল ; এমনকি তথায় প্রবাসী মোসলমানদের আশ্রয় ও সুযোগেরও ব্যবস্থা হইল।

নবুয়তের একাদশ বৎসরে মদিনায় ইসলামের প্রসার ও প্রবাসী মোসলমানদের নিরাপত্তার এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা হওয়ার পর হইতেই ব্যাপক পরিকল্পনার ভিত্তিতে নয়, বরং শুধু ব্যক্তিগতভাবে আবুসালামা এবং উম্মে-সালামার ন্যায় কেউ কেউ মক্কা হইতে মদিনায় হিজরত করিয়া আসেন। ইতিমধ্যেই দ্বাদশ বৎসরের শেষ দিকে যুগান্ত-কারী ঐতিহাসিক তৃতীয় আক্বাবা সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয়। অপর দিকে নবী (দঃ) স্বপ্নযোগে মদিনায় মোসলমানদের হিজরত করার ইঙ্গিত লাভ করেন। নবীর স্বপ্ন অহীই বটে, এবং এই ব্যাপারে একাধিক স্বপ্ন ও ইঙ্গিত নবীজী প্রাপ্ত হন। প্রথম ইঙ্গিত যাহা আবুমুছা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) বলিলেন—

رَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ اَنِّى اُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ اِلَى اَرْضٍ بِهَا نَخْلٌ فَذَهَبَ

وَهَلِى اِلَى اَنَّهَا الْيَمَامَةُ اَوْ هَجَرُ فَاِذَا هِىَ الْمَدِيْنَةُ يَثْرِبُ

“আমি স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, আমি হিজরত করিতেছি মক্কা হইতে খেজুর বৃক্ষের দেশে। সেমতে আমার ধারণা হইল যে, ঐ দেশ ‘ইয়্যামামা’ বা ‘হাজার’ অঞ্চল হইবে, কিন্তু পরে দেখা গেল—সেই দেশের উদ্দেশ্য ‘ইয়াছরেব’ (তথা মদিনা) নগরী ছিল।” এই হাদীছখানা তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় ইঙ্গিত সম্পর্কে নবী (দঃ) বলিয়াছেন—

اِنَّ اللّٰهَ اَوْحَى اِلَىَّ اَىَّ هٰؤُلَاءِ الْبِلَادِ الثَّلَاثِ نَزَلْتَ فَهِىَ دَارُ

هِجْرَتِكَ اَلْمَدِيْنَةُ اَوِ الْبَحْرَيْنِ اَوْ قِنَّسْرِيْنَ

"আল্লাহ আমাকে অহী মারফত জ্ঞাত করিয়াছেন, তিনটি নগরীর যে কোনটিতে আপনি অবতরণ করিবেন উহাই আপনার হিজরতের স্থান সাব্যস্ত হইবে—মদিনা বা বাহ্‌রাইন কিম্বা কন্নাছিরীণ।" তিরমিজী শরীফ

তৃতীয়বার স্বপ্নযোগে এমন নিদর্শন ও আলামত বর্ণনা করা হইল যাহাতে নবীজীর হিজরত-স্থানরূপে মদিনা নির্দ্ধারিত হইয়া গেল। "নবীজীর হিজরত" আলোচনায় একটি সুদীর্ঘ হাদীছ আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইবে উহাতে অছে একদা নবীজী (দঃ) বলিলেন—قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ أُرِيتُ سَبِخَةً ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ

"তোমাদের হিজরতের নগরী আমাকে দেখানো হইয়াছে উহা খেজুর-বাগানপূর্ণ, তবে উহার মধ্যে কোন জায়গা লোনাও রহিয়াছে, উহার দুই পার্শ্বে কাঁকরময় ময়দান আছে।" তিনটি নিদর্শন একত্রে একমাত্র মদিনা নগরীতেই রহিয়াছে। খেজুর বাগানপূর্ণ নগরী অনেকই আছে, তৎসঙ্গে অপর নিদর্শনদ্বয় মদিনা ভিন্ন অন্য কোথাও নাই। উক্ত হাদীছে ইহাও উল্লেখ আছে যে—

"রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কর্তৃক ঐ স্বপ্ন বর্ণিত হওয়ার পর মক্কার মোসলমানগণ নিজ নিজ সুযোগমতে অনবরত হিজরত করিয়া যাইতে লাগিলেন। এমনকি পূর্বে যাঁহারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহারাও মদিনা পানে ধীরে ধীরে আসিয়া পড়িতে লাগিলেন।"

নবুয়তের ত্রয়োদশ বৎসর ঃ

দ্বাদশ বৎসরের শেষ মাসে ঐতিহাসিক আকাবার তৃতীয় সম্মেলন আশাতীত সাফল্যের সহিত সমাপ্ত হইয়াছে। মদিনায় ইসলাম ও মোসলমানদের নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের সুদৃঢ় আশ্বাস লাভ হইয়াছে। মদিনাকে ইসলামের কেন্দ্ররূপে গড়িয়া তোলার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। মদিনায় নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আগমন-সম্ভাবনা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

এমতাবস্থায় স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ)ও মোসলমানদিগকে ব্যাপকভাবে মদিনায় হিজরত করিয়া যাওয়ার প্রতি আকৃষ্ট করিতে লাগিলেন। নবীজী (দঃ) মোসলমাদের মধ্যে প্রচার করিলেন—إِنَّ اللّٰهَ قَدْ جَعَلَ لَكُمْ إِخْوَانًا وَدَارًا تَأْمَنُونَ بِهَا

"আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য একটি দেশের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন যথায় তোমরা আশ্রয় পাইবে নিরাপদে থাকিবে এবং ভ্রাতৃত্ব-সুলভ বন্ধুবর্গেরও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন" (বেদায়াহ, ৩—১৬৯)। অবশ্য নবীজী (দঃ) নিজে মক্কায়ই থাকিলেন; এই অবস্থায় তাঁহার মক্কায় অবস্থান সাধারণ দৃষ্টিতেও অতি বড় উদারতা ও মহানুভবতার পরিচয় ছিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে, আকাবায় সাফল্যজনক সম্মেলনের

সংবাদ কোরেশরা পাইয়া বসিয়াছিল। কারণেই মোসলমানদের উপর চরম অত্যাচারের মাত্রা তাহারা অধিক বাড়াইয়া দিয়াছিল। এই দুঃসময়ে মহানুভব নবীজী (দঃ) নিজের চিন্তা একটুও করিলেন না। তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয় হইল মোসলমানগণকে নিরাপদ স্থানে পেঁছাইয়া দেওয়া। সহচরবৃন্দকে নিরাপদ আশ্রয়ে পেঁছাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়া অবস্থান করিলেন শত্রুপুরীতে—এই আদর্শের দৃষ্টান্ত কতই না বিরল।

মোসলমানগণ যতই ব্যাপক হারে হিজরত করিতে লাগিলেন কাফেররা ততই কঠোর ভাবে বাধার সৃষ্টি করিতে উন্মাদ হইয়া উঠিল। সুতরাং মোসলমানগণ হিজরতের ব্যবস্থা গোপনে গোপনে করিতে লাগিলেন। একমাত্র ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বিপরীত ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন।

ওমর (রাঃ) মদিনার পানে ঃ

ওমর (রাঃ) প্রকাশ্যেই হিজরতের যাত্রার ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করিয়া তরবারি বক্ষে ঝুলাইলেন, ধনুক তীর ছুড়িবার ভঙ্গিতে প্রস্তুত করিলেন এবং তীরদান হইতে তীর হস্তে ধারণ পূর্ব্বক কা'বা শরীফে আসিলেন। তথায় দুরাচার কাফেররা ছলা-পরামর্শে এবং গল্পগুজবে জটলা বাঁধিয়া বসিয়া ছিল। ওমর (রাঃ) কা'বা শরীফের তওয়াফ করিলেন, মকামে-ইব্রাহীমে দুই রাকাত নামায আদায় করিলেন, অতঃপর কাফেরদের জটলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সিংহ-গর্জ্জনে সম্বোধন করিলেন, তোমাদের চেহারা বিকৃত হউক—যাহার ইচ্ছা হয়, তাহার মাকে পুত্রশোকে পতিত করার, সন্তান-সন্ততিকে এতিম করার, স্ত্রীকে বিধবা করার সে যেন হরম শরীফ সীমার বাহিরে আমার সম্মুখে আসে। এই ঘোষণায় কাফেরদের মুখ শুকাইয়া গেল; কাহারও সাহস হইল না ওমরের পিছু ধাওয়া করার। একমাত্র কতিপয় দুর্ব্বল মোসলমান যাঁহারা তাঁহার আশ্রয়ে হিজরত করায় প্রস্তুত হইয়া ছিলেন তাঁহারা তাঁহার পেছনে ছুটিলেন; তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার পথের খোঁজ অবগত করিয়া রওয়ানা হইয়া গেলেন (যোরকানী, ১—৩২০)।

তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বড় ভাই যায়েদ ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এবং ভগ্নিপতি সায়ীদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) সহ বিশ জনের কাফেলা মদিনার পানে রওয়ানা হইলেন। এই কাফেলায় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন আইয়্যাশ ইবনে রবীআ (রাঃ)। তিনি ছিলেন দুরাচার আবুজহলের বৈপিত্রেয় ভ্রাতা। তাই তাঁহার হিজরত করায় আবুজহলের ক্ষোভের সীমা থাকিল না, কিন্তু তিনি ওমরের সহযাত্রী, তাই বাধা দানের সাহস তাহার হইল না। তাঁহার মদিনা পৌঁছিবার পর আবুজহল ভণ্ডামীর এক চক্রান্ত করিল।

আইয়্যাশ (রাঃ) বিপদে পড়িলেন ঃ

আইয়্যাশ (রাঃ) ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সহিত নির্বিঘ্নে মদিনায় পৌঁছিয়া যাওয়ার পর আবুজহল এবং তাহার আর এক দস্যু ভ্রাতা "হারেছ" তাহারা উভয়ে মদিনায় পৌঁছিল এবং আইয়্যাশ (রাঃ)কে নানারূপ ছল-চাতুরী দ্বারা বুঝাইল, তোমার বৃদ্ধা মাতা তোমার বিচ্ছেদ শোকে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। এমনকি তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন যে, তোমাকে না দেখা পর্য্যন্ত চুল বাঁধিবেন না, ছায়ায় যাইবেন না—রোদ্রেই থাকিবেন। মাতার ক্লেশ ও দুর্গতির সংবাদে আইয়্যাশ (রাঃ) বিচলিত হইলেন। ওমর (রাঃ) তাঁহাকে সতর্ক করিলেন, কিন্তু তিনি শেষ পর্য্যন্ত ঐ দুরাচারদ্বয়ের সঙ্গে মক্কার পথে রওয়ানা হইয়া পড়িলেন। তিনি হয়ত ভাবিলেন, অন্ততঃ একবার মাকে সান্ত্বনা দিয়া আশা আবশ্যক। পথিমধ্যে ছল করিয়া আবুজহল-ভ্রাতৃদ্বয় আইয়্যাশের বাহন থামাইল এবং উভয়ে এক সঙ্গে তাঁহার উপর ঝাপাইয়া পড়িল। হঠাৎ তাঁহাকে কাবু করিয়া তাঁহার হাত পা বাঁধিয়া ফেলিল এবং মক্কায় আনিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিল। উক্ত কারাগারে ইসলাম-গ্রহণ অপরাধে "হেশাম" নামক একজন মোসলমান পূর্ব্ব হইতেই ভীষণ অত্যাচার ভোগ করিতেছিলেন। তিনিও ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কাফেলার সঙ্গী হইতে চলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি পাষাণ্ডদের হস্তে বন্দী হইয়া উক্ত কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন।

আইয়্যাশ (রাঃ) এবং হেশাম (রাঃ) উভয়ই কারাগারে নির্য্যাতন ভোগে আবদ্ধ থাকিলেন; দীর্ঘদিন এই অবস্থা তাঁহাদের উপর অতিবাহিত হইল। এমনকি রসুলুল্লাহ (দঃ) হিজরত করিয়া মদিনায় চলিয়া গেলেন, তখনও তাঁহারা কারাগারেই আবদ্ধ। এই সময় ত তাঁহাদের শ্রেণীর আবদ্ধ বা দুর্ব্বল মোসলমানদের উপর মক্কার দুরাচারদের নির্য্যাতন বহু গুণে বাড়িয়া গেল। কারণ, পাষাণ্ডরা সকল ক্রোধের ঝাল তাঁহাদের উপরই মিটাইতে লাগিল। আইয়্যাশ (রাঃ) এবং হেশাম (রাঃ) তাঁহারা দৈহিক নির্য্যাতনে ত ছিলেনই, আর একটি মানসিক যাতনাও ছিল তাঁহাদের অতি বড়।

আইয়্যাশ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ঘটনা ত বিস্তারিত বর্ণিত হইলই যে, তাঁহাকে আবুজহল ও তাহার ভ্রাতা ধোকা দিয়া বিভ্রান্ত করিল; ফলে তিনি বিভ্রান্তিতে পড়িয়া গেলেন। এই বিষয়টিকেই ইতিহাসে فَتَنَاهُ فَافْتَتَنَ, "তাহারা উভয়ে তাঁহাকে বিভ্রান্ত করার চক্রান্ত করিল, ফলে তিনি বিভ্রান্তিতে পতিত হইলেন" বলা হইয়াছে। (বেদায়াহ, ৩—১৭২)

হেশাম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকেও এইরূপ বিভ্রান্ত করারই কোন চক্রান্ত করা হইয়াছিল। ওমর (রাঃ) হিজরতে যাত্রার পূর্ব্বে আইয়্যাশ (রাঃ) এবং হেশাম (রাঃ)

উভয়কে বলিয়াছিলেন, রজনীর অন্ধকারে প্রত্যেকে নিজ নিজ গৃহ হইতে রওয়ানা হইয়া প্রভাতে "তানাজোব" নামক স্থানে পৌছিবে। ভোরবেলায় যে ঐস্থানে পৌছিতে না পারিবে তাহার জন্য অপেক্ষা করা হইবে না। ওমর (রাঃ) এবং আইয়্যাশ (রাঃ) ত ভোরবেলা ঐ স্থানে পৌছিলেন, কিন্তু হেশাম (রাঃ) পৌছিলেন না। ফলে ওমর (রাঃ) এবং আইয়্যাশ (রাঃ) তাঁহারা দুই জনই পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ অনুযায়ী অপেক্ষা না করিয়া ঐ স্থান হইতে মূল কাফেলায় মিলিত হইয়া মদিনায় চলিয়া গেলেন, আর হেশাম (রাঃ) দুরাচারদের হাতে আট্‌কা পড়িয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। হেশাম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উক্ত ঘটনা স্বয়ং ওমর(রাঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত ইতিহাসে বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই বর্ণনায়ও রহিয়াছে—وَحُبِسَ هِشَامٌ وَفُتِنَ فَافْتُتِنَ "হেশামকে আট্‌কাইয়া ফেলা হইল, তাঁহাকে বিভ্রান্তিতে ফেলিবার চেষ্টা করা হইল; ফলে তিনি বিভ্রান্তিতে পতিত হইয়া গেলেন" (বেদায়াহ, ৩—১৭২)। এস্থলে আইয়্যাশের ঘটনার ন্যায় বিভ্রান্তির বিবরণ না থাকিলেও উল্লেখিত কথার দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কোন বিভ্রান্তিকর চক্রান্ত দ্বারাই হেশাম (রাঃ)কে আটকানো হইয়াছিল এবং তিনি সেই বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়ায় হিজরত করিতে পারেন নাই।

আইয়্যাশ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ঘটনায় একটি প্রশ্ন সুস্পষ্ট যে, তিনি কাফেরদের কথা কেন বিশ্বাস করিলেন—যেই চক্রান্তে পতিত হইয়া তিনি তৎকালীন একটি বৃহত্তম ফরজ হিজরত হইতে বিচ্যুত থাকিলেন? তদ্রূপ হেশাম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতিও এই প্রশ্ন যে, হয়ত কাফেরদের চক্রান্তে বিশ্বাস করায়ই তিনি আটকা পড়িয়া হিজরতের ফরজ আদায় করা হইতে বঞ্চিত থাকিলেন। এই প্রশ্ন লক্ষ্য করিয়া লোকেরাও বলিত এবং তাঁহারাও ভীষণ চিন্তিত ছিলেন যে, হিজরত না করার তৎকালীন বৃহত্তম কবিরা গোনাহ হইতে তাঁহাদের রেহায়ী পাওয়ার কোন ব্যবস্থা হইবে না—কাফেরদের চক্রান্তে যেহেতু তাঁহারা নিজেরাই পতিত হইয়াছেন, তাই উক্ত গোনাহের জন্য শত তওবা করিলেও তাঁহাদের তওবা কবুল হইবে না।

রসুলুল্লাহ (দঃ) তখন মদিনায় পৌছিয়াছেন এবং সর্ব্বত্রই ঐ জল্পনা-কল্পনা। আল্লাহ তায়ালার রহমত অসীম, তিনি সবই জ্ঞাত থাকেন; আইয়্যাশ (রাঃ) এবং হেশাম (রাঃ) তাঁহাদের ত্রুটি কি পরিমাণ ছিল তাহাও তিনি জ্ঞাত ছিলেন। তাঁহাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার দয়া হইল; তিনি ঐ সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান করিয়া পবিত্র কোরআনের আয়াতে নাযেল করিলেন—

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ -

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ......

"আপনি বলিয়াদিন, হে বন্দাগণ যাহারা নিজেদেরই ক্ষতিকর ত্রুটি করিয়াছ—তোমরা আল্লার রহমতের আশা ত্যাগ করিও না, নিরাশ হইও না। নিশ্চয় আল্লাহ এই শ্রেণীর সব গোনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন ; নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী দয়াল……। এই আয়াত লিপিযোগে মদিনা হইতে মক্কায় আইয়্যাশ (রাঃ) ও হেশাম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট পৌছাইয়া তাহাদের সান্ত্বনার ব্যবস্থা করা হইল।

এদিকে নবীজী (দঃ) ঐ শ্রেণীর নির্য্যাতিত অসহায় মোসলমানগণের মুক্তির জন্য বিশেষ দোয়া করা আরম্ভ করিলেন। এমনকি জমাতের সহিত ফরজ নামাযের মধ্যেও সকলকে আমীন বলার সুযোগ দানে সশব্দে ঐ দোয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। মক্কায় আবদ্ধ অত্যাচারিত দুর্ব্বল মোসলমানদের মুক্তির দোয়া করা পূর্ব্বক কতিপয় বিশেষ নামও উল্লেখ করিতেন ; তন্মধ্যে আলোচ্য আইয়্যাশ রাজিয়াল্লাহু আনহুর নাম সর্ব্বাগ্রে ছিল। দোয়ার মধ্যে আরও একজনের নাম ছিল—সালামা-ইবনে হেশাম। তিনি ছিলেন আবুজহলের সহোদর। তিনিও ইসলাম গ্রহণ অপরাধে একই কারাগারে বন্দী ছিলেন। তাঁহার পা আইয়্যাশের পায়ের সহিত শিকলে বাঁধা ছিল (তবকাতে-ইবনে সায়াদ—৪)। দোয়ার বিস্তারিত বয়ান প্রথম খণ্ড ৫৪৭ নং হাদীছে।

আইয়্যাশ (রাঃ)-এর মুক্তি লাভঃ

নবী (দঃ) মদিনায় পৌছিয়া গিয়াছেন, কিছু সংখ্যক মোসলমান মক্কায় কাফেরদের হস্তে বন্দী রহিয়াছেন বা বাধাপ্রাপ্তরূপে আটকা পড়িয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আইয়্যাশ (রাঃ) এবং হেশাম (রাঃ) একই কারাগারে নিক্ষিপ্ত ও ভীষণভাবে অত্যাচারিত হইতেছিলেন। নবী (দঃ) বলিলেন—مَنْ لِى بِعَيَّاشِ ابْنِ اَبِى رَبِيْعَةَ وَهِشَامٍ "আইয়্যাশ এবং হেশামের মুক্তির জন্য আমি উদ্‌গ্রীব ; আমার এই বাসনা পূরণে আত্মদান করিতে কে প্রস্তুত আছ? ওলীদ নামক ছাহাবী বলিলেন, আমি প্রস্তুত আছি। ওলীদ (রাঃ) মক্কায় আসিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকিলেন। কারাগারে বন্দীদের আহার তাঁহাদের বংশীয় লোকদের পৌছাইবার অনুমতি ছিল ; সেমতে এক মহিলা খাদ্য নিয়া যাইতেছিল। ওলীদ (রাঃ) ঐ মহিলার সঙ্গে কথা বলিয়া জানিতে পারিলেন, সে ঐ বন্দীদের জন্যই খাদ্য নিয়া যাইতেছে। ওলীদ (রাঃ) তাহার পেছনে পেছনে গেলেন এবং কারাগারের অবস্থান ভালভাবে লক্ষ্য করিয়া আসিলেন। কারাগারটি নগর প্রান্তে শুধু প্রাচীর বেষ্টিত ছিল—উহার উপর ছাদ ছিল না ; বন্দীগণ সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে সারাদিন সেই উন্মুক্ত কারাগারে ছটফট করিতেন। ওলীদ (রাঃ) রজনীর অন্ধকারে সেই কারাগারের নিকটে যাইয়া বহু কষ্টে প্রাচীর উলঙ্ঘন পূর্ব্বক লাফাইয়া কারাগারের ভিতরে পড়িলেন। কিন্তু বন্দীদের পায়ে কঠিন লৌহ-বেড়ীর বাঁধন ছিল ; এই অবস্থায় তাঁহারা চলিতে সক্ষম হইবেন না পলায়ন কিরূপে করিবেন?

ওলীদ (রাঃ) এক খণ্ড শক্ত পাথর খোঁজিয়া আনিলেন এবং লৌহ-বেড়ীর নিচে স্থাপন পূর্ব্বক তরবারি দ্বারা ভীষণ জোরে লৌহ-বেড়ীতে আঘাত করিলেন; উহা কাটিয়া গেল। রাত্রির অন্ধকারে তাঁহারা মদিনার পানে ছুটিয়া চলিলেন। একটি মাত্র উট ছিল ওলীদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর; তিনি অন্যদেরকে উটে চড়াইয়া নিজে এই দীর্ঘ প্রায় তিন শত মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে পৌছিলেন।* (সীরতে-ইবনে হেশাম)

ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পর ওসমান (রাঃ)ও মদিনায় হিজরত করিলেন (যোরকানী, ১—৩২০)। এইভাবে মক্কা হইতে প্রায় সকল মোসলমানই হিজরত করিয়া গেলেন। মক্কায় রহিলেন শুধু কতিপয় মজলুম মোসলমান যাঁহারা দুর্ব্বল হওয়ায় কিম্বা নিজ গোষ্টি-জ্ঞাতিদের দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ বা কারারুদ্ধ জীবন যাপনে বাধ্য ছিলেন। আর ছিলেন শাহেন-শাহে-দুজাহান ছাইয়্যেদুল-কওনাইন হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহারই আদেশে আবুবকর (রাঃ) ও আলী (রাঃ)।

যথা সম্ভব মোসলমানগণকে আশ্রয়ের ও নিরাপদের স্থান মদিনায় পৌছাইয়া দিয়াও নবীজী (দঃ) মক্কায় অবস্থান করিলেন আল্লাহ তায়ালার অনুমতির অপেক্ষায়।

আনছারগণের সৌজন্য ঃ

মোসলমানগণ মক্কা ত্যাগ করতঃ মদিনায় আসিয়া অতি সমাদরে গৃহীত হইলেন। মদিনার আনছারগণ এই প্রবাসী ভ্রাতাদিগকে নিজ নিজ ঘর-দুয়ার ও বিষয়-সম্পত্তির অংশ প্রদানের প্রস্তাব দ্বারা অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন (নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)। এইভাবে মোহাজের ভাইদের সুখ-সাচ্ছন্দ্যের জন্য সর্ব্বপ্রকার সৌজন্য প্রদর্শনে আনছারগণ এক অতুলনীয় ইতিহাস সৃষ্টি করিলেন। এতদ্ভিন্ন মদিনার সর্ব্বত্র ইসলামের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়া চলিল, মদিনাবাসী মোসলমানগণ ইসলামের উন্নতি সাধন কল্পে অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিয়া যাইতে লাগিলেন।

---

* উল্লেখিত ঘটনায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণকারীর নাম "ওলীদ" দেখিয়া মোস্তফা-চরিত গ্রন্থে উক্ত ঘটনার বাস্তবতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করা হইয়াছে; এই কারণে যে, আইয়্যাশ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মুক্তির জন্য যে, নবী (দঃ) নামাযের মধ্যে দোয়া করিয়াছেন সেই দোয়ার মধ্যেই ওলীদ নামীয় ব্যক্তির মুক্তির জন্যও দোয়ার উল্লেখ আছে। অর্থাৎ ইহাতে বুঝা যায় ওলীদও তখন মক্কায় বন্দী ছিলেন; সুতরাং ওলীদের নামে উল্লেখিত ঘটনা নিশ্চয় অবাস্তব।

এই সংশয় জ্ঞান-বিদ্যার অভাব প্রসূত। কারণ, তবকাতে-ইবনে সায়াদ ৪র্থ খণ্ডে ঘটনার বর্ণনায় দেখা যায়, সত্যই ওলীদ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ অপরাধে মক্কায় বন্দী ছিলেন এবং আইয়্যাশ (রাঃ) ও সালামা (রাঃ)-এর সঙ্গে একই কারাগারে ছিলেন; (সেই সময় মুক্তির দোয়ার মধ্যে আইয়্যাশ ও সালামার নামের সহিত ওলীদের নামও ছিল। পরে) ওলীদ (রাঃ) কোন উপায়ে পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়া মদিনায় চলিয়া আসিয়াছিলেন। অপর বন্দীগণ কারাগারেই শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিলেন। নবী (দঃ) ওলীদের মুখেই আইয়্যাশ ও তাঁহার সঙ্গীর উপর নির্ম্মম অত্যাচারের সংবাদ জ্ঞাত হইয়া তাঁহাদের মুক্তির জন্য ওলীদ (রাঃ)কে মক্কায় প্রেরণ করিয়াছিলেন।

নবীজীর হিজরত (৫৫১ পৃঃ)

মক্কা নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্ম-ভূমি ; নবুয়তের পূর্ব্বে স্বীয় জীবনের বড় অংশ সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর এই মক্কায়ই কাটিয়াছিল। নবুয়তী জীবনেরও বেশী অংশ মক্কায়ই কাটিয়াছে। মক্কায়ই সৃষ্টির মুকুটমণি আল্লাহ তায়ালার ঘর—কা'বা শরীফ অবস্থিত। এই সব কারণে মক্কার প্রতি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আকর্ষণ ছিল অনেক বেশী, মক্কার প্রতি তাঁহার ভালবাসা ছিল অপরিমেয়। কিন্তু আল্লার তথা আল্লার দ্বীনের ভালবাসা হইল সর্ব্বোচ্চে, সর্ব্বাধিক ও সর্ব্বাগ্রে। দীর্ঘ তের বৎসরের অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষায়ও যখন মক্কার ভূমিতে দ্বীন-ইসলামের জন্য নিরাপত্তা সৃষ্টি হইল না, নিরাপদে ইসলাম গ্রহণ ও ইসলাম প্রচারের সুযোগ তথায় হইয়া উঠিল না তখন নবীজী মোস্তফা (দঃ) নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য বাধ্য হইলেন স্বদেশ ত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণে। বিষাদ ও দুঃখ ভরা অন্তরে, ব্যথা ও বেদনাজনিত হৃদয়ে স্থির করিলেন, মক্কাকে পরিত্যাগ করিতে।

এই সঙ্কল্প গ্রহণের পর মনোব্যথায় নবীজী মোস্তফা (দঃ) মক্কাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন—

مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي

مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ

"মক্কা! কতই না ভাল তুমি! কতই না ভালবাসি আমি তোমাকে!! আমার জ্ঞাতিরা তোমার ক্রোড়ে আমাকে থাকিতে দিল না ; নতুবা আমি তোমাকে ছাড়িয়া কোথাও বাস করিতাম না।" (মেশকাত শরীফ ২৩৮)

নবীজী যখন মক্কাকে ছাড়িয়া যাইবেন সেই বিচ্ছেদ-লগ্নে একটি টিলার উপর দাঁড়াইয়া অশ্রুসজল নয়নে কা'বার প্রতি তাকাইলেন এবং গভীর মমতায় ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন—

وَاللّٰهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللّٰهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللّٰهِ إِلَيَّ وَلَوْلَا

أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ

"খোদার কসম—মক্কা! অতি উত্তম দেশ তুমি! আমার অতি প্রিয় তুমি! আমি তোমায় অত্যন্ত ভালবাসি। তোমার হইতে আমাকে বিতাড়িত করা না হইলে আমি তোমাকে ত্যাগ করিতাম না। (ঐ)

অধিকাংশ আলেমগণের মতে জগতের বুকে সর্ব্বোত্তম দেশ প্রিয় মদিনা। কিন্তু মদিনা এই গৌরব লাভ করিয়াছে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পদার্পণের পরে। যাবৎ না নবী (দঃ) মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদিনায় পৌঁছিয়াছিলেন তাবৎ ঐ গৌরব মক্কার জন্যই নির্দ্ধারিত ছিল।

হিজরতের সূচনা ঃ

মদিনায় ইসলাম ও মোসলমানদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, মোসলমানগণ মদিনায় আশ্রয় ও নিরাপত্তা লাভ করিয়া তথায় তাঁহাদের কেন্দ্র স্থাপনের সুযোগ পাইতেছেন, মদিনা এলাকায় ইসলামের প্রসার ব্যাপক আকার ধারণ করিতেছে। এই সব সংবাদ মক্কাবাসীদের অবিদিত থাকে নাই এবং তাহারা এই সংবাদে বিচলিত না হইয়া পারে না। কারণ, তাহাদের সুখ-শান্তি ও বল-শক্তিরই নয় শুধু, বরং তাহাদের বাঁচিবার প্রশ্ন নির্ভর করে সিরিয়ার বাণিজ্যের উপর এবং সেই বাণিজ্যের পথ মদিনাবাসীদের বাগের মধ্যে। সুতরাং মদিনায় মোসলমানদের কেন্দ্র গড়িয়া উঠা এবং তথায় মোসলমানদের শক্তি সৃষ্টি মক্কার কাফের গোষ্টির জন্য মৃত্যু-পরওয়ানা। তাই কোরেশদের মনে এক নূতন চিন্তার উদয় হইল। মোসলমানগণ হাত ছাড়া হইয়াছে, মদিনার আউস ও খাযরাজ প্রসিদ্ধ ও শক্তিশালী দুইটি গোত্রের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভের সুযোগ তাঁহারা পাইয়া বসিয়াছেন। ইহার উপর আবার স্বয়ং মোহাম্মদও (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) তাঁহাদের সঙ্গে গিয়া যোগ দিতে উদ্যত ; এইরূপ হইলে ত ইসলাম ও মোসলমানগণ বহু শক্তি অর্জ্জনের সুযোগ পাইয়া বসিল এবং একটি সুশৃঙ্খল ও সুসংহত কেন্দ্র গড়িয়া তোলার সকল প্রকার সুবিধাই লাভ করিয়া ফেলিল।

মক্কার মোশরেকরা ভালভাবেই জানিত, ইসলামের প্রাণশক্তির উৎস-মুখ হইলেন মোহাম্মদ (দঃ)। সুতরাং তাঁহার মদিনা যাওয়া পণ্ড করিতে পারিলে মদিনায় ইসলামী কেন্দ্র গড়িয়া উঠার আশঙ্কা তিরোহিত হইবে। এই ভাবিয়া তাহারা রসুলুল্লাহ (দঃ) সম্পর্কে এমন কোন একটা ব্যবস্থা করার চিন্তা করিতে লাগিল যদ্দারা এইসব সুযোগেরও চিরসমাপ্তি ঘটে এবং রসুলুল্লার আন্দোলনই যেন চিরতরে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে মক্কাবাসীরা তাহাদের সর্ব্বোচ্চ পরিষদ—একশত মেম্বার সম্বলিত "দারে-নদওয়ার" এক পরামর্শ সভা আহ্বান করিল।

মক্কার কাফের শত্রুরা হযরত রসুলুল্লার বিরুদ্ধে সর্ব্বশেষ ব্যবস্থা স্থির করার জন্য বিশেষ গোপনীয়তার সহিত রুদ্ধদ্বার কক্ষে এই সম্মেলনের ব্যবস্থা করিল। এদিকে ইবলিসও এই সুযোগে ইসলামের গোড়া ও মুল কর্ত্তন করিয়া দেওয়ার চেষ্টায় লাগিয়া গেল। রসুলুল্লার প্রাণ বিনাশক কোন স্বক্রিয় ব্যবস্থালম্বনে শত্রু দলকে

উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে স্বয়ং ইবলিস شيخ نجدي—আরব দেশীয় নজদ এলাকা নিবাসী প্রবীণ মানুষের আকৃতি ও বেশে উক্ত সম্মেলনে যোগদানের জন্য তথায় উপস্থিত হইল। এমনকি এই সম্মেলনের মধ্যে সে-ই প্রস্তাব গ্রহণের ভূমিকায় প্রধান হওয়ার সুযোগ পাইয়া বসিল।*

সম্মেলনে বিভিন্ন প্রস্তাবালী পেশ হইতে লাগিল। একজন বলিল, মোহাম্মদকে (দঃ) বন্দী করিয়া কঠোর দণ্ড দেওয়া হক; হাতে পায়ে বেড়ি দিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করতঃ যাবজ্জীবন কারাগারে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হউক। কারাগারে ভীষন দণ্ড ভোগ করিতে করিতে একদিন মরিয়া যাইবে। শেখ-নজদী এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলিল, এই প্রস্তাব কার্য্যকরি করিলে তাহার লোকজন ও আত্মীয়স্বজন নিশ্চয়

---

* সমালোচনাঃ—আলোচ্য ঘটনায় নজদ নিবাসী বয়ঃবৃদ্ধের আকৃতিতে স্বয়ং ইবলিসের উপস্থিতিকে "মোস্তফা-চরিত" গ্রন্থে অস্বীকার করা হইয়াছে। ছুতা ধরা হইয়াছে যে, "যাঁহারা ঐ কথা বলিয়াছেন তাঁহারা বৃদ্ধের মুখেও ঐ কথা শুনেন নাই, অথবা হযরতের মুখেও ঐ তথ্য অবগত হন নাই। কাজেই বৃদ্ধটি যে, ছুলধারী শয়তান ইহা তাঁহাদিগের অনুমান মাত্র।"

এইরূপ উক্তিতে হাসি না আসিয়া পারে না। সীরত তথা চরিত-শাস্ত্রের সমস্ত কেতাবেই আলোচ্য সমাবেশ ও সভার অনুষ্ঠানের বিবরণ উল্লেখ আছে এবং সুস্পষ্টরূপে ইহাও বর্ণিত রহিয়াছে যে, উক্ত সমাবেশে স্বয়ং ইবলিস নজদ অধিবাসী বৃদ্ধের আকৃতিতে যোগদান করিয়াছিল। এখন যেই যুক্তিতে এই বিবরণকে খণ্ডন করা হইয়াছে সেই যুক্তিতে ত মূল ঘটনা—সমাবেশ ও সভা অনুষ্ঠানের বিবরণেরও খণ্ডন হইয়া যায়। কারণ, সমাবেশ ও সভা অনুষ্ঠানের বিবরণও ত কেহ সভা অনুষ্ঠানকারীদের কিম্বা হযরতের মুখে শুনে নাই।

বলা বাহুল্য—সীরত তথা চরিত-শাস্ত্রের পূর্ব্বাপর প্রচলিত গ্রন্থাবলীর বিবরণের উপর ভিত্তি করিয়াই সীরত বা চরিত-গ্রন্থাবলীর রচনা করা হইয়া থাকে; মোস্তফা-চরিতও সেইরূপেই রচিত যে, শত শত বর্ণনা প্রসিদ্ধ চরিত-গ্রন্থাবলী হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। ঐ সব বর্ণনা মূল ঘটনার লোকদের মুখে বা হযরতের মুখে শুনা হয় নাই, চরিত-গ্রন্থাবলীর বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং যেই যুক্তিতে ইবলিসের আলোচ্য ভূমিকার বিবরণ অস্বীকার যোগ্য সাব্যস্ত হইবে, সেই যুক্তিতে মোস্তফা-চরিতের এবং বিভিন্ন চরিত-গ্রন্থের অধিকাংশ বিবরণই অস্বীকার যোগ্য হইবে। বরং ইতিহাস শাস্ত্রই পঙ্গু হইয়া যাইবে। ইতিহাস শাস্ত্রে কয়টি ঘটনা এইরূপ পাওয়া যাইবে যাহা মূল ঘটনার লোকদের মুখে শুনিয়া বা হযরতের মুখে শুনিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে? অতএব উল্লেখিত যুক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে যুক্তিই নহে, বাতুলতা মাত্র।

এতদ্ভিন্ন উল্লেখিত অস্বীকারের কারণ জ্ঞানের এবং এল্‌মের অভাবও বটে। ইবলিসের আলোচ্য ভূমিকার বিবরণটা ঘটনার অতি নিকটবর্ত্তী লোক—মহামান্য, নির্ভরশীল আস্থার পাত্র বিশিষ্ট ছাহাবী নবীজীর চাচাত ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে সনদযুক্তভাবে বহু নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে। যথা—সীরত গ্রন্থ "বেদায়া-ওন্-নেহায়া", ৩—১৭৫। সীরত গ্রন্থ "যোরকানী", ১—৩২১। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ওয়াকেদীর ইতিহাস গ্রন্থ ২—৯৮।

খোঁজ পাইবে এবং তাহাকে উদ্ধার করিতে নিশ্চয় চেষ্টা করিবে ; তাহাতে যুদ্ধবিগ্রহের অঘটনও ঘটিবে এবং শেষ পর্য্যন্ত হয়ত তাহারা উদ্ধার করিয়া নিয়াও যাইবে।

আর একজন বলিল, তাহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হউক ; সে তাহার দল বল সহ দেশান্তরিত হইলে আমাদের দেশ ঠাণ্ডা হইবে। শেখ-নজদী এই প্রস্তাবেরও প্রতিবাদ করিয়া বলিল, সে যে দেশে যাইবে সেখানেই তাহার বহু ভক্ত জুটিয়া যাইবে। তাহার মিষ্ট কথায় এবং কোমল ব্যবহারে অনেক মানুষ তাহার দলে ভিড়িয়া যাইবে। পরে আমাদেরও বিপদের কারণ হইবে ; হয়ত সে দল জোটাইয়া আমাদের উপর আক্রমণ করিবে এবং আমাদের হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করা তাহার জন্য সহজ হইয়া যাইবে।

অবশেষে আবুজহল একটি প্রস্তাব আনিল যে, তাহাকে হত্যা করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। তাহাকে হত্যা করিলে চিরদিনের জন্য আমরাও স্বস্তি লাভ করিব এবং তাহার ধর্ম্ম ইসলামকেও হত্যা করা হইয়া যাইবে। তবে একা একজনে হত্যা করিলে তাহার গোষ্টি হাশেম ও মোত্তালেব বংশ প্রতিশোধ গ্রহণে ছুটিয়া আসিবে। অতএব আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, মক্কা এবং উহার পার্শ্বস্থ সমুদয় গোত্র হইতে এক একজন শক্তিশালী যুবক বাছিয়া লইয়া একটি দল গঠন করা হউক, তাহাদের প্রত্যেকের হাতে তরবারী প্রদান করা হউক ; তাহারা সকলে একত্রে এক সঙ্গে মোহাম্মদের উপর তরবারী দ্বারা আঘাত করতঃ তাহাকে হত্যা করিবে। এই ব্যবস্থায় মূল উদ্দেশ্য হাসিল হইয়া যাইবে এবং উহার কোন পরিণামও বিশেষ ক্ষতিকর হইবে না, কারণ যেহেতু এই হত্যানুষ্ঠানে বহু গোত্রের লোক শামিল থাকিবে তাই বনু-হাশেমগণ এতগুলি গোত্রের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাবলম্বনে সাহসী হইবে না। আর প্রাণ-বিনিময়ের জরিমানা আদায় করিতে হইলে তাহাও সকল গোত্রের উপর বণ্টিত হইয়া সহজসাধ্য হইয়া যাইবে।

প্রবীন মানুষ-বেশী ইবলিস এই প্রস্তাবকে স্বানন্দে অনুমোদন করিল এবং সকলেই ইহার প্রতি সমর্থন জানাইল। তাহাদের উক্ত প্রস্তাব বাস্তবায়িত করিতে রাত্রি বেলা রসুলুল্লার শয়ন-গৃহকে ঘেরাও করারও ব্যবস্থা হইল। শত্রুদের সম্মেলন শেষ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে জিব্রায়ীল (আঃ) মারফত হযরত (দঃ) সমুদয় খবর জ্ঞাত হইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে স্বীয় বিছানায় শয়ন করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল এবং মদিনার পানে হিজরতের অনুমতি দিয়া দেওয়া হইল।↑

↑ উল্লেখিত তথ্যের প্রতি পবিত্র কোরআনেও ইঙ্গিত রহিয়াছে—

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

নবীজী মোস্তফা (দঃ) আবুবকর (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া মদিনা প্রস্থানের পরিকল্পনা করিলেন এবং ইহাও স্থির করিলেন যে, আলী (রাঃ)কে মক্কায় রাখিয়া যাইবেন। কারণ, মক্কার জনসাধারণ তাহাদের সমাজপতিদের প্ররোচনায় অজ্ঞতা বশতঃ নবীজীর বিরুদ্ধাচরণ করিলেও তাহারা নবীজী (দঃ)কে এতদূর বিশ্বাস ও মহাত্মা বলিয়া মনে করিত যে, মক্কায় যাহার যে কোন মূল্যবান বস্তু বা টাকা-পয়সা আমানত বা গচ্ছিত রাখার আবশ্যক হইত সে তাহা নিঃসংশয়ে নবীজীর নিকট রাখিয়া যাইত। কারণ, সব রকম বিরোধিতা ও বিরুদ্ধাচরণের মধ্যেও তিনি "ছাদেকে-আমীন—বিশ্বাস্য নির্ভরশীল" বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। এমনকি নবীজী যখন মক্কা ত্যাগ করার সঙ্কল্প করিয়াছেন তখনও তাঁহার নিকট বহু মূল্যবান জিনিষপত্র ও টাকা-পয়সা গচ্ছিত ছিল। নবীজী (দঃ) যদি হঠাৎ এক দিনে সমুদয় গচ্ছিত বস্তু ফেরত দিয়া দেন তবে তাঁহার হিজরতের গোপন তথ্য ফাঁস হইয়া যায়। আর লোকদেরকে তাহাদের আমানত পৌঁছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা না করিলে তাহাই বা কিরূপে হয়? তাই নবীজী (দঃ) আলী (রাঃ)কে ঐসব আমানত সোপর্দ করিয়া মালিকদের নিকট উহা প্রত্যার্পণের সুব্যবস্থা করিয়া গেলেন। নবীজীর চরিত্র-মাহাত্ম্য এতই অনাবিল ছিল।

নবীজী (দঃ) হিজরতের সুস্পষ্ট অনুমতি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত গরমের মধ্যেই আবুবকরের গৃহে আসিলেন। আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, আমার মাতাপিতা আপনার চরণে উৎসর্গ—এই অসময়ে হুজুরের পদার্পণ কি উদ্দেশ্যে, কি ব্যাপারে? নবীজী (দঃ) বিশেষ সতর্কতার সহিত আবুবকর (রাঃ)কে অবগত করিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে হিজরতের অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। আবুবকর আরজ করিলেন, আমি আপনার সঙ্গেই যাইব কি? নবীজী (দঃ) বলিলেন, আমার সঙ্গেই যাইতে হইবে। এই সৌভাগ্যের সুযোগ লাভের অসীম আনন্দে আবুবকর (রাঃ) কাঁদিয়া দিলেন। এই ঘটনা বর্ণনাকারিণী আবুবকর তনয়া বিবি আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, মানুষ যে আনন্দেও কাঁদে উহার দৃষ্টান্ত আমি ঐ দিনই দেখিলাম। বেদায়াহ্, ৩—১৭৮

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ *

"একটি স্মরণীয় ঘটনা—কাফেরগণ আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল; তাহাদের প্রস্তাব এই ছিল যে, আপনাকে বন্দী করিবে বা প্রাণে বধ করিয়া ফেলিবে বা দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবে। এই উদ্দেশ্যে তাহারা গোপন ষড়যন্ত্র আঁটিতেছিল! আল্লাহ তায়ালাও তাহাদের ঐ ষড়যন্ত্র বানচাল করার গোপন ব্যবস্থা করিতেছিলেন। (ফলে তাহাদের সমুদয় ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ হইল, কারণ) আল্লাহ হইলেন সর্ব্বোত্তম ব্যবস্থাকারী। ৯ পাঃ ১৮ রুঃ

আবুবকর(রাঃ) চার মাস পূর্ব্বেই হিজরতের জন্য দুইটি উত্তম উট ক্রয় করিয়া রাখিয়া ছিলেন। আজ নবীজী (দঃ) ও আবুবকর (রাঃ) উভয়ে হিজরতের সমুদয় ব্যবস্থা ও কথাবার্ত্তা নির্দ্ধারিত করিয়া নিলেন। হিজরতের ব্যবস্থা বিশেষ গোপনীয়তার মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে, তাই নবীজী (দঃ) রাত্রি আরম্ভে স্বীয় গৃহেই থাকিলেন, যেন কাহারও কোন সন্দেহ না হয় এবং যাত্রার পূর্ব্বেই কোন কেলেঙ্কারী সৃষ্টি না হইয়া পড়ে। রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে এক দিকে নবীজী (দঃ) গৃহ ত্যাগের প্রস্তুতি করিতেছেন অপর দিকে আবুজহলের প্রস্তাব অনুযায়ী সে নিজে এবং অন্যান্য গোত্র হইতে সংগৃহীত—মোট এক শত জন শত্রুর দল নবীজীর গৃহ ঘেরাও করিয়া নিল। দারে-নদওয়া মক্কার বিশেষ মিলনায়তনের পরামর্শ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমবেত অস্ত্রের আঘাতে নবীজীকে হত্যা করার প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করার জন্য তাহারা এই রজনীকেই নির্দ্ধারিত করিয়াছে। আর নবীজীও হিজরত করিতে গৃহ ত্যাগের জন্য এই রজনীকেই সাব্যস্ত করিয়াছেন ; আবুবকর পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ অনুযায়ী নিজ গৃহে নবীজীর অপেক্ষায় বসিয়া আছেন।

নবীজী (দঃ) পূর্ব্বেই আলী (রাঃ)কে আমানত সমূহ প্রত্যার্পনের ভার গ্রহণ করার এবং নবীজীর কক্ষে অবস্থান করার বিষয় অবগত ও সম্পন্ন করিয়া রাখিয়া ছিলেন। সেমতে নবীজী (দঃ) নিজে সবুজ রঙ্গের যে চাদরখানা মুড়িয়া ঘুমাইতেন সেই চাদরেই আলী (রাঃ)কে আবৃত করিয়া নবীজীর শয্যায়ই তাঁহাকে শোয়াইয়া দিলেন। নবীজী (দঃ) এখন গৃহ হইতে বাহির হইবেন, কিন্তু এক শত প্রাণঘাতি শত্রুর দ্বারা তাঁহার গৃহ অবরুদ্ধ। এই অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরত নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিরাপত্তার অসাধারণ ব্যবস্থা করিল। নবীজী মোস্তফা (দঃ) ছুরা ইয়াছীনের এই আয়াত তেলাওত করতঃ আল্লাহ তায়ালার উপর নির্ভর ও অদম্য সাহসের সহিত গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন—

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

"আমি তাহাদের চতুর্দ্দিকে বেষ্টনী সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি এবং তাহাদেরে আবরণে ফেলিয়া দিয়াছি, ফলে তাহারা দেখিতে পাইবে না।"

পবিত্র কোরআনের ইহাও একটি অলৌকিক ক্রিয়া যে, আয়াতের মূল মর্ম্মত পূর্ব্বাপর বিষয় বস্তুর সামঞ্জস্যেই উদ্দিষ্ট থাকে। কিন্তু উহার শাব্দিক অর্থের সামঞ্জস্যে বিভিন্ন বাহ্যিক ক্রিয়াও আল্লাহ তায়ালা উহার বরকত ও অছিলায় সংঘটিত করেন। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা তাবীজ-গণ্ডা, ঝার-ফুঁক ইত্যাদি হাযার হাযার আমলের ঐরূপ ক্রিয়া আবহমানকালের অভিজ্ঞতায় সুপ্রমাণিত রহিয়াছে।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পাক-পবিত্র জবান মোবারকে ঐ আয়াত তেলাওয়াত করায় আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে উহার শাব্দিক অর্থের সামঞ্জস্যময় ক্রিয়ার উপস্থিত ফল এই দান করিলেন যে, অবরোধকারী শত্রুদের দৃষ্টির উপর আল্লাহ তায়ালার কুদরতী আবরণ পড়িয়া গেল; নবীজী (দঃ) নির্বিঘ্নে নিজ গৃহ হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন; ঐ শত্রুরা তাঁহাকে দেখিল না। এমনকি প্রস্থানকালে নবীজী (দঃ) শত্রুদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া কাঁকরময় মাটি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; তাহাদের প্রত্যেকের মাথার উপর উহার অংশ পতিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা মোটেই কোনরূপ টের পায় নাই। গৃহ হইতে বাহির হইয়া নবীজী (দঃ) আবুবকরের গৃহে গেলেন এবং তাঁহারা উভয়ে ঐ গৃহের পেছন দিকের খিড়কি পথে বাহির হইয়া পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ অনুযায়ী ছৌর পর্ব্বত উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া গেলেন।

যাত্রাকালে নবীজী (দঃ) এই দোয়া করিয়াছিলেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَنِىْ وَلَمْ اَكُ شَيْئًا اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى هَوْلِ
الدُّنْيَا وَبَوَائِقِ الدَّهْرِ وَمَصَائِبِ اللَّيَالِىْ وَالْاَيَّامِ اَللّٰهُمَّ اصْحَبْنِىْ
فِىْ سَفَرِىْ وَاخْلُفْنِىْ فِىْ اَهْلِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا رَزَقْتَنِىْ وَلَكَ فَذَلِّلْنِىْ
وَعَلٰى صَالِحِ خُلُقِىْ فَقَوِّمْنِىْ وَاِلَيْكَ رَبِّ فَحَبِّبْنِىْ وَاِلَى النَّاسِ فَلَا
تَكِلْنِىْ اَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَاَنْتَ رَبِّىْ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ
الَّذِىْ اَشْرَقَتْ لَهُ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَكُشِفَتْ بِهِ الظُّلُمَاتُ وَصَلُحَ
عَلَيْهِ اَمْرُ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ اَنْ يَحِلَّ بِىْ غَضَبُكَ وَيَنْزِلَ عَلَىَّ سَخَطُكَ
اَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَجَمِيْعِ
سَخَطِكَ لَكَ الْعُتْبٰى عِنْدِىْ خَيْرَ مَا اسْتَطَعْتُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লার জন্য যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অথচ আমি কিছুই ছিলাম না। আয় আল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন দুনিয়ার আপদ-বিপদে, সর্ব্বদার ভয়-ভীতিতে, দিবা-রাত্রির বালা-মছিবতে। আয় আল্লাহ! আপনি আমার সঙ্গী হইয়া থাকুন আমার ভ্রমণে এবং আমার পরিবারে আমার অনুপস্থিতির

অভাব আপনি পুরণ করিয়া দিন। আমাকে যাহা দান করেন উহাতে বরকত দান করুন। আমাকে আপনার অনুরক্ত বানাইয়া রাখুন, সৎ চরিত্রের উপর আমাকে দৃঢ়পদ রাখুন, আমাকে আপনার প্রেমিক বানাইয়া রাখুন। আমাকে মানুষের নিকট সোপর্দ্দ করিবেন না। আপনি সকল দুর্ব্বলদের প্রভু, আমি দুর্ব্বলেরও প্রভু; আমি আপনি দয়ালের আশ্রয় গ্রহণ করি। আপনার নূরে সমস্ত আকাশ ও ভূমণ্ডল আলোকিত হইয়াছে এবং সকল প্রকার অন্ধকার দূরিভূত হইয়াছে এবং পূর্বাপর সকলের সমস্ত কাজ কারবার ঐ নূরের বদৌলতেই সুশৃঙ্খল হইয়াছে। আমাকে আশ্রয় দান করুন আমার উপর আপনার গজব পতিত হওয়ার দুর্ভাগ্য হইতে। আপনার আশ্রয় গ্রহণ করি আপনার নে'মত-হারা হওয়ার দুর্ভাগ্য হইতে, অকস্মাৎ আপনার আজাবের আগমন হইতে, আপনার প্রদত্ত সুখ-শান্তির পরিবর্ত্তন ঘটা হইতে; আপনার সকল প্রকার সন্তুষ্টি লাভই আমার একমাত্র কাম্য। আপনার সাহায্য ছাড়া বাঁচিবার স্থান ও শক্তি কোথাও কাহারও নাই।" (যোরকানী, ১—৩২৯)

এদিকে শত্রু দল নবীজীর গৃহ ঘিরিয়া রাখিয়াছে, নবীজীর শয্যার উপর তাঁহারই চাদরে আবৃত আলী (রাঃ)কে তাহারা হয়ত দ্বারের ফাটল দিয়া বা কোন প্রকারে শায়িত দেখিয়া তাহারা মনে করিতেছিল, হযরতই শুইয়া আছেন। এই মনে করিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছে। রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইতেছে অথচ তাহারা উদ্দেশ্য সাধনের কোন সুযোগ পায় নাই, তাই অবশেষে ভোর বেলায় অবরোধকারীরা গৃহ ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। তথায় আলী (রাঃ)কে দেখিয়া তাহারা হতবাক হইয়া গেল; তাহারা আলী (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের কর্ত্তা কোথায়? আলী (রাঃ) উত্তর করিলেন, তিনি কোথায় আছেন তাহা আমি জানি না (বেদায়াহ ৩—১৮১)। তৎক্ষণাৎ আবুজহল কতিপয় লোকসহ আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বাড়ীতে গেল; তাহারা গৃহ দ্বারে দাঁড়াইলে আবুবকর তনয়া আস্‌মা (রাঃ) তথায় আসিলেন। তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোর পিতা কোথায়? আস্‌মা (রাঃ) বলিলেন, আমি জানিনা আব্বা কোথায় গিয়াছেন। আবুজহল খবিস বদজাত ছিল; সে আসমা (রাঃ)কে জোরে চপেটাঘাত করিল যাহাতে তাঁহার কানের বালি ছিড়িয়া পড়িয়া গেল। (বেদায়াহ, ৩—১৭৯)

নবীজী ও আবুবকর ছোর পর্ব্বতে ঃ

আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর গৃহ হইতে বাহির হইয়া নবীজ (দঃ) ও আবুবকর (রাঃ) রজনীর অন্ধকারে ছোর পর্ব্বৎ উদ্দেশ্যে পথ চলিতে লাগিলেন। নগর হইতে মাত্র ৩।৪ মাইল ব্যবধানেই ছোর পর্ব্বৎ অবস্থিত। সুতরাং সাধারণ-ভাবে রাত্রির অন্ধকারে শহর হইতে যাত্রা করিয়া ভোর হইতেই তথায় পৌছার

কথা। কিন্তু লুকাইয়া লুকাইয়া পথ অতিক্রম করায় এবং হয়ত সাধারণ পথ ভিন্ন অন্য পথ অবলম্বন করায় ছৌর পর্ব্বৎ পর্য্যন্ত পৌঁছিবার পথেই দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছিল। উত্তপ্ত দ্বিপ্রহরে বিশ্রামেও বাধ্য হইয়া ছিলেন, তাই ছৌর পর্ব্বৎ-গুহায় রাত্রে পৌঁছিয়া ছিলেন। (বেদায়াহ, ৩—১৭৯)

বুধবার দিন যাইয়া যে রাত্রি আসিল উহা বৃহস্পতিবার রাত্র; এই রাত্রে গৃহ ত্যাগ করতঃ বৃহস্পতিবার পূর্ণ দিন অতিক্রান্তে ছৌরে পৌঁছিয়াছিলেন। সেই রাত্র যাহা জুমার রাত্র এবং জুমার দিন, তারপর শনিবার রাত্র ও দিন, তারপরের রবিবার রাত্র ও দিন—এই তিন রাত্র তিন দিন গুহায় বাস করিয়া রবিবার দিনের পর রাত্র তথা সোমবারের রাত্রে উহার গভীর অংশে ছৌর পর্ব্বৎ-গুহা হইতে বাহির হইয়া মদিনা পানে যাত্রা করিয়াছিলেন। (যোরকানী, ১—৩২৫)

গিরিগুহায় আবুবকর ও নবীজী ঃ

ছৌর গিরিগুহার দ্বারে রাত্রির অন্ধকারে পৌঁছিয়া আবুবকর (রাঃ) রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিলেন, আপনি বাহিরে অপেক্ষা করুন; আমি প্রথমে গুহার ভিতরে প্রবেশ করি; সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি কষ্টদায়ক কোন কিছু থাকিলে উহার দুঃখ আমার উপর দিয়াই যাইবে। এই বলিয়া প্রথমে আবুবকর (রাঃ) গুহায় প্রবেশ করিলেন; গুহার চতুর্দিকে ছিদ্র পথ ছিল যাহা হইতে কোন দংশনকারী বাহির হইতে পারে। আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট অতিরিক্ত একটি কাপড় ছিল; উহা তিনি খণ্ড খণ্ড করিলেন এবং অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াইয়া ছিদ্রসমূহ কাপড়-খণ্ড দ্বারা বন্ধ করিয়া দিলেন। দুইটি ছিদ্র বাকি থাকিতেই কাপড় শেষ হইয়া গেল। আবুবকর নবীজী (দঃ)কে ভিতরে প্রবেশের আহ্বান জানাইলেন। নবীজী (দঃ) ভিতরে প্রবেশ করিলে আবুবকর (রাঃ) উন্মুক্ত ছিদ্রের মুখ স্বীয় পা দ্বারা বন্ধ করিয়া উরু বিছাইয়া দিলেন; উহার উপর ক্লান্ত পরিশ্রান্ত নবীজী (দঃ) মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। এদিকে ছিদ্রের ভিতর বিষাক্ত বিচ্ছু ছিল; আবুবকরের পায়ে বার বার দংশিতে লাগিল। নবীজীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে আশঙ্কায় আবুবকর (রাঃ) বিচ্ছুর দংশন সহ্য করিয়া যাইতেছিলেন, একটুও নড়িলেন না। কিন্তু বিষ ক্রিয়ায় তাঁহার চোখের অশ্রু নবীজীর চেহারার উপর পতিত হইল; নবীজী (দঃ) জাগিয়া গেলেন এবং আবুবকর (রাঃ)কে অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, আমার জনক-জননী আপনার চরণে উৎসর্গ—আমার পায়ে বিচ্ছু দংশিয়াছে। নবীজী (দঃ) দংশন স্থানে থুথু দিয়া দিলেন; তৎক্ষণাৎ আবুবকর (রাঃ) আরোগ্য লাভ করিলেন। নবীজী (দঃ) ঐ মুহূর্ত্তেই আবুবকরের জন্য দোয়া করিলেন—

رَحِمَكَ اللّٰهُ صَدَّقْتَنِىْ حِيْنَ كَذَّبَنِىْ النَّاسُ وَنَصَرْتَنِىْ حِيْنَ خَذَلَنِىْ

النَّاسُ وَآمَنْتَ بِيْ حِيْنَ كَفَرَ بِيَ النَّاسُ وَانْسَتَنِيْ فِيْ وَحْشَتِيْ

"আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন; তুমি আমাকে বিশ্বাস করিয়াছ যখন লোকেরা আমাকে অবিশ্বাস করিয়াছে, তুমি আমাকে সাহায্য করিয়াছ যখন লোকেরা আমার সাহায্য ছাড়িয়া দিয়াছে, তুমি আমার প্রতি ঈমান আনিয়াছ যখন লোকেরা আমাকে অস্বীকার করিয়াছে এবং তুমি আমার সান্ত্বনা যোগাইয়াছ আমার উদ্‌বেক অবস্থায়।" নবীজী (দঃ) আরও দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَبَا بَكْرٍ مَعِيْ فِيْ دَرَجَتِيْ فِي الْجَنَّةِ

"হে আল্লাহ! বেহেশতে আমার শ্রেণীতে আমার সঙ্গে আবুবকরকে রাখিও।"
(যোরকানী, ১—৩৩৫)

ওমর (রাঃ) স্বীয় খেলাফৎ আমলে অবগত হইলেন যে, কোন কোন লোক ওমর (রাঃ)কে আবুবকর (রাঃ) অপেক্ষা উত্তম বলিয়া থাকে। ওমর (রাঃ) তখন কসম করিয়া বলিলেন, আবুবকরের শুধু এক রাত্রের বা শুধু এক দিনের আমল সমগ্র ওমর-পরিবারের সারা জীবনের আমল অপেক্ষা উত্তম। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবুবকর (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া ছৌরগুহার উদ্দেশ্যে রাত্রির অন্ধকারে পথ চলিতেছিলেন। ঐ সময় আবুবকর (রাঃ) কতক্ষণ নবীজীর পেছনে চলেন, আবার কতক্ষণ সম্মুখে। নবীজী (দঃ) তাঁহার এইরূপ চলনের প্রতি লক্ষ্য করিলেন এবং বলিলেন, আবুবকর! তুমি এইরূপ চলিতেছ কেন? আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, পেছন হইতে ধাওয়াকারী শত্রুর আশঙ্কা করি তখন আপনার পেছনে চলি, আবার সম্মুখে অপেক্ষমান শত্রুর ভয় করি তখন আপনার সম্মুখে চলি। নবীজী জিজ্ঞাসা করিলেন; তুমি কি এই কামনা কর যে, শত্রুর কোন আঘাত আসিলে তাহা আমাকে না লাগিয়া তোমাকে লাগে? আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, যেই আল্লাহ আপনাকে সত্য দ্বীন প্রদানে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার শপথ করিয়া বলি—উহাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। অতঃপর ওমর (রাঃ) গুহার ভিতরে রাত্রি বেলায় উহার ছিদ্রসমূহ বন্ধ করার পূর্ব্ব বর্ণিত ঘটনাও বিস্তারিতরূপে উল্লেখ করিলেন এবং কসম করিয়া বলিলেন, ঐ শ্রেণীর শুধু এক রাত্রের আমল গোটা ওমর-পরিবারের সারা জীবনের আমল অপেক্ষা উত্তম। (বেদায়াহ, ৩—১৮০)

একদা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সম্মুখে আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আলোচনা হইল। ওমর (রাঃ) কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, আমি আকাঙ্খা রাখি--আমার সারা জীবনের আমল আবুবকরের শুধু একটি রাত্র বা শুধু একটি দিনের আমলের সমপরিমাণ গণ্য হয়।

রাত্রটি ত হইল ঐ রাত্র যে রাত্রে তিনি এবং নবীজী এক সঙ্গে চলিয়া ছৌ:গিরি-গুহার দ্বারে পৌছিলেন। তথায় পৌছিয়া আবুবকর (রাঃ) নবীজীকে বলিলেন, আপনি গুহায় প্রবেশ করিবেন না আপনার পূর্ব্বে আমি প্রবেশ করিব; আঘাত পাওয়ার কোন কিছু উহার ভিতরে থাকিলে আমিই পাইব, আপনার আঘাত লাগিবে না। সেমতে আবুবকর গুহায় প্রবেশ করিয়া উহাকে পরিষ্কার করিলেন; উহার ভিতরে চতুর্দ্দিকে ছিদ্র দেখিতে পাইলেন, তাঁহার একখানা অতিরিক্ত লুঙ্গি ছিল, সেই লুঙ্গিখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিদ্রগুলির মুখ বন্ধ করিলেন; দুইটি ছিদ্র উন্মুক্ত থাকিল; কাপড় শেষ হইয়া গিয়াছে; ঐ ছিদ্র দুইটি দুই পায়ে বন্ধ করিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রবেশের আহ্বান জানাইলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) প্রবেশ করিলেন এবং আবুবকরের কোলে মাথা রাখিয়া শয়ন করিলেন। ছিদ্র হইতে তাঁহার পায়ে দংশন লাগিল, কিন্তু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঘুম ভাঙ্গার ভয়ে আবুবকর একটুও নড়িলেন না। তাঁহার অশ্রু ফোটা নবীজীর চেহারায় পতিত হইল; নবীজী জাগ্রত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে আবুবকর? তিনি বলিলেন, দংশন লাগিয়াছে—আমার জনক-জননী আপনার চরণে উৎসর্গ। রসুলুল্লাহ (দঃ) দংশন স্থানে থুথু দিলেন তৎক্ষণাৎ আরোগ্য হইয়া গেল, কিন্তু আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শেষ জীবনে সেই বিষের ক্রিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং মৃত্যুর কারণ হইল (ফলে তিনি নবীজীর জন্য শহীদ হওয়ার মর্ত্তবা লাভ করিলেন)।……(মেশকাত শরীফ ৫৫৬)

উল্লেখিত তথ্য ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ভাবাবেগ নহে, বাস্তব সত্যই বটে: স্বয়ং নবী (দঃ)ও ঐরূপই বলিয়াছেন।

হাদীছ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা অতি উজ্জ্বল চাঁদনি রাত্রে রসুলুল্লাহ (দঃ) আমার ক্রোড়ে হেলান দেওয়া ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আকাশের অগণিত নক্ষত্র সংখ্যার পরিমাণে কোন ব্যক্তির নেক্ বা ছওয়াব আছে কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, হাঁ—আছে, ওমর। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে আবুবকরের নেক্সমূহের পরিমাণ কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আবুবকরের একটি নেক ওমরের সারা জীবনের সমস্ত নেকসমূহের সমান। (মেশকাত ৫৬০)

গিরিগুহায় অসীম সাহসের পরিচয়ঃ

শত্রুদল নবীজীর গৃহে এবং আবুবকরের গৃহে তাঁহাদেরকে না পাইয়া ব্যাপার বুঝিতে তাহাদের বাকি থাকিল না এবং ব্যবস্থা অবলম্বনেও তাহারা মোটেই বিলম্ব করিল না। অবিলম্বে তাহারা তাঁহাদের খোঁজে চতুর্দিকে ছুটিয়া পড়িল। বিশেষতঃ সেই যুগে একটি বিশেষজ্ঞ সম্প্রদায় সুপ্রসিদ্ধ ছিল যাহাদিগকে "কায়েফ"

বলা হইত। পদ-চিহ্নের পরিচয়, উহার আবিষ্কার এবং উহার অনুসরণে ঐ সম্প্রদায় অসাধারণ পটু হইত। ঐ সম্প্রদায়ের বিশেষজ্ঞদেরকে নবীজী ও আবুবকরের গন্তব্যস্থানের খোঁজে লাগাইয়া দেওয়া হইল প্রত্যেক দিকে। ছৌর পর্ব্বতের দিকে যে দল চলিয়া ছিল তাহারা তাঁহাদের পদ চিহ্ন আবিষ্কার করিতে এবং উহার অনুসরণ করিতে সক্ষম হইল। তাহারা সেই সূত্র ধরিয়া চলিতে চলিতে ছৌর-গিরিগুহার দ্বারে যাইয়া উপনীত হইল। (যোরকানী, ১—৩৩০)।

সম্মুখে আর কোন পদ-চিহ্নের নিদর্শন না দেখিয়া তাহারা ধারণাও করিল, হয়ত এই গুহার ভিতরই আসামীরা লুকাইয়া রহিয়াছে। তাই তাহারা তথায় থামিয়া গেল এবং আনাগোনা করিতে লাগিল। এমনকি গুহাভ্যন্তর হইতে আবুবকর (রাঃ) তাহাদেরকে দেখিতে ছিলেন। আবুবকর বিচলিত হইয়া পড়িলেন; বলিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! এখন উপায় কি? প্রাণঘাতি শত্রুদল নিজেদের পায়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া তাকাইলেই ত আমাদিগকে দেখিয়া ফেলিবে—তখন যে, কি অবস্থা হইবে তাহা ত বলিতে হইবে না। ঐ সময় নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভূমিকা অতি অসাধারণ ও অতুলনীয় ছিল।

অশিক্ষিত শত্রুরা নবীজীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন করিয়াছিল; শিক্ষিত শত্রু খৃষ্টানরা তদপেক্ষা অধিক তীক্ষ্ণ অস্ত্র—কলম ধারন করিয়া নবীজীর সুনাম-সুখ্যাতি ও কৃতিত্বের উপর কালিমা লেপনে তাহাদের সর্ব্বময় শিক্ষা ও কৌশল ব্যয় করিয়াছে। ঐরূপ একজন স্বনামধন্য শত্রু 'মারগোলিয়থ'ও নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আলোচ্য ভূমিকার প্রশংসামুখর হইয়া লিখিতে বাধ্য হইয়াছে যে, "মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)— চরম বিপদের সময় যাঁহার মানসিক বল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে বিকশিত হইত, তিনি যে, (এই মুহূর্ত্তে) বিশেষ ধীরতা ও সাহসের সহিত কাজ করিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

মারগোলিয়থ গোষ্ঠি সত্যের দ্বারে পৌছিয়া যাইতে সক্ষম হইত যদি তাহারা আর একটু গবেষণা করিত যে—এই অদম্য মানসিক বল, এই অসীম সাহস, এই অটল ধৈর্য্য এবং বিপদের চরম ভীষণতা ও ভয়ঙ্করের মুখে উক্ত গুণাবলীর পরম বিকাশ ইহার মূল কোথায়?

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) আল্লার সত্য নবী, তিনি সত্যের অকৃত্রিম সেবক, বিশ্বাসের স্বর্গীয় আদর্শ। তিনি আপন হৃদয়ে আল্লাহকে এমনভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ভিতরে বাহিরে সত্যের তেজ ও আল্লাহতে বিশ্বাস ও নির্ভরের অনুভূতি এমনভাবে গাঁথিয়াছিলেন যে, দুনিয়ার কোন বিভীষিকা, ভীষণ হইতে ভীষণতর কোন বিপদ এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার সুপ্রশস্ত মহান হৃদয়কে বিচলিত করিতে পারিত না, তাঁহার ধীরস্থিরতা সর্ব্বদা অটুট থাকিত।

আলোচ্য ঘটনায় নবীজী মোস্তফার যে ভূমিকা ছিল তাহাই উল্লেখিত দাবীর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ঐ বিভীষিকা ও মহাসঙ্কটের চরম মুহূর্ত্তে যখন আবুবকরের ন্যায় মানুষও বিহ্বল বিচলিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—হায়! কি অবস্থা হইবে! শত্রুদল নিজেদের পায়ের দিকে লক্ষ্য করিলেই আমাদেরকে দেখিয়া ফেলিবে। এইরূপ পরিস্থিতিতে যাহারা শুধু মানুষ তাহারা কি ব্যাকুল না হইয়া পারে? নিভৃত গুহার মধ্যে মাত্র দুইটি মানুষ। পলায়নের কোন পথ নাই, মুক্তির আশা নাই, ঘাতকদল গুহার মুখে দাঁড়াইয়া আছে—মৃত্যু একরূপ অবধারিত। কিন্তু সেখানেও নবীজী মোস্তফা (দঃ) সমুদ্রের ন্যায় প্রশস্ত ও গভীর, পর্ব্বতের ন্যায় স্থির ও অটল। বিন্দুমাত্র ব্যাকুলতা নাই, হতাশা নাই; আছে শুধু আল্লার করুণার আশা, রহমতের বিশ্বাস এবং আল্লার উপর দৃঢ় নির্ভর। প্রশান্ত চিত্তে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আবুবকর (রাঃ)কে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "চিন্তা করিও না, অধীর হইও না; নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।" শুধু এতটুকের উপর ক্ষান্ত না হইয়া আরও বলিলেন, "যেই দুই জনের তৃতীয় সঙ্গী থাকেন আল্লাহ সেই দুই জনের নিরাপত্তা সম্পর্কে কি ধারণা কর?"

১৭০২। হাদীছঃ—(৫১৬ পৃঃ) عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا فِي الْغَارِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا فَقَالَ مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ - اللهُ ثَالِثُهُمَا

অর্থ—আনাছ (রাঃ) আবুবকর (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন; যখন আমরা (হিজরতের পথে ছৌর পর্ব্বতের) গুহায় ছিলাম, তখন আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আশঙ্কা প্রকাশ করিলাম যে, শত্রুগণ (আমাদের খোঁজে গুহার মুখ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে, এখন তাহাদের কেহ যদি নিজ পায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে তবেই আমাদিগকে দেখিয়া ফেলিবে। এতচ্ছ্রবণে হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন, (এইরূপ কথা মুখেও আনিও না।) হে আবুবকর! ঐ দুই ব্যক্তির অবস্থা কিরূপ মনে কর (যাহাদের পক্ষে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ সাহায্য সহায়তা প্রতি মুহূর্ত্তে বিদ্যমান রহিয়াছে যেন) আল্লাহ স্বয়ং এই দুইজনের তৃতীয় সাথী।

আরও অধিক আশ্চর্য্যের বিষয়—এই ঘোরতর সঙ্কট সময়েও নবীজী মোস্তফা (দঃ) গুহার ভিতরে নামাযে মগ্ন ছিলেন। তায়েফের ঘটনায়ও বলা হইয়াছে, বিপদ-সঙ্কুল ভয়াবহ পরিস্থিতিতে নবীজীর সান্ত্বনা ও শান্তি লাভের একমাত্র অবলম্বন

ছিল নামায। তাই গিরিগুহার সঙ্কটময় সময়—যখন ঘাতকদল গুহার মুখে আনাগোনা করিতেছিল তখনও নবীজী মোস্তফা (দঃ) নামাযে মগ্ন ছিলেন। (যোরকানী, ১—৩৩৬)

গিরিগুহার সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে নবীজী মোস্তফা (দঃ) মানুষের জন্য সান্ত্বনা লাভের এক চরম ভরসা রাখিয়া গিয়াছেন, এক কূলহীন প্রশস্ত আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আল্লার করুণার উপর এমন ঐকান্তিক নির্ভরতার দৃষ্টান্ত আর কোথাও মিলিবে কি? আল্লাহ তায়ালার করুণা হইতে কোন অবস্থাতেই নিরাশ হওয়া চাইনা—ইহার অমর দৃষ্টান্ত ও চিরস্মরণীয় আদর্শ স্থাপন করিলেন নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গিরিগুহার সঙ্কট মুহূর্ত্তে। আল্লাহ তায়ালাও বলিয়াছেন—

لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللّٰهِ

"আল্লার করুণা হইতে নিরাশ হইও না।"

নবীজী মোস্তফার বুক ভরা আশা ও বিশ্বাস ছিল—সেই মুহূর্ত্তেই আল্লাহ তায়ালার করুণা লাভের; কার্য্যতঃ হইলও তাহাই। আল্লাহ তায়ালা তথা হইতে ঘাতকদলের ফিরিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন; অস্ত্রের বা ভূত-প্রেতের ভয় দেখাইয়া নয়, ঝড়-তুফান বা ভূমিকম্পের কাণ্ড ঘটাইয়া নয়; আল্লার কুদরতের লিলায় নিজেদের ধারণা ত্যাগে বাধ্য হইয়া এবং উহার বিপরীত বিশ্বাসে ভাসিয়া গিয়া শত্রু দল ঐ স্থান ত্যাগ করিল, শুধু তাহাই নয় বরং খোঁজাখোঁজির অভিযানই ত্যাগ করিয়া তাহারা ব্যর্থতা বরণ করিয়া নিল। এইভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার প্রিয় রসুলকে প্রাণঘাতি পাষণ্ডিগের কবল হইতে রক্ষা করিলেন।

গিরিগুহায় আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ঃ

নবীজী মোস্তফা (দঃ) এবং আবুবকর (রাঃ) রাত্রির আরম্ভদিকেই গুহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া গিয়াছেন। তথায় কাফেরদের পৌছিবার পূর্ব্বে অনতিবিলম্বেই কুদরতে-এলাহী তথায় কতিপয় অতি সাধারণ, কিন্তু সুক্ষ্ম কৌশলের ব্যবস্থা করিল। গুহার মুখে "রাআহ্‌" নামক এক প্রকার সাধারণ গাছ জন্মিল, উহার শাখাগুলি গুহামুখে ঝুকিয়া পড়িল। আর তথায় মাকড়সা জাল বুনিয়া দিল এবং এক জোড়া জংলা কবুতরও সেখানে বাসা বানাইয়া ডিম পারিল।

অনুসন্ধানীদল গুহামুখে পৌছিয়া তথায় কিছু সময় আনাগোনা করিল, এমনকি তাহাদের কেহ কেহ ঐ গুহার মধ্যে তাহাদের আসামী পালাইবার সম্ভাবনাও প্রকাশ করিল, কিন্তু তথায় মাকড়সার জাল এবং কবুতরের বাসা দৃষ্টে শেষ পর্য্যন্ত তাহারা ভাবিল, এই গুহায় নিশ্চয় কোন লোক প্রবেশ করে নাই, নতুবা মাকড়সার এইরূপ অক্ষত জাল থাকিত না এবং এইরূপভাবে কবুতরের বাসাও থাকিত না।

এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহারা আর গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল না, খোঁজাখোঁজিও করিল না—তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

আল্লাহ তায়ালার কী কুদরত! একেবারে সাধারণ এবং নাজুক ও দুর্ব্বল উপকরণ দ্বারা তিনি এমন দুর্ধর্ষ শত্রুদিগের সমুদয় অপচেষ্টাকে বন্ধ করিয়া দিলেন, ভয়াবহ অভিযানকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন। ঘটনা প্রবাহের আশ্চর্য্যজনক সীনকে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে কি সুন্দর ভঙ্গিমায় বর্ণনা করিয়াছেন।

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ
إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا - فَأَنْزَلَ
اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ
كَفَرُوا السُّفْلٰى - وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا - وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ *

"আল্লার রসুলকে তোমরা যদি সাহায্য না কর, তবুও আল্লার সাহায্য তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছে। (উহার দৃষ্টান্ত দেখ—) যখন কাফেরগোষ্টি তাঁহাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করিল তখন তিনি শুধু দুইজনের একজন ছিলেন (তৃতীয় কোন বাহ্যিক সঙ্গী তাঁহার ছিল না। কি করুণ দৃশ্য ছিল—!) যখন তাঁহারা দুইজন গিরিগুহায় আশ্রয় নিলেন। (আল্লার প্রতি কী দৃঢ় প্রত্যয় ছিল রসুলের!) যখন তিনি (এক বিভীষিকাপূর্ণ ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে) নিজ সঙ্গীকে বলিতেছিলেন, "চিন্তা করিও না, অধীর হইও না; নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।" সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাঁহার উপর শান্তি ও ধীরস্থিরতা বর্ষণ করিলেন এবং তাঁহার সাহায্যে বিভিন্ন এমন বাহিনী নিয়োগ করিলেন যাঁহাদেরকে তোমরা দেখ না, যাহার প্রতি কেহ লক্ষ্যও করেনা। আর কাফেরদের (সিদ্ধান্ত—নবীজীকে হত্যা করিবে সেই) কথাকে আল্লাহ হেয় নিচ তথা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। আল্লার (সিদ্ধান্ত—নবীজী অক্ষত থাকিবেন সেই) কথাই উপরে তথা বলবৎ থাকিল। আল্লাহ সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহার কৌশল অসীম।

(১০ পাঃ ১২ রুঃ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—উল্লেখিত আয়াতের "جُنُوْد জুনূদ" শব্দটি বহুবচন; একবচন হইল "جُنْد জুন্দ" যাহারা অর্থ "বাহিনী"। বহুবচন দ্বারা নিশ্চয় বিভিন্ন বাহিনী উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। ফেরেশতা বাহিনীর সাহায্যত তথায় ছিলই—যাঁহাদিগকে কেহ দেখে না; আর মাকড়সা ও কবুতর যাহা সামান্য ও সাধারণ বস্তু হিসাবে কেহ উহার প্রতি লক্ষ্য করে না। কিন্তু ঐ ক্ষেত্রে উহাদের দ্বারা যেই সাহায্য

হইয়াছে যে, শত্রুদল তথা হইতে চলিয়া গিয়াছে—এই সাহায্য ত সশস্ত্র মানুষ দ্বারাও কঠিন ছিল। সুতরাং মাকড়সা এবং কবুতরও ঐ স্থানে নবীজীর সাহায্যকারী বাহিনীর মধ্যে শামিল বলিয়া গণ্য হইবে।*

গিরিগুহায় পানাহারের ব্যবস্থা ঃ

গৃহ ত্যাগের প্রাক্কালে আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরিবার বিশেষতঃ তাঁহার কন্যা আস্‌মা (রাঃ) নবীজী ও আবুবকরের জন্য উপস্থিত সহজসাধ্য সামান্য কিছু পাথেয় তৈরী করিয়া একটি থলিয়ায় ভরিয়া দিয়া ছিলেন, ছোট একটি মশকও পানি ভরিয়া দিয়া ছিলেন। থলিয়া ও মশকের মুখ বাঁধিবার দড়ি পাওয়া যাইতে ছিলনা; তাড়াহুড়ার মধ্যে আস্‌মা (রাঃ) স্বীয় কমরবন্দ চিরিয়া এক খণ্ড নিজের জন্য রাখিলেন অপর খণ্ড থলিয়া ও মশকের মুখ বাঁধিতে ব্যয় করিয়া দিলেন। (যোরকানী, ১—৩২৮)

এতদ্ভিন্ন গিরিগুহায় থাকাকালে খাদ্য লাভের অন্য একটি ব্যবস্থাও আবুবকর (রাঃ) করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার একজন মুক্ত ও অতি ভক্ত ঈমানদার গোলাম ছিল—আমের ইবনে-ফোহায়রা (রাঃ); তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে মদিনায় যাইবেন, কিন্তু এখনও তিনি আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর গৃহেই অবস্থান করেন। তিনি আবুবকরের মেষপাল চরাইয়া থাকেন। পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ অনুযায়ী তিনি তাঁহার মেষগুলো চরাইতে চরাইতে সন্ধাবেলা ঐ গুহারনিকটে নিয়া যাইতেন এবং রজনীর অন্ধকারে দুধ দোহাইয়া দিয়া আসিতেন। নবীজী (দঃ) এবং আবুবকর (রাঃ) ঐ দুগ্ধ পানে রাত্র ও দিন কাটাইতেন; গুহায় অবস্থানের তিন দিনের প্রতি দিনই তিনি ঐরূপ করিতেন।

কোরেশদের খবরাখবর গুহায় পৌঁছিবার ব্যবস্থা ঃ

গুহা হইতে বাহির হইয়া মদিনা যাত্রা করিতে বিশেষ বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন এবং সতর্কতার জন্য মক্কাবাসীদের পরিকল্পনা-সঙ্কল্প ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে অবগত থাকা আবশ্যক, নতুবা বাহির হইবার সুযোগ-সুবিধা কিভাবে নিরূপণ করা হইবে?

---

* সমালোচনা ঃ—মোস্তফা-চরিত গ্রন্থে মাকড়সার ঘটনাকে অগত্যা স্বীকার করা হইয়াছে, কিন্তু স্বাভাবিক ও মামুলীরূপে। বলা হইয়াছে—মাকড়সা দুনিয়াময় জাল বুনিয়া বেড়াইতে পারে, এখানে পারিবেনা কেন? আর কবুতরের ঘটনাকে অপ্রমানিক প্রচলিত গল্প বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে এবং অবিশ্বাস্য আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

বস্তুতঃ অস্বাভাবিক—নবীর মোজেযাকেও স্বীকার না করার ভূতের আছরেই এই সব প্রলাপ। নতুবা মোস্তফা-চরিত সহ সর্ব্বস্তরের সঙ্কলনেই যে সব সীরত বা চরিত-গন্থাবলী হইতে শত শত বর্ণনা সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং হইয়া থাকে সেইরূপ সব গ্রন্থাবলীতেই মাকড়সা ও কবুতর উভয়ের ঘটনাই বর্ণিত আছে এবং অস্বাভাবিক ঘটনারূপেই উল্লেখ হইয়াছে।

আবুবকর (রাঃ) এই প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার এক পুত্র ছিলেন আবদুল্লাহ (রাঃ), তিনি ছিলেন অত্যন্ত চালাক-চতুর, গভীর জ্ঞানী ও সূক্ষ্ম কৌশলী যুবক। তিনি সারাদিন মক্কায় খোঁজ করিয়া বেড়াইতেন— নবীজী (দঃ) এবং আবুবকর (রাঃ) সম্পর্কে কোথায় কি আলোচনা হইতেছে, কি সঙ্কল্প-পরিকল্পনা করা হইতেছে। সকল প্রকার সংবাদ ও তথ্য অবগত হইয়া তিনি রজনীর গভীর অন্ধকারে ছৌরগুহায় আসিতেন এবং সব তথ্য ও সংবাদ নবী (দঃ) ও আবুবকর (রাঃ) সমীপে ব্যক্ত করিতেন। তিনি গুহার ভিতরেই রাত্রি যাপন করিতেন, কিন্তু প্রভাতে আলো ছড়াইবার পূর্ব্বেই অন্ধকারের মধ্যে তিনি মক্কা নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন; যেন তিনি নগরেই রাত্র কাটাইয়াছেন। কেহ যেন ভাবিতেও না পারে যে, রাত্রে তিনি অন্য কোথাও গিয়াছিলেন। এইভাবে প্রতিদিন তিনি সমুদয় তথ্য ও সংবাদ মক্কা নগরী হইতে গুহায় সরবরাহ করিয়া থাকিতেন।

যান-বাহনের ব্যবস্থা ঃ

মক্কা নগরী হইতে ছৌরগুহা পর্য্যন্ত ত নবী (দঃ) ও আবুবকর (রাঃ) পদব্রজেই আসিয়াছিলেন। গুহা হইতে মদিনা গমন ত বাহন ব্যতিরেকে সম্ভব হইবে না, তাই আবুবকর (রাঃ) উহারও সুব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন।

নবীজী (দঃ) মোসলমানদিগকে মদিনায় হিজরত করার জন্য ব্যাপকভাবে উৎসুক করিয়া তুলিতেছেন, আবার আবুবকর (রাঃ)কে অপেক্ষা করিতে বলিতেছেন। এই সব ইঙ্গিতে আবুবকর (রাঃ) চার মাস পূর্ব্বেই উত্তম দুইটি উট সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন; উটদ্বয়কে ভালভাবে ঘাস-পাতা খাওয়াইয়া মোটা-তাজা শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছিলেন।

পার্ব্বত্য মরু অঞ্চলে দূর দেশের পথ চলা কঠিন কাজ; দিক ও পথ নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার; উহার জন্য বিশেষজ্ঞ পারদর্শী লোক আছে। ঐরূপ অঞ্চলে কাফেলা চলার জন্য সেই লোকের বিশেষ প্রয়োজন। বাড়ী হইতে যাত্রার অনেক পূর্ব্বেই আবুবকর (রাঃ) সেইরূপ একজন অতি পারদর্শী লোককে সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার নাম ছিল আবদুল্লাহ-ইবনে-ওরায়কীৎ; সে তখন ত কাফের ছিলই পরেও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু খাঁটী ব্যবসায়ীর ধর্ম্ম এবং যুগের বৈশিষ্ট্য হিসাবে আবুবকর (রাঃ) এবং নবীজী (দঃ) উভয়েই তাহাকে নির্ভরশীল গণ্য করিয়াছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত সে পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়ার উত্তম পরিচয়ই দিয়াছে। আবুবকর (রাঃ) হিজরতের জন্য তৈরী উটদ্বয় ঐ ব্যক্তির নিকট অর্পণ করিয়া রাখিলেন এবং তাঁহাদের পরিকল্পনা মতে তাহাকে বলিয়া দিলেন, (যাত্রা করার বুধবার দিবাগত রাত্রির পরবর্ত্তী)

তিন রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর উটদ্বয় লইয়া তুমি ছৌরপর্ব্বত গুহার নিকটে যাইবে। সেমতে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রি, শুক্রবার দিবাগত রাত্রি এবং শনিবার দিবাগত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেলে রবিবার প্রভাতের দিকে সে উটদ্বয় লইয়া ছৌর পর্ব্বত এলাকায় পৌছিল এবং রবিবার দিনটা অতিবাহিত হইয়া সোমবারের রাত্র আরম্ভে নিস্তব্ধতা নামিয়া আসিলে সে উটদ্বয়কে ছৌরগিরিগুহার দ্বারে উপস্থিত করিল।

গিরিগুহা হইতে মদিনার পানে ঃ

নবীজী (দঃ) ও আবুবকর (রাঃ) বৃহস্পতিবার (দিনের পূর্ব্ব) রাত্রে গৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন ; আজ রবিবার চতুর্থ দিন অতিবাহিত হইয়াছে। মক্কার কাফেররা তাহাদের সাধ্যমতে খোঁজাখোঁজি করিয়া নিরাশ হইয়াছে। এখন তাহারা ভাবিয়াছে, শিকার আমাদের নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, তাই তাহারা পথে-ঘাটে খোঁজ করা হইতে ক্ষান্ত ও নিবৃত্ত। নবীজী (দঃ) ও আবুবকর (রাঃ) গিরিগুহায় তিনটি রাত্র তিনটি দিন লুকাইয়া থাকার কষ্ট এই সুযোগের অপেক্ষায়ই সহ্য করিয়া ছিলেন। তাঁহাদের পরিকল্পনার সঠিক ফল ফলিয়াছে, তাই আজ রবিবার দিবাগত সোমবার রাত্রের অন্ধকার নামিয়া আসিলে তাঁহারা গিরিগুহা হইতে বাহির হইয়া মদিনার পানে যাত্রা করিলেন। আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মুক্ত দাস আমের ইবনে ফোহায়রা (রাঃ) পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ অনুযায়ী সময় মতে উপস্থিত হইয়াছেন ; খেদমত ও সেবার জন্য তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে যাত্রা করিলেন। নবীজী (দঃ), আবুবকর (রাঃ), আমের ইবনে ফোহায়রা (রাঃ) এবং পথ-প্রদর্শক আবদুল্লাহ—এই চারজনের ক্ষুদ্র কাফেলা মদিনার পানে যাত্রা করিল। নবীজী (দঃ) একা একটি উটের উপর, আবুবকর (রাঃ) ও আমের (রাঃ) একত্রে অপর উটটির উপর, আর আবদুল্লাহ তাহার নিজস্ব ব্যবস্থায় পথ চলা আরম্ভ হইল। মক্কা-মদিনার পথিকরা সাধারণতঃ যে পথ দিয়া যাতায়াত করে সে পথে চলা মোটেই নিরাপদ নহে, তাই পথপ্রদর্শক আবদুল্লাহ কাফেলা লইয়া লোহিত সাগরের উপকূলীয় পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।*

---

* নবীজীর হিজরত পথের বিশ্রামাগার বা মঞ্জিলগুলি বর্ত্তমানে অপরিচিত। উহার মধ্যে "রাবেগ" নামক স্থানটি অবশ্য সেই মহাযাত্রার পথের আংশিক সন্ধান প্রদান করে। রাবেগ স্থানটি বর্ত্তমান মক্কা-মদিনার পথেও একটি প্রসিদ্ধ মঞ্জিল। তথা হইতে লোহিত সাগরের আবছায়া পরিদৃষ্ট হয়। যেই যুগে মক্কা-মদিনার নগর-নগরীতে মৎস দেখা যাইত না তখনও রাবেগ মঞ্জিলে সামুদ্রিক মৎস উপভোগ করা যাইত ; যদ্দরুণ বাংলাদেশী হাজীগণ মক্কা-মদিনার পথে রাবেগ মঞ্জিলের অপেক্ষায় তাকাইয়া থাকিতেন।

হিজরত প্রসঙ্গে চিরস্মরণীয় ব্যক্তিবর্গ ঃ

জগতে কোন মহৎ কার্য্য সমাধা করিবার আয়োজন পর্ব্বে যাঁহার উপর উহার ভার ন্যস্ত হয় আল্লাহ তায়ালা তাঁহার জন্য যোগ্য সহচর ও সহকর্ম্মী মনোনীত করিয়া থাকেন। ইসলামের গৌরব ও উন্নতি সাধণের প্রত্যেক অধ্যায়ে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণের ভূমিকা এই সত্যের উজ্জ্বল নমুনা।

ইসলামের শুধু রক্ষাই নহে, বরং চরম উন্নতির সোপান ছিল মদিনায় হিজরত। এই মহান হিজরতের আয়োজনকে যাঁহারা ধৈর্য্য, সাহস, দুরদর্শিতা, আত্মত্যাগ ও সুকৌশলের সহিত এবং জীবনের উপর ঝুঁকি লইয়া নীরবে নীরবে সফল ও অসম্ভব করিয়া তুলিয়া ছিলেন তাঁহাদের নাম ইসলামের ইতিহাসে এবং মোসলেম জাতির হৃদয়-কোষ্ঠে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ--

(১) আবুবকর (রাঃ)—তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষেত্রে ইসলামের জন্য, সত্যের জন্য, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য নিজের জান-মাল সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া থাকিতেনই। তাঁহার ন্যায় অনুরক্ত সুহৃদ ভক্ত জগতে দুর্ল্ভ। হিজরত আয়োজনে এবং এই মহাযাত্রাকে সফল করিয়া তুলিতে তাঁহার ত্যাগ ও দান ছিল অপরিসীম। প্রাণের দুলালী কিশোরী আয়েশা এবং সন্তান সম্ভাবা তরুণী কন্যা আস্‌মা সহ স্বজনকে কোরেশ শত্রুদের মধ্যে ফেলিয়া নিজে মৃত্যুর বিভিষীকা-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। মক্কা হইতে মদিনায় পরিবহণের ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই সম্পন্ন করিয়া রাখিলেন—চার মাস পূর্বেই দুইটি উট ক্রয় করিয়া পোষণ করিলেন।

নবীজীর একটি মহান আদর্শ ঃ

আবুবকর (রাঃ) পরিবহণ উদ্দেশ্যে নিজের জন্য একটি এবং নবীজীর জন্য একটি—দুইটি উট চার মাস পূর্বে ক্রয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। নবীজী (দঃ) হিজরতের অনুমতি লাভ আবুবকরের গোচরে আনিলে তিনি বলিলেন, আমার মাতা-পিতা আপনার চরণে উৎসর্গ—এই বাহনদ্বয়ের একটি আপনি গ্রহণ করুন। নবীজী (দঃ) বলিলেন, মূল্য দানে আমি এই উট গ্রহণ করিতে পারি অন্যথায় নহে। নেতা, হাদী ও জাতির পরিচালক হওয়ার জন্য কত বড় মহান আদর্শ। যে, নিজকে ভক্তগণের আর্থিক প্রভাব হইতে অতি সাবধানে মুক্ত রাখিবে, অপর দিকে নিজের জন্য কোন ভক্তের উপর আর্থিক চাপ ফেলিবে না। কত মূল্যবান শিক্ষা ও মহান আদর্শ ছিল ইহা।

আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ইসলামের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনে চল্লিশ হাযার দেরহাম ব্যয় করিয়াছিলেন।

তাঁহার সেই সব ব্যয় নবীজী (দঃ) সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এহেন ভক্তের দানও এইরূপ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নবীজী (দঃ) এড়াইয়া চলিয়াছেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নবীজী মোস্তফা (দঃ) এই আদর্শই দেখাইয়াছেন ও শিক্ষা দিয়াছেন। আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—"মৃত্যুর পূর্বে নবী (দঃ) নিজ পরিবারের আহার যোগাইতে নিজের লৌহবর্ম্ম এক ইহুদীর নিকট বন্ধক রাখিয়া (দুই বা) তিন মণ খাদ্য তাহার হইতে বাকি ক্রয় করিয়াছিলেন। এমনকি নবীজীর মৃত্যু সময় তাঁহার সেই লৌহবর্ম্ম ঐ ইহুদীর নিকট বন্ধক অবস্থায় ছিল (বোখারী শরীফ ৬৪১ পৃঃ)।

অর্থিক অনটনে নবী (দঃ) ভক্তবৃন্দ ছাহাবীগণের নিকট হইতে ধার লইতে পারিতেন বা তাঁহাদের কাহারও নিকট হইতে ঐ খাদ্য ধারে ক্রয় করিতে পারিতেন সে ক্ষেত্রে লৌহবর্ম্ম বন্ধক রাখিতে হইত না। কিন্তু নবীজী মোস্তফা (দঃ) তাহা করেন নাই, এমনকি ভক্তবৃন্দকে তাঁহার এইরূপ অনটন জ্ঞাতও হইতে দেন নাই; মৃত্যু-শয্যায়ও এই আদর্শ হইতে তিনি বিচ্যুত হন নাই। নবী (দঃ) ভাবিয়াছেন, ভক্তবৃন্দ তাঁহার এই অনটন বুঝিতে পারিলে তাঁহারা ব্যস্ত হইবে—উহা পূরণ না করিয়া ক্ষান্ত হইবে না এবং কাহারও উপর তাহা অতিরিক্ত বোঝা হইতে পারে। এমনকি ধারে ক্রয় করিতেও এক ইহুদীর নিকট গিয়াছেন এবং বন্ধক রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন; কোন ভক্তের নিকট হইতে ধারে ক্রয় করেন নাই। কারণ, কোন ভক্ত এই ক্ষেত্রে মূল্য গ্রহণ করিবে না, অথচ ইহা তাঁহার পক্ষে বোঝা হইতে পারে। কী অতুলনীয় আদর্শ ছিল নবীজীর! চিরজীবন তিনি এই শ্রেণীর সোনালী আদর্শেরই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন স্বীয় কার্য্যের মাধ্যমে—শুধু বচনে নয়।

আলোচ্য উটটি চারশত দেরহামে আবুবকর (রাঃ) ক্রয় করিয়া ছিলেন; নবীজী মোস্তফা (দঃ) সেই মূল্যেই উহা গ্রহণ করিলেন। এই উটটি নবীজীর অবশিষ্ট জীবনে "কাছ্ওয়া" বা "জাদ্আ" নামের বাহন ছিল, অনেক অলৌকিক ঘটনা উহার সহিত বিজড়িত। নবীজীর তিরোধানের পরও উহা জীবিত ছিল, অবশ্য কেহ উহাকে ব্যবহার করিত না, মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করিয়া বেড়াইত, খলীফা আবুবকরের আমলে উহার মৃত্যু ঘটে। (যোরকানী, ১—৩২৮)

নবীজী (দঃ) এবং আবুবকর (রাঃ) রাত্রিবেলা গৃহ হইতে বাহির হইয়া পদব্রজেই ছৌর পর্ব্বত পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিলেন, এমনকি পায়ে জুতাও ছিল না। নবীজী মোস্তফা (দঃ) প্রস্থরময় পার্ব্বত্য পথে খালি-পায়ে চলায় তাঁহার পদদ্বয় রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছিল। আবুবকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, গুহায় পৌছিয়া চরণযুগলের রক্তধারা দৃষ্টে আমি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলাম।

ছৌর পর্ব্বত এক মাইলের অধিক উচু; নবীজী (দঃ) হাঁটিয়া তাঁহার অত্যধিক ক্লান্তি নিশ্চয় আসিয়াছে, তদুপরি চরণযুগলের ঐ অবস্থা, তাই পর্ব্বতারোহনে

নবীজী (দঃ) স্থানবিশেষে অপারগ হইয়া পড়িতেন। ঐ অবস্থায় আবুবকর (রাঃ) নবীজী (দঃ)কে স্বীয় কাঁধে বহন করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিতেন। নবীজী মোস্তফা (দঃ)কে ঘোড়া, উট, খচ্চর এবং গাধাও বহন করিয়াছে এবং তাঁহার প্রত্যেকটি বাহনই সেই বদৌলতে নিজ নিজ শ্রেণী ও জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। তদ্রূপ আবুবকর (রাঃ) ঐরূপ সঙ্কটাবস্থায় নবীজীর বাহন হইতে পারিয়া মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভে ধন্য হইয়াছেন। আবুবকরের এই শ্রেণীর ত্যাগ ও সেবাকে স্বয়ং নবীজী (দঃ) যেই ভাষায় স্বীকৃতি দিয়াছেন উহা চিরদিন আবুবকর রাজিয়াল্লাহু আনহুর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। নবীজী (দঃ) বলিয়াছেন—

مَا لِاَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ اِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا خَلَا اَبَا بَكْرٍ فَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا

يَدًا يُكَافِئُهُ اللّٰهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ -

"আমার প্রতি যত মানুষের উপকারই রহিয়াছে প্রত্যেককেই আমি উহার প্রতিদান দিয়াছি একমাত্র আবুবকর ব্যতীত। আমার প্রতি তাঁহার এরূপ উপকার রহিয়াছে যাহার প্রতিদান আল্লাহ তাআলাই কেয়ামত দিবসে পূর্ণ করিবেন।" (তিরমিজী শরীফ)

(২) আলী (রাঃ)—হিজরতের আয়োজন সফল করার মধ্যে তাঁহারও ত্যাগ ও অবদান ছিল অনেক বেশী। যেই শয্যায় রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মৃত্যুকে কাফেররা একরূপ অবধারিত করিয়া রাখিয়াছিল সেই শয্যার উপর স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে দেহ পাতিয়া রাখিয়াছিলেন আলী (রাঃ)। এমনকি নবীজীরই চাদরখানাও মুড়ি দিয়া ভেল্কি লাগাইয়া রাখিয়াছিলেন অবরোধকারী ঘাতকদের চোখে। কত বড় আত্মত্যাগ ও অসীম সাহসের চরম দৃষ্টান্ত ছিল ইহা। যে কোন মুহূর্ত্তে তাঁহার উপর অবরোধকারী ঘাতকদের তরবারি পতিত হইতে পারিত; কারণ, ঘাতকদল তাঁহাকেই নবীজী ভাবিয়া কড়া দৃষ্টিতে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল গৃহকে।

(৩, ৪) আস্‌মা (রাঃ) ও আয়েশা (রাঃ); পিতা তাঁহাদেরে ঘোর বিপদে শত্রুর মধ্যে ফেলিয়া পাড়ি দিলেন মৃত্যুর পথে। এই দুশ্চিন্তায় তাঁহাদের হৃদয়ে কী চাঞ্চল্য সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক তাহা সকলেরই বোধগম্য। কিন্তু তাঁহারা আদর্শ মোসলেম রমণীরূপে জন্মিয়াছিলেন ধরাপৃষ্ঠে। তাই তাঁহারা একবিন্দুও অধীর হইলেন না। বরং সেই চরম দুর্ভাবনার মধ্যে নবীজী ও পিতার জন্য পাথেয়াদি প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তাঁহাদের হাবভাবেও কেহ ঘুণাক্ষরে বুঝিতে পারিল না— কিসের আয়োজন করিতেছেন তাঁহারা। কোথাও যদি বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটিত তবেই সব আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যাইত—এই মহাযাত্রা হয়ত সম্ভব হইত না।

(৫) আবুবকর তনয় আবদুল্লাহ (রাঃ); তিনি নিজ প্রাণের উপর ঝুঁকি লইয়া প্রত্যহ মক্কার সমুদয় সংবাদ ও খবর পৌঁছাইয়াছেন নিভৃত ছৌরগুহায়। উহার উপর ভিত্তি করিয়াই তিন দিন তিন রাত্র পরে বাহির হইয়াছেন নবীজী (দঃ) ও আবুবকর (রাঃ) গুহা হইতে মদিনার পানে।

(৬) আবুবকরের মুক্ত দাস আমের ইবনে ফোহায়রা (রাঃ); তিনি প্রত্যহ ঐ নিভৃত গুহায় আহার পৌঁছাইবার গোপন ব্যবস্থা করিয়া থাকিতেন।

ধন্য আবুবকর (রাঃ), আলী (রাঃ) ও আবুবকর-পরিবার যে, তাঁহাদেরই আত্মত্যাগ, লক্ষ্য ও আদর্শের একমুখিতা এবং তাঁহাদের মনোবল ও কর্ম্মকৌশল ইত্যাদি গুণাবলীর সমাবেশেই শত্রুদের বেষ্টন ভেদ করিয়া আল্লার রসুলের আশ্রয়স্থলে যাওয়া সম্ভব হইয়াছিল। কেয়ামত পর্য্যন্ত সকল মোসলমান তাঁহাদের নিকট ঋণী হইয়া থাকিবে।

হিজরত পর্বের এই পর্য্যন্ত বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়াবলীর মৌলিক বর্ণনা সম্বলিত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত একখানা হাদীছ নিম্নে তরজমা করা হইল। হাদীছখানা অতি দীর্ঘরূপে বোখারী (রঃ) ৫২২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় কতিপয় ঘটনা একত্রে সমাবেশিত আছে। পাঠকদের সুবিধার জন্য আমরা প্রত্যেক ঘটনার অংশ ভিন্ন ভিন্ন নিজ নিজ স্থানে তরজমা করিয়াছি। নবুয়তের পঞ্চম বৎসর—আবিসিনিয়ায় হিজরত পরিচ্ছেদ "আবুবকরের আবিসিনিয়ায় হিজরত যাত্রা" আলোচনায় প্রথম অংশের তরজমা হইয়াছে। এস্থানে দ্বিতীয় অংশের তরজমা দেওয়া হইল—

১৭০৩। হাদীছ :—(৫২৩ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মোসলমানদিগকে বলিতে লাগিলেন, তোমাদের হিজরত করিয়া যাওয়ার স্থানটি আমাকে স্বপ্নে দেখান হইয়াছে—তথায় খেজুর বাগানের আধিক্য রহিয়াছে এবং উহার উভয় পার্শ্বে কাঁকরময় ময়দান বিদ্যমান। মদিনার এলাকাটি উক্ত উভয় গুণেরই বাহক। সেমতে অনেক মোসলমানই মদিনায় হিজরত করিয়া গেলেন, এমনকি যাঁহারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদেরও অধিকাংশই মদিনায় চলিয়া গেলেন। আবুবকর (রাঃ)ও মদিনায় হিজরত করিয়া যাওয়ার প্রস্তুতি করিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে একটু থামিয়া যাইতে বলিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে, আমি আশা করিতেছি, আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে আমাকেও হিজরতের অনুমতি প্রদান করা হইবে। আবুবকর (রাঃ) হযরতের চরণে স্বীয় উৎসর্গতা পেশ করতঃ আশ্চর্য্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি সত্যই ঐরূপ আশা পোষণ করিতেছেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ। এতচ্ছ্রবণে আবুবকর (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সহযাত্রী হওয়ার উদ্দেশ্যে হিজরত করা মুলতবী রাখিলেন এবং হিজরত উদ্দেশ্যে তাঁহার

সংগৃহীত বিশেষ দুইটি উটকে ভালভাবে বাবুল পাতা খাওয়াইয়া পোষণ করিয়া রাখিলেন—এই অবস্থায় চার মাস কাটিল।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা দ্বিপ্রহরের সময় আমার পিতা আবুবকরের গৃহে আমরা বসিয়াছিলাম এমতাবস্থায় আমাদের একজন আবুবকর (রাঃ)কে সংবাদ দিল, ঐ দেখুন! (আপনার গৃহাভীমুখে) রসুলুল্লাহ (দঃ); (দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রের কারণে) তিনি তাঁহার সম্পূর্ণ মাথা কাপড়ে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এরূপ দ্বিপ্রহরে ইতিপূর্ব্বে আমাদের গৃহে কখনও তিনি আসেন নাই। আবুবকর (রাঃ) খবরটা শুনা মাত্র চমকিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, আমার পিতা-মাতা সর্ব্বস্ব তাঁহার চরণে উৎসর্গ—তিনি নিশ্চয় কোন বিশেষ কারণে এই অসময়ে আমার গৃহে তশরীফ আনিতেছেন।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, ইতিমধ্যেই হযরত (দঃ) গৃহদ্বারে আসিয়া পৌছিলেন এবং প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। তৎক্ষাণাৎ স্বাদর সম্ভাষণ জানান হইল। হযরত (দঃ) গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং আবুবকর (রাঃ)কে বলিলেন, ঘর হইতে লোকজন বাহির করিয়া দেওয়া হউক। আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, একমাত্র আপনার স্বজনগণই গৃহে আছেন, অন্য কেহ নাই। হযরত (দঃ) বলিলেন, বিশেষ খবর এই যে, মক্কা হইতে হিজরত করিয়া যাওয়ার অনুমতি আমাকে প্রদান করা হইয়াছে। আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, আপনার চরণে আমার মাতা-পিতা সর্বস্ব উৎসর্গ—আপনি সঙ্গী গ্রহণ করিতে ইচ্ছা রাখেন কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ। আবুবকর বলিলেন, আমার জনক-জননী আপনার চরণে উৎসর্গ—আপনি আমার উটদ্বয় হইতে একটি কবুল করুন। হযরত (দঃ) বলিলেন, কবুল করিলাম, কিন্তু মুল্যের বিনিময়ে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমরা তাঁহাদের জন্য তাড়াহুড়ার মধ্যে কিছু পাথেয় বা পথ-সম্বলের ব্যবস্থা করিলাম এবং কিছু খাদ্য বস্তু একটি থলিয়ার মধ্যে ভরিয়া দিলাম। (আয়েশার ভগ্নি) আস্‌মা (রাঃ) কমর-বন্ধের কাপড় খানা হইতে এক অংশ ফাড়িয়া নিয়া উহা দ্বারা ঐ থলিয়ার মুখ বাঁধিয়া দিলেন। (তিনি যে, আল্লার রসুলের খেদমতের জন্য স্বীয় কমর-বন্ধ চিরিয়া দুই টুকরা করিয়াছিলেন সেই ঘটনা চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে,) ঐ সুত্রেই তাঁহাকে "জাতুন্‌-নেতাকাইন্‌"—"দুই কমর-বন্ধ-ওয়ালী" বলা হইয়া থাকে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, (রাত্রিবেলা) হযরত (দঃ) এবং আবুবকর (রাঃ) উভয়ে গোপনে গৃহ ত্যাগ করতঃ ছৌর পর্বতের গুহায় পৌঁছিলেন এবং তথায় তিন রাত্র লুকাইয়া থাকিলেন। আবুবকরের একটি ছেলে ছিল আবদুল্লাহ—সে ছিল যুবক এবং অতিশয় চালাক চতুর। সে সারা রাত্রি ঐ পর্বতগুহায় তাঁহাদের নিকট থাকিত, কিন্তু প্রভাতে অন্ধকার থাকিতেই মক্কা নগরীতে আসিয়া যাইত, যেন

সে মক্কার ভিতরেই রাত্রি যাপন করিয়াছে। হযয়ত (দঃ) ও আবুবকর (রাঃ) সম্পর্কে কাফেররা যত কিছু ষড়যন্ত্রমূলক ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করিত সবকিছুর সংবাদ আবদুল্লাহ রাত্রিবেলা তাঁহাদিগকে অবগত করিয়া আসিত। আবুবকরের একজন ক্রীতদাস ছিল "আমের ইবনে ফোহায়রাহ্" সে বকরীর দল চরাইয়া ঐ পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী লইয়া যাইত এবং রাত্রির অন্ধকার আসিয়া গেলে দুগ্ধ তাঁহাদিগকে পৌঁছাইত, তাঁহারা ঐ দুগ্ধের উপর রাত্রি যাপন করিতেন। আমের-ইবনে ফোহায়রা রাত্রির অন্ধকার থাকিতেই বকরি লইয়া তথা হইতে মক্কা নগরীতে চলিয়া আসিত—প্রত্যহই সে এইরূপ করিত। এতদ্ভিন্ন হযরত (দঃ) এবং আবুবকর (রাঃ) একজন সুবিজ্ঞ পথ প্রদর্শকও পূর্ব হইতেই মজুরীর উপর ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং উভয়ের যানবাহন তাহার হাওয়ালা করিয়া দিয়া তাহাকে তিন রাত্র পর ছৌর পর্বতের নিকট উপস্থিত হইতে বলিয়া দিয়াছিলেন। ঐ ব্যক্তি কাফেরই ছিল, কিন্তু তাহার উপর তাঁহাদের আস্থা ছিল।

নির্দ্ধারিত ব্যবস্থানুযায়ী তিনটি রাত্র অতিবাহিত হইয়া তৃতীয় রাত্রের প্রভাতেই সেই ব্যক্তি উটদ্বয় লইয়া সেই এলাকায় উপস্থিত হইল, (অবশ্য দিন অতিবাহিত হইবার পর রাত্রিবেলা সুযোগমতে) হযরত (দঃ) ও আবুবকর (রাঃ) পর্বতগুহা হইতে বাহির হইয়া মদিনার পথে রওয়ানা হইলেন। ক্রীতদাস আ'মের ইবনে ফোহায়রাহ্ এবং পথ প্রদর্শক ব্যক্তিও তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। পথ প্রদর্শক ব্যক্তি তাঁহাদিগকে (সাধারণ চলাচলের পার্বত্যপথে অগ্রসর না করিয়া লোহিত সাগরের) উপকূলবর্ত্তী পথে পরিচালিত করিল।

১৭০৪। হাদীছ ঃ—(৫৫৫) আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এবং আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জন্য (হিজরতের সময়) রাস্তায় খাইবার কিছু খাদ্য তৈয়ার করিলাম এবং উহা একটি থলিয়ার মধ্যে রখিলাম। থলিয়ার মুখ বাঁধিবার জন্য আমি আমার আব্বা আবুবকর (রাঃ)কে বলিলাম যে, বাঁধিবার কিছু পাইতেছি না, একমাত্র আমার কমর বাঁধিবার কাপড়টা আছে। আব্বা বলিলেন, উহাকেই দুই খণ্ড করিয়া নেও। আমি তাহাই করিলাম (এবং এক খণ্ড আমার কমরবন্ধের কাজে রাখিলাম, অপর খণ্ডের দ্বারা ঐ খাদ্যের থলিয়ার মুখ এবং পানির মশকের মুখ বাঁধিয়া দিলাম।) সেই সূত্রেই আমাকে দুই কমরবন্ধওয়ালী বলা হইয়া থাকে।

আবুবকরের সদা সতর্কতা ঃ

আবুবকর (রাঃ) বহিরাঞ্চলে নবীজী (দঃ) অপেক্ষা অধিক পরিচিত ছিলেন। কারণ, তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন; দেশবিদেশের লোকদের সহিত তাঁহার

পরিচয় হইত। সেমতে হিজরত-পথে এমন লোকদের সহিত সাক্ষাৎ হইত যাহারা আবুবকর (রাঃ)কে চিনিত, কিন্তু নবী (দঃ)কে চিনিত না। ঐরূপ কোন কোন লোক আবুবকর (রাঃ)কে নবী (দঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিত—আপনার অগ্রবর্ত্তী লোকটি কে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে আবুবকর (রাঃ) বলিতেন, هذا الرجل يهدينى السبيل "এই ব্যক্তি আমাকে পথ-প্রদর্শন করিয়া থাকেন।"

প্রশ্নকারী ভাবিত, দুনিয়ার পথ প্রদর্শক, আর আবুবকর (রাঃ) আখেরাতের পথ উদ্দেশ্য করিতেন। এইভাবে নবীজীর পরিচয় গোপন থাকিয়া যাইত—যাহার অত্যধিক প্রয়োজন ছিল ঐ সময়, অথচ আবুবকর (রাঃ)কে মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইত না। মিথ্যার আশ্রয় না লইয়া নবীজীর পরিচয় গোপন রাখার এক কৌশল ছিল ইহা। এই শ্রেণীর কৌশলকে শরীয়ত মতে "তৌরিয়া" বলা হয়। কাহারও কোন ক্ষতি না হয়—শুধু নিজের স্বার্থ রক্ষায় ঐরূপ কৌশল অবলম্বন জায়েয আছে; ইহাকে ধোকা বলা যাইবে না। অবশ্য এইরূপ কৌশলে কাহারও ক্ষতি হইলে তাহা ধোকা গণ্য হইবে এবং নাজায়েয হইবে।

মদিনার পথে বিপদ ঃ

মক্কার মোশরেকরা নবীজীকে অনেক খোঁজিয়াও যখন পাইল না তখন তাহারা অন্য এক কৌশল অবলম্বন করিল। তাহারা সর্বত্র ঘোষণা জারি করিয়া দিল—মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) ও আবুবকরকে বন্দী বা নিহত করিতে পারিলে কোরেশরা উভয়ের প্রত্যেকের বিনিময়ে এক একশত উট পুরস্কার প্রদান করিবে। এই ঘোষণা তাহারা বিভিন্ন দলপতি এবং বিশিষ্ট লোকদের নিকটও বিশেষভাবে পৌঁছাইল।

কাফের মোশরেকরা ত নবীজীর সর্বদার শত্রু আছেই, তদুপরি দুইশত উটের লালসা; অতএব নবীজী ও আবুবকরকে পাইবার প্রতি তৎকালীন আরবীয় দস্যু প্রকৃতির লোকদের কিরূপ আগ্রহ হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

আরবেরই "বনু-মোদ্‌লাজ" গোত্র; কোরেশরা তাহাদের নিকটও লোক পাঠাইয়া উক্ত ঘোষনার সংবাদ পৌঁছাইল। ঐ গোত্রেরই এক দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তি ছোরাকাহ ইবনে মালেক; ঐ ঘোষনার সংবাদ সেও অবগত ছিল। একদিন তাহারই বংশীয় একজন লোক হঠাৎ বহুদূর হইতে নবীজীর কাফেলাকে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে অবহিত করিল। ছোরাকাহ দুই শত উটের পুরস্কার একা লাভ করার উদ্দেশ্যে কৌশলের সহিত গোপনে অস্ত্র লইয়া কাফেলার পেছনে ধাওয়া করিল।

আবুবকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ছোরাকাহ যখন আমাদের অতি নিকটবর্ত্তী আসিয়া গেল তখন আমি অস্থির হইয়া বলিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ। আমাদের পেছনে

ধাওয়াকারী আমাদেরকে পাইয়া ফেলিল! এই কথা বলিয়া আমি কাঁদিয়া দিলাম। নবীজী (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাঁদ কেন? আমি আরজ করিলাম, আমার জীবনের জন্য কাঁদি না, আপনার চিন্তায় কাঁদিতেছি। নবী (দঃ) সম্পূর্ণ শান্ত অবিচল, কিন্তু আমার হতাশা দৃষ্টে আল্লাহ তায়ালার দরবারে ফরিয়াদ করিলেন—

اَللّٰهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ اَللّٰهُمَّ اصْرَعْهُ

"হে আল্লাহ! তাহার বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষ হইতে তুমিই যথেষ্ট হইয়া যাও। হে আল্লাহ তাহাকে পাছাড়ে-পতিত কর।" অমনি তাহার ঘোড়ার পা উহার পেট পর্য্যন্ত পাবর্ব্ত্য পাথর-জমিতে গাড়িয়া গেল। সে ব্যাপারটা ভালরূপেই বুঝিতে পারিল। তাই সে চীৎকার করিয়া বলিল, নিশ্চয় আপনাদের বদদোয়ায় আমার এই বিপদ আসিয়াছে। আমার জন্য দোয়া করুন—আমি মুক্তি পাইয়া যাই। আমি আপনাদের কোন ক্ষতি করিব না, বরং আপনাদের হইতে শত্রু বিতাড়নের সাহায্য করিব। হযরত (দঃ) তাহার মুক্তির জন্য দোয়া করিলেন এবং তাহাকে কথা বলার সুযোগ দানে দাঁড়াইলেন।

ছোরাকাহ নিজেই বর্ণনা করিয়াছে, ঐ সময়ই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) জয়ী হইবেন। আমি তাঁহাদিগকে তাঁহাদের প্রতি লোকদের বিষাক্ত মনোভাব জ্ঞাত করিলাম এবং আমার বিভিন্ন বস্তু সামগ্রী পাথেয় ইত্যাদি গ্রহণের অনুরোধ করিলাম; তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। এমনকি আমি বলিলাম, অমুকস্থানে আমার মেষপাল রহিয়াছে আপনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী উহা হইতে নিয়া যাইবেন। নবীজী (দঃ) বলিলেন, আমার প্রয়োজন হইবে না। তিনি আমাকে শুধু এই বলিলেন যে, আমাদের সংবাদ গোপন রাখিও! আমার অভিপ্রায়মতে তিনি একটি চামড়া খণ্ডে আমার জন্য নিরাপত্তা-পত্রও লিখিয়া দিলেন। ঘটনার মূল ব্যক্তি ছোরাকা ইবনে মালেকের ভ্রাতার মাধ্যমে ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুর রহমান হইতে বোখারী (রঃ) নিম্নের হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন—যাহা মূল কেতাবে ১৭০৩ নং হাদীছের সঙ্গেই রহিয়াছে।

১৭০৫। হাদীছ ঃ— ছোরাকাহ্-ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের নিকট কোরায়েশ কাফেরদের প্রেরিত লোক উপস্থিত হইয়া এই সংবাদ জ্ঞাত করিল যে, কোরায়েশরা রসুলুল্লাহ এবং আবুবকরকে হত্যা বা বন্দী করার উপর (প্রত্যেকের জন্য) একশত উট পুরস্কার দানের ঘোষণা করিয়াছে।

অতঃপর একদিন আমি আমার গোত্রীয় লোকদের সঙ্গে বসিয়া খোশগল্প করিতেছিলাম তখন এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে খবর দিল যে, আমি উপকূলবর্ত্তী পথে কতিপয় পথিকের গমন লক্ষ্য করিয়াছি; আমার মনে হয় তাহারা মোহাম্মদ এবং তাহার সঙ্গীগণই হইবে। ছোরাকাহ্ বলেন, আমি তখন পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া

নিলাম যে, সেই পথিকগণ তাঁহারাই হইবেন, কিন্তু ঐ খবরদাতা ব্যক্তিকে পুরস্কার লাভের সুযোগ গ্রহণ হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রবঞ্চনা স্বরূপ বলিলাম, ঐ পথিকগণ তাঁহারা নহেন, বরং ঐ পথিকগণ হইতেছে অমুক অমুক ব্যক্তি—তাহারা একটু পূর্ব্বে আমাদের সম্মুখে ঐ পথে অগ্রসর হইয়াছে। অতঃপর আমি কিছু সময়ের জন্য খবরটার প্রতি তৎপরতা না দেখাইয়া সকলের সঙ্গে বসিয়া থাকিলাম। তারপর তথা হইতে উঠিয়া বাড়ী আসিলাম এবং আমার এক দাসীকে বলিলাম, আমার ঘোড়াটা বাড়ী হইতে বাহির করিয়া অমুকস্থানে আড়ালে নিয়া রাখ এবং আমি আমার বল্লমটাকে হাতে লইয়া বাড়ীর পেছনদিকের পথে বাহির হইলাম, এমনকি বল্লমটার ফলক নীচের দিকে রাখিয়া উহাকে শোয়াইয়া নিয়া চলিলাম। (উদ্দেশ্য গোপন রাখার জন্য এইসব ব্যবস্থা; যেন অন্য কেহ সঙ্গী হইয়া পুরস্কারের অংশীদার না হইয়া বসে।)

এইরূপ গোপনভাবে আমি আমার ঘোড়ার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং উহার উপরে আরোহণ করিয়া উহাকে দ্রুত গতিতে চালাইলাম, এমনকি অল্প সময়ের মধ্যে আমি ঐ পথিকদের নিকটবর্ত্তী পৌছিয়া গেলাম। এমতাবস্থায় আমার ঘোড়াটি হোঁচট খাইয়া গেল এবং আমি উহার পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গেলাম। তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া আমি আমার তীরদান হইতে গণন কার্য্যের তীর বাহির করিয়া গণনা করিয়া দেখিলাম, আমি আমার উদ্দেশ্যে সফলকাম হইব কিনা? গণনার ফলাফল আমার মনোবাঞ্ছা বিরোধী বাহির হইল, কিন্তু আমি গণনার ফলাফলের পায়রবী না করিয়া পুনঃ ঘোড়ায় আরোহন করিয়া উহাকে দ্রুত অগ্রসর করিলাম এবং এত নিকটবর্ত্তী হইয়া গেলাম যে, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোরআন পাঠের আওয়াজ শুনিতে লাগিলাম। তিনি কিন্তু পেছনের দিকে মোটেও তাকান না, অবশ্য আবু বকর বার বার (পেছনের দিকে আমাকে) তাকাইতেছিলেন। ইতিমধ্যেই আমার ঘোড়ার সম্মুখের পা দুইটি হাঁটু পর্য্যন্ত (পাথরীয়) জমিনের মধ্যে গাড়িয়া গেল এবং আমি উহার পৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গেলাম। অতঃপর আমি তাহাকে স্বজোরে হাঁকাইলাম, সে উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পা দুইখানা উঠাইতে সক্ষম হইতেছিলনা, অবশ্য অতি কষ্টে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম যে স্থানে তাহার পা গাড়িয়াছিল তথা হইতে ধুলাবালু ধুঁয়ার ন্যায় আকাশের দিকে উঠিতেছে। তখন পুনরায় আমি গণন কার্য্যের তীর দ্বারা গণনা করিলাম, এইবারও ফলাফল আমার মনোবাঞ্ছা বিরোধীই বাহির হইল। তখন আমি তাঁহাদের প্রতি আমার পক্ষ হইতে নিরাপত্তা দানের ধ্বনী উচ্চারণ করিলাম। সেমতে তাঁহারা দাঁড়াইলেন। আমি ঘোড়ায় আরোহন করিয়া তাঁহাদের নিকটে পৌঁছিলাম। আমি যখন তাঁহাদের নিকট

পেঁাছিতে বিপদগ্রস্ত হইতেছিলাম তখনই আমার অন্তরে এই কথাই জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আন্দোলনটা অচিরেই প্রাধান্য লাভ করিবে, তিনি নিশ্চয় জয়ী হইবেন।

অতঃপর আমি তাঁহাকে জানাইলাম যে, আপনার দেশবাসীগণ একা আপনার বিনিময়ে একশত উট পুরস্কার দানের ঘোষণা জারি করিয়াছে। আরও তাঁহাকে আমি লোকদের সমুদয় ইচ্ছা-এরাদার বিস্তারিত বৃত্তান্ত শুনাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁহাদের খেদমতে খাদ্য এবং আবশ্যকীয় চিজ-বস্তু পেশ করিলাম, কিন্তু তাঁহাদের জন্য কোন কিছুই আমার ব্যয় করিতে হইল না। তাঁহারা আমার নিকট কোন অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিলেন না, শুধু মাত্র একটি কথা হযরত (দঃ) আমাকে বলিলেন যে, আমাদের সংবাদটা গোপন রাখিও। তখন আমি হযরতের খেদমতে আরজ করিলাম যে, আমার জন্য একটি নিরাপত্তা-দানপত্র লিখিয়া দিন। হযরত (দঃ) আ'মের ইবনে ফোহায়রাকে লিখিবার আদেশ করিলেন। তিনি একটি চর্ম্ম খণ্ডে উহা লিখিয়া দিলেন। তারপর হযরত (দঃ) চলিয়া গেলেন, (আমি ফিরিয়া আসিলাম।)

ছোরাকা ইবনে মালেকের ইসলাম ঃ

ছোরাকাহ নবীজীর কাফেলাকে বিদায় দিয়া বাড়ীর পথ ধরিল। সে তাহার প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী যে কোন মানুষকে নবীজীর তালাশকারী পাইত তাহাকেই বলিত, আমি অনেক তালাশ করিয়াছি ; তোমার তালাশের প্রয়োজন হইবে না। যখন এই সংবাদ প্রচার হইয়া গেল যে, নবী (দঃ) মদিনায় পৌছিয়া সারিয়াছেন তখন ছোরাকাহ তাহার পুর্ণ কাহিনী লোকদের নিকট বর্ণনা করা আরম্ভ করিল। কিভাবে সে নবীজীর কাফেলার পেছনে ধাওয়া করিল, নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দৃঢ় মনোবল ও অবিচল ভরসা কিরূপ দেখিল এবং তাহার ঘোড়ার সমুদয় ঘটনা কিরূপ ঘটিল—এই সব সে সর্বত্র প্রচার করিতে লাগিল।

ছোরাকার বর্ণিত ঘটনাবলী সারা দেশময় ছড়াইয়া পড়িল ; কোরেশ দলপতিরা ইহাতে দুর্ভাবনায় পড়িয়া গেল যে, এইরূপ অলৌকিক ঘটনা শ্রবনে অনেক লোক মোসলমান হইয়া যাইবে। ছোরাকা একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন, তিনি বনু-মোদলাজ গোত্রের বিশিষ্ট বিত্তশালী সমাজপতি ছিলেন। তাঁহার বিবৃতিতে ইসলাম প্রসারের আশঙ্কা করিয়া আবুজহল কাব্যের মাধ্যমে তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করিল—

بَنِى مُدْلِجٍ اِنِّىْ اَخَافُ سَفِيْهَكُمْ — سُرَاقَةَ مُسْتَغْوٍ لِنَصْرِ مُحَمَّدٍ

عَلَيْكُمْ بِهٖ اَلَّا يُفَرِّقْ جَمْعَكُمْ — فَيُصْبِحَ شَتّٰى بَعْدَ عِزٍّ وَسُؤْدَدٍ

"হে বনু-মোদলাজ গোত্র! তোমাদের বোকা ছোরাকা সম্পর্কে আমার আশঙ্কা হয়, সে লোকদেরে বিভ্রান্ত করিয়া মোহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) সাহায্যের পথে আকৃষ্ট করিবে। তোমরা সতর্ক থাকিও, সে যেন তোমাদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করিতে না পারে। অন্যথায় তোমাদের বংশ তোমাদের প্রাধান্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের পর দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যাইবে।

ছোরাকাহ এই সতর্কবাণীর উত্তরে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া কবিতা প্রচার করিল—

أَبَا حَكَمٍ وَاللّٰهِ لَوْ كُنْتَ شَاهِدًا — لِأَمْرِ جَوَادِيْ إِذْ تَسُوْخُ قَوَائِمُهٗ

عَجِبْتَ وَلَمْ تَشْكُكْ بِأَنَّ مُحَمَّدًا — رَسُوْلٌ وَبُرْهَانٌ فَمَنْ ذَا يُقَاوِمُهٗ

عَلَيْكَ فَكُفَّ الْقَوْمَ عَنْهُ فَإِنَّنِيْ — إِخَالُ لَنَا يَوْمًا سَتَبْدُوْ مَعَالِمُهٗ

"হে আবুল-হাকাম (আবুজহল)। খোদার কসম—তুমি যদি উপস্থিত থাকিতে আমার ঘোড়ার ঘটনা সম্মুখে* যখন উহার পাগুলি গাড়িয়া গিয়াছিল; তবে তুমিও

---

* সমালোচনা—"মোস্তফা-চরিত" গ্রন্থের সঙ্কলক আকরম খাঁ মরহুমের কুঅভ্যাস নবীগণের মোজেযা অস্বাভাবিক ঘটনাবলী অস্বীকার করা। তাঁহার এই কুঅভ্যাসটা বাতিক রোগ অপেক্ষা অধিক নিরারোগ্য। ঐ শ্রেণীর সামান্য ঘটনার ক্ষেত্রেও তিনি তাঁহার স্বভাবকে ভুলেন না।

ছোরাকা ইবনে মালেকের আলোচ্য ঘটনায় তাহার ঘোড়ার সম্মুখ পদদ্বয় গাড়িয়া যাওয়ার চিত্রকে তিনি তাঁহার সঙ্কলনে যে ভাষায় তুলিয়া ধরিয়াছেন উহাতে তাঁহার প্রচেষ্টা একমাত্র ইহাই যে, ঘটনাটা নিছক স্বাভাবিক ছিল—উহাতে অস্বাভাবিকের কিছুই ছিল না। তাঁহার বক্তব্য এই—"ছোরাকাহ দিক বিদিক না দেখিয়া ঘোড়া ছুটাইয়াছিল, ঘোড়াটাও লম্ফন কুর্দ্দন পূর্ব্বক বাধাবিঘ্নগুলি উলঙ্ঘন করিতে করিতে তীরবেগে ছুটিয়াছিল—এই উত্তেজনা ও অসতর্কতার ফলে ঘোড়াটার সম্মুখ পদদ্বয় ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গেল।"

অস্বাভাবিক ঘটনা নবীর মোজেযাকে স্বাভাবিক বানাইবার অপচেষ্টায় খাঁ মরহুমের লম্ফন কুর্দ্দন দেখিলে হাসি আসে। ঘটনা ত বাংলা দেশের বিল অঞ্চলে কাঁদা ও নরম মাটির মধ্যে নহে যে, লম্ফন কুর্দ্দন উলঙ্ঘনে স্বাভাবিকভাবে ঘোড়ার পা ভূমিতে প্রোথিত হইয়া যাইবে; ঘটনা ত আরব দেশের পার্ব্বত্য পাথর-জমির উপর; সেখানে লম্ফন উলঙ্ঘনে ঘোড়ার পা তাহাও পেছনের পদদ্বয় নয়—শুধু সম্মুখ পদদ্বয় প্রোথিত হইয়া যাওয়ার দাবী এবং উহা স্বাভাবিকভাবে হওয়ার দাবী একমাত্র পাগলেই করিতে পারে।

সর্ব্বপরি—ঘটনার মূল ছোরাকাহ যিনি ঐ ঘোড়ার পৃষ্ঠ পরে ছিলেন তিনি তাঁহার কাব্যে উক্ত ঘোড়ার ঘটনাকে অস্বাভাবিক সাব্যস্ত করিয়া নবীজীর রসূল ও সত্যবাদী হওয়ার প্রমাণরূপে আবুজহলের ন্যায় লোককে চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন—ইহার মোকাবিলায় খাঁ মরহুমের কুর্দ্দন উলঙ্ঘন কি কোন ফলদায়ক হইবে?

আশ্চার্যান্বিত হইতে এবং তোমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিত না এই বিষয়ে যে, মোহাম্মদ রসুল এবং সত্যের উজ্জল প্রমাণ। এমন কে আছে যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দিতা করিতে পারে? তুমি যাও—লোকদিগকে তাঁহার হইতে বিরত রাখার চেষ্টা কর; আমার ত ধারণা—অচিরেই এমন দিন আমাদের সম্মুখে আগত যেদিন তাঁহার প্রাধান্যের ও বিজয়ের নিদর্শনসমূহ দিবালোকের ন্যায় প্রকটিত হইয়া উঠিবে।" (বেদায়াহ, ৩—১৮৯)

আরবের পৌত্তলিকদের মধ্যে তৎকালে আত্মগর্ব আত্মশ্লাঘা অত্যধিক ছিল। নিজেদের নীতি ও কৃষ্টি ত্যাগ করা তাহাদের জন্য কঠিন ছিল। নবীজীর পিতৃব্য খাজা আবুতালেব নবীজীর সত্যবাদিতায় পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু নিজ পূর্ব্ব-পুরুষদের নীতি ও কৃষ্টি রক্ষায় এতই দৃঢ় ছিলেন যে, শত বুঝিয়াও মৃত্যু পর্য্যন্ত ঈমান গ্রহণ করিলেন না। ছোরাকার অবস্থাও প্রায় সেইরূপই হইতে যাইতেছিল। সে নিজের ঘটনার অলৌকিকতার দ্বারা নবীজীর রসুল হওয়ার পক্ষে আবুজহলকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছে, কিন্তু সব কিছু জানিয়াও ঈমান গ্রহণে অনেক বিলম্ব করিয়াছে।

হিজরতের ঘটনার সাত বৎসর পর অষ্টম বৎসরে মক্কা বিজয়ের সংলগ্নে হোনায়ন যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া মক্কা হইতে ১২।১৩ মাইল ব্যবধানে "জেএ'ররানা" নামক স্থানে নবীজী (দঃ) অবস্থানরত ছিলেন। তখন নবীজীর চতুর্দিকে কত ভিড়! লোকে লোকারণ্য—এই সময় ছোরাকাহ তথায় উপস্থিত হইল। নবীজী প্রদত্ত চর্ম্ম খণ্ডে লিখিত নিরাপত্তানামা তখনও তাহার নিকট সুরক্ষিত ছিল। লোকেরা তাহাকে নবীজীর নিকট যাইতে বাধা দিতে ছিল, তাই সে দূর হইতে নিরাপত্তানামা সহ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক উচ্চ কণ্ঠে বলিল, ইয়া রসুলুল্লাহ। এই যে, আপনার দেওয়া লিখিত নিরাপত্তানামা আমার নিকট রহিয়াছে; আমি ছোরাকা-ইবনে-মালেক।

নবীজী (দঃ) বলিলেন, যাহাকে যে কথা দেওয়া হইয়াছে আজ উহা পূরণ করার দিন; এই বলিয়া নবীজী ছোরাকাকে তাঁহার নিকটে পেঁৗছিবার সুযোগ করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। ছোরাকা নবীজী মোস্তফার চরণে শরণ লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করিলেন; এখন তিনি ছোরাকা ইবনে মালেক (রাঃ)।

(সীরতে-ইবনে হেশাম)

আরও এক দস্যুদলের আক্রমন ঃ

রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং আবুবকর (রাঃ)কে বাগে না পাইয়া কোরেশরা খুবই ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। তাহারা পূর্ব্ব হইতে জানিত রসুলুল্লাহ (দঃ) মদিনায়ই যাইবেন, তাই তাঁহাদের প্রত্যেকের হত্যা বা বন্দী করার এক একশত উট পুরস্কারের ঘোষণাটা মদিনা যাওয়ার পথের এলাকাসমূহে জোরালোভাবে প্রচার করা হইয়াছে।

সেই বৃহৎ পুরস্কারের আশায় আসলাম গোত্রের প্রধান "বোরায়দা" ৭০ জন দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তিবর্গকে লইয়া নবীজীর কাফেলার খোঁজে বাহির হইল। খোঁজ পাইয়াও

বসিলে; এমনকি নবীজীর ক্ষুদ্র কাফেলার সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। কি ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্ত! কি ভয়াবহ দৃশ্য!

একদিকে ৭০ জন দুর্দ্ধর্ষ সশস্ত্র দস্যু—বিদ্বেশ ও প্রলোভনে উত্তেজিত ও উৎসাহিত এবং যাঁহাদের মুণ্ডপাতে শ্রেষ্ঠ পূণ্য ও দুই শত উট লাভের আশা তাহাদেরকে বাগে পাইয়া বসিয়াছে। অপর দিকে নিরস্ত্র নিরীহ মাত্র চার জন লোক—উহার মধ্যেও একজন বিধর্ম্মী এবং তাঁহারা ভীত সন্ত্রস্তিত পলাতক পথিক ঐ দস্যুদলের কবলে পতিত।

এই অবস্থায় মানুষের কল্পনায় নবীজীর রক্ষাপ্রাপ্তি সম্ভবপর বিবেচিত হইতে পারে কি? এহেন ঘোরতর বিপদ মুহূর্ত্তেও নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ধীরস্থিরতায় এবং স্বর্গীয় গাম্ভির্য্যে বিন্দুমাত্র শিথিলতা পরিলক্ষিত হয় নাই। এই আসন্ন মৃত্যুর মুখে দাঁড়ানো অবস্থায়ও একটু চাঞ্চল্য বা অধৈর্য্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। আল্লার কার্য্যে নীরব-অবিচঞ্চল আত্মনিয়োগ এবং আল্লাহ-নির্ভরতার এই ভাব যে—রক্ষা করার সকল ভার এবং সমস্ত ভাবনা একমাত্র আল্লার উপর ন্যস্ত। কর্ত্তব্যের এই সাধনা এবং বিশ্বাসের এই তেজ ও ঈমানের এই শক্তিই হইল ঐ অসাধারণ সাহস ও দৃঢ়তার মূল উৎস।

কী প্রশান্ত চিত্ত, কী প্রশস্ত হৃদয়,। দস্যুদলপতি বোরায়দা নবীজীর সম্মুখে আসিতেই নবীজী মোস্তফা (দঃ) ধীর কণ্ঠে ও শান্ত স্বরে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? সে বলিল, বোরায়দাহ। "বোরায়দা" শব্দ "বার্‌দ" ধাতু হইতে এবং বার্‌দ অর্থ শীতলতা ও শান্তি; এই সূত্রে তাহার নাম হইতে নবী (দঃ) শুভলক্ষণ গ্রহণ* পূর্ব্বক আবুবকর (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমাদের কার্য্যে শান্তি ও শীতলতা লাভ হইবে। জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন গোত্রের তুমি? সে বলিল, "আসলাম" গোত্রের। "আসলাম" শব্দ "সেল্‌ম" ধাতু হইতে যাহার অর্থ নিরাপত্তা নিস্কণ্টকতা। ইহা হইতেও শুভলক্ষণ গ্রহণ পূব্বক নবী (দঃ) বলিলেন, আমাদের কণ্টক দূর হইবে, নিরাপত্তা লাভ হইবে। জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন বংশ-শাখার তুমি? সে বলিল, "বনু-সাহ্‌ম" হইতে। "সাহ্‌ম" অর্থ তীর; নবী (দঃ) বলিলেন, হে আবুবকর! তোমাদের সৌভাগ্যের তীর আগত।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই গাম্ভির্য্যপূর্ণ প্রশান্ততা দস্যুদলপতিকে ভারাক্রান্ত করিয়া ফেলিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গে শিথিলতা ও শীতলতা আসিয়া গেল; দস্যুতার পরিবর্ত্তে এখন তাহার মধ্যে বন্ধুত্বের ভাব ফুটিয়া উঠিল। শান্ত কণ্ঠে কোমল স্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার পরিচয় কি? নবীজী (দঃ)

* যে কোন বস্তু হইতে শুভলক্ষ্যাণ গ্রহণ করা জায়েয আছে, কিন্তু কোন কিছু হইতেই কুলক্ষ্যাণ গ্রহণ করা জায়েয নহে।

আত্মপ্রত্যয়ের বলিষ্ঠতাপূর্ণ কণ্ঠে উত্তর দিলেন—انا محمد بن عبد الله رسول الله
"আমি আবদুল্লার পুত্র মোহাম্মদ আল্লার রসুল" (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)।

বোরায়দা নিজকে আর সামলাইতে পারিল না, প্রেমপূণ্যে উদ্ভাসিত নবীজী মোস্তফার স্বর্গীয় দৃষ্টির তীর তাহার অন্তরে বিদ্ধ হইয়া গেল। সে দমিত ও নমিত, কিন্তু আত্মবলে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা দিয়া উঠিল—

আশ্‌হাদু-আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আশ্‌হাদু আন্না মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ।

দলপতি বোরায়দার ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সহচররাও ইসলাম গ্রহণে নবীজীর চরণে লুটাইয়া পড়িল। কী অপূর্ব্ব দৃশ্য! একজন নয় দুই জন নয়—৭০ জন রক্ত-মাতাল হিংস্র শত্রু মুহূর্ত্তের মধ্যে বশীভূত হইয়া মিত্রে পরিণত হইয়া গেল ; সত্যের বল-শক্তি এইরূপই হয়—যাদু-মন্ত্রের শক্তিও উহার সম্মুখে তুচ্ছ।

বোরায়দা (রাঃ) অবনত মস্তকে আল্লাহ তায়ালার শোক্‌র আদায় করিলেন যে, তাঁহারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন ; কোন প্রকারে বাধ্য হইয়া নয়। নবীজী (দঃ) রাত্রির বিশ্রাম শেষে ভোরবেলা যাত্রা করিলেন তখন বোরায়দা (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনার কাফেলা উড্ডীয়মান বিজয় পতাকার সহিত মদিনায় প্রবেশ করিবে। সেমতে বোরায়দা (রাঃ) নিজ আমামা—শিরস্ত্রাণ দ্বারা তাঁহার বর্শা ফলকে ইসলামের বিজয়-নিশান তৈরী করিয়া মহা উৎসাহে বীর দর্পে অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন। মদিনা বেশী দূরে নয় ; কাফেলাওয়ালাদের মনে কতই না পুলক ও কৌতুহল। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে কেন্দ্র করিয়া চলিয়াছেন সকলে ; আর বোরায়দা (রাঃ) অগ্রে অগ্রে চলিয়াছেন ইসলামের বিজয়-পতাকা বহন করিয়া। এই মনোহর দৃশ্য সমেতই কাফেলা পৌঁছিল মদিনার উপকণ্ঠে। (যোরকানী, ১—৩৫০)

মদিনার পথে খাদ্যের ব্যবস্থা ঃ

আবু বকর (রাঃ) গৃহ ত্যাগকালে কিছু পাথেয় সঙ্গে লইয়া ছিলেন, এতদ্ভিন্ন পথিমধ্যেও সুযোগ মতে আহারের ব্যবস্থা করিরাছেন ; ঐরূপ একটি ঘটনা এই—

১৭০৬। হাদীছ ঃ—বরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন মদিনাপানে যাইতেছিলেন তখন ছোরাকাহ-ইবনে মালেক নামক এক ব্যক্তি তাঁহার পেছনে ধাওয়া করিল। হযরত নবী (দঃ) তাহার প্রতি বদ-দোয়া করিলেন। তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তির যানবাহন ঘোড়ার পা জমিনে গাড়িয়া গেল। সে ভয় পাইয়া হযরত (দঃ)কে অনুরোধ করিতে লাগিল, আপনি আমার জন্য দোয়া (করিয়া আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার) করুন ; আমি আপনার কোন অনিষ্ট করিব না। হযরত (দঃ) তাহার জন্য দোয়া করিলেন, (সে মুক্তি পাইয়া গেল)।

অতঃপর হযরত (দঃ) পিপাসা অনুভব করিলেন, এমতাবস্থায় তিনি এক রাখালের নিকটবর্ত্তী পথ অতিক্রম করিলেন ; সঙ্গী আবুবকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তখন আমি একটি পাত্র লইয়া ঐ রাখালের নিকট হইতে কিছু দুগ্ধ দোহাইয়া আনিলাম। হযরতের নিকট সেই দুগ্ধ পেশ করিলে তিনি তাহা পান করিলেন যাহাতে আমার অন্তর আনন্দে ভরিয়া গেল।

১৭০৭। হাদীছঃ—(৫১৫) আ'জেব (রাঃ) আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এবং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) যখন মক্কা হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং শত্রু কাফেররা আপনাদের তালাশে পেছনে ধাওয়া করিল তখন আপনারা কিরূপ করিয়াছিলেন ? আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, মক্কা হইতে (তথা মক্কার এলাকাস্থ ছোর পর্ব্বতে তিন দিন লুকাইয়া থাকার পর পর্ব্বতগুহা হইতে রাত্রিবেলা) বাহির হইয়া আমরা সারা রাত্র পথ চলিলাম এবং পরের দিনও চলিলাম ; যখন উত্তাপময় দ্বিপ্রহরের সময় উপস্থিত হইল তখন আমি বিশ্রামের উদ্দেশ্যে ছায়ার জন্য চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম এবং বড় একটি পাথরের ছায়া দেখিতে পাইয়া তথায় আমরা উপস্থিত হইলাম। তথাকার জায়গাটা একটু সমান করিয়া বিছানা বিছাইয়া দিলাম এবং নবী (দঃ)কে আরাম করার অনুরোধ জানাইলাম। নবী (দঃ) আরাম করিলেন এবং আমি চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম ; এই উদ্দেশ্যে যে, শত্রুদলের পক্ষ হইতে আমাদের তল্লাশকারী কাহাকেও দেখা যায় কি না।

হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, এক বকরির রাখাল তাহার বকরি দল হাঁকাইয়া এই পাথরের দিকে নিয়া আসিতেছে ; তাহারও উদ্দেশ্য উহাই যে উদ্দেশ্যে আমরা পাথরটির নিকট আসিয়াছি। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার মালিক কে ? সে তদুত্তরে কোরায়েশ বংশের এমন একটি লোকের নাম উল্লেখ করিল যে আমার পরিচিত। তখন আমি তাহাকে বলিলাম, তোমার বকরি পালের মধ্যে দুগ্ধবতী বকরি আছে কি ? সে বলিল, হাঁ—আছে। আমি বলিলাম, আমাদের জন্য কিছু দুগ্ধ দোহাইয়া দিবে কি ? সে বলিল, হাঁ—দিব এবং একটি বকরি সেই উদ্দেশ্যে বাঁধিয়া রাখিল। বকরির স্তন হইতে ধুলা-বালু ভালরূপে ঝাড়িয়া ফেলার জন্য বলিলাম এবং অতঃপর তাহার হাতদ্বয় ভালরূপে ঝাড়িতে বলিলাম। সে তাহা করিয়া আমার জন্য দুগ্ধ দোহাইল। সেই দুগ্ধকে আমি একটি পাত্রের মুখে কাপড় রাখিয়া ছাকিয়া এবং উহার মধ্যে পানি ঢালিয়া উহাকে উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত সুশীতল ঠাণ্ডা করিলাম, অতঃপর উহাকে লইয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে পৌঁছিলাম। দেখিলাম, হযরত (দঃ) নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া উঠিয়াছেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! দুগ্ধ পান করুন। হযরত তৃপ্তির সহিত ঐ দুগ্ধ পান করিলেন। আমি তাহাতে খুবই আনন্দিত

হইলাম। তারপর আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! এই সময় কি পুনঃ যাত্রা আরম্ভ করিবেন? হযরত (দঃ) বলিলেন, হাঁ। সেমতে আমরা যাত্রা করিলাম।

এদিকে মক্কাবাসীগণ আমাদের খোঁজে লাগিয়া আছে, কিন্তু তাহারা আমাদিগকে বাগে পায় নাই। অবশ্য একমাত্র ছোরাক্বাহ ইবনে মালেক নামক ব্যক্তি আমাদের খোঁজ পাইল এবং দ্রুত ঘোড়া হাঁকাইয়া আমাদের নিকটবর্ত্তী চলিয়া আসিল। তখন আমি আতঙ্কিত অবস্থায় আরজ করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমাদের পেছনে ধাওয়াকারী আমাদের পর্য্যন্ত পৌছিয়া গেল। হযরত (দঃ) ধীর-স্থিরতার সহিত বলিলেন, কোন প্রকার ভাবনা চিন্তা করিও না—আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন।

● মদিনার পথে নবীজীর কাফেলা আরও কয়েক স্থানে দুগ্ধ পানের ব্যবস্থা করিয়া ছিল। ঐ সবের বিবরণ এই—

উম্মে-মা'বাদের কুটীরে নবীজীর কাফেলা ঃ

নবীজীর কাফেলা "ক্বোদায়দ" নামক বস্তিতে পৌছিল; তথায় একটি কুটীরে উম্মে-মা'বাদ-পরিবার বাস করিত। উম্মে-মা'বাদ এক পূণ্যাত্মা বৃদ্ধা ছিল, তাহার যথেষ্ট সুনাম ছিল; সে তাহার গৃহাঙ্গনে বসিয়া থাকিত; শ্রান্ত ক্লান্ত পথিকদেরে খাদ্য-পানীয় দ্বারা আপ্যায়ন করিত, তাহাদের সেবা করিত।

ঐ এলাকায় তখন খুব অভাব, অনাবৃষ্টির দরুন ঘাস-পাতারও খুব অভাব, তাই পশুপালের অবস্থাও অতিশয় সুচনীয়। উম্মে-মা'বাদের স্বামী তাহার মেষপাল চরাইতে বহু দূরে কোথাও চলিয়া গিয়াছে। এই সময় নবীজীর কাফেলা ঐ কুটীরে পৌছিল এবং তাঁহারা দুগ্ধ, গোশ্‌ত বা খেজুর যাহা উপস্থিত থাকে ক্রয় করিতে চাহিলেন। উম্মে-মা'বাদ বলিল, আমার নিকট পানাহারের কিছু থাকিলে আমি আপনাদের অতিথেয়তায় কার্পণ্য করিতাম না, আমি নিজেই আপনাদের সেবা করিতাম, আপনাদের মুল্য দিতে হইত না।

নবী (দঃ) লক্ষ্য করিলেন, কুটীরের এক প্রান্তে একটি ছাগী শুইয়া আছে—অতি কৃশ ও দুর্ব্বল। নবীজী (দঃ) উম্মে-মা'বাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ ছাগীটি কি? সে বলিল, উহা এতই দুর্ব্বল যে, মেষপালের সঙ্গে চরিতে যাওয়ার বলও সে পায় নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, উহাতে দুগ্ধ আছে কি? সে বলিল, দুগ্ধ দানের সম্ভাবনা হইতেও অনেক অধম ইহা। তারপরও নবীজী (দঃ) উম্মে-মা'বাদকে বলিলেন, ঐ ছাগীটা দোহন করিতে অনুমতি আছে কি? সে বলিল, উহার স্তনে দুধ আছে মনে করিলে দোহন করিতে পারেন। নবী (দঃ) উম্মে-মা'বাদের ছোট্ট ছেলে মা'বাদকে বলিলেন, হে বালক! ছাগীটা নিয়া আস ত। ছাগীটা নিয়া আসিলে নবী (দঃ) দোহনের জন্য উহাকে আবদ্ধ করিলেন এবং বিছমিল্লাহ বলিয়া উহার স্তনে ও পিঠে হাত বুলাইলেন

এবং দোয়াও করিলেন। পুনরায় উহার স্তনে হাত বুলাইলেন এবং বার বার আল্লার নাম জপিলেন।

অতঃপর বলিলেন, বড় একটি পাত্র আন—যাহার খাদ্য এক দল লোকের পেট পুরিতে যথেষ্ট হয়। ইতিমধ্যেই ছাগীটা উহার স্তন দুগ্ধে ফাঁপিয়া উঠায় পেছনের পাদ্বয় ফাঁক করিয়া দিল এবং জাবর কাটিতে আরম্ভ করিল। নবী (দঃ) প্রবল বেগে দুগ্ধ দোহন করিতে লাগিলেন। বড় পাত্রটি দুগ্ধপূর্ণ হইলে সর্ব্বপ্রথম ঐ পাত্র উম্মে-মা'বাদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সে পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলে কাফেলার লোকদেরে প্রদান করিলেন; প্রত্যেকে বার বার পান করিয়া অতিমাত্রায় পরিতৃপ্ত হইল। সকলে বারংবার পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলে সর্ব্বশেষে নবীজী মোস্তফা (দঃ) পান করিলেন এবং এহেন মহান আদর্শ কার্য্যতঃ শিক্ষা দানের পর মৌখিকও বলিয়া দিলেন—"সকলকে পান করাইবার ভার যাহার উপর ন্যাস্ত থাকিবে সে সকলের পরে পান করিবে।" অতঃপর দ্বিতীয়বার ঐ পাত্রে দোহন করিয়া পুনঃ পুনঃ সকলকে পান করাইলেন। নবীজীর দ্বারা এই অসাধারণ বরকত লাভে তাহারা তাঁহাকে "মোবারক"—বরকত ও মঙ্গলপুর্ণ বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিল।

তারপর নবী (দঃ) তৃতীয়বার ঐ পাত্রে দুধ দোহন করিয়া উম্মে-মা'বাদের গৃহে রাখিয়া গেলেন এবং বলিলেন, তোমার স্বামী মা'বাদের পিতা বাড়ী আসিলে তাহাকে পান করাইও। নবীজীর কাফেলা তথা হইতে রওয়ানা হইয়া গেল; ইতিমধ্যেই স্বামী আবু-মা'বাদ মেষপাল লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ঘাসের অভাবে মেষগুলি এতই দুর্ব্বল ছিল যে, হাটিতে সক্ষম হইতেছিল না, এতই কৃশ ছিল যে, উহাদের অস্তি-মজ্জা পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। গৃহে দুগ্ধ দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল; উম্মে-মা'বাদকে জিজ্ঞাসা করিল, দুগ্ধ কোথা হইতে পাইলে? মেষপাল ত বাড়ীতে ছিল না, দুগ্ধের কোন ছাগীও গৃহে ছিল না। উম্মে-মা'বাদ বলিল, তোমার কথা সত্যই, কিন্তু আমাদের গৃহে এক "মোবারক"—বরকতপূর্ণ মহৎ ব্যক্তির আগমন হইয়াছিল তাঁহার দ্বারা এই ঘটনা ঘটিয়াছে—দুগ্ধ দোহনের পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিয়া শুনাইল। আবু-মা'বাদ কৌতুহলে সেই মহান আগন্তুকের বিস্তারিত বিবরণ জ্ঞাত হইবার আগ্রহ প্রকাশ করিল। উম্মে-মা'বাদ তাহার স্বামীর নিকট নবীজীর আকৃতি-প্রকৃতি ও রূপ-গুণের বিবরণ যে ওজস্বিনী ভাষায় প্রদান করিয়াছিল উহার যথাযথ অনুবাদ বাংলা ভাষায় সম্ভব নহে। সামান্য কিছু আভাস দেওয়া যাইতে পারে। উম্মে-মা'বাদ বলিল—

আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি—অতি উজ্জ্বলবর্ণ সুপুরুষ তিনি, মুখশ্রী তাঁহার দীপ্ত ও আভাপূর্ণ, চরিত্র তাঁহার অতি মধুর, পেট তাঁহার স্ফীত নয়, দেহ তাঁহার কৃশ নয়—সুন্দর সুঠাম। খুব কাল তাঁহার চোখের তারা, ঘন ও সুদীর্ঘ তাঁহার নয়নের

রোমরাজি। কর্কষ নয়—গম্ভীর তাঁহার স্বর, নয়ন যুগলে অতি সাদার মধ্যে অতি কাল পুতুলি; প্রকৃতিই যেন সুর্মা দিয়া দিয়াছে তাঁহার নয়নে, ভ্রুযুগল পরস্পর সংযোজিত, অতি কাল তাঁহার কেশদাম, গ্রীবা তাঁহার দীর্ঘ, দাড়ি তাঁহার ঘন। মৌনাবলম্বন অবস্থায় তাঁহার উপর গুরুগম্ভীর ভাবের দৃশ্য ফুটিয়া উঠে, কথা বলিলে সকলের মনোপ্রাণকে মোহিত করিয়া দেয়। কথা তাঁহার মুক্তার দীর্ঘ মালার ন্যায় সুবিন্যস্ত—উহা হইতে যেন এক একটি মুক্তা পর পর খসিয়া পড়িতেছে। মিষ্ট ও প্রাঞ্জল তাঁহার ভাষা, সুস্পষ্ট তাঁহার বর্ণনাধারা, ত্রুটিও থাকে না আধিক্যও হয় না তাঁহার কথার মধ্যে। দূর হইতে দেখিলে তাঁহার রূপ-লাবণ্য মুগ্ধ করিয়া ফেলে, নিকটে আসিলে (তাঁহার ঐশিক প্রভাব দৃষ্টিকে ঝলসাইয়া দেয়, কিন্তু) তাঁহার প্রকৃতির মাধুরী মোহিত করিয়া ফেলে। দেহ তাঁহার মধ্যাকার—দেখায় অপ্রিয় দীর্ঘও নহে, হেয় মানের খর্ব্বও নহে, (পুষ্টি ও পুলকে সেই দেহ) রসাল বৃক্ষ-ডালার ন্যায়—যেই ডালা কচিও নয় দীর্ঘ দিনেরও নয়। তিন জনের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্ব্বাধিক সুদর্শন ও সুমহান। তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে সদা বেষ্টন করিয়া থাকে। তাহারা তাঁহার কথা অতি মনোযোগের সহিত শ্রবণ করে এবং কোন আদেশ করিলে তাহা অতি আগ্রহের সহিত পালন করে। সকলের সেবার পাত্র তিনি, সকলেই তাঁহার হুজুরে জটলা বাঁধিয়া থাকে। বিষণ্ণ আকৃতিতে থাকেন না তিনি, তিরস্কার করা ধিক্কার দেওয়া তাঁহার স্বভাবে নাই।

আবুমা'বাদ স্ত্রীর মুখে এই বর্ণনা শুনিবা মাত্র শপথ করতঃ বলিয়া উঠিল, ইনিই ত কোরেশদের সেই মহান। তাঁহার দর্শন পাইলে নিশ্চয় তাঁহার চরণে আমি শরণ লইতাম; উহার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা ও সাধনা করিয়া যাইব। তাঁহার সাহচর্য্যের কামনা আমি করি; সুযোগ পাইলে সেই মনোবাঞ্ছা নিশ্চয় পূরণ করিব।

নবীজী (দঃ) চলিয়া যাওয়ার পরও ছাগীটি সকাল-বিকাল ঐরূপ অসাধারণভাবে দুগ্ধ দিয়া থাকিত এবং ছাগীটি দীর্ঘ দিন বাঁচিয়াও ছিল। (যোরকানী, ১—৩৪০)

আবুমা'বাদের আকাঙ্খা পূর্ণ হইল, সাধনা তাঁহার সফল হইল। স্বামী আবুমা'বাদ এবং স্ত্রী উম্মে-মা'বাদ তাঁহারা সপরিবারে মদিনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উম্মে-মা'বাদের ভ্রাতা "হোবায়শ"ও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মক্কা বিজয়ে শহীদ হইয়াছিলেন। তাঁহার মাধ্যমেই উম্মে-মা'বাদ হইতে এই ঘটনা বর্ণিত হইয়া আসিয়াছে। তাঁহাদের সকলের ইসলাম গ্রহণের বিবরণ যোরকানী, ১—৩৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

উম্মে-মা'বাদের ঘটনা জ্বিন সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রসার লাভ করিয়া ছিল; তাহারা অদৃশ্য কণ্ঠে কাব্যের মাধ্যমে মক্কায় এই ঘটনা সুললিত সুরে গাহিয়া প্রচার করিল।

আবুবকর তনয়া আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, পিতা আবুবকর (রাঃ) ও নবীজী মোস্তফা (দঃ) গৃহ ত্যাগের ৪-৫ দিন পরে আমরা ত তাঁহাদের কোন সংবাদ অবগত নহি ; ইতিমধ্যেই একটি অদৃশ্য কণ্ঠের এই কবিতা মক্কার লোকজন শুনিতে পাইল।

جَزَى اللّٰهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَائِهِ — رَفِيقَيْنِ حَلَّا خَيْمَتَيْ أُمِّ مَعْبَدِ

هُمَا نَزَلَا بِالْبِرِّ وَارْتَحَلَا بِهِ — فَأَفْلَحَ مَنْ أَمْسَى رَفِيقَ مُحَمَّدِ

سَلُوا أُخْتَكُمْ عَنْ شَاتِهَا وَإِنَائِهَا — فَإِنَّكُمْ إِنْ تَسْأَلُوا الشَّاةَ تَشْهَدِ

دَعَاهَا بِشَاةٍ حَائِلٍ فَتَحَلَّبَتْ — لَهُ بِصَرِيحٍ ضَرَّةُ الشَّاةِ مُزْبِدِ

فَغَادَرَهَا رَهْنًا لَدَيْهَا لِحَالِبٍ — يُدِرُّهَا فِي مَصْدَرٍ ثُمَّ مَوْرِدِ

"হে সকলের প্রভু আল্লাহ। উত্তম প্রতিদান দান কর ভ্রমণ-সঙ্গীদ্বয়কে যাঁহারা উম্মে-মা'বাদের কুটীরে অবতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মহাপুণ্যবানরূপে তথায় অবতরণ করিয়াছিলেন এবং ঐরূপেই তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। মোহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) বন্ধুত্ব যাহারই লাভ হইয়াছে সাফল্য লাভে সে-ই ধন্য হইতে পারিয়াছে। তোমাদেরই ভগ্নি উম্মে-মা'বাদকে তাহার ছাগী এবং বিরাট পাত্রের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর ; ঐ ছাগীকে জিজ্ঞাসা করিলেও সে ঘটনার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। মোহাম্মদ (দঃ) উম্মে-মা'বাদকে ডাকিলেন তাহার এমন একটি ছাগীর জন্য যাহা ছিল বন্ধ্যা বা বাঁঝা, (অতএব উহার স্তনে দুগ্ধের অস্তিত্বই ছিল না,) কিন্তু ঐ ছাগীর স্তন খাঁটী দুগ্ধ এমন প্রবল বেগে প্রদান করিল যে, উহার উপর ফেনার স্তূপ জমিয়া গেল। অবশেষে ঐ ছাগীকে উম্মে-মা'বাদের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া চলিয়া গেলেন, প্রত্যেক দোহনকারী উম্মে-মা'বাদের জন্য পুনঃ পুনঃ দুগ্ধ দোহন করিতে থাকিবে। (বেদায়াহ ও যোরকানী,—৩৪২)

উম্মে-মা'বাদের নিবাস এলাকা "কোদায়দ" মক্কা-মদিনার পথে মদিনা অপেক্ষা মক্কার অধিক নিকটবর্ত্তী ছিল। তাহার বদান্যতায় সে মক্কা এলাকায় পরিচিতা ছিল এবং তাহার কুটীর পথিকদের বিশ্রামাগার ছিল, দেশ-বিদেশের পথিকগণ তথায় সেবা ও সহানুভূতি পাইয়া থাকিত, তাই ঐ কুটীরও লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। সেমতে জ্বিনদের উক্ত কবিতা মক্কার মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিল এবং যাঁহারা নবীজীর কাফেলার সংবাদ জ্ঞাত হইতে আগ্রহী ছিলেন তাঁহারাও আশ্বস্ত হইয়া আনন্দ লাভ করিলেন।

উম্মে-মা'বাদের কুটীরে ছাগী দোহনের যে ঘটনা ঘটিয়াছিল উহা নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি মোজেযা ছিল। ঐ মোজেযাটির বিভিন্ন দিক ছিল। যথা—

১। ঘাসের অভাবে ছাগীটি এতই কৃশ ও দুর্ব্বল ছিল যে, চারণভূমিতে যাওয়ায়ও অক্ষম ছিল। উম্মে-মা'বাদ নিজেই এই কথা বলিয়াছিল; অতএব সাধারণভাবেই উহা দুগ্ধশূন্য ছিল। নবীজীর মোজেযায় উহাতে দুগ্ধের সঞ্চারণ হইয়াছিল।

২। ছাগীটির কোনও বাচ্চা জন্মিয়াছিল না, যাহাতে উহার স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হইতে পারে। জ্বিনদের কাব্যে যে, ঐ ছাগীটির গুণবাচক "حائل—হাএল" শব্দ ব্যবহৃদ হইয়াছে উহার আভিধানিক অর্থই হইল—كل انثى لا تحمل "ঐ মাদী জীব যে গর্ভধারণ করে না অর্থাৎ বন্ধা বা বাঁঝা। সেমতে ঐ ছাগীটি গর্ভধারণের যোগ্যই ছিল না, সুতরাং স্বাভাবিকভাবে উহার স্তনে দুগ্ধের সঞ্চারই হইতে পারে না। একমাত্র নবীজীর মোজেযায়ই তাহা সম্ভব হইয়াছিল।

৩। বড় পাত্র যাহার মধ্যে একদল লোক পরিতৃপ্ত হওয়ার পরিমাণ পানীয় সামাইতে পারে—স্বাভাবিকরূপে একটি অতি উত্তম ছাগী হইতেও ঐরূপ পাত্র বারংবার পরিপূর্ণ হওয়ার মত দুগ্ধ লাভ হইতে পারে না। এই ঘটনায় ঐরূপ হইয়া ছিল এবং ৭.৮ জন মানুষ পুনঃ পুনঃ পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া ছিল; ইহাও মোজেযাই ছিল।

৪। আরও অধিক আশ্চর্য্যজনক বিষয় এই ছিল যে, দীর্ঘ দিন পর্য্যন্ত ঐ ছাগীটি এইরূপ অস্বাভাবিকভাবে দুগ্ধ দিতেই ছিল।

আলোচ্য ঘটনায় নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরশহস্তের স্পর্শে উল্লেখিত অস্বাভাবিক ঘটনাই বাস্তবায়িত হইয়াছিল, যাহা দৃষ্ট ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীগণ নবীজী (দঃ)কে স্বতঃস্ফূর্ত্ত "মোবারক" নামের আখ্যা দিয়াছিল এবং আবুমা'বাদ নিজ গৃহে দুগ্ধ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল, মোসলমান জ্বিন সম্প্রদায়ও এই ঘটনাকে নবীজী মোস্তফার সত্য রসুল হওয়ার সাক্ষ্যরূপে প্রচার করিয়াছিল। এইসব তথ্য সীরত তথা চরিত-শাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ কেতাবসমূহের সমস্ত গ্রন্থেই বর্ণিত রহিয়াছে।↑

↑ সমালোচনাঃ—"মোস্তফা-চরিত" গ্রন্থে ঐ ছাগীর দুগ্ধ সম্পর্কীয় সমুদয় তথ্য হইতে চোখ বন্ধ করিয়া শুধু গ্রন্থকারের নিজ অনুমানের ভিত্তিতে ঘটনাটাকে স্বাভাবিক প্রমাণ করায় অপচেষ্টায় বলা হইয়াছে—"সম্ভবতঃ কৃশ মনে করিয়া কয়েক দিন তাহাকে দোহন করা হয় নাই, তাহার স্তনে কয়েক দিনের যে দুগ্ধ সঞ্চিত ছিল তাহা পথিকগণের পক্ষে নিতান্ত অপ্রচুর হইল না। দুগ্ধের সাথে জল মিশ্রিত করিয়া পান করার নিয়ম আরবে প্রচলিত ছিল।"

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঐরূপ আরও ঘটনা ঃ

মদিনার পথে নবীজী মোস্তফা (দঃ) কর্ত্তৃক আহার যোগাইবার ঐরূপ আরও ঘটনা সীরত গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত রহিয়াছে।

মদিনার পথে নবীজীর কাফেলা এক রাখালের নিকট দিয়া যাইতে ছিল; আহারের প্রয়োজন ছিল। তাঁহারা রাখালকে কোন একটি ছাগী হইতে দুগ্ধদানের অনুরোধ করিলেন। আরবে এই নীতি ও উদারতা সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল যে, পথিকগণ যে কোন মেষপাল ইত্যাদি হইতে নিজ প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে।

রাখাল বলিল, আমার মেষপালে দুগ্ধ দেওয়ার যোগ্য কোন ছাগী নাই; একটি ছাগী আছে উহার বয়সও কম, এই শীত মৌসুমের আরম্ভে বাচ্চা দিয়া ছিল; সেই বাচ্চা ছিল অসম্পূর্ণ-দেহবিশিষ্ট—বহু দিন পূর্ব্বে ঐ ছাগীটিরও দুগ্ধ একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। নবী (দঃ) বলিলেন, ঐ ছাগীটিকেই নিয়া আস। উহা উপস্থিত করা হইলে নবীজী (দঃ) উহার স্তনে হস্ত বুলাইলেন এবং দোওয়া করিলেন; উহার স্তনে দুগ্ধ নামিয়া আসিল। আবুবকর (রাঃ) একটি পাত্র নিয়া আসিলেন; নবীজী (দঃ) দোহন করিলেন। প্রথমবার আবুবকর (রাঃ) পান করিলেন, দ্বিতীয়বার ঐ রাখাল পান করিল—এইভাবে সকলে পান করিলে সর্ব্বশেষে নবীজী (দঃ) পান করিলেন।

ঘটনা দৃষ্টে রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, খোদার কসম—আপনি কে? আপনার ন্যায় ব্যক্তিত আমি আর দেখি নাই। নবীজী (দঃ) বলিলেন, আমার পরিচয় জ্ঞাত করিলে সংবাদ গোপন রাখিবে ত? সে বলিল, হাঁ। নবীজী (দঃ)

পাঠক! লক্ষ্য করিলেন! ইতিহাসে বর্ণিত তথ্যগুলিকে কিরূপে মুছিয়া ফেলা হইল! বলা হইল—কয়েক দিনের দুগ্ধ স্তনে সঞ্চিত ছিল; অথচ ছাগীটি ছিল, 'হায়েল' অর্থাৎ বন্ধা যাহার গর্ভে বাচ্চা জন্মে না, স্তনে দুগ্ধ কোথা হইতে আসিবে? বলা হইয়াছে, পথিকগণের পক্ষে; অথচ গৃহস্বামীরাও পান করিয়াছিল, এমনকি অনুপস্থিতের জন্যও একপাত্র রাখা হইয়াছিল। বলা হইয়াছে, নিতান্ত অপ্রচুর হইল না; অথচ প্রত্যেকে পুনঃ পুনঃ পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে মোস্তফা-চরিত গ্রন্থকার দুগ্ধে জল মিশ্রিত করা সাব্যস্ত করিল তবুও মোজেযাকে স্বীকার করিল না।

এইরূপ অপদার্থ মগজ হইতে নিঃসৃত বাতুলতার সমালোচনা কত করা যায়? প্রবীণ পণ্ডিত মরহুমের সমালোচনা হয়ত পাঠককেও মর্ম্মাহত করে। কিন্তু নবীজীর মোজেযার প্রতি স্বীকৃতি দানে যাহারা এত সঙ্কীর্ণ তাহাদের অধিকার ছিল না মোস্তফা-চরিত সঙ্কলন করিয়া মোসলমানদিগকে বিভ্রান্ত করার। মূল ঘটনাকে যে সব গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে আমাদের উদ্ধৃত তথ্যসমূহ ঐসব গ্রন্থেই বিদ্যমান রহিয়াছে। তথ্যসমূহকে বাদ দিয়া, বরং উপেক্ষা করিয়া ঘটনাকে মনগড়ারূপে "সম্ভবতঃ" জনিত নিজ উক্তির আড়ালে বিকৃত করা শিক্ষা ও সভ্যতার বিপরীত নয় কি?

বলিলেন, আমি মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) আল্লার রসুল। রাখাল বলিল, কোরেশরা যাহাকে ধর্ম্মত্যাগী বলিয়া থাকে আপনিই তিনি? নবী (দঃ) বলিলেন, তাহারা এরূপই বলিয়া থাকে। রাখাল বলিল, আমার স্বীকৃতি ঘোষণা করিতেছি যে, আপনি নিশ্চয় নবী এবং আপনার ধর্ম্ম সত্য; আপনি যাহা করিয়াছেন নবী ভিন্ন কেহ তাহা করিতে সক্ষম হইবে না; আমি আপনার সঙ্গে থাকিতে ইচ্ছা করি। নবী (দঃ) বলিলেন, তুমি এখন আমার সঙ্গী হইতে পারিবে না; আমার বিজয় ও প্রাবল্যের সংবাদ অবগত হইলে পর তুমি আমার নিকটে চলিয়া আসিও*। (বেদায়াহ, ৩—১৯৪)

আরও একটি ঘটনা ঃ

আবুবকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কা ত্যাগ করার পথে আমরা একটি গোত্রের বস্তিতে পৌঁছিয়া এক কুটীরে অবতরণ করিলাম, তখন সন্ধা হইয়া গিয়াছে। ঐ কুটীরে এক মহিলার অবস্থান; সন্ধাবেলা তাহার পুত্র মেষপাল চরাইয়া উহা লইয়া বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। তাহার মাতা তাহাকে একটি ছুরি প্রদান করিয়া বলিয়াছে—এই ছুরি ও একটি মেষ লইয়া পথিক মুছাফিরদের নিকট যাও এবং বল, আপনারা এই মেষটি জবাই করিয়া নিজেরাও খাওয়ার ব্যবস্থা করুন আমাদেরকেও দিন। বালক ছুরি ও একটি ছাগী লইয়া পৌঁছিলে নবীজী (দঃ) ছুরিটা ফেরত দিলেন এবং বলিলেন, দুগ্ধ দোহনের পাত্র নিয়া আস। বালক বলিল, ছাগীটিত কম বয়সের—এখনও পাঠার পালে আসে নাই↑ (ইহাতে দুগ্ধের সম্ভাবনাই নাই)। নবীজী বলিলেন, তুমি যাও; সে যাইয়া পাত্র নিয়া আসিল। নবী (দঃ) ছাগীটির স্তনে হাত বুলাইলেন, অতঃপর দুগ্ধ দোহাইলেন; পাত্রটি দুগ্ধে পুর্ণ হইলে উহা বালকের মাতার জন্য পাঠাইলেন। সে তৃপ্ত হইয়া পান করিলে পুনরায় দোহাইলেন উহা সঙ্গীগণ পান করিলেন; সবর্বশেষে নবীজী (দঃ) পান করিলেন। তথায় কাফেলা দুই রাত্র অবস্থান করিল। কুটীরবাসীরা নবীজী (দঃ)কে "মোবারক—বরকত ও মঙ্গলপুর্ণ" নামে আখ্যায়িত করিত।

ঐ মহিলার মেষপালে বরকত হইল উহা সংখ্যায় অনেক বাড়িয়া গেল। ঐ মহিলা তাহার মেষপাল সহ বালক পুত্রকে লইয়া মদিনায় পেঁাছিল। বালক

* পাঠক! "মোস্তফা-চরিত" সঙ্কলক এই ঘটনাকে কি বলিয়া স্বাভাবিক বানাইবেন? ঘটনা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক হওয়ার কারণেই ত ঘটনায় উপস্থিত রাখাল স্পষ্ট বলিয়াছে, আপনি যাহা করিয়াছেন নবী ভিন্ন কেহ করিতে পারে না।

↑ "মোস্তফা-চরিত" সঙ্কলক এই ঘটনায় ছাগীটির দুগ্ধ দেওয়ার স্বাভাবিকতা কিরূপে নির্ণয় করিবেন? উল্লেখিত দুইটি ঘটনা ঐ সব কেতাবেই বর্ণিত রহিয়াছে যে সব কেতাব তে উম্মেমা'বাদের ঘটনা মোস্তফা-চরিত গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

পুত্র মদিনায় হঠাৎ আবুবকর (রাঃ)কে দেখিয়া চিনিতে পারিল এবং মাতাকে বলিল, মা! ঐ যে, মোবারকের সঙ্গী ব্যক্তি। তাঁহারা নবীজীকে "মোবারক" নামের আখ্যা দিয়াছিল।

মাতা তৎক্ষাণাৎ আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকটে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লার বন্দা। আপনার সঙ্গী সেই মহাপুরুষ কে ছিলেন? আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, তিনি আল্লার নবী। মহিলা বলিলেন, আমাকে তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দিন। আবুবকর (রাঃ) তাঁহাদিগকে নবীজী সমীপে পৌঁছাইয়া দিলেন; তাঁহারা নবীজী (দঃ)কে কিছু পনির এবং গ্রাম্য সামগ্রী হাদিয়া পেশ করিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিলেন। নবীজী (দঃ) তাঁহাদিগকে দাওয়াত খাওয়াইলেন এবং পরিধেয় ইত্যাদি উপহার দিলেন (যোরকানী, ১—৩৪৯ বেদায়াহ্ ৩—১৯২।)

নূতন শুভ্রবসনে মদিনায় উপস্থিতির ব্যবস্থা ঃ

১৭০৮। হাদীছঃ—(৫৫৪ পৃঃ) যোবায়র (রাঃ) ছাহাবীর পুত্র ওরওয়া (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) ও আবুবকর (রাঃ) মদিনা যাওয়ার পথে যোবায়র রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সহিত সাক্ষাৎ হইল—তিনি কতিপয় মোসলমান বণিকদের সঙ্গে বাণিজ্য কাফেলায় সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ছিলেন। যোবায়র (রাঃ) নবীজী (দঃ) এবং আবুবকর (রাঃ)কে সাদা কাপড়ের নূতন পোশাক পরাইয়া দিলেন।

মদিনার শহরতলিতে নবীজীর উপস্থিতি ঃ

মক্কা হইতে রওয়ানা হওয়ার দিন-তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন মতামত আছে। প্রসিদ্ধ মত ইহাই যে, হযরত (দঃ) রবিউল-আউয়াল চাঁদের প্রথম তারিখ (বুধবার দিবাগত) বৃহস্পতিবারের রাত্রে মক্কা নগরী ত্যাগ করতঃ ছৌর পর্বত গুহায় পেঁৗছিয়াছিলেন; বৃহস্পতিবার দিন শুক্রবার রাত্র ও দিন, শনিবার রাত্র ও দিন এবং রবিবার রাত্র ও দিন এই চার দিন তিন রাত্র গুহার পথে এবং গুহায় উদযাপন করতঃ (রবিবার দিবাগত) সোমবারের রাত্রে গুহা হইতে বাহির হইয়া মদিনার পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। ১২ই রবিউল-আউয়াল সোমবার দিন দ্বিপ্রহরের পুর্বে মদিনায় পেঁৗছিয়াছিলেন। (ফতহুলবারী ৭—১৮৮)

মক্কা হইতে মদিনায় পেঁৗছিতে মদিনার শহরতলি কোবা-পল্লী দিয়াই প্রবেশ-পথ। এই কোবাপল্লীতে বনী-আমর-ইবনে আউফ গোত্রের বসবাস। তাঁহাদের মহানুভবতা ইসলামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মক্কা হইতে বিতাড়িত ও আগত মজলুম অত্যাচারিত সর্ব্বহারা মোসলমানগণ এই পল্লীর উক্ত গোত্রেই

বেশী পরিমাণে শুধু আশ্রয়ই পাইতেন না, বরং সহোদররূপে সমাদরে গৃহীত ও সযত্নে আপ্যায়িত হইতেন। মজলুম মোহাজেরগণের প্রথম ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্র সর্ব্বস্ব হইতে বিচ্ছিন্ন আবুছালামা (রাঃ) এই পল্লীতেই আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার দুঃখীনী স্ত্রী উম্মে-সালামা (রাঃ) বালক পুত্রসহ দীর্ঘ এক বৎসর পর এই পল্লীতেই স্বামীর সহিত আশ্রয় পাইয়াছিলেন। আবুসালামা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পর সস্ত্রীক হিজরতকারী আমের ইবনে রবীয়া (রাঃ), তাঁহার পর আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) এবং তাঁহার স্ত্রী, ভ্রাতা ও তিন ভগ্নি সকলেই হিজরত করিয়া কোবা পল্লীতে মোবাশ্‌শের ইবনে আবদুল-মোনজের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন (বেদায়াহ, ৩—১৭১)। ওমর (রাঃ) এবং তাঁহার পরিবারবর্গ, ভ্রাতা, ভগ্নিপতিসহ বিশজন সকলেই কোবা পল্লীতে রেফাআ' ইবনে আবদুল মোনজের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিলেন (বেদায়াহ, ৩—১৭৩)। হামযা (রাঃ), যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ), আবু মারছাদ (রাঃ), মারছাদ (রাঃ) আনাছাহ (রাঃ) এবং আবুকাব্‌শা (রাঃ) তাঁহারাও কোবা পল্লীতে কুলছুম ইবনে হাদম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছিলেন (বেদায়াহ, ৩—১৭৪)।

নবীজী মোস্তফা (দঃ) মক্কা হইতে আত্মগোপন করতঃ যাত্রা করিয়াছেন— মদিনাবাসী মোসলমানগণ যথাসময়ে এই সংবাদ জানিতে পারিয়া ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে অপরিসীম প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছিল। সমগ্র শহর ও শহরতলির মোসলমানদিগের আনন্দ ও উৎসাহের সীমা ছিল না। কারণ, তাঁহাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, নবীজী মোস্তফা (দঃ) মক্কা হইতে যাত্রা করিয়া মদিনায়ই পৌঁছিবেন। মদিনার মোসলমানগণ প্রত্যহ নগর এলাকার বাহিরে উন্মুক্ত কাঁকরময় ময়দানে দাঁড়াইয়া অধীর আগ্রহে তাকাইয়া থাকিতেন নবীজীর কাফেলার আগমন প্রতিক্ষায়। সূর্য্যের প্রখর উত্তাপই তাঁহাদিগকে সেই প্রতিক্ষা হইতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিত; সূর্য্য-তাপ অসহনীয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা বাড়ী ফিরিতেন না।

১২ই রবিউল-আউয়াল সোমবার দিনও ঠিক ঐরূপেই মদিনাবাসী মোসলমানগণ সূর্য্য-তাপে বাধ্য হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন মাত্র। ইতিমধ্যেই হুলস্থুল পড়িয়া গেল, কোলাহল জাগিয়া উঠিল—উজ্জল শুভ্রবসন পরিহিত ক্ষুদ্র কাফেলা মদিনার ঊর্দ্ধপ্রান্ত পথে কোবা পল্লীর পানে আগত পরিদৃষ্ট হইতেছে। এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নগরময় আনন্দ-উৎসাহের হিল্লোল বহিয়া গেল। মোসলমানগণ দলে দলে ঘর হইতে ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন; সকলেরই মনে আজ পুলক ও অফুরন্ত উল্লাস; দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্খা আজ পুরণ হইবে—আল্লার রসুলকে আজ তাঁহারা নিজেদের মধ্যে পাইবেন।

ধীরে ধীরে নবীজীর কাফেলা কোবা পল্লীতে উপনীত হইল। বার রাত্র বার দিনের কঠিন ছফরে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত নবীজী মোস্তফা (দঃ) আবুবকর (রাঃ)কে লইয়া একটি খেজুর গাছের ছায়াতলে উপবেশন করিলেন। নবীজী (দঃ) মৌনভাবে বসিয়া আছেন এবং তাঁহার পার্শ্বদেশেই আছেন আবুবকর (রাঃ)। নবীজীর পোশাক-পরিচ্ছদে কোন জাঁকজমক নাই, উপবেশনে কোন পার্থক্য ও আড়ম্বর নাই—যাহা দেখিয়া সাধারণ লোকে সহজে নবীজী (দঃ)কে চিনিতে পারিত। এমনকি যাঁহারা পূর্ব্বে নবীজী (দঃ)কে দেখেন নাই, আবুবকর (রাঃ)কে চিনিতেন না তাঁহাদের অনেকে আবুবকর (রাঃ)কে নবীজী মনে করিয়া তাঁহাকেই তসলীম জানাইতেছিলেন। কারণ, আবুবকর (রাঃ) বয়সে নবীজী (দঃ) অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট হইলেও দেখায় নবীজী অপেক্ষা অধিক বয়সের মনে হইতেন। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত নবীজী (দঃ) অভ্যর্থনাকারী ও সাক্ষাৎকারীগণের ভিড়ে যাতনা অনুভব করিবেন—অবলীলাক্রমে তিনি ঐভাবে উহা হইতে রক্ষা পাইলেন। হয়ত, এই কারণেই আবুবকর (রাঃ) তসলীম গ্রহণে বাধার সৃষ্টি না করিয়া মৌনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সময় ছায়া সরিয়া যাওয়ায় নবীজীর চেহারায় রৌদ্র লাগিতে লাগিল। আবুবকর (রাঃ) অবিলম্বে নিজ বস্ত্রের সাহায্যে নবীজীর উপর ছায়া করিয়া দাঁড়াইলেন ; ছায়া করাও হইল এবং ভক্ত অনুরক্ত খাদেম ও প্রভুর মধ্যে পার্থক্যের পরিচয়ও হইয়া গেল।

বৃক্ষ ছায়াতলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও কুশলবাদের আলাপ-আলোচনার পর নবীজী (দঃ) কোবা পল্লীর কুল্‌ছুম-ইবনে হদ্‌মের গৃহে আপ্যায়িত হইলেন। যে কয়দিন নবীজী (দঃ) কোবায় অবস্থান করিলেন এই গৃহেই অবস্থান করিতেন, কিন্তু জনসাধারণের সহিত সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে তিনি সায়াদ ইবনে খায়ছামা (রাঃ) ছাহাবীর গৃহে বসিতেন। কারণ, এই গৃহস্বামী ছিলেন পরিবার শূন্য ; এই গৃহে নবীজীর নিকট লোকদের যাতায়াত ও সাক্ষাৎ সুবিধাজনক ছিল। (বেদায়াহ, ৩—১৯৭)

নবীজী (দঃ) মক্কা হইতে বাহির হইয়া আসায় কৃতকার্য্য হইলে পর আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষে সহজ হইয়া গেল নবীজীর নিকট মক্কাবাসীদের গচ্ছিত চিজ-বস্তু তাহাদেরকে ফিরাইয়া দেওয়া। সেমতে তিনি যথা সম্ভব দ্রুত মালিকদিগকে তাহাদের চিজ-বস্তু প্রত্যার্পণ করিতে লাগিলেন। মক্কা হইতে নবীজীর যাত্রা করার তিন দিন পরে আলী (রাঃ)ও মক্কা ত্যাগ করতঃ হিজরত করিয়া কোবা পল্লীতেই নবীজীর সহিত মিলিত হইলেন। (বেদায়াহ, ৩—১৯৭)

কোবা পল্লীতে নবী (দঃ) সোমবার পৌঁছিয়া ছিলেন এবং শুক্রবার পর্য্যন্ত ঐ পল্লীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহা অবধারিত যে, কোবা হইতে নবীজীর প্রস্থান শুক্রবার ছিল ; কাহারও মতে পরবর্ত্তী শুক্রবার, কিন্তু অধিকাংশের মতে দ্বিতীয় শুক্রবার।

সেমতে কোবা পল্লীতে নবীজীর (দঃ) অবস্থান (অবতরণ ও প্রস্থানের উভয় দিনকে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যায় গণনা করিয়া) বার দিন ছিল। (বেদায়াহ, ৩—১৯৮)

ছাহাবী আনাছ (রাঃ) যাঁহার বয়স এই সময় মাত্র দশ বৎসর ছিল ; তিনি পরবর্ত্তী-কালে আলোচ্য বিষয়ের বর্ণনা নিজ স্মরণ অনুযায়ী এই প্রদান করিয়াছেন যে, কোবা পল্লীতে নবী (দঃ) চৌদ্দ দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। হয়ত, তাঁহার স্মরণ মতে নবীজীর কোবা পল্লীতে অবতরণ শুক্রবার দ্বিপ্রহরে ছিল এবং কোবা হইতে মদিনা নগরে প্রস্থান তৃতীয় শুক্রবার দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে ছিল। সেমতে অবতরণ ও প্রস্থানের অর্দ্ধ অর্দ্ধ দিনের সমষ্টিকে একদিন গণ্য করিয়া চৌদ্দ দিন বলা হইয়াছে। আছাহ ১০৯

কোবা পল্লীতে মসজিদ নির্ম্মাণ :

কোবা পল্লীতে ১২ দিন বা ১৪ দিন অবস্থান সময়ে নবীজী (দঃ) তাঁহার একটি বিশেষ আদর্শ ও সুন্নত-পালন বাস্তবায়িত করিলেন। নবীজীর বিশেষ মৌলিক আদর্শ ও সুন্নত এই যে, যেস্থানেই মোসলমানের বসবাস হইবে তথায় সর্ব্বদা জমাতের সহিত নামায আদায় করার সুব্যবস্থা করিবে। মোসলমানদের জন্য এই আদর্শ বস্তুতঃ পবিত্র কোরআনেরও ইঙ্গিত। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ

"মোসলমান এমন জাতি যে, তাহাদিগকে কোন ভূখণ্ডে শক্তি-সামর্থের সুযোগ দান করিলে তাঁহারা তথায় নামায জারি করার সুব্যবস্থা করেন…।"

কোবা পল্লীতে মোসলমানগণের মুক্ত ধর্ম্মীয় পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সুযোগে মোসলমানদের কর্ত্তব্য তথায় জমাতী নামাযের প্রচলন করার জন্য এবং ইসলামের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য মসজিদ তৈরী করা। নবীজী (দঃ) তাঁহার ১২।১৪ দিনের সংক্ষিপ্ত অবস্থানে সেই কর্ত্তব্যের উদ্বোধন করেন। ইসলামের সর্ব্বপ্রথম মসজিদ ঐ কোবা-পল্লীতে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হস্তে তৈরী হয়। মোসলমান সর্ব্ব-সাধারণের জন্য এবং আনুষ্ঠানিক মসজিদরূপে পূর্ণ আকৃতিপ্রাপ্ত মসজিদ সর্ব্ব-প্রথম এই মসজিদে কোবা-ই ছিল। ইহার পূর্ব্বে ব্যক্তিগত নির্দ্দিষ্ট নামাযের স্থানরূপে বা গোত্রীয় সমাজের নামাযের জন্য অতি সামান্য ঘেরাও-এর রক্ষণায় নির্দ্দিষ্ট নামাযের স্থান আরও তৈরী হইয়াছিল, কিন্তু আনুষ্ঠানিকরূপে পূর্ণাঙ্গ জামে-মসজিদ এই উম্মতের মধ্যে সর্ব্ব-প্রথম এই কোবা-পল্লীর জামে-মসজিদই। উক্ত মসজিদের গৌরব পবিত্র কোরআনেও উল্লেখ রহিয়াছে—

لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ -

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا

"যেই মসজিদের ভিত্তি রাখা হইয়াছে পরহেজগারী—আল্লাহ্‌নুরুক্তির উপর প্রথম দিন হইতে উহার সঙ্গেই আপনার সম্পর্ক রাখা বাঞ্ছনীয়। ঐ মসজিদের পল্লী-বাসীরা (উত্তম লোক ; তাঁহারা) পাক-পবিত্রতাকে ভালবাসিয়া থাকে। ১১ পাঃ ২রুঃ

অনেকের মতে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোবায় পদার্পণের প্রথম দিনেই এই মসজিদের ভিত্তি রাখিয়াছিলেন। (বেদায়াহ, ৩—২০৯)

কোবা মসজিদের ফজীলত ঃ

এই মসজিদের প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা করিয়াছেন কোরআন শরীফে যে, এই মসজিদের ভিত্তি রাখা হইয়াছে আল্লার তাক্‌ওয়া তথা পরহেজগারী ও আল্লাহনুরুক্তির উপর। এই পল্লী হইতে চলিয়া যাওয়ার পরও নবী (দঃ) এই মসজিদে আসিতেন এবং নামায পড়িতেন। প্রথম খণ্ড ৬৩১ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে—নবী (দঃ) প্রতি শনিবার এই কোবা পল্লীর মসজিদে সুযোগ হইলে যানবাহনে নতুবা পদব্রজে আসিতেন এবং দুই রাকাত নামায পড়িতেন।

হাদীছে আছে—এই মসজিদে নামায পড়িলে ওমরা আদায় করার ছওয়াব লাভ হয়। (যোরকানী, ১—৩৫১)

মদিনার শহর পানে কোবা হইতে প্রস্থান ঃ

বার বা চৌদ্দ দিন কোবা পল্লীতে অবস্থানের পর শুক্রবার দিন নবী (দঃ) তাঁহার দাদার মাতৃকুল—নাজ্জার বংশের লোকদিগকে তাঁহার মদিনা নগরীতে যাত্রার সঙ্কল্পের সংবাদ জ্ঞাত করিলেন।

দীর্ঘ দুই সপ্তাহ আগ্রহ ও অপেক্ষায় কাটিয়া গিয়াছে, এখন নবীজীর আগমন সংবাদ পাইয়া নগরবাসীগণের আনন্দ-উল্লাস ও উৎসাহ-উদ্দীপনার আর সীমা থাকিল না। তৎকালীন আরবীয় বীর জাতির প্রথানুসারে তাঁহারা সকলে তরবারী ঝুলাইয়া ফৌজী কায়দায় নবীজী (দঃ)কে রাজকীয় অভ্যর্থনার সহিত নিয়া আসিবার জন্য ছুটিয়া চলিলেন। নগরের সকল মোসলমানের মধ্যে এই শুভ সংবাদ অবিলম্বে প্রচারিত হইয়া পড়িল। এবং আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলে আনন্দে উল্লাসে মাতিয়া উঠিল।

শুক্রবার দিনের সুদীর্ঘ অংশ অতিক্রমের পর নবীজী (দঃ) কোবা হইতে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে বনী-সালেম গোত্রের মহল্লায় পৌঁছিতেই জুমার নামাযের ওয়াক্ত হইয়া গেল। নবীজী (দঃ) তাঁহার একশত জন সঙ্গীসহ ঐ গোত্রের নির্দ্দিষ্ট নামাযের স্থানে জুমার নামায আদায় করিলেন। নবীজীর জন্য ইহাই সর্ব্বপ্রথম জুমা ছিল।

নবীজীর সর্ব্বপ্রথম জুমার খোৎবা ঃ

উক্ত জুমায় নবীজীর প্রথম খোৎবার মর্ম্ম নিম্নরূপ ছিল—

সমস্ত মহিমা-গরিমা একমাত্র আল্লার জন্য ; আমি তাঁহারই মহিমা গাহি ও প্রচার করি। আমি তাঁহারই সাহায্য প্রার্থনা করি এবং (কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটির জন্য) তাঁহারই নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাই। সৎপথ-লাভ তাঁহারই নিকট যাচ্ঞা করি। তাঁহার প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখি ; তাঁহাকে অমান্য করিব না। তাঁহাকে অমান্য করে এমন ব্যক্তিকে কখনও মিত্র বানাইব না। আমি এই সাক্ষ্য ঘোষণা করিতেছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই ; তিনি এক, তাঁহার অংশীদার কেহ নাই এবং এই সাক্ষ্যও ঘোষণা করিতেছি যে, মোহাম্মদ তাঁহার বন্দা ও প্রেরিত রসুল। যখন দীর্ঘকাল যাবৎ বিশ্ব রসুল হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে—যখন ধরাপৃষ্ঠ হইতে সত্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যখন মানবজাতি ভ্রষ্টতা ও অনাচারে ডুবিয়া গিয়াছে, যখন বিশ্বের আয়ু শেষ প্রায় এবং কেয়ামত বা মহাপ্রলয় সমাগত, কর্ম্মফল ভোগের নির্দ্ধারিত সময় নিকবর্ত্তী—এহেন সময় আল্লাহ তাঁহার রসুল মোহাম্মদকে সত্যের জ্যোতি, জ্ঞানের আলো, সদোপদেশের আকর ও সঠিক ও বাস্তবমুখী ধর্ম্ম দিয়া জগদ্বাসীর প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন। আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলের অনুগত হইয়া চলিলেই মানব-জীবনের চরম সফলতা লাভ হইবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের অননুগত চলিলে পদস্খলন, অপরাধ-প্রবণতা এবং সুদূর প্রসারী ভ্রষ্টতা অবধারিত।

হে জনমণ্ডলী! তোমাদের প্রতি আমার চরম উপদেশ—তোমরা তাক্‌ওয়া তথা পরহেজগারী—আল্লাহনুরুক্তি ও আল্লার ভয়-ভক্তি অবলম্বন কর। (অর্থাৎ বিবেকের ঐ চরম উৎকর্ষ লাভ কর যে, কুভাব কুচিন্তা ও অপরাধ-প্রবণতার প্রবৃত্তিই হৃদয় হইতে মুছিয়া যায়—ঐসব কদর্য্যের প্রতি এমন ঘৃণা জন্মে যে, উহা স্বতঃই বিষবৎ পরিত্যজ্য বোধ হয়)।

পরকালের চিন্তা ও আল্লার ভয়-ভক্তি অবলম্বনের উপদেশ—এক মোসলেম অপর মোসলেমকে দিবার মত উৎকৃষ্টতর উপদেশ একমাত্র ইহাই। যে সব দুষ্কর্ম্মে আল্লাহ তোমাদেরে তাঁহার আজাবের ভয় দেখাইয়াছেন—সাবধান! উহার নিকটেও যাইও না ; ইহা অপেক্ষা উত্তম সদোপদেশ আর কিছুই হইতে পারে না, ইহা অপেক্ষা উত্তম সতর্কবাণী আর কিছু হইতে পারে না। প্রভু-পরওয়ারদেগার আল্লাহকে ভয় করিয়া যে ব্যক্তি আল্লার নিষিদ্ধসমূহকে বর্জ্জন করে—যাহাকে "তাক্‌ওয়া" বলে ; এই তাক্‌ওয়াই হইল মানুষের জন্য পরকালের সাফল্য লাভের প্রকৃত সাহায্যকারী।

আল্লার সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক এবং উহার যে কর্ত্তব্য রহিয়াছে—যে ব্যক্তি সেই সম্পর্ক ও কর্ত্তব্যকে ভিতরে-বাহিরে প্রকাশ্যে ও গোপনে ত্রুটিমুক্ত ও নিখুঁত

করিতে সচেষ্ট থাকিবে—একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ; ঐ ব্যক্তির এই প্রচেষ্টা তাহার জন্য ইহজীবনে অতি বড় সুনাম এবং পরজীবনে মহাসম্বল ও মহাসম্পদ হইবে—যখন মানুষের একমাত্র নির্ভরস্থল হইবে তাহার কৃত আমল। উল্লেখিত প্রচেষ্টা ছাড়া মানুষ দুনিয়ার বুকে যাহা কিছু করে পরজীবনে সে শত আকাঙ্খা করিবে—উহার হিসাব-নিকাশ হইতে যেন সে অনেক অনেক দূরে থাকে।

আল্লাহ তোমাদিগকে তাঁহার সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্কের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের ব্যাপারে পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিতেছেন। আল্লাহ স্বীয় বন্দাদের প্রতি অতিশয় দয়াময় ও কৃপাময়। আল্লার কথা সত্য, তাঁহার অঙ্গীকার সুরক্ষিত ও অলঙ্ঘনীয়—সেই মহানই বলিয়াছেন, "আমার কথার রদবদল নাই, আমি বন্দাদের প্রতি আদৌ কোন অবিচার করিব না।"

ইহজীবন ও পরজীবন উভয় জীবনের ব্যাপারে ভিতরে-বাহিরে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সর্ব্বতোভাবে আল্লার ভয়-ভক্তি সকলে অবলম্বন কর। যে ব্যক্তি আল্লার ভয়-ভক্তি অবলম্বন করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার গোনাহসমূহ মুছিয়া ফেলিবেন এবং অতি বড় প্রতিদান তাহাকে দান করিবেন। যাহার ভিতরে আল্লার ভয়-ভক্তি থাকিবে সে চরম সাফল্য লাভ করিবে।

স্মরণ রাখিও, আল্লার ভয়-ভক্তি তাঁহার গজব হইতে রক্ষা করে, তাঁহার আজাব হইতে বাঁচায়, তাঁহার অসন্তুষ্টি হইতে হেফাজত করে। আরও আল্লার ভয়-ভক্তি চেহারাকে উজ্জ্বল করিবে, প্রভু-পরওয়ারদেগারকে সন্তুষ্ট করিবে, মান-মর্য্যাদাকে উর্দ্ধে নিয়া যাইবে।

ইহজীবনের সুখ ভোগ কর, (কিন্তু ভোগের মোহে) আল্লার দাবী পুরণে শিথিল হইও না। আল্লাহ তোমাদিগকে তাঁহার কেতাব শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহার (পর্য্যন্ত পৌছার) পথ সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এখন কে প্রকৃতপক্ষে সত্যের সেবক, আর কে মিথ্যাবাদী কপট তাহাই আল্লাহ দেখিয়া নিবেন। সুতরাং আল্লাহ যেরূপ তোমাদেরে চরম উপকার করিয়াছেন তদ্রূপ তোমরাও নিজেদের উপকার কর—আল্লার শত্রুদেরে শত্রু গণ্য কর এবং তাঁহার (দ্বীনের) জন্য যথাযোগ্য জেহাদ কর। তিনি তোমাদিগকে (তাঁহার নিজের জন্য) নির্ব্বাচিত করিয়াছেন এবং তোমাদের নাম রাখিয়াছেন, মোছলেম—আত্মোৎসর্গকারী।

(আল্লাহ তায়ালা কেতাব ও পথের সন্ধান দানের সুব্যবস্থা এই উদ্দেশ্যে করিয়াছেন—) যেন ধ্বংসের পথ অবলম্বনকারী সেই পথে ধ্বংস হয় সুস্পষ্টরূপে জানিয়া-বুঝিয়া লওয়ার পর ; (ফলে তাহার কোন আপত্তির অবকাশ থাকিবে না।) এবং বাঁচিবার পথের সন্ধানী বাঁচিয়া যায় সুস্পষ্ট পথ পাইয়া। নিশ্চয় জানিও, আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও কোন শক্তি নাই। অতএব সদা আল্লাহকে

স্মরণ রাখিও, আর পরজীবনের জন্য সম্বল সঞ্চয় করিয়া লও। আল্লার সহিত নিজ সম্পর্ককে যে দৃঢ় ও নিখুঁত করিয়া লয় মানুষের সঙ্গে তাহার সমূদয় সম্পর্কের জন্য আল্লাহ তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইয়া যান। কারণ, মানুষের উপর আল্লারই হুকুম চলে—আল্লার উপর মানুষের হুকুম চলে না। মানুষ আল্লার উপর প্রভূত্ব রাখে না—আল্লাহই মানুষের উপর প্রভুত্ব রাখেন। আল্লাহু-আকবার—আল্লাহ সর্ব্বমহান; সেই মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও হস্তে কোন শক্তি নাই। (ওয়াকেদী, ২—১১৭; বেদায়াহ, ৩—)

জুমা শেষে নগর দিকে যাত্রা ঃ

জুমার নামায শেষ করিয়া নবী (দঃ) আবার নগর পানে যাত্রা করিলেন। নবী (দঃ) তাঁহারই বাহনের উপর পেছনে আবুবকর (রাঃ)কে বসাইলেন এবং ধীরে ধীরে নগরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দীর্ঘ তিন বৎসর হইতে মক্কার নীরব আকাবা প্রান্তরে যেই আকাঙ্খা পূরণের ব্যবস্থা করা হইতেছিল, তিন মাস পূর্ব্বেও সেই আকাবায় গভীর নিস্তব্ধ নিবিড় অন্ধকার-আড়ালে যেই গুপ্ত পরামর্শ করা হইয়া ছিল যে, নবীজী মোস্তফা (দঃ) মদিনায় আগমন করিবেন—আজ সেই পূণ্য-প্রতিশ্রুতি সফল হইতে চলিয়াছে; মদিনার আনছার ও প্রবাসী মোহাজেরগণ বহুদিনের ব্যাকুল প্রতীক্ষার পর নিজেদের আশাতীত সৌভাগ্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দে-উৎসাহে মাতওয়ারা হইয়া উঠিলেন।

মোসলেম মদিনার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নবীজীর প্রাণ-ঢালা অভ্যর্থনার জন্য মাতিয়া উঠিয়াছে। সশস্ত্র বনু-নাজ্জার বংশের লোকগণ নবীজীর কাছওয়া উষ্ট্রীর অগ্রে-পশ্চাতে এবং দক্ষিণে ও বামে দল বাঁধিয়া চলিয়াছেন রাজকীয় শান প্রদর্শনে। স্থানে স্থানে খঞ্জর ও বর্শা চালাইয়া যুদ্ধ-মহড়া প্রদর্শনীর ধুম চলিয়াছে সর্ব্বত্র। সমগ্র নগরের ছাদ ও বারান্দাগুলি পরিপূর্ণ হইয়া গেল উৎসুক দর্শকদের ভিড়ে। এমনকি (তখন ত শরীয়তে পর্দ্দার হুকুম ফরজ হইয়াছিল না, তাই) অভিজাত মহিলারা পর্য্যন্ত নিজ নিজ গৃহ-ছাদে আরোহন করিয়া শত শত আবেগে তাকাইয়া ছিল নবীজীর দর্শন লাভের আকাঙ্খায়। সকলের অন্তরে আনন্দ হিল্লোল বহিয়া যাইতে ছিল নবীজীর আগমন আশায়। কী আনন্দ! কী আগ্রহ সকলের মনে! নর-নারী, ছোট বড় সকলের মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে মহা আনন্দের আভা। বালক-বালিকাদের বিরামহীন ছুটাছুটি চলিয়াছে সড়কে সড়কে, গলিতে গলিতে। তাহারা দফ্ বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে সর্ব্বত্র আনন্দ-ধ্বনি দিতে লাগিল—আল্লাহু-আকবার জাআ-মোহাম্মদ! (Welcome—মোহাম্মদের শুভাগমন—ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) আল্লাহু-আকবার, জাআ-রসুলুল্লাহ। (আল্লার রসুলের শুভাগমন।)

সকলের অন্তরে আজ নব কৌতূহল, চেহারায় তাঁহাদের আনন্দোচ্ছ্বাস, সম্মুখে তাঁহাদের কত কত রঙ্গীন স্বপ্ন! এই অতুলনীয় আনন্দ-উৎসবের মাঝে মহামানব নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বহন করিয়া তাঁহার কাছওয়া উষ্ট্রী ধীরে ধীরে নগরে প্রবেশ করিতে লাগিল। মদিনার বিশিষ্ট শ্রেণীর প্রায় পাঁচ শত গণ্য-মান্য ব্যক্তিবর্গ আগাইয়া আসিলেন নবীজী (দঃ)কে স্বাগত জানাইবার জন্য। শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল—

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا — مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا — مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعٍ

اَيُّهَا الْمَبْعُوْثُ فِيْنَا — جِئْتَ بِالْاَمْرِ الْمُطَاعِ

"মোদের পরে পূর্ণচাঁদের হয়েছে উদয়
ছানিয়াতুল-অদা* পথে দেখ্‌বি যদি আয়।
শোকোর কর্‌ব মোরা সবে সদা সর্ব্বজনে
ডাক্‌বে যাবৎ ধরা পৃষ্ঠে কেহ আল্লাহ পানে**।
মহান তুমি আস্‌হ ধরায় মোদের শান্তি নিয়ে
বরণ করব তোমায় মোরা প্রাণ ঢেলে দিয়ে।
(যোরকানী, ১—৩৫৯। বেদায়াহ, ৩—১৯৭)

মদিনা নগর পৃষ্ঠে নবীজী (দঃ)ঃ

মদিনার রাজপথে নবীজীর বাহন চলিতেছে; কত মনের মত আকাঙ্খা—নবীজী আমাদের গৃহে অবতরণ করিবেন। প্রত্যেক গৃহ হইতে নবীজী (দঃ)কে সাদর-আহ্বান জানানো হইতেছিল। নবীজীর অন্তরে এই ইচ্ছা বিদ্যমান ছিল যে, তিনি তাঁহার পিতামহের মাতুল বনু-নাজ্জার গোত্রের কোন গৃহে অবতরণ করিয়া তাঁহাদের সম্মান বর্দ্ধিত করিবেন। নবীজী (দঃ) তাঁহার মনোভাব মুখেও প্রকাশ করিয়াছেন যে—

اَنْزِلُ عَلٰى بَنِى النَّجَّارِ اَخْوَالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اُكْرِمُهُمْ بِذٰلِكَ

"পিতামহ আবদুল মোত্তালেবের মাতুল বনু-নাজ্জার গোত্রে অবতরণ করিব; এতদ্দ্বারা আমি তাঁহাদের সম্মান বর্দ্ধিত করিব" (মোসলেম শঃ)। কিন্তু নবীজী (দঃ) সকলের সহিত সমব্যবহার প্রতিষ্ঠা কল্পে, এবং বনু-নাজ্জার গোত্রের লোকও ত বহু

---

* মদিনা নগরে প্রবেশ-প্রান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত মালার একটি বিশেষ স্থান।

** অর্থাৎ যাবৎ আল্লার নাম বাকি থাকিবে তথা জগতের অস্তিত্ব থাকিবে।

সংখ্যক ; তাঁহাদেরও প্রত্যেক পরিবার নবীজীকে প্রাণ-ঢালা সাদর আহ্বান জানাইতেছিলেন। তাই নবী (দঃ) অবতরণ সম্পর্কে নিজ ইচ্ছার প্রতি তৎপরতা ত্যাগ করিলেন। নবীজী (দঃ) সকলকে একই উত্তর দিতেছিলেন—"আমার উষ্ট্রীকে তাহার ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দাও সে আল্লার আদেশে চলিবে আল্লার আদেশে বসিবে ; আল্লাহ আমাকে যথায় অবতরণ করাইবেন আমি তথায়ই অবতরণ করিব।" নবীজী (দঃ) সবাইকে এই উত্তর দিতে লাগিলেন এবং উষ্ট্রীর লাগাম-দড়ি শিথিল করিয়া দিলেন। উষ্ট্রি ধীরে ধীরে চলিয়া নাজ্জার গোত্রীয় আবুআইউব আনছারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বাড়ীর নিকটে পোঁছিয়া বসিয়া পড়িল।

নবীজী (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার আপনজন (বন্নু-নাজ্জার গোত্রের) কাহার গৃহ অধিক নিকটবর্ত্তী ? আবুআইউব আনছারী (রাঃ) আনন্দে গদগদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, সর্ব্বাধিক নিকটবর্ত্তী এই আমার গৃহ, এই আমার গৃহ-দ্বার। নবীজী (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, গৃহে যাইয়া আমাদের জন্য আরাম করার ব্যবস্থা করিয়া আস। তৎক্ষণাৎ আবুআইউব (রাঃ) গৃহে গেলেন এবং সমূদয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া আসিলেন। আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনাদের আরামের ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়াছি ; আপনি ও আবুবকর (রাঃ)—আল্লার বরকত ও মঙ্গলময় আপনারা উভয়ে তশরীফ নিয়া চলুন। তাঁহারা সেই গৃহে তশরীফ নিয়া গেলেন (বেদায়াহ, ৩—২০০)। আবুআইউব আনছারী (রাঃ) এবং তাঁহার সহিত নবীজীর পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ) যিনি পূর্ব্বেই হিজরত করিয়া আসিয়া ছিলেন—তাঁহারা উভয়ে নবীজীর আসবাবপত্র উঠাইয়া গৃহে নিয়া গেলেন। (যোরকানী, ১—৩৫৭)

বন্নু নাজ্জার বংশীয় কতিপয় আনন্দে আত্মহারা বালিকা দফ্ বাজাইয়া আনন্দ-গীত বা তারানা গাহিতে লাগিল—

نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ — يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارِ

"বন্নুনাজ্জার-দুলালী মোরা
আনন্দ মোদের চরম।
মোহাম্মদ মোদের পরশী হলেন
ভাগ্য মোদের পরম।"
(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)

নবীজী (দঃ) তাহাদের প্রতি প্রীতি প্রদর্শনে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা আমাকে ভালবাস ? তাহারা সমস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল—কসম খোদার! নিশ্চয় ইয়া রসুলুল্লাহ। নবীজী (দঃ) তাহাদের

একবার উক্তির উত্তরে তিন বার বলিলেন, আমিও তোমাদেরকে ভালবাসিব—আল্লাহ সাক্ষী আছেন আমার অন্তর তোমাদেরে ভালবাসে। (বেদায়াহ, ৩—২০০)

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদর্শ ছিল—

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا......

"আমার উম্মতে সামিল নহে ঐরূপ ব্যক্তি যে, ছোটদেরকে স্নেহ মমতা ও আদর না করে এবং বড়দিগকে সম্মান না করে। (মেশকাত শরীফ ৪২৩)

আবুআইউব আনছারীর গৃহে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অবতরণের পেছনে উহার একটি ঐতিহাসিক পটভূমি রহিয়াছে। যাহার বিবরণ এই—

ঐতিহাসিকদের নিকট অগ্রগণ্য মতের হিসাবে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্মের এক হাযার বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা—তখন ইয়্যামানের বাদশাহদের পদবী ছিল "তুব্বা" যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে। সেই "তুব্বা" পদবীর এক বাদশাহ যিনি অতিশয় নেক ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, তিনি কোন এক ভ্রমণে মদিনার এলাকায় পৌঁছিলেন; ঐ এলাকা তখন অনাবাদ। সঙ্গী আলেমগণ যাঁহারা আসমানী কেতাবের খাঁটী এল্‌ম্ রাখিতেন, তাঁহাদের মারফত তিনি জানিতে পারিলেন যে, এই এলাকাই সর্ব্বশেষ পয়গাম্বর "মোহাম্মদ" নামীয় রসুলের হিজরত-স্থান হইবে।

বাদশাহ এই ভবিষ্যদ্বাণী জ্ঞাত হইতে পারিয়া ঐ অঞ্চলে আলেমদেরই একটি দলের বসতি স্থাপন করিয়া উহাকে আবাদ করিলেন এবং আখেরী জমানার পয়গাম্বর মোহাম্মদ (দঃ)কে লক্ষ্য করিয়া একখানা লিপিও লিখিলেন যাহার মধ্যে তিনি হযরতের প্রতি স্বীয় ঈমান ও বিশ্বাস প্রকাশ করতঃ আখেরাতে তাঁহার শাফায়া'ত কামনা করিয়াছিলেন। পত্রখানা তথায় বসবাসকারী একজন আলেমের হস্তে অর্পণ করিয়া উহাকে স্বয়ং বা তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধরগণের মাধ্যমে পরম্পরা আখেরী জমানার পয়গাম্বরের নিকট পৌঁছাইবার অছিয়ত করিয়াছিলেন।

সেই তুব্বা' বাদশাহ হযরতের উদ্দেশ্যে তথায় একটি বাড়ীও তৈরী করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন যে, আবুআইউব আনছারী (রাঃ) ছাহাবীর বাড়ী সেই তুব্বা' বাদশাহ কর্ত্তৃক তৈরী বাড়ীর স্থানেই অবস্থিত। এমনকি সেই বাদশার উল্লেখিত লিপিখানাও হযরতের হস্তে পৌঁছিয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। একটি হাদীছে ইহাও বর্ণিত আছে যে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন তোমরা তুব্বা'কে মন্দ বলিও না; সে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। (তফছীর রুহুল-মায়া'নী ২৫—১২৭)

কোবা পল্লী সম্পর্কীয় ঘটনাবলী বর্ণনায় একটি হাদীছ—

১৭০৯। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কা হইতে অন্তর্দ্ধানের পরেই সারা মদিনায় খবর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) মক্কা ত্যাগ করতঃ মদিনাপানে রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। সেমতে মদিনার মোসলমানগণ প্রতিদিন ভোর হইতেই মদিনার বাহিরে আসিয়া হযরতের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে থাকিতেন, এমনকি রৌদ্রের উত্তাপে প্রস্থানে বাধ্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা অপেক্ষমানরূপে অবস্থান করিতেন।

একদিন তাঁহারা ঐরূপ অপেক্ষা করতঃ বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছেন এমতাবস্থায় এক ইহুদী ব্যক্তি উঁচু টিলার উপর কোন আবশ্যকে দাঁড়াইলে সে দূর হইতে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণকে সাদা পোশাকে দেখিতে পাইল। ইহুদী ব্যক্তি তাঁহাদিগকে দেখা মাত্র অধীর হইয়া উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—হে আরব-বংশধরগণ! তোমাদের অদৃষ্টের শুভ চন্দ্র উদিত হইয়াছে—যাহার অপেক্ষা তোমরা করিতেছিলে। এই সংবাদ শুনা মাত্র মোসলমানগণ ফৌজী কায়দায় সুসজ্জিত হইয়া ছুটিয়া চলিল এবং মদিনার শহর প্রান্ত কাঁকরময় ময়দানে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ করিল।

হযরত (দঃ) সঙ্গীগণকে লইয়া (মুল মদিনা শহরে আসিলেন না, বরং) ডান দিকের রাস্তায় অগ্রসর হইয়া বনী আ'ম্‌র ইবনে আ'উফ্ গোত্রের বস্তিতে অবতরণ করিলেন। সেই দিনটি রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার দিন ছিল। সাক্ষাৎকারী লোকদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলার জন্য আবুবকর (রাঃ) দাঁড়াইলেন; রসুলুল্লাহ দঃ) চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মদিনাবাসীগণ যাঁহারা পূর্ব্বে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে দেখেন নাই তাঁহারা আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতিই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অতঃপর যখন হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শরীরে রৌদ্র আসিবার দরুন আবুবকর (রাঃ) আগাইয়া আসিয়া স্বীয় চাদরের সাহায্যে হযরতের উপর ছায়া দানের ব্যবস্থা করিলেন তখন সকলে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসল্লামকে চিনিতে পারিলেন।

ঐ বস্তিতে হযরত (দঃ) দশ দিনের অধিক অবস্থান করিলেন এবং তথায় একটি মসজিদ তৈরী করিলেন*—সেই মসজিদটির প্রশংসাই পবিত্র কোরআনে উল্লেখ হইয়াছে যে, "এই মসজিদের ভিত্তি রাখা হইয়াছে আল্লাহ তায়ালার ভয়-ভক্তির একনিষ্ঠতার উপর।" হযরত (দঃ) তথায় সেই মসজিদেই নামায পড়িয়া থাকিতেন। তারপর হযরত (দঃ) মূল মদিনায় পৌঁছিবার জন্য স্বীয় যান-বাহনে আরোহন করতঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অন্যান্য লোকগণ হযরতের পেছনে পেছনে চলিতে

* সেই বস্তিটির নামই "কোবা" তথায় এখনও সেই মসজিদ বিদ্যমান রহিয়াছে।

লাগিল। হযরতের যানবাহন ঠিক ঐস্থানে আসিয়া বসিয়া পড়িল যে স্থানে বর্ত্তমানে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদ অবস্থিত। তথায় হযরতের পৌঁছিবার পুর্ব্ব হইতেই কিছু সংখ্যক মোসলমান নামায পড়িয়া থাকিতেন এবং ঐ স্থানটি বস্তুতঃ মদিনাবাসী দুই এতিম ছেলের মালিকানায় ছিল, ঐস্থানে খেজুর শুখান হইত। হযরত (দঃ) ঐ স্থানটি উহার মালিক ভ্রাতাদ্বয়ের নিকট হইতে খরিদ করিতে চাহিলেন। তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমরা বিক্রি করিব না, বরং ইহা আপনাকে বিনা মূল্যে হেবা করিয়া দিব, (এবং একমাত্র আল্লাহ তায়ালার নিকটই ইহার বিনিময়ের প্রত্যাশা রাখিব।) কিন্তু হযরত (দঃ) বিনা মূল্যে উহা গ্রহণ করিতে রাজি হইলেন না, অবশেষে হযরত (দঃ) মালিক-দ্বয়ের নিকট হইতে উহা খরিদ করিয়া লইলেন, তারপর তথায় মসজিদ তৈরীর ব্যবস্থা করিলেন। মসজিদ তৈরীকালে ইট পাথর বহন করিয়া আনার কার্য্যে স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)ও শরীক হইয়াছেন এবং তিনি সেই ইটের বোঝা বহনকালে দুইটি বয়েত পড়িতে ছিলেন—

هٰذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالَ خَيْبَرْ — هٰذَا اَبَرُّ رَبَّنَا وَاَطْهَرْ (১)

"এই বোঝা জাগতিক ধন-দৌলতের বোঝা নহে; হে পরওয়ারদেগার! আমি বিশ্বাস করি যে, এই বোঝা দুনিয়ার ধন-দৌলতের বোঝা অপেক্ষা অনেক মূল্যবান অনেক পবিত্র।"

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْاَجْرَ اَجْرُ الْاٰخِرَةْ — فَارْحَمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةْ (২)

"হে আল্লাহ! আখেরাতের প্রতিদান-পুরস্কারই আসল পুরস্কার ও প্রতিদান; অতএব আনছার ও মোহাজেরগণের প্রতি দয়া করুন—(তাহাদিগকে সেই পুরস্কার ও প্রতিদানই পূর্ণরূপে দান করুন।)"

১৭১০। হাদীছঃ—(৫৫৬ পৃঃ) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদিনার দিকে আসিতেছিলেন, আবুবকর (রাঃ) তাঁহার পেছনে পেছনে ছিলেন। আবুবকর (বয়সে হযরতের ছোট ছিলেন বটে, কিন্তু বাহ্যিক আকৃতিতে তিনি হযরত (দঃ) অপেক্ষা অধিক) বৃদ্ধ দেখাইতেন এবং তিনি বহিরাঞ্চলের লোকদের নিকট পরিচিত ছিলেন; (যেহেতু তিনি ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য দেশ-বিদেশ ঘুরিতেন।) পক্ষান্তরে হযরত (দঃ) বয়সে আবুবকরের বড় হইয়াও বাহ্যিক আকৃতিতে আবুবকর অপেক্ষা অধিক) বলিষ্ঠ দেখাইতেন

এবং তাঁহাকে সাধারণতঃ লোকেরা চিনিত না। পথিমধ্যে লোকদের সঙ্গে দেখা হইলে তাহারা আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট হযরতের প্রতি ইশারা করিয়া জিজ্ঞাসা করিত, তিনি কে? তখন আবুবকর (শত্রুর ভয়ে গোপনীয়তা অবলম্বনে) বলিতেন, "এই লোকটি আমাকে পথ দেখাইয়া থাকেন।" জিজ্ঞাসা-কারী ইহার অর্থ "সাধারণ জাগতিক পথ" গণ্য করিত; আর আবুবকর (রাঃ) আখেরাতের পথ উদ্দেশ্য করিতেন। এইভাবে আবুবকর (রাঃ) স্বীয় উক্তিতে সত্যবাদী থাকিয়া মূল বিষয় গোপন রাখিতেন।)

এক সময় আবুবকর (রাঃ) পেছনের দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইলেন এক ব্যক্তি দ্রুত ঘোড়া হাঁকাইয়া তাঁহাদের পর্য্যন্ত পেঁাছিয়া যাইতেছে। তখন আবুবকর (রাঃ) আতঙ্কিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ। ঐ দেখুন এক অশ্বারোহী ঘাতক শত্রু আমাদের পর্য্যন্ত পেঁাছিয়া যাইতেছে। তখন হযরত পেছনের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, اللهم اصرعه—ইয়া আল্লাহ! এই মানুষটাকে পাছড়াইয়া ফেলুন। তৎক্ষণাৎ ঘোড়াটি তাহাকে পৃষ্ঠ হইতে ফেলিয়া দিল; তারপর (ঘোড়ার পা জমিনে গাড়িয়া যাওয়ায়) ঘোড়াটি (আবদ্ধরূপে) দাঁড়াইয়া চিৎকার আরম্ভ করিল। ঐ লোকটি বলিল, হে আল্লার নবী! আমাকে যাহা আদেশ করিবেন আমি তাহাই করিব; (আমাকে রক্ষা করুন।) হযরত (দঃ) তাহাকে বলিলেন, সম্মুখের দিকে আর অগ্রসর হইও না এবং আমাদের পেছনে যে কাহাকেও আসিতে দেখিবে তাহাকে ফিরাইয়া দিবে। (সেই ব্যক্তি তাহাই করিল—কাহাকেও হযরতের তালাশে আসিতে দেখিলে সে বলিত, এই দিকে যাইতে হইবে না; আমি সব দেখিয়া আসিয়াছি।)

আবুবকর (রাঃ) বলেন, আল্লার কুদরত! যে ব্যক্তি দিনের প্রথম ভাগে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শত্রু বা ভক্ষক ছিল সে-ই দিনের শেষভাগে তাঁহার মিত্র ও রক্ষক হইয়া দাঁড়াইল।

মদিনায় পৌঁছিয়া হযরত (দঃ) মূল শহরে আসিলেন না, বরং শহরের কিনারায় (কোবা নামক মহল্লায়) অবস্থান করিলেন। তথায় কতেকদিন অবস্থান করার পর হযরত (দঃ) মদিনা শহরে অবস্থানকারী আন্‌ছারগণকে একদিন সংবাদ পাঠাইলেন। তাঁহারা হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং সালাম আরজ করিয়া নিবেদন জানাইলেন যে, আপনারা উভয়ে এখনই যানবাহনে আরোহন করিয়া মদিনা শহরে চলুন; আমরা আপনাদের চির খাদেমরূপে আজ্ঞাবহ থাকিব। হযরত নবী (দঃ) এবং আবুবকর (রাঃ) যানবাহনে আরোহন করিলেন। মদিনাবাসী আনছারগণ ফৌজী সজ্জায় সজ্জিত অবস্থায় তাঁহাদিগকে নিজেদের মধ্যস্থলে বেষ্টিতরূপে রাজকীয় শান-শৌকতের সহিত মদিনায় নিয়া আসিলেন।

হযরত (দঃ) মদিনায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সারা মদিনা উল্লাস ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল—বাড়ী-ঘরের ছাদ এবং উঁচু উঁচু টিলা সমূহের উপর হইতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শুভাআগমন-ধ্বনি গর্জিয়া উঠিতে লাগিল।

এইরূপ স্বতঃস্ফুর্ত্ত উল্লাস ধ্বনির মধ্য দিয়া হযরত (দঃ) অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশেষে আবু আইউব আন্‌ছারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বাড়ীর নিকটবর্ত্তী আসিয়া অবতরণ করিলেন।

হযরত নবী (দঃ) আবু আইউব আনছারী (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার আপন-জনের মধ্য হইতে কাহার বাড়ী নিকটবর্ত্তী আছে ? আবু আইউব আনছারী (রাঃ) আরজ করিলেন, আমি উপস্থিত আছি ; আমার বাড়ীই সর্ব্বাধিক নিকটবর্ত্তী—এই আমার ঘর এবং এই আমার বাড়ীর গেট। হযরত (দঃ) তাঁহাকে বলিলেন, আচ্ছা—বাড়ী যাও এবং আমার জন্য আরাম করার ব্যবস্থা কর। আবু আইউব (রাঃ) (তাহা করিলেন এবং) বলিলেন, আপনারা উভয়ে (হযরত (দঃ) এবং আববুকর (রাঃ) আমার বাড়ী তশরীফ নিয়া চলুন ; আল্লাহ আমাদেরকে বরকত দান করিবেন। সেমতে হযরত নবী (দঃ) আবু আইউবের গৃহে তশরীফ আনিলেন।

১৭১১। **হাদীছ**ঃ—(৫৫৯ পৃঃ) আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন হিজরত করিয়া মদিনা অঞ্চলে পৌঁছিলেন তখন প্রথম অবস্থায় তিনি মদিনার মূল শহরে আসিয়াছিলেন না, বরং তিনি মদিনার উর্দ্ধ প্রান্তে অবস্থিত—বনু-আ'ম্‌র্‌ ইবনে আ'উফ্‌ গোত্রের (কোবা নামক) মহল্লায় অবস্থান করিয়াছিলেন। তথায় হযরত (দঃ) চৌদ্দ দিন অবস্থান করিলেন, অতঃপর (মদিনার সুপ্রসিদ্ধ গোত্র - হযরতের দাদার মাতুল বংশ) বনু-নাজ্জার গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোকগণকে সংবাদ দিলেন। তাঁহারা (হযরতের মনোবলকে দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে শান-শৌকতের সহিত) ফৌজী সজ্জায় সজ্জিত হইয়া হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। হযরত (দঃ) আবুবকর সমভিব্যাহারে উটের উপর ছওয়ার হইয়া মদিনা শহর পানে যাত্রা করিলেন। বনু-নাজ্জার গোত্রের লোকগণ হযরত (দঃ)কে চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিল। আনাছ (রাঃ) বলেন, সেই স্মৃতি এখনও যেন আমার চোখে ভাসে।

ঐভাবে বিশেষ শান-শৌকতের সহিত হযরত (দঃ) মদিনা শহরে পৌঁছিলেন এবং তাঁহার যানবাহনটি আবু আইউব আনছারী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া বসিয়া পড়িল। হযরত (দঃ) (মদিনা শহরে তথায়ই অবস্থান করিলেন এবং তিনি) নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইলে যথায় থাকিতেন তথায়ই নামায আদায় করিয়া লইতেন, এমনকি বকরি রাখার ঘরেও তিনি আবশ্যক বোধে নামায পড়িয়া থাকিতেন। (তখন মসজিদের কোন ব্যবস্থা ছিল না।) অতঃপর

হযরত (দঃ) মসজিদ তৈরীর প্রতি দৃষ্টি দিলেন এবং (বর্ত্তমান মসজিদে-নববীর স্থানটি ঐ সময় খেজুর বাগান ছিল, উহা সম্পর্কে কথাবার্ত্তা চালাইবার উদ্দেশ্যে) বনু-নাজ্জার গোত্রের প্রধানদিগকে ডাকিয়া আনিলেন। তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা তোমাদের এই বাগানটির মূল্য কি চাও তাহা আমাকে বল। তাহারা বলিল, খোদার কসম— আমরা মুল্য চাই না, ইহার মুল্য আমরা একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার নিকট পাইতে চাই।

সেই বাগানটিতে ছিল কতিপয় অমোসলেমের পুরাতন কবর এবং পুরান ঘর-বাড়ীর ভগ্নস্তূপ ও খেজুর বৃক্ষ। হযরত (দঃ) কবরগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিতে আদেশ করিলেন এবং ভগ্নস্তূপগুলিকে সমান করিয়া ফেলিতে বলিলেন এবং খেজুর বৃক্ষগুলিকে কাটিয়া ফেলিতে বলিলেন। তাহাই করা হইল এবং খেজুর বৃক্ষগুলিকে মসজিদের কেবলা দিকে সারিবদ্ধাকারে গাড়িয়া দেওয়া হইল। মসজিদের দরওয়াজার উভয় চৌকাঠ পাথরের তৈরী করা হইয়াছিল। সেই পাথর (এবং ইটা ইত্যাদি) উঠাইয়া আনিবার সময় ছাহাবীগণ তারানা গাহিতেছিলেন, রছুলুল্লাহ্ (দঃ)ও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহাদের তারানা এই ছিল—

اَللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُ الْاٰخِرَةْ — فَانْصُرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةْ

"হে আল্লাহ! পরকালের উন্নতিই একমাত্র উন্নতি, অতএব আনছার ও মোহাজের জমাতকে সেই পথে সাহায্য করুন।"

আবু আইউব (রাঃ)-গৃহে নবীজী (দঃ)

আবু আইউব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর গৃহ ছিল দ্বিতল। তিনি নবীজী মোস্তফা (দঃ)কে উপর তলায় অবস্থানের অনুরোধ করিলেন—আরজ করিলেন, হে আল্লার নবী! আমার মাতাপিতা আপনার চরণে উৎসর্গীত; আপনার চরণ আমাদের মাথার উপর থাকিবে ইহাই অবধারিত। আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমি আপনার উপরে অবস্থান করিব। অতএব আমরা নীচের তলায় আসিয়া যাই, আপনি উপর তলায় তশরীফ নিয়া যাইবেন। নবী (দঃ) বলিলেন, আবু আইউব! আমার জন্য এবং আমার সাক্ষাৎ প্রার্থীদের জন্য সুবিধাজনক ইহাই যে, আমি নীচের তলায় থাকি। অগত্যা তাহাই হইল—আবু আইউব-পরিবার উপর তলায় এবং নবীজী মোস্তফা (দঃ) নীচের তলায় থাকিলেন।

রাত্রিবেলা উপর তলায় একটি পানির পাত্র ভাঙ্গিয়া গিয়া পানি ছড়াইয়া পড়িল। আবু আইউব (রাঃ) ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন যে, নীচের তলায় পানি পড়িলে নবীজীর কষ্ট হইবে, তাই নিজেদের যে একটি মাত্র লেপ ছিল উহাকেই সম্পূর্ণ ভিজাইয়া পানি মুছিয়া নিলেন।

এতদ্ভিন্ন আবু আইউব (রাঃ) এবং তাঁহার স্ত্রী এই ভাবিয়া ভীত থাকিলেন যে, আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপরে আছি, আমরা তাঁহার উপরে চলাফেরা করি। এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা শয্যা ত্যাগ করিয়া কক্ষের এক কেনারায় সারা রাত্র বসিয়া থাকিলেন। ভোরবেলা নবীজী (দঃ)কে সকল তথ্য অবগত করিয়া তাঁহাকে উপর তলায় যাইবার অনুরোধ করিলেন। নবী (দঃ) পূর্ব্বের ন্যায় এইবারও সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সুবিধার কথা উল্লেখ করিলেন। কিন্তু আবু আইউব (রাঃ) উপরে থাকিতে কোন প্রকারেই সম্মত হইলেন না। অবশেষে নবী (দঃ) উপরতলায় তশরীফ নিলেন, আবু আইউব-পরিবার নীচের তলায় অবস্থান করিল।

আবু আইউব আনছারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা আহার্য্য তৈরী করিয়া নবীজী সমীপে উপস্থিত করিতাম। নবী (দঃ) উহা হইতে খাদ্য গ্রহণ করার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা আমাদের নিকট ফেরত পাঠাইতেন। আমরা লক্ষ্য করিতাম পাত্রস্থ খাদ্যের কোন্ স্থানে নবীজীর অঙ্গুলি-চিহ্ন দেখা যায়? আমি এবং আমার স্ত্রী ঐ বরকতপূর্ণ স্থান তালাশ করিয়া তথা হইতে খাদ্য গ্রহণ করিতাম। একদা আমরা ভীষণ উদ্বিগ্ন হইলাম যে, পাত্রস্থ খাদ্যের কোন স্থানেই নবীজীর অঙ্গুলী-চিহ্ন দেখা যায় না; মনে হয় নবীজী (দঃ) পাত্র হইতে কিছুই গ্রহণ করেন নাই।

আবু আইউব (রাঃ) বলেন, আমি অতিশয় ব্যস্ত-ত্রস্তভাবে নবীজীর খেদমতে উপস্থিত হইয়া খাদ্য গ্রহণ না করার হেতু জানিতে দরখাস্ত করিলাম। নবী (দঃ) বলিলেন, এই খাদ্যে পেয়াজের গন্ধ ছিল, তাই আমি উহা খাই নাই; কারণ আমাকে ফেরেশতার সঙ্গে আলাপ করিতে হয়; বিন্দুমাত্র দুর্গন্ধেও ফেরেশতাগণের কষ্ট হয়। তোমরা ঐ খাদ্য খাইয়া নেও। অতঃপর নবীজীর খাদ্যে আর কোন সময় পেয়াজ-রসুন দেওয়া হইত না (যোরকানী, ১—৩৫৮)।

পেয়াজ-রসুন খাওয়া সম্পর্কে মছআলাহ ইহাই যে, যে সময় বা যেস্থানে ফেরেশতাগণের আনাগোনা থাকে বা লোকদের সহিত মেলামেশা হয় এইরূপ সময় ও ক্ষেত্রে পেয়াজ-রসুনের দুর্গন্ধ মুখে রাখিয়া উপস্থিত হওয়া নিষিদ্ধ। সেমতে পেয়াজ-রসুন খাইয়া মসজিদে বা নামাযে গমন একেবারেই নিষিদ্ধ। অবশ্য যদি পেয়াজ-রসুন পূর্ণ পক্ক হয় যে, উহাতে দুর্গন্ধের লেশমাত্র নাই তবে উহার কথা স্বতন্ত্র।

আবু আইউব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর গৃহে নবীজী (দঃ) অবস্থান করাকালে অন্যান্য ছাহাবীগণও নবীজীর জন্য খাদ্য সামগ্রী হাদিয়া দিয়া থাকিতেন। মদিনাবাসী যায়েদ ইবনে ছাবেৎ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ঐ সময় সর্ব্বপ্রথম আমি হাদিয়া নিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। একটি পাত্রে দুধ ও মাখনে খণ্ড-বিখণ্ড রুটি ভিজাইয়া রাখা হইয়াছিল যাহাকে "ছরীদ" বলা হয়। আমি ঐ খাদ্যের পাত্র লইয়া নবীজী সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং আরজ করিয়াছিলাম, আমার মাতা এই খাদ্য হাদিয়া

পাঠাইয়াছেন। নবী (দঃ) উত্তরে বলিয়াছিলেন, "আল্লাহ তোমাদেরে বরকত—মঙ্গল ও উন্নতি দান করুন।" অতঃপর উপস্থিত সকলকে ডাকিয়া একত্রে ঐ খাদ্য খাইয়াছিলেন।

যায়েদ ইবনে ছাবেৎ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরে যাঁহার হাদিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তিনি হইলেন সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)। তিনি গোশ্‌তের সুরুয়ায় ভিজানো রুটি উপস্থিত করিয়াছিলেন। এইভাবে প্রতি দিনই বিভিন্ন ছাহাবীগণের হাদিয়া—খাদ্য নবীজী সমীপে উপস্থিত হইয়া থাকিত। প্রত্যেক রাত্রেই দেখা যাইত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দ্বারে তিন-চার জন ছাহাবী খাদ্য সামগ্রী লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। (বেদায়াহ, ৩—২০২)

নবীজীর পদার্পণে মদিনা ঃ

মদিনা নগরীর পূর্ব্ব নাম ছিল "ইয়্যাছ্‌রেব"। নবী (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, উহার নাম "মদিনা" হইবে (দ্বিতীয় খণ্ড ৯৫৫ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)। "মদিনা" অর্থ নগরী বা শহর। সেমতে নবীজীর আগমনের পরে সাধারণভাবে ইহাকে "মদিনাতুন-নবী" বলা হইত; অর্থাৎ নবীর শহর। অতঃপর সংক্ষেপে শুধু "মদিনা" শব্দই থাকিয়া যায়; উহার সহিত একটি গুণবাচক শব্দ মিলাইয়া বলা হয় "মদিনা-মোনাওওয়ারাহ" অর্থাৎ নূরে পরিপূর্ণ নগরী।

নবীজীর পদার্পণে এই নগরীর প্রকৃত অবস্থার ইঙ্গিত উহার আর একটি নামের দ্বারা পাওয়া যায়; সেই নামটি আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং স্থির করিয়াছেন। মোসলেম শরীফের হাদীছে আছে—

"জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি ان الله سمى المدينة طابة —নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মদিনার নাম "তাবাহ" রাখিয়াছেন। "তাবাহ" অর্থেই বিভিন্ন হাদীছে ইহার নাম "তায়বাহ"ও উল্লেখ আছে। সাধারণভাবে গুণবাচক শব্দের সহিত এই নগরীকে "মদিনা-তায়্যেবাহ্‌ও বলা হয়।

"তাবা, তায়বা ও তায়্যেবাহ্ শব্দত্রয়ের এক অর্থ উৎকৃষ্ট; ভূপৃষ্ঠে মদিনা সত্যই সর্বোৎকৃষ্ট ভূখণ্ড। এমনকি অনেকের মতে নবীজীর আগমণে মদিনা মক্কা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। উক্ত শব্দত্রয়ের আর এক অর্থ আছে পাক-পবিত্র; মদিনার ভূখণ্ডে মহাপবিত্রাত্মা নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পদার্পণে মদিনা এমন পবিত্র হইয়াছিল যে, ইহুদ-মোনাফেকদের ন্যায় অপবিত্রদের তথায় সাময়িক অবস্থান সত্তেও উহা আল্লাহ তায়ালার নিকট পবিত্র গণ্য হইতে ছিল। এমনকি অপবিত্রদেরকে বাহির করিয়া দেওয়ার বৈশিষ্ট্য মদিনার ভূমিতে আল্লাহ তায়ালা প্রদান করেন—যাহার বিকাশ সাধারণভাবে সময় সময় ক্ষেত্র বিশেষে ত হইয়াছেই; কেয়ামতের নিকটবর্ত্তী সময়ে মদিনার এই বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ বিকাশ হইবে। এই তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে ৯৫৫ নং হাদীছে রহিয়াছে।

মদীনার সওগাত

আল্লাহ তায়ালার রহমত ও করুণা বলে বিগত ১৯৬১ ইং সনে পবিত্র হজ্জের সৌভাগ্য হইয়াছিল এবং ইসলাম ও ঈমানের প্রাণ-কেন্দ্র মাহ্‌বুবে খোদার পবিত্র শহর সোনার মদীনায় হাজির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। সেই উপলক্ষে পবিত্র মদীনাকে স্মরণ করিয়া এবং তাজদারে-মদীনা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে দরূদ ও সালাম পেশ করিয়া একটি আরবী কাছিদাহ পাঠ করিয়াছিলাম। তখন বোখারী শরীফ অনুবাদ চতুর্থ খণ্ড লেখা হইতেছিল। পাঠকদের উপভোগের জন্য উক্ত কাছিদাহ "মদীনার সওগাত" রূপে পাঠক সমক্ষে পেশ করিয়া দিলাম।

احب الارض تسكنها سليمى * و ياتيها فوادى يستطار

প্রিয় পাত্রের দেশ আমার নিকট বড়ই আদরণীয়, আমার অন্তর সেখানে উপস্থিত হইতে উড়িয়া আসে।

وما حب الديار شغفن قلبى * ولكن حب من حوت الديار

তথাকার দালান-কোঠা ইমারত ইত্যাদি আমাকে আকৃষ্ট করে না, কিন্তু তথায় যিনি বসবাস করিতেন তাঁহার মহব্বতই আমাকে আকৃষ্ট করে।

نعم حب الديار ديار ارض * بها المحبوب فى قلبى يفور

হাঁ, হাঁ—যেই দেশ প্রাণাধিক প্রিয় পাত্রের দেশ, সেই দেশের প্রতিটি ঘর-দুয়ারের প্রতি মহব্বতও নিশ্চয় আমার অন্তরে উথলিয়া উঠে।

مدينة طيبة نفسى فداها * بها اثار محبوب تزار

আমার জান-প্রাণ মদীনা তায়্যেবার উপর উৎসর্গ; সেখানে মাহবুবে-খোদার বহু নিদর্শনের জেয়ারত লাভ হয়।

وتربة طيبة كحل لعينى * واطيب لا يضاهيها العبير

মদীনা তায়্যেবার মাটি আমার চক্ষের সুরমা এবং আমার জন্য এরূপ সুগন্ধি যাহার মোকাবিলায় মেশ্‌ক-আম্বরও অতি তুচ্ছ।

وتربتها على راسى وعينى * ولى فيها السعادة والسرور

উহার মাটি আমার মাথার উপর ও চোখের উপর রাখি, উহার স্পর্শনে আমার সৌভাগ্য ও শান্তি নিহিত রহিয়াছে।

بها دار الحبيب حبيب ربى * وانوار لها دوما ظهور

তথায় মাহবুবে-খোদার আবাসিক ঘর-বাড়ী রহিয়াছে এবং সর্বদা তথায় নূরই নূর প্রকাশ পাইতেছে।

وقبة روضة خضراء تزهو * على شمس وبدر يستنير

তথায় আরও আছে মাহবুবে-খোদার রওজা পাকের “সবুজ গুম্বজ” যাহার নূরাণী উৎকর্ষ চন্দ্র-সূর্য্য হইতেও অধিক।

وروضة جنة في دار دنيا * تعالوا فاقبلوا بشرى وزوروا

তথায় আরও আছে—ভূপৃষ্ঠে বেহেশতের বাগান। সকলে আসুন এবং তথায় প্রবেশের সুসংবাদ গ্রহণ করতঃ উহা স্বচক্ষে জেয়ারত করুন।

تعالوا فادخلوها بالسلام * سرور وابتهاج والحبور

সকলে আসুন এবং সেই বেহেশতের বাগানে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করুন; তথায় আনন্দই আনন্দ, শান্তিই শান্তি, সুখই সুখ।

تعالوا يا عصاة يا ضياع * فباب محمد ملجى طهور

হে পাপী গোনাহগারগণ! হে নরাধমগণ! আস—আস; হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দ্বার ও দরবার তোমাদেরকে আশ্রয় দান করিবে এবং তোমাদেরকে পরিচ্ছন্ন করিবে।

فباب محمد ملجى لجان * ومأوى ذي تراكمة الصغار

তাঁহার দরওয়াযা গোনাহগারদের জন্য বিশেষ আশ্রয়স্থল এবং গোনাহগার যখন বিপদাপদে বেষ্টিত হইয়া পড়ে তখন ঐ দরওয়াযা তাহার পক্ষে নিরাপদস্থান।

وباب محمد ماحي الذنوب * ولو كانت تعادلها البحور

তাঁহার দরওয়াযায় উপস্থিতি গোনাহ সমূহকে মুছিয়া দেয় যদিও উহা সমুদ্র পরিমাণ হয়।

ومن ياتي بهذ الباب يوما * سيغفر ذنبه الرب الغفور

তাঁহার দরওয়াজায় যে ব্যক্তি একদিন উপস্থিত হইবে, অচিরেই ক্ষমাশীল প্রভু আল্লাহ তায়ালা তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন।

أَتَيْتُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَبْغِىْ * نَوَالَكَ مِنْ ذُنُوْبِىْ اَسْتَجِيْرُ

হে আল্লার রসুল। আপনার দরবারে আমি নরাধম হাজির হইয়াছি; আল্লার নিকট স্বীয় গোনাহের কুফল হইতে পানাহ চাহিতেছি—এসম্পর্কে আপনার সুদৃষ্টি কামনা করি।

أَتَيْتُكَ تَائِبًا مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ * رَجَاءً لِلشَّفَاعَةِ هَلْ تُجِيْرُ

খোদার দরবারে সমস্ত গোনাহ হইতে তওবা করতঃ শাফায়া'তের জন্য আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি—আশাকরি আপনি আশ্রয় দান করিবেন।

وَمَنْ لِىْ مِنْ هَلَاكِىْ يَوْمَ يَاْتِىْ * صَحَائِفُ سُوْءِ اَعْمَالِىْ تَطِيْرُ

কেয়ামতের দিন যখন আমার বদ-আমলের আমল-নামা উড়িয়া আসিয়া আমার হাতে পৌঁছিবে তখন অধঃপতন হইতে রক্ষা পাইবার অছিলা আমার পক্ষে আর কে হইবে—

سِوَاكَ يَا شَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ * وَدُوْنَكَ يَا جَوَادُ يَا بَشِيْرُ

আপনি ভিন্ন? আপনি সমস্ত গোনাহগারের পক্ষে শাফায়াতকারী এবং দয়ার সাগর ও সুসংবাদবহনকারী।

لَمَوْعِدُكَ بِالشَّفَاعَةِ حِرْزُ نَفْسِىْ * وَاَنَّكَ لَا تُخَيِّبُ مَنْ يَزُوْرُ

আপনি স্বীয় উম্মতের শাফায়াতের যে ওয়াদা করিয়াছেন উহাই আমার পক্ষে রক্ষাকবচ—আপনারই ওয়াদা যে, আপনি আপনার (রওযা) জেয়ারতকারীকে কস্মিনকালেও বঞ্চিত করিবেন না।

عَلَيْكَ صَلٰوةُ رَبِّىْ وَالسَّلَامُ * دَوَامًا مَّا يُقَلِّبُنَا الدُّهُوْرُ

যাবৎ এই বিশ্ব ভূমণ্ডলের যুগ চলিতে থাকে তাবৎ আপনার প্রতি দরূদ ও সালাম চলিতে থাকিবে।

وَرَحْمَةُ رَبِّنَا اٰلَافُ اَلْفٍ * عَلَيْكَ الدَّهْرَ يَا بَدْرُ الْمُنِيْرُ

হে পূর্ণিমার চন্দ্র! বিশ্ব প্রভুর কোটি কোটি রহমত আপনার উপর চিরকাল বর্ষিত হউক—আমীন। আমীন।।

নবীজীর আগমনে মদিনাবাসীদের উল্লাস ঃ

১৭১২। হাদীছ ঃ—(৫৫৮পৃঃ) মদিনাবাসী বিশিষ্ট ছাহাবী বরা-ইবনে আ'যেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (মক্কা হইতে হিজরত করিয়া মদিনায়) আমাদের নিকট সর্ব্বপ্রথম মোছ্‌য়া'ব-ইবনে ওমায়ের (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ-ইবনে-উম্মে-মাকতুম (রাঃ) আসিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে মদিনার লোকদিগকে কোরআন শরীফ শিক্ষা দিতেন। অতঃপর বেলাল (রাঃ), সা'য়া'দ (রাঃ) এবং আম্মার ইবনে ইয়াছের (রাঃ) আসিলেন। তারপর ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) ছাহাবীদের কুড়ি জনের একটি দল লইয়া পৌঁছিলেন। তারপর হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে আসাল্লাম পৌঁছিলেন।

ছাহাবী বরা ইবনে আ'যেব (রাঃ) বলেন, আমি মদিনাবাসীগণকে কখনও কোন বস্তু দ্বারা ঐরূপ উল্লাসিত হইতে দেখি নাই যেরূপ উল্লাসিত হইয়াছিলেন তাঁহারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আগমনে। এমনকি কচি-কাচা মেয়েরাও উল্লাসের সহিত রসুলুল্লার শুভাগমন-ধ্বনি দিতেছিল।

হিজরতের গুরুত্ব ঃ

ইসলামে মক্কা হইতে মদিনায় হিজরতের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, হিজরতের দ্বারাই ইসলাম ও মোসলমানদের মুক্তি এবং শক্তির সূচনা হইয়াছে। হিজরতের পরেই মদিনাকে কেন্দ্র করিয়া ইসলাম ও মোসলমানদের সার্ব্বভৌমত্ব বিশ্ববুকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবই নয় শুধু, বরং বাস্তবায়িত হইয়াছে। তাই ইসলামের ইতিহাসে এই হিজরতের গুরুত্ব অনেক বেশী ; এমনকি এই মহান হিজরতকে মোসলমানদের নিকট চিরস্মরণীয় করিয়া রাখার জন্য ইসলামী বৎসরের গণণা হিজরত হইতেই আরম্ভ করা হইয়াছে।

ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফতকালে মোসলমানদের স্বতন্ত্র বৎসর গণণার প্রয়োজন সাব্যস্ত করা হইলে উহার আরম্ভ সম্পর্কে আলোচনা হইল। কাহারও প্রস্তাব হইল নবীজীর জন্ম হইতে আরম্ভের, কাহারও প্রস্তাব হইল নবীজীর মৃত্যু হইতে আরম্ভের। অবশেষে সর্ব্বসম্মতিক্রমে হিজরত হইতে আরম্ভ করাই সাব্যস্ত হয়। নবীজীর হিজরতের সূচনা ছিল আকাবা গিরিকান্তারে মদিনাবাসীদের তৃতীয় বায়আ'ৎ বা দীক্ষা গ্রহণ যাহা জিলহজ্জ মাসের মধ্য দিকে ছিল ; ঐ ভাঙ্গা মাসের পরবর্ত্তী মাসই ছিল "মোহাররাম"। তাই মোহাররাম মাস হইতে বৎসর আরম্ভের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। হিজরতকে কেন্দ্র করিয়া ইসলামী গণনার বিষয়টি নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে—

১৭১৩। হাদীছ ঃ—(৫৬০ পৃঃ) عن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه
قَالَ مَا عَدُّوْا مِنْ مَبْعَثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مِنْ وَفَاتِهِ

مَا عَدُّوا إِلاَّ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ

অর্থ—ছাহাবী সাহল ইবনে সাআ'দ (রাঃ) বলিয়াছেন, সনের গণনা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নবুয়ত প্রাপ্তির সময় হইতে আরম্ভ করা হয় নাই এবং তাঁহার মৃত্যুকাল হইতেও আরম্ভ করা হয় নাই। মদিনায় তাঁহার হিজরতকে উপলক্ষ্য করিয়াই ঐ গণনা করা হইয়াছে।

অতঃপর আমরা ইনশা-আল্লাহ তায়ালা হিজরী সালের ভিত্তিতে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর আলোচনা করিব।

হিজরী প্রথম বৎসর

এই বৎসরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইহুদী সম্প্রদায়ে ইসলামের প্রবেশ। মদিনায় ধন-দৌলৎ, শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে প্রথম নম্বরে ছিল ইহুদী সম্প্রদায়, পৌত্তলিকরা ছিল দ্বিতীয় নম্বরে। ইতিপূর্ব্বে মদিনার আউস ও খযরজ পৌত্তলিক গোত্রদ্বয়ে ইসলাম প্রবেশ করিয়াছিল, নবীজী (দঃ) মদিনায় পদার্পণ করিলে মন্থর গতিতে হইলেও এবং নগণ্য সংখ্যায় হইলেও ইহুদী সম্প্রদায়ে ইসলাম প্রবেশ করে। নবীজী মোস্তফার মদিনায় পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই ইহুদীদের বিশিষ্ট বিজ্ঞ আলেম আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ইসলাম গ্রহণ করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে সালামের ইসলাম গ্রহণঃ

১৭১৪। হাদীছঃ—(৫৫৬ পৃঃ) আনাছ (রাঃ) নবীজীর মদিনায় প্রবেশের ধারাবাহিক বিবরণ দানে বলিয়াছেন, নবী (দঃ) আবু আইউবের বাড়ীর (রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) নিকটবর্ত্তী অবতরণ করিলেন।

এখানে হযরত নবী (দঃ) স্বীয় লোক-জনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে ছিলেন এমতাবস্থায় (ইহুদীদের অন্যতম বিশিষ্ট আলেম) আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বাগানে ফল-ফসাদি আহরণ করিতে থাকাবস্থায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আগমন সংবাদ জ্ঞাত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই আহরিত ফলের বোঝা সহ হযরতের নিকট ছুটিয়া আসিলেন। এখানে আসিয়া তিনি বিশেষ মনযোগের সহিত হযরতের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিলেন এবং বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তথায় পুনঃ হযরতের খেদমতে হাজির হইয়া ঘোষণা দিলেন, "আমি মনে-প্রাণে ঘোষণা দিতেছি—সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লার রসুল, আপনি সত্য দ্বীন বহন করিয়া আনিয়াছেন।"

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) হযরতের নিকট ইহাও আরজ করিলেন যে, ইহুদীগণ খুব ভালরূপেই জানে যে, আমি তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় একজন। আমার পিতাও তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন এবং আমি তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলেম, আমার পিতাও তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন।* আপনি ইহুদীদেরকে ডাকিয়া এই বিষয়টি যাচাই করিয়া দেখেন। তাহাদিগকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন—এর পূর্ব্বে যে, তাহারা আমার ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞাত হইতে পারে। কারণ, (ইহুদী জাতি মিথ্যা অপবাদে বড়ই পটু ;) তাহারা যখন জানিতে পারিবে যে, আমি মোসলমান হইয়া গিয়াছি তখন তাহারা আমার উপর মিথ্যা দোষারোপ আরম্ভ করিবে।

সেমতে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহুদীগণকে সংবাদ দানের জন্য লোক পাঠাইলেন। তাহারা হযরতের নিকট উপস্থিত হইল। হযরত (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, হে ইহুদীগণ! তোমরা তোমাদের সর্ব্বনাশা পরিণাম হইতে সতর্ক হও—তোমরা খাঁটী ভাবে আল্লার ভয়-ভক্তি অবলম্বন কর, একমাত্র আল্লাহই সকলের মা'বুদ, তিনি ভিন্ন আর কোন মা'বুদ নাই। নিশ্চয় তোমরা ভাল ভাবেই জ্ঞাত আছ যে, আমি আল্লার খাঁটী ও সত্য রসুল এবং আমি সত্য ধর্ম্ম নিয়া তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি, অতএব তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়া নেও। তাহারা উত্তরে বলিল, ইস্‌লাম কি জিনিস তাহা আমরা জানি না, আমরা বুঝি না। হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে তিন বার তাহাদের এইরূপ কথা কাটাকাটি হইল। অতঃপর হযরত (দঃ) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তোমাদের মধ্যে কিরূপ ব্যক্তি গণ্য হইয়া থাকেন? তাহারা বলিল, তিনি ত আমাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ও সরদার এবং সর্ব্বাধিক বিজ্ঞ আলেম পরিগণিত হইয়া থাকেন, তাঁহার পিতাও তদ্রূপই ছিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, সেই আবদুল্লাহ ইবনে সালাম যদি ইসলাম গ্রহণকারী হয় তবে? তাহারা বলিল, আল্লাহ পানাহ্—তিনি ইসলাম গ্রহণ করিবেন—ইহা সম্ভবই নহে। হযরতের সঙ্গে তাহাদের এই বিতর্ক তিন বার হইল। (আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) নিকটবর্ত্তীই লুকাইয়া ছিলেন ;) হযরত (দঃ) বলিলেন, হে ইবনে সালাম। তুমি বাহির হইয়া আস। তৎক্ষণাৎ আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বাহির হইয়া আসিলেন এবং ইহুদীগণকে

---

* আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই বক্তব্য ও প্রচেষ্টা স্বীয় অহঙ্কার প্রকাশার্থে ছিল না, বরং আসল উদ্দেশ্য ছিল ইহুদীদের মধ্যে তাঁহার যে বাস্তব মর্য্যাদা ও উচ্চ স্থান রহিয়াছে তাহা হযরত (দঃ)কে জ্ঞাত করা ; যেন হযরত (দঃ) তাঁহার ইসলামের দ্বারা ইহুদীগণকে প্রভাবান্বিত করিতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হযরতের বিশেষ দৃষ্টির সৌভাগ্য ও যেন তিনি অধিক লাভ করিতে পারেন।

লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে ইহুদী জাতি! তোমরা আল্লার ভয়কে অন্তরের মধ্যে জাগাইয়া তোল। যেই আল্লাহ সকলের মা'বুদ, তিনি ভিন্ন আর কোন মা'বুদ নাই; সেই আল্লার শপথ করিয়া আমি বলিতেছি, তোমরা নিশ্চয় একিনরূপে জান এবং বুঝ যে, তিনি (মোহাম্মদ (দঃ)) আল্লার রসুল, তিনি সত্য ধর্ম্ম বহন করিয়া আনিয়াছেন। ইহুদীগণ বলিল, আপনার এই কথা সত্য নহে।* অতঃপর (ঝগড়া সৃষ্টির আশঙ্কায়) হযরত (দঃ) ইহুদীদেরকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

১৭১৫। **হাদীছ**ঃ—(৫৬১ পৃঃ) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মদিনায় আগমনের সংবাদ অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং আরজ করিলেন, আমি আপনাকে তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিব যাহার সঠিক জ্ঞান একমাত্র নবীরই থাকিতে পারে—(১) কেয়ামত অতিশয় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসার আলামত বা নিদর্শন কি? (২) বেহেশ্‌ত লাভকারীগণের আতিথেয়তা সর্ব্ব প্রথম কি বস্তুর দ্বারা করা হইবে? (৩) সন্তান পিতার বা মাতার আকৃতি লাভ করার সুত্র কি?

হযরত (দঃ) বলিলেন, এই প্রশ্নগুলির উত্তর এখনই (আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে) জিব্রাইল ফেরেশতা আমাকে জ্ঞাত করিয়া গিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলিলেন, ইহুদীগণ ত জিব্রাইলকে শত্রু মনে করিয়া থাকে; অতঃপর হযরত (দ.) প্রশ্নগুলির উত্তর দান করতঃ বলিলেন, কেয়ামত অতিশয় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসার আলামত ও নিদর্শন হইল একটি আগুন বাহির হইবে—সেই আগুনটি লোকদিগকে পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্তের দিকে হাঁকাইয়া চলিবে। আর বেহেশ্‌ত লাভকারীগণের সর্ব্ব প্রথম খাদ্যবস্তু হইবে একটি মৎস্যের কলিজার ছোট টুকরাটি। আর (গর্ভাশয়ের মধ্যে নরনারীর উভয়ের বীর্য্য মিলিত হওয়ার সময়) পুরুষের বীর্য্যের প্রাবল্য ও আধিক্য হইলে সন্তান পিতার আকৃতি ধারণ করে এবং নারীর বীর্য্যের প্রাবল্য ও আধিক্য হইলে সন্তান মাতার আকৃতি ধারণ করে।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন— اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله "আমি মনে-প্রাণে ঘোষণা ও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ভিন্ন আর কোন মা'বুদ নাই এবং আপনি আল্লার রসুল।

* এক হাদীছে আছে, প্রথমে ইহুদীগণ আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) সম্পর্কে বলিয়াছিল— তিনি আমাদের সর্ব্বোত্তম ব্যক্তি এবং সর্ব্বোত্তম ব্যক্তির সন্তান। আর তাঁহার ইসলাম প্রকাশের পর তাহারা বলিল, সে আমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি এবং নিকৃষ্টতম ব্যক্তির সন্তান।

তখন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! ইহুদীদের এই মিথ্যা অপবাদের ভয়ই আমি করিতেছিলাম। অর্থাৎ তিনি যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা এই অপবাদের ভয়েই; উহা তাহাদের মুখেই মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য ছিল।

হযরতের নিকট ইহুদী আলেমগণের উপস্থিতি ঃ (৫৬১ পৃঃ)

মদিনায় হযরতের আগমন সংবাদ প্রচারিত হইলে পর তথাকার সংখ্যাগুরু এবং আধিপত্য ও প্রতিপত্তিশালী জাতি ইহুদীদের আলেমগণ— যাহারা পূর্ববর্ত্তী আসমানী কেতাব মারফত হযরতের আবির্ভাব সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল তাহারা হযরতের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহাদের মধ্য হইতে অধিকাংশ ত সত্যকে সম্পূর্ণরূপে গোপন ও হজম করিয়া ফেলিল। তাহারা হযরত (দঃ)কে পূর্ণরূপে চিনিয়া ও নির্দিষ্ট করিয়া লওয়া সত্ত্বেও স্বীয় জ্ঞান-বিবেক এবং অন্তরের অটল সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করতঃ তাঁহাকে অস্বীকার করিল। আর কিছু সংখ্যক ঐরূপও ছিল যাহারা উপরোক্ত দলের ন্যায় স্বীয় জ্ঞান-বিবেক ও অন্তরের অটল সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিতে না পারিয়া আপন লোকদের নিকট সত্যকে প্রকাশ করিল, কিন্তু স্বীয় সঙ্গীদের সমর্থন না পাওয়ায় আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতার কবলে পতিত হইয়া নিজের সিদ্ধান্তকে বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইল। যেমন, ইহুদীদের বিশিষ্ট গোত্র বনু-নজীরের একজন সরদার "আবু-ইয়াছের ইবনে আখতাব" সে সর্ব্বপ্রথম হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল এবং নিজ লোকদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিল—

"اطيعونى فان هذا النبى الذى كنا ننتظر— তোমরা সকলে আমার কথা মান, নিশ্চয় তিনি সেই নবী যাঁহার আবির্ভাবের অপেক্ষা আমরা করিতেছিলাম।" কিন্তু তাহার ভ্রাতা "হুয়াই ইবনে আখ্‌তাব" সেও তাহাদের অন্যতম বিশিষ্ট সরদার ছিল, সে ভ্রাতার উক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করিল এবং সর্ব্বসাধারণও তাহার সঙ্গেই হইয়া গেল। (ফতহুলবারী ৭—২২০)

ইহুদী আলেমগণ যদি সমবেত ভাবে তাহাদের উপলব্ধিকৃত সত্যকে উপেক্ষা না করিত এবং হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে বন্ধুসরূপে গ্রহণ করিয়া নিত তবে গোটা ইহুদী সম্প্রদায় ইসলামের ছায়াতলে ছুটিয়া আসিত। এই বিষয়টি স্বয়ং হযরত (দঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—

১৭১৬। হাদীছ ঃ—(৫৬২ পৃঃ) عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لو امن بى عشرة من اليهود لامن بى اليهود -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ইহুদীদের মধ্যে (তাহাদের আলেম শ্রেণীর দশ জন লোক

এমন রহিয়াছে যে, সেই) দশ জন লোক আমার প্রতি ঈমান আনিলে গোটা ইহুদী সম্প্রদায় আমার প্রতি ঈমান আনিয়া নিত।

ব্যাখ্যা ঃ—আলেমদের পদস্খলনে গোটা জাতিরই পদস্খলন হইয়া থাকে ; সেই সূত্রেই আলেমদের ঘাড়ে মস্তবড় দায়িত্ব এবং গোনাহের বোঝাও বড় হইবে, সুতরাং আলেমকে সতর্ক থাকিতে হইবে।

মসজিদে-নববী নির্ম্মাণ ঃ

মদিনার মূল শহরে পৌঁছিবার পরই নবী (দঃ) মসজিদ তৈরীর পরিকল্পনা নিলেন। মসজিদকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার আবাসিক গৃহ তৈরী হইবে এই ইচ্ছাও হয় ত তিনি পোষণ করিতেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মদিনা নগরীতে প্রবেশকালে নবীজী (দঃ) তাঁহার "কাছওয়া" উষ্ট্রীর উপর আরোহিত ছিলেন এবং নিজের অবতরণ সম্পর্কে বলিয়া দিয়াছিলেন, উষ্ট্রী আল্লার হুকুমে চলিবে ; যথায় উহা বসিবে তিনি তথায়ই অবতরণ করিবেন। উষ্ট্রী আবু আইউব (রাঃ) ছাহাবীর বাড়ীতে নয়, বরং তাঁহার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী একটি উন্মুক্ত স্থানে বসিল ; তখনই নবী (দঃ) বলিয়াছিলেন, "هٰذَا الْمَنْزِلُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ—ইনশা আল্লাহ ইহাই আমার বাসস্থান হইবে।" অতঃপর উট হইতে অবতরণ করিতে বলিয়াছিলেন, رَبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ—হে পরওয়ারদেগার! আমাকে যে স্থানে অবতরণ করাইয়াছ উহাকে বরকতপূর্ণ করিয়া দাও ; উত্তম স্থানে অবতরণ করানো তোমারই কাজ" (অফাউল-অফা ১—২৩০)

মসজিদ তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ঐ উন্মুক্ত ভূখণ্ডকেই নবী (দঃ) মসজিদের জন্য নির্ব্বাচন করিলেন। ঐ ভূখণ্ডের এক পাশে উট বাঁধা হইত, এক দিকে খেজুর শুকানোর থল ছিল, এক খণ্ডে প্রাচীন গোরস্থান ছিল, কিছু অংশে খেজুর বাগানও ছিল। ঐ ভূখণ্ডটির মালিক ছিল দুই জন এতিম বালক ; তাঁহারা স্বয়ং এবং তাহাদের অভিভাবক বিশিষ্ট ছাহাবী আসআ'দ ইবনে যোরারা (রাঃ) সকলেই ঐ ভূখণ্ড মসজিদের জন্য বিনা মূল্যে দান করিতে চাহিলেন। কিন্তু নবী (দঃ) উহা বিনা মূল্যে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। এমনকি ঐ ভূস্বামীদের গোত্র বনু-নাজ্জার সকলেই উক্ত দান গ্রহণ করিতে নবীজী (দঃ)কে অনুরোধ করিলেন কিন্তু নবী (দঃ) শেষ পর্য্যন্ত সম্মত হইলেন না। ভূখণ্ডের মূল মালিক দুইটি এতিম বালক ছিল ; এতিমের মালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনেই হয় ত নবী (দঃ) উহা বিনা মূল্যে গ্রহণের সর্ব্বপ্রকার আবেদন-নিবেদনকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। অবশেষে

ঐ ভূখণ্ডের উপযুক্ত মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইল দশ দীনার—স্বর্ণ মুদ্রা এবং ঐ মূল্য আবুবকর (রাঃ) পরিশোধ করিয়াদিলেন। (ঐ ২৩১)

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদর্শ কত সুন্দর ও কত সরল! মসজিদের ভূমি সংগ্রহ করিয়া মসজিদ নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পাদনে স্বয়ং নবীজী (দঃ) নিজে সামান্য দিন-মজুরের মত ইট ও পাথরের মোট বহনে প্রবৃত্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আনছার ও মোহাজেরগণ কার্য্য সম্পাদনে ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহারা ছুটিয়া আসিতে ছিলেন এবং বলিতে ছিলেন—

لَئِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِىُّ يَعْمَلُ — ذَاكَ إِذًا لَلْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ

আমরা যদি বসিয়া থাকি, আর নবী (দঃ) পরিশ্রম করেন তবে ইহা জঘণ্যরূপ ধৃষ্টতার কাজ হইবে। (ঐ ২৩৫)

নবীজীর সঙ্গী হইয়া ভক্ত ছাহাবীগণ মসজিদ তৈরী করিতেছেন—তাঁহাদের উৎসাহের সীমা আছে কী? আনন্দে-উৎসাহে মাতোয়ারা হইয়া এই মহামজুরগণ সমবেত কণ্ঠে তারানা গাহিয়া যাইতে ছিলেন; নবীজী মোস্তফা (দঃ)ও তাঁহাদের সহিত কণ্ঠ মিশাইয়া তাঁহাদের উৎসাহ যোগাইবার জন্য সেই তারানা গাহিতে ছিলেন।

১৭০৯ নং হাদীছে সেই তারানার দুইটি ছড়া এবং ১৭১১ নং হাদীছে আর একটি ছড়া উল্লেখ হইয়াছে।

নবীজী এবং ছাহাবীগণের সমবেত প্রচেষ্টায় মসজিদ নির্ম্মিত হইল। এই প্রথম নির্ম্মাণকালে মসজিদটির দৈর্ঘ ছিল সত্তর হাত, প্রস্থ ছিল ষাট হাত, উঁচু ছিল সাত হাত। পরবর্ত্তী কালে নবীজীর আমলেই প্রয়োজন বোধে ঐ মসজিদের প্রথম সম্প্রসারণ হয়—দৈর্ঘে একশত হাত, প্রস্থেও একশত হাত। (অফাউল-অফা—১)

মূল মসজিদ তৈরীর পর এক সময় নবীজী (দঃ) মসজিদ সংলগ্নে উহার একটি বারান্দাও তৈরী করেন। এক বর্ণনায় ঐ বারান্দা তৈরীর সময়কালও নির্ণীত হয়। মসজিদ যখন তৈরী হয় তখন নামাজের কেবলা ছিল বায়তুল-মোকাদ্দাস দিক যাহা মদিনা হইতে উত্তর দিকে। হিজরতের ১৬ বা ১৭ মাস পরে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযেল হইয়া নামাযের কেবলা কা'বা শরীফ দিক নির্দ্ধারিত হয় যাহা মদিনা হইতে দক্ষিণ দিকে। এইভাবে বিপরীত দিকে কেবলা পরিবর্ত্তিত হইলে মসজিদেরও সম্মুখ-পশ্চাদ পরিবর্ত্তিত হয়। প্রথমে মসজিদের সম্মুখ তথা কেবলা-দেওয়াল ছিল উত্তর দিকস্থ দেওয়াল। কেবলার পরিবর্ত্তন হইলে মসজিদের সম্মুখ হইয়া যায় দক্ষিণ দিকের দেওয়াল এবং স্বভাবতঃই মসজিদে প্রবেশ পথ উত্তর দিকের দেওয়ালে করিতে হয়। এই সময় উত্তর দিকের দেওয়ালের গায়ে খেজুর পাতার একখানা

চাল সংযোগ করিয়া সম্মুখ দিক উন্মুক্ত একটি বারান্দা বা চাতাল তৈরী করা হয় (অফাউল-অফা, ১—৩২১)।

উল্লেখিত চাতাল বা বারান্দাকেই আরবী ভাষায় "ছোফ্‌ফা" বলা হয়। নিঃসম্বল, নিঃস্ব, নিরাশ্রয় সর্ব্বহারা মোসলমান—মদিনাতে যাহার কোন আপন জন বা আশ্রয়স্থল নাই এই শ্রেণীর লোকদের সাময়িক আশ্রয়ের জন্য নবীজী (দঃ) ঐ বারান্দা তৈরী করিয়াছিলেন। "ছোফ্‌ফা" অর্থ বারান্দা, এই সুত্রেই তথায় আশ্রয় গ্রহণকারী-গণকে "আছহাবে-ছোফ্‌ফা—বারান্দার আশ্রিত" আখ্যায় স্মরণ করা হইত।

তাঁহাদের এই অস্থায়ী আশ্রয় জীবনে বিভিন্ন সূত্র সমন্বয়ে তাঁহাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা হইত। তাঁহারা নিজেরাও জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া কিছু জোটাইতেন এবং খেজুর বাগানের মালিক আনছারগণও নিজ নিজ সাধ্যমতে কিছু খেজুরের ছড়া মসজিদে ঝুলাইয়া রাখিয়া যাইতেন। আর নবী (দঃ) নিজে এবং অন্যান্য মোসলমানগণও নিজ নিজ গৃহে তাঁহাদিগকে মেহমানরূপে নিয়া যাইতেন। নিঃস্ব ও নিঃসম্বল হওয়ায় তাঁহাদের আর্থিক দুর্ব্বলতাও ছিল চরম, তাই তাঁহাদের পরিধেয়ও নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইত। পারিবারিক জীবনের সংস্থান না পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের সাংসারিক কোন ব্যস্ততা হইত না; তাঁহারা তাঁহাদের এই সুযোগকে এক মহান কাজে ব্যয় করিতেন। তাঁহারা সর্ব্বদা নবীজীর সঙ্গে চাপিয়া থাকিয়া দ্বীনের শিক্ষা—কোরআন-হাদীছের চর্চ্চায় লিপ্ত থাকিতেন। মদিনার বাহিরে কোথাও শিক্ষকের চাহিদা হইলে নবী (দঃ) তাঁহাদের হইতেই শিক্ষক পাঠাইতেন।

স্মরণ রাখিবেন—মসজিদে নববীর এই বারান্দায় আশ্রয় লাভকারী আছহাবে-ছোফ্‌ফাগণ কোন স্থায়ী ও বিশেষ সম্প্রদায় ছিলেন না—যেরূপ হইয়া থাকে হিন্দুদের মধ্যে যোগী সন্ন্যাসী ও বৈরাগী বা ভিক্ষু সম্প্রদায়।

নবীজীর সুন্নত, ইসলামের আদর্শ—পারিবারিক জীবন লাভের সংস্থান লাভ সাপেক্ষে একমাত্র সাময়িক ও অস্থায়ী আশ্রয় গ্রহণরূপে তাঁহারা ঐ বারান্দার জীবিকার আশ্রয় লইতেন। আদর্শগত সাধারণ জীবিকার সুযোগ যখনই যাঁহার লাভ হইত তখনই তিনি ঐ আশ্রয় হইতে কাটিয়া পড়িতেন; আছহাবে-ছোফফাগণের রূপ নির্ণয়ে মদিনার ইতিহাস সুপ্রসিদ্ধ "অফাউল-অফা" গ্রন্থে বোখারী শরীফের বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবনে হজর (রঃ) হইতে উদ্ধৃতি বিদ্যমান আছে—

الصفة مكان فى مؤخر المسجد النبوى مظلل اعد لنزول الغرباء فيه ممن لا مأوى له ولا اهل وكانوا يكثرون فيه ويقلون بحسب من يتزوج منهم او يموت او يسافر

অর্থাৎ—"ছোফফা" একটি বিশেষ স্থান যাহা মসজিদে নববীর পেছনে (তথা কেব্‌লা-দিকের বিপরীত দিক প্রান্তে) ছিল—উপরে চাল বা ছাপ্পর দেওয়া ছিল। গরীব দুস্থ যাহাদের ঘর-বাড়ী, পরিবার-পরিজন না থাকিত ঐরূপ লোককে আশ্রয় দেওয়ার উদ্দেশ্যে উহা তৈরী করা হইয়াছিল। তথায় আশ্রয়ীগণের সংখ্যা সময়ে বেশী, সময়ে কম হইত; এইভাবে যে, তাঁহাদের কেহ বিবাহ করিয়া পারিবারিক জীবনের সংস্থান করিয়া লইতেন, কাহারও মৃত্যু হইত, কেহ অন্যত্র চলিয়া যাইতেন।

সারকথা ছোফফা বা ঐ বারান্দায় কোন বিশেষ সম্প্রদায় সৃষ্টি করা মোটেই উদ্দেশ্য ছিল না; সাময়িক আশ্রয় দানের ব্যবস্থা ছিল মাত্র। তথায় আশ্রয় গ্রহণকারী সকলেই সুযোগ মতে সাধারণ জীবন যাপনে চলিয়া যাইতেন। আছহাবে-ছোফফাগণের একজন প্রসিদ্ধ সদস্য ছিলেন আবু হোরায়রা (রাঃ); তিনি পরবর্ত্তী জীবনে এক প্রদেশের গভর্ণরও হইয়াছিলেন।

তৎকালীন মসজিদে-নববী ঃ

ইসলাম বাহ্যিক আড়ম্বর পছন্দ করে না, সর্ব্বক্ষেত্রে সরলতাই উহার আদর্শ। তদুপরি ঐ যুগে বিশেষতঃ মরু অঞ্চল মক্কা-মদিনায় লোকদের সাধারণ আবাস গৃহও অপেক্ষাকৃত নিম্নমানেরই ছিল। সেমতে মসজিদে-নববীর নির্ম্মাণও ঐ শ্রেণীর ছিল। কাঁচা ইটের প্রাচীর, খেজুর গাছের আড়া, উহারই খুঁটি এবং খেজুর পাতার ছাপ্পর, বৃষ্টি হইলে পানি ঝরিত। এই ছিল তৎকালীন মসজিদে-নববীর আকৃতি (বাংলা বোখারী শরীফ প্রথম খণ্ড ২৯১ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)। উহাতে ছিল না কোন সমুচ্চ গুম্বজ, ছিল না উহার সুদীর্ঘ মিনারা*।

অনাড়ম্বররূপে তৈরী ঐ মসজিদটি নবীজীর গুরুত্বপূর্ণ জীবনের দশটি বৎসর এবং তাঁহার পরেও তাঁহার খলীফাগণের আমলে শুধু কেবল নামায বা এবাদতের স্থানই ছিল না, বরং এই মসজিদই ইসলামের সর্ব্বপ্রকার জরুরী কার্য্যের প্রধানতম বরং একমাত্র কর্ম্মকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। এমনকি বৈদেশিক রাজন্যবর্গের সহিত সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয়াবলীর ফরমান জারীর কেন্দ্রও এই মসজিদই ছিল। এবং এই খেজুর পাতার মসজিদেরই এত বড় প্রভাব ছিল যে, উহার সম্মুখে আসিলে পারস্য ও রোম মহাদেশের রাজদূতগণের কলিজাও কাঁপিয়া উঠিত।

---

* "বিশ্বনবী" গ্রন্থের বিবরণ—"চারি কোণে চারিটি মিনার ছিল" ইহার সুউন্নত মিনার তখনকার দিনে বাস্তবিকই এক নূতন শিল্প-সৃষ্টি বলিয়া পরিগণিত হইত।

উক্ত গ্রন্থের এই সব বর্ণনা দৃষ্টে পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত মনে পড়ে; আয়াতটির মর্ম্ম হইল—'তোমরা লক্ষ্য কর না? কবিগণ হররকম ময়দানেই (এমনকি শুধু কল্পনার ময়দানেও) চক্কর খাইতে থাকে। (১৯ পাঃ ১৫ রুঃ)

নবীজীর আবাসিক গৃহ তৈরী ঃ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নবীজীর উষ্ট্রী ঐস্থানে বসিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নবী দঃ) বলিয়াছিলেন—ইনশা আল্লাহ ইহাই আমার বাসস্থান হইবে। তাই মসজিদ তৈরীর পরেই নবীজী (দঃ) তাঁহার সেই সঙ্কল্প বাস্তবায়িত করিলেন। ঐ সময় নবীজীর সহধর্ম্মীনী ছিলেন দুইজন—ছওদা (রাঃ) এবং আয়েশা (রাঃ), অবশ্য আয়েশা (রাঃ) তখনও নবীজীর গৃহিণী হইয়া ছিলেন না। কিন্তু নবীজীর কন্যাগণ ত ছিলেন, তাই নবীজী (দঃ) মসজিদের পূর্ব্ব পার্শে মসজিদেরই সমান মানে কাঁচা ইট এবং খেজুর গাছ ও খেজুরের পাতার দুইটি কক্ষ তৈরী করিলেন। পরবর্ত্তীকালে প্রয়োজন মতে আরও নয়টি কক্ষ তৈরী করিয়াছিলেন ; সব কক্ষগুলিই মসজিদকে কেন্দ্র করিয়াই তৈরী করা হইয়াছিল, অবশ্য মসজিদের পশ্চিম পার্শে কোন কক্ষ ছিল না (অফাউল-অফা, ১—৩২৫)।

নবীজীর কক্ষগুলি কাঁচা ইট, খেজুর গাছের খুঁটি ও আড়া এবং খেজুর পাতার উপর মাটি ফেলিয়া ছাদ—এই আকৃতিতে তৈরী ছিল ; দরওয়াজায় মেষের লোমে বুনানো চট ঝুলানো ছিল। এই ছিল সরদারে-দু-জাহান বিশ্বনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গৃহের আকৃতি—যথায় তিনি সারা জীবন পরিবার পরিজন নিয়া বসবাস করিয়া গিয়াছেন। কত কত এলাকা তিনি জয় করিয়া ছিলেন, তথাকার ধন-সম্পদ হস্তগত করিয়া ছিলেন, কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার গৃহ ঐ আকৃতিরই ছিল। প্রায় শতাব্দিকালের পর—ওলীদ ইবনে আবদুল মালেকের শাসন আমলে মসজিদে-নববীর সম্প্রসারণ প্রয়োজনে ঐ কক্ষসমূহ ভাঙ্গিয়া মসজিদ বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

কক্ষসমূহ উচ্ছেদ উপলক্ষে ছাহাবী-তনয় তাবেয়ীগণের অনেকে মসজিদে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন—"কক্ষগুলি বিদ্যমান রাখিতে পারিলে কত ভাল হইত। পরবর্ত্তী লোকদের জন্য উপদেশ লাভের সুযোগ হইত ; তাহারা বাড়ী-ঘরের মান নিম্নের রাখিত ; তাহারা দেখিতে পাইত—আল্লাহ তাঁহার নবীর জন্য কিরূপ বাসস্থান পছন্দ করিয়াছিলেন। অথচ নবীজীর হস্তে বিশ্ব-ধনভাণ্ডারের চাবিগুচ্ছ প্রদত্ত ছিল। (ঐ ৩২৭)

মক্কা হইতে নবীজীর পরিবারবর্গ আনয়ন ঃ

মসজিদ এবং উহার সঙ্গে আবাস গৃহের দুইটি কক্ষ তৈরী হওয়ার পর হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় পালকপুত্র যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ) এবং বিশিষ্ট খাদেম আবু-রাফে'কে মক্কায় প্রেরণ করিলেন ; উম্মুল-মোমেনীন ছওদা (রাঃ) এবং তৃতীয়া কন্যা উম্মে-কুলছুম ও কনিষ্ঠা কন্যা ফাতেমা জাহ্‌রাকে নিয়া আসিবার জন্য। হযরতের দ্বিতীয় কন্যা রোকাইয়াহ্ (রাঃ) স্বীয় স্বামী ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর

সঙ্গে পূর্ব্বেই মদিনায় পৌছিয়াছিলেন এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা তখনকার অমোসলেম স্বামী আবুল আ'ছের নিকট আবদ্ধ ছিলেন, আর উম্মুল মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) স্বীয় পিতা আবুবকরের পরিবারবর্গের সঙ্গেই ছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুও স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহকে মক্কায় পাঠাইলেন; স্ত্রী—উম্মে-রুমান, পুত্র—আবদুর রহমান এবং কন্যা—আছ্মা ও উম্মুল-মোমেনীন আয়েশাকে নিয়া আসিবার জন্য।

হযরতের পরিবারবর্গ মদিনায় পৌছিলে হযরত (দঃ) আবু আইউব আনছারীর গৃহ ত্যাগ করতঃ মসজিদ সংলগ্ন তৈরী স্বীয় বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন।

মদিনায় নবীজী কর্ত্তৃক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গোড়াপত্তন ঃ

আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব পালন ও প্রতিষ্ঠা উভয়টিই ইসলামের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু দাসত্ব পালন হইল প্রথম নম্বরে, আর দাসত্ব প্রতিষ্ঠা হইল দ্বিতীয় নম্বরে। তাই ইসলামের মক্কী জীবনে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গোড়াপত্তনে তৎপরতা অবলম্বিত হয় নাই, এমনকি জেহাদেরও অনুমতি দেওয়া হয় নাই। অবশ্য মোসলমানকে আল্লার দাসত্ব পালনের সুযোগ প্রাপ্তির সাথে সাথে উহা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং পরিকল্পনাও গ্রহণ করিতে হয়। মক্কায় আল্লার দাসত্ব পালনেরই সুযোগ ছিল না; মদিনায় আসার পর নবীজী এবং মোসলমানগণ সেই সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন, এমনকি আল্লার দাসত্ব পালনে এবাদত-বন্দেগীর কেন্দ্র মসজিদও নবীজী (দঃ) তৈয়ার করিয়া সারিলেন। নবীজী মোস্তফা (দঃ) তাঁহার কর্ম্ম-পরিকল্পনাকে এত দ্রুত ধাবমান করিলেন যে, বিরতিহীন রূপে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। আল্লার দাসত্ব পালনের সুযোগ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উহা পালন করিয়া যাওয়ার সার্ব্বিক ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়াই নবীজী (দঃ) উহার প্রতিষ্ঠা চেষ্টায় অগ্রসর হইলেন।

নবীজী (দঃ) এই পরিকল্পনায় সর্ব্বপ্রথম মদিনা এলাকাকে গৃহযুদ্ধ মুক্ত শান্তির এলাকায় পরিণত করার ব্যবস্থা করিলেন। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা না থাকিলে তথায় কোন কাজেরই অগ্রগতি সাধন সম্ভব হয় না। এই পদক্ষেপে নবীজী (দঃ) মদিনার বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সহঅবস্থান চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা করিলেন।

মদিনার আদি অধিবাসীর পৌত্তলিক গোত্রগুলিতে ইসলামের প্রভাব পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল; তাহাদের মধ্যে তাহাদের মোসলমানগণ প্রবল ছিলেন—যাঁহারা আনছার নামে আখ্যায়িত ছিলেন। আর এক শ্রেণী ছিলেন প্রবাসী মোসলমান মদিনায় তাঁহাদেরও সংখ্যা যথেষ্ট ছিল; তাঁহারা মোহাজের নামে আখ্যায়িত ছিলেন। মদিনার আদি অধিবাসী আর এক সম্প্রদায় ছিল ইহুদী; নবীজীর আগমন পূর্ব্বে মদিনায় তাহাদেরই প্রাবল্য এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল।

মোসলমানদের দুই শ্রেণী—আনছার ও মোহাজের এবং ইহুদী সম্প্রদায়, এই তিনকে সহঅবস্থান ও মদিনার দেশরক্ষা চুক্তিতে এক করার ব্যবস্থা নবী (দঃ) করিলেন।

আনছার-মোহাজের ও ইহুদীদের মধ্যে সহঅবস্থান-চুক্তির ঐতিহাসিক সনদ সম্পাদন :

সনদটির শিরনামা ছিল নিম্নরূপ—

বিস্‌মিল্লাহির-রহমানির-রহীম

কোরেশ বংশীয় (তথা প্রবাসী বা মোহাজের) মোসলমান, আর মদিনাবাসী মোসলমান এবং তাঁহাদের সহিত যাহারা দেশরক্ষা ও শান্তি অভিযানে অংশ গ্রহণে যোগদান করিবে—সকলের মধ্যে নবী মোহাম্মদ (দঃ) কর্ত্তৃক সম্পাদিত সনদ ইহা।

সনদটির সর্ব্বপ্রথম অনুচ্ছেদ ছিল এই—

"স্বাক্ষরকারী সকল দল অন্য সকলের মোকাবিলায় এক গণ্য হইবে।" অর্থাৎ চুক্তি বা সনদের মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উহার বিরোধীদের মোকাবিলায় স্বাক্ষরকারীগণ অভিন্নরূপে সংগ্রাম করিবে।

অতঃপর সনদের মধ্যে অনেক রকম অনুচ্ছেদই ছিল, তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ কতিপয় অনুচ্ছেদ এই—

১। ইহুদী সম্প্রদায় যাহারা আমাদের সহিত চুক্তি স্বাক্ষরে যোগ দিয়াছে তাহাদের জন্য সাহায্য এবং (নাগরিকত্বের) সমান সুযোগ থাকিবে। তাহাদের কাহারও প্রতি কোন অন্যায় করা হইবে না, তাহাদের কাহারও বিরুদ্ধে তাহার শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করা হইবে না।

২। চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী ইহুদীদের সপক্ষে আরও একটি ধারা ছিল যে, তাহারা নিজেদের ধর্ম্মীয় স্বাধীনতা পাইবে।

৩। ইহুদীদের কেহ মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন যুদ্ধে অবতরণ করিতে পারিবে না।

৪। সনদে স্বাক্ষরকারী কোন সম্প্রদায়ের প্রতি কাহারও আক্রমণ হইলে অন্য স্বাক্ষরকারীগণ ঐ সম্প্রদায়ের সাহায্য-সহায়তা করিবে। অবশ্য অন্যায়ের ক্ষেত্রে কোন সাহায্য করা হইবে না।

৫। স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়গণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে মোসলমানদের ন্যায় ইহুদীগণও ব্যয়ভার বহনে বাধ্য থাকিবে—যাবৎ যুদ্ধ চলিতে থাকে।

৬। স্বাক্ষরকারী এক মিত্র অপর মিত্রকে তাহার অন্যায়ে সাহায্য করিবে না, সর্ব্বক্ষেত্রে মজলুম অত্যাচারিতের পক্ষে সাহায্য থাকিবে।

৭। স্বাক্ষরকারী সকল সম্প্রদায় সমবেতভাবে ইয়্যাছরেব (মদিনা) এলাকাকে রক্ষা করিতে এবং অপরাধমুক্ত রাখিতে বাধ্য থাকিবে।

৮। স্বাক্ষরকারী কোন সম্প্রদায় কোরেশদেরকে বা তাহাদের কোন মিত্রকে কোন প্রকার সাহায্য করিতে পারিবে না।

৯। সকল মোমেন-মোত্তাকী ঐ শ্রেণীর প্রত্যেক মানুষের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত থাকিবে যে অবাধ্য হয় কিম্বা অত্যাচার, অপরাধ, সীমা-লঙ্ঘন বা মোমেনদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা-বিপর্য্যয় ঘটানোর কাজে লিপ্ত হয়। মোমেনদের ঐক্যবদ্ধ হস্ত ঐ শ্রেণীর লোককে শায়েস্তা করায় সক্রিয় থাকিবে—যদিও ঐ লোক তাঁহাদের কাহারও নিজ সন্তান হয়।

১০। (কাহারও সহিত মৈত্রী স্থাপনে আনছার ও মোহাজের—) সকল মোসলমানের মৈত্রী এক হইবে। বিশেষতঃ জেহাদের বেলায় মোসলমানদের এক জনকে ছাড়িয়া অন্যজন কাহারও সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে পারিবে না। প্রয়োজন হইলে মৈত্রী এরূপ স্থাপন করিবে যাহা সকলের স্বার্থ রক্ষায় সমান হয় এবং সকল মোসলমানের পক্ষে ন্যায় হয়। অর্থাৎ মোসলমানদের কোন এক জমাত অন্যদেরকে ছাড়িয়া বা সকল মোসলমানের স্বার্থ সমানভাবে না দেখিয়া শুধু এক দলের স্বার্থের জন্য কাহারও সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে পারিবে না।

১১। এই সনদে স্বাক্ষরকারী মোসলমান যাহারা আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে তাহাদের কেহ কোন ফাছাদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীর সহায়তা করিতে পারিবে না, তাহাকে সমর্থন দিতে পারিবে না। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীকে কেহ সাহায্য সমর্থন দিলে তাহার উপর আল্লার লা'নৎ ও গজব পড়িবে এবং তাহার ফরজ-নফল কোন প্রকার এবাদৎ কবুল হইবে না।

১২। সনদের কোন বিষয়ে কোন বিতর্কের সূত্রপাত হইলে উহার মীমাংসা একমাত্র আল্লাহ এবং মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর ন্যাস্ত হইবে।

১৩। স্বাক্ষরকারী মিত্রদের কোন সম্প্রদায়ে এমন কোন বিবাদের সৃষ্টি হইলে যাহার প্রতিক্রিয়া ছড়াইয়া পড়ার আশঙ্কা হয় সেক্ষেত্রে উক্ত বিবাদের ও মতবিরোধের সমাপ্তি আল্লাহ এবং আল্লার রসুল মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উপর ন্যাস্ত করিতে হইবে।

অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ তায়ালার আদেশ প্রাপ্তে যে মীমাংসা ও সালীসী করিয়া দিবেন তাহাই চূড়ান্ত ও সকলের গ্রহণীয় সাব্যস্ত হইবে।

সনদের সর্ব্বশেষ অনুচ্ছেদ ছিল এই—

আল্লাহ এবং আল্লার রসূল মোহাম্মদ (দঃ) ঐ ব্যক্তির সাহায্য ও সমর্থনের পক্ষে থাকিবেন যে অঙ্গীকার রক্ষা করিয়া চলিবে এবং সৎ-সাধু হইয়া জীবন যাপন করিবে। (সীরতে-ইবনে হেশাম এবং বেদায়াহ, ৩—২৪৪)

এই সনদ সম্পাদনের মাধ্যমে ইসলামের এমন একটি রূপের বিকাশ হইল যাহা সম্পর্কে এতদিন কোন ধারণা করা যায় নাই। রাষ্ট্র পরিচালনায়, সমাজ ব্যবস্থায় এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ইসলামের নীতির রূপরেখা কি হইবে তাহা এতদিন অপ্রকাশিত ছিল। কারণ, ইসলাম ত এতদিন আত্মরক্ষায়ই অক্ষম ছিল; উহার নীতিমালার প্রকাশ সে কোথায় করিবে ?

মদিনায় ইসলাম উহার স্বাধীনতার উৎস লাভের সঙ্গে সঙ্গে ঐ নীতির রূপরেখা প্রকাশ করিয়াদিল যে, ইসলাম তাহার রাষ্ট্রীয় শক্তি ও প্রভাবের দ্বারা অন্য ধর্ম্মের নাগরিকদের উপর ইসলাম ধর্ম্ম বলপূর্ব্বক চাপাইয়া দিবে না। সহঅবস্থান বা রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের ক্ষেত্রে ইসলাম সকলকেই নিজ নিজ ধর্ম্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিবে। প্রথম দিন হইতেই ইসলামের সমাজ ব্যবস্থায় এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উক্ত উদার নীতির রূপরেখা প্রকাশ করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও এই ব্যাপারে আজও ইসলামকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হইয়া থাকে। আজও লোকদের ধারণা— ইসলামী রাষ্ট্রে বা ইসলামী শাসনে অমোসলেমদের গলা কাটিয়া জবরদস্তি তাহাদেরে মোসলমান করা হয়।

উল্লেখিত চুক্তিটি শুধু দেশরক্ষা, শান্তিরক্ষা এবং মদিনায় বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গৃহযুদ্ধ এড়াইবার জন্য রাজনৈতিক চুক্তি ছিল।

মদিনায় ইহুদী সম্প্রদায় ধনে-জনে, শিক্ষা-দীক্ষায়, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে প্রবল ছিল এবং এই সম্প্রদায় ছিল মোসলমানদের ঘোর শত্রু। এই পরিস্থিতিতে মোসলমানদের শক্তিশালী হইতে হইলে মোসলমানদের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্যের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। মদিনায় মোসলমানদের দুইটি সম্প্রদায় ছিল—আনছার তথা মদিনার অধিবাসী মোসলমান, আর মোহাজের তথা বহিরাগত মোসলমান। এই দুই শ্রেণীর মোসলমানের মধ্যে পরস্পর তিল পরিমাণ বিভেদ সৃষ্টি হইলেই মদিনায় মোসলমানদের শক্তি সম্পূর্ণরূপে চুরমার হইয়া যাইত। মদিনায় মোসলমানদের প্রভাব কখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না, বরং চিরকাল ইহুদীদের প্রভাবতলে থাকিতে হইত। আর ইহুদীদের ন্যায় শত্রুদের বেষ্টনে থাকায় মোসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির আশঙ্কা ছিল প্রকট। তাই নবী (দঃ) মোসলমান শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে সামাজিক ঐক্যবন্ধন সৃষ্টির জন্য উভয় শ্রেণীকে আনুষ্ঠানিকরূপে ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ করার ব্যবস্থা করিলেন। এই ব্যবস্থাকেই আরবী ভাষায় "মোয়াখাত" বলা হয়, যাহার অর্থ ভ্রাতৃত্ব বন্ধন।

এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন দ্বারা মোসলমানদের মধ্যে ঐক্য ত সৃষ্টি হইলই, এতদ্ভিন্ন ছিন্নমূল সর্ব্বহারা বহিরাগত মোসলমানদের আশ্রয় লাভেরও বিশেষ সুব্যবস্থা হইল।

আনছার ও মোহাজেরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন (৫৩৩—৫৬১ পৃঃ)

মক্কায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতঃ হিজরত করিয়া মদিনায় আগমনকারী নিঃস্ব মোসলমানদের জন্য এক একজন মদিনাবাসী মোসলমান তথা আনছারীর সঙ্গে এক একজন মোহাজেরের "মোয়াখাত—ভাই-বন্ধি" বা বন্ধুত্ব স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। একদা এক মজলিসে ৪৫ জন আনছারীর সঙ্গে ৪৫ জন মোহাজেরের ভাই-বন্ধি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতঃ হযরত (দঃ) এই মহান কার্য্যের উদ্বোধন করিয়াছিলেন (আছাহ-হুছ-সিয়ার ১১০)। আনছার তথা মদিনাবাসী মোসলমানগণ এই ভাই-বন্ধির মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন তাহার নজীর কোন জাতির ইতিহাসে নাই।

দ্বিতীয় খণ্ডে ১১৩৭ নং হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাদের গৃহে আনছার ও মোহাজেরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপনের কাজ করিয়াছিলেন।

আনছারগণের চরম সহানুভূতি ঃ

১৭১৭। হাদীছ ঃ—(৫৩৪ পৃঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (আন্‌ছার ও মোহাজেরদের মধ্যে ভাই-বন্ধি অনুষ্ঠিত হওয়ার পর) আন্‌ছারীগণ হযরতের খেদমতে আরজ করিলেন, আমাদের এবং আমাদের মোহাজের ভাইদের মধ্যে আমাদের সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দিন। হযরত (দঃ) তাহা অস্বীকার করিলেন অতঃপর তাঁহারা বলিলেন, তবে মোহাজের ভাইগণ আমাদের জায়গা-জমিতে কাজ করিবেন সে সূত্রে তাঁহারা উহার উৎপন্নে আমাদের শরীক হইবেন। ইহাতে সকলেই সম্মতি দান করিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আনছারগণ কর্ত্তৃক মোহাজেরগণের প্রতি চরম সহানুভূতির অসংখ্য উপমা ইতিহাস এবং হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে। যথা—দ্বিতীয় খণ্ডে ১০৬১ নং হাদীছে একটি ঘটনা রহিয়াছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) মোহাজের এবং সায়াদ ইবনে রবী (রাঃ) আনছারী এই দুই জনের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করিয়াছিলেন। সেমতে সায়াদ (রাঃ) স্বতঃস্ফুর্ত্ত প্রস্তাব করিলেন, আমি একজন বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি; আপনি আমার ভ্রাতা—সেই হিসাবে আমার ধন-সম্পদের অর্দ্ধভাগ আমি আপনাকে দিয়া দিলাম।

এমনকি প্রবাসী ও বিদেশী মানুষ হিসাবে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) মোহাজেরের নিকট কেহ মেয়ে বিবাহ দিতে সম্মত হইবে না আশঙ্কায় সায়াদ (রাঃ) এই প্রস্তাবও করিলেন যে, আমার দুই স্ত্রী আছে (তখন পর্দ্দার মছআলাহ না থাকায়) আপনি উভয়কে দেখিয়া যাহাকে পছন্দ করিবেন আমি তাহাকে তালাক দিয়া দিব; আপনি তাহাকে বিবাহ করিয়া নিবেন।

ঐরূপ দ্বিতীয় খণ্ড ১১৫৮ নং হাদীছেও ঘটনা বর্ণিত আছে, বাহরাইন এলাকা জয় হইলে পর রসুলুল্লাহ (দঃ) ইসলামের জন্য কর্ম্ম তৎপরতায় আত্মত্যাগের স্বীকৃতি দান স্বরূপ আনছারগণকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, এই এলাকার পতিত জমিগুলি তোমাদের নামে লিখিয়া দেই। আনছারগণ উত্তরে বলিয়াছিলেন, যদি আপনি আমাদেরকে জমি লিখিয়া দিতে চান তবে প্রথমে আমাদের মোহাজের ভাইগণকে ঐ পরিমাণ জমি লিখিয়া দিয়া তারপরে আমাদিগকে দিবেন।

পবিত্র কোরআনেও স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা আনছারগণের চরম উদারতার বর্ণনায় আয়াত নাযেল করিয়াছেন—

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

"অভাব অনটন থাকা সত্ত্বেও আনছারগণ নিজেরা না খাইয়া অন্যকে অগ্রগণ্য করিয়া থাকে, অন্যের অভাব মিটাইয়া থাকে।"

এই আয়াত যেই বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযেল হইয়াছিল উহা অত্যন্তই কৌতূহলজনক। একদা এক ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি নবীজীর নিকট উপস্থিত হইল, নবীজী প্রথমে নিজ গৃহিণীদের নিকট খোঁজ নিলেন; সংবাদ আসিল—আমাদের নিকট পানি ব্যতীত আর কিছুই নাই। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) অন্যদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ক্ষুধার্ত্তের মেহমানীর জন্য কে প্রস্তুত আছ? একজন আনছারী ছাহাবী নিবেদন করিলেন, আমি আছি। অতিথিকে নিয়া তিনি গৃহে গেলেন এবং স্ত্রীকে বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অতিথির সেবা উত্তমরূপে করিও। স্ত্রী বলিলেন, শিশু সন্তানদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু খাদ্য ব্যতীত অতিরিক্ত আর কিছু নাই।

তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে গৃহের এই সামান্য খাদ্য নিজেরা কেহ না খাইয়া অতিথিকে সম্পূর্ণ খাওয়াইবার এক অভিনব কৌশল করিলেন। শিশু সন্তানদেরকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিলেন। ঐ সময় পর্দ্দার মছআলাহ ছিল না, আরবীয় প্রথানুসারে গৃহের সকলকে অতিথির সহিত বসিয়া একই পাত্রে খাইতে হইবে। এই সমস্যার সমাধানে স্ত্রী স্বামীর পরামর্শানুযায়ী ছল করিয়া গৃহের প্রদীপ নিবাইয়া দিলেন, অতঃপর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অতিথির সঙ্গে খাইতে বসিয়া গেলেন এবং এমন ভাব দেখাইলেন যেন তাঁহারাও খাইতেছেন। প্রকারান্তরে তাঁহারা এক লোকমাও খাইলেন না—সুকৌশলে সম্পূর্ণ খাদ্যটুকু অতিথিকে খাওয়াইয়া নিজেরা উপবাসে রাত্র কাটিলেন। তাঁহাদের এই অতুলনীয় মহানুভবতাকে লক্ষ্য করিয়া উল্লেখিত আয়াত নাযেল হইল।

আত্মনির্ভরশীলতায় মোহাজেরগণের দৃঢ়তা :

আনছারগণ এইভাবে অসাধারণ উদারতা ও মহানুভবতা দেখাইতেছিলেন, কিন্তু মোহাজেরগণ ইহাকে সুযোগ রূপে কখনও গ্রহণ করেন নাই। আনছারগণের মহানুভবতায় একান্ত কৃতজ্ঞ থাকিয়াও মোহাজেরগণ নিজেদের কায়িক পরিশ্রম এবং ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা নিজেদের জীবিকা সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করিতেন।

১৭১৭ নং হাদীছে দেখিতে পাইয়াছেন, আনছারগণ নিজেদের সম্পত্তি মোহাজেরগণকে ভ্রাতা হিসাবে বণ্টন করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিয়া ছিলেন। মোহাজেরগণ তাহাতে সম্মত না হইয়া কায়িক পরিশ্রমের বিনিময়ে বর্গা প্রথায় অংশ গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন।

তদ্রূপ দ্বিতীয় খণ্ডে ১০৬১নং হাদীছের ঘটনায়ও আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) মোহাজের সায়াদ (রাঃ) আনছারীর মহানুভবতার প্রস্তাব—সম্পত্তি ও স্ত্রী বণ্টন করিয়া নেওয়ার প্রস্তাবকে ধন্যবাদের সহিত এড়াইয়া গিয়া বলিয়াছিলেন—ভাই! আমাকে বাজার দেখাইয়া দিন; তিনি বাজারে যাইয়া ব্যবসায় দ্বারা প্রতিদিন সামান্য সামান্য উপার্জন করিতে লাগিলেন এবং অনতিবিলম্বেই বিবাহ করিলেন। হযরত তাঁহাকে ওলিমা খাওয়াইবার পরামর্শ দিলেন; তাহা করিতেও তিনি সক্ষম হইলেন, এমনকি ব্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি কালে বহু ধনের অধিপতি হইয়া ছিলেন।

আয়েশা (রাঃ)কে গৃহে আনয়ন :

বিবাহের ইজাব-কবুল আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সহিত হিজরতের পূর্ব্বে মক্কায় অবস্থানকালেই সম্পন্ন হইয়াছিল। বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সময় বিবাহের শুধু ইজাব-কবুলই হইয়াছিল; আয়েশা (রাঃ)কে নবীজী (দঃ) নিজ গৃহে আনিয়াছিলেন না; তখন তাঁহার বয়সও অনেক কম ছিল—মাত্র ছয় বৎসর ছিল। মদিনায় হিজরত করিয়া আসার ৭ বা ৮ মাস পরে নবী (দঃ) আয়েশা (রাঃ)কে নিজগৃহে আনিলেন; তখন তাঁহার বয়স নয় বৎসর পূর্ণ হইয়া ছিল। ১৬৯৬ নং হাদীছে বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

আজানের প্রবর্ত্তন :

মক্কায় সুদীর্ঘ জীবনে নবীজী এবং মোসলমানগণ মনের সাধ মিটাইয়া নামায পড়িতে পারিতেন না; মসজিদে সমবেত হইয়া জমাতে নামায আদায় করার পূর্ণ সুযোগ ছিলই না। মদিনায় সেই সব বাধা-বিপত্তি নাই; মোসলমানগণ তাঁহাদের মা'বুদের সর্ব্বপ্রধান এবাদৎ নামায মনের সাধ মিটাইয়া আদায় করার পূর্ণ সুযোগ পাইয়াছেন। জমাতের সহিত নামায আদায় করার জন্য মসজিদ তৈরী হইয়াছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং জুমার নামায মোসলমানগণ নবীজীর পেছনে সমবেতভাবে জমাতের সহিত আদায় করিতেন।

লোকেরা অনুমানের দ্বারা নামাযের সময় নিরূপণ করিয়া মসজিদে আগমন করিয়া থাকেন—ইহাতে নিশ্চয় অসুবিধা হইতে লাগিল। এই অসুবিধা এড়াইবার জন্য নবীজীর সহিত মোসলমানদের ছলা-পরামর্শ হইতেছিল। এমতাবস্থায় এক কৌতূহলজনক ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে আজান প্রবর্ত্তিত হইল—যাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

আজান প্রথা ইসলাম ও মোসলমানদের মধ্যে এক নবযুগের সূচনা করিল। তৌহীদের ঘোষণা, মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার রসুল, এই ঘোষণা—যাহা গৃহ-প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে বসিয়া শুধু নিজ মুখে উচ্চারণ করিতেও মোসলমানগণ সন্ত্রস্ত থাকিত, নামাযকে মোসলমান নিজেই আদায় করিতে শত বাধার সম্মুখীন হইত—অপরকে উহার প্রতি আহ্বান করার ত প্রশ্নই ছিল না।

আজ সেই তৌহীদের ঘোষণা, মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার রসুল হওয়ার ঘোষণা, নামাযের প্রতি আহ্বান গৃহভ্যন্তরে নয়, শুধু মুখের উচ্চারণে নয়, শুধু সুযোগ প্রাপ্তে নয়—বরং নীতিগত ও রীতিমতভাবে, বলিষ্ঠ কণ্ঠে, সর্ব্বোচ্চ স্বরে ঐ ঘোষণা ও আহ্বানের সুর-লহরী আকাশে-বাতাসে মিশাইয়া দেওয়া হইতেছে।

প্রতিদিন পাঁচ পাঁচবার ঐ ঘোষণা ও আহ্বানের বজ্রনিনাদে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইতে লাগিল। আজানের এই অপূর্ব্ব ধ্বনি-তরঙ্গ মানুষের কর্ণকুহরে প্রবেশ করায় তাহাদের মনঃপ্রাণ ঝংকৃত হইয়া উঠিতে লাগিল। ইসলামের গৌরব মোসলমানদের বিজয়-ধ্বনির মহাস্বর সেই আজান যাহা বিশ্বের মিনারে মিনারে আজও ধ্বনিত হইতেছে—হিজরতের প্রথম বৎসরেই এই মহাধ্বনি ইসলামের বিধান রূপে প্রবর্ত্তিত হয় এবং আবহমানকালের জন্যই ইসলামের গৌরব ও বিজয়-স্মৃতিরূপে চিরাগতবিধি আকারে আজান সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়।

মদিনায় ইসলামের এক নবরূপের আবির্ভাবঃ

মক্কায় দীর্ঘ তের বৎসর নবীজীর নীতি ছিল—বিধর্ম্মীদের জুলুম-অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া যাওয়া। এক গালে চর খাওয়া সত্ত্বেও অপর গাল পাতিয়া দিয়াও সংঘর্ষ এড়াইতে হইবে—এই ছিল তাঁহার নীতি। মক্কার পাষণ্ডরা তাঁহার উপর এবং তাঁহার ভক্তগণের উপর কী অমানুষিক অত্যাচারই না করিয়াছে! স্বয়ং নবীজীকে গালাগালি দিয়াছে, প্রহার করিয়াছে, নানাপ্রকারে তাঁহাকে উৎপীড়ন করিয়াছে, সামাজিক বয়কট করিয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করিয়াছে। মোসলমানদের উপর ত অত্যাচারের সীমাই ছিল না। কিন্তু নবীজীর পক্ষ হইতে প্রতিরোধ বা প্রতিকার ছিল না; নীরবে সহ্য করিয়া চলাই ছিল তাঁহার নীতি। দীর্ঘ তের বৎসরেও এই নীতির সুফল ফলিল না; মক্কার পাষণ্ডরা

এই নীতির পাত্র ছিল না। তাহাদের উপর এই সাধুনীতির বিরূপ ক্রিয়া হইল; এই নীতির সুযোগে পাষণ্ডরা জুলুম-অত্যাচারের পরিমাণ দিনের দিন বাড়াইল বৈ কমাইল না। অবশেষে বাধ্য হইয়া নবীজী (দঃ) এবং মোসলমানগণ ঘরবাড়ী, টাকাকড়ি, আত্মীয়-স্বজন বর্জন করতঃ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া মদিনায় চলিয়া আসিলেন।

মদিনায় আসিয়া নবীজী অন্য একটি সত্যের প্রতি দৃষ্টি দিলেন যে, নিষ্ক্রিয় সহ্য দুষ্কৃতির প্রশ্রয় দেয়; অতএব অত্যাচারী জালেমকে অবশ্যই সক্রিয়ভাবে বাধা দিতে হয় এবং যত দিন না তাহাতে জয়লাভ করা যায় ততদিন সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হয়। আল্লার সার্ব্বভৌমত্ব মানিয়া চলায় যাহারা বাধার সৃষ্টি করে, আল্লার এবাদৎ-বন্দেগী করাকে যাহারা অপরাধ গণ্য করিয়া উৎপীড়ন করে জুলুম-অত্যাচার করে তাহারা প্রকৃতই জালেম ও সত্যের শত্রু। এই জালেমদেরকে দমন করিতে হইবে, এই শত্রুদেরকে বাধা দিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিতে হইবে, অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে।

এই যুদ্ধ নিছক রাজ্য জয়ের জন্য নয়, তথা ডাকাতের মত নিজ স্বার্থ লোভে নরহত্যা ও লুণ্ঠন করার ন্যায় নয়। এই যুদ্ধ মঙ্গলের জন্য, সত্য ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য; তথা ডাক্তারের মত দেহের শান্তি ও সুস্থতা রক্ষাকল্পে উহার অবাঞ্ছিত ও দূষিত অংশকে অস্ত্রোপচারে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়ার ন্যায়। এই যুদ্ধকেই জেহাদ বলা হয়। জেহাদে অস্ত্রধারণ ও অস্ত্র প্রয়োগ আছে বটে, কিন্তু সর্ব্বক্ষেত্রে অস্ত্রপ্রয়োগ নিন্দনীয় নয়। সত্য ও আদর্শের জন্য শান্তি ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্রপ্রয়োগ অতি মহৎই বটে।

বিশ্ববুকে সত্য, শান্তি ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠায় নবীজী মোস্তফা (দঃ) মক্কায় দীর্ঘ তের বৎসর সহ্য ও সহিষ্ণুতার সাধুনীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়া ছিলেন; পাত্রের অযোগ্যতা হেতু উদ্দেশ্যে সফলতা প্রতিষ্ঠায় উহা ব্যর্থ হইয়াছে। মদিনায় আসিয়া নবীজী (দঃ) ঐ উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠায় জেহাদের বলিষ্ঠ নীতির প্রতি দৃষ্টি দিলেন।

তাঁহার এই নীতি পরিবর্ত্তনের সূচনায় আল্লাহ তায়ালার ইঙ্গিত এবং সমর্থনও ছিল অতি সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ। মদিনায় হিজরত এবং প্রবাসীদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা মোটামুটি শৃঙ্খলায় আসার পর পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটি অবতীর্ণ হইল—

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ -

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ

(মোসলেম জাতি) যাহারা (এক আল্লার প্রভুত্বের স্বীকৃতি দানের অপরাধে পথে-ঘাটে) আক্রান্ত হইয়া থাকে তাহাদেরে সংগ্রাম করার অনুমতি প্রদান করা

হইল—কারণ, তাহারা অত্যাচারিত। নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদিগকে জয়ী করিতে সক্ষম। তাহাদেরে অন্যায়রূপে তাহাদের ঘর-বাড়ী হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে—শুধুমাত্র এই কারণে যে, তাহারা বলে, আমাদের প্রভু এক আল্লাহ।" ১৭ পাঃ ১২ রুঃ

মোসলমানদের নীতি পরিবর্ত্তনের আহ্বানে আরও আয়াত অবতীর্ণ হইল। যথা—

(১) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"আল্লার পথে তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর যাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। তবে (কোথাও চুক্তিবদ্ধ থাকিলে তথায় চুক্তির) সীমা লঙ্ঘন করিও না। সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন না।"

(২) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

"আর (যাহারা তোমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী) তাহাদেরে যথায় পাও হত্যা কর এবং যেখান হইতে তাহারা তোমাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছে সেখান হইতে তোমরাও তাহাদেরে বিতাড়িত কর। আর জানিয়া রাখ, (জুলুম-অত্যাচার ও আল্লার ধর্ম্মে বাধা দান ইত্যাদি) অপকর্ম্ম হত্যাকাণ্ড অপেক্ষা বেশী ভয়াবহ। (অতএব যাহারা ঐ শ্রেণীর অপকর্ম্মে লিপ্ত তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সমীচীনই বটে।)"

(৩) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

"(আল্লার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় যাহারা বাধাদানকারী) তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইয়া যাইতে থাকিবে যাবৎ না আল্লার দ্বীনে অন্তরায় সৃষ্টি রহিত হইয়া যায় এবং আল্লার দ্বীনের প্রাবল্য প্রতিষ্ঠিত হয়।" (২ পাঃ ৮ রুঃ)

(৪) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ - وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ - وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"জেহাদ তোমাদের জন্য অবধারিত কর্ত্তব্য করা হইল যদিও তোমরা উহা কঠিন মনে কর। তোমরা যাহা কঠিন গণ্য করিতেছ হয়ত উহাতেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত এবং যাহা তোমরা ভাল মনে করিতেছ হয়ত উহাতে তোমাদের অমঙ্গল রহিয়াছে। আল্লাহই সব জানেন তোমরা জানো না।" (২ পাঃ ১০ রুঃ)

মোসলমানদের তৎকালীন প্রথম নম্বরের বিপক্ষ মক্কার কাফেরদের চরম উগ্রতাও নবীজীর নীতি পরিবর্ত্তনকে অপরিহার্য্য করিয়া তুলিতেছিল এবং পরিবর্ত্তিত নূতন নীতিতে দ্রুত অগ্রসর হইতে বাধ্য করিতেছিল।

মক্কার কাফেররা নবীজী এবং মোসলমানদিগকে দীর্ঘদিন যাবৎ জুলুম-অত্যাচারে কাবু করিয়া রাখিয়াছিল। হিজরতের পরে তাহারা দেখিল, শিকার সম্পূর্ণরূপে তাহাদের হাতছাড়া হইয়া নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। মোসলমানগণ মদিনায় পৌঁছিয়া সমাদরে গৃহীত হইয়াছে, তাহারা তথায় শান্তি ও স্বস্তির সহিত তাহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম পালনের পূর্ণ সুযোগ পাইয়াছে। যে ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনে কোরেশরা এক যুগ ধরিয়া চেষ্টা-পরিশ্রম করিয়াছে আজ সেই ধর্ম্ম মদিনা ও পার্শ্ববর্ত্তী এলাকায় দ্রুত প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার লাভ করিয়া চলিয়াছে। এই সব সংবাদে তাহাদের শয়তানী ক্রোধ শতগুণে বাড়িয়া গেল। তারপর এই সংবাদও তাহারা অবগত হইল যে, মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) মদিনার মোসলমান, প্রবাসী মক্কার মোসলমান, এমনকি মদিনার ধনে-জনে পুষ্ট ইহুদীদিগকেও লইয়া এক আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি ও সনদের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। উক্ত সনদের একটি বিশেষ অনুচ্ছেদে কোরেশ এবং তাহাদের মিত্রদের প্রতি বৈরী হওয়ার উপর মদিনার সকল সম্প্রদায়কে সম্মত করাইয়াছেন। মদিনার সকল সম্প্রদায়কে এক বিশেষ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা পূর্ব্বক আন্তর্জাতিক সন্ধি স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে কোন বহির্দেশ মদিনাকে আক্রমণ করিলে ধর্ম্ম ও গোত্র নির্ব্বিশেষে সকলে একযোগে সেই আক্রমণ প্রতিহত করিবে। এইভাবে মোসলমানগণ মদিনায় নিজেদের নিরাপত্তাকে সুদৃঢ় করিতে সফল হইয়াছে; এখন মদিনা আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে হেস্তনেস্ত ও বিধ্বস্ত করা অতিশয় কঠিন হইয়া পড়িতেছে। এইসব শুনিয়া ও ভাবিয়া কোরেশরা ক্ষোভে ও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। একদিকে মোসলমানদের শান্তি লাভের উপর ক্ষোভ ও ক্রোধ, অপরদিকে তাঁহাদের শক্তি সঞ্চয়ের উপর আতঙ্ক।

নরাধমেরা নবীজী ও তাঁহার সহচরবর্গের প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল এখন তাহা তাহাদের স্মরণ পথে উদিত হইতে লাগিল এবং অন্তরে আতঙ্ক উঁকি দিল যে, মোসলমানগণ এইভাবে আরও কিছু শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়াস পাইয়া প্রতিশোধ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের পরিণাম কত শোচনীয় হইতে পারে?

তাহাদের আতঙ্কের আর একটি বিশেষ কারণ ত অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল। মক্কা এলাকা উৎপাদনে সম্পূর্ণ অক্ষম; বাণিজ্যই হইল ঐ এলাকার লোকদের একমাত্র জীবন-সম্বল এবং সিরিয়ার বাণিজ্যই তাহাদের প্রধান অবলম্বন। আর মক্কা ও সিরিয়ার বাণিজ্য পথটি মদিনাবাসীদের বাগের ভিতরে। ঐ পথে চলাচলকারীদের বাণিজ্য সম্ভার লুণ্ঠন করা এবং মক্কাবাসীদের এই বাণিজ্য পথ বন্ধ করা মদিনাবাসীদের পক্ষে অতি সহজ। মক্কাবাসীরা মোসলমানদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়া তাঁহাদের সহিত যে শত্রুতা স্থাপন করিয়াছিল তাহাও তাহারা উত্তমরূপে অবগত ছিল। সুতরাং মদিনায় মোসলমানদের প্রতিষ্ঠা লাভ মক্কার কাফেরদের জন্য মৃত্যু-পরোয়ানা। এই সকল চিন্তা ও উদ্বেগ কোরেশদের ক্ষোভ ও আতঙ্কে অগ্নি-মাঝে কেরোসিনের কাজ করিল। শিকড় জমাইয়া অজেয় হইবার পূর্ব্বেই কাল বিলম্ব না করিয়া মোসলমান জাতিকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার জন্য তাহারা উন্মাদ হইয়া উঠিল। এমনকি মদিনা আক্রমনে মোসলমানদিগকে তথা হইতে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনায় নানারকম চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিল এবং উস্কানীমূলক কার্য্যে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল। কোরেশদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত কত মারাত্মক ছিল— একটি নমুনা লক্ষ্য করুন—

রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং মোসলমানগণ মক্কায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া মদিনায় আসিয়াছেন—এখানেও তাঁহারা যেন আশ্রয় না পান মক্কার দুরাচাররা সেই ফিকিরে লাগিয়া গেল। ইহার সুযোগ লাভের অবকাশও মদিনায় ছিল—এই সময় মদিনায় খযরজ বংশীয় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত প্রতি-পত্তিশালী মোশরেক ছিল। সমগ্র মদিনায় তাহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল, এমনকি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মদিনায় আগমনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আবদুল্লাহই মদিনার শাসক ও প্রধান নিযুক্ত হইবে। অচিরেই তাহার শিরে পরাইবার জন্য রাজমুকুটও তৈরী হইতেছিল, কিন্তু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মদিনায় পদার্পণে ঐ সব পরিকল্পনাই বানচাল হইয়া গিয়াছে। এই কারণে স্বভাবতঃই তাহার ক্রোধ পড়িয়াছে নবীজীর উপরে; এই সংবাদ কোরেশদের অবিদিত ছিল না এবং তাহারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতেও মোটেই বিলম্ব ও ত্রুটি করিল না। তাহারা আবদুল্লাহ এবং তাহার দলস্থ মোশরেক-পৌত্তলিকদেরে মোসলমানদের বিরুদ্ধে উত্থান করিতে উত্তেজিত করিয়া আবদুল্লার নিকট গুপ্তপত্র পেরণ করিল যাহার মর্ম্ম এই ছিল—

"তোমরা (আমাদের স্বধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও) আমাদের পরম শত্রু ব্যক্তিকে তোমাদের দেশে আশ্রয় দিয়াছ। হয় তোমরা যুদ্ধ করিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়া ফেল, না হয় তোমাদের দেশ হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দাও। অন্যথায় আমরা

নিশ্চয় আমাদের সমস্ত শক্তি লইয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করিব এবং তোমাদের যুবক দলকে হত্যা করিব, তোমাদের স্ত্রীলোকদিগকে ছিনাইয়া নিয়া আসিব।

আবদুল্লার নিকট এই পত্র পৌঁছিলে সে অতি উৎসাহী হইয়া মোসলমানদের বিরুদ্ধে শক্তি সংগ্রহে তৎপর হইল এবং নবীজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি করিল।

রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সংবাদ অবগত হইয়া স্বয়ং তিনি আবদুল্লাহ এবং তাহার দলের লোকদের নিকট গমন করিয়া তাহাদেরে বলিলেন—দেখিতেছি, কোরেশদের চাল তোমাদের উপর বেশ চলিয়া গিয়াছে, তোমরা তাহাদের ফাঁদে পড়িয়া গিয়াছ। তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? কোরেশরা আক্রমণ করিলে তাহারা তোমাদের যে ক্ষতি করিবে—তাহাদের উস্কানীতে তোমরা যাহা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছ তাহার ফলে তোমাদের নিজেদের হাতে নিজেদের ক্ষতি তদপেক্ষা তিল পরিমাণও কম হইবে না। মোসলমানদের মধ্যে তোমাদেরই পুত্র, ভ্রাতা ও আত্মীয়-স্বজন রহিয়াছে; অতএব মোসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে তোমাদেরই সেই পুত্র, ভ্রাতা ও স্বজনরা মারা পড়িবে। নবীজীর এই যুক্তিপুর্ণ উক্তির প্রভাবে আবদুল্লার দলের মধ্যে মত্ পরিবর্ত্তনের হিরিক পড়িয়া গেল; তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল; আবদুল্লাও নীরব থাকিতে বাধ্য হইল।

কোরেশদের এই সব ষড়যন্ত্র এবং উস্কানীর মুখে নিষ্ক্রীয় দর্শকের ভূমিকায় বসিয়া থাকা নবীজীর পক্ষে সমীচীন ছিল—কোন পাগলও ইহা ভাবিতে পারে না। কর্ত্তব্যের খাতিরেই নবীজীকে সক্রীয় হইতে হইল; অত্যাচারী জালেম শক্তিকে শক্তি দ্বারা বাধা দানের বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করিতে হইল। স্বষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে বাধাদানকারীদের বাধা অপসারণে তাহাদিগকে দাবাইবার জন্য শক্তির মোকাবিলায় শক্তি প্রয়োগের নীতিতে নবীজী অগ্রসর হইলেন—ইহাই বলিষ্ঠ ও জাগ্রত জীবনের লক্ষণ বটে। সসম্মানে জাতিগতভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এই নীতি অপরিহার্য্য; যতদিন না ইহাতে জয়লাভ হয় তত দিন সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হয়। নবীজী মোস্তফা (দঃ) মদিনার জীবনে সেই সংগ্রামেই অবতীর্ণ হইলেন।

চির শত্রু মক্কার দস্যুদের উস্কানীর প্রতিরোধে প্রথম প্রথম ছোট ছোট অভিযান পরিচালিত হয়, যাহার ফলে বড় বড় যুদ্ধের সুচনা হইয়া পড়ে; নবীজীর দশ বৎসর জেহাদী জীবনের বেশীর ভাগ জেহাদ এই ছেলছেলা ও অনুক্রমেই ছিল।

এতদ্ভিন্ন ইহুদীজাতি যাহারা স্বভাবতঃই ক্রুর ও কুটিল, তাহারাও ইসলামের উন্নতিতে এবং মদিনায় তাহাদের দীর্ঘ দিনের প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব্ব হইতে থাকায় সহঅবস্থান চুক্তি ভঙ্গ করিয়া অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা স্বষ্টি করিতে লিপ্ত হয়। তাহাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে কতিপয় জেহাদের সুচনা হয়। এইভাবে মদিনায় নবীজীর দশ বৎসরের জীবনে তাঁহাকে কতকগুলি যুদ্ধ-জেহাদে জড়াইয়া

পড়িতে হইয়া ছিল। নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবনী আলোচনায় সেই সব জেহাদের বিবরণ এক বিশেষ অধ্যায়রূপে পরিগণিত হইয়াছে; বাস্তবিকই উহা এক বৈশিষ্ট্যপুর্ণ অধ্যায়। মুষ্টিমেয় সংখ্যার জমাত অতি নগণ্য সম্বল লইয়া যেভাবে বিদ্যুৎগতিতে জয়লাভ করিয়া যাইতে থাকে উহা দৃষ্টে বলিতে বাধ্য হইতে হয় যে, জেহাদগুলি প্রকৃতঃই নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মোজেযা ও ইসলামের সত্যতার উজ্জল প্রমান ছিল।

মূল বোখারী শরীফে ৫৬৩ হইতে ৬৪২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত সেই সব জেহাদের বিবরণ বর্ণিত আছে। বাংলা বোখারী শরীফ তৃতীয় খণ্ডে প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী উহার অনুবাদ রহিয়াছে এবং অধ্যায়টির ভুমিকায় জেহাদ সম্পর্কে এবং জেহাদে অবতরণের সুচনায় নবীজীর প্রজ্ঞাময় বৈজ্ঞানিক কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবনী সঙ্কলনে ঐ সব জেহাদের বিবরণ দান অবশ্যই অপরিহার্য্য বিষয়। কিন্তু আমাদের তৃতীয় খণ্ডে উহার অনুবাদ হইয়া যাওয়ায় বক্ষমান খণ্ডে আমরা ঐ আলোচনা হইতে বিরত রহিয়াছি। আমরা হিজরী সালগুলির ঘটনাবলী আলোচনায় ঐ জেহাদসমূহের শুধু নাম উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত থাকিব। বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ড হইতে উদ্ধার করার জন্য পাঠক সমীপে অনুরোধ।

এই বৎসরের জেহাদ ঃ

এই সালে নবী (দঃ) তিনটি অভিযানের ব্যবস্থা করেন। অভিযানগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিল এবং নবী (দঃ) সঙ্গে থাকেন নাই। সর্ব্বপ্রথম অভিযানটি পরিচালিত হয় হামযাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নেতৃত্বে, দ্বিতীয় অভিযানটি পরিচালিত হয় ওবায়দা-ইবনুল-হারেছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নেতৃত্বে। তৃতীয় অভিযানটি পরিচালিত হয় সায়াদ-ইবনে-আবু ওক্কাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নেতৃত্বে।

হিজরী দ্বিতীয় বৎসর

এই বৎসরই সর্ব্বপ্রথম নবী (দঃ) স্বয়ং জেহাদ অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। নবীজীর সর্ব্বপ্রথম অভিযানটি ছিল—গযওয়া আবওয়া বা ওদ্দান। পর পর এইরূপ আরও তিনটি অভিযান স্বয়ং নবী (দঃ) কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়—গযওয়া বাওয়াত, গযওয়া-ওসায়রা, গযওয়া-ছাফওয়ান।

এই বৎসরই নবীজী (দঃ) মক্কার দস্যুদের বিরুদ্ধে তাঁহার বৈজ্ঞানিক রণকৌশলকে জোরদার করার জন্য আর একটি অতি সুন্দর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। মক্কা

এলাকার ভিতরে গোয়েন্দা দল পাঠাইয়া শত্রুদের গমনাগমন ও তাহাদের খবরাখবর গোপনে অবগত থাকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নেতৃত্বে গোয়েন্দা দল প্রেরিত হয়।

কেব্‌লা পরিবর্ত্তন ঃ

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে স্পষ্ট বলিয়াছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِى السِّلْمِ كَافَّةً

"হে ঈমানদারগণ তোমরা পুরাপুরিভাবে ইসলামের আওতাভুক্ত হও।"

পরিপক্ক ও পরিপূর্ণ ঈমান-ইসলাম আন্তরিক বিশ্বাস ও দৈহিক আমল ভিন্ন আরও একটি সুক্ষ্ম জিনিষের দাবী করে। সেই জিনিষটি হইল মানসিক-পরিবর্ত্তন। ঈমানে-মোফাচ্ছাল কলেমার বিষয়বস্তুগুলির প্রতি অটুট বিশ্বাস স্থাপন এবং পূর্ণ শরীয়তের ফরজ-ওয়াজেব, হালাল-হারাম অনুযায়ী সমুদয় আমল সম্পাদন—এর পরেও পরিপক্ক ঈমান-ইসলামের আর একটি (DEMAND) দাবী থাকে, আল্লাহ ও আল্লার রসুলের তথা ইসলামী শরীয়তের মানসিক গোলামী। অর্থাৎ নিজের মানস—মন চিত্ত ও অভিলাসকে আল্লাহ ও রসুলের পূর্ণ অনুগত বানাইয়া নেওয়া যে, ভিন্ন ধর্ম্মীয়, ভিন্ন রীতি-নীতি বা ভিন্ন পরিবেশের কোন প্রকার প্রভাব বা আকর্ষণ তাহার মানস ও অভিলাসকে প্রভাবিত ও আকৃষ্ট করিতে পারে না। এই বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে এই হাদীছে উল্লেখ আছে—

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ

"তোমাদের কেহ পরিপক্ক ঈমানদার সাব্যস্ত হইবে না যাবৎ না তাহার মানস ও অভিলাস পূর্ণ অনুগত হইয়া যায় ঐ জীবন-ব্যবস্থার যাহা আমি বহন করিয়া নিয়া আসিয়াছি।"

ছাহাবা-কেরামগণকে আল্লাহ তায়ালা সর্ব্বদিক দিয়া পরীক্ষার সম্মুখীন করিয়া পূর্ণ পরিপক্ক মোমেন-মোসলেমরূপে গড়াইয়া ছিলেন। ভীষণ দুর্য্যোগ দুর্ভোগের প্রলয়ঙ্কর কম্পন তাঁহাদের উপর বহাইয়া তাঁহাদের ঈমান ও ইসলামকে পরীক্ষা করা হইয়াছে—مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا

"দুর্য্যোগ দুর্ভোগ ও বিভীষিকাপূর্ণ নির্য্যাতন তাঁহাদিগকে কম্পমান করিয়া তুলিয়াছিল।" (কোরআন শরীফ)

ঘর-বাড়ী আত্মীয়-স্বজন সর্ব্বস্ব ত্যাগে হিজরতের দ্বারাও তাঁহাদেরে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। এইভাবে ঈমান ও ইসলামের পরীক্ষা ছেলছেলায় আল্লাহ তায়ালা ছাহাবীগণকে তাঁহাদের মানসিক-পরিবর্ত্তনের পরীক্ষাও করিয়াছেন অনেক বিষয়ের দ্বারা। সব রকম পরীক্ষায়ই ছাহাবীগণ উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন এবং সর্ব্ব ক্ষেত্রে সাফল্যের মান লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তবেইত তাঁহারা ইসলামের এত দূর উন্নতি সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন এবং স্বয়ং আল্লার রসুল কর্ত্তৃক তাঁহাদের প্রতিজন—প্রত্যেক ব্যক্তি আদর্শ হওয়ার যোগ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়া ছিলেন।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন— أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ

"আমার ছাহাবীগণ (ইসলামের ও ঈমানের পথে দিশারী হওয়ায়) উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ; তাঁহাদের প্রতিজনের অনুসরণই তোমাদিগকে সত্য পর্য্যন্ত পৌঁছাইবে।"

মানসিক পরিবর্ত্তনের পরীক্ষায় আল্লাহ তায়ালা ছাহাবীগণকে কেব্‌লা-বিষয় দ্বারা একটি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। মক্কা হইতে আগত মোহাজের মোসলমানগণ ইসলাম-পূর্ব্বে নিজেদেরকে কা'বা ঘরের পুরোহিত ও সেবাইত গণ্য করিয়া নানা কুসংস্কার সৃষ্টি করিয়াছিল। যথা—তাহারা যে বহিরাগতকে বস্ত্র না দিবে সে কা'বার তওয়াফ বা প্রদক্ষিণকার্য্য উলঙ্গ হইয়া সম্পাদন করিবে, হজ্জ আদায় করিতে তাহারা আরাফার ময়দানে যাইবে না—ইত্যাদি।

কা'বা শরীফের ভক্তি ভাল জিনিষ, কিন্তু সেই ভক্তিকে কেন্দ্র করিয়া বহু অনাচারজনিত পৌরহিত্য সৃষ্টি হইয়াছিল। আর মক্কাবাসীরা এই পৌরহিত্য জিয়াইয়া রাখার স্বার্থে কা'বাগৃহের ভক্তিতে গদগদ ছিল।

মক্কাবাসী মোসলমানগণ যখন হিজরত করিয়া মদিনায় আসিলেন তখন আল্লাহ তায়ালা কা'বা শরীফের বিপরীত দিক বাইতুল-মোকাদ্দেসের দিককে কেবলা বানাইবার আদেশ করিলেন। আল্লাহ-পরীক্ষা করিতে চাহিলেন, কা'বার পুরোহিতেরা কেবলা হওয়ার সম্মান আল্লার আদেশে কা'বাকে ছাড়িয়া উহা অপেক্ষা কম মর্য্যাদার বাইতুল-মোকাদ্দাসকে দিতে সন্তুষ্ট চিত্তে রাজি হয় কি না? দীর্ঘকালের পৌরহিত্যকে আল্লার আদেশে এইভাবে ক্ষুণ্ণ করিয়া রসুলের মারফত দেওয়া আল্লার আদেশকে সর্ব্বোচ্চে স্থান দেওয়ার মানসিকতা কাহার ভিতরে কতটুকু সৃষ্টি হইয়াছে—তাহাই আল্লাহ তায়ালা এই পরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়া নিতে চাহিলেন। পবিত্র কোরআনে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই দী ১৬-১৭ মাস পর এই পরীক্ষার সমাপ্তি লগ্নে এই তথ্য বর্ণনা করিয়াছেন—

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ

"মদিনায় আসিয়া যেই কেব্‌লার উপর আপনি থাকিলেন উহার আদেশ একমাত্র এই উদ্দেশ্যে করিয়া ছিলাম যে, দেখিয়া নিব—কে রসুলের কথা মানে, কে রসুলের কথা হইতে ফিরিয়া থাকে।" (২ পাঃ ১ রুঃ)

পরীক্ষাকাল ১৬ বা ১৭ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর এই উম্মতের জন্য স্থায়ী কেবলারূপে কা'বা শরীফের দিক নির্দ্ধারিত হয় হিজরী দ্বিতীয় বৎসরে। কেবলা পরিবর্ত্তনের বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ড ৩৬ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

হিজরী দ্বিতীয় বৎসরেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ ইসলামের প্রথম মহাসমর বদরের জেহাদ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; যাহার বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে ৩৮ পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণিত হইয়াছে।

বদর জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের মাত্র এক সপ্তাহ পরেই নবী (দঃ)কে ছোট একটি অভিযানে যাইতে হয়। স্বয়ং নবীজী (দঃ) এই অভিযানের নেতৃত্ব দিয়া ছিলেন; অভিযানটি গযওয়া-বনীছোলায়ম নামে বর্ণিত।

তারপর আরও একটি অভিযান এই বৎসরই পরিচালিত হয় "গযওয়া-ছবীক"। ঘটনা এই ছিল যে, বদর-যুদ্ধে মক্কার কাফেরদের শোচনীয় পরাজয় হইল। আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা রক্ষা করা নিয়া বদর যুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছিল। অথচ আবু সুফিয়ান তাহার কাফেলাসহ নিরাপদে মক্কায় পৌঁছিল, আর মক্কার সর্দ্দাররা রণাঙ্গনে নিহত হইল। পরাজয়ের শোকাবহ সংবাদ মক্কায় পৌঁছিলে আবু সুফিয়ান প্রতিজ্ঞা করিল, সে স্ত্রীসঙ্গমও করিবে না যাবৎ না মোহাম্মদ হইতে প্রতিশোধ লয় (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)।

সেমতে আবু সুফিয়ান তুইশত লোক লইয়া গোপনে মদিনার নিকটবর্ত্তী অবতরণ করিল এবং ইহুদীদের সাহায্যে তুইজন মদিনাবাসী মোসলমানকে হত্যা করিয়া লুকাইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু সংবাদ প্রকাশ পাইয়া গেল এবং রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং তাহাকে পাকড়াও করিবার জন্য দ্রুত অভিযান চালাইলেন। আবু সুফিয়ান পূর্ব্বেই পালাইয়া যাইতে সক্ষম হইল। (বেদায়াহ, ৩—৩৪৪)

এই বৎসরই নবীজীর কন্যা রুকিয়্যা (রাঃ) ইন্তেকাল করেন যিনি ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বিবাহে ছিলেন। নবীজীর জ্যেষ্ঠা কন্যা যয়নব (রাঃ) যিনি এতদিন মক্কায়ই ছিলেন; এই বৎসরই তিনি মদিনায় পৌঁছিতে পারেন। এই বৎসরই ফাতেমা (রাঃ) আলি রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর গৃহে আসেন; বিবাহের আক্‌দ পূর্ব্বের বৎসরই হইয়াছিল। (বেদায়াহ, ৩—৩৪৬)।

হিজরী তৃতীয় বৎসর

এই বৎসরের প্রথম দিকেও ছোট তুইটি অভিযান চালাইতে হয়—গযওয়া-নজদ বা জী-আমর এবং গযওয়া-ফুরু।

ইতিমধ্যেই নবীজী (দঃ) এক নূতন বিপদের সম্মুখীন হইলেন—এতদিন বহির্শক্রর সহিত সংগ্রাম ছিল। এইবার মদিনার অভ্যন্তরে প্রকাশ্য শত্রুতা সৃষ্টি হইয়া গেল; মদিনার প্রভাবশালী ও শক্তিশালী ইহুদী সম্প্রদায় সহঅবস্থান ও শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করিয়া বিদ্রোহ করিল এবং নানাপ্রকার উস্কানীমূলক উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। ইহুদীদের শ্রেষ্ঠ ধনবতী গোত্র ছিল বনী-কাইনুকা, তাহারা স্বর্ণের ব্যবসায়ী ছিল। সর্ব্বপ্রথম এই গোত্রই বিদ্রোহ করে; নবী (দঃ) সাফল্যজনকভাবে তাহাদিগকে মদিনা হইতে বহিষ্কার করিতে সক্ষম হইলেন। তারপরেই ইহুদীদের আরও এক প্রভাবশালী গোত্র বনু-নজীর বিদ্রোহ করিল। তাহাদের বিরুদ্ধেও নবী (দঃ) সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদিগকে মদিনা হইতে বহিষ্কার করিতে সফল হইলেন। অনেকের মতে এই দ্বিতীয় বিদ্রোহ হিজরী চতুর্থ বৎসরে হইয়াছিল।

তৃতীয় খণ্ডে ছয় পৃষ্ঠা ব্যাপী এই বিদ্রোহদ্বয়ের বিবরণ বর্ণিত রহিয়াছে।

এই আভ্যন্তরিণ বিপদের ভিতর দিয়াও নবী (দঃ) বহির্শক্রর প্রধান কোরেশদেরকে শায়েস্তা করার এবং তাহাদিগকে দাবাইয়া রাখার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা—তাহাদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অবরোধ অব্যাহত রাখেন। সেই ছেলছেলায় নবীজীর পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারেছা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নেতৃত্বে ছোট একটি অভিযানের ব্যবস্থা করেন এবং তাহাতে সাফল্য লাভ হয়।

এরই মধ্যে আভ্যন্তরিণ ইহুদীদের বিদ্রোহ দমাইবার ব্যবস্থায় নবী (দঃ) অধিক সক্রিয় হইয়া উঠিলেন। ইহুদীদের ধনকুবের কা'আ'ব-ইবনে আশরাফ নামীয় ব্যক্তি বিদ্রোহ উস্কাইয়া রাখিতে অত্যধিক তৎপর ছিল এবং মোসলেম জাতির ধ্বংস কল্পে তাহার সমুদয় ধনশক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়োজিত রাখিয়াছিল। বিনা রক্তপাতে তাহাকে হত্যা করাইতে নবী (দঃ) সফল হইলেন।

এই শ্রেণীর আরও এক ইহুদী সওদাগর ছিল আবু-রাফে; ধনশক্তি এবং প্রভাব প্রতিপত্তির সহিত সদাগরী সূত্রে বৈদেশিক খ্যাতি ও পরিচয়-মিত্রতা তাহার অনেক ছিল। সেও তাহার সমুদয় শক্তি-সম্পদ ইসলামের বিরুদ্ধে নিয়োগ করিয়া রাখিয়া ছিল। রক্তপাতহীন ব্যবস্থায় তাহাকেও হত্যা করাইতে নবীজী (দঃ) সফল হইলেন।

ইতিমধ্যেই ভীষণ বিপদের কালোমেঘ মদিনার উপর মোসলমানদেরকে ঘিরিয়া ধরিল। মক্কার মোশরেকরা সর্ব্বশক্তি একত্রিত করিয়া বদর-সমরের প্রতিশোধ গ্রহণ উদ্দেশ্যে ৩০০ মাইল অগ্রসর হইয়া মদিনার শহরতলিতে পৌছিল এবং ইসলামের দ্বিতীয় মহাসমর ইতিহাস প্রসিদ্ধ ওহোদের জেহাদ অনুষ্ঠিত হইল যাহার বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে পৃষ্ঠা ব্যাপি বর্ণিত হইয়াছে।

এই বৎসরই শেষ ভাগে (কাহারও মতে হিজরতের চতুর্থ বৎসর) মক্কার অনতি দূরস্থ "রাজী" নামক এলাকায় এক মর্ম্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়াছিল (তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

এই বৎসর ওসমান রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সহিত নবী-কন্যা উম্মে-কুলছুম রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার বিবাহ হইয়াছিল। এই বৎসরই হাসান (রাঃ) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হিজরী চতুর্থ বৎসর

এই বৎসরের প্রথম দিকেই বনু-আসাদ নামীয় একটি পৌত্তলিক গোত্র মোসলমানদের বিরুদ্ধে মদিনা আক্রমনের জোগার-আয়োজন করিল। তাহাদের মধ্য হইতেই এক ব্যক্তি নবী (দঃ)কে সেই সংবাদ পৌছাইল। নবীজী মোস্তফা (দঃ) আবু-সালামা (রাঃ)কে নেতৃত্ব প্রদান করিয়া সেই গোত্রের বস্তির প্রতি একটি বাহিনী প্রেরণ করিলেন ; শত্রুরা পলায়ন করিল।

এই বৎরের প্রথম ভাগে আর একটি দুঃখজনক ঘটনায় নবীজী কর্ত্তৃক প্রেরিত অনেক জন বিশিষ্ট ছাহাবী প্রাণ হারাইয়াছিলেন। ইতিহাসে উহা বীরে-মউনার ঘটনা নামে প্রসিদ্ধ। এই বৎসরই স্বয়ং নবী (দঃ) আরও একটি অভিযানে নেতৃত্ব দান করিয়াছিলেন। অভিযানটি গযওয়া-জাতুর-রেকা' নামে প্রসিদ্ধ।

এই বৎসরই ইমাম হোসাইন (রাঃ) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বৎসরই নবী (দঃ) উম্মে-ছালামাহ (রাঃ)কে বিবাহ করিয়াছিলেন।

হিজরী পঞ্চম বৎসর

এই বৎসরের সেরা ঘটনা হইল ইসলামের বৃহত্তম মহাসমর খন্দকের জেহাদ। তৃতীয় খণ্ডে সুদীর্ঘ আট পৃষ্ঠা ব্যাপী উহার ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত মহাসমর সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই মদিনার সর্ব্বশেষ ইহুদী গোত্র নজীরহীন বিশ্বাসঘাতক বনু-কোরায়জাকে নিশ্চিহ্ন করার অভিযান পরিচালিত হয়। উহার বিবরণও তৃতীয় খণ্ডে দীর্ঘ আট পৃষ্ঠা ব্যাপী বর্ণিত হইয়াছে।

অনেকের মতে এই বৎসরই নবী (দঃ) মক্কার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্দার আবু সুফিয়ান তনয়া উম্মে-হাবিবা (রাঃ)কে বিবাহ করেন। আবু সুফিয়ান তখন মোসলমান হইয়াছিলেন না, কিন্তু উম্মে-হাবিবা মোসলমান ছিলেন এবং নিজ স্বামীর সহিত হিজরত করিয়া আবিসিনিয়ায় চলিয়া গিয়াছিলেন। তথায় তিনি বিধবা হইয়া পড়েন ; তিনি আবিসিনিয়ায় থাকাবস্থায়ই নবী (দঃ) তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন এবং সেই দেশের বাদশার ব্যবস্থাপনায় বিবাহ সম্পন্ন হইল। এমনকি বাদশাহ নিজেই তাঁহার মহরানা চার হাজার দেরহাম আদায় করিয়া দিলেন। বিবাহ সম্পাদনেও বাদশাহই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ওকীল ছিলেন। বিবাহ সম্পাদন পরে তাঁহাকে শোরাহ্‌বীল ইবনে হাসানাহ (রাঃ) ছাহাবীর তত্ত্বাবধানে মদিনায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। (বেদায়াহ, ৩—১৪৩)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত এই বিবাহের ইঙ্গিত বহন করিয়া নিয়া আসিয়াছিল। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً

"অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের এবং তোমাদের শত্রুদের মধ্যে ভালবাসার একটি সূত্র সৃষ্টি করিয়া দিবেন।"

মোসলমানদের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন নবীজী মোস্তফা (দঃ), আর মোসলমানদের তৎকালীন প্রধান শত্রু পক্ষ মক্কার কোরেশদের সর্দার ও সমাজপতি ছিলেন আবু সুফিয়ান। নবীজী (দঃ) এবং আবু সুফিয়ানের মধ্যে এই বিবাহ সূত্রে শ্বশুর-জামাতার সম্পর্ক সৃষ্টি হইয়া গেল। আবু সুফিয়ানের কন্যা মোসলমান জাতির মাতা হইয়া গেলেন। (বেদায়াহ, ৩—১৪৩)

এই বৎসরই নবী (দঃ) যয়নব (রাঃ)কে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহ শুধু আল্লাহর আদেশেই হয় নাই, বরং স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই জিব্রায়ীল (আঃ) ফেরেশতার মাধ্যমে এই বিবাহ সম্পাদনকারী ছিলেন বলিয়া পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। পবিত্র কোরআনের আয়াত—فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا

"যায়েদ যখন যয়নব হইতে নির্লিপ্ত হইয়া গেল তখন আমি তাহাকে আপনার বিবাহে দিয়া দিলাম।" এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়াই বিবাহের সম্পাদন ছিল।

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যয়নব (রাঃ) (যায়েদ ইবনে হারেছা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর স্ত্রী ছিলেন ; তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিবার পর তিনি) যখন ইদ্দৎ পূর্ণ করিয়া নিলেন তখন নবী (দঃ) ঐ যায়েদ (রাঃ)কেই বলিলেন, তুমি যাইয়া যয়নবকে আমার বিবাহের প্রস্তাব জানাও। সেমতে যায়েদ (রাঃ) যয়নবের নিকটে আসিলেন ; তখন যয়নব (রাঃ) রুটি পাকাইবার জন্য আটা তৈরী করিতে ছিলেন। (ঐ সময় পর্দ্দার মছআলাহ ছিল না।)

(যয়নব (রাঃ) যায়েদেরই দীর্ঘ দিনের স্ত্রী ছিলেন ; তবুও যায়েদ (রাঃ) বলেন—) আমার অন্তরে যয়নবের সম্মান ও শ্রদ্ধার এত বড় প্রভাব উপস্থিত হইল যে, আমি তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সক্ষম হইলাম না—এই কারণে যে, নবী (দঃ) তাঁহাকে বিবাহে গ্রহণ করার আলোচনা করিয়াছেন। সেমতে আমি তাঁহার প্রতি পৃষ্ঠ দানে বিপরীত দিকে মুখ করিয়া বলিলাম, আপনি মহাসুসংবাদ গ্রহণ করুন। রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে আপনার নিকট বিবাহের প্রস্তাব দিয়া পাঠাইয়াছেন।

যয়নব (রাঃ) বলিলেন, আমি আমার মহান প্রভু-পরওয়ারদেগারের পরামর্শ গ্রহণ ব্যতিরেকে কিছু করিব না। এই বলিয়া তিনি তাঁহার নামায-কক্ষে যাইয়া

দাঁড়াইলেন। ইতিমধ্যেই পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযেল হইয়া গিয়াছে। যাহাতে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—"যায়েদ যখন যয়নব হইতে নির্লিপ্ত হইয়া গেল তখন আমি যয়নবকে আপনার বিবাহে দিয়া দিলাম।" এই আয়াত অবতীর্ণ হইলে পর রসুলুল্লাহ (দঃ) যয়নবের কক্ষে অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকেই তশরীফ নিয়া গেলেন। অতঃপর বিবাহের ওলিমা খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়া লোকজনকে দাওয়াত করিলেন (মোসলেম শরীফ)। বেদায়াহ, ৩—১৪৬

বোখারী শরীফেরই এক হাদীছে বর্ণিত আছে—যয়নব (রাঃ) নবীজীর সকল স্ত্রীগণের উপর গর্ব্ব করিয়া বলিতেন, আপনাদের বিবাহ পরিচালন ও সম্পাদন করিয়াছেন আপনাদের আত্মীয়গণ। পক্ষান্তরে আমার বিবাহ পরিচালন ও সম্পাদন করিয়াছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা সপ্ত আকাশের উপরে।

এই বিবাহের ওলিমা লগ্নেই পর্দ্দা ফরজ হওয়ার আদেশ পবিত্র কোরআনে অবতীর্ণ হইয়া ছিল।

হিজরী ষষ্ঠ বৎসর

এই বৎসরের উল্লেখযোগ্য প্রথম ঘটনা জী-কারাদের অভিযান। এই অভিযানের সূচনায় অতি মজার একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহার বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে রহিয়াছে, ১৫০৭ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।

আর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা গযওয়া-বনী মেস্তালেক বা মোরায়সী-অভিযান। এই জেহাদটির তারিখ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রাঃ) তুইটি অভিমত উল্লেখ করিয়াছেন—হিজরী চতুর্থ বৎসরে এবং হিজরী ষষ্ঠ বৎসরে এবং ষষ্ঠ বৎসয়ের অভিমতকেই প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন।

"খোযাআ" গোত্রের একটি শাখা-বংশ বনী-মেস্তালেক; "মোরায়সী" নামক একটি ঝর্ণার নিকটে খোযাআ গোত্রের বস্তি ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই মর্ম্মে সংবাদ পাইলেন যে, বনী-মেস্তালেকদের সর্দার হারেস লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র যোগার করিতেছে মোসলমানদের বিরুদ্ধে মদিনা আক্রমণ করার জন্য। নবী (দঃ) একজন ছাহাবীকে তথায় প্রেরণ করিয়া সংবাদটির বাস্তবতা তদন্ত করাইলেন। সংবাদটি সত্য প্রমাণিত হইল; তাই নবী (দঃ) উহার প্রতিকারে দ্রুত অগ্রসর হইলেন। মোসলমানদের প্রথম আক্রমণেই শত্রুদল পরাজিত হইল; অনেকে পালাইয়া গেল এবং বহু সংখ্যক বন্দী হইল।

বন্দীদের মধ্যে বংশপতি হারেসের তুহিতা "জোয়ায়রিয়া"ও ছিল। জোয়ায়রিয়া নবীজীর শরণাপন্ন হইয়া ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করিলেন এবং নিজের পরিচয়ও দিলেন যে, আমি বংশের সর্দার হারেসের কন্যা। তাঁহার অবস্থা দৃষ্টে

নবীজীর মহানুভব অন্তর দয়ায় উতলিয়া উঠিল। নবীজী (দঃ) তাঁহাকে চির-গৌরবের আশ্রয় দানে চরমভাগ্যবতি বানাইয়া দিলেন যে, তাঁহাকে নিজ দাম্পত্যে স্থান দান করিয়া বিশ্ব মোসলেমের জননী বানাইয়া দিলেন।

এই জেহাদে মোস্তালেক বংশের অনেক নরনারী বালক-বালিকা বন্দী হইয়া আসিয়াছিল। অবিলম্বে মদিনায় এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল যে, নবীজী (দঃ) এক মহাউদারতার নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। নবীজী (দঃ) বিজিত বনী-মোস্তালেক বংশের সর্দার হারেসের বন্দীনী দুহিতার পানিগ্রহণে তাহাকে ধন্য করিয়াছেন। তখন মোসলমানগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, বনী-মোস্তালেক বংশের লোকগণ এখন হযরতের শ্বশুরকুল, সুতরাং ইহাদিগকে আর দাস দাসী-রূপে রাখা সঙ্গত হইতেছে না। নবীজীর সহধর্মিনী মাত্রই মোসলমানদের মাতা, অতএব জননী জোয়ায়রিয়ার বংশের সমস্ত লোকই এখন মোসলমানদের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন। মদিনার মোসলমানগণ কালবিলম্ব না করিয়া বনী-মোস্তালেকের সমস্ত বন্দী দাস-দাসীদেরকে মুক্তি দিয়া দিলেন।

এই অভিযানটি কতিপয় ঘটনার দরুন স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। হাদীছ-তফছীরে, এবং ইতিহাসে ঐ সব ঘটনার আলোচনায় এই অভিযানের উল্লেখ আসিয়া থাকে।

প্রথম ঘটনা :—মদিনার অধিবাসীদের একটি শ্রেণী ছিল মোনাফেক—কপট মোসলমান। বস্তুতঃ তাহারা ইসলাম ও মোসলমানদের পরম শত্রু, কিন্তু আতঙ্ক বা স্বার্থ-লোভ কিম্বা ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যে মুখে ইসলাম প্রকাশ করে এবং মোসলমানদের দলে মিশিয়া থাকে।

আলোচ্য অভিযানে ঐ শ্রেণীর শয়তানদের বড় সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যোগদান করিয়াছিল। মোসলমানদের সুদৃঢ় ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করা, মোহাজের ও আনছারগণের মধ্যে বিবাদ বাঁধাইয়া দেওয়া ইত্যাদি শত্রুতামূলক কার্য্যের সুযোগ সন্ধানে তাহারা সদা তৎপর থাকিত। ঐ অভিযান ছফরে একদা পানি সংগ্রহ করিতে ভিড় হয় এবং একজন মোহাজের ও একজন আনছারের মধ্যে বিবাদ হয়; সেই সুযোগে মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ঝগড়ার উস্কানী মূলক এবং উত্তেজনা মূলক কথাবার্ত্তা ছড়াইতে লাগিল তাহার সম্মুখে তাহার দলের কতিপয় লোক সমবেত ছিল, তাহাদের মধ্যে এক যুবক যায়েদ-ইবনে-আরকাম (রাঃ) খাঁটী মোসলমানও উপস্থিত ছিলেন। তাহাদের সম্মুখে মোনাফেক আবদুল্লাহ মোহাজেরগণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিল, তাহারা আমাদের দেশে আসিয়া আমাদের উপর প্রাধান্য দেখায়, আমাদের উপব প্রাবল্য দেখায়। তাহাদের ও আমাদের অবস্থা ঐ প্রবাদের

ন্যায়ই—“কুকুরকে মোটা-তাজা বানাও যেন সে তোমাকে খায়।” এই বিদেশীদেরে তোমরা এক দানা দ্বারাও সাহায্য করিও না; বাধ্য হইয়া তাহারা এদিক সেদিক চলিয়া যাইবে। এইবার মদিনায় যাইয়া দেশবাসী শক্তিশালীরা বিদেশী দুর্ব্বলদেরে নিশ্চয় বাহির করিয়া দিবে। ইত্যাদি ইত্যাদি অবাঞ্ছিত কথাবার্ত্তা বলিল এবং লোকদিগকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করিল।

তাহার এই সব কথাবার্ত্তা খাঁটী মোসলমান যুবক যায়েদ-ইবনে-আরকাম (রাঃ) শুনিলেন এবং এই সব কথা নবীজীর গোচরে আনিলেন। নবীজীর নিকটে ওমর (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন, তিনি মোনাফেক আবদুল্লাহকে হত্যা করার মত প্রকাশ করিলেন। নবী (দঃ) ওমরকে বলিলেন, তাহাকে হত্যা করিলে লোকেরা বলিবে, মোহাম্মদ তাঁহার দলের লোকদেরকে হত্যা করেন; (আবদুল্লাহ ত প্রকাশ্যে মোসলমান দলভুক্ত ছিল।)

মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ এই সংবাদ অবগত হইল যে, তাহার কথাবার্ত্তা নবীজীর গোচরে আসিয়াছে। তখন সে নবীজীর নিকট আসিয়া কসম করিয়া ঐ সব কথা অস্বীকার করিল এবং বলিল, সে ঐরূপ কথা মুখেও আনে নাই। উপস্থিত কেহ কেহ নবীজী (দঃ)কে প্রবোধ দিল যে, যায়েদ-ইবনে-আরকাম যুবক ছেলে; হয়ত সে বুঝিতে ভুল করিয়াছে। মোনাফেক আবদুল্লাহ অভিজাত শ্রেণীর লোক ছিল।

মোনাফেক সর্দার আবদুল্লার এই জঘন্য ভূমিকা ও এই জঘন্য কথাবার্ত্তার বর্ণনায় পবিত্র কোরআনে ২৮ পাঃ “ছুরা মোনাফেকুন” নামের ছুরাটি নাযেল হইল। ঐ ছুরায় পরিষ্কার ভাষায় পূর্ণ ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

মোনাফেকরা আপনার সম্মুখে আসিলে বলে, আমরা মনে-প্রাণে সাক্ষ্য দেই—নিশ্চয় আপনি আল্লার রসুল। আল্লাহ ত জানেনই, আপনি আল্লার রসুল। আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন—মোনাফেকরা নিশ্চয় মিথ্যাবাদী; (তাহারা অন্তরে কখনও আপনাকে আল্লার রসুল মান্য করে না।) তাহারা মিথ্যা কসমের আড়ালে নিজেদেরকে রক্ষা করিয়া লোকদেরকে আল্লার দ্বীন হইতে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পায়। তাহাদের কার্য্যকলাপ নিতান্তই জঘন্য। তাহারা মুখে ঈমান প্রকাশ করার পর সেই মুখেই আবার কুফুরী কথা বলে, ফলে তাহাদের অন্তরে মোহর লাগিয়া গিয়াছে; তাহারা ঈমান গ্রহণ করিবে না। তাহাদের বাহ্যিক আকৃতি আপনাকেও আকৃষ্ট করে, তাহাদের মিষ্ট কথা আপনারও ভাল লাগে। (কিন্তু তাহাদের এই আকৃতি ও কথার মূলে কোন শক্তি নাই;) তাহাদের অবস্থা ঐ থামগুলির ন্যায় যেইগুলি মাটিতে প্রোথিত নয়—শুধু হেলান দেওয়া দাঁড় করিয়া রাখা হইয়াছে। (ঐগুলি যতই মোটা-মজবুৎ হউক, কিন্তু প্রোথিত না হওয়ায় কোন শক্তি নাই; মোনাফেকদের ভাল আকৃতি ও মিষ্ট কথার অবস্থাও তদ্রূপই। যেহেতু তাহারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তাই) তাহারা সর্ব্বদা আতঙ্কগ্রস্ত থাকে। তাহারা নিছক

শত্রু ; তাহাদের হইতে সদা সতর্ক থাকিবে। আল্লাহ তাহাদেরে ধ্বংস করুন ; তাহারা কিভাবে উল্টাপথে চলে।

এই ভূমিকা বর্ণনার পর আলোচ্য ঘটনায় আবদুল্লার বিষাক্ত উক্তিগুলিও আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন—যাহা যায়েদ-ইবনে-আরকাম (রাঃ) ব্যক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু আবদুল্লাহ কসম খাইয়া অস্বীকার করিয়াছিল।

উক্ত ছুরা নাযেল হইলে পর রসুলুল্লাহ (দঃ) যায়েদ (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার সত্যতার সাক্ষ্য দিয়াছেন।

এখন আবদুল্লার ভূমিকা পরিষ্কার হইয়া গেল। তাহার এক ছেলে ছিলেন খাঁটী মোসলমান, তাঁহার নামও আবদুল্লাহই ছিল। তিনি নবীজীর নিকট আসিয়া আরজ করিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! এইরূপ শুনা যায় যে, আপনি মোনাফেক আবদুল্লাহকে হত্যা করার চিন্তা করিতেছেন ; যদি তাহাই হয় তবে আমি তাহার মুণ্ডু কাটিয়া আপনার নিকট উপস্থিত করি। অন্য কেহ তাহা করিলে হয় ত মানবীয় স্বভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া আমি জাহান্নামী হইতে পারি। রসুলুল্লাহ (দঃ) পুত্র আবদুল্লাকে বলিলেন, যত দিন সে আমাদের জমাতে মিশিয়া আছে আমি তাহাকে হত্যা করিতে চাই না।

দ্বিতীয় ঘটনা—ঐ মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ-ইবনে-উবাই এই অভিযানের ছফরে আর একটি ঘটনা এমন ঘটাইল যাহা তাহার জীবনের সমস্ত অপকর্ম্মকে ছাড়াইয়া গেল।

এই ভ্রমনে নবীজীর সহিত মোসলেম-জননী আয়েশা (রাঃ)ও ছিলেন। খবিশ মোনাফেক আবদুল্লাহ জঘন্য ষড়যন্ত্ররূপে জাতির জননী আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নামে মিথ্যা অপবাদ গড়াইয়া লোকদের মধ্যে উহার চর্চ্চা করিল। ইহাতে এক মহাবিভ্রাটের সৃষ্টি হইল। অবশেষে পবিত্র কোরআনের সুদীর্ঘ বয়ান অবতীর্ণ হইয়া মা আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার পবিত্রতা প্রমাণ করিল।

এই ঘটনার সুদীর্ঘ বর্ণনা বোখারী শরীফের হাদীছে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইনশা আল্লাহ তায়ালা ষষ্ঠ খণ্ডে আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ফজিলত পরিচ্ছেদে উহার অনুবাদ ও বিস্তারিত আলোচনা হইবে।

বক্ষমান বৎসরের সর্ব্বশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল "হোদায়বিয়ার সন্ধি"। এই সন্ধির ফলেই মোসলেম জাতি সর্ব্বপ্রথম নিজস্ব সত্তার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করে। এবং ইসলামের জন্য অগ্রাভিযানের সুযোগ লাভ হয়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে "হোদায়বিয়ার জেহাদ" শিরনামায় ৩৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী বর্ণিত রহিয়াছে।

হিজরী সপ্তম বৎসর

নবী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কর্ম্ম তৎপরতা কত ক্ষিপ্র গতির ছিল। হিজরী ষষ্ঠ বৎসরের সর্ব্বশেষ মাস জিলহজ্জ মাসে হোদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদন করিয়া নবীজী (দঃ) মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সন্ধির দরুন মক্কাবাসীদের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে অবকাশ পাইয়াছেন। এই অবকাশে কালবিলম্ব না করিয়া বিশ্ব ব্যাপী ইসলামের আহ্বান ছড়াইয়া দেওয়ার এক আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করিলেন। বিশ্বের বড় বড় এবং গুরুত্বপুর্ণ রাজন্যবর্গের প্রতি, বিভিন্ন গোত্রীয় সমাজপতি এবং বড় বড় ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি ভিন্ন ভিন্ন দূত মারফত ইসলামের আহ্বানে সিলমোহরকৃত লিপি প্রেরণের ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন।

একদা নবী (দঃ) ছাহাবীগণকে বলিলেন, আগামীকল্য সকাল বেলা তোমরা সব আমার সহিত একত্রিত হইবে। সেমতে পরবর্ত্তী দিন ফজরের নামাযে সকলে বিশেষ ভাবে উপস্থিত হইলেন। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিয়ম ছিল—তিনি ফজর নামাজান্তে কিছু সময় তছবীহ পড়া ও দোয়া করায় মগ্ন থাকিতেন। আজ সেই নিয়ম পালন পরে উপস্থিত ছাহাবীবর্গের প্রতি ফিরিয়া মিম্বার পরে দাঁড়াইলেন এবং ভাষণ দানে আল্লাহ তায়ালার গুণগান ও প্রশংসা করিয়া সকলকে সম্বোধন পুর্ব্বক বলিলেন, আমি তোমাদের কোন কোন ব্যক্তিকে বহির্বিশ্বের রাজ-রাজাদের প্রতি প্রেরণ করার ইচ্ছা করিতেছি। তোমরা আমার কথার ব্যতিক্রম করিবে না। আল্লার বন্দাদের কল্যাণ ও মঙ্গল কামনায় আল্লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইবে। জনগণের কোন দায়িত্ব কাহারও উপর ন্যাস্ত করা হইলে যদি সে তাহাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের চেষ্টা না করে তবে আল্লাহ তাহার জন্য বেহেশত হারাম করিয়া দিবেন।

তোমরা নিজ নিজ কর্ত্তব্যে যাইবে এবং ঐরূপ করিবে না যেরূপ করিয়াছিল ঈসা আলাইহেচ্ছালামের প্রেরিত দূত বনী ইস্রায়ীলগণ। তাহারা নবীর কথার ব্যতিক্রম করিয়াছিল ; নিকটবর্ত্তী স্থানে পৌছিয়াছিল, কিন্তু দূরবর্ত্তী স্থানে যায় নাই।

ছাহাবীগণ প্রতিজ্ঞা করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমাদিগকে যে কোন আদেশ করেন, যে কোন দেশে প্রেরণ করন—আমরা আপনার কথার ব্যতিক্রম কখনও করিব না। তখন নবী (দঃ) এক একজনকে এক একজনের নিকট প্রেরণের জন্য নির্দ্ধারিত করিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ গন্তব্য দেশের ভাষাও শিক্ষা করিয়া নিলেন। (তবকাত, ১—২৭৪, বেদায়াহ, ৩—২৬৮)

সেমতে ঐ জিলহজ্জ মাসের পরবর্ত্তী সপ্তম বৎসরের প্রথম মাস মহররমেই নবীজী (দঃ) তৎকালীন বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গ ছয়জন সম্রাটের প্রতি লিপি লিখিলেন

এবং ছয়জন দূত একই দিনে প্রেরণ করিয়া এই ব্যবস্থার উদ্বোধন করিলেন।

১। সর্ব্বপ্রথম দূত আম্‌র-ইবনে-উমাইয়্যা (রাঃ); তাঁহাকে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্যে নবীজী (দঃ) দুইখানা পত্র লিখিয়াছিলেন—একখানা পত্রে ইসলামের আহ্বান এবং পবিত্র কোরআনের কতিপয় আয়াত লিখিয়া ছিলেন। বাদশাহ এই লিপিখানা হস্তে ধারণ পূর্ব্বক উহাকে শ্রদ্ধার সহিত উভয় চোখে স্পর্শ করিলেন এবং সিংহাসন হইতে নামিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। অতঃপর কলেমা-শাহাদৎ পাঠে ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং আক্ষেপের সহিত বলিলেন, সক্ষম হইলে অবশ্যই আমি নবীজী সমীপে উপস্থিত হইতাম।

অপর পত্রে লিখিয়াছিলেন, মক্কা হইতে যাঁহারা হিজরত করিয়া আবিসিনিয়ায় আশ্রয় নিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে বাহনের ব্যবস্থা করিয়া পাঠাইয়া দেওয়ার জন্যে। এই পত্রের আদেশও তিনি উত্তমরূপে পালন করিয়াছিলেন। দুইটি নৌকা যোগে তিনি তথাকার প্রবাসী ৮০ জন নারীপুরুষ মোসলমানকে মদিনায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। দলপতি জাফর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হস্তে নবীজী সমীপে লিপির উত্তরও পাঠাইয়াছিলেন—উহাতে নিজের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ লিখিয়াছিলেন। (ঐ ২৫৯)

২। তৎকালীন সর্ব্ববৃহৎ শক্তি রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট লিপি পাঠাইয়াছিলেন দেহ্‌য়্যা কল্‌বী (রাঃ) মারফৎ। এই লিপির বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ড ৬ নং হাদীছে রহিয়াছে।

৩। তৎকালীন দুই বৃহৎ শক্তির দ্বিতীয় পারস্য সম্রাটের নিকট লিপি পাঠাইয়াছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফা (রাঃ) মারফৎ। লিপির মর্ম্ম এই ছিল—

بسم الله الرحمن الرحيم - من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وامن بالله ورسوله واشهد ان لا اله الا الله وانى رسول الله الى الناس كافة لينذر من كان حيا اسلم تسلم فان ابيت فعليك اثم المجوس

বিসমিল্লাহের-রহমানের-রহীম—

আল্লার রসুল মোহাম্মদের তরফ হইতে পারস্য-প্রধান কেছরার নিকট—সালাম তাহাকে যে সত্যের অনুসরণ করে, আল্লাহ এবং আল্লার রসুলকে বিশ্বাস করে। আমি সাক্ষ্য দেই, আল্লাহ ভিন্ন কোন উপাস্য নাই এবং আমি আল্লার রসুল সমগ্র বিশ্ব-মানবের প্রতি—সকল জীবন্তদিগকে সতর্ক করার জন্য। ইসলাম গ্রহণ করুন; শান্তিতে থাকিবেন, যদি আপনি ইসলামকে অস্বীকার করেন তবে

আপনার প্রজা সমস্ত অগ্নিপূজকরাই অস্বীকার করিবে, ফলে সকলের পাপের জন্ত আপনি দায়ী হইবেন। (সীরাতুন-নবী)

মহাপ্রতাপশালী পারস্য-সম্রাট—যাহাকে তাহার প্রজা ও অধীনস্থগণ পূজনীয় প্রভু গণ্য করিত এবং সকলেই তাহার সম্মুখে অবনত মস্তকে সেজদা করিয়া থাকিত; তাহার নিকট কেহ কোন লিপি পেশ করিলে উহাতে সর্ব্বপ্রথম সকলের উপরে তাহার নাম লেখা অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। তাহার নামের পূর্ব্বে কোন কিছু লেখা মহাঅপরাধ গণ্য করা হইত। সেমতে এই লিপিতে যখনই সে দেখিল, তাহার নামের উপরে প্রথম আল্লার নাম তারপর আবার মোহাম্মদ নাম। তখনই সে ক্রোধে বেশামাল হইয়া পড়িল এবং লিপিখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

নবীজীর দূত আবতুল্লাহ (রাঃ) মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নবী (দঃ)কে তাঁহার লিপি ছিঁড়িয়া ফেলার সংবাদ পৌঁছাইতেই নবী (দঃ) আল্লার হুজুরে নিবেদন করিলেন, ان يمزقوا كل ممزق "আয় আল্লাহ। তাহারাও যেন টুকরা টুকরা হইয়া যায় যেরূপ আমার লিপিকে টুকরা টুকরা করিয়াছে।" বিস্তারিত বিবরণ প্রথম খণ্ড ৫৭নং হাদীছে দ্রষ্টব্য।

ক্রোধে আত্মহারা সম্রাট ইতিমধ্যেই তাহার অধীনস্থ ইয়ামান প্রদেশের শাসনকর্ত্তা "বাযান"কে ফরমান পাঠাইল—অবিলম্বে আরবে নবুয়তের দাবীদার মোহাম্মদকে গ্রেফতার করিয়া আমার দরবারে হাজির কর। আদেশ পাওয়া মাত্র বাযান গ্রেফতারী পরওয়ানা সহ তুইজন রাজ-কর্ম্মচারীকে মদিনায় পাঠাইয়া দিল। তাহারা মদিনায় পৌঁছিয়া নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল এবং বাযানের গ্রেফতারী পরওয়ানার লিপি অর্পণ করিল।

রসুলুল্লাহ (দঃ) লিপির মর্ম্মে মুস্কি হাসি হাসিলেন এবং আগন্তুকদ্বয়কে ইসলামের আহ্বান জানাইলেন। নবীজী (দঃ) যখন কথা বলিতেছিলেন তখন তাহাদের বুক থর থর কাঁপিতেছিল। নবীজী (দঃ) তাহাদেরকে বলিলেন, আমার বক্তব্য আমি আগামীকল্য বলিব।

দ্বিতীয় দিন তাহারা নবীজী সমীপে উপস্থিত হইলে নবীজী (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা দেশে ফিরিয়া যাও এবং তোমাদের প্রেরক বাযানকে সংবাদ দাও যে, আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার আল্লাহ তাহার প্রভু সম্রাটকে গত রাত্রে রাত্রির সাত ঘণ্টা অতিক্রান্তের পর মারিয়া ফেলিয়াছেন। সম্রাটের পুত্রকেই আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি লেলাইয়া দিয়াছেন; পুত্র তাহার পিতা সম্রাটকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা চলিত জমাদাল-উলা মাসের দশ তারিখ মঙ্গলবার রাত্রের ঘটনা। তাহারা উভয়ে ইয়ামনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বাযানকে ঐ সংবাদ পৌঁছাইতেই বাযান এবং ইয়ামনে উপস্থিত তাঁহার সমুদয় পরিবারবর্গ ইসলাম গ্রহণ করিলেন। (তবকাতে ইবনে-সায়াদ, ১—২৬০)

৪। মিশরীয় ক্বিব্‌তী জাতির খৃষ্টান শাসনকর্ত্তা মোকাওকাসের নিকট লিপি পাঠাইয়াছিলেন হাতেব-ইবনে-আবুবলতায়া (রাঃ) মারফৎ। সে নবীজীর দূতকে সম্মান করিয়াছে, যথাসত্বর সাক্ষাৎ দান করিয়াছে, নবীজীর লিপিকে অতিশয় সম্মান করিয়াছে; উহাকে একটি হস্তি-দাঁতের কৌটায় হেফাজতের সহিত সংরক্ষণ করিয়াছে। নবীজীর জন্য মূল্যবান হাদিয়া—উপঢৌকনও পাঠাইয়াছিল; সেই উপঢৌকনের মধ্যেই ছিল অতিশয় দুষ্প্রাপ্য শ্বেতবর্ণের অশ্বতরী "দুল্‌দুল"।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনে মোকাওকাস কোন ত্রুটি করে নাই। সে শ্রদ্ধার সহিত নবীজীর লিপির উত্তরও দিয়াছে। উত্তরে সে প্রকাশ করিয়াছে—আমি জানিতাম, একজন নবীর আবির্ভাব বাকি রহিয়াছে; আমার ধারণা ছিল, তাঁহার আবির্ভাব সিরিয়া হইতে হইবে।

মোকাওকাস ইসলাম গ্রহণ করে নাই। নবী (দঃ) নিজ উদারতা ও আন্তর্জাতিক রীতি অনুসারে তাহার উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া ছিলেন, কিন্তু নবীজী অসন্তুষ্টির সহিত বলিয়াছেন, রাজত্বের লালসা তাহাকে ইসলাম হইতে বঞ্চিত রাখিল, অথচ তাহার রাজত্বের স্থায়িত্ব নাই। (তবকাতে ইবনে সায়াদ, ১—২৬০)

মোকাওকাস খৃষ্টান ছিল, কিন্তু সে নবীজীর লিপিখানা সুরক্ষিতরূপে রাখিয়াছিল। দীর্ঘকাল উহা তাহার রাজভাণ্ডারে সযত্নে সুরক্ষিত ছিল, এমনকি এই যুগেও উহা মোসলমানদের হস্তগত হইয়া মূল কপির ফটো ব্লক প্রকাশিত হইয়াছে। বরকতের জন্য আমরা উহার ফটো ব্লক ছাপাইয়া দিলাম।

১৮৪০ ইং মোতাবেক ১২৬০ হিজরীর দিকে তুরস্কের শাসনকর্ত্তা ছিলেন সুলতান আবদুল মজিদ খান। তখন মক্কা-মদিনা সহ হেজায এলাকা তুরস্কের শাসনেই ছিল। বর্ত্তমান মসজিদে-নববীর সম্মুখ ভাগ নবীজীর রওজা পাকের সবুজ গুম্বুজ সহ সুলতান আবদুল মজিদ খানেরই নির্ম্মিত। সেই সুলতান আবদুল মজিদ খানের আমলের ঘটনা—

ফ্রান্সের একজন পর্য্যটক মিশরস্থ ক্বিব্‌তিয়া শহরে পৌছিলেন। তথায় খৃষ্টানদের বড় একটি গির্জ্জা ছিল; উক্ত গির্জ্জার প্রধান যাজক পাদ্রীর নিকট ঐ লিপি মোবারক সুরক্ষিত ছিল। পর্য্যটক উহার খোঁজ পাইয়া পাদ্রী হইতে উহা ক্রয় করিয়া আনেন এবং সুলতান আবদুল মজিদ খান সমীপে মহাউপহার রূপে উপস্থিত করেন।

তুরস্কের রাজভাণ্ডারে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কতিপয় বরকতপূর্ণ স্মৃতিচিহ্ন-বস্তু সুরক্ষিত আছে। সুলতান আবদুল মজিদ খান (রঃ) এই মহামূল্যবান লিপি মোবারককেও উহাতে শামিল করিয়া রাখেন। কোন মহামতি ব্যক্তির সৌজন্যে সেই মহামোবারক লিপির ফটো ব্লক প্রকাশিত হয়।

কালের আবর্ত্তনে লিপির কোন কোন অক্ষর বিলুপ্ত হইয়াছে মনে হয় এবং লিপির গায়ে দাগ ও রেখা সৃষ্টি হইয়াছে। চেষ্টা করিলে উক্ত দাগ ও রেখামুক্ত ফটো ব্লক

তৈরী করা সম্ভব হইত, কেহ কেহ সেইরূপ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা মূল বস্তুর অবিকল ছাপ গণ্য হয় না। তাই আমরা সেই চেষ্টায় অগ্রসর হই নাই।

ঢাকা লালবাগের ইতিহাস প্রসিদ্ধ দূর্গে তথা কিল্লার ভিতরে শাহী আমলের যে মসজিদ আছে সেই মসজিদ হইতে এই মহাসওগাত লাভ করা হইয়াছে।
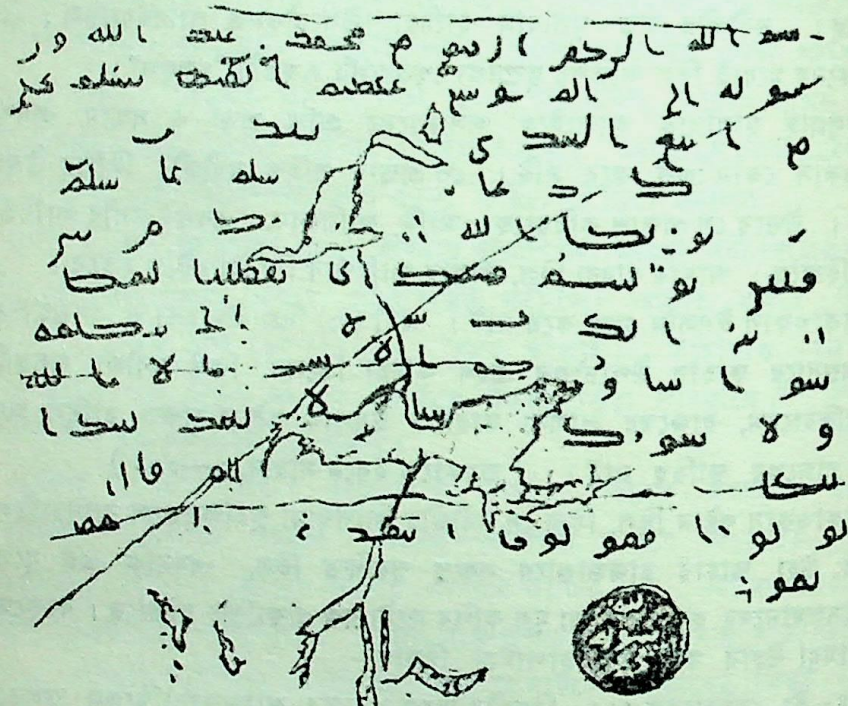
বর্ত্তমান আরবী বর্ণমালায় লিপিখানার বিষয়বস্তু এই—

بسم الله الرحمن الرحيم - مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ اِلَى الْمُقَوْقِسِ

عَظِيمِ الْقِبْطِ - سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّى اَدْعُوكَ

بِدِعَايَةِ الْاِسْلَامِ اَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَاِنْ تَوَلَّيْتَ

فَعَلَيْكَ مَا يُفْجِعُ الْقِبْطَ - يَآاَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا

وَبَيْنَكُمْ اَنْ لَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا

اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ - فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ -

বিছ্‌মিল্লাহের-রহমানের-রহীম—

আল্লার বন্দা এবং তাঁহার রসুল মোহাম্মদের পক্ষ হইতে কিব্‌তী-প্রধান মোকাওকাসের নিকট; সত্যের যে অনুসরণ করে তাহার প্রতি সালাম। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের আহ্বান জানাইতেছি। ইস্‌লাম গ্রহণ করুন শান্তিতে থাকিতে পারিবেন; আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দিবেন। ইসলাম হইতে আপনি ফিরিয়া থাকিলে কিব্‌তী জাতির উপর যে বিপদ আসিবে উহার জন্য আপনি দায়ী হইবেন।

হে কেতাবধারীগণ! তোমাদের ও আমাদের মধ্যে ঐক্যমতের কথাটি বাস্তবায়িত করার প্রতি আসিয়া যাও—যে, আমরা আল্লাহ ভিন্ন কাহারও উপাসনা করিব না, তাঁহার সহিত কোন বস্তুকে শরীক সাব্যস্ত করিব না এবং আমরা আল্লাহ ছাড়া একে অন্যকে প্রভুর মর্য্যাদা দিব না। যদি তোমরা এই একত্ববাদকে বাস্তবায়িত করা হইতে ফিরিয়া থাক তবে তোমরা সাক্ষী থাকিও—আমরা ঐ এক আল্লাহ সমীপে পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী।

৫। রোমের আশ্রিত রাজ্য সিরিয়ার শাসনকর্তা মোনজের ইবনে হারেস গাচ্ছানীর নিকটও নবী (দঃ) লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন শুজা-ইবনে-ওহ্‌ব (রাঃ) ছাহাবী মারফৎ (বেদায়াহ, ৩—২৬৮)। প্রথম খণ্ড ৬নং হাদীছে বর্ণিত ঘটনায় রোম-সম্রাট হেরাক্লিয়াসের সিরিয়াস্থ ইলিয়া শহরে আগমনের যে উল্লেখ রহিয়াছে—সেই আগমন উপলক্ষে রোম-সম্রাটের অতিথেয়তার ব্যবস্থাপনায় তখন মোনজের ইবনে হারেস অত্যধিক ব্যতিব্যস্ত ছিল।

লিপিবাহক শুজা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি শাসনকর্তা হারেসের সাক্ষাতের জন্য পৌঁছিলাম এবং ২৩ দিন অপেক্ষারত থাকিলাম। তাহার এক গৃহরক্ষী ছিল রোমান বংশীয়, নাম তাহার "মোরী"। সে আমাকে বলিল, অমুক অমুক বিশেষ দিন ছাড়া হারেসের সাক্ষাৎ হইবে না; আমি অপেক্ষায় থাকিলাম। মোরীর সহিত আমার বেশ সম্পর্ক হইয়া গেল; সে আমাকে রসুলুল্লাহ (দঃ) সম্পর্কে বিভিন্ন কথা জিজ্ঞাসা করিত। উত্তরে আমি নবীজীর গুণাবলী বর্ণনা করিতাম এবং তিনি যেই ধর্ম্মের আহ্বান করিয়া থাকিতেন সেই ধর্ম্ম—ইসলামের বয়ানও তাহার নিকট করিতাম। মোরী আমার বক্তব্য শ্রবনে অত্যধিক মোহিত হইত, এমনকি কাঁদিয়া অস্থির হইয়া যাইত; আর আমাকে বলিত, আমি ইঞ্জিল কেতাব পাঠ করিয়া থাকি উহাতে এই নবীর গুণাবলীর উল্লেখ ঠিক এইরূপই পাইয়া থাকি। আমি তাঁহার প্রতি ঈমান আনিলাম এবং আমি তাঁহার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিলাম। অবশ্য আমি

ভয় করি, মোনজের ইবনে হারেস জানিতে পারিলে আমাকে প্রাণে মারিয়া ফেলিবে। মোরী আমাকে অত্যধিক সম্মান করিত এবং যত্নের সহিত আমার অতিথেয়তা করিত।

একদা শাসনকর্ত্তা হারেস রাজমুকুট পরিধানে দরবারে বসিল এবং আমাকে সাক্ষাৎ দানের সময় দিল। আমি উপস্থিত হইয়া নবীজীর লিপিখানা তাহার হস্তে অর্পণ করিলাম। লিপির বিষয়বস্তু এই ছিল—

سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى وَاٰمَنَ بِهٖ وَاَدْعُوْكَ اِلٰى اَنْ تُؤْمِنَ

بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ يَبْقٰى مُلْكُكَ

"সালাম তাহার প্রতি যে সত্যের অনুসরণ করে এবং সত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। আমি আপনাকে আহ্বান জানাই, আপনি আল্লার প্রতি ঈমান গ্রহণ করুন যিনি এক—তাঁহার কোন শরীক নাই ; আপনার রাজত্ব অটুট থাকিবে।

(বেদায়াহ, ৩—২৬৮)

সে লিপি পাঠ করিয়া ক্রোধে বেসামাল হইয়া পড়িল এবং লিপিখানা ফেলিয়া দিয়া বলিল, এমন কে আছে যে, আমার রাজত্ব ছিনাইয়া নিতে পারে ? আমি অভিযান চালাইব এবং সে সুদূর ইয়ামনে থাকিলেও তাহাকে পাকড়াও করিয়া আনিব। এখন হইতেই লোক-লস্কর একত্রিত করা হইবে। ঐ দরবারে বসা অবস্থায়ই সে সৈন্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করিল এবং তথা হইতে উঠিয়া যুদ্ধের অশ্বসমূহের পায়ে নাল লাগাইয়া প্রস্তুত করার আদেশ জারি করিয়া দিল।

লিপিবাহক শুজা (রাঃ) বলেন, সে যুদ্ধের এই সব তৎপড়তা ও প্রস্তুতি আরম্ভ করিয়া আমাকে বলিল, তোমার গুরুকে এই সমাচার অবগত কর। শাসনকর্ত্তা মোনজের ইবনে হারেস রোম সম্রাটের নিকটও পত্রযোগে আমার বিষয় এবং যুদ্ধের জন্য তাহার প্রস্তুতির বিষয় সংবাদ পাঠাইয়া দিল।

(রোম সম্রাটের অবস্থা ত ৬নং হাদীছে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে যে, সে নবীজীর বিষয়ে অত্যধিক গুরুত্বদানে ভাবাবেগে কাবু হইয়া পড়িয়াছিল। অতএব) রোম সম্রাট তাহাকে তাহার পত্রের উত্তরে সতর্ক করিয়া দিল যে, ঐ নবীর বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবে না ; তাঁহার বিরুদ্ধে তৎপরতা বন্ধ কর, আর ইলিয়া শহরে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ কর।

শুজা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, শাসনকর্ত্তা মোনজের ইবনে হারেসের নিকট যখন রোম-সম্রাটের এই উত্তর পৌছিল তখন সে দমিয়া গেল। সে আমাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি আপনার গুরুর নিকট প্রত্যাবর্ত্তনে কোন্ দিন যাত্রা করিবেন ? আমি বলিলাম, আগামীকল্য। মোনজের তৎক্ষণাৎ আমাকে একশত তোলা স্বর্ণ

এবং যাতায়াত ব্যয় এবং পোশাক-পরিচ্ছদ উপহার দেওয়ার আদেশ করিল। আর মোরীকে আদেশ করিল, আমার সমুদয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করার জন্য।

মোরী আমার মারফৎ নবীজী সমীপে সালাম আরজ করিলেন। আমি নবীজীর খেদমতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মোনজের ইবনে হারেসের সমুদয় সংবাদ অবগত করিলাম; নবীজী বলিলেন, তাহার রাজত্বের অবসান অবশ্যম্ভাবী। আর নবীজী সমীপে মোরীর পক্ষ হইতে সালাম নিবেদন করিলাম এবং তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনাইলাম; নবী (দঃ) বলিলেন, সে সত্যবাদী। মোনজেরের ভাগ্যে ঈমান জুটিল না। (তবকাত, ১—২৬১)

৬। আরবের একটি প্রসিদ্ধ সুফলা এলাকা "ইয়ামামা", তথাকার সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি ছিল "হাওয়াযা-ইবনে আলী।" এলাকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐ ব্যক্তি তথাকার সর্ব্বাধিক প্রভাবশালী লোক। তাহার নিকটও নবী (দঃ) লিপি পাঠাইলেন— সালীৎ-ইবনে-আম্‌র (রাঃ) ছাহাবী মারফৎ। লিপিতে তাহাকে ইসলামের আহ্বান জানাইলেন। সে লিপি পাঠ করিয়া কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান না করিলেও মুলায়েম ভাবে প্রত্যাখ্যানই করিল। সে নবীজীর লিপির উত্তরে লিপি লিখিল, যাহার মর্ম্ম এই ছিল—আপনি যেই বস্তুর প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন উহা অতি সুন্দর ও উত্তমই বটে। তবে আমি আমার জাতির কবি ও সুবক্তা, সমগ্র আরব আমাকে ভয় করে। অতএব প্রাধান্যের কিছু অংশ আপনার সহিত আমাকে দিতে হইবে, তবেই আমি আপনার কথা গ্রহণ করিতে পারি।

লিপির এই উত্তর দান করিল, আর নবীজীর দূতকে পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বিভিন্ন উপঢৌকন প্রদান করিল। দূত প্রত্যাবর্ত্তন করিলে নবীজী (দঃ) তাহার লিপি পাঠ করিয়া বলিলেন, (ইসলামের বিনিময়ে) যদি সে একটি খেজুর পরিমাণ জায়গার কর্ত্তৃত্বও দাবী করে তাহাও দান করিতে আমি প্রস্তুত নহি। তাহার ধন-সম্পদ অচিরেই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

পাঠক! নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কর্ম্মতৎপড়তার দ্রুতগতির নমুনা এখানেই দেখা যায়। প্রায় ১৫০০ ছাহাবী সঙ্গে লইয়া ৩০০ মাইল ছফর করতঃ ওমরা করার নিয়্যতে মক্কার নিকটবর্ত্তী পৌঁছিলেন। মক্কাবাসীরা মক্কায় যাইতে দিল না; বিরাট ঝামেলার পরে তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া আবার সেই প্রায় ৩০০ মাইল ভ্রমণ করিয়া মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অত বড় ছফর এবং ঝামেলা অতিক্রম করতঃ মদিনায় পৌঁছিয়া এক মাসেরও অনেক কম সময় মদিনায় অবস্থান করিলেন। উহার পরই আরবে ইহুদী-শক্তির সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র খয়বর-অভিযানে তাঁহাকে যাইতে হইল যাহা এক ভয়াবহ অভিযান ছিল।

মধ্যবর্ত্তী এই সামান্য সময়েও নবী (দঃ) তাঁহার দায়িত্ব পালনের তৎপরতায় বিন্দুমাত্র বিশ্রাম নিলেন না। এই ১০×২০ দিনের মধ্যেই নবী (দঃ) বহির্বিশ্বে

ইসলামকে বিদ্যুৎগতিতে ছড়াইয়া দেওয়ার বিপ্লবী ব্যবস্থা সম্পন্ন করিলেন। একই দিনে উল্লেখিত ছয়জন দূতকে ছয়টি দেশে প্রেরণ করিয়া এক সঙ্গে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় ইসলামকে ছড়াইয়া দিলেন। মহানবীর মহাআহ্বানে তিনটি মহাদেশেই এক অপূর্ব্ব আলোড়নের সৃষ্টি হইল—সম্রাটগণের রাজসিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল, বিশ্ব বিজয়ী শক্তিসমূহও আতঙ্কিত হইয়া উঠিল।

মরু নিবাসী ও খেজুরপাতার মসজিদে দরবার অনুষ্ঠানকারী নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের লিপিগুলির রাজকীয় মহত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ততা, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভাষা, আত্মাভিমানপূর্ণ বাক্যাবলী, শক্তি-সমর্থের কণ্ঠধারী শব্দাবলী পৃথিবীর খ্যাতনামা সম্রাট, এবং গর্ব্ব-অহঙ্কারে পরিপূর্ণ বীরগণকে কাঁপাইয়া তুলিল। শত শত যুদ্ধের দ্বারা যাহা সম্ভব হইত না শুধু লিপির দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইয়া গেল।

নবীজী মোস্তফা (দঃ) উল্লেখিত ছয়খানা লিপি ছাড়া আরও অনেক লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। যথা—

৭। আয্‌দ বংশীয় শাসনকর্ত্তা জায়ফর এবং তাঁহার ভ্রাতা আব্‌দ—তাঁহাদের প্রতি নবী (দঃ) আম্‌র ইবনুল আ'ছ (রাঃ) ছাহাবীকে লিপি দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৮। বাহ্‌রাইনের শাসনকর্ত্তা মোন্‌জের-ইবনে-ছাওয়ার নিকটও নবী (দঃ) লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন—আলা-ইবনুল-হযরমী (রাঃ) ছাহাবী মারফৎ। তিনিও ইসলাম গ্রহণ পূর্ব্বক নবীজীর নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন যে, আমার দেশে ইহুদী ও অগ্নিপূজক সম্প্রদায় বাস করে; তাহাদের প্রতি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিব। নবী (দঃ) উত্তরে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, আপনি যাবৎ সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন আপনার কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ন থাকিবে। আর ইহুদী ও অগ্নিপূজক সম্প্রদায়রা অনুগত নাগরিকত্বের রাষ্ট্রীয় কর আদায় করিলে তাহারা নিজ নিজ ধর্ম্মে থাকিয়া দেশে বসবাস করিবার সুযোগ-সুবিধা পূর্ণরূপে ভোগ করিবে।

৯। গাচ্ছানের শাসনকর্ত্তা জাবালা-ইবনে-আইহামকেও নবী (দঃ) লিপি লিখিয়াছিলেন। সে তখন মোসলমান হইয়াছিল; খলীফা ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আমলে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ক্রোধে ইসলাম ত্যাগ করতঃ পালাইয়া গিয়াছিল।

১০। সামাওয়াহ্ এলাকার শাসক নুফাছা ইবনে ফরওয়াহকেও রসুলুল্লাহ (দঃ) লিপি লিখিয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতিও নবী (দঃ) লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। যথা—

১১। ইয়ামনের হারেস ১২। শোরায়হ ১৩। নোয়াএম

তাঁহারা তিন ভ্রাতা আব্দে-কুলালের পুত্র প্রত্যেকেই বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। নবী (দঃ) প্রত্যেকের নিকটই ভিন্ন ভিন্ন লিপি পাঠাইয়াছিলেন। তদ্রূপ ইয়ামনেরই—

১৪। নোমান ১৫। মাআফের, ১৬। হামদান, ১৭। যোরআ- তাঁহাদেরকেও ভিন্ন ভিন্ন লিপি লিখিয়াছিলেন। তাহাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন ইয়ামনের দুই বিশিষ্ট ব্যক্তি—১৮। জীল-কুলা' এবং ১৯। জী-আম্ কেও লিপি লিখিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমনকি পবিত্র কোরআন ছুরা ফীলের ইতিহাসের নায়ক আব্রাহা রাজার কন্যা "জোরায়বা" জীল-কুলার-এর স্ত্রী ছিলেন তিনিও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ২০। আব্রাহার পুত্র মা'দীকারেবকেও লিপি লিখিয়াছিলেন এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২১। নবী (দঃ) নবুয়তের মিথ্যা দাবীদার মোছায়লেমা-কাজ্জাবের নিকটও ইসলামের প্রতি আহ্বানে লিপি পাঠাইয়াছিলেন। ২২। রোমানদের প্রসিদ্ধ পাদ্রি জাগাতেরকেও লিপি লিখিয়াছিলেন।

নবী (দঃ) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-প্রধানদেরকেও লিপি লিখিয়াছিলেন। যথা—

২৩। ইয়ামনস্থিত নাজরানের প্রসিদ্ধ গির্জ্জার পাদ্রিদের নিকট নবী (দঃ) লিপি পাঠাইয়াছিলেন। ২৪। আরব সাগরের উপকূলীয় হাজ্রামউত এলাকার কতিপয় সর্দ্দার প্রধানের নিকটও লিপি লিখিয়াছিলেন।

লিপির মাধ্যমে বিশ্বের কোণে কোণে ইসলামের ডাক পৌছাইয়া দেওয়া—ইহাও নবীজীর নব আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক উপায় ছিল যাহার সুফল আশাতীত লাভ হইয়াছিল।

এই বৎসরের প্রথম মাস মোহাররাম মাসেই ইহুদীশক্তি নিস্তব্ধকারী খয়বর-জেহাদ অনুষ্ঠিত হয়। বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে প্রায় দশ পৃষ্ঠা ব্যাপী বর্ণিত রহিয়াছে।

এই বৎসরই নবী (দঃ) চৌদ্দ শতের অধিক ছাহাবীগণকে সঙ্গে লইয়া ওমরা করার জন্য বিনাবাধায় মক্কায় প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং ওমরা আদায় করিয়াছিলেন। হিজরী ষষ্ঠ বৎসরে নবী (দঃ) ঐসব ছাহাবীগণকে লইয়া ওমরা করার জন্য আসিয়াছিলেন, কিন্তু মক্কাবাসীরা বাধা দেওয়ায় ওমরা আদায় করিতে পারিয়াছিলেন না। অবশ্য পরস্পর সন্ধি হইয়াছিল—যাহা "হোদায়বিয়ার সন্ধি" নামে প্রসিদ্ধ। সেই সন্ধির শর্ত অনুসারে এই বৎসর বিনা বাধায় মোসলমানগণ ওমরা আদায় করিয়াছিলেন।

হিজরী অষ্টম বৎসর

ইসলাম ও মোসলমানদের মহাবিজয়ের বৎসর

এই বৎসরের প্রথম জেহাদ—মূতার জেহাদ; এই জেহাদে নবীজী অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন না। অত্যন্ত ভয়াবহ জেহাদ ছিল ইহা। নবীজীর নির্দ্ধারিত একের পর এক তিনজন আমীর বা কমাণ্ডার—নবীজীর পালকপুত্র যায়েদ (রাঃ), চাচাত ভাই জাফর (রাঃ) এবং বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) প্রত্যেকেই শহীদ হইয়াছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

এই বৎসরই নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের তথা ইসলাম ও মোসলেম জাতির মহাবিজয়, চরম বিজয়, সুস্পষ্ট বিজয়—ফত্‌হে মুবীন তথা মক্কা-বিজয় লাভ হয়। অধিকন্তু মক্কার পার্শ্ববর্ত্তী এলাকাসমূহ—হোনায়ন, আওতাস, তায়েফ ইত্যাদিও জয় করা হয়; সর্ব্বত্রই ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন হয়। বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে ৩৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী বর্ণিত রহিয়াছে।

নবীজীর উদারতা ঃ

আরবের বিখ্যাত কবি যোহায়র, তাহার পরিবারের প্রত্যেকই বিশিষ্ট কবি। তাহার দুই পুত্র—বোজায়র ও কা'ব তাহারাও প্রসিদ্ধ কবি। মক্কা বিজয়ের পর বোজায়র ইসলাম গ্রহণ পূর্ব্বক নবীজীর সহিত মদিনায় চলিয়া আসিলেন। মদিনা হইতে ভ্রাতা কা'বকে পত্র লিখিয়া নিজে ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জ্ঞাত করিলেন, এবং তাহাকেও লিখিলেন, যে কেহ ইসলাম গ্রহণ করিয়া আসিলে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহার ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পূর্ব্বেকার অপরাধ ক্ষমা করেন। অতএব তোমার অন্তরে যদি ইসলামের প্রতি আকর্ষণ হয় তবে যথা সত্বর উড়িয়া চলিয়া আস, অন্যথায় প্রাণ বাঁচাইবার জন্য আশ্রয়স্থলের খোঁজ কর।

কা'ব উত্তরে কাব্যের মাধ্যমে নবীজী (দঃ)কে কটাক্ষ করিয়া পত্র লিখিল। তাহার পত্রের কটাক্ষে নবীজী (দঃ) তাহার উপর রুষ্ঠ হইলেন এবং লোকেরা তাহাকে ভয় দেখাইল যে, তুমি প্রাণ হারাইবে। অবশেষে কা'বের মতি পরিবর্ত্তিত হইল—সে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উদারতার প্রশংসা করিয়া একটি কবিতা রচনা করিল। অতঃপর গোপনে মদিনায় আসিয়া এক পরিচিত ছাহাবীর আশ্রয় নিল। ঐ ছাহাবী তাহাকে লইয়া নবীজীর মসজিদে ফজরের নামায পড়িলেন। ঐ ছাহাবী নামাযের পরে কা'বকে নবীজীর প্রতি ইশারা করিয়া দেখাইয়া দিলেন। নবী (দঃ) কা'বকে চিনেন না; এই সুযোগে কা'ব নিজেই নবী (দঃ)কে বলিল, ইয়া রসুলুল্লাহ! যোহায়র-পুত্র কা'ব অনুতপ্ত হইয়া ইসলাম গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার চরণে শরণ লইতে আসিয়াছে। আপনি তাহাকে গ্রহণ করিবেন কি—যদি আমি তাহাকে আপনার নিকট উপস্থিত করি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, হাঁ—নিশ্চয়। তৎক্ষণাৎ কা'ব বলিয়া উঠিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমি নিজেই কা'ব। এই বলিয়া কবি কা'ব (রাঃ) নবীজীর উদ্দেশ্যে রচিত তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কবিতা "বানাত-সোআ'দ" ঐ মজলিসেই পাঠ করিয়া শুনাইলেন। উক্ত কবিতায় তিনি উল্লেখ করিলেন—

আমাকে রসুলুল্লাহ সম্পর্কে ভয় দেখানো হইয়াছে, কিন্তু আল্লার রসুলের দরবারে ক্ষমার আশা অতি উজ্জল। আমার প্রতি সহিষ্ণু হউন; আল্লাহ আপনাকে মহান কোরআনে কত কত সুন্দর উপদেশমালা দান করিয়াছেন। মিথ্যা দোষ চর্চ্চাকারীদের

কথায় আমাকে মেহেরবানীপূর্ব্বক অপরাধী সাব্যস্ত করিবেন না। লোকেরা আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই বলে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আমি অপরাধী নহি।

নবীজীর প্রশংসায় একটি উক্তি তিনি অতি চমৎকার করিয়াছেন—

"রসুল আল্লার নূর বিশ্ব হয় তাঁহাতে উজালা; আল্লার উন্মুক্ত তলোয়ার তিনি হিন্দী উহার শলা।"

নবী (দঃ) সন্তুষ্ট হইয়া কবিকে তাঁহার গায়ের চাদর মোবারক পুরস্কারস্বরূপ দান করিলেন। চাদরখানা কা'ব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট আজীবন ছিল। খলীফা মোয়াবিয়া (রাঃ) কবির নিকট হইতে দশ হাজার দেরহামে—রৌপ্য মুদ্রায় উহা ক্রয় করার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু কবি কা'ব (রাঃ) সম্মত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বরকতপূর্ণ বস্ত্র আমি কোন মূল্যেই কাহাকেও দিব না। কবির ইন্তেকালের পর মোয়াবিয়া (রাঃ) বিশ হাজার দেরহামে তাঁহার উত্তরাধিকারীদের নিকট হইতে উহা ক্রয় করিয়া নিয়াছিলেন। অতঃপর উহা বনু-উমাইয়্যা বংশীয় বাদশাহগণের নিকটই পরম্পরা পবিত্র বস্তুরূপে সমাদর লাভ করিতে থাকে। তাঁহাদের রাজধানী ছিল বাগদাদ; বাগদাদের উপর যখন দস্যু তাতারীদিগের আক্রমণ হয় তখন চাদর মোবারক নিখোঁজ হইয়া যায়।

(যোরকানী. ৩—৬০)

হিজরী নবম বৎসর

এই বৎসরের সেরা ঘটনা ছিল তবুকের জেহাদ; ইহাই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্বক্রীয় সর্ব্বশেষ জেহাদ। ইসলামের দশ বৎসর সামরিক জীবনে এই জেহাদের ন্যায় এত অধিক সৈন্য সমাবেশ আর কোন জেহাদে হয় নাই। এযাবৎ সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা বার হাজার ছিল—হোনায়ন জেহাদে। মক্কা বিজয়েও দশ হাজার ছিল, কিন্তু তবুক জেহাদে সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ হাজার। বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে ১৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী বর্ণিত হইয়াছে।

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নীতি ছিল, অধিক জন-সমাবেশের সুযোগ দেখিলে নবীজী (দঃ) তাঁহার আদর্শ ও উপদেশ ব্যক্ত করায় তৎপর হইতেন এবং সুদীর্ঘ ভাষণ দিতেন। সেমতে তবুক এলাকায় পৌঁছিয়া শিবির স্থাপনের পরই নবীজী (দঃ) এই বিশাল জন সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া নৈতিকতা শিক্ষাদানের এক সুদীর্ঘ ভাষণ দান করিলেন। সেই ভাষণের উপদেশমালা চিরস্মণীয়। নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অ াল্লামের ভাষণ এই ছিল—

প্রথমে আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা ও গুণগান করিলেন, তারপর বলিলেন— হে জনমণ্ডলি! আল্লার গুণগানের পর —স্মরণ রাখিও, সর্ব্বাধিক সত্য বাণী আল্লার কেতাব এবং সর্ব্বাধিক মজবুত ও শক্ত ধারণীয় মুক্তির কলেমা— কলেমা-তৌহিদ। ধর্ম্মীয় মৌলিক বিষয়ে সর্ব্বোত্তম (হযরত) ইব্রাহীমের ধর্ম্মের মূল সমূহ, সর্ব্বোত্তম আদর্শ মোহম্মদের আদর্শ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)। সর্ব্বোচ্চ বাক্য আল্লার জেক্‌র এবং সর্ব্বাধিক সুন্দর ইতিহাস কোরআনের ইতিহাস।* শরীয়তের নির্দ্দেশাবলীই সর্ব্বোত্তম কাজ এবং গর্হিত কার্য্যাবলী সর্ব্বাধিক মন্দ কাজ। সর্ব্বাধিক সুন্দর জীবন-ব্যবস্থা নবীগণ প্রদত্ত জীবন-ব্যবস্থা। সর্ব্বাধিক সম্মানের মৃত্যু শহীদগণের আত্মদান। হেদায়েতের সুযোগ পাইয়াও ভ্রষ্টতার উপর থাকা সর্ব্বাধিক বড় অন্ধতা। উৎকৃষ্ট আমল উহা যাহার উপকার ভোগ করা যায়। উত্তম জীবন-ব্যবস্থা উহা যাহার ব্যবস্থাপক নিজে উহার অনুসরণ করিয়াছে। জ্ঞান-বিবেকের অন্ধতা সর্ব্বাধিক ঘৃণিত অন্ধতা। দানকারী হস্ত গ্রহণকারী হস্ত অপেক্ষা উত্তম। প্রয়োজন পরিমাণ কম ধন-সম্পদ উত্তম বেশী পরিমাণ হইতে যাহা উদাসীন বানাইয়া দেয়। মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছিয়া ওজর-আপত্তি করা ঘৃণার কাজ।

حمد الله واثنى عليه بما هو اهله ثم قال ايها الناس اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واوثق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة ابراهيم وخير السنن سنة محمد (صلى الله عليه وسلم) واشرف الحديث ذكر الله واحسن القصص هذا القران وخير الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها واحسن الهدى هدى الانبياء واشرف الموت قتل الشهداء اعمى العمى الضلالة بعد الهدى وخير الاعمال ما نفع وخير الهدى ما اتبع وشر العمى عمى القلب واليد العليا خير من اليد

* পবিত্র কোরআনে পূর্ব্ববর্ত্তী বহু জাতি, বহু শক্তি এবং বহু দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তিদের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। উপদেশ গ্রহণে ঐ সব ইতিহাসের তুলনা নাই।

السُّفْلٰى وَمَا قَلَّ وَكَفٰى خَيْرٌ مِّمَّا
كَثُرَ وَاَلْهٰى وَشَرُّ الْمَعْذِرَةِ حِيْنَ
يَحْضُرُ الْمَوْتُ وَشَرُّ النَّدَامَةِ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَأْتِى
الْجُمُعَةَ اِلَّا دُبُرًا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
لَا يَذْكُرُ اللّٰهَ اِلَّا هُجْرًا وَمِنْ اَعْظَمِ
الْخَطَايَا اللِّسَانُ الْكَذُوْبُ وَخَيْرُ
الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ وَخَيْرُ الزَّادِ
التَّقْوٰى وَرَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ
اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخَيْرُ مَا وُقِرَ فِى
الْقُلُوْبِ الْيَقِيْنُ وَالْاِرْتِيَابُ مِنَ
الْكُفْرِ وَالنِّيَاحَةُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ
وَالْغُلُوْلُ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ وَالشِّعْرُ
مِنْ مَزَامِيْرِ اِبْلِيْسَ وَالْخَمْرُ
جِمَاعُ الْاِثْمِ وَالنِّسَاءُ حَبَائِلُ

কেয়ামত দিবসে লজ্জিত হইতে হইলে তদপেক্ষা অপমান আর কিছু নাই। অনেক মানুষ জুমার নামাযে উপস্থিত হইতেও বিলম্ব করে। অনেকে আল্লাহ তায়ালার জেক্‌র পূর্ণ মর্য্যাদার সহিত করে না। জবানকে মিথ্যার অভ্যস্ত বানানো অতি বড় গোনাহ। অন্তরের তৃপ্তিই বড় ধনাঢ্যতা। মানুষের উত্তম সম্বল পরহেজগারী। বড় জ্ঞান-বিজ্ঞান হইল মহান আল্লার ভয়। অন্তরে বদ্ধমূল বিষয়ের উত্তমটি হইল আল্লার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস; উহাতে কোন প্রকার দ্বিধা কুফরী গোনাহ। শোক-বিলাপ অন্ধকার যুগের রীতি। অসদুপায়ে অর্জ্জিত সম্পদ (দ্বারা প্রতিপালিত দেহ) জাহান্নামের জ্বালানি। সাধারণ কাব্য শয়তানের সুর। মদ নানাবিধ গোনাহ একত্রকারী। নারী শয়তানের ফাঁদ। যৌবন উন্মাদনারই অংশবিশেষ। ঘৃণার উপার্জ্জন সূদের উপার্জ্জন। জঘণ্য খাদ্য এতিমের মাল খাওয়া। অন্যকে দেখিয়া যে শিক্ষা লাভ করে সেই সৌভাগ্যশালী। হতভাগা শুধু সে যে মায়ের উদর হইতেই হতভাগা হইয়া জন্ম নিয়াছে*। প্রত্যেকেরই দুনিয়ার শেষ সীমা চার হাত জায়গা (তথা কবরের স্থানটুকু, সেই অনুপাতেই দুনিয়ার জন্য ব্যস্ততা অবলম্বন করিবে।)

* অর্থাৎ মায়ের পেট হইতে হতভাগা হইয়া জন্ম নেওয়ার তথ্য ত কাহারও জানা নাই; সুতরাং কেহ নিজকে ভাগ্যবঞ্চিত ভাগ্য-বিতাড়িত, হতভাগা গণ্য করিয়া কার্য্য-ময়দানে নিষ্ক্রিয় বসিয়া থাকিবে না। শত বার অকৃতকার্য্য হইলেও শত বারই কৃতকার্য্যতার জন্য চেষ্টা করিবে।

ভাল-মন্দের শেষ ফয়ছালা চিরস্থায়ী আখেরাতে হইবে। সারা জীবনের আমলকে সংরক্ষণ করে শেষ জীবনের আমল। মিথ্যা বর্ণনার উদ্ধৃতকারীও জঘণ্য। প্রত্যেক আগত নিকটতম (অতএব পরকাল নিকটতমই বটে)। মোমেনকে গালী দেওয়া ফাছেকী গোনাহ. মোমেনের সঙ্গে লড়াই করা কুফুরী গোনাহ, অসাক্ষাতে তাহার নিন্দা করা আল্লার নাফরমানী, তাহার ধন-সম্পত্তির নিরাপত্তা তাহার জানের নিরাপত্তার সমান। যে ব্যক্তি আল্লার কার্য্যের উপর কসম খাইবে আল্লাহ তাহাকে মিথ্যুক বানাইবেন ↑। যে কেহ আল্লার নিকট ক্ষমা চাহিবে আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিবেন। যে ব্যক্তি পাক-পবিত্র থাকার সাধনা করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে পাক-পবিত্র থাকায় সাহায্য করিবেন। যে ব্যক্তি ক্রোধ দমাইয়া রাখিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ছওয়াব দান করিবেন। ক্ষয়-ক্ষতির বিপদে যে ব্যক্তি ধৈর্য্যধারণ করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে ক্ষতি-পুরণ দান করিবেন। যে ব্যক্তি নেক কাজ করিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জনের ইচ্ছা করে আল্লাহ তায়ালা (কেয়ামত দিবসে) সর্ব্বসমক্ষে তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়া দণ্ড দিবেন। যে ব্যক্তি আপদে-বিপদে সর্ব্বক্ষেত্রে ধৈর্য্যধারণকারী হইবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অনেক

الشَّيْطَانِ وَالشَّبَابُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْجُنُونِ
وَشَرُّ الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الرِّبٰو وَشَرُّ
الْمَاكِلِ اَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالسَّعِيْدُ
مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهٖ وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ
فِيْ بَطْنِ اُمِّهٖ وَاِنَّمَا يَصِيْرُ اَحَدُكُمْ
اِلٰى مَوْضِعِ اَرْبَعَةِ اَذْرُعٍ وَالْاَمْرُ
اِلَى الْاٰخِرَةِ وَمِلَاكُ الْعَمَلِ خَوَاتِمُهٗ
وَشَرُّ الرَّوَايَا رَوَايَا الْكَذِبِ وَكُلُّ
مَا هُوَ اٰتٍ قَرِيْبٌ وَسِبَابُ الْمُؤْمِنِ
فُسُوْقٌ وَقِتَالُ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ وَاَكْلُ
لَحْمِهٖ مِنْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَحُرْمَةُ مَالِهٖ
كَحُرْمَةِ دَمِهٖ وَمَنْ يَّتَاَلّٰى عَلَى
اللّٰهِ يُكَذِّبْهُ وَمَنْ يَّسْتَغْفِرْهُ يَغْفِرْ
لَهٗ وَمَنْ يَّعِفَّ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ
يَّكْظِمْ يَاْجُرْهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَّصْبِرْ عَلَى
الرَّزِيَّةِ يُعَوِّضْهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَّبْتَغِ

↑ যেমন কেহ অন্য একজন মোসলমানকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিল, কসম খোদার তোর গোনাহ মাফ হইবে না। এইরূপ অনধিকার কথাকে আল্লাহ নাপছন্দ করেন।

السمعة يسمع الله به ومن يصبر يضعف الله له ومن يعص الله يعذبه الله اللهم اغفرلى ولامتى اللهم اغفرلى ولامتى اللهم اغفرلى ولامتى استغفر الله لى ولكم -

গুণ বেশী ছওয়াব দিবেন। আল্লার নাফরমানী যে করিবে আল্লাহ তাহাকে দণ্ড দিবেন।

হে আল্লাহ! আমাকে এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন, আয় আল্লাহ! আমাকে এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন, আয় আল্লাহ! আমাকে এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন (তিনবার বলিলেন)। আল্লার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাই আমার জন্য এবং তোমাদের জন্য।
(বেদায়াহ, ৪—১২)

মসজিদে-জেরার ঃ

"জেরার" শব্দের অর্থ ক্ষতিসাধনের ষড়যন্ত্র। মদিনায় এক খৃষ্টান পাদ্রি ছিল আবু-আমের। নবীজী (দঃ) তাহাকে ইসলামের আহ্বান জানাইলেন, কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণ না করিয়া ইসলামকে মদিনা হইতে চিরবিদায় দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। বদর-জেহাদের পরে মক্কায় যাইয়া মক্কাবাসীদের মধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের উত্তেজনা সৃষ্টি করিল, যাহার পরিণামে ওহোদের যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে তাহার মনের আশা পুরিল না; তাহার ষড়যন্ত্র চলিতেই থাকিল, এমনকি সে রোম সম্রাটের সহিত যোগাযোগ করিল মদিনা আক্রমনের জন্য। রোম সম্রাটও খৃষ্টান, তাই তাহার সহিত যোগাযোগ খুব গাঢ়ভাবেই হইল। আবু আমের ঘন ঘন রোম যাইত এবং মদিনায় আসিয়া মদিনার মোনাফেকদের সহিত সলা-পরামর্শ করিত। আবু আমেরের তৎপরতা চালাইতে সুবিধালাভের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানের (তথা অফিস গৃহের) প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যকে মূল লক্ষ্য বানাইয়া কোবা পল্লিতে নবীজীর তৈরী সর্ব্বপ্রথম মসজিদের নিকটবর্ত্তীই মোনাফেকরা আর একটা মসজিদের আকৃতি তৈরী করিল। উহাতে তাহাদের এই উদ্দেশ্যও থাকিল যে, কোবা মসজিদ হইতে কিছু মুছল্লী খসাইয়া এই মসজিদে আনিতে পারিলে ধীরে ধীরে স্থানীয় মোসলমানদের মধ্যে দুইটা সমাজ সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা সহজ হইবে। এই সব ষড়যন্ত্রমূলক উদ্দেশ্যে এই মসজিদ আকৃতির ঘরটা তৈরী করিল। মোসলমানদের নিকট ইহাকে পুরাপুরি মসজিদ সাব্যস্ত করিবার জন্য নবীজীর দ্বারা এই মসজিদে নামায আরম্ভ করাইবার পরিকল্পনা তাহারা করিল। সেমতে মোনাফেক দল নবীজীর নিকট আসিয়া মিনতির সহিত আবেদন জানাইল যে, রুগ্ন ও দূর্ব্বলদের জন্য সব সময় দূরের মসজিদে যাওয়া কষ্টকর হয়। তাই কোবা পল্লীতে আমরা দ্বিতীয় আর

একটি মসজিদ তৈরী করিয়াছি। আমাদের আরজু, আপনি ঐ মসজিদে নামায আরম্ভ করিয়া দিবেন।

নবীজী মোস্তফা (দঃ) তখন তবুক-জেহাদের ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত; তাই তিনি তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, তবুক হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর আমি তথায় নামায পড়াইয়া দিব। তবুক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পথে নবী (দঃ) "আওয়ান" নামক স্থানে পৌঁছিলেন উহা মদিনার অতি নিকটবর্ত্তী; তথা হইতে মদিনা মাত্র এক ঘণ্টার পথ। ঐ সময় উক্ত মসজিদ নামীয় মোনাফেকী ষড়যন্ত্রের আড্ডা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আয়াত নাযেল হইয়া গেল এবং ঐ মসজিদে যাইতে নবীজী (দঃ)কে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ - وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَا

اِلَّا الْحُسْنٰى - وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ - لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا

"যাহারা মসজিদ তৈরী করিয়াছে ইসলামের অনিষ্ট সাধন উদ্দেশ্যে, কুফুরী কাজের উদ্দেশ্যে, মোমেনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং পূর্ব্ব হইতে আল্লাহ ও রসূলের সহিত শত্রুতা বাঁধাইয়াছে—এমন এক ব্যক্তির কর্ম্মস্থল বানাইবার উদ্দেশ্যে। অথচ আপনার নিকট আসিয়া মিথ্যা কসম খাইয়া তাহারা বলে, আমরা ভাল উদ্দেশ্যে এই মসজিদ তৈরী করিয়াছি। আল্লাহ সাক্ষী দিতেছেন, নিশ্চয় তাহারা মিথ্যাবাদী। আপনি কস্মিনকালেও তাহাদের সেই মসজিদে একটু দাঁড়াইবেন ও না। (১১ পাঃ ২ রুঃ)

এই আয়াত অবতীর্ণ হইলে পর সঙ্গে সঙ্গে ঐ "আওয়ান" এলাকা হইতেই নবী (দঃ) দুইজন ছাহাবীকে সরাসরি এই বলিয়া ঐ মসজিদে পাঠাইয়া দিলেন যে, এখনই যাইয়া উহাকে আগুন লাগাইয়া ভস্ম করিয়া দিবে। ছাহাবীদ্বয় তাহাই করিলেন—মসজিদ নামের ঐ ঘরে আগুন ধরাইয়া দিলেন; মোনাফেকের দলরা তথা হইতে ছুটাছুটি করিয়া পালাইয়া গেল। (বেদায়াহ, ৪—২১)

চতুর্দিক হইতে ইসলামের জয়জয়কার ঃ

ষষ্ঠ বৎসরের শেষ দিকে হোদায়বিয়ার সন্ধি হইয়া ছিল। ঐ সন্ধির শর্ত্তগুলি সাধারণ দৃষ্টিতে খুবই হেয়তাজনক ছিল, কিন্তু শান্তির অগ্রদূত, শান্তির মহাসাধক মানুষের প্রেম ও ভালবাসার শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাগুরু নবীজী মোস্তফা (দঃ) ঐরূপ একটি সন্ধির প্রতি ব্যাকুল ছিলেন। কারণ, যুদ্ধের দ্বারা নয়, বরং সত্যের ডাক ও

আহ্বান দ্বারা বিশ্বকে জয় করাই নবীজী মোস্তফা (দঃ) তাঁহার নবীজীবনের সাফল্য মনে করিতেছিলেন। কোরেশদের যুদ্ধ-বিগ্রহের ভিড়ে নবীজী (দঃ) সেই অবকাশ পাইতে ছিলেন না। ইসলাম শান্তির সাধনা—শান্তিতেই এই সাধনার প্রকৃত স্বরূপ লোক সমক্ষে উদ্ভাসিত হইতে পারে। সেই শান্তির সুযোগই নবীজী মোস্তফা (দঃ) খুঁজিতে ছিলেন, তাই তিনি কোরেশদের সমস্ত অন্যায় জেদ স্বীকার করিয়া লইয়াও সন্ধিকে চূড়ান্তে পৌঁছাইয়া ছিলেন এবং সেই সন্ধিকে নবীজী (দঃ) মহা-বিজয়রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সন্ধি যে ইসলামের মহাবিজয় ছিল তাহার বিকাশ ধাপে ধাপে হইয়াছে। সন্ধির দ্বারা শান্তির অবকাশ পাইতেই একদিনেরও বিশ্রাম না লইয়া নবীজী (দঃ) সপ্তম বৎসরের আরম্ভ হইতেই চতুর্দ্দিকে লিপি প্রেরণ করিয়া ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় সর্ব্বত্র ইসলামের ডাক পৌঁছাইয়া দিলেন। রাজদরবারে, বড় বড় প্রতিষ্ঠানে এবং গোত্রে গোত্রে ইসলামের আহ্বান পৌঁছিয়া গেল। এই অভিযানে বিরাট সাফল্য লাভ হইল। আবিসিনিয়ার সম্রাট, বাহরাইনের শাসনকর্ত্তা, ওমানের শাসনকর্ত্তা, গাচ্ছানের শাসনকর্ত্তা এবং অনেক গোত্রপতিগণসহ বিভিন্ন শক্তিশিবিরে ইসলাম প্রবেশ করিল, বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করিলেন। উক্ত অভিযানে ইসলামের ডাক সর্ব্বত্রই আলোড়নের সৃষ্টি করিল এবং অনেকে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এক বিরাট অংশ ইসলামের আহ্বান পাইয়াও আর এক অপেক্ষায় থাকিয়া গেল।

মোহাম্মদ (দঃ) মক্কায় জন্মগ্রহণকারী এবং কোরেশ বংশের লোক। মোসলমানদের খোদার ঘর মক্কায়। মোহাম্মদ (দঃ) এখনও মক্কা জয় করিতে পারেন নাই, কোরেশরা এখনও ইসলাম গ্রহণ করে নাই, খোদার ঘর—কা'বা এখনও ঠাকুর-দেবতা, মূর্ত্তি-প্রতিমায় পরিপূর্ণ। সুতরাং কোরেশ ও মোসলমানদের চূড়ান্ত সংঘর্ষ অনিবার্য্য—সেই সংঘর্ষের ভবিষ্যত পরিণামের অপেক্ষায় বহু এলাকা, বহু গোত্র, বহু শক্তি ইসলাম হইতে দূরে থাকিয়া দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহারা মনে করিতেছিল, এই চূড়ান্ত সংঘর্ষেই সত্য-মিথ্যার সুস্পষ্ট পার্থক্য সূচিত হইবে; সত্য বিজয়ী এবং মিথ্যা পরাভূত হইবে। একদিকে কোরেশদের পূজিত শত শত দেব-দেবী যাহাদেরে তাহারা বিজয়ের উৎস মনে করে, অপর দিকে মোহাম্মদ (দঃ) বলিতেছেন, এই ঠাকুর দেবতা এবং দেব-দেবী-মূর্ত্তিগুলি অক্ষম জড়পদার্থ, পক্ষান্তরে তাঁহার আল্লাহই একক ভাবে সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বনিয়ন্তা। এই দুই মতবাদে নিশ্চয় লড়াই হইতেই থাকিবে। যদি মোহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) দল কোরেশদের দ্বারা পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় তবে আমরা লড়াই-বিগ্রহ ছাড়াই তাহাদের হইতে নিস্তার পাইয়া যাইব। আর যদি কেন্দ্রীয় দেব-দেবীদের পূজারী ও পুরোহিত এবং জাতি হিসাবে দুর্দ্ধর্ষ কোরেশরাই ঐ দলের হস্তে পরাজিত হইয়া যায় তাহা হইলে

আমাদেরকেও স্বীকার করিতে হইবে যে, মোহাম্মদই সত্য ; তাঁহার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ-লড়াই করিয়া জয়ী হইতে পারিব না।

আরবের বিভিন্ন গোত্র এইভাবের জল্পনা-কল্পনা এবং আন্দোলন-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া অপেক্ষমান দর্শকের ভুমিকায় তাকাইয়া রহিয়াছে। এরই মধ্যে হঠাৎ এক দিন বিস্ময়কর সংবাদ তাহাদের গোচরে আসিয়া গেল যে মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কা অধিকার করিয়া লইয়াছেন। মক্কার সর্ব্বপ্রধান সর্দার আবুসুফিয়ান মোসলমান হইয়া গিয়াছেন। দুর্দ্ধর্ষ মক্কাবাসীরা ইসলামের দুয়ারে ভিড় জমাইয়া ইসলামের ছায়ায় স্থান সংগ্রহ করিতেছে। আবরাহার হাতি-ঘোড়া ও অসংখ্য সৈন্য যে কা'বা অধিকার করিতে আসিয়া দৈব সাহায্যে সম্পুর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছিল ; আজ অনায়াসে সেই কা'বা মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অধিকারে আসিয়া গিয়াছে এবং কা'বা ঘরে স্থাপিত প্রতিমাগুলি অধঃমুখে ভুলুণ্ঠিত হইয়াছে, অন্যান্য স্থানের ঠাকুরদেবতাগুলি চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়াছে। যেই মোহাম্মদ এবং তাঁহার দল নিঃস্ব নিঃস্বম্বলরূপে মক্কার পথে-ঘাটে অত্যাচারিত ছিল, আজ তিনি মক্কার সর্ব্বেসর্ব্বা। যেই ছাফা পর্ব্বতের চূড়ায় দাঁড়াইয়া মোহাম্মদ (দঃ) মক্কার সমাজপতিদেরে ইসলামের ডাক দিয়াছিলেন ; আর তাহারা ঘৃণা, তিরস্কার ও ধমকের দ্বারা তাঁহাকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছিল। আজ সেই ছাফা পর্ব্বতের পাদদেশেই ইসলামের জন্য আত্মোৎসর্গ করায় লালায়িত হইয়া মক্কার লোকেরা আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছে। মক্কা বিজয় দ্বারা এইভাবে বিস্ময়জনক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল, তাই আরবের বহু গোত্র স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণে মদিনায় প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিতে লাগিল। তৃতীয় খণ্ড ১৫৫৩ নং হাদীছে এই তথ্যের বিবরণ উল্লেখ রহিয়াছে, পবিত্র কোরআনেও ইঙ্গিত রহিয়াছে যে—"মক্কাবিজয়ের পর আপনি দেখিতে পাইবেন দলে দলে লোক ইসলামে প্রবেশ করিতেছে।" (ছুরা-নছ্‌র)

হিজরী অষ্টম বৎসরের শেষার্দ্ধে মক্কাবিজয় সম্পন্ন হইয়াছে, তাই নবম বৎসরে ঐরূপ প্রতিনিধি দল আগমনের হিড়িক পড়িয়া গেল। এমনকি ইতিহাসে হিজরী নবম বৎসরকে "আমুল-উফুদ" ডিপুটেসন বা প্রতিনিধি দল আগমনের বৎসর বলা হয়।

হিজরী পঞ্চম বৎসরে খন্দকের যুদ্ধে মক্কাবাসীদের নেতৃত্বে পরিচালিত বিশাল সম্মিলিত আরববাহিনী ব্যর্থ ও পর্যুদস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আরবে ইসলামের এবং মোসলমানদের সুদৃঢ় প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন হইতেই সময় সময় স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণে কোন কোন গোত্রের প্রতিনিধিদল আসিতে ছিল। সর্ব্বপ্রথম ঐ পঞ্চম হিজরী সনে "মোযায়না" গোত্রের প্রতিনিধিদল আসিয়াছিল ; উক্ত প্রতিনিধি দলে চার শত লোক আসিয়াছিল। তাঁহারা সকলে স্বেচ্ছায় এক সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নবী (দঃ) তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন, তোমাদের নিজ দেশ

হইতে হিজরত করিতে হইবে না। (কারণ, তাহাদের বস্তিতে মোসলমানগণ স্বাধীন শক্তিশালী হইলেন।) তোমরা নিজেদের ধন-সম্পদের স্থানে ফিরিয়া যাও। সেমতে তাঁহারা ইসলাম লইয়া নিজ বস্তিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। (তবকাত, ১—২৯১)

এইভাবে পঞ্চম বৎসর হইতে প্রতিনিধিদলের আগমন আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু কদাচিৎ কদাচিৎ। নবম বৎসরে ব্যাপক আকারে এবং বহু সংখ্যক প্রতিনিদলের আগমন হয়। ইতিহাসে ঐরূপ ৭২টি প্রতিনিধিদল আগমনের উল্লেখ পাওয়া যায় (তবকাত, প্রথম খণ্ড)। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—তায়েফের প্রতিনিধিদল, তামীম-প্রতিনিধিদল, বনুহানিফার প্রতিনিধিদল, ইয়ামন-প্রতিনিধিদল এবং তাই গোত্রের প্রতিনিধিদলের আলোচনা তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

গোত্রীয় বা বিশেষ বিশেষ প্রতিনিধিদল ছাড়াও মদিনায় নবীজী (দঃ) সমীপে বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আগমনও অনেক হইয়াছে। যথা—

(১) ফরওয়া ইবনে মিচ্ছীক (রাঃ), তিনি কিন্দা বংশীয় রাজাদের শাসনাধীন নিজ গোত্রের প্রধান ও শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি ঐ কিন্দা বংশীয় রাজার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে নিজের গোত্র এবং পার্শ্ববর্ত্তী আরও দুইটি গোত্র—তিনটি গোত্রের শাসনকর্ত্তা মনোনীত করিয়া তাঁহার দেশের যাকাত ইত্যাদির কালেক্টাররূপে খালেদ ইবনে সায়ীদ (রাঃ) ছাহাবীকে তাঁহার সহিত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

(২) আম্র ইবনে মা'দীকারেব, তিনি যোবায়দ গোত্রের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি তাঁহার এক বন্ধু কায়সকে বলিলেন, হে কায়স! শুনিতে পাইলাম, কোরেশ বংশের মোহাম্মদ (দঃ) নামী এক ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে; তিনি দাবী করেন, তিনি নবী। আমাকে নিয়া তাঁহার নিকট চল: তাঁহার পূর্ণ তথ্য অবগত হইব; প্রকৃতই যদি তিনি নবী হইয়া থাকেন তবে তাহা আমাদের চোখে লুক্কায়িত থাকিবে না—প্রকাশ পাইয়া যাইবেই; আমরা তাঁহার অনুসরণ মানিয়া লইব। আর যদি ঐ দাবীর বিপরীত কিছু হয় তাহাও উপলব্ধি করিতে পারিব। বন্ধু কায়স তাঁহার কথায় সারা দিল না, তবুও তিনি একাই যাত্রা করিলেন এবং নবীজীর দরবারে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

(৩) জরীর ইবনে আবদুল্লাহ, তিনি ইয়ামনের বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নবীজীর দরবারে পৌঁছিয়া উপস্থিত একজন লোক মারফৎ জ্ঞাত হইলেন যে, নবীজী (দঃ) তাঁহার উপস্থিতির পূর্ব্বেই তাঁহার আলোচনায় ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন যে, অবিলম্বেই এই দরওয়াজা দিয়া ইয়ামনের এক উত্তম ব্যক্তি তোমাদের নিকট উপস্থিত হইবেন।

জরীর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবীজীর মজলিসে পৌঁছিলে পর নবীজী (দঃ) আমার নিকট এক ব্যক্তিকে পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জরীর! কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন? আমি উত্তর করিলাম, আপনার হস্তে ইসলাম গ্রহণ উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। তখন নবীজী (দঃ) আমার জন্য একখানা কম্বল বিছাইয়া দিলেন এবং লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া (একটি সুন্দর আদর্শ শিক্ষাদানে) বলিলেন, তোমাদের নিকট কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসিলে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে তৎপর হইবে। অতঃপর নবীজী (দঃ) আমাকে কতিপয় বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাইলেন— (১) মনে-মুখে ঘোষণা দেওয়া যে, আল্লাহ্ ভিন্ন কোন মাবুদ নাই এবং আমি—মোহাম্মদ আল্লার রসুল। (২) আল্লার প্রতি, পরকালের প্রতি এবং ভাল-মন্দ তকদীরের প্রতি ঈমান স্থাপন করা। (৩) নামায পড়া (৪) যাকাত দান করা। আমি নবীজীর আহ্বানের প্রত্যেকটি বস্তু বরণ ও গ্রহণ করিলাম।

নবীজী (দঃ) আমার প্রতি এতই অমায়ীক ও সদয় ছিলেন যে, আমাকে তিনি যখনই দেখিতেন আমার প্রতি দৃষ্টি দান করিয়া মুচকি হাসি হাসিতেন।

(৪) ওয়াএল ইবনে-হুজ্‌র, তিনি ইয়ামনের রাজবংশীয় একজন ছিলেন, আরব সাগরের উপকূলবর্ত্তীয় হায্‌রামউত এলাকার একজন বিশিষ্ট জমিদার ছিলেন। তাঁহার আগমনের পুর্ব্বেই নবী (দঃ) ছাহাবীগণকে তাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী শুনাইয়াছিলেন। তিনি পৌঁছিলে নবী (দঃ) তাঁহাকে স্বাগত জানাইয়া নৈকট্যদানে তাঁহাকে নিজের অতি নিকটে বসাইয়াছিলেন এবং তাঁহার বসিবার জন্য চাদর বিছাইয়া দিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ও তাঁহার বংশধরের জন্য মঙ্গল ও কল্যাণের বিশেষ দোয়া করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সমগ্র হায্‌রামউত এলাকার জমিদারদের প্রধান নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে মোয়াবিয়া (রাঃ) ছাহাবীকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

একটি চমকপ্রদ বিষয়ঃ—ওয়াএল (রাঃ) রাজবংশীয় লোক, সবে মাত্র মোসলমান হইয়াছেন; সেই যুগের ও পরিবেশের বংশীয় উগ্রতা মন-মগজ হইতে মুছিতে কিছু বিলম্ব অবশ্যই হইবে। মোয়াবিয়া (রাঃ) তাঁহার সঙ্গেই আছেন, তিনি পায়ে হাটিয়া চলিতেছেন। রৌদ্রের উত্তাপে যখন মরুভূমির পথ উত্তপ্ত হইয়া গিয়াছে তখন মোয়াবিয়া (রাঃ) তাঁহার নিকট পথের উত্তাপের অভিযোগ করিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, আমার উটের ছায়ায় চলিতে থাকুন। মোয়াবিয়া (রাঃ) বলিলেন, তাহাতে কষ্টের কি লাঘব হইবে? আপনি আমাকে আপনার বাহনের পেছনে বসাইয়া নিলে ভাল হয়। ওয়াএল (রাঃ) তাঁহাকে উত্তরে বলিলেন, চুপ থাকুন; রাজবংশীয় লোকদের সহিত এক বাহনে বসিবার মর্য্যাদা আপনার নাই।

যুগের পরিবর্ত্তন! এই মোয়াবিয়া (রাঃ) পরবর্ত্তীকালে আমীরুল-মোমেনীন খলীফাতুল-মোসলেমীন হইলেন; তখনও ওয়াএল (রাঃ) জীবিত আছেন। তিনি

একবার মোয়াবিয়া রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সাক্ষাতে আসিলেন; মোয়াবিয়া (রাঃ) তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। তিনি তাঁহাকে স্বাগত জানাইয়া নিজের নিকটেই বসাইলেন না শুধু, বরং তাঁহাকে নিজের আসনে নিজের সঙ্গে বসাইলেন এবং বহু মুল্যবান উপহার তাঁহার নিকট পেশ করিলেন। ওয়াএল (রাঃ) নিজেই বলেন, আমি তখন (লজ্জিত হইয়া) মনে মনে ভাবিতে ছিলাম, ঐ দিন যদি আমি তাঁহাকে আমার বাহনে আমার অগ্রভাগে বসাইতাম!

৫। যেয়াদ-ইবনে-হারেছ-ছুদায়ী, তিনি তাঁহার গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিলেন। অতঃপর আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার গোত্রের প্রতি সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হইয়াছে, হুজুর এখনই সৈন্যবাহিনী ফেরত আনিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন; আমার গোত্রের ইসলাম ও আনুগত্য সম্পর্কে আমি জামিন থাকিলাম। নবীজী বলিলেন, তুমি যাও এবং আমার পক্ষ হইতে সৈন্যবাহিনীকে ফিরাইয়া নিয়া আস। আমি আরজ করিলাম, আমার বাহনটি অতিশয় পরিশ্রান্ত; সেমতে নবীজী অন্য ব্যক্তিকে পাঠাইয়া সৈন্যবাহিনী ফেরত নিয়া আসিলেন।

অতঃপর আমি আমার গোত্রের নিকট পত্র লিখিয়া দিলাম; অবিলম্বে সমগ্র গোত্রের পক্ষ হইতে তাহাদের ইসলাম ও আনুগত্যের সংবাদ লইয়া প্রতিনিধিদল নবীজীর নিকট উপস্থিত হইল। এতদৃষ্টে রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার গোত্র ত তোমার খুবই অনুগত। আমি বলিলাম, আল্লাহ তায়ালাই তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছেন। নবীজী বলিলেন, তোমাকেই তোমার গোত্রের শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিব; এই মর্ম্মে নিয়োগপত্ররূপে একখানা লিপিও তিনি আমাকে প্রদান করিলেন। আমি আরজ করিলাম, আমার ব্যয় বহনের জন্য তাহাদের ছদকা ভাণ্ডার হইতে কিছু অংশ গ্রহণের অনুমতি দিন। সেই মর্ম্মেও তিনি আমাকে একখানা লিপি লিখিয়া দিলেন।

ইতিমধ্যেই এক এলাকার লোকগণ আসিয়া নবীজীর নিকট তাহাদের শাসনকর্ত্তা সম্পর্কে অভিযোগ করিল যে, তিনি অতীতের আক্রোশে আমাদেরকে উৎপীড়ন করেন। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ঈমানদার লোকের জন্য শাসনক্ষমতায় উপকার নাই। নবীজীর এই কথাটি আমার অন্তরে বিদ্ধ হইয়া রহিল। ইতিমধ্যেই আরও একটি ঘটনা ঘটিল যে, এক ব্যক্তি নবীজীর নিকট সাহায্য প্রার্থী হইল। নবীজী (দঃ) তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিলেন, স্বচ্ছলতা থাকা সত্বেও যে ব্যক্তি অন্যের নিকট চাহিবে উহা তাহার মাথা ব্যাথা ও পেটের পীড়ার (তথা তাহার জন্য ভীষণ যন্ত্রণার) কারণ হইবে। তখন ঐ ব্যক্তি বলিল, আমাকে ছদকার

ভাণ্ডার হইতে কিছু দান করুন। তদুত্তরে নবী (দঃ) বলিলেন, ছদকার জন্য স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা আট শ্রেণীর লোক নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন ; তুমি যদি উহার কোন শ্রেণীভুক্ত হও তবেই তোমাকে দিব। নবীজীর এই কথাটিও আমার অন্তরে বিদ্ধ হইল এবং আমি ভাবিলাম, আমি ত স্বচ্ছল, অথচ ছদকার ভাণ্ডার হইতে অংশ গ্রহণের জন্য আমি নবীজীর অনুমতি-লিপি চাহিয়া লইয়াছি।

এই ভাবনা-চিন্তায় রাত্রি অতিবাহিত করিয়া ফজর নামাযান্তে আমি নবীজীর লিপিদ্বয় লইয়া উপস্থিত হইলাম এবং আরজ করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমি এই উভয় লিপির মর্ম্ম হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করি। নবীজী (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার কারণ তোমার অন্তরে কি উদিত হইয়াছে ? আমি আরজ করিলাম, আপনার এই বাণী আমি শুনিয়াছি—"ঈমানদারের জন্য শাসনক্ষমতায় উপকার নাই ;" আমি ত আল্লাহ এবং রসুলের প্রতি ঈমান রাখি। আপনার এই বাণীও শুনিয়াছি—"স্বচ্ছলতা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি অন্যের নিকট চাহিবে উহা তাহার জন্য মাথার ব্যাথা ও পেটের পীড়ার কারণ হইবে ;" আমি স্বচ্ছল হইয়াও আপনার নিকট চাহিয়াছি।

নবীজী (দঃ) বলিলেন, আমি যাহা বলিয়াছি তাহা বাস্তবই ; অতএব তুমি সেমতে চিন্তা করিয়া হয় গ্রহণ কর না হয় ত্যাগ কর। আমি আরজ করিলাম যে, আমি ত্যাগ করিলাম। নবীজী (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহাকে গোত্রীয় প্রধান নিযুক্ত করিব তাহা তুমি বলিয়া দাও। আমি প্রতিনিধিদলে আগন্তুকদের মধ্য হইতে একজনের নাম প্রস্তাব করিলাম ; তিনি তাঁহাকেই গোত্রপ্রধান নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

অতঃপর আমি আরজ করিলাম, আমাদের গোত্রে একটিমাত্র কূপ রহিয়াছে ; বর্ষাকালে উহার পানি আমাদের জন্য যথেষ্ট হয় ; কিন্তু গ্রীষ্মকালে যথেষ্ট হয় না ; পানির জন্য আমাদের অন্যত্র যাইতে হয়। এখন আমরা মোসলমান ; চতুষ্পার্শ্বস্থ গোত্র অমোসলেম, তাহারা আমাদিগকে পানি দিবে না। নবী (দঃ) আমাকে বলিলেন, সাতটি কাঁকর নিয়া আস ; তিনি সেই কাঁকরগুলি নিজ হস্তে মর্দন করতঃ উহাতে দোয়া করিলেন এবং আমাকে বলিলেন, এই কাঁকরগুলি নিয়া যাও ; এক একটি কাঁকর আল্লার নাম জপন পূর্ব্বক কূপে ফেলিয়া দিবে। আমরা তাহাই করিলাম ; তখন হইতে সর্ব্বদা আমাদের কূপে এত অধিক পরিমাণ পানি থাকিত যে, কোন সময়ই উহার তলা দেখা সম্ভব হইত না।

(৬) তারেক ইবনে আবদুল্লাহ, তিনি নবীজী (দঃ)কে নবুয়তের প্রথম জীবনে একবার অতি করুণ অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়াছেন—আমি "জুল-মজায" নামক আরবের প্রসিদ্ধ মেলা বা হাটে দাঁড়াইয়াছিলাম। তথায় দেখিলাম, একজন লম্বা জুব্বাধারী লোক এই আহ্বান করিয়া বেড়াইতেছেন—"হে মানবগণ। সকলে বল, আল্লাহ এক—অদ্বিতীয়, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই ;

তাহা হইলে তোমরা সাফল্য লাভ করিবে।" সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিলাম যে, আর একটি লোক তাঁহার পেছনে পেছনে তাঁহার প্রতি পাথর ছুড়িয়া মারিতেছে এবং বলিতেছে, সাবধান! কেহ ইহার কথা শুনিও না সে মহামিথ্যাবাদী।

আমি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, এই ব্যক্তি কে? লোকেরা বলিল, আহ্বানকারী ব্যক্তি হইলেন—হাশেম বংশের একজন সুপুরুষ যিনি নিজকে আল্লার প্রেরিত রসুল বলিয়া থাকেন। আর দ্বিতীয় লোকটি তাঁহারই পিতৃব্য আবদুল-ওয্‌যা—আবুলহব।

এই ঘটনার পর দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হইয়াছে—বহু লোক মোসলমান হইয়াছে এবং মক্কা হইতে মোসলমানগণ সকলেই হিজরত করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। এই সময় আমরা আমাদের বস্তি "রাবাজা" হইতে কতিপয় লোক খেজুর ক্রয়ের জন্য মদিনা যাত্রা করিলাম। মদিনার বাগ-বাগিচার নিকটবর্ত্তী হইয়া আমরা বিশ্রাম করিবার এবং ময়লা কাপড় বদলাইবার জন্য অবতরণ করিলাম। এই সময় এক চাদর পরিধানে আর এক চাদর গায়ে একজন লোক আমাদের নিকট আসিয়া সালাম করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কাফেলাটি কোথ হইতে আসিয়াছে, আর কোথায় যাইবে? আমরা বলিলাম, রাবাজা হইতে আসিয়াছি মদিনায় যাইব। উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, খাদ্য ক্রয়ের জন্য যাইব।

কাফেলায় একজন মহিলাও ছিল, আর আমাদের সঙ্গে বিক্রির জন্য একটি লাল রঙ্গের উট ছিল। আগন্তুক লোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন, উটটি বিক্রি হইবে কি? আমরা বলিলাম, হাঁ—এই পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি হইবে। লোকটি সেই মূল্য সম্পর্কে কোন রূপ কাটাকাটি না করিয়া উটের নাশারজ্জু ধরিলেন এবং উট লইয়া চলিয়া গেলেন। লোকটি উট লইয়া আমাদের দৃষ্টির আড়াল হইতেই আমাদের চৈতন্য হইল—উট ক্রেতা আমাদের পরিচিত নহেন, আর মূল্য না লইয়া তাঁহাকে উট দিয়া দিলাম! আমাদের সঙ্গী মহিলাটি বলিল, চিন্তার কোন কারণ নাই, লোকটি নূরানী চেহারার—তাঁহার মুখমণ্ডল যেন পূর্ণিমা-চাঁদ। এই লোক প্রতারক হইবেন না; উটের মূল্যের জন্য আমি দায়ী থাকিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং প্রথমে নিজ পরিচয় দিলেন যে, আমি তোমাদের বিশ্বমানবের প্রতি আল্লার প্রেরিত রসুল। অতঃপর বলিলেন, এই নেও খেজুর; ইহা হইতে তোমরা সকলে পেট পুরিয়া খাও, অতঃপর তোমাদের প্রাপ্য উটের বিনিময় পূর্ণ ওজন করিয়া নেও। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

আমরা যথা সময় মদিনা নগরে গমন করিয়া মসজিদের নিকটে উপস্থিত হইলাম। তথায় দেখি—সেই লোকটি মসজিদের মেম্বারে দাঁড়াইয়া জনমণ্ডলীকে উপদেশ দিতেছেন। আমরা শেষের এই কথা কয়টি শুনিতে পাইয়াছিলাম—

"হে লোক সকল। অভাবগ্রস্ত কাঙ্গালদেরে দান কর, ইহা তোমাদের পক্ষে বিশেষ কল্যাণজনক। স্মরণ রাখিও, উপরের তথা দাতার হাত নীচের তথা গ্রহীতার হাত হইতে উত্তম। পিতা মাতা, ভাই ভগ্নি ও অন্যান্য স্বজনবর্গের প্রতিপালন করিবে।"

ইতিমধ্যেই মদিনার একজন মোসলমান উপস্থিত হইয়া আমাদের উপর এক মস্ত বড় অভিযোগ চাপাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ। এই কাফেলার লোকদের গোষ্টির উপর পুর্ব আমলের একটি খুনের দাবী আমাদের রহিয়াছে। অন্ধকার যুগের রীতি ছিল, হত্যাকারী হইতে প্রতিশোধ লওয়া না হইলে তাহার গোষ্ঠি ও গোত্র হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইত।

রসুলুল্লাহ (দঃ) সেই অভিযোগ নাকচ করিয়া দিয়া বলিলেন, পিতা পুত্রের অপরাধে বা পুত্র পিতার অপরাধে প্রতিশোধ গ্রহণের পাত্র হইবে না; (দূর সম্পর্কীয়দের ত কোন কথাই নাই।)

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এইরূপ মহানুভবতা ও অমায়িক ব্যবহারেও আকৃষ্ট হইয়া তারেক ইবনে আবদুল্লাহ ও তাঁহার সঙ্গীদের ন্যায় বহু লোক ইসলামের ছায়ায় স্থান গ্রহণ করিয়া ছিলেন। (উল্লেখিত সমুদয় ঘটনা বেদায়াহ, ৪৭০ × ৪৮৬ হইতে অনুদিত।)

মোসলমানদের স্বাধীন মক্কায় প্রথম হজ্জ

আবুবকরের নেতৃত্বে হজ্জ যাত্রা (৬২৬ পৃঃ)

অনেকের মতে নবম হিজরীর প্রথম দিকেই, কাহারও মতে আরও অনেক পূর্ব্বেই হজ্জ ফরজ হওয়ার বিধান আসিয়া গিয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্বে ত মোসলমানদের জন্য মক্কায় হজ্জ করিতে যাওয়া সহজ-সাধ্য ছিল না, আর নবম হিজরীতে নবীজীর জন্য হজ্জ সমাপনে কোন বিশেষ অসুবিধা ছিল। অনেকের মতে হজ্জ ফরজ হওয়ার বিধান নবম হিজরীর সর্ব্বশেষ দিকে আসিয়াছে, কিন্তু সাধারণভাবে হজ্জ করার নিয়ম পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল, সেমতে নবী (দঃ) শুধু সাধারণ নিয়মানুসারে মোসলমান হাজীদের নেতৃত্ব দানে আবুবকর (রাঃ)কে মনোনীত করিলেন। সেমতে তিনশত মোসলমানের কাফেলা আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নেতৃত্বে নবম হিজরীর হজ্জ সমাপনে যাত্রা করিয়াছিল। এই হজ্জে নবীজী (দঃ) অংশ গ্রহণ করে নাই, কিন্তু মক্কাস্থ মিনায় কোরবানী দেওয়ার জন্য বিশটি উট নবী (দঃ) আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বেদায়াহ, ৪—৩৯

আনুষ্ঠানিকরূপে পরিচালিত ও নবীজী (দঃ) কর্ত্তৃক প্রেরিত হাজীকাফেলা স্বাধীন মক্কায় সর্ব্বপ্রথম ইহাই ছিল। অবশ্য অষ্টম হিজরীর হজ্জ মওসুমের

পূর্ব্বেই রমজান মাসে মক্কা বিজয় সম্পন্ন হইয়াছিল এবং ঐ বৎসরও মোসলমান-মোশরেক সম্মিলিতভাবের হজ্জ আদায় করা হইয়াছিল। তখন নবীজী (দঃ) কর্ত্তৃক মক্কার গভর্ণররূপে আত্তাব-ইবনে-আসীদ (রাঃ) ছিলেন। পদাধিকার বলে তিনিই ঐ বৎসর মোসলমান হাজীগণের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন (যোরকানী, ৩—৯৪)।

কিন্তু ঐ বৎসরের হজ্জ শুধু গতানুগতিক প্রথারূপের ছিল ; উহার কোন ব্যবস্থাই নবীজী (দঃ) কর্ত্তৃক আনুষ্ঠানিকরূপে পরিচালিত ছিল না—যেরূপ ছিল নবম হিজরীতে আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নেতৃত্বের হজ্জ।

অষ্টম হিজরী সনে মক্কা ও উহার পার্শ্বস্থ সমুদয় এলাকার বিজয় দ্বারা আল্লাহ তায়ালা ইসলাম ও মোসলমানদের পূর্ণ শক্তি-সামর্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। তাই এখন আল্লাহ তায়ালার আর একটি বিশেষ আদেশ—

قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَّيَكُونَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلَّهِ

"কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাও যাবত না আল্লার দ্বীনে বাধা দানের শক্তি রহিত হইয়া যায় এবং সর্ব্বত্র আল্লার দ্বীনের প্রাবল্য প্রতিষ্ঠিত হয়"।

এই আদেশ বাস্তবায়ন পরিকল্পনার কাজে বিশেষ তৎপরতার সহিত অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। সেমতে অষ্টম হিজরীতে শক্তি-সামর্থ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই নবম হিজরী সনে উক্ত পরিকল্পনার কাজ দ্রুতগতিতে চালানো হয়। নবম হিজরীর হজ্জ পর্য্যন্ত কাফেরদের জন্য সাধারণ সুযোগ ভোগের অবকাশ ছিল। যথা—

(১) কাফেররাও মোসলমানদের সহিত একত্রে হজ্জ করিত।

(২) হজ্জ করায় কাফেররা তাহাদের গর্হিত নীতি যেমন, উলঙ্গ হইয়া তওয়াফ করা পালন করিয়া যাইত।

(৩) অনেক অনেক গোত্রের সহিত রসুলুল্লাহ (দঃ) অনির্দিষ্টকাল বা নির্দিষ্টকালের জন্য "যুদ্ধ নয় চুক্তি" সম্পাদন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহারা ইসলামের সম্মুখে নতি স্বীকার ছাড়াই সর্ব্বত্র পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া যাইত।

(৪) কাফেররা সমগ্র আরবে, এমনকি পবিত্র হরম-শরীফেও নির্ব্বিবাদে বসবাস এবং স্বাধীনভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইত।

৩ এবং ৪ নম্বরের সুযোগ ইসলামের প্রাবল্য ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ক্ষতিকর ও আশঙ্কার বস্তু ছিল। কারণ, পবিত্র হরম শরীফ ইসলাম-বিদ্রোহীদের সর্ব্বপ্রধান ঘাটি ছিল, অতএব তথা হইতে ইসলামদ্রোহীদের নাম-নিশান চিরতরে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলা একান্ত কর্ত্তব্য। আর সমগ্র আরবই ইসলামের কেন্দ্র ও রাজধানীরূপ ; তথা হইতেও ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে ইসলামদ্রোহীদের উচ্ছেদ প্রয়োজন। এই কর্ত্তব্য ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার তরফ

হইতে এক বিরাট বলিষ্ঠ সুদীর্ঘ ঘোষণা পবিত্র কোরআনের ত্রিশটি আয়াতরূপে অবতীর্ণ হয়। উক্ত আয়াতসমূহের তেজস্বী সুর ও কঠোর ভাষার প্রভাব-প্রতাপই কাফের-মোশরেকদেরে ভীত সন্ত্রস্ত ও কম্পমান করিয়া তুলিতে এবং আভ্যন্তরীণ শত্রু মোনাফেক ও বাহিরের লোলুপ শক্তিগুলিকে চিরতরে নিরাশ ও নিস্তব্ধ করিতে যথেষ্ট ছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۤ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّاعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ - وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۤ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهٗ......

"যে সব মোশরেকদের সহিত সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত রহিয়াছে তাহাদের প্রতি আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের পক্ষ হইতে সমুদয় চুক্তি বাতিলের সুস্পষ্ট ঘোষণা জারি করা হইতেছে। (আর যাহাদের সঙ্গে কোন চুক্তি নাই তাহাদের প্রশ্নত আরও সুস্পষ্ট। উভয় শ্রেণীর কাফেরদের প্রতি চরমপত্র—) তোমরা এই দেশে আর শুধু চার মাস অবাধে চলাফেরার সুযোগ ভোগ করিতে পারিবে। (ইসলাম ন্যায়ের ধর্ম্ম; সুযোগ দিয়াছে। ইতিমধ্যে তোমরা হয় ইসলামের নিকট আত্ম-সমর্পণ না হয় এই দেশ ত্যাগ কর।) তোমরা জানিয়া রাখ—তোমরা (আল্লার রসুলকে তথা) আল্লাহকে হার মানাইতে পারিবে না। এবং নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরে পদদলিত করিবেন।

আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের পক্ষ হইতে মহান হজ্জের দিনে সর্ব্ববৃহৎ জনসমাবেশ সমক্ষে দৃঢ় কণ্ঠের ঘোষণা জারি করা হইতেছে যে—আল্লাহ এবং আল্লার রসুল মোশরেকদের হইতে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত। অবশ্য যাহাদের সঙ্গে নির্দ্ধারিত সীমিত সময়ের চুক্তি রহিয়াছে এবং তাহারা কোন প্রকারে চুক্তি ক্ষুন্ন করে নাই তাহাদের জন্য চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত সুযোগ বহাল থাকিবে। এই কথাটি মাত্র ঐ শ্রেণীর জন্য যাহাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হইয়া অচিরেই আপনা আপনিই সুযোগ রহিত হইয়া যাইবে। অন্য সব কাফের মোশরেকদের সম্পর্কে মোসলমান-দিগকে কড়া নির্দ্দেশ দিয়া দেওয়া হইল এই যে—

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ

وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ

وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ - فَإِنْ تَابُوا

وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ

فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ........

"কাফেরদের জন্য প্রদত্ত সুযোগের চারটি মাস—যে সময় তাহাদেরে আক্রমণ করা নিসিদ্ধ ; এই চারিটি মাস অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়ার পরই মোশরেকদেরে (এই দেশে) যথায় পাও হত্যা কর, তাহাদেরে পাকড়াও কর, তাহাদেরে ঘেরাও কর এবং তাহাদেরে ঘায়েল করার প্রতিটি সুযোগের তাকে লাগিয়া থাক। হাঁ—যদি তাহারা কুফুরী-শেরেকী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং নামাজ কায়েম করে, এবং যাকাত দান করে তবে তাহাদেরে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান কর।
(১০ পাঃ ছুরা তওবা)

অনেকের মতে আবুবকর (রাঃ) যাত্রা করিয়া যাওয়ার পর এই তেজালো ঘোষণা ও চরমপত্রের আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হয়। আর কাহারও মতে পূর্ব্বেই অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং হয়ত মিনায় বৃহত্তম সমাবেশে ইহার ঘোষণার জন্য নবীজী আবুবকর (রাঃ)কে বলিয়াও দিয়াছিলেন। কিন্তু আবুবকর (রাঃ) যাত্রা করিয়া যাওয়ার পর রাষ্ট্রিয় চুক্তি বাতিল ঘোষণার গুরুত্ব প্রদর্শনে আন্তর্জাতিক বিধি মোতাবেক রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যক্তিগত বিশেষ দূতরূপে নবীজী (দঃ) নিজস্ব বাহন "আজবা" উষ্ট্রীর উপর ছওয়ার করিয়া আলী (রাঃ)কে ঐ ঘোষণা আবৃত্তির জন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিলেন। আল্লার ঘর—কা'বার নগরী মক্কাকে মুল কেন্দ্র করিয়া সমগ্র আরবকে ইসলামের কেন্দ্ররূপে গড়িয়া তোলার বাস্তব পদক্ষেপে নবীজী অগ্রসর হইলেন এবং পরিকল্পনা করিলেন যে—(১) আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে কাফের-মোশরেকদের কোন সম্পর্ক নাই, সেই সম্পর্কের একমাত্র অধিকারী মোমেন-মোসলমানগণ—ইহা সুস্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। (২) আল্লার ঘর কা'বা শরীফকে অন্ধকার যুগের কুফুরী রীতি-নীতি হইতে পূর্ণ পাক-পবিত্র করা হইবে। (৩) মক্কার এলাকাকে এখন হইতেই চিরতরে কাফের-মোশরেক হইতে মুক্ত রাখার সুব্যবস্থা করা হইবে। (৪)সমগ্র আরবকে ঈমান-ইসলামের পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্ররূপে রূপায়িত করার জন্য তথা হইতে উহার বিরোধী সকলকে ধাপে ধাপে উচ্ছেদ করিতে হইবে ; যেন ভিতরে থাকিয়া ইসলামের ক্ষতি সাধনের ষড়যন্ত্র করিতে সুযোগ না পায়। এই চারিটি উদ্দেশ্যের

বাস্তবায়নে রসুলুল্লাহ (দঃ) চারিটি নির্দ্দেশ দিয়া উহার ঘোষণার জন্য তাঁহার ব্যক্তিগত বিশেষ দূতরূপে আলী (রাঃ)কে প্রেরণ করিলেন। ঘোষণা চারিটি এই—

(১) মোমেন ব্যতীত অন্য কেহ বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে না। (২) কোন উলঙ্গ ব্যক্তি কা'বা শরীফের তওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করিতে পারিবে না। (৩) এই বৎসরের পরে আর কোন কাফের-মোশরেক হজ্জ করিতে পারিবে না। (৪) বিশেষ ঘোষণা পবিত্র কোরআন ১০ পারা ছুরা-তওবা বা বরাআতের প্রথম আয়াত সমূহ— যাহাতে মোশরেকদের সহিত সম্পাদিত চুক্তি বাতিলের ঘোষণা এবং চার মাসের মধ্যে হরম শরীফ হইতে, বরং সমগ্র আরব হইতে মোশরেক-পৌত্তলিকদের দেশ ত্যাগ করার আদেশ ছিল। আরবের মোশরেকদেরে সতর্ক করণও ছিল যে, ইসলাম গ্রহণ কর, না হয় আরব দেশ ত্যাগ কর, অন্যথায় হত্যা, বন্দী বা ঘেরাও-এর সম্মুখীন হওয়ার তথা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। (আছাহ ৪৪৫)

৩ নং আদেশটিও বস্তুতঃ পবিত্র কোরআনের ঐ ছুরা তওবারই সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ

الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا

"হে মোমেনগণ। নিশ্চয় মোশরেকরা হইতেছে অপবিত্রই অপবিত্র, সুতরাং তাহারা যেন এই বৎসর হজ্জের পরে আর হরম শরীফ-মসজিদের নিকটেও আসিতে না পারে।"

এই চারিটি আদেশ লইয়া নবীজীর ব্যক্তিগত বাহন "আজবা" উষ্ট্রীর উপর আরোহণ পূর্বক আলী (রাঃ) যাত্রা করিলেন। আবুবকর (রাঃ) মদিনা হইতে সত্তর মাইলেরও অধিক অতিক্রম করিয়া "আরজ" নামক জায়গায় পৌঁছিলে আলী (রাঃ) দ্রুত যাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। আবুবকর (রাঃ) ফজরের নামায আরম্ভ করার জন্য দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় নবীজীর বাহন "আজবা" উষ্ট্রীর আওয়ায তিনি ঠাহর করিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, হয়ত আমার যাত্রার পরে নবীজীর হজ্জে আগমনের ইচ্ছা হইয়াছে, তাই তিনি আসিয়াছেন। অতঃপর যখন আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সাক্ষাৎ পাইলেন তখন আবুবকর (রাঃ) তাঁহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, উপরস্থ হইয়া আসিয়াছেন, না অধীনস্থ ? আলী (রাঃ) উত্তর করিলেন, আপনার অধীনস্থ হইয়াই আসিয়াছি। রসুলুল্লাহ (দঃ) আমাকে পাঠাইয়াছেন সন্ধিচুক্তি বাতিলের ঘোষণা শুনাইবার জন্য।

সেমতে আবুবকর (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) উভয়ে একত্রে চলিতে লাগিলেন। হজ্জ পরিচালনার সম্পূর্ণ নেতৃত্ব আবুবকর (রাঃ)ই প্রদান করিলেন; আলী (রাঃ)

১০ই জিলহজ্জ মিনার মধ্যে জামরা-আকাবার নিকটে জনমণ্ডলীর বৃহত্তম সমাবেশের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নবী (দঃ) প্রদত্ত ঘোষণাসমুহের প্রচার করিয়া যাইতে লাগিলেন। আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই কার্য্যে তাঁহার সাহায্যার্থে অন্যদেরকেও যেমন--আবুহোরায়রা (রাঃ)কেও আবুবকর (রাঃ) নিয়োগ করিয়াছিলেন (১ম খণ্ড ২৪৫ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)।

হজ্জ সমাপনান্তে আবুবকর (রাঃ) মদিনায় পৌছিয়া নিজ অন্তরের একটি ভীতি দূর করনার্থে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার প্রতি কোন অভিযোগে আল্লার আদেশ অবতীর্ণ হইয়াছিল কি? নবী (দঃ) তদুত্তরে বলিয়া-দিলেন, না—তবে আমি ভাল মনে করিয়াছিলাম যে, আন্তর্জাতিক সন্ধিচুক্তি বাতিলের ঘোষণাটা আমার ব্যক্তিগত নিজস্ব লোক মারফত হউক (আছাহ, ৫৪৭)। অর্থাৎ শুধু উক্ত নিয়ম অনুসরণে আলী (রাঃ)কে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

হিজরী দশম বৎসর

মোসলমানদের পরম আনন্দ ও ইসলামের চরম গৌরবের বৎসর

ইসলামের প্রতি সম্ভাব্য হুমকীসমূহ দমাইতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অভিযান পূর্ণ সফলতা লাভ করিয়াছে। বহির্বিশ্বের সর্ব্ববৃহৎ শক্তি রোমানরা নবম হিজরীতে মদিনার প্রতি দুই লক্ষ সৈন্য লইয়া বৃহত্তম অভিযানের শুধু পরিকল্পনা করিয়াছিল; খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবীজী (দঃ) চল্লিশ হাজার আত্মোৎস্বর্গকারী ভক্তবৃন্দকে লইয়া দীর্ঘ ৩০০ মাইল পথ অতিক্রম করতঃ রোমানদের নাকের উপর তবুক নামক এলাকায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় ক্যাম্প করিয়া বিশ দিন অবস্থান করিলেন। শত্রুদের মনোবল একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল; সীমান্তে সমাবেশিত শত্রু সৈন্য সীমান্ত হইতে পশ্চাদপদ হইয়া গেল। মদিনা আক্রমণ করার সাধ তাহাদের চিরতরে মিটিয়া গেল, অধিকন্তু তাহাদের উপর এবং সমগ্র এলাকার উপর মোসলেম বাহিনীর পূর্ণ প্রভাব জগদ্দল পাথররূপে চাপিয়া গেল। এমনকি রোম সীমান্তে আরবদের যে সব দেশীয় রাজ্য দীর্ঘ দিন হইতে রোম সম্রাটের আশ্রিত ও অনুগত ছিল এবং যে সব গোত্র রোম সম্রাটের পক্ষাবলম্বী ছিল সকলেই ইসলামী রাষ্ট্রের করতলে আসিয়া গেল, মোসলমানদের করদ রাজ্যে পরিণত হইয়া গেল। এইভাবে রোম সীমান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত এলাকাকে মদিনার শাসনে আনয়ন পূর্ব্বক গোটা আরব উপদ্বীপের উপর ইসলামের কর্তৃত্ব পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তবুক অভিযানে যুদ্ধ না করিয়া চরম বিজয় লাভে নবীজী মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

নবীজীর এই রাজনৈতিক চরম বিজয়ে আরবের মুমূর্ষ কুফুরী শক্তি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগে বাধ্য হইল। মক্কা ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী এলাকাসমূহের চরম বিজয়ে আরবে শেরেক ও কুফুরী শক্তির কোমর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; বহিশক্তির সাহায্যে সোজা হইয়া দাঁড়াইবার যে দুরাশা আরবের কাফের-মোশরেকদের ছিল তবুক অভিযানের ফলাফল উহা হইতেও তাহাদিগকে চিরতরে নিরাশ করিয়া দিল। এখন ইসলাম সত্য সত্যই বলিষ্ঠ ও বিজয়ী; ইসলামের বিজয়ধ্বনিতে সমগ্র বহির্বিশ্ব প্রকম্পিত এবং উহার জয়জয়কারে আরব উপদ্বীপের আকাশ-বাতাস মুখরিত; দীর্ঘ দশ বৎসরের যুদ্ধের সকল সীমান্তই এখন নীরব। ২৩ বৎসরকাল ধরিয়া চতুর্দিকে যেই আগুন দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল ধীরে ধীরে তাহা নিভিয়া গিয়াছে। উহার ধুম্রজালের বাদল কাটিয়া গিয়া সমগ্র আরব উপদ্বীপের আকাশে ইসলামের পূর্ণিমা-চাঁদ উদিত হইয়াছে এবং সেই আলোকে আলোকিত হইয়াছে উহার চতুর্দিক। তাই বিদায় নিতে হইয়াছে কুফর ও শের্কের অন্ধকারকে। আকাশ হইতে আলো নামিয়া আসিলে ধরণীর জমাট-বাঁধা অন্ধকারকে নীরবে বিদায় লইতেই হয়।

এদিকে কপট মোনাফেক দলের পরিচালক আবদুল্লাহ-ইবনে উবাইও জাহান্নামে চলিয়া গিয়াছে; তাহার মৃত্যুতে ঘরের ইঁদুর মোনাফেক দলের অবস্থাও কাহিল হইয়া গিয়াছে—এইসব নবম হিজরীর অবস্থা।

ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার পথ নবীজী (দঃ) সুগম করিয়াছেন, ইসলামকে পালন করার বিধি-ব্যবস্থার অনুশীলন এবং শিক্ষাদানও নবীজী (দঃ) পূর্ণ করিয়াছেন। নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি ফরজ-ওয়াজেব এবং হালাল-হারামের শিক্ষাদান ও কার্য্যে রূপায়ন হাতে-কলমে পূর্ণভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন! এখন পূর্ণাঙ্গ ইসলামের শুধু একটি স্তম্ভ—একটি রোক্‌ন বা মহাফরজ যাহা মোসলমানের সারা জীবনে মাত্র একবার করিতে হয় তথা "হজ্জ" উহার অনুশীলন ও বাস্তব রূপায়ন অবশিষ্ট রহিয়াছে। দশম হিজরীতে নবী (দঃ) মোসলমানগণকে সঙ্গে লইয়া এই হজ্জব্রত পালনের ইচ্ছা করিলেন। নবীজী (দঃ)কে দিবালোকে, স্পষ্টভাবে, প্রকাশ্যে, খোলা ময়দানে, মুক্ত পরিবেশে মক্কায়, মিনায়, আরাফায়, মোযদালেফায় এবং এইসব এলাকার পথে পথে ধীর-স্থিররূপে লক্ষাধিক জনতাকে হজ্জের নিয়ম-কানুন কার্য্যতঃ দেখাইতে হইবে। জনতার ভিড়ে, তাহাদের সঙ্গে সর্ব্বদা নবীজীকে মিশিয়া মিশিয়া থাকিতে হইবে। তাই নবীজীর নিরাপত্তার বাহ্যিক ব্যবস্থা জোরদার হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন নবম হিজরীর বিশেষ ঘোষণাবলীতে পূর্ণ ও সুন্দররূপে মিটিয়া গিয়াছে। সমগ্র হরম এলাকা হইতে কাফের-মোশরেকদের প্রতিটি প্রাণীর উৎখাত সাধিত হইয়াছে, হরম এলাকায় কাফের-মোশরেকের পা রাখাও নিষিদ্ধ

হইয়াছে। হজ্জ উদযাপনে কাফের-মোশরেক একটি প্রাণীও নাই; তাহাদের হজ্জে অংশ গ্রহণ চিরতরে নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। নবীজীর নিরাপত্তার এই বাহ্যিক সুব্যবস্থা সম্পন্ন করার প্রয়োজনও বহু কারণের একটি কারণ ছিল নবীজীর হজ্জ উদযাপন দশম হিজরী পর্যন্ত পিছাইয়া যাওয়ার।

হজ্জের সময় উপস্থিতির বহু পূর্ব্বেই সর্বত্র প্রচার করা হইল, এই বৎসর নবীজী মোস্তফা (দঃ) হজ্জব্রত পালন করিতে যাইবেন। সর্বত্র এই প্রচারণায় অগণিত জনসমুদ্রের ঢেউ মদিনাকে ঘিরিয়া ফেলিল। প্রায় দেড় লক্ষ লোকের ভিড়ের মধ্যে চলিতে লাগিল নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের "কাছওয়া" উষ্ট্রি; পথে পথে আরও অনেক লোকই সামিল হইলেন কাফেলায়। অত্যধিক ভিড় এবং পথে পথে সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে, এইরূপ অনেক কারণেই সংখ্যা নির্দ্ধারণকারীদের বর্ণনায় বিভিন্নতা; যাহা এইরূপ ক্ষেত্রে নিতান্তই স্বাভাবিক।

নয় দিন ভ্রমণ করিয়া নবী (দঃ) এই অগণিত মোসলমানগণ সহ মক্কায় পৌছিলেন। আজ পবিত্র মক্কায় এক অভিনব দৃশ্য দেখা দিয়াছে। শুভ্র শ্বেতবর্ণের একখানা চাদর গায়ে একখানা চাদর পরনে—নবীজী (দঃ) এবং ধনী দরীদ্র এমনকি ক্রীতদাস পর্যন্ত এই একই পরিচ্ছদে প্রায় দুই লক্ষ ভক্তের জমাত। সকলেই নগ্ন পদ, নগ্ন মস্তক এবং সকলের মুখে একই 'লাব্বাইক' ধ্বনি।

সর্বাধিক আকর্ষণীয় বিষয় ছিল এই যে, এই মক্কার ভূমিতে যাঁহারা ছিলেন উপেক্ষিত উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত তাঁহারাই প্রায় দুই লক্ষ সংখ্যায় আজ মক্কাকে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। পবিত্র কা'বার তওয়াফ ও ছাফা-মারওয়ার পরিক্রম ইত্যাদি অনুষ্ঠানে আজ তাঁহারাই। তাঁহাদের অত্যাচার উৎপীড়ণকারীদের নাম-নিশানও আজ মক্কার সমগ্র এলাকায় খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নহে। যেই দেশে নবীজীর কথা বলার অধিকার ছিল না, আজ সেই দেশের আকাশে-বাতাসে ঝংকারিত হইতেছে নবীজীর কত কত অভিভাষণ!

ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার পথ সুগম করিয়াছেন নবীজী (দঃ) এবং ইসলামকে পালন করারও সব নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছেন তিনি। অবশিষ্ট ছিল, শুধু কেবল এই মহান হজ্জব্রত; ইহাও উদযাপিত হইয়া চলিয়াছে মহাসমারোহে। মোসলমানদের এই অভূতপূর্ব্ব মহাসমাবেশে চরম গৌরব ও পরম আনন্দমুখর রাজকীয় পরিবেশে নবীজী (দঃ) কর্ত্তৃক হজ্জ উদযাপনের সাথে সাথে দ্বীন-ইসলাম পরিপুর্ণতা লাভ করিল। এই মুহূর্ত্তেই মোসলেম জাতির জন্য চিরগৌরব ও মহাসুসংবাদ বহন করিয়া পবিত্র কোরআনের এই মহান আয়াতটি অবতীর্ণ হইল—

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

"আজ পূর্ণতা দান করিলাম তোমাদের জন্য দ্বীন-ইসলামকে এবং আমার নেয়ামত বা বিশেষ দান—এই ইসলামকে পূর্ণ পরিণত করিলাম এবং তোমাদের জন্য জীবন-ব্যবস্থা ও ধর্ম্মরূপে ইসলামকেই পছন্দ ও মনোনীত করিলাম।"

এই হজ্জ উপলক্ষে বিশ্ব-শান্তি ও বিশ্ব-কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব-মানবের প্রতি বিশ্ব-নবী মোস্তফা (দঃ) ৯ জিলহজ্জ আরাফার ময়দানে এবং ১০ জিলহজ্জ মিনার বিভিন্ন স্থানে যে সুদীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন উহা শুধু মোসলেম জাতির জন্য নয়, বিশ্ব-মানবের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যই সর্বোত্তম রক্ষাকবচ। দ্বিতীয় খণ্ডে বিদায় হজ্জ পরিচ্ছেদে আমরা ১৮ পৃষ্ঠাব্যাপী সেই মহা অভিভাষণের মূল বিবরণ ও অনুবাদ প্রদান করিয়াছি।

হজ্জের মৌলিক কার্য্যাবলী সমাপনান্তে ১০ জিলহজ্জ বিকালবেলা শয়তানকে কাঁকর মারার মহাসমাবেশে মানবজাতির শান্তি ও নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার ঘোষণার গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ শেষ করিয়া নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জনতার দিকে মুখ করিলেন এবং "বিদায়"! "বিদায়"!! বলিয়া তাহাদের হইতে স্বীয় বিদায় গ্রহণ করিলেন। মূল তত্ত্ব ও মর্ম্ম বুঝিতে বাকি থাকিল না কাহারও; তাই সকলেই নবীজীর এই সমারোহের হজ্জকে "বিদায় হজ্জ" নামে আখ্যায়িত করিল (দ্বিতীয় খণ্ড ৯১০ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)।

বিদায় হজ্জ হইতে মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন ঃ

বিদায় হজ্জ হইতে মদিনায় উপস্থিত হইবামাত্রই নবীজী (দঃ) একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করিলেন। তাঁহার ভাষণটি নিতান্তই সংক্ষিপ্ত ছিল, কিন্তু অত্যন্ত সময়োপযোগী ছিল। মিনায় শেষ ভাষণ সমাপ্তে জনতাকে নবীজী (দঃ) স্বীয় বিদায়ের ইঙ্গিত দিয়া আসিয়াছেন, এখন আর এক ইঙ্গিতের বিশেষ প্রয়োজন যে, তাঁহার বিদায়ের পরে উম্মতের কাণ্ডারী বা কর্ণধার কে হইবেন? সেই বিশেষ প্রয়োজনই মিটাইয়াছেন নবীজী (দঃ) তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত অভিভাষণে। শুধু তাঁহার পরবর্তী কর্ণধারের ইঙ্গিতের উপরই ক্ষান্ত হন নাই তিনি, বরং দীর্ঘ দিন পর্য্যন্ত এই প্রয়োজনের সুরাহা কল্পে পরম্পরা কতিপয় নামের ইঙ্গিতও দিয়াছেন এই ভাষণে। নবীজী মোস্তফা (দঃ) স্বীয় স্নেহাস্পদ উম্মতকে এক ভাষণে নিজ বিদায়ের ইঙ্গিত দানে বিচলিত করিয়া অপর ভাষণে কর্ণধার নির্দ্ধারণে আশ্বস্ত করিয়াছেন এবং তাহাদের কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশও দিয়াছেন।

নবীজী (দঃ) হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনে মদিনায় পৌঁছিয়া সমবেত উম্মতের সম্মুখে মিম্বারে আরোহণ করিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও শোক্‌র আদায় করিয়া বলিলেন—

"হে লোক সকল! আবুবকর কখনও আমার প্রতি কোন ত্রুটি করেন নাই; তাঁহার এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি তোমরা লক্ষ্য রাখিও"।

"হে লোক সকল! আবুবকর, ওমর, ওসমান, আলী, তাল্‌হা, যোবায়র, আবদুর রহমান-ইবনে-আউফ এবং যাঁহারা প্রথমদিকে (—ইসলামের দুর্দিনে ইসলাম গ্রহণ করিয়া) দেশ-খেশ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন—তাঁহাদের প্রতি আমার পূর্ণ সন্তুষ্টি রহিয়াছে। তোমরা তাঁহাদের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিও।

হে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ! আমার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার মর্য্যাদা রক্ষা করিও আমার ছাহাবীগণের বেলায়—বিশেষতঃ যাঁহারা আমার শ্বশুর (যেমন—আবুবকর, ওমর) এবং যাঁহারা আমার দোস্তদার (যেমন, উল্লেখিত গণ্যমান্যগণ)। তোমরা সতর্ক থাকিও—তোমাদের কাহারও যেন আল্লাহ তায়ালার নিকট অভিযুক্ত হইতে না হয় আমার কোন একজন ছাহাবীর প্রতি অশোভনীয় আচরণের দায়ে।

হে লোক সকল! মোসলমানদের গ্লানী প্রচার হইতে বিরত থাকিও এবং তাহাদের মধ্যে যাহার মৃত্যু হয় তাহার প্রতি মন্তব্য করিতে ভাল মন্তব্য করিও।

(বেদায়াহ, ৪—২১৪)

হিজরী একাদশ বৎসর

নবীজীর মহাপ্রয়াণ এবং উম্মতের মহাশোক

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাব, পরিচয় এবং জন্ম ইত্যাদি সম্পর্কে যেরূপ পূর্ববর্ত্তী আসমানী কেতাবে বিবরণ বর্ণিত ছিল তদ্রূপ তাঁহার তিরোধানেরও বিবরণ বর্ণিত ছিল। ঐ সব কেতাবের জ্ঞানীগণ তাহা সম্যক অবগত ছিলেন। যেমন নিম্নে বর্ণিত হাদীছের ঘটনায় উহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে—

১৭১৮। **হাদীছঃ**—(৬২৫ পৃঃ) জরীর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ইয়ামনবাসী দুই বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত আমি সাক্ষাৎ করিলাম—একজন যু-কালা, অপরজন যু-আম্‌র। তাঁহাদের সহিত আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা করিলাম। তাহা শ্রবণে যু-আম্‌র আমাকে বলিলেন, আপনার উদ্দেশ্য ব্যক্তির অবস্থা যদি প্রকৃতই ঐরূপ হইয়া থাকে যাহা আপনি বর্ণনা করিয়াছেন তবে ইতিমধ্যেই তিন দিন পূর্ব্বে তিনি ইহকাল ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর তাঁহারা উভয়ে আমার সঙ্গে মদিনা পানে যাত্রা করিলেন। আমরা তিন জন পথ চলিতে লাগিলাম; পথে একদল লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল—তাহারা মদিনা হইতে আসিয়াছে। তাহাদের নিকট মদিনার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেই তাহারা বলিল, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ইহকাল ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আবুবকর (রাঃ) তাঁহার খলীফা মনোনীত হইয়াছেন, জনগণ

সুশৃঙ্খল রহিয়াছে। এতদশ্রবণে তাঁহারা উভয়ে আমাকে বলিলেন, এখন আমরা মদিনায় যাইতেছি না। আপনি আমাদের সম্পর্কে আবুবকর (রাঃ)কে বলিবেন, আমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি, মদিনার পানে যাত্রা করিয়াছিলাম; (আশা ছিল, নবীজীর পদধুলি লাভ হইবে, কিন্তু ভাগ্যে তাহা জুটিবার নয়।) হয়ত অচিরেই আমরা ইনশা-আল্লাহ তায়ালা পুনঃ মদিনায় আসিতেছি। এই বলিয়া তাঁহারা ইয়ামনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আমি মদিনায় পৌঁছিয়া তাঁহাদের সমুদয় কথাবার্ত্তা আবুবকর (রাঃ)কে জ্ঞাত করিলাম; তিনি অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশে বলিলেন, তাঁহাদেরকে সঙ্গে নিয়া আসিলে না কেন?

অনেক দিন পর যু-আম্‌রের সহিত আমার পুনঃ সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, আমার প্রতি আপনার মস্ত বড় অনুগ্রহ রহিয়াছে; (আপনার মাধ্যমেই আমি ইসলাম লাভ করিতে পারিয়াছি।) তাই আপনাকে একটি সুসংবাদ শুনাই। আপনারা আরবজাতি (যাঁহারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—) যাবৎ আপনাদের এই রীতি বহাল থাকিবে যে, শাসনকর্ত্তা একজনের পর অপরজনের বিনিয়োগ পরামর্শের মাধ্যমে হইবে তাবৎ আপনাদের মধ্যে মঙ্গল অক্ষুন্ন থাকিবে। যখন তরবারির সাহায্যে ক্ষমতা দখল করা হইবে তখন শাসনকর্ত্তাগণ একনায়ক হইবেন; তাঁহাদের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি একনায়কগণের ন্যায় নিজ মর্জির ভিত্তিতে হইবে।

ব্যাখ্যা—ইয়ামনের আলোচ্য ব্যক্তিদ্বয় এলাকার সমাজপতি ও জাতীয় প্রধান ছিলেন। ইয়ামনবাসী জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) ছাহাবী মারফত উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের নিকট নবীজী (দঃ) ইসলামের আহ্বানে লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই লিপি বাহকরূপেই জরীর (রাঃ) তাঁহাদের সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহারা মদিনার পানে যাত্রা করিলেন পথে থাকাকালীনই নবীজী (দঃ) ইহকাল ত্যাগ করেন। তাই তাঁহারা ছাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই।

আলোচ্য ঘটনায় যে, যু-আম্‌র নামীয় ব্যক্তি মদিনা হইতে বহু দূর ইয়ামনে থাকিয়া আলোচনার মাধ্যমে সর্ব্বশেষ পয়গম্বরকে ঠাহর করিতে পারিলেন এবং ইহাও বলিতে পারিলেন যে, তিন দিন পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী আসমানী কেতাবের জ্ঞানের মাধ্যমেই সম্ভব হইয়াছিল।

নবীজীকে ইহজগত ত্যাগের সঙ্কেত দান:

নবীজীর প্রতি ছুরা নছর অবতীর্ণ হইল যাহা বাহ্যতঃ সুসংবাদ বহনকারী ছিল—

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ - وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ

اللّٰهِ أَفْوَاجًا - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا -

অর্থ—আল্লার সাহায্য পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছে, মক্কা জয় হইয়া গিয়াছে এবং দলে দলে লোকদের আল্লার দ্বীনে দীক্ষা আপনি স্বচক্ষে দেখিয়া নিয়াছেন, অতএব (এখন) স্বীয় প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণার যপনা ও তাঁহার প্রশংসায় লিপ্ত থাকুন এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকুন ; নিশ্চয় তিনি হইলেন অতিশয় ক্ষমাশীল, নেক দৃষ্টি দানকারী।

এতদ্ভিন্ন এই দশম হিজরী সনেই হযরত (দঃ) বিদায় হজ্জ সমাপন করেন এবং আ'রফার ময়দানে সুসংবাদ বহনকারী এই আয়াত নাজেল হয়—

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۔

অর্থ—(ইসলামের অবশিষ্ট রোক্ন্—হজ্জকে স্বয়ং আপনার দ্বারা এবং আপনার সম্মুখে লক্ষাধিক সংখ্যক মোসলমান দ্বারা বিনা বাধায় পূর্ণ শান-শৌকতের সহিত সম্পন্ন করাইয়া) আজিকার দিনে আমি তোমাদের (মোসলেম জমাতের) জন্য তোমাদের দ্বীন (ইসলাম)কে (আরকান-আহকামের দিক দিয়া এবং শক্তির বিকাশের দিক দিয়া) সম্পূর্ণতায় পৌঁছাইয়া দিলাম এবং (এইরূপে) আমার নেয়ামতকে তোমাদের উপর পূর্ণ করিয়া দিলাম এবং তোমাদের জন্য একমাত্র ইসলামকেই দ্বীন রূপে পছন্দ করিয়া নিয়াছি। (ছুরা মায়েদাহ্—৬ পাঃ ৫ রুঃ)

এই ছুরা নছর এবং উক্ত আয়াত বস্তুতঃ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পক্ষে ইহজগত ত্যাগ সম্পর্কে একটি সঙ্কেত ধ্বনি ছিল। কারণ, ইহজগতে হযরতের আবির্ভাব দ্বীন-ইসলাম প্রচারের জন্যই ছিল। উহা যখন সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে এবং এই পর্য্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছে যে, চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে লোকজন স্বেচ্ছায় ইসলামে দীক্ষা নিতেছে, এমতাবস্থায় এই কষ্ট-ক্লিষ্টের জগতে অবস্থানের আবশ্যক হযরতের জন্য থাকে নাই, তাই তাঁহাকে ইহা ত্যাগের প্রস্তুতি করা চাই। যেমন রাজদূত তাঁহার কার্য্যশেষে তাঁহাকে আপন দেশে যথাশীঘ্র ফিরিয়া যাইতে হয়। নবীজীও বুঝিতে পারিয়া ছিলেন, তাঁহার কাজ যখন ফুরাইয়াছে তখন শীঘ্রই তাঁহাকে এই ধরাধাম হইতে চলিয়া যাইতে হইবে।

ছুরা নছরের এই তাৎপর্য্য হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) অনুধাবন করিতে পারিয়াই তিনি এই ছুরার শেষ অংশের আদেশগুলি পালনে তৎপর হইয়া উঠিলেন। উঠা-বসায়, চলা-ফেরায় তাঁহার মুখে শুনা যাইত (ছীরতে মোস্তফা ৩—১৯১)—

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۔

এবং سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ -

এবং سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ -

বিশিষ্ট ছাহাবীগণও ঐ তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

১৭১৯। হাদীছ :—(৭৪৩ পৃঃ) আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (খলীফাতুল-মোছলেমীন) ওমর (রাঃ) তাঁহার দরবারে (বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে, এমনকি) বদরের জেহাদে অংশ গ্রহণকারী বড় বড় ছাহাবীদের সঙ্গে আমাকে স্থান দিয়া থাকিতেন। ইহাতে কোন কোন লোক মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন, এমনকি ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে তাঁহারা বলিলেন, এই অল্প বয়স্ক যুবককে কেন আমাদের সঙ্গে স্থান দিয়া থাকেন? তাহার বয়সের সন্তান-সন্ততি আমাদের রহিয়াছে। ওমর (রাঃ) তাঁহাদিগকে বলিলেন, সে যে কোন্ শ্রেণীর লোক তাহা ত আপনারাও জ্ঞাত আছেন।

অতঃপর একদা ওমর (রাঃ) বিশেষভাবে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে দরবারে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাঁহাকে অন্যান্যদের সঙ্গে বসাইলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম যে, ওমর (রাঃ) (আমার দ্বারা) দরবারের লোকগণকে কোন একটা কিছু দেখাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

ওমর (রাঃ) দরবারের সকলকে বলিলেন, "ইজাজাআ-নাছরুল্লাহে অল্‌ফাত্‌হু"—ছুরার তাৎপর্য্য সম্পর্কে আপনারা কি বলেন? তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ চুপ রহিলেন; আর কেহ কেহ বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালার বিশেষ সাহায্য এবং মক্কা-বিজয় লাভ হওয়ায় (শোকরিয়া স্বরূপ) আমাদিগকে আল্লার প্রশংসা করিতে এবং তাঁহার দরবারে ক্ষমাপ্রার্থীরূপে নম্র হইয়া থাকিতে আদেশ করা হইয়াছে।

ইবনে আব্বাস বলেন, ওমর (রাঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ইবনে আব্বাস! তুমিও কি এইরূপই বুঝিয়া থাক? আমি বলিলাম, না। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তবে তুমি কি বল? আমি বলিলাম, এই ছুরায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ইহজগত ত্যাগের কথা জ্ঞাত করা হইয়াছিল যে—আল্লার সাহায্যে মক্কা পর্য্যন্ত জয় হইয়া গিয়াছে এবং চতুর্দিকের লোকজন দলে দলে ইসলামে দীক্ষা লাভ করিতেছে; ইহা আপনার ইহজগত ত্যাগ নিকটবর্ত্তী হওয়ার নিদর্শন; অতএব এখন বিশেষভাবে "তছবীহ্"—প্রভুর পবিত্রতা যপনায়, "তাহ্‌মীদ"—প্রভুর প্রশংসা যপনায় এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনায় লিপ্ত থাকুন। ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমিও এই ছুরার তাৎপর্য্য উহাই বুঝি যাহা তুমি বলিয়াছ।

ব্যাখ্যা—ছুরা "নছর" কাহারও মতে বিদায় হজ্জের মধ্যে নাজেল হইয়াছিল এবং কাহারও মতে বিদায় হজ্জের পূর্ব্বে নাজেল হইয়াছিল। হযরত (দঃ) বিদায় হজ্জের পূর্ব্বেই ইহজগত ত্যাগ আসন্ন বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। রমজান মাসে জিব্রায়ীল ফেরেশতা হযরতের সঙ্গে কোরআন শরীফ একবার খতম করিতেন, দশম হিজরীর রমজান মাসে দুইবার খতম করিলেন। হযরত (দঃ) ইহা দ্বারাও আঁচ করিতে পারিলেন যে, এই রমজান তাঁহার জীবনের শেষ রমজান—সম্মুখে ১৭৩৩ নং হাদীছে এই তথ্য স্পষ্ট উল্লেখ আছে। বোধহয় সেই জন্যই তিনি এই রমজানে দশ দিনের স্থলে কুড়ি দিনের এ'তেকাফ করিয়া ছিলেন।

১৭২০। ছাদীছ ঃ— (৭৪৮ পৃঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, জিব্রায়ীল ফেরেশতা নবী (দঃ)-এর সঙ্গে প্রতি রমজানে একবার কোরআন শরীফ দওর্ করিতেন! যেই বৎসর (তথা যেই রমজানের পরে) হযরত (দঃ) ইহজগত ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন সেই বৎসর (তথা সেই রমজানে) দুই বার দওর্ করিয়াছিলেন এবং হযরত (দঃ) প্রতি বৎসর দশ দিনের এ'তেকাফ করিয়া থাকিতেন। যেই বৎসর তিনি ইহজগত ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন সেই বৎসর বিশ দিন এ'তেকাফ করিয়াছিলেন।

মোছলেম শরীফে আছে- হযরত (দঃ) বিদায় হজ্জে বলিয়াছেন আমাকে দেখিয়া তোমরা হজ্জের নিয়মাবলী শিখিয়া রাখ; হয়ত তোমাদের সঙ্গে হজ্জ করার সুযোগ পুনরায় আর আমি পাইব না।

বিদায়ের সঙ্কেত প্রাপ্তে নবীজীর অবস্থা ঃ

স্বদেশে স্বজনগণের নিকটে ফিরিয়া যাওয়ার সময় উপস্থিত হইলে প্রবাসী যেমন তাড়াতাড়ি করিয়া প্রবাসের সমস্ত কাজকর্ম্ম ও ঝঞ্ঝাট মিটাইয়া, দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য শেষ করিয়া আনন্দ ও উৎসুক্যের সহিত নিজের যাত্রার আয়োজন করিতে থাকে, প্রবাসের প্রতি বিমনা হইয়া পড়ে। ইহজগত ত্যাগের সঙ্কেত প্রাপ্তে হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর নবীজী (দঃ) যেন তদ্রূপ পৃথিবীর সমস্ত কাজকাম সারিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সকল কার্য্যে এবং সকল চিন্তায় ও ভাবধারায় একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিল। ওপার হইতে আগত ব্যক্তি যেমন বেলা-শেষে নদীর কূলে দাঁড়াইয়া পরপারের দিকে তাঁকায়; নবীজী মোস্তফা (দঃ)ও যেন পরপারের আকর্ষণে এই পার হইতে বিমনা হইয়া ওপারের প্রতি তাঁকাইতে লাগিলেন। এমনকি তিনি কোন ভাষণ দিলে শ্রোতাদের অনুভূতিতে ও দৃষ্টিতে তাঁহার ঐ ভাব দিবালোকের ন্যায় ফুটিয়া উঠিত। যেমন এক হাদীছে আছে—

এর্বাজ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামায শেষে আমাদের প্রতি মুখ করিয়া উপদেশমূলক বক্তব্য রাখিলেন যাহা

অত্যধিক মর্ম্মস্পর্শী ছিল। সেই বক্তব্য শ্রবনে সকলেরই চোখ অশ্রু বহাইতে লাগিল এবং অন্তর কাঁপিতে লাগিল। একজন ছাহাবী ঐ অবস্থায় আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ। আপনার এই ওয়াজ বিদায়কালীন ওয়াজের ন্যায় মনে হয়; অতএব আপনি আমাদেরে শেষ উপদেশ দিয়া যান। নবীজী (দঃ) ঐ ছাহাবীর কথা খণ্ডন না করিয়া উত্তরদানে বলিলেন; তোমাদের প্রতি আমার শেষ উপদেশ—

"সর্ব্বদা আল্লার ভয়-ভক্তি অবলম্বন করিয়া থাকিবে। আর মুরব্বি ও উপরস্থের কথা মানিয়া ও গ্রহণ করিয়া চলিবে যদিও সে নিম্নমানের হয়। আমার পরে যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে তাহারা অনেক বিভেদ দেখিতে পাইবে; সে ক্ষেত্রে তোমরা আমার ছুন্নত এবং সত্যের ধারক ও বাহক—আমার খলীফাদের ছুন্নতের উপর দৃঢ়পদ থাকিবে, উহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিবে, উহাকে শক্তভাবে দাঁত দ্বারা কামড় দিয়া ধরিয়া রাখিবে। ঐ ছুন্নত ছাড়া যত প্রকার গর্হিত তরিকা হইবে সব হইতে স্বযত্নে দূরে সরিয়া থাকিবে। ঐরূপ গর্হিত তরিকাকেই "বেদ্আৎ" বলা হয় এবং সব রকম বেদ্আৎই ভ্রষ্টতা। (মেশকাত শরীফ ৩০)

বিদায় হজ্জ সমাপনান্তে মদিনার নিকটবর্ত্তী "গাদীরে-খোম" নামক স্থানে নবীজী(দঃ) অবস্থান করিয়া তথায়ও ভাষণ দিয়া ছিলেন; সেই ভাষণেও সুস্পষ্টরূপে নবীজী (দঃ) বিদায়ের কথা বলিয়া দিয়াছিলেন। মোসলেম শরীফের হাদীছে উক্ত ভাষণের উল্লেখ রহিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা বর্ণনার পর নবীজী (দঃ) বলিলেন—

أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوْشِكُ أَنْ يَأْتِيَنِيْ رَسُوْلُ رَبِّيْ فَأُجِيْبُ وَأَنَا تَارِكٌ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللّٰهِ فِيْهِ الْهُدٰى وَالنُّوْرُ فَخُذُوْا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاسْتَمْسِكُوْا بِهٖ وَأَهْلُ بَيْتِيْ أُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ فِيْ أَهْلِ بَيْتِيْ

হে লোক সকল। আমি মানুষই বটে; অচিরেই হয়ত আমার প্রভুর দূত আমাকে নিয়া যাওয়ার জন্য উপস্থিত হইবেন; আমিও অবিলম্বে তাঁহার ডাকে সারা দিব। আমি অতি মহান দুইটি জিনিষ তোমাদের মধ্যে রাখিয়া যাইতেছি। প্রথমটি হইল—আল্লার কেতাব যাহার মধ্যে হেদায়েত (তথা সঠিক পথ প্রদর্শন) এবং নূর (তথা ঐ পথের আলো) রহিয়াছে। অতএব তোমরা আল্লার কেতাবকে ধরিয়া থাকিবে, উহাকে আঁকড়াইয়া থাকিবে। দ্বিতীয়টি হইল আমার পরিজন; (তাহাদের হইতে দ্বীনের সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করিবে।) তাহাদের সম্পর্কে তোমাদিগকে আল্লার ভয় স্মরণ করাইয়া যাইতেছি। (আছাহ্ ৫৩৯)

এইভাবে যতই দিন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ততই পরপারের দিকে দ্রুত আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন এবং ইহজীবন হইতে বিদায়ী কার্য্যকলাপ ব্যস্ততার সহিত সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

ওহোদ-পর্ব্বতের পাদদেশে ভয়াবহ যুদ্ধ-ময়দানে যাঁহারা কঠোর পরীক্ষায় নবীজীর চরণপ্রান্তে দাঁড়াইয়া দ্বীন-ইসলামের সেবায় আত্মবলিদান করিয়াছিলেন—বিদায়ের বেলায় নবীজী (দঃ) তাঁহাদেরকে বিশেষভাবে স্মরণ করিলেন। এমনকি (অনেকের মতে) এই সময়ে একদা তিনি ওহোদপ্রান্তে যথায় শহীদানগণ চিরনিদ্রায় শুইয়া আছেন তথায় উপস্থিত হইলেন এবং শহীদানের সমাধি-কেনারায় দাঁড়াইয়া তাঁহাদের জন্য প্রাণ ভরিয়া দোয়া করিলেন। ঘটনার বর্ণনাকারী যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা বলিয়াছেন—নবীজী যেন মৃত, জীবিত সকল হইতে বিদায় লইতেছিলেন (৫৭৮ পৃঃ)।

নবীজীর পীড়ার সূচনা ঃ

দশম হিজরীর সর্ব্বশেষ মাস জিলহজ্জ মাসে হযরত (দঃ) বিদায় হজ্জ সমাপন করিয়া মাসের অল্প কয়েক দিন বাকি থাকিতে মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন—তখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। পরবর্ত্তী মহররমের চাঁদ হইতে একাদশ হিজরী বৎসর আরম্ভ হইল। পূর্ণ মহরম মাসও হযরত (দঃ) সুস্থ ছিলেন।

একাদশ হিজরীর দ্বিতীয় মাস—ছফর মাসের শেষ দিকে একদা রাত্রিবেলা হযরত নবী (দঃ) স্বীয় খাদেম আবু মোয়াইহাবাহ্‌কে নিদ্রা হইতে উঠাইলেন এবং বলিলেন, "বাক্বী"—(মদিনার) কবরস্থানে যাইয়া তথাকার সমাহিতদের জন্য দোয়ায়ে-মাগফেরাত করার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি। সেমতে হযরত (দঃ) তথায় গেলেন এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর হঠাৎ হযরত (দঃ) অসুস্থ হইয়া পড়িলেন—তাঁহার মাথা ব্যাথা ও জ্বর আরম্ভ হইল। এই রাত্রটি ২৯ ছফর মঙ্গলবার দিবাগত—৩০ ছফর বুধবারের রাত্র ছিল।*

---

* অর্থাৎ ছফর মাসের মাত্র এক রাত্র বাকি রহিয়াছে এই সময় তথা ছফর মাসের শেষ রাত্রে হযরত (দঃ) রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। এই রাত্রটি বুধবার গণ্য, কারণ ইসলামী হিসাবে রাত্র উহার পরবর্ত্তী দিনের বলিয়া গণ্য হয়। আমাদের দেশে প্রচলিত "আখেরী চাহার সোম্বা", তথা ছফর মাসের শেষ বুধবারের বৈশিষ্ট্যের সূত্র ইহাই যে, এই বুধবারেই হযরতের অন্তিম রোগ হইয়াছিল। রোগাক্রান্তির বার ত বুধবার ছিল, কিন্তু উহা কোন তারিখ ছিল তাহা সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। ছফর মাসের শেষ রাত্র হওয়া সম্পর্কেও একটি মত্ আছে (মজমুয়া ফতওয়া মাওঃ আবদুল হাই ২—২৩৯ দ্রষ্টব্য)। আমরা এই মত্‌কে অগ্রগণ্য ধরিয়াছি। কারণ, এই বুধবার ৩০ তারিখ হইলেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের দিন সোমবার রবিউল-আউয়ালের ১২ তারিখ হইতে পারে যাহা অতি প্রসিদ্ধ। এ সম্পর্কে একটি জটিল প্রশ্ন আছে উহার মীমাংসা "শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের দিন' বর্ণনাস্থলে উল্লেখ করা হইবে।

রোগের প্রথম প্রকাশ ঃ

"জান্নাতুল-বাকী" গোরস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া নবীজী (দঃ) পীড়া অনুভব করিতে লাগিয়াছেন। ইতিমধ্যে আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে আসিয়া নবীজী (দঃ) শুনিতে পাইলেন—আয়েশা (রাঃ) মাথা-ব্যাথায় কাতর হইয়া বিলাপ করিতেছেন—উঃ! মাথা গেল! তখন নবীজী (দঃ) বিবি আয়েশার সহিত কৌতুক করিয়া বলিলেন, তোমার ত্রাসের কি কারণ! আমার সম্মুখে তোমার মৃত্যু হইলে ত তোমার বড় সৌভাগ্য। আমার হাতে তোমার কাফন-দাফন ইত্যাদি সমুদয় ব্যবস্থা সম্পন্ন হইবে এবং আমি তোমার জানাযা পড়াইয়া তোমাকে কবরে শোয়াইয়া দিব—এর চেয়ে শুভাদৃষ্ট আর কি হইতে পারে! আয়েশা (রাঃ) তদুত্তরে রাগতঃ স্বরে ঠেস মারিয়া বলিলেন, মনে হয় আপনার কামনা—আমি মরিয়া যাই, আর আপনি একজন নতুন বিবি আনিয়া আমারই ঘরে নূতন সংসার পাতেন! এই সময় নবী (দঃ) বিবি আয়েশার এই স্নিগ্ধ বিদ্রূপ স্মিত হাস্যে উপভোগ করিয়া নিজের অসুস্থতার কথা প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, তোমার মাথা কি গেল? বরং আমার মাথা গেল! (বেদায়াহ, ৪—২২৪)। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে এই তথ্যেরই উল্লেখ রহিয়াছে।

১৭২১। হাদীছ ঃ—(৮৪৬ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি মাথা ব্যথায় অস্থির হইয়া বলিতে লাগিলাম, হায় মাথা! আমার হায়-হুতাশ শুনিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমার চিন্তা কি? আমি জীবিত থাকাবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু হইয়াই যায় তবে আমি তোমার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট মাগফেরাত কামনা করিব এবং দোয়া করিব।

আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, হায়! আমার পোড়া কপাল! মনে হয় আপনি আমার মৃত্যু কামনা করেন! তাহা হইলে ত সেই দিনেরই শেষ ভাগে (আমারই গৃহে) অন্য স্ত্রীর সঙ্গে আপনি রাত্রি যাপন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

এতচ্ছ্রবনে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (মৃদু হাসি হাসিলেন এবং) বলিলেন, (তোমার মাথায় কি ব্যথা? উহাত কিছুই নহে, বরং আমার মাথায় সাংঘাতিক ব্যথা;) আমি বলিতে পারি—হায় মাথা। (ইহা হইতেই হযরতের অন্তিম রোগ আরম্ভ*)।

নবীজীর অন্তিম রোগ ঃ

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অন্তিম রোগের আরম্ভ ছিল মাথা-ব্যথা; অচিরেই ইহার সহিত ভীষণ জ্বরও মিলিত হয়। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমীপে উপস্থিত হইলাম;

* বন্ধনীর মধ্যবর্তী বিষয়গুলি মেশকাত শরীফ ৫৪৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।

তখন নবীজী ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত। আমি তাঁহার গায়ে হাত রাখিয়া বলিলাম আপনার জ্বর ত অতিমাত্রায়। নবীজী বলিলেন, হাঁ তোমাদের সাধারণ লোকের দুইজনের সমপরিমাণ জ্বর আমার আসে। আমি আরজ করিলাম, ইহা কি এই কারণে যে, আপনার ছওয়াবও দ্বিগুণ ? নবী (দঃ) বলিলেন, হাঁ। তিনি শপথ করিয়া আরও বলিলেন, যে কোন মোসলমানের পীড়া বা অন্য কোন কষ্ট হইলে তাহার গোনাহ্ তাহার হইতে এইরূপে ঝরিয়া যায় যেরূপে গাছের শুষ্ক পাতা গাছ হইতে ঝরিয়া যায় (বেদায়াহ, ৪—২৩৭)।

আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (ঐ সময়) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গায়ে কম্বল দেওয়া ছিল। জ্বর এরূপ ভীষণ ছিল যে, ঐ কম্বলের উপরে হাত রাখিলে জ্বরের তাপ অনুভূত হইত। (যোরকানী, ৮—২০৯)

নবীজীর শেষ অবস্থানঃ

রোগ অবস্থায়ও নবীজী (দঃ) তাঁহার ন্যায় নীতি ও আদর্শের উপর দৃঢ় ছিলেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি বিবিগণের জন্য নির্দ্ধারিত তারিখে এক এক বিবির গৃহে অবস্থান করিয়া যাইতে ছিলেন। অবশেষে যখন পীড়ার যাতনা বাড়িয়া গেল এবং এই ব্যবস্থা চালাইয়া যাওয়ার অক্ষমতা ঘনাইয়া আসিল তখন আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহের প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ জন্মিল। এই গৃহই সর্ব্বাধিক ওহী অবতরণের ক্ষেত্র ছিল, এই গৃহই বিধাতা কর্তৃক তাঁহার শেষ শয্যার স্থানরূপে নির্দ্ধারিত ছিল। এই গৃহে আসিবার দিন ছিল সোমবার দিন ; সোমবার দিনের পুর্ব্ব হইতেই নবীজী (দঃ) এই গৃহের প্রতি স্বীয় আকর্ষণ ও অপেক্ষা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে এই তথ্যের বিবরণ রহিয়াছে—

১৭২২। হাদীছঃ—(৬৪০ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মৃত্যু-রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর প্রতিদিন তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিতেন, আগামীকল্য আমি কোন স্ত্রীর গৃহে থাকিব ? এই জিজ্ঞাসা দ্বারা তিনি আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে থাকিবার দিনের প্রতি অপেক্ষা প্রকাশ করিতেছিলেন। অন্যান্য বিবিগণ (ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা) সন্তুষ্টচিত্তে নবীজীকে যাহার গৃহে ইচ্ছা অবস্থান করার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সেমতে হযরত (দঃ) আয়েশার গৃহে অবস্থান করিলেন, এমনকি এই গৃহেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ব্যাখ্যাঃ—সোমবার দিন আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে অবস্থানের দিন ; এই দিন হযরত (দঃ) আয়েশার গৃহে আসিয়া তথাই অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অসুস্থ অবস্থায় এই গৃহেই পরবর্ত্তী সোমবারে ইহজগত ত্যাগ করিয়াছিলেন।

এই সময় একদা হযরত (দঃ) বলিলেন, আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, আবুবকর ও তাহার পুত্রকে ডাকিয়া আনিয়া (আবুবকরকে আমার স্থলাভিসিক্ত রূপে) মনোনীত করিয়া

দেই, যেন অন্য কাহারও কিছু বলার বা আশা করার অবকাশ না থাকে, কিন্তু পরে ভাবিলাম, (আমার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মনোনয়ন) একমাত্র আবুবকর ছাড়া অন্য কাহারও জন্য আল্লাহ তায়ালাও হইতে দিবেন না, মোসলমানগণও গ্রহণ করিবে না।

পরকালীন জিন্দেগীকে অগ্রগণ্যতা দান ঃ

নবীগণের কর্ত্তব্য পূর্ণ হওয়ার পর তাঁহাদের সম্মানার্থে মৃত্যুর পূর্ব্বে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে তাঁহাদিগকে এখ্‌তিয়ার দেওয়া হইত যে, ইচ্ছা করিলে দুনিয়ার দীর্ঘ জীবন ভোগ করিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রস্তুত নেয়ামত সমূহ উপভোগেও চলিয়া আসিতে পারেন।

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকেও সেই এখ্‌তিয়ার দেওয়া হইয়াছিল। হযরত (দঃ) আখেরাতকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। রোগ-শয্যায় শায়িত হওয়ার কয়েক দিন পরই স্বয়ং হযরত(দঃ) এই বিষয়টি সর্বসমক্ষে প্রকাশও করিয়া দিয়াছিলেন।

১৭২৩। হাদীছ ঃ— (৫১৬ পৃঃ) আবু সায়ী'দ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে ভাষণ দান করিলেন— তিনিবলিলেন, আল্লাহ তায়ালা এক বন্দাকে দুনিয়ার জেন্দেগী উপভোগ কিম্বা তাঁহার নিকট সুরক্ষিত নেয়ামত উপভোগ—উভয়ের কোন একটাকে গ্রহণ করার এখতিয়ার দিয়াছেন; সে বন্দা আল্লার নিকট সুরক্ষিত নেয়ামত উপভোগকেই অবলম্বন করিয়াছে।

হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন, এতচ্ছ্রবনে আবুবকর (রাঃ) কাঁদিতে লাগিলেন (এবং বলিতে লাগিলেন আমাদের মাতাপিতা আপনার চরণে উৎসর্গ হউক!) আমরা তাঁহার ক্রন্দনে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) কোন এক বন্দা সম্পর্কে একটি তথ্য প্রকাশ করিলেন, আর এই বৃদ্ধ কাঁদিতেছেন! প্রকৃত প্রস্তাবে সেই বন্দা স্বয়ং রসুলুল্লাহ (দঃ)ই ছিলেন; (আমরা তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম না, আবুবকর বুঝিতে পারিয়াছিলেন।) আবুবকর আমাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন।

(আবুবকরের ক্রন্দন হযরত (দঃ)কে বিশেষরূপে অভিভূত করিয়াছিল; বলিয়া মনে হয়, তাই) হযরত (দঃ) (তাঁহাকে ক্রন্দন হইতে বারণ করিতেছিলেন এবং) বলিলেন, জান ও মাল উভয় দ্বারা আমার প্রতি সর্ব্বাধিক উপকারী ব্যক্তি হইল আবুবকর। আমি যদি আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার ব্যতীত অন্য কাউকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাইতাম তবে আবুবকরকে নিশ্চয়ই সেই স্থান দান করিতাম। অবশ্য তাহার জন্য ইসলামী ভ্রাতৃত্ব এবং সেই সূত্রের দুস্তি ও মহব্বত পূর্ণরূপে রহিয়াছে।

হযরত (দঃ) (আবুবকরের বৈশিষ্টের নিদর্শন স্বরূপ) এই নির্দ্দেশও দান করিলেন যে, নিজ নিজ বাড়ী হইতে (আমার) মসজিদের দেয়ালে যতগুলি দরওয়াজা খোলা হইয়াছে তন্মধ্যে শুধু আবুবকরের দরওয়াজা বাকি রাখিয়া অন্যান্য সমুদয় দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের চার দিন পূর্ব্বে ঃ

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) রোগাক্রান্ত হইয়া ছিলেন বুধবার* এবং দীর্ঘ তের দিন* রোগ শয্যায় থাকিয়া সোমবার দিন ইহজগৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন—সেই সোমবারের পূর্ব্বে বৃহস্পতিবার দিন হইতে রোগ অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এমতাবস্থায় দিনের প্রথমার্দ্ধে হযরত (দঃ) মোসলমানদের মঙ্গলার্থে একটি লিপি লিখিয়া দেওয়ার ইচ্ছা করিয়া কাগজ কলম চাহিলেন, কিন্তু হযরত (দঃ) রোগ যাতনার ভীষণ চাপে থাকিয়া আবার লিপি লেখাইবার কষ্ট করিবেন তাহা কোন কোন ছাহাবীর পক্ষে অসহণীয় হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহারা কাগজ কলম আনিয়া দিয়া হযরতের কষ্ট-ক্লেশ বর্দ্ধিত করিতে বাধা দান করিলেন। অবশেষে হযরত (দঃ)ও স্বীয় ইচ্ছা হইতে বিরত রহিলেন এবং মতভেদ করিতে যাইয়া ছাহাবীগণের মধ্যে কিছুটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইলে হযরত (দঃ) সকলকে তথা হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ঘটনার বিবরণ ১ম খণ্ডে ৯০ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

উক্ত ঘটনার পর জোহরের নামাজের ওয়াক্তে হযরত (দঃ) বিশেষ কায়দায় গোছল করতঃ ব্যথার দরুন মাথায় পট্টি বাঁধিয়া মসজিদে তশরীফ আনিলেন এবং নামাযান্তে একটি ভাষণ দান করিলেন—উহাই ছিল তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের সর্ব্বশেষ ভাষণ। (সীরতে মোস্তফা ৩—১৯৭)

১৭২৪। হাদীছ ঃ— (৬৩৯ পৃঃ) উম্মুল-মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়া থাকিতেন যে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) রোগশয্যায় আমার গৃহে আসিবার পরে একদা তাঁহার রোগ-যাতনা অতিশয় বৃদ্ধি পাইলে পর তিনি বলিলেন, সাত মশক পানি যাহার মুখ বন্ধই রহিয়াছে এখনও খোলা হয় নাই—আমার উপর ঢালিয়া (আমাকে গোসল করাইয়া) দাও। লোকদিগকে একটি বিশেষ কথা জানাইতে চাহিতেছি—সেই কার্য্যে যেন আমি সক্ষম হই।

সেমতে আমরা হযরত (দঃ)কে একটি বড় টবের মধ্যে বসাইলাম এবং তাঁহার গায়ে ঐরূপ মশকের পানি ঢালিতে লাগিলাম। হযরত (দঃ) যখন বলিলেন যে, তোমরা আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছ তখন আমরা ক্ষান্ত হইলাম। অতঃপর হযরত (দঃ) (আব্বাস (রাঃ) ও আলী (রাঃ) এই দুই জনের কাঁধে ভর করতঃ (ঘর হইতে) বাহির হইয়া (মসজিদে) লোকদের সম্মুখে আসিলেন এবং নামায পড়াইয়া ভাষণ দিলেন। (এই ভাষণের উল্লেখ প্রথম খণ্ড ৬৯৯ নং হাদীছে আছে।

এই ভাষণেই হযরত (দঃ) স্বীয় উম্মতকে সতর্ক করণার্থে ইহাও বলিয়াছিলেন যে, ইহুদ-নাছারাদের উপর আল্লার অভিশাপ বর্ষিত হউক ; তাহারা তাহাদের নবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কবরকে সেজদা করিয়া থাকিত।)

---

* এই সব নির্দ্ধারণ সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ আছে।

১৭২৫। হাদীছঃ—(৬৩৯ পৃঃ) عن عائشة رضى الله تعالى عنها

قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَرَضِهِ الَّذِى لَمْ يَقُمْ مِنْهُ

لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اِتَّخَذُوا قُبُوْرَ اَنْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِدَ قَالَتْ عَائِشَةُ

لَوْلَا ذَالِكَ لَاُبْرِزَ قَبْرُهُ خَشِىَ اَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا ـ

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অন্তিম শয্যায় তথা যেই রোগ শয্যা হইতে আর সারিয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন না, সেই অবস্থায় বলিয়াছিলেন, (আল্লাহ ধ্বংস করুন,*) আল্লার অভিশাপ বর্ষিত হউক ইহুদ-নাছারাদের উপর ; তাহারা তাহাদের নবীগণের কবরকে সেজদার স্থান বানাইয়া ছিল (—নবীগণের কবরকে সেজদা করিত।)

আয়েশা (রাঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, যদি ঐরূপ গর্হিত কার্য্যের রীতি পূর্ব্ব হইতে না থাকিত তবে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কবর শরীফকে উন্মুক্ত রাখা হইত, কিন্তু এস্থলেও আশঙ্কা করা হইয়াছে যে, ইহাকেও সেজদার স্থান বানান হয় না কি। (তাই গৃহাভ্যন্তরে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।)

ব্যাখা ঃ—আলোচ্য হাদীছটি অতি প্রয়োজনীয় এবং তাৎপর্য্যপূর্ণ। হাদীছখানাকে ইমাম বোখারী (রঃ) মূল গ্রন্থে পাঁচ স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন।

স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)ও এই বিষয়টি সম্পর্কে সতর্ক করণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছিলেন, এমকি ইহাকে তিনি তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের সর্ব্বশেষ ভাষণে উল্লেখ করিয়াছেন, বরং ইহার উপরও তিনি ক্ষান্ত হন নাই। জীবনের সর্ব্বশেষ মুহূর্ত্তে যখন স্বীয় পবিত্র আত্মাকে সৃষ্টিকর্ত্তার হাওয়ালা করিতেছিলেন তখনও পুনঃ পুনঃ এই সতর্ক বাণীই উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। প্রথম খণ্ড ২৭৮ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।

বক্ষমান হাদীছখানা মোছলেম শরীফে অতিরিক্ত একটি শব্দের সহিত বর্ণিত আছে যাহা অতিশয় তাৎপর্য্যপূর্ণ হযরত (দঃ) ভাষণে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন—

الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبياءهم وصالحيهم

مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد انى انهاكم من ذلك ـ

"তোমরা সতর্ক থাকিও। তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ তাহাদের নবীগণের এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কবরকে সেজদার স্থান বানাইয়া থাকিত। খবরদার! তোমরা কখনও কোন কবরকে সেজদার স্থান বানাইও না। নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে ঐরূপ কার্য্য হইতে নিষেধ করিতেছি।"

---

* বোখারী শরীফ ৬২ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েতে এই শব্দ রহিয়াছে।

উক্ত ভাষণে হযরত (দঃ) মদিনাবাসী ছাহাবী আনছারগণ সম্পর্কে একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তিও উল্লেখ করিয়াছিলেন, যাহার বিবরণ নিম্নের হাদীছদ্বয়ে রহিয়াছে—

১৭২৬। হাদীছ ঃ—(৫৩৬ পৃঃ) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অন্তিম শয্যাকালীন সময়ে) একদা আবুবকর (রাঃ) ও আব্বাস (রাঃ) আনছারদের এক মজলিসের নিকটবর্ত্তী পথে যাইতেছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, আনছারগণ তথায় বসিয়া কাঁদিতেছেন।

আবুবকর ও আব্বাস (রাঃ) তাঁহাদিগকে কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আনছারগণ বলিলেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারের কথা স্মরণে কাঁদিতেছি। আবুবকর ও আব্বাস (রাঃ) এই সংবাদ নবী (দঃ)কে জানাইলেন।

আনাছ (রাঃ) বলেন, অতঃপর নবী (দঃ) (রুগ্ন অবস্থায় অসহনীয় ব্যথার দরুন) স্বীয় মাথায় কাপড় আঁটিয়া পট্টি বাঁধিয়া স্বীয় কক্ষ হইতে বাহির হইলেন এবং মসজিদে মিম্বরের উপর উপবিষ্ট হইলেন। মিম্বরের উপর ইহাই ছিল তাঁহার সর্ব্বশেষ আরোহণ—অতঃপর আর তিনি মিম্বরে আরোহণ করিতে পারেন নাই। মিম্বরে বসিয়া পূর্ণাঙ্গীন ভাষণ দানার্থে প্রথমতঃ আল্লাহ তায়ালার হাম্‌দ্-ছানা বা প্রশংসা করিলেন, অতঃপর ভাষণের মধ্যে আনছারদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন—

أُوصِيكُمْ بِالْأَنْصَارِ فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي وَقَدْ قَضَوُا الَّذِي عَلَيْهِمْ وَبَقِيَ

الَّذِي لَهُمْ فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ -

"হে লোক সকল! আমি তোমাদিগকে আন্‌ছার—মদিনাবাসী ছাহাবীগণের পক্ষে বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি; তাঁহারা আমার ভিতর-বাহিরের বন্ধু। তাঁহারা নিজেদের কর্ত্তব্য (যে সম্পর্কে তাঁহারা আ'কাবা-সম্মেলনে ওয়াদা করিয়াছিলেন) পূর্ণ মাত্রায় আদায় করিয়াছেন। তাঁহাদের জন্য তোমাদের নিকট উহার বিনিময় প্রাপ্য বাকি রহিয়াছে, অতএব তাঁহাদের সুব্যবহারকে বিশেষ আদর-কদরের সহিত গ্রহণ করিও এবং অরুচির ব্যবহার দেখিলে তাহা হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া যাইও।

১৭২৭। হাদীছ ঃ—(১২৭ পৃঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (অন্তিম শয্যায়) একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মসজিদের মিম্বারে আরোহণ করিলেন। একখানা চাদর তাঁহার গায়ে উভয় স্কন্ধ সমেত জড়ান ছিল এবং মাথার তৈলে তৈলাক্ত একখানা রুমাল যাহা তিনি পাগড়ীর নীচে ব্যবহার করিয়া থাকিতেন উহার দ্বারা মাথায় পট্টি বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন এবং ইহাই ছিল মিম্বরের উপর তাঁহার সর্ব্বশেষ আরোহণ।

হযরত (দঃ) মিম্বারে উপবিষ্ট হইয়া আল্লাহ তায়ালার হাম্‌দ-ছানা বা প্রশংসা করিয়া বলিলেন, হে লোক সকল। আমার নিকটবর্ত্তী আসিয়া যাও। সেমতে সকলেই তাঁহার প্রতি ছুটিয়া আসিল। অতঃপর হযরত (দঃ) বলিলেন—

فَاِنَّ هٰذَا الْحَىَّ مِنَ الْاَنْصَارِ يَقِلُّوْنَ وَيَكْثُرُ النَّاسُ فَمَنْ وَلِىَ شَيْئًا

مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ فَاسْتَطَاعَ اَنْ يَضُرَّ فِيْهِ اَحَدًا اَوْ يَنْفَعَ فِيْهِ اَحَدًا فَلْيَقْبَلْ

مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيْئِهِمْ -

"আনছারগণের" বংশধর ধীরে ধীরে সংখ্যালঘুতে পরিণত হইয়া যাইবে, অন্যান্য লোকগণ সংখ্যাগুরু হইয়া দাঁড়াইবে। তোমাদের যে কেহ মোহাম্মদ (দঃ)-এর উম্মতে কোন ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারিবে এবং লোকদের লাভ-লোক্‌সানে হস্তক্ষেপের ক্ষমতা লাভ করিতে পারিবে তাহার কর্ত্তব্য হইবে—আন্‌ছারদের সুব্যবহারকে আদর-কদরের সহিত গ্রহণ করা এবং তাঁহাদের দ্বারা কোন অরুচির ব্যবহার দেখিতে পাইলে উহা হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া চলা।

এই ভাষণে রসুলুল্লাহ (দঃ) আরও আদেশ করিয়াছিলেন—

১৭২৮। হাদীছ—(৪২৯ পৃঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন,...রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মৃত্যুকালে তিনটি বিষয়ের অছিয়ত করিয়া গিয়াছেন। (১) সমস্ত মোশরেক—পৌত্তলিকদেরকে আরব উপদ্বীপের সীমা হইতে বাহির করিয়া দিবে। (২) বিদেশী প্রতিনিধিবৃন্দকে ঐরূপে উপহার দিবে যেরূপ আমি দিয়া থাকিতাম। (৩) পবিত্র কোরআন বা অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে কিছু বলিয়াছিলেন তাহা বর্ণনাকারী ভুলিয়া গিয়াছেন।

রোগ-শয্যায় শায়িত হইয়াও হযরত (দঃ) প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে মসজিদে তশরীফ আনিতেন এবং ইমামতীও করিতেন। এই বৃহস্পতিবার রোগ আক্রমণ বৃদ্ধি পাইবার পর এই দিনের মগরেবের নামাযই ছিল তাঁহার স্বাভাবিক ইমামতীর সর্ব্বশেষ নামায। ছুরা "ওয়াল্‌-মোর্‌ছালাত" দ্বারা তিনি এই নামায পড়াইয়া ছিলেন। ১ম খণ্ডে ৪৪৪ নং হাদীছে এই তথ্যটি বর্ণিত হইয়াছে।

এই দিন মগরেবের নামাযের পর হযরতের রোগ-যাতনা চরমে পৌঁছিয়া গেল। এমতাবস্থায় এশার নামাযের ওয়াক্ত হইল; হযরত (দঃ) বার বার ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলেন নামাযের জন্য মসজিদে যাইবার, কিন্তু যত বারই তিনি শয্যা হইতে উঠিতে উদ্যত হইলেন প্রতি বারই মূর্চ্ছা খাইয়া পড়িয়া গেলেন। অবশেষে আবুবকর (রাঃ)কে ইমাম হইয়া নামায পড়াইবার আদেশ করিলেন। (সীরাতে মোস্তফা ৩—১২৯)

১৭২৯। হাদীছ ঃ—(৯৫ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বৃহস্পতিবার এশার সময়ে) তাঁহার রোগ যাতনা বৃদ্ধির অবস্থায় জিজ্ঞাসা করিলেন, اصلى الناس "লোকগণ নামায পড়িয়া ফেলিয়াছে কি? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, فقلنا لا يا رسول الله وهم ينتظرونك "আমরা আরজ করিলাম, না—হুজুর। তাহারা এখনও নামায পড়ে নাই; তাহারা আপনার উপস্থিতির অপেক্ষা করিতেছে।" তখন হযরত (দঃ) বলিলেন, ضعوا لى ماء فى المخضب "আমার জন্য টবের মধ্যে পানি ঢাল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, তাহাই করা হইল এবং হযরত (দঃ) ঐ পানিতে গোসল করিলেন। অতঃপর হযরত (দঃ) উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দাঁড়াইতে পারিলেন না—মূর্চ্ছা খাইয়া পড়িয়া গেলেন। তারপর চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকগণ নামায পড়িয়া ফেলিয়াছে কি? সকলেই উত্তর করিল, না—হুজুর। তাহারা আপনার উপস্থিতির অপেক্ষায় আছে। হযরত (দঃ) পুনরায় টবের মধ্যে পানি ঢালিতে আদেশ করিলেন এবং উহাতে গোসল করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এইবারও মূর্চ্ছা খাইয়া পড়িয়া গেলেন। এইবারও হযরতের চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে হযরত জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকগণ নামায পড়িয়া ফেলিয়াছে কি? সকলেই উত্তর করিল, না—হুজুর। তাহারা আপনার অপেক্ষায় আছে। হযরত (দঃ) তৃতীয়বার টবের মধ্যে পানি ঢালিবার আদেশ করিলেন এবং গোসল করিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এইবারও মূর্চ্ছা খাইয়া পড়িয়া গেলেন। লোকজন তখনও এশার নামাজের জন্য হযরতের অপেক্ষায় মসজিদে সমবেত হইয়া আছে।*

---

* ইহা হযরতের মৃত্যুর সোমবার দিনের পূর্ব্ব বৃহস্পতিবারের দিন পরে রাত্রের এশার সময়ের ঘটনা। এই বৃহস্পতিবার দিন জোহরের নামাযের সময়ও হযরত (দঃ) টবের মধ্যে গোসল করিয়া ছিলেন এবং উক্ত গোসলে কিছুটা স্বস্তি বোধ করিয়া দুইজনের কাঁধে ভর করতঃ মসজিদে যাইয়া জোহর নামাযে ইমামতী করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বশেষ ভাষণ দান করিয়াছিলেন—যাহার উল্লেখ ১৭২৪ নং হাদীছে রহিয়াছে। এই বৃহস্পতিবার দিনের পর রাত্রে এশার নামাযের পূর্ব্বেও হযরত মসজিদে যাওয়ার সক্ষমতা লাভের আশায় পুনঃ পুনঃ গোসল করিয়াছিলেন; কিন্তু এইবার গোসলের দ্বারা স্বস্তিবোধ আসে নাই এবং মসজিদে যাইতে সক্ষম হন নাই।

আলোচ্য হাদীছে উহারই বর্ণনা হইয়াছে। এই এশার ওয়াক্ত হইতেই আবুবকরের ইমামতী আরম্ভ হয় এবং পরদিন শুক্রবারের পাঁচ ওয়াক্ত তার পরদিন শনিবারের ফজর কিম্বা তার পর দিন রবিবারের ফজর পর্যন্ত আবুবকরের ইমামতী চলিতে থাকে। সেই শনি বা রবিবার দিন জোহরের নামায ওয়াক্তে হযরত (দঃ) কিছুটা স্বস্তিবোধ করিয়া দুইজনের কাঁধে ভর করিয়া মসজিদে যান এবং আবুবকরকে মোকাব্বের রাখিয়া জোহর নামাযের ইমামতী করেন যাহার বয়ান ১৭৩১ নং হাদীছে রহিয়াছে।

অতঃপর হযরত (দঃ) আবুবকরের নিকট (বেলাল (রাঃ) মারফৎ) সংবাদ পাঠাইলেন, তিনি যেন লোকদের নামায পড়াইয়া দেন। সংবাদ দানে প্রেরিত লোকটি আবুবকরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) আপনাকে লোকদের নামায পড়াইয়া দিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন।

আবুবকর অতিশয় নরম-দিল মানুষ ছিলেন ; (রসুলুল্লাহ (দঃ) রোগাক্রান্ত হওয়ার শোকে বিহ্বল অবস্থায় তাঁহারই স্থানে দাঁড়াইয়া নামায পড়াইবেন—ইহা আবুবকরের পক্ষে সম্ভব হইবে না বিধায়) তিনি ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি লোকদের নামায পড়াইয়া দেন। ওমর (রাঃ) তাহা অস্বীকার করিয়া বলিলেন, আপনিই এই কার্যের জন্য অধিক যোগ্য। সেমতে আবুবকর (রাঃ) (ঐ নামায এবং আরও) কতিপয় দিনের নামায পড়াইলেন।

১৭৩০। **হাদীছ**:—(৯৯ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রোগ-যাতনা বৃদ্ধি পাইলে একদা বেলাল (রাঃ) আসিয়া তাঁহাকে নামাযের ওয়াক্ত-উপস্থিতি জ্ঞাত করিলেন। সেই অবস্থায় হযরত (দঃ) বলিলেন—লোকদের নামায পড়াইয়া দিবার জন্য আবুবকরকে বল।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি তখন আরজ করিলাম, আবুবকর (নরম-দিল মানুষ ; তিনি) আপনার স্থানে যখন দাঁড়াইবেন তখন আর ক্রন্দনের দরুণ নামাযের ক্বেরাত শুনাইতে সক্ষম হইবেন না, সুতরাং আপনি ওমরকে আদেশ করুন তিনি যেন লোকদিগকে নামায পড়াইয়া দেন। হযরত (দঃ) পুনরায় বলিলেন, আবুবকরকে বল লোকদের নামায পড়াইয়া দিতে।

আয়েশা বলেন, তখন আমি (ওমরের কন্যা উম্মুল-মোমেনীন) হাফ্ছাহকে বলিলাম, আপনি যাইয়া হযরতের নিকট বলুন, আবুবকর আপনার স্থানে দাঁড়াইলে ক্রন্দনের দরুণ লোকদিগকে ক্বেরাত শুনাইতে সক্ষমই হইবেন না ; অতএব আপনি ওমরকে আদেশ করুন, তিনি যেন লোকদের নামায পড়াইয়া দেন। হাফ্ছাহ (রাঃ) হযরত (দঃ)কে ঐরূপ বলিলেন। (এইরূপে তিন-চার বার হযরতের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পেশ করা হইলে অবশেষে বিরক্ত হইয়া) রসুলুল্লাহ (দঃ) (রাগতঃ স্বরে) বলিলেন, তোমাদের অবস্থা ঐনারীদের ন্যায় যাহারা ইউসুফ(আঃ)কে তাঁহার অভিরুচির বিপরীত বিবি জোলেখার অভিপ্রায়ের কাজ করিতে বলিতেছিল। (তোমাদের অপচেষ্টা ত্যাগ কর এবং) আবুবকরকে লোকদের নামায পড়াইয়া দিতে বল।

হাফ্ছাহ (রাঃ) আয়েশা (রাঃ)কে বলিলেন, আপনার পরামর্শে কোন কাজ করিয়া কখনও আমি উহার ভাল ফল লাভ করিতে পারি নাই।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের এক বা দুইদিন পূর্ব্বেঃ

রোগ যাতনা বৃদ্ধির দরুণ উপরোল্লেখিত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে এশার নামায হইতে আবুবকর দ্বারা ইমামতির কার্য্য চালাইবার ব্যবস্থা স্বয়ং হযরত (দঃ) করিয়াছিলেন। সেমতে আবুবকর (রাঃ) প্রতি ওয়াক্তে ইমামতী করিয়া যাইতে লাগিলেন, হযরত (দঃ) মসজিদে তশরীফ আনিতে পারিতেছিলেন না।

পরবর্ত্তী শনিবার বা রবিবার দিন জোহরের নামাযের সময় আবুবকর (রাঃ) ইমাম হইয়া নামায আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন এমতাবস্থায় হযরত(দঃ) কিছুটা স্বস্তি বোধ করিলেন। তৎক্ষণাৎ আলী (রাঃ) ও আব্বাস (রাঃ)কে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাদের উভয়ের কাঁধে ভর করতঃ হযরত (দঃ) মসজিদে তশরীফ আনিলেন এবং ইমাম— আবুবকরের বাম পার্শ্বে বসিয়া নামাযের ইমামতী করিলেন। আবুবকর তাঁহার পক্ষে মোকাব্বেরের কার্য্য চালাইলেন। (সীরাতে মোস্তফা ৩—২০১)

(নামায আরম্ভ হওয়ার পর এই ব্যবস্থা একমাত্র হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পক্ষেই জায়েয ছিল, অন্য কাহারও পক্ষে ইহা সিদ্ধ নহে।)

১৭৩১। ছাদীছ ঃ—(৯৪ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) রোগ যাতনা বৃদ্ধিকালে আবুবকরকে লোকদের নামায পড়াইবার আদেশ করিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর (একদা) হযরত (দঃ) কিছুটা স্বস্তি বোধ করিলেন* এবং স্বীয় কক্ষ হইতে বাহির হইয়া মসজিদে আসিলেন, তখন আবুবকর ইমাম হইয়া লোকদের নামায পড়াইতে ছিলেন। হযরতের প্রতি আবুবকরের দৃষ্টিকোণ পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে আবুবকর ইমামতীর স্থান হইতে পেছনে চলিয়া আসিতে উদ্যত হইলেন। হযরত (দঃ) আবুবকরকে ইশারা করিয়া নিজ স্থানে স্থির থাকিবার আদেশ করিলেন। অতঃপর হযরত (দঃ) আবুবকরের বরাবরে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। তখন (মূল ইমাম হযরত (দঃ) হইলেন) আবুবকর প্রত্যক্ষরূপে হযরতের এক্তেদা করিতেছিলেন, আর অন্যান্য লোকগণ আবুবকরের অনুসরণ করিয়া যাইতেছিল।

---

* মানুষের অন্তিম রোগ সাধারণতঃ প্রকট হইয়া উঠার পর কিছুটা স্বস্তির ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তারপর হঠাৎ ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া চরম অবনতি দ্রুত আসিয়া যায় এবং অনতিবিলম্বে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। হযরতের এই স্বস্তিবোধও ঐ শ্রেণীরই ছিল। বৃহস্পতিবার হইতে রোগ যাতনা প্রকট হওয়ার পর শনিবার বরং খুব সম্ভব রবিবার দুপুরে এই স্বস্তি বোধ পরিলক্ষিত হইল এবং রাত্রিও এই স্বস্তি বোধেই উদযাপিত হইল। পরবর্ত্তী দিন—সোমবার দিন ভোরবেলা ত ঐ স্বস্তিবোধ অধিক দৃষ্ট হইল, এমনকি আবুবকর (রাঃ) সহ অনেকে নিজ নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যেই দ্রুত অবস্থার চরম অবনতি ঘটিল এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হযরত (দঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

এই সময়ের আর একটি ঘটনা :—শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব্বের দিন—রবিবার (সীরতে মোস্তফা ৩—২০২) এই ঘটনা ঘটিল যে, সকাল বেলায় হযরতের রোগকে নিউমোনিয়া সাব্যস্ত করিয়া উহার জন্য কোন পানীয় ঔষধ তাঁহার মুখে ঢালিয়া দেওয়া হইল। হযরত (দঃ) ঐরূপ করিতে নিষেধ করিতেছিলেন, কিন্তু ভক্তগণ উক্ত নিষেধাজ্ঞাকে ঔষধের প্রতি রোগীর সাধারণ বিতৃষ্ণা মনে করিয়া হযরতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঔষধ তাঁহার মুখে ঢালিয়া দিল। হযরত (দঃ) তাহাদের এই কার্য্যের শাস্তি দিয়াছিলেন, যাহার বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে—

১৭৩২। হাদীছ :— (৬৪১ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (নবী (দঃ) রোগ যাতনায় চৈতন্যহীনের ন্যায় হইয়া পড়িলেন,) আমরা তাঁহার মুখে (নিউমোনিয়ার) ঔষধ ঢালিয়া দিতে উদ্যত হইলাম। তিনি ইশারা দ্বারা ঐরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। আমরা মনে করিলাম, ঔষধের প্রতি রুগীর সাধারণ বিতৃষ্ণার দরুণ এই নিষেধাজ্ঞা। তাই আমরা বারণ রহিলাম না। অতঃপর হযরতের পূর্ণ চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে পর তিনি বলিলেন, মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিতে আমি নিষেধ করিয়াছিলাম নয় কি ? আমরা আরজ করিলাম, উহা ত ঔষধের প্রতি রুগীর সাধারণ বিতৃষ্ণা। হযরত (দঃ) বলিলেন, গৃহে উপস্থিত প্রত্যেকের মুখে ঔষধ ঢালিয়া দেও—আমার সম্মুখে ঐরূপ কর, আমি যেন তাহা দেখিতে পাই। অবশ্য আব্বাসকে রেহায়ী দিও, কারণ তিনি ঐ সময় গৃহে উপস্থিত ছিলেন না।

ব্যাখা :— আল্লার ওলীদের সঙ্গে ব্যথাদায়ক ও উত্ত্যক্তজনক কোন ব্যবহার করা হইলে সেখানে আল্লার তরফ হইতে প্রতিশোধ গ্রহণের আশঙ্কা দেখা দেয়, এমনকি ঐরূপ ব্যবহার না বুঝিয়া ভুল বশতঃ করা হইলেও উহার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্যই অনেক সময় আল্লার ওলীদের সাধারণ স্বভাব—উদারতার বিপরীত তাঁহাদের দ্বারা ঐরূপ স্থলে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে দেখা যায়। বস্তুতঃ ইহা সাধারণ লোকদের পক্ষে অতিশয় কল্যাণজনক ব্যবস্থা ; কারণ ওলী যদি স্বয়ং প্রতিশোধ গ্রহণ না করিতেন তবে হয়ত আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে তাহা গ্রহণ করা হইত ; আর আল্লার তরফ হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ সামান্য পরিমাণের হইলেও বস্তুতঃ উহা হইবে অতিশয় কঠোর ও কঠিন। তাই ওলীগণ এরূপ স্থলে দয়াপরবশ হইয়া মানুষকে আল্লার প্রতিশোধ গ্রহণ হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে দ্রুত নিজেই প্রতিশোধ লইয়া থাকেন।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এস্থলে ছাহাবীগণ ঐ ধরণের ব্যবহারই করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভুল বুঝিয়া হযরতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছিলেন, যদ্দরুণ হযরত রাগান্বিত এবং বিরক্ত হইয়াছিলেন। হযরতকে উত্ত্যক্ত করার প্রতিশোধ আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে লওয়া হইলে তাহা হইবে ভয়ঙ্কর, তাই হযরত (দঃ) ছাহাবীদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া দ্রুত নিজেই প্রতিশোধ নিয়া নিলেন।

হযরত (দঃ)কে যে ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল তাহা ছিল "উদেহিন্দী"—কুড়চি বা গিরিমল্লিকা গাছের কাষ্ঠ ও যাইতুন তৈল। এই বস্তুদ্বয় সাধারণভাবে কাহারও পক্ষে ক্ষতি কারক নহে, তাই প্রতিশোধ গ্রহণে ঐ বস্তুই সকলের মুখে ঢালিয়া দেওয়া হইল। এমনকি উম্মুল-মোমেনীন মাইমুনাহ্ (রাঃ)ও ঐ লোকদের একজন ছিলেন, তিনি রোযা রাখিয়াছিলেন, তাঁহার নফল রোযা ভঙ্গ করাইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইয়াছিল।

এই রবিবার দিনই হযরত (দঃ) ঐতিহাসিক উসামা বাহিনী রোমের দিকে প্রেরণ করতঃ বিদায় দান করিয়াছিলেন। যাহার বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

কন্যা ফাতেমার সহিত গোপন আলাপ ঃ

১৭৩৩। হাদীছ ঃ—(৫১২ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা (হযরতের অন্তিম কালে তাঁহার বিবিগণ সকলেই তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন এমতাবস্থায়) ফাতেমা (রাঃ) হযরতের নিকট আসিলেন। ফাতেমার চাল-চলন হুবহু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চাল-চলনের ন্যায় ছিল।

ফাতেমা নিকটে আসিলে পর নবী (দঃ) তাঁহাকে মারহাবা বলিলেন এবং শয্যা-পার্শ্বে বসাইয়া চুপি চুপি তাঁহাকে কিছু বলিলেন ; ফাতেমা ফোঁফাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম, ফাতেমা কাঁদে কেন ? অতঃপর পুনঃ চুপি চুপি তাঁহাকে কিছু বলিলেন ; তাহাতে ফাতেমা হাসিয়া উঠিলেন। আমি বলিলাম হাসি-কান্না উভয়ের এইরূপ সম্মেলন আর কোন দিন দেখি নাই। আমি ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরত (দঃ) কি বলিয়াছেন ? ফাতেমা বলিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) যে কথা গোপনে বলিয়াছেন তাহা আমি প্রকাশ করিতে পারি না।

তারপর হযরত (দঃ) ইহজগৎ ত্যাগ করিয়া গেলে পর ফাতেমাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। ফাতেমা বলিলেন, প্রথমবারে হযরত (দঃ) বলিয়াছিলেন যে, প্রতি বৎসর জিব্রায়ীল (আঃ) আমার সঙ্গে একবার কোরআন শরীফ দওর করিয়া থাকিতেন, এই বৎসর দুইবার দওর করিয়াছেন ; মনে হয় আমার অন্তিমকাল ঘনাইয়া আসিয়াছে। (আমি এই রোগেই ইহজগৎ ত্যাগ করিব) এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্যে তুমি সর্ব্বাগ্রে আমার সঙ্গে মিলিত হইবে (আমার পরে সর্ব্বাগ্রে তোমারই মৃত্যু হইবে।)

(ফাতেমা (রাঃ) বলেন, হযরতের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী) ইহা শুনিয়া আমি কাঁদিয়াছি। তখন হযরত আমাকে বলিয়াছেন, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি বেহেশতবাসী সমস্ত মেয়েদের সর্দ্দার হইবে ? এই সুসংবাদ শুনিয়া হাসিয়াছি।

১৭৩৪। হাদীছ ঃ—(৬৩৮ পৃঃ) আয়েশা বর্ণনা করিয়াছেন, অন্তিম শয্যা-বস্থায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় কন্যা ফাতেমাকে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাহাকে চুপি চুপি কিছু বলিলেন তাহাতে ফাতেমা কাঁদিয়া উঠিলেন। পুনরায় চুপি চুপি কিছু বলিলেন তাহাতে হাসিলেন।

আমরা ফাতেমাকে ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জানাইয়াছেন যে, প্রথমবারে হযরত বলিয়াছিলেন যে, তিনি এই রোগেই ইহজগত ত্যাগ করিবেন ; তাই আমি তখন কাঁদিয়াছিলাম। আর দ্বিতীয়বারে হযরত আমাকে বলিয়াছিলেন যে, (তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ বেশী দিনের নয়) তুমি আমার পরিজনের মধ্য হইতে সর্ব্বাগ্রেই আমার সঙ্গে মিলিত হইতে পারিবে ; এই সংবাদে আমি হাসিয়াছি।

শাহাদতের মর্ত্তবা লাভ ঃ

মাথা ব্যথা ও জ্বরই ছিল হযরতের অন্তিম শয্যার সূচনা এবং মূল পীড়া। কিন্তু পরে উহার সঙ্গে আরও একটি পুরাতন উপসর্গ যোগ হইয়া গিয়াছিল। বহুদিন পূর্ব্বে একবার ইহুদীগণ হযরত (দঃ)কে খাদ্যের সঙ্গে বিষ দিয়াছিল যাহার বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খণ্ড খয়বর যুদ্ধের পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালার কুদরতে এতদিন হযরতের উপর সেই বিষের পূর্ণ প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল না, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে উক্ত বিষের ভয়ানক প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল। যেহেতু এই বিষ শত্রুগণ কর্ত্তৃক প্রয়োগ করা হইয়াছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত উহার প্রতিক্রিয়ায় মৃত্যু ঘটিয়াছিল, তাই হযরত (দঃ) শাহাদতের মর্ত্তবা লাভ করিয়াছিলেন। সাধারণ উপায়ে হযরতের শাহাদৎ হইলে তাহা মোসলমানদের পক্ষে কলঙ্ক হইত, তাই আল্লাহ তায়ালা স্বীয় হাবীবের পক্ষে শাহাদতের ন্যায় বড় মর্ত্তবা লাভের জন্য উক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

১৭৩৫। হাদীছ ঃ—(৬৩৭ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার অন্তিম শয্যায় বলিয়া থাকিতেন, হে আয়েশা! খয়বর দেশে ইহুদীদের দাওয়াতে যে বিষ মিশ্রিত খাদ্য খাইয়াছিলাম এখন উহার প্রতিক্রিয়া ও কষ্ট যাতনা বিশেষরূপে অনুভব করিতেছি, এমনকি মনে হইতেছে, উহার চাপে আমার হৃদতন্ত্রী বা অন্তর-রগ ছিন্ন হইয়া যাইবে।

জীবনের সর্ব্বশেষ দিন ঃ

সোমবার দিন—আজ হযরত ইহজগৎ ত্যাগ করিয়া যাইবেন, কিন্তু আজ নবী (দঃ) অবিচলিত অবস্থায় রাত্রি যাপন করিয়াছেন। মসজিদে লোকগণ আবুবকরের ইমামতীতে ফজরের নামায আদায় করিতেছে। হযরত (দঃ) স্বীয় কক্ষের দরওয়াজায় আসিলেন এবং দরওয়াজার পর্দ্দা উঠাইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে নামায আদায়ের দৃশ্য এবং আবুবকরের পেছনে সকলের সমবেত হওয়ার দৃশ্য অবলোকন করতঃ সন্তুষ্টিভরে মুস্কি হাসি হাসিলেন। সেই বিবরণই নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে।

১৭৩৬। হাদীছ ঃ -(৯৩,৯৪ ও ৬৪০ পৃঃ) আনাছ (রাঃ) যিনি দীর্ঘ দশ বৎসর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন এবং হযরতের খেদমত করিয়াছেন তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রি এশার

নামায হইতে তথা শুক্র, শনি, রবি এই) তিন দিন হযরত (দঃ) নামাযের জন্য মসজিদে আসিতে পারিতেছেন না। (আবুবকর (রাঃ) নামায পড়াইতেছেন ;) সোমবার ভোরে মোসলমানগণ মসজিদে ফজরের নামায আদায় করিতেছিলেন ; আবুবকর (রাঃ) তাহাদের ইমামতী করিতেছিলেন। হঠাৎ রসুলুল্লাহ (দঃ) (তাঁহার অবস্থান স্থল) আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার কক্ষের দরওয়াজার পর্দ্দা উঠাইয়া (কক্ষ সংলগ্ন মসজিদে) লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। (হযরতের চেহারা মোবারক রক্তহীনতার দরুণ কাগজের মত সাদা দেখাইতেছিল।) লোকগণ তখন কাতার বাঁধিয়া নামায আদায় করিতেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে হযরত (দঃ) মুস্কি হাসি হাসিতে ছিলেন। আবুবকর (রাঃ) হযরতের অগ্রসর হওয়া অনুভব করিতে পারিলেন এবং ইমামতির স্থান ত্যাগ করিয়া মোক্তাদিদের কাতারে মিলিত হইবার জন্য পেছনের দিকে পিছ্-পা চলিয়া আসিতে উদ্যত হইলেন। কারণ, তিনি ভাবিলেন, হযরত (দঃ) মসজিদে তশরীফ আনিবেন। মোক্তাদিগণ ত হযরতের মসজিদে আগমন অনুভবে অধিক খুসি হইয়া নামায ভঙ্গ করার উপক্রম করিয়া বসিল। হযরত (দঃ) হাতের ইশারায় আদেশ করিলেন, তোমরা নামায পুরা করিয়া লও ; এই বলিয়া হযরত (দঃ) পর্দ্দা ছাড়িয়া দিলেন এবং কক্ষের ভিতরে চলিয়া গেলেন। ঐ দিনই হযরতের এন্তেকাল হইয়া গেল, হযরত (দঃ)কে পুনঃ দেখার সুযোগ আর হইল না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—জীবনের শেষ সময়ে মৃত্যুর মুখে আসিয়া অনেক সময় মানুষ কিছুটা সুস্থ হইয়া দাঁড়ায় ; রবিবার দুপুর হইতে হযরতের সেই অবস্থা এবং আজ সোমবার ভোর পর্য্যন্ত হযরত (দঃ) সেই অবস্থার চরমে উপনীত হইয়াছেন। সাধারণ ভাবে লোকগণ হযরতের এই স্বস্তির পরিণাম উপলব্ধি করিতে পারে নাই, এমনকি আবুবকর (রাঃ) এই দিন হযরত (দঃ)কে সুস্থ দেখিয়া ফজর নামাযান্তে হযরতের অনুমতি লইয়া মদিনা শহরের দূর প্রান্তে অবস্থিত এক স্ত্রীর আবাস গৃহে চলিয়া গেলেন। আরও অনেকে যাঁহারা বৃহস্পতিবার হইতে হযরতের অবস্থার অবনতি দৃষ্টে হযরতের নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন আজ তাঁহারাও চলিয়া গেলেন।

অবশ্য হযরতের ঘনিষ্ট জ্ঞাতি—চাচা আব্বাস (রাঃ) হযরতের চেহারা মোবারক দেখিয়া পরিণতির কিছুটা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন।

১৭৩৭। হাদীছঃ— (৬৩৯ পৃঃ) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আলী (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট হইতে তাঁহার রোগ অবস্থায় চলিয়া আসিলেন। লোকগণ আলী (রাঃ)কে হযরতের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। আলী (রাঃ) বলিলেন, আল্‌হামদু লিল্লাহ্—আজ হযরত (দঃ) একটু সুস্থতার মধ্যে রাত্রি প্রভাত করিয়াছেন। তখন আব্বাস (রাঃ)

আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হাত ধরিয়া নিয়া গেলেন এবং বলিলেন, খোদার কসম—তুমি তিন দিন পরেই (তথা অচিরেই) অন্যের লাঠির দ্বারা পরিচালিত হইবে। খোদার কসম—আমার ধারণা এই যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) এই রোগেই মৃত্যুবরণ করিবেন। আমি আবদুল মোত্তালেবের বংশধরগণের মৃত্যু সময়কালীন চেহারার অবস্থা ভালরূপেই ঠাহর করিতে পারি। সুতরাং তুমি আমাকে নিয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট চল। আমরা তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করি, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনের দায়িত্ব কাহাকে বহন করিতে হইবে ?

যদি সেই দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত করেন তবে তাহা আমরা তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়া রাখিব, আর যদি অন্যদের কথা বলেন তবে তাহাও জানিয়া রাখিব এবং হযরত (দঃ) আমাদের সম্পর্কে একটা অছিয়ত নামা লিখিয়া দিয়া যাইবেন।

আলী (রাঃ) বলিলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে যদি তিনি আমাদের সম্পর্কে "না" বলিয়া দেন তবে ত আর সেই অধিকার লাভের জন্য লোকদের নিকট দাঁড়াইবারও কোন সুযোগ আমাদের থাকিবে না, অতএব আমি ঐ বিষয়ে কোন কথা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিব না।

জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত ঃ

সোমবার দিন দুপুর হওয়ার পূর্ব্বেই হযরতের অবস্থার ভয়ানক অবনতি ঘটিল। উম্মুল-মোমেনীন আয়েশা (রাঃ) এবং ফাতেমা (রাঃ) নিকটেই ছিলেন। মৃত্যুর স্বাভাবিক যাতনার মধ্যে হযরতের শেষ মুহূর্ত্তগুলি কাটিতেছিল।

১৭৩৮। **হাদীছ ঃ—**(৬৭১ পৃঃ) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন রোগের ভীষণ চাপে অত্যধিক কাতর হইয়া পড়িয়াছেন এবং পুনঃ পুনঃ চেতনা হারাইয়া ফেলিতেছেন তখন ফাতেমা (রাঃ) চীৎকার করিয়া উঠিলেন—হায়! আমার পিতার কী কষ্ট! নবী (দঃ) ফাতেমা (রাঃ)কে বলিলেন, আজিকার এই অল্প সময়ের পরে তোমার পিতার আর কোন কষ্ট-ক্লেশ থাকিবে না।

নবীজীর শেষ মুহূর্ত্ত ফুরাইয়া গেলে ফাতেমা(রাঃ) কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, আ···হ্! আমার পিতা প্রভুর ডাকে চলিয়া গিয়াছেন। আ···হ্! আমার পিতা ফেরদাউস-বেহেশতের বাসস্থানে চলিয়া গেলেন। আ···হ্! আমার পিতার শোক-সংবাদ জিব্রাঈলও অবগত হইয়াছেন; (আর ত তিনি ওহী নিয়া আসিবেন না।)

নবীজীর দেহ মোবারক সমাধিস্থ করা হইলে ফাতেমা (রাঃ) শোকাভিভূত স্বরে বলিলেন, হে আনাছ! তোমাদের প্রাণ কিভাবে সহ্য করিল যে, তোমরা আল্লার রসুলকে মাটির আড়ালে করিয়া দিলে।

বিশিষ্ট তাবেয়ী ছাবেৎ (রঃ) এই হাদীছ বর্ণনা করিতে এরূপ কাঁদিতেন যে, তাঁহার বুক ফুলিয়া উঠিত (বেদায়াহ, ৪—২৭৩)।

১৭৩৯। হাদীছ :—(৬৩৯ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তখন তিনি আমারই বুকের সঙ্গে হেলান দেওয়া ছিলেন, তাঁহার মাথা আমার ছিনা ও থুতির মধ্যস্থলে ছিল। আমি তাঁহার মৃত্যু-যাতনা দেখিবার পর কাহারও পক্ষে মৃত্যু-যাতনাকে অশুভ বলিয়া গণ্য করিতে পারি না।

১৭৪০। হাদীছ :—(৬৩৯পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে হযরত নবী (দঃ) স্বীয় পিঠ দ্বারা আমার প্রতি ভর লাগাইয়াছিলেন, এমতাবস্থায় আমি তাঁহার প্রতি নিবীরে কান লাগাইয়া শুনিতে পাইলাম তিনি বলিতেছেন—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى

"হে আল্লাহ। আমার সমস্ত গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া দাও, আমার প্রতি রহমত ও দয়া কর এবং আমাকে উর্দ্ধ জগতের বন্ধুর সঙ্গে মিলনের ব্যবস্থা করিয়া দাও।"

১৭৪১। হাদীছ :—(৬৩৮ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট শুনিয়া থাকিতাম, কোন নবীকে দুনিয়া এবং আখেরাতের উভয় জিন্দেগীর যে কোন একটাকে অবলম্বন করার পূর্ণ এখ্তিয়ার দেওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হয় না।

হযরত (দঃ) স্বয়ং যখন রোগ শয্যায় রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় উপনিত হইলেন তখন তিনি এই আয়াতখানা তেলাওয়াত করিতেছিলেন—

مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰئِكَ رَفِيْقًا ـ

অর্থ—যাঁহাদের প্রতি আল্লার বিশেষ করুণা রহিয়াছে—নবীগণ, ছিদ্দিকগণ, শহীদগণ এবং বিশেষ নেক বন্দাগণ তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করিতে চাই; তাঁহারাই হইতেছেন অতি উত্তম সঙ্গী।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরতের মুখে এই আয়াত শ্রবণে আমি বুঝিতে পারিলাম, হযরত (দঃ)কে সেই এখ্তিয়ার দেওয়া হইয়াছে (এবং তিনি আখেরাতের জিন্দেগীকেই গ্রহণ করিয়া নিয়াছেন।)

১৭৪২। হাদীছ :—(৬৩৮ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সুস্থ থাকাবস্থায় বলিয়া থাকিতেন, কোন নবীর

মৃত্যু হয় না যাবৎ তাঁহাকে তাঁহার বেহেশ্‌তের বাসস্থান দেখাইয়া তাঁহাকে (দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জিন্দেগীর) এখ্‌তিয়ার বা পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা না হয়।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত (দঃ) যখন রোগশয্যায় জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে পৌঁছিলেন তখন তাঁহার মাথা আমার উরুর উপর ছিল এবং তিনি চৈতন্যহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতঃপর যখন তাঁহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল তখন উর্দ্ধদিকে তাকাইয়া বলিলেন, اَللّٰهُمَّ فِى الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى—হে আল্লাহ উর্দ্ধ জগতের বন্ধুগণের সঙ্গে সামিল হইতে চাই।

এতচ্ছ্রবনে আমি বুঝিয়া নিলাম যে, এখন আর হযরত আমাদের মধ্যে থাকিবেন না এবং ইহাও উপলব্ধি করিতে পারিলাম যে, হযরত (দঃ) সুস্থাবস্থায় যাহা বলিয়া থাকিতেন ইহা উহারই তাৎপর্য্য।

১৭৪৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন সময় অসুস্থতা বোধ করিলে কুল্‌ আউজু বে-রাব্বিল্‌ ফালাক্‌ ও কুল্‌ আউজু বে-রাব্বিন্‌ নাছ্‌—এই ছুরাদ্বয় পাঠ করতঃ উভয় হস্তে ফুৎকার মারিয়া হস্তদ্বয় সর্ব্ব শরীরে বুলাইয়া দিতেন।

হযরত (দঃ) যখন অন্তিম রোগে আক্রান্ত হইলেন তখন (স্বয়ং নিজে তিনি ঐরূপ করিতেন না।) আমি উক্ত ছুরাদ্বয় পাঠ করতঃ হযরতের হস্তদ্বয়ে ফুৎকার মারিতাম এবং তাঁহার হস্তদ্বয়ই তাঁহার শরীরে বুলাইয়া নিতাম।

নবীজীর জীবনের শেষ মুহূর্ত্তের আর একটি সতর্কবাণী বিশেষ অনুধাবন যোগ্য—যাহা প্রথম খণ্ডে অনূদিত হইয়াছে ; ২৭৮ নং হাদীছ।

১৭৪৪। হাদীছ ঃ—(৬৪০ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার উপর আল্লাহ তায়ালার একটি বিশেষ নেয়ামত এই হইয়াছে যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন, আমার গৃহে এবং আমার জন্য নির্দ্ধারিত দিনে এবং আমার (বুকে হেলান দেওয়া অবস্থায় আমার) ছিনা ও থুতির মধ্যস্থলে থাকিয়া। তদুপরি শেষ মুহূর্ত্তে আল্লাহ তায়ালা হযরতের এবং আমার—উভয়ের থুথু একত্রিত করিয়া দিয়াছিলেন—যাহার ঘটনা এই যে—

আমার ভ্রাতা আব্দুর রহমান হাতে তাজা একটি মেছওয়াকের ডালা লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল ; তখন আমি হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে আমার বুকের সঙ্গে হেলান দেওয়াইয়া রাখিয়াছিলাম। আমি লক্ষ্য করিলাম, হযরত (দঃ) আবদুর রহমানের প্রতি বিশেষ ভাবে তাকাইতেছেন ; তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, হযরত (দঃ) মেছওয়াকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। আমি হযরত (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ মেছওয়াক আপনার জন্য লইব কি ? হযরত (দঃ) মাথার দ্বারা ইশারা

করিয়া বলিলেন, হাঁ। আমি মেছওয়াক আনিয়া হযরত (দঃ)কে প্রদান করিলাম। উহাকে চিবান তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইল ; সুতরাং আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি ইহাকে চিবাইয়া নরম করিয়া দিব কি ? হযরত (দঃ) মাথা দ্বারা ইশারা করিয়া হাঁ বলিলেন। তখন আমি মেছওয়াকটিকে লইয়া ভালভাবে চিবাইলাম (এবং উহাকে ঝাড়িয়া সুন্দররূপে পরিষ্কার করতঃ হযরত (দঃ)কে প্রদান করিলাম।) অতঃপর হযরত (দঃ) উহা দ্বারা এমন সুন্দর ভাবে দাঁত মর্দ্দন করিলেন যে, ঐরূপ আর কখনও দেখি নাই। হযরত উহা দ্বারা মেছওয়াক করিলেন, তখন তাঁহার সম্মুখে একটি পাত্র ছিল এবং উহার মধ্যে পানি ছিল। হযরত (দঃ) বার বার স্বীয় হস্তদ্বয় পানির মধ্যে ভিজাইয়া উহা দ্বারা মুখমণ্ডল ঠাণ্ডা করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ -

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ; মৃত্যুর যাতনা অনেক।"

অতঃপর উপরের দিকে হস্ত উত্তোলন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "فِى الرَّفِيقِ الْاَعْلٰى —উর্দ্ধ জগতের বন্ধুর সঙ্গে মিলন চাই।" এই বলিতে বলিতে হস্ত মোবারক শিথিল হইয়া পড়িয়া গেল এবং তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

জীবন সায়াহ্নের কতিপয় বাণী ঃ

১। জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে বলিতে শুনিয়াছি– আল্লার প্রতি তোমার ভাল ধারণা রাখিও। তোমাদের প্রত্যেকের মৃত্যু যেন এই অবস্থায় হয় যে, আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভাল ধারণা থাকে (বেদায়াহ, ৪—২৩৮)।

ব্যাখ্যা—আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভাল ধারণা তথা তাঁহার রহমত লাভের আশা পোষণ করা তখনই সম্ভব হইবে যখন আমল ভাল হয়। সাধ্যানুসারে বা সাধারণ পর্য্যায়ে ভাল আমল করিয়াও অনেকের মনে আল্লার আজাবের আতঙ্ক ও ভীতির প্রাবল্য থাকে ; তাঁহাদের প্রতি নবীজীর উপদেশ—মৃত্যু ঘনাইয়া আসিলে আল্লাহ তায়ালার রহমতের আশা প্রবল রাখিবে।

২। আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জীবনের শেষ মুহূর্ত্তসমূহে পুনঃ পুনঃ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া থাকিতেন—

নামায, নামায—সাবধান।

দাস দাসীদের প্রতি সাবধান।।

আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে আদেশ করিলেন কোন একটি প্রশস্ত বস্তু আনিতে যাহাতে তিনি এমন বিষয় লিখিয়া যাইবেন যাহা পাওয়ার পর উম্মত গোমরাহ হইবে না।

আলী (রাঃ) বলেন, আমার ভয় হইল যে, আমি দূরে গেলে হয় ত নবীজীর শেষ নিঃশ্বাসের সময়টুকু হারাইয়া বসিব। তাই আমি আরজ করিলাম, আমি স্মরণ রাখিব এবং সযত্নে কণ্ঠস্থ করিয়া লইব। নবীজী (দঃ) বলিলেন, তোমাদিগকে শেষ উপদেশ দিতেছি—নামায এবং যাকাত, আর দাস-দাসীদের প্রতি সদয় থাকিও।

উম্মুল-মোমেনীন বিবি উম্মে-সালামা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শেষ নিঃশ্বাসের বেলায়ও বলিতেছিলেন, নামায এবং দাস-দাসী। এমনকি তাঁহার জবান চলে না, তবুও তাঁহার কণ্ঠনালীর মধ্যে ঐ কথার গরগর শব্দ শ্রুত হইতে ছিল (নেছায়ী শরীফ)। বেদায়াহ, ৪—২৩৮

৩। আয়েশা (রাঃ) ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—(যাহা প্রথম খণ্ডে ২৭৮ নং হাদীছে অনুদিত হইয়াছে যে,) নবীজী (দঃ) যখন মৃত্যু যাতনায় অস্থির ছিলেন যদ্দরুন মুখমণ্ডল একবার চাদরে আবৃত করিতেছিলেন, আর একবার উন্মুক্ত করিতেছিলেন এইরূপ অস্থিরতার মধ্যেও নবীজী (দঃ) স্বীয় উম্মতকে কবরের সেবা ও শ্রদ্ধার নামে কবর-পূজা হইতে সতর্ক করণার্থে বলিতেছিলেন, ইহুদী ও খৃষ্টানদের উপর লা'নৎ বা অভিশাপ; তাহারা তাহাদের নবীগণের এবং নেককার ব্যক্তিবর্গের কবরকে সেজদার স্থান বানাইয়াছিল। সাবধান! তোমরা ঐরূপ করিবে না—আমি কঠোরভাবে উহা নিষেধ করিয়া যাইতেছি।

নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অন্তিমকালের এই অছিয়ৎ—উপদেশকে এই যুগের উম্মতগণ যেভাবে লঙ্ঘন করিতেছে তাহা দেখিলে শরীর শিহরিয়া উঠে।

নবীজীর সর্ব্বশেষ বচন (৬৪১ পৃঃ)

১৭৪৫। হাদীছঃ— عن عائشة رضى الله تعالى عنها

......قَالَتْ وَكَانَتْ اٰخِرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْاَعْلٰى

অর্থ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে উচ্চারিত সর্ব্বশেষ বচন ছিল—"আল্লাহুম্মার-রফীকাল্ আ'লা" হে আল্লাহ—আমার পরম সুহৃদ। (তোমার মিলন চাই।)

কালেমা-তায়্যেবা—"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"এর যে মর্ম্ম—তৌহীদ ও একাত্ববাদ তাহা পূর্ণরূপে এই বাক্যের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। এই বাক্যের মর্ম্ম হইল—একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই চাই; আমার লক্ষ্য একমাত্র তাঁহারই প্রতি (যোরকানী, ৮—২৮২)।

কালেমা-তায়্যেবার মর্ম্ম—এক আল্লার প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করা, ইহার বিকাশ এই বাক্যে অতি উচ্চাঙ্গ পর্য্যায়ে। কারণ, ঐ মর্ম্ম কালেমা-তায়্যেবাতে আছে শুধু স্বীকৃতি পর্য্যায়ে, আর এই বাক্যে উহা রহিয়াছে মহব্বত ও প্রেমের বন্ধন পর্য্যায়ে। "রফীক্বাল্ আ'লা"এর অর্থ পরম বন্ধু, পরম সুহৃদ, পরম প্রিয়, পরম প্রেমাস্পদ—আল্লাহ ; একমাত্র তাঁহার মিলন কামনা করি।

নবীজী মোস্তফা (দঃ) "হাবীবুল্লাহ"—আল্লার প্রিয়পাত্র। তিনি সারা জীবন এই আখ্যার স্বীকৃতি আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে লাভ করিয়াছেন। এখন জীবনের সর্ব্বশেষ প্রান্তে সেই আল্লার সান্নিধানে পৌঁছিবার শুভ মুহূর্ত্তে তাঁহাকে তিনি পরম বন্ধু, পরম সুহৃদ নামে ডাকিলেন এবং বরণ করিলেন ; ইহা কতইনা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

নবীজী মোস্তফা (দঃ) অন্তিম অবস্থায় বারংবার অচেতন হইয়া পড়িতেছিলেন। প্রত্যেকবার চৈতন্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বাক্য বলিয়া উঠিতেন। শেষ নিশ্বাসের সঙ্গেও পবিত্র জবান হইতে শেষ বাণী উহাই উচ্চারিত হইল এবং উহার মর্ম্মানুযায়ী তাঁহার পবিত্র আত্মা তাঁহার পরম সুহৃদ আল্লাহ তায়ালার সন্নিধানে মহাপ্রস্থান করিল।

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ - وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهٖ

مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

বিবি আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবীজীর পবিত্র আত্মার মহাপ্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে এমন সুগন্ধি ছড়াইয়া পড়িল যাহা জীবনে কোন সময় লাভ হয় নাই।

বিবি উম্মে-ছালমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবীজীর মহাপ্রস্থানের দিন আমি একবার তাঁহার পবিত্র বক্ষের উপর হস্ত স্পর্শ করিয়াছিলাম ; আমার হাতে এমন সুগন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল যে, দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত অজু-গোছলে ধোয়া-মোছা সত্ত্বেও আমার হস্তে কস্তুরীর সুগন্ধী পাওয়া যাইত। (বেদায়াহ, ৪, ২৪১)

অন্তিম শয্যায় নবীজীর বিভিন্ন ভাষণঃ

শেষ নিশ্বাস ত্যাগের চার দিন পূর্ব্বে বৃহস্পতিবার দিন জোহর নামাযান্তে মসজিদের মিম্বারে আরোহণপূর্ব্বক নবীজী (দঃ) যে ভাষণ দিয়াছিলেন উহাই ছিল তাঁহার বিদায়কালীন প্রসিদ্ধ এবং প্রকাশ্যভাবে সর্ব্বসাধারণ সমক্ষের শেষ ভাষণ। এই ভাষণে নবী (দঃ) অনেক বিষয়ই বয়ান করিয়াছিলেন এবং তাহা অংশ অংশরূপে বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত আছে। যথা—মিম্বারে আরোহণের পূর্ব্বে সর্বপ্রথম নবীজী (দঃ) ওহোদ-জেহাদের শহীদানদের জন্য বিদায়ী হৃদয়ের সমুদয় ভাবাবেগ ঢালিয়া দিয়া দোয়া করিলেন। প্রথম খণ্ড ৬৯৯ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য

অতঃপর মিম্বারে আরোহণ পূর্বক প্রথমই তাঁহার ইহজগত ত্যাগ ও পরপারের যাত্রাকে অবলম্বন করার কথা ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু নিজের নাম প্রকাশ না করিয়া অনির্দিষ্ট কোন এক ব্যক্তির বিষয়রূপে প্রকাশ করিলেন। ফলে জনসাধারণ বুঝিতে পারিলনা যে, নবীজী অচিরেই আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন, কিন্তু আবুবকর (রাঃ) বিষয়টি ভালভাবেই বুঝিতে পারিলেন এবং তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। আবুবকরের ক্রন্দনে নবীজী অত্যন্ত অভিভূত হইলেন; তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং নবীজীর জন্য তাঁহার অসাধারণ ত্যাগ, দান ও সেবার স্বীকৃতি দান পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি গভীর ভালবাসা প্রকাশ করিলেন। ১৭২৩ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য

অতঃপর সুস্পষ্ট ভাষায় সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া অগ্রগামীরূপে আখেরাতের মঞ্জিলে চলিয়া যাইতেছি। আল্লার দরবারে আমি তোমাদের জন্য সাক্ষী হইব। হাওজে-কাওছারে আমার সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাতের ওয়াদা রহিল। হাওজে কাওছার (বাস্তব, সৃষ্ট) এখনও আমি দেখিতেছি। আমাকে সমগ্র দুনিয়ার ধন-ভাণ্ডারের চাবী দিয়া দেওয়া হইয়াছে; (অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের উপর মোসলমানদের আধিপত্য স্থাপিত হইবে।) আমি এই ভয় আর করি না যে, আমার তিরোধানের পর তোমরা শির্‌ক বা অংশীবাদে লিপ্ত হইবে। তবে আমার এই ভয় হয় যে, তোমরা দুনিয়ার ধন-দৌলত, জাক জমক ও আরাম-আয়েশের প্রতি অতিশয় ঝুকিয়া পড়িবে—প্রতিযোগিতামূলকভাবে উহাতে লিপ্ত ও মত্ত হইবে। ফলে দুনিয়া তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবে যেরূপ তোমাদের পূর্ব্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করিয়াছে।*

কবরপুজা সম্পর্কে সতর্ক করিয়া নবী (দঃ) বলিলেন, খৃষ্টান ইহুদীদের প্রতি আল্লার লা'নৎ ও অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে; তাহারা তাহাদের পীরপয়গাম্বর-গণের কবরকে সেজদা করিয়াছে। আমি তোমাদিগকে কঠোরভাবে নিষেধ করিতেছি, খবরদার—তোমরা ঐরূপ করিবে না, আমার কবরকেও তোমরা পুজা করিবে না। প্রথম খণ্ড ২৭৮ নং ও ১৭২৫ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য

ইসলামের জন্য মদিনাবাসী আনছারগণের জান-মাল সর্ব্বস্ব ত্যাগের স্বীকৃতি দানে নবীজী (দঃ) তাঁহাদের সম্পর্কে বলিলেন—

আনছারগণ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং ব্যক্তিগত সর্ব্বময় সম্পর্কের অধিকারী। তাঁহারা তাঁহাদের দায়িত্ব পুর্ণরূপে আদায় করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের প্রাপ্য বাকি রহিয়াছে। তাঁহাদের ভাল কাজের স্বীকৃতি দিবে এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া চলিবে, ক্ষমা করিবে।

* প্রথম খণ্ডের ৬৯৯ নং হাদীছ যাহা মুল কেতাবে ১৭৯ ও ৫৭৬ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে, কিছু অংশ মেশকাত শরীফ ৫৪৭ পৃষ্ঠায় আছে।

আমি মোহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) উম্মতের যে কোন ব্যক্তি কাহারও ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবে তাহার প্রতি আমার বিশেষ নির্দ্দেশ—সে যেন আনছারগণের ভাল কাজের স্বীকৃতি দেয় এবং তাঁহাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া চলে। ১৭২৬ নং ও ১৭২৭ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য

নবম হিজরী সন হইতে সমগ্র আরব উপদ্বীপকে ইসলামের কেন্দ্ররূপে গড়িয়া তোলার জন্য তথা হইতে মোশরেক-পৌত্তলিকদের উচ্ছেদ সাধনের যে অভিযান আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নির্দেশে আরম্ভ করা হইয়াছিল—সেই অভিযান চালাইয়া যাওয়ার নির্দেশ দানে নবীজী (দঃ) বলিলেন, সমগ্র আরব উপদ্বীপের সীমানা হইতে মোশরেক পৌত্তলিকদেরকে বহিষ্কার করিয়া দিবে। আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সৌহার্দ্য বজায় রাখিবে। রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিবর্গকে উপহার দেওয়ার যে নীতি আমার ছিল সেই নীতি তোমরাও অনুসরণ করিয়া চলিবে। ১৭২৮ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য

নবীজী (দঃ) আরও বলিলেন—হে লোকসকল! আমি শুনিতে পাইয়াছি, তোমরা তোমাদের নবীর মৃত্যুর ভাবনায় আতঙ্কিত। বলত! আমার পূর্ব্বে কোন নবী তাঁহার উম্মতের মধ্যে চিরদিন রহিয়াছেন কি? তাহা হইলে আমিও চিরদিন থাকিতে পারিতাম। সত্যই—আমি আমার প্রভু-পরওয়ারদেগারের সন্নিধানে চলিয়া যাইব। তোমারাও তাঁহার সন্নিধানে যাইবে।

আমি তোমাদেরে বিদায়ী উপদেশ দিতেছি—তোমরা ইসলামের জন্য সর্বস্ব ত্যাগী মোহাজেরদের মর্য্যাদার প্রতি সচেতন থাকিও। মোহাজেরগণকেও আমি উপদেশ দেই, তাঁহারা যেন নিজ নিজ অবস্থার সংশোধন করিয়া সৎ-সাধু হয়। আল্লাহ তায়ালা (ছুরা আছ্‌রের মধ্যে) বলিয়াছেন, মানুষ ধ্বংসের সম্মুখীন ; একমাত্র তাহারা ব্যতিত যাহারা ঈমান বজায় রাখে এবং নেক আমলসমূহ সম্পাদন করিয়া চলে, আর সৎপথে এবং সত্যের উপর দৃঢ়-পদ থাকার প্রতি মনোযোগী ও আহ্বানকারী হয়। সব কাজই আল্লার আদেশে হইয়া থাকে। অতএব কোন কাজে বিলম্ব হইলে ব্যতিব্যস্ত হইও না। কাহারও ব্যতিব্যস্ততায় আল্লাহ ব্যতিব্যস্ত হইবেন না। আল্লাহ সকলের উপর প্রবল, আল্লার উপর কেহ প্রবল হইতে পারেনা। আল্লার সঙ্গে চালবাজি করিলে আল্লাহ তাহাকে উহার পরিণাম ভোগাইবেন।

তোমরা যদি ইসলামের শিক্ষা হইতে বিরাগী হও তবে তোমাদের দুনিয়ারও বিপর্য্যয় ঘটিবে এবং পরস্পরের সৌহার্দ্য বিনষ্ট হইবে। মদিনাবাসী আনছারদের প্রতি উত্তম ব্যবহারের উপদেশ দিতেছি। তাহারা তোমাদের পূর্ব্ব হইতেই মদিনার অধিবাসী এবং অতি যত্নের সহিত ঈমান গ্রহণ ও বরণকারী। তোমরা তাহাদের প্রতি সদয় থাকিও। তাহারা তাহাদের জায়গা-জমির উৎপন্ন বণ্টন করিয়া তোমাদেরে সমান

ভাগ দান করিয়াছে, বাড়ী-ঘরে স্থান দান করিয়াছে। নিজেরা অনাহারী থাকিয়াও তোমাদেরকে অগ্রগণ্য করিয়াছে। তাহাদিগকে তোমরা পেছনে ফেলিও না।

আমি তোমাদেরই অগ্রগামী ব্যবস্থাপকরূপে পরকালীন জগতের প্রতি চলিয়া যাইতেছি। পরে তোমরা আমার সঙ্গে মিলিত হইবে। হাওজে-কাওছারের কূলে তোমরা আমার সাক্ষাৎ পাইবে। কিন্তু স্মরণ রাখিও—পরকালের জীবনে হাওজে-কাওছারের কূলে আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার যদি আকাঙ্খা থাকে তবে স্বীয় মুখ এবং হাতকে অবাঞ্ছিত কার্য্যাবলী হইতে বিরত রাখিবে।

হে জনমণ্ডলী। আল্লাহ তায়ালার নাফরমানী আল্লাহ তায়ালার দেওয়া নেয়ামত সমূহকেও পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়। মনে রাখিও—

জনসাধারণ সৎ, নেককার ও ভাল হইলে শাসনকর্ত্তাগণও সৎ-সাধু, ভাল হইবে। আর জনসাধারণ ফাছেক-ফাজের হইলে তাহাদের শাসনকর্ত্তা তাহাদের অশান্তি আনয়নকারী হইবে। (যোরকানী, ৮—২৬৮)

তুলনাহীন আদর্শের একটি ভাষণ ঃ

ফজল-ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ্ (দঃ) তাঁহার অন্তিম শয্যায় একদা ভীষণ জ্বর অবস্থায় মাথায় পট্টি বাঁধিয়া আমার নিকটে আসিলেন এবং বলিলেন, হে ফজল। তুমি আমাকে হাতে ধরিয়া নিয়া চল। সেমতে আমি হাতে ধরিয়া তাঁহাকে নিয়া চলিলাম; তিনি মিম্বারের উপর যাইয়া বসিলেন এবং বলিলেন, হে ফজল! লোকদেরকে নামাযে উপস্থিত হওয়ার ডাক দাও। আমি "নামাযের জন্য আস" বলিয়া ধ্বনি দিলাম; জনগণ মসজিদে উপস্থিত হইল। ; ইহে অসাল্লাম ভাষণ দানে দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন—

হে লোকসকল! তোমাদের মধ্য হইতে আমার বিদায় গ্রহণ নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে; অতঃপর তোমরা আমাকে এই স্থানে তোমাদের মধ্যে আর দেখিতে পাইবে না। আমি তোমাদের নিকট একটি জরুরী কথা বলিব; আমার পক্ষ হইতে অন্য কেহ ঐ কথাটি পৌঁছাইলে তাহা যথেষ্ট হইবে না ভাবিয়া আমি নিজেই তোমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি।

তোমরা লক্ষ্য করিয়া শুন—কাহারও পৃষ্ঠে আমি কোন আঘাত করিয়া থাকিলে আমার পৃষ্ঠ উপস্থিত রহিয়াছে; সে যেন তাহার ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া নেয়। আমার মন্দ বলার দ্বারা কাহারও সম্মানের হানি হইয়া থাকিলে আমার সম্মান উপস্থিত রহিয়াছে; সে যেন প্রতিশোধ নিয়া নেয়।

কেহ যেন ভয় না করে যে, (ঐরূপ করিলে) তাহার প্রতি আল্লার রসুলের আক্রোশ থাকিয়া যাইবে। স্মরণ রাখিও—কাহারও প্রতি আক্রোশ রাখা আমার স্বভাবে ও চরিত্রে নাই। আমার সর্ব্বাধিক ভালবাসা ঐ ব্যক্তির জন্য যে, আমার হইতে তাহার

হক আদায় করিয়া নিবে যদি আমার উপর তাহার কোনও দাবী থাকে, কিম্বা আমার হইতে দাবী ছাড়িয়া মাফ করিয়া দিবে। আমি যেন মহান আল্লার সাক্ষাতে এমন পাক-ছাফ অবস্থায় যাইতে পারি যে, আমার উপর কাহারও কোন দাবী না থাকে।

ফজল (রাঃ) বলেন—(নবীজীর ভালবাসা প্রাপ্তির) এই ঘোষণা শুনিয়া এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনার নিকট আমার তিনটি দেরহাম প্রাপ্য আছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি কাহারও দাবী অস্বীকার করিব না বা দাবীদারকে কসম খাইতেও বলিব না। তবে তোমার প্রাপ্য কি সূত্রে? ঐ ব্যক্তি বলিল, হুজুরের স্মরণ আছে কি? একদা এক সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তিকে (হুজুরের পক্ষ হইতে) তিনটি দেরহাম দেওয়ার জন্য আমাকে বলিয়াছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) তখন বলিলেন, হে ফজল! তাহাকে তিনটি দেরহাম দিয়া দাও। নবী (দঃ) পুনঃ পুনঃ তাঁহার ঐ বক্তব্য বলিলেন। অতঃপর বলিলেন—

হে লোকসকল! সরকারী ধনভাণ্ডার হইতে কেহ কোন কিছু আত্মসাৎ করিয়া থাকিলে তাহা অবশ্যই ফেরত দিয়া দিবে। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমার উপর তিনটি দেরহাম রহিয়াছে; এক জেহাদে যুদ্ধলব্ধ ধন যাহা বায়তুল-মালের হক তাহা হইতে আমি উহা নিয়াছিলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তুমি কেন উহা নিয়াছিলে? ঐ ব্যক্তি বলিল, আমি প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া নিয়াছিলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, হে ফজল! তিনটি দেরহাম তাহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লও। অতঃপর বলিলেন—

হে লোকসকল! কাহারও ঈমান-ইসলামে আভ্যন্তরীণ কোন কপটতা অনুভব করিলে সে দাঁড়াও আমি তাহার জন্য আল্লার দরবারে দোয়া করি। এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি মোনাফেক, মিথ্যাবাদী-কপট, হতভাগা। ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, ধিক্ তোমার প্রতি—আল্লাহ তায়ালা তোমার দোষ গোপন রাখিয়াছিলেন; তুমি কেন তাহা প্রকাশ করিয়া নিজের বদনাম করিলে। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, হে খাত্তাব-পুত্র (ওমর)! চুপ থাক। দুনিয়ার বদনামী ও লজ্জা অতি ক্ষীণ ও সহজ আখেরাতের বদনামী ও লজ্জা হইতে। অতঃপর নবীজী ঐ ব্যক্তির জন্য দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ! এই ব্যক্তি যখন নিজের শুদ্ধি চাহিয়াছে তখন তুমি তাহাকে সত্য দান কর, ঈমান দান কর, দুর্ভাগ্য হইতে মুক্তি দাও। তারপর রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ওমর আমার সঙ্গী, আমি ওমরের সঙ্গী, সত্য সদা ওমরের সঙ্গে থাকিবে। (বেদায়াহ, ৪—২৩১)

কাহারও প্রতি কোন অন্যায় করিয়া থাকিলে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হইয়াও উহার প্রতিশোধ দানে নতশিরে প্রস্তুত হওয়ার আদর্শ নবীজী মোস্তফা (দঃ) স্থাপন করিয়া গেলেন। তাঁহার পরেও তাঁহার সুযোগ্য খলীফাগণ এই আদর্শের অনুসরণে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

আম্র-ইবনে শোআয়েব (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা ওমর (রাঃ) সিরিয়ায় আগমন করিলেন। এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট সিরিয়ার গভর্ণরের বিরুদ্ধে তাহাকে প্রহার করার অভিযোগ করিল এবং উহার প্রতিশোধ চাহিল। ওমর (রাঃ) উক্ত গভর্ণর হইতে প্রতিশোধ দানের ইচ্ছা করিলেন। (বিশিষ্ট ছাহাবী এবং মিশরের গভর্ণর) আম্র-ইবনুল আছ (রাঃ) ওমর (রাঃ)কে বলিলেন, সিরিয়ার গভর্ণর হইতে এই ব্যক্তির প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইবে ? ওমর (রাঃ) বলিলেন, নিশ্চয়। মিশরের গভর্ণর বলিলেন, এরূপ হইলে ত আমরা আপনার চাকুরী করিব না। ওমর (রাঃ) বলিলেন, না কর ; তাহাতে আমার কোন পরওয়া নাই—এই ভয়ে আমি প্রতিশোধ দান নীতি ছাড়িতে পারি না ; যেহেতু আমি দেখিয়াছি, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বেচ্ছায় প্রতিশোধ দানে আগাইয়া আসিয়াছেন। মিশরের গভর্ণর বলিলেন, এই ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করিয়া দিলে চলিবে কি ? ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহা করিতে পার।

সায়ীদ ইবনে মোছাইয়্যেব (রঃ) বলিয়াছেন, নবী (দঃ) স্বেচ্ছায় প্রতিশোধ দান করিয়াছেন, আবুবকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ)ও স্বেচ্ছায় প্রতিশোধ দান করিয়াছেন। (তবকাতে-ইবনে সায়াদ, ১—৩৭৪)

করুণাবিজড়িত কণ্ঠের আর একটি ভাষণ ঃ

আবহুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক মাসকাল পূর্ব্বেই আমরা নবীজীর ইহধাম ত্যাগের আভাস পাইয়াছিলাম। অন্তিম সময় যখন একেবারেই ঘনাইয়া আসিল এবং বিদায়-মুহূর্ত্ত নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল তখন একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার শেষ-শয্যা-কক্ষ আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহার গৃহে আমাদিগকে সমবেত করিলেন। অতঃপর সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

আল্লাহ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন, তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, তোমাদের ক্ষতিপূরণ দান এবং ব্যথা-বেদনা দূর করুন, তোমাদিগকে নেয়ামত দান করুন, তোমাদিগকে সাহায্য করুন, তোমাদিগকে উন্নতি দান করুন এবং তাঁহার আশ্রয়ে তোমরা নিরাপদ হইয়া থাক।

আমি তোমাদিগকে আল্লার নামে ধর্ম্মভীরু হইবার অছিয়ৎ করিতেছি, তোমাদিগকে তাঁহারই হাতে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি। আমি তোমাদিগকে আল্লার আজাব হইতে সতর্ক করিয়া যাইতেছি। তাঁহার পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট সতর্কবাণী শুনাইয়া যাইতেছি—সাবধান। আল্লার দুনিয়াতে আল্লার বন্দাদের উপর অহঙ্কার ও অন্যায়-আচরণ করিও না। সদা স্মরণ রাখিবা, আল্লাহ আমার জন্য এবং তোমাদের জন্য পরিষ্কার বলিলেন,

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا

"এই যে পরকালের শান্তির নিবাস—ইহা আমি সেই সকল লোকদিগের জন্যই নির্দ্ধারিত করিব যাহারা পৃথিবীতে উদ্ধতি ও অহঙ্কার দেখাইতে এবং বিপর্যায় ঘটাইতে চাহে না, এবং সংযমশীল খোদাভীরু লোকগণই পরিণামে কল্যাণ লাভ করিবে।" আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ

"অহঙ্কারকারীদের বাসস্থান অবশ্যই জাহান্নামে হইবে।"

আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ। আপনার শেষ মুহূর্ত্ত কবে? তিনি বলিলেন, বিদায় অতি নিকটবর্ত্তী, যাত্রা আল্লার সন্নিধানে এবং চিরস্থায়ী বেহেশতের দিকে।

আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ। আপনাকে গোছল কে দিবে? হুজুর বলিলেন, আমার আপনজনের মধ্যে নিকটতম ব্যক্তি। কাফন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, আমার পরিধেয় কাপড়েই এবং ইচ্ছা করিলে তৎ সঙ্গে মিশরীয় বা ইয়ামনী সাদা এক জোড়া কাপড়। জানাযার নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, গোছল দিয়া কাফন পরাইবার পর খাটের উপরে কবরের কিনারায় রাখিয়া কিছু সময় তোমরা অন্যত্র থাকিও। সর্ব্বপ্রথম জানাযা পড়িবেন জীব্রায়ীল, তারপর মীকায়ীল, তারপর ইস্রাফীল, তারপর আজরায়ীল—প্রত্যেকের সঙ্গেই ফেরেশতাগণের বিরাট দল থাকিবে। তারপর তোমরা জমাত জমাত আসিয়া দরুদ এবং সালাম পাঠ করিয়া যাইবে। আর একটি কথা—

তোমরা আমার অনুপস্থিত ছাহাবীদিগকে আমার "সালাম" পৌছাইয়া দিবে। এতদ্ভিন্ন—আজ হইতে কেয়ামত পর্য্যন্ত যাহারা আমার প্রচারিত ধর্ম্মের অনুসরণ করিবে তাহাদের সকলের প্রতিও আমার "সালাম"। (যোরকানী, ৪—২৬৯)

পাঠক, পাঠিকা! আসুন!! আমরা নবীজীর সালামে কৃতার্থ হইয়া সমবেত কণ্ঠে সেই মহান সালামের উত্তর দানে বলিতে থাকি—

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

লক্ষ-কোটি দরুদ ও সালাম আপনার প্রতি—হে আল্লার রসুল।

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ

লক্ষ-কোটি দরুদ ও সালাম আপনার প্রতি—হে আল্লার নবী।

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ

লক্ষ-কোটি দরুদ ও সালাম আপনার প্রতি—হে আল্লার হাবীব।

বোখারী শরীফ বাংলা তরজমা দ্বিতীয় খণ্ড লেখাকালীন ১৩৭৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৫৮ সনে হজ্জ উপলক্ষে পবিত্র মদীনায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দরবারে পঠিত—

الالتجاء والحنين مع الصلوة والسلام
الى سيد المرسلين

রসুলগণের সরদার সমীপে করুণা ভিক্ষা, আবদার এবং প্রাণের আবেগপূর্ণ দরূদ ও সালাম

بِنَفْسِي وَاَوْلَادِي وَاُمِّي وَوَالِدِي * عَلَى تُرْبَةٍ فَاحَتْ بِطِيْبِ مُحَمَّدٍ

আমার প্রাণ, আমার সন্তান-সন্ততি, আমার মাতা-পিতা সর্ব্বস্ব ঐ পাক ভূ-খণ্ডের উপর উৎসর্গ যেই ভূ-খণ্ড হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সুগন্ধে সুগন্ধময় হইয়া আছে।

عَلَى تُرْبَةٍ فَاقَتْ عَلَى الْعَرْشِ رُتْبَةً * وَحَازَتْ رِيَاضَ الْجَنَّةِ الْمُتَأَبِّدِ

আমার সর্ব্বস্ব উৎসর্গ ঐ ভূ-খণ্ডের উপর যাহার মর্য্যাদা আরশ অপেক্ষা অধিক এবং যেই এলাকায় অনন্তময়ী বেহেশতের বাগিচা বিরাজমান—

وَوَارَتْ حَبِيْبًا رَبُّنَا قَدْ اَحَبَّهُ * فَلَمْ يُبْقِ فِيْنَا بِالْبَقَاءِ الْمُخَلَّدِ

যেই বিশেষ ভূ-খণ্ডটি আল্লাহ তায়ালার প্রিয়তম দোস্তকে ঢাকিয়া আছে। তিনি আল্লার অতি প্রিয়; তাই তাঁহাকে আমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল না রাখিয়া ডাকিয়া নিয়াছেন।

لِاَذْكُرَ اَيَّامَ الْحَبِيْبِ بِطَيْبَةٍ * فَاَصْعَقُ مَغْشِيًّا عَدِيْمَ التَّجَلُّدِ

প্রিয় পাত্র (হযরত নবী দঃ) যখন এই "তায়বা"—মদীনায় অবস্থানরত ছিলেন তখনকার মধুর দৃশ্যের কল্পনা, ধ্যান ও স্মরণ করতঃ আমি ধৈর্য্যহীন হুশহারা হইয়া পড়ি।

اَمُرُّ بِاٰثَارِ الْحَبِيْبِ بِطَيْبَةٍ * فَكَادَ فُؤَادِي اَنْ يَطِيْرَ بِمُوْجَدِ

আমি যখন তায়বাস্থিত প্রিয়তমের নিদর্শন সমূহের নিকটবর্ত্তী যাতায়াত করি তখন মনে হয়—ঐ সবের আকর্ষণে আমার প্রাণপাখী উড়িয়া যাইবে।

فَهٰذِي بِقَاعٌ وَالْجِبَالُ وَمَعْهَدٌ * وَبِئْرٌ وَبُسْتَانٌ وَاٰثَارُ مَشْهَدِ

এই বিশেষ বিশেষ স্থান সমূহ, পাহাড় সমূহ, রাস্তা-ঘাট ও বিভিন্ন কুপ, বাগ-বাগিচার স্থান এবং তাঁহার উপস্থিতির স্থানের নিদর্শন সমূহ এবং

وَدُوْرٌ وَاٰطَامٌ وَمِنْبَرُ خُطْبَةٍ * اَسَاطِيْنُ اَعْلَامٍ وَمِحْرَابُ مَسْجِدِ

বিভিন্ন ঘর-বাড়ী, টিলা, খোৎবা দানের মিম্বর এবং মসজিদস্থিত কতিপয় খুঁটি ও মেহরাব—

لَتَمْلأُ مِنْ ذِكْرَى الْحَبِيْبِ قُلُوْبَنَا * وَتُوْرِثُ نَارًا فِىْ ضُلُوْعٍ وَاَكْبُدٍ

উল্লেখিত নিদর্শন সমূহ আমার প্রাণকে প্রিয় পাত্রের স্মরণে পরিপূর্ণ করিয়া দেয় এবং আমার হৃদয় পটে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির সঞ্চার করে।

كَاَنَّ فُؤَادِىْ اِذْ اَتَيْتُ بِبَابِهٖ * لَجَمْرَةُ نِيْرَانٍ شَدِيْدُ التَّوَقُّدِ

আমি তাঁহার দ্বারে পৌঁছার মুহূর্ত্তে আমার হৃদয়টি যেন একটি প্রজ্জ্বলিত অগ্নি খণ্ড।

وَلَمْ اَسْتَفِقْ حَتّٰى اَقُوْلَ مَقَالَةً * وَاَدْرِكَ اِدْرَاكًا بِقَلْبِى الْمُقَدَّدِ

তদবস্থায় আমার হুশ-জ্ঞান বিগুমান ছিল না যে, আমি কিছু বলিতে পারি এবং আমার বিদীর্ণ হৃদয়ে কিছু অনুভব করিতে সক্ষম হই।

فَاَرْسَلْتُ دَمْعِىْ لِلْفُؤَادِ مُتَرْجِمًا * فَيَا عَيْنُ جُوْدِىْ وَاهْمِلِىْ لَا تَجْمُدِىْ

অগত্যা অন্তরের আবেগ প্রকাশে অশ্রু-বৃষ্টি বহাইলাম; হে নয়ন! খুব অশ্রু বহাও থামিও না।

وَيَا عَيْنُ جُوْدِىْ وَاهْمِلِىْ مِنْ مَدَامِعٍ * وَصُبِّىْ عُيُوْنًا مِنْ دِمَاءٍ لِتَسْعَدِىْ

হে নয়ন! অবিরাম অশ্রুপাত কর; রক্তস্রোতের নদী বহাইয়া দাও ইহাই তোমার সৌভাগ্য।

وَيَا عَيْنُ سُحِّىْ وَاسْكُبِىْ كُلَّ قَطْرَةٍ * نَجِيْعًا وَّدَمْعًا كَىْ تَفُوْزَ بِمَقْصِدِ

হে নয়ন! অশ্রু ও রক্তের প্রতিটি বিন্দু বহাইয়া দাও ইহাতেই তোমার আশা-আকাঙ্খার সাফল্য

وَيَا نَفْسُ ذُوْبِىْ ثُمَّ سِيْلِىْ مَدَامِعًا * عَلٰى رَسْمِهٖ رَسْمِ الدِّيَارِ وَمَلْحَدِ

হে প্রাণ! প্রিয় পাত্রের ঘর-বাড়ী ও সমাধি-চরণে উৎসর্গ হওয়ার সুযোগ-হারাইও না— বিগলিত হইয়া অশ্রু আকারে বহিয়া যাও।

لِاَىِّ مَرَامٍ تُرْصِدُ الْعَيْنُ مَاءَهَا * وَاَىَّ مَرَامٍ يُرْصِدُ النَّفْسَ لِلْغَدِ

আর কোন্ আকাঙ্খা পূরণের মানসে চক্ষু স্বীয় অশ্রু রক্ষিত রাখিবে? এবং আর কোন্ আকাঙ্খায় আমার প্রাণ আগামী দিনের জন্য বাঁচিয়া থাকিবে?

عَلَيْكَ سَلَامٌ يَا مُطَيِّبَ طَيْبَةٍ * لِاَنْتَ مَلَاذِىْ اِذْ اَتٰى يَوْمُ مَوْعِدِ

"তায়বা"কে মনমুগ্ধকারক—হে মহান! আপনাকে সালাম। কেয়ামতের দিনে আপনি আমার আশ্রয়-স্থল।

وَاَنْتَ رَجَائِىْ فِىْ مَنَازِلِ مَحْشَرٍ * صِرَاطٍ وَمِيْزَانٍ وَفِىْ كُلِّ مَوْرِدِ

আপনি আমার আশার স্থল হাশরের ময়দানের প্রতিটি স্থানে—পোল-ছেরাত, নেকী-বদীর পাল্লার নিকটবর্ত্তী এবং অন্যান্য প্রতিটি ঘাটিতে।

مِنَ اللّٰهِ "سَلْ تُعْطَهْ" وَمِنْكَ شَفَاعَةٌ * فَهٰذَا رَجَائِىْ يَا فِنَائِىْ وَمُسْنَدِىْ

আপনার পক্ষ হইতে শাফায়াতের প্রতিশ্রুতি এবং আল্লার পক্ষ হইতে আপনার শাফায়াত পূরণের ঘোষণা—ইহাই আমার একমাত্র আশা ভরসা-স্থল।

بِذَنْبِىْ وَعِصْيَانِىْ لَغَى كُلُّ حِيْلَتِىْ * بِجُوْدِكَ يَا خَيْرَ الْجَوَادِ تَغَمَّدِ

গোনাহ ও নাফরমানীর দরুণ আমার সমস্ত চেষ্টা তদবীরই নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে; হে দয়াল! আপনি স্বীয় দান-সমুদ্রে আমাকে নিমজ্জিত করুন।

غَرِقْتُ بِبَحْرِ الذَّنْبِ مَا لِىْ عِصْمَةٌ * فَخُذْ بِيَدِىْ أَنْتَ الْكَرِيْمُ فَخُذْ يَدِىْ

গোনাহের সমুদ্রে আমি নিমজ্জিত নিরুপায়; আপনি দয়ালু; আপনি আমার হাত ধরুন! আপনি আমার হাত ধরুন!

أَتَيْتُكَ مَسْلُوْبًا وَجِئْتُكَ هَارِبًا * أَغِثْنِىْ بِلُطْفٍ يَا مُغِيْثِىْ وَزَوِّدِ

আমি সর্ব্বহারা হইয়া ঘর-বাড়ী ত্যাগ করতঃ আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। আপনি দয়ার দরিয়া আমাকে সাহায্য করুন এবং আমার সম্বল করিয়া দিন।

أَتَيْتُكَ مَذْعُوْرًا مِنَ الذَّنْبِ خَائِفًا * أَتَيْتُكَ عَبْدًا مُسْتَجِيْرًا بِسَيِّدِ

আমি গোনাহের ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া আপনার প্রতি ছুটিয়া আসিয়াছি যেরূপ বিপদগ্রস্ত গোলাম মনিবের সাহায্যের প্রতি ছুটিয়া আসে।

أَتَيْتُ كَئِيْبًا مِنْ دِيَارٍ بَعِيْدَةٍ * حَزِيْنًا بِآثَامٍ وَوَجْهٍ مُسَوَّدِ

গোনাহের চিন্তামগ্ন কাল মুখ লইয়া দূর দেশ হইতে ক্লান্তাবস্থায় আপনার দ্বারে পৌঁছিয়াছি।

أَتَيْتُ بِقَلْبٍ مُسْتَهَامٍ وَمُغْرَمٍ * جَرِيْحٍ بِأَسْيَافِ الْفِرَاقِ الْمُبَدِّدِ

পাগল-প্রাণ লইয়া উপস্থিত হইয়াছি, বিচ্ছেদ যাতনায় সেই প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

أَتَيْتُ بِشَوْقٍ وَاشْتِيَاقٍ وَرَغْبَةٍ * رَجَائِىْ بِكُمْ أَعْلَى وَغَيْرُ مُعَدَّدِ

বহু আশা-আকাঙ্খা ও আবদার নিয়া আসিয়াছি; আমার আকাঙ্খা অসংখ্য ও অতি বড়।

أَتَيْتُكَ مَوْلَائِىْ بِلُطْفِكَ رَاجِيًا * وَلَنْ يُحْرَمَ الرَّاجِىْ بِبَابِ مُحَمَّدِ

আপনার দয়ার ভিখারী হইয়া আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) এর দ্বার হইতে কোন ভিখারী কখনও বঞ্চিত হয় না।

لَاَغْضَبْتُ رَبِّىْ بِالْمَعَاصِىْ وَلَمْ أَجِدْ * وَسِيْلَةَ غُفْرَانِىْ سِوٰى بَابِ أَحْمَدِ

আমি আমার প্রভুর নাফরমানি করিয়া তাঁহাকে ক্রোধান্বিত করিয়াছি; এখন মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দ্বার ভিন্ন আমার গোনাহ মাফ হওয়ার কোন অছিলা নাই।

هو الباب باب الجود والكرم والسخا * ومن يأته يأت المرام ويسعد

এই দ্বার দান, দয়া ও ছাখাওয়াতের দ্বার, যে ব্যক্তি এই দ্বারে উপস্থিত হয় সে মনোবাঞ্ছা পূরণে এবং সাফল্য লাভে সক্ষম হয়।

فكم من غريق هالك لج بابه * نجى نائلا نورا من الله يهتدي

বহু নিমজ্জমান ধ্বংসের সম্মুখীন ব্যক্তি এই দ্বার আঁকড়াইয়া ধরিয়া আল্লাহ তায়ালার হেদায়েত ও নূর প্রাপ্তে পরিত্রাণ পাইয়াছে।

رجائي إليكم يا شفيع المشفع * ومن ذا الذي نرجو إليه ونهتدي

আপনি এমন সুপারিশ কারক যে আপনার সুপারিশ কবুল করিবেন বলিয়া আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়াছেন; তাই আশা-আকাঙ্খা নিয়া আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, আপনি ব্যতীত আর কে আছে যাহার প্রতি আমরা আশা করিতে পারি এবং ধাবিত হইতে পারি?

رثى لي عدوي من ذنوبي ومأثمي * فما لي لا أرجو رثائك سيدي

আমার গোনাহ দৃষ্টে শত্রুর অন্তরেও দয়ার সঞ্চার হয়। আপনি আমার মনিব, আপনার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইবে বলিয়া আমি আশাবাদী কেন হইব না?

وما لي عند الله دونك حيلة * نجاة وغفران فكن أنت رائدي

আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা ও পরিত্রাণ পাইবার জন্য আপনি ভিন্ন আমার আর কোন সূত্র নাই, তাই আপনি আমার সংস্থাপক হইয়া যান।

ترحم رسول الله جئتك راجيا * لأنت كريم للعدو ومعتدي

হে আল্লার রসুল! আমার প্রতি করুণার দৃষ্টি করুন, আমি আশা আকাঙ্খা নিয়া আপনার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি—আপনি ত শত্রুর প্রতিও দয়াশীল।

وأنت جواد ما لجودك ساحل * فما لي لا أرجو بأنك مسعدي

আপনার দয়ার সাগরের কুল-কিনারা নাই; তবে কেন আমি আশাবাদী হইব না যে, আপনি আমাকে সৌভাগ্যশালী করিবেন।

ترحم عزيز الحق يا من بلطفه * كثير من العاصي لفردوس يهتدي

আপনি আমি নরাধম আজিজুল হকের প্রতি দয়ার দৃষ্টি করুন, আপনার কৃপার অছিলায় বহু গোনাহগার ফেরদাউস বেহেশ্‌ত লাভ করিয়া বসিবে।

وربك يعطى ما تريد وتشتهى * محب لمحبوب يطيع ويقتدى

আপনি যাহাই ইচ্ছা করেন ও পছন্দ করেন আল্লাহ তায়ালা তাহাই দান করিয়া থাকেন ;
দোস্ত দোস্তের মন রক্ষা করিয়াই চলে।

عليك صلوة والسلام ورحمة * دواما من الله الى يوم موعد

আপনার প্রতি দরুদ ও সালাম এবং কেয়ামত পর্যন্ত আপনার উপর আল্লার রহমত বর্ষিত হউক।

عليك صلوة والسلام ورحمة * الوف والاف وما زاد فازدد

আপনার প্রতি হাজার হাজার দরুদ, সালাম ও রহমত এবং আরও যতদূর অধিক হইতে পারে।

منى كن فى قلبى غرست بطيبة * فاسقى بدمع والدماء لتجتدى

আমার অন্তরের বহু আশা আকাঙ্খা পবিত্র মদিনার ভূমিতে রোপণ করিলাম, এখন নয়নের
অশ্রু ও রক্তের দ্বারা উহার সেচন করিতে থাকিব। তবেই উহাতে ফল ধরা সম্ভব হইবে।

فما العيش بعد البعد من ارض طيبة * يلذ بنا والصبر منها بمبعد

মদিনা হইতে বিচ্ছিন্ন জীবনে আনন্দ থাকিতে পারে কি ? মদিনাকে ভুলিয়া থাকা অসম্ভব।

وهل لذة لى فى الدنى ونعيمها * اذا انا ناء من مدينة سيدى

আমার মনিবের শহর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দুনিয়া এবং দুনিয়ার সামগ্রী সমূহ আমার
নিকট আস্বাদক হইতে পারে কি ?

حياتى على بعد المدينة مرة * وقلبى به شوق لساحة سيدى

মদিনা হইতে বিচ্ছেদে আমার জীবন বিষাক্ত এবং আমার মনিবের আঙ্গিনায় পড়িয়া
থাকাই আমার অন্তরের একমাত্র আনন্দ।

تمنيت من ربى جوار مدينة * فيا ليت لى فيها ذراع لمرقدى

মদিনায় অবস্থানই আল্লাহ তায়ালার নিকট আমার আন্তরিক আকাঙ্খা ; হায় ! মদিনার
মধ্যে আমার কবরের জন্য এক হাত ভুমি আমার অদৃষ্টে জুটিবে কি ?

اللهم ارزقنى شهادة فى سبيلك والموت فى بلد رسولك صلى
الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم -

হে আল্লাহ ! তোমার রাস্তায় শহীদ হওয়ার সুযোগ আমাকে দান কর এবং তোমার
রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শহরে আমার মৃত্যু নছীব কর। আমীন !

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় ও তারিখ এবং হযরতের বয়স ঃ

ইহা সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, একাদশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে সোমবার দিন হযরত (দঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহাও প্রায় অবধারিত যে, সোমবার দিন দুপুর বেলার পূর্ব্বেই হঠাৎ অবস্থার ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া মৃত্যু-যাতনা আরম্ভ হয় এবং দ্বিপ্রহরকাল পর্য্যন্ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উক্ত সোমবার দিনটি রবিউল আউয়াল মাসের কোন্ তারিখে ছিল সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। প্রসিদ্ধ এই যে, উহা ১২ই রবিউল আউয়াল ছিল * কাহারও মতে ২ তারিখ, কাহারও মতে ১ম তারিখ ছিল। (সীরতে মোস্তফা ৩—২০৫)

---

* ১২ই রবিউল আউয়াল দিনটি সোমবার হওয়ার জন্য ঐ মাসের প্রথম তারিখ বৃহস্পতিবার হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইহাতে একটি জটিল প্রশ্ন প্রতিবন্ধক হয়—তাহা এই যে, এই মাসের দুই মাস পূর্ব্বের জিলহজ্জ মাসে হযরত (দঃ) বিদায় হজ্জ করিয়া আসিয়াছেন। ঐ মাসের ৯ তারিখ তথা আরাফার দিন শুক্রবার ছিল—ইহা অকাট্যরূপে অবধারিত। সেমতে জিলহজ্জ, মহরম, ছফর এই তিনটি মাসের সবগুলিকে ৩০ দিনের বা ২৯ দিনের কিম্বা কোনটা ৩০ কোনটা ২৯ যে প্রকারেই হিসাব করা হউক জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ শুক্রবার ধরিয়া কোন মতেই রবিউল আউয়াল মাসের ১ম তারিখ বৃহস্পতি ও ১২ তারিখ সোমবার হইতে পারে না। এই জন্য হযরতের ওফাতের তারিখ সম্পর্কে ১২ই রবিউল আউয়ালকে অনেকে অস্বীকার করিয়া বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু হযরতের ওফাতের দিন সোমবার এবং ১২ই রবিউল আউয়াল এই মতবাদটা সর্ব্বত্র এতই প্রসিদ্ধ যে, উহাকে এড়ান যায় না। মাওলানা আবদুল হাই সাহেব মজমুয়া ফতওয়া ২—২৩৯পৃষ্ঠায় উক্ত প্রশ্নটির ভা'ল মীমাংসা দিয়াছেন যে—বোধ হয়, হযরতের বিদায় হজ্জের বৎসর জিলহজ্জ মাসের ১ম তারিখ মক্কায় ও মদিনায় চাঁদ দেখার হিসাবে বিভিন্ন ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী জিল্‌কদ মাসের প্রথম তারিখ—হযরতের হজ্জ যাত্রার তারিখ বর্ণনাকারীদের হিসাব মতে বুধবার ছিল। এই মাসের ২৯ তারিখ বুধবার হজরত (দঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণ মক্কার পথে থাকিয়া জিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখেন; মক্কাতেও তাহাই হয়। সেমতে জিলহজ্জ মাসের ১ম তারিখ হয় বৃহস্পতিবার এবং ৯ তারিখ হয় শুক্রবার। কিন্তু ঐ দিন মদিনাতে জিলহজ্জের চাঁদ দৃষ্ট হয় নাই এবং সেই যুগে মক্কা এলাকার খবর মদিনা শহরে সময় মত পৌছিতেও পারে নাই। মদিনা শহরে জিলকদের চাঁদ ৩০ দিনের গণ্য হইয়া জিলহজ্জের ১ম তারিখ শুক্রবার হইয়াছে এবং মদিনায় এই হিসাবই প্রচলিত হইয়া গিয়াছে; পরেও এই বিষয়ে কোন তৎপরতার প্রয়োজন হয় নাই। জিলহজ্জ মাসও ৩০ দিনের হইয়া ১লা মহরম রবিবার হইয়াছে। মহরম মাসও ৩০ দিনের হইয়া ১লা ছফর মঙ্গলবার হইয়াছে। ছফর মাসও ৩০ দিনের হইয়া ১লা রবিউল আউয়াল বৃহস্পতিবার হইয়াছে। এই হিসাবে মক্কা এলাকার ৯ই জিলহজ্জ শুক্রবার এবং মদিনা এলাকার ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার সঙ্গতিপূর্ণই বটে। ৯ই জিলহজ্জ আরাফার দিন শুক্রবার মক্কা এলাকার হিসাব অনুযায়ী হইয়াছে। আর ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার মদিনা এলাকার হিসাবে হইয়াছে।

হযরত (দঃ) কত বয়সে ইহজগৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মতভেদও আছে এবং এই সম্পর্কে রেওয়ায়েত বা বর্ণনাও বিভিন্ন রহিয়াছে। কিন্তু ৬৩ বৎসর সম্পর্কীয় বর্ণনাই বিশেষ অগ্রগণ্য।

১৭৪৬। হাদীছঃ—(৬৪১ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তেষট্টি বৎসর বয়সে ইহজগৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যাঃ—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের (১) জন্ম (২) তাঁহার নবুয়ত প্রাপ্তি (৩) তাঁহার মক্কা ত্যাগ (৪) তাঁহার মৃত্যু—এই বিষয়গুলির সঠিক দিন তারিখ নির্দ্ধারণ যদিও পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণের রুচি দৃষ্টে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, কিন্তু ঐসব বিষয়াবলীর যুগে কোন ঘটনার সঠিক দিন-তারিখ নির্দ্ধারণের গুরুত্ব মোটেই ছিল না। এতদ্ভিন্ন ইসলামেও উহার কোন গুরুত্ব মোটেই নাই, সুতরাং প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে উহার দিন-তারিখ সংরক্ষণ করা হইয়াছিল না। পরবর্ত্তীকালে কোন কোন ছাহাবী এ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন, ফলে তাঁহাদের মন্তব্যের মধ্যে কিছুটা বিভিন্নতা সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—যাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেই বিভিন্নতা সূত্রেই মোটামুটি হিসাবের বেলায় যে—(১) ঠিক কত বয়সে নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (২) নবুয়ত প্রাপ্তির পর কত দিন মক্কায় অবস্থান করিয়াছিলেন (৩) মদিনায় কত দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন (৪) সর্ব্বমোট কত বয়সে ইহজগৎ ত্যাগ করিয়াছিলেন—এই সব বিষয়াবলীর সংখ্যা নির্দ্ধারণে মতামতের বিভিন্নতা সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই ধরণের হিসাবাদির মধ্যে স্বাভাবিক রূপেই অনেক সময় বৎসরের ভাঙ্গা মাস, মাসের ভাঙ্গা দিনগুলির সঠিক নির্দ্ধারণ করা হয় না; যেরূপ দিনের ভাঙ্গা ঘণ্টা, ঘণ্টার ভাঙ্গা মিনিট এবং মিনিটের ভাঙ্গা সেকেণ্ডগুলির সূক্ষ্ম হিসাবের প্রতি কেহই দৃষ্টিদান করে না, বরং কেহবা ঐ ভাঙ্গাগুলি পূর্ণ ধরিয়া হিসাব করে, কেহবা ঐ ভাঙ্গাগুলিকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া হিসাব ধরে। দশকের মধ্যবর্ত্তী ভাঙ্গা সংখ্যা সম্পর্কেও ঐরূপ করা হয়। এই ভাবেও মোটামুটি সংখ্যা নির্দ্ধারণে মতভেদ হইয়া থাকে।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বয়স সম্পর্কের মতভেদটাও সেই শ্রেণীরই। এস্থলে তিন প্রকার মতামত বর্ণনা রহিয়াছে। ৬০, ৬৩ এবং ৬৫। প্রকৃত প্রস্তাবে হযরতের সঠিক বয়স ছিল ৬৩, কিন্তু কেহ কেহ দশক তথা ৬০-এর উপরের ভাঙ্গা ৩-এর সংখ্যা বাদ দিয়াছে, আবার কেহ জন্ম ও মৃত্যুর ভাঙ্গা বৎসর দুইটি পূর্ণ পূর্ণ বৎসর হিসাব করিয়াছে, ফলে দুই বৎসর বর্দ্ধিত হইয়া ৬৫-এর সংখ্যা হইয়াছে।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পর:

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মৃত্যু খবর ছড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে সারা মদিনায় বিহ্বলতার অন্ধকার ছাইয়া গেল। ছাহাবীগণের মধ্যে সকলে

এই কথা বিশ্বাস ও গ্রহণ করিয়া নিতে পারিলেন না যে, হযরতের মৃত্যু হইয়াছে। হযরত (দঃ)কে চির নিদ্রায় দেখা সত্ত্বেও তাঁহারা ভাবিলেন, ওহী নাযেল হওয়াকালে হযরতের উপর এইরূপ আচ্ছন্নতা পরিলক্ষিত হইত এখনও সেই অবস্থায়ই হয়ত হযরত (দঃ)কে এইরূপ দেখা যাইতেছে, কস্মিনকালেও তাঁহার মৃত্যু হয় নাই।

এইরূপ ধারণা পোষণকারীদের মধ্যে ওমর ফারুক (রাঃ) ছিলেন সর্ব্বাগ্রে এবং সর্ব্বাধিক অটল। এমনকি তিনি উন্মুক্ত তরবারি হাতে লইয়া বিহ্বলতার মধ্যে ঘোষণা দিতে লাগিলেন, যে কেহ বলিবে যে, মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মৃত্যু হইয়াছে আমি তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিব। হযরতের মৃত্যু হয় নাই, তিনি অচিরেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবেন এবং মোনাফেকগণের মূল উচ্ছেদ করিবেন। ওমর (রাঃ) তাঁহার এই উক্তির প্রচারে লোকদের মধ্যে বক্তৃতাও করিতেছিলেন। ওসমান (রাঃ) আলী (রাঃ) এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ছাহাবীগণ বিহ্বলতার মধ্যে কেহবা নির্ব্বাক অচেতন অবস্থায় ছিলেন, কেহবা অশ্রুস্রোতে ভাসিতেছিলেন।

আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) এই দিন ভোর বেলা হযরত (দঃ)কে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিয়া মদিনার দূরপ্রান্তে চলিয়া গিয়াছিলেন; তথায় তাঁহাকে এই প্রলয়ঙ্করী সংবাদ পৌঁছান হইল। বিহ্বলতার চরমে পৌঁছা সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে ধীর স্থিরতার তৌফিক দান করিলেন। সমগ্র জাতি সর্ব্বহারারূপে বিশৃঙ্খলময় প্রলয়ঙ্করী বিপদের মুখে পতিত অবস্থায় জাতির কর্ণধারকে যেরূপ হইতে হয় আল্লাহ তায়ালা আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)কে ঐ মুহূর্ত্তে ঠিক সেই রূপে রূপবান করিয়া সাজাইলেন। যাঁহার সাহচর্য্যতায় আবুবকর সর্ব্বস্ব বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহার বিচ্ছেদ যাতনার অগ্নি আবুবকরের অন্তরকে পুড়িয়া ভস্ম করিতেছিল, কিন্তু আবুবকরের বহিরাকৃতি পর্ব্বৎতুল্য অটল ও অবিচল ছিল। আবুবকর (রাঃ) সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায় চড়িয়া দ্রুত চলিয়া আসিলেন এবং কাহারও সঙ্গে কথাবার্ত্তা না বলিয়া স্বীয় কন্যা আয়েশার কক্ষে প্রবেশ করিলেন; তথায় সর্দ্দারে-দুজাহান চাদরে আবৃত রহিয়াছেন। "ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে অসাল্লাম"

১৭৪৭। **হাদীছ ঃ**—(৬৪০পৃঃ) আবু ছালামাহ (রাঃ) আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, (হযরতের মৃত্যু সংবাদে) আবুবকর (রাঃ) মদিনার দূর প্রান্ত "সুনহ্"স্থিত তাঁহার গৃহ হইতে ঘোড়ায় চড়িয়া দ্রুত আসিলেন এবং সোজা মসজিদে নববীতে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর কাহারও সঙ্গে কথাবার্ত্তা না বলিয়াই আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি অগ্রসর হইলেন; হযরত (দঃ) একটি চাদরে আবৃত ছিলেন।

আবুবকর হযরতের চেহারা মোবারক হইতে চাদর হটাইয়া দিলেন এবং শ্রদ্ধাবনত রূপে তাঁহার ললাটে চুম্বন করিলেন; আবুবকরের নিরব অশ্রুধারা বহিয়া পড়িল।

অতঃপর হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমার মাতা-পিতা আপনার চরণে উৎসর্গ, (আল্লার সাধারণ নিয়মাধীন) আপনার জন্য যে মৃত্যু নির্দ্ধারিত ছিল সেই মৃত্যু আপনার উপর আসিয়া গিয়াছে ; (এখন পুনঃ আগমন হইলে উহার জন্য দ্বিতীয়বার মৃত্যুও অনিবার্য্য—) আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর মৃত্যুকে দুই বার সুযোগ দান করিবেন না।

পরবর্ত্তী বিবরণ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, অতঃপর আবুবকর (রাঃ) কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলেন ; ওমর (রাঃ) লোকদের মধ্যে স্বীয় বক্তব্য (যে, হযরতের মৃত্যু হয় নাই) প্রচার করিয়া বক্তৃতা দিতেছিলেন। আবুবকর (রাঃ) ওমরকে বসিয়া যাইতে বলিলেন। তিনি বসিলেন না (বিহ্বলতার মধ্যে স্বীয় বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন আবুবকর (রাঃ) দাঁড়াইয়া গেলেন) ফলে লোকজন ওমরকে ছাড়িয়া আবুবকরের প্রতি ধাবিত হইল। আবুবকর তেজদৃপ্ত ভাষায় এক যুগান্তকারী ভূমিকা সকলের সামনে তুলিয়া ধরিলেন। তিনি বলিলেন—

من كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد
الله فان الله حى لا يموت - قال الله تعالى "وما محمد الا رسول قد
خلت من قبله الرسل - افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن
ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا - وسيجزى الله الشكرين -"

"তোমাদের মধ্য হইতে কেহ যদি মোহাম্মদের পূজারী ও উপাসক হইয়া থাক তবে সে জানিয়া লও যে, মোহাম্মদের মৃত্যু হইয়া গিয়াছে (যদ্দারা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, মোহাম্মদ যত বড়ই হন না কেন, কিন্তু তিনি পূজণীয় ও মা'বুদ হইতে পারেন না।) আর যাহারা আল্লার উপাসক ও বন্দেগীকারী তাহারা জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ হইলেন অনাদি-অনন্ত, চির জীবন্ত—তাঁহার মৃত্যু আসিতেই পারে না, (সুতরাং আল্লার দ্বীন ও তাঁহার এবাদত চির বিদ্যমান থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে আবুবকর (রাঃ) পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতও তেলাওত করিলেন যাহার অর্থ এই—

"মোহাম্মদ রসুল বটে, (কিন্তু তিনি মানুষ—তিনি খোদা নন ;) তাঁহার পূর্ব্বে আরও অনেক রসুল আসিয়াছিলেন, যাঁহাদের কেহই দুনিয়াতে চিরঞ্জীবি হন নাই, সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে ; (মোহাম্মদ (দঃ)ও সেই একই পথের পথিক।) সুতরাং মোহাম্মদ (দঃ) মরিয়া গেলে বা শহীদ হইয়া গেলে তোমরা কি (দ্বীন-ইসলাম ছাড়িয়া) পেছনের অবস্থার দিকে এবং অধঃপতনের দিকে ফিরিয়া যাইবে ? যে কেহ পেছনের

দিকে, অধঃপতনের দিকে ফিরিয়া যাইবে (সে নিজেরই ক্ষতি করিবে ; আল্লার কোন ক্ষতিই সে করিবে না। আর জানিয়া রাখিও, যাহারা সর্ব্বাবস্থায় আল্লার নেয়ামতের কদর করিয়া চলিবে আল্লাহ তাহাদিগকে উত্তম প্রতিফল দান করিবেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, খোদার কসম—লোকগণ যেন ইতিপূর্ব্বে জানিতই না যে, এই আয়াত পবিত্র কোরআনে রহিয়াছে ; আবুবকর উহা তেলাওয়াত করার পরেই যেন তাহারা উহা জানিতে পারিল এবং সকলেই আবুবকরের মুখ হইতে উহা গ্রহণ করিয়া নিল, এমনকি কোন একজন মানুষও আমি দেখি নাই যে এই আয়াত তখন তেলাওয়াত করিতেছিল না।

ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আবুবকরের মুখে এই আয়াত শুনার সঙ্গে সঙ্গে আমারও হাত-পা ভাঙ্গিয়া পড়িল। যখন আমি উক্ত আয়াতের তেলাওয়াত আবুবকরের মুখে শুনিলাম এবং উপলব্ধি করিতে পারিলাম যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মৃত্যু হইয়া গিয়াছে তখন আর আমি আমার পায়ের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, মূর্ছা খাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলাম।

ভূপৃষ্ঠ হইতে হযরতের দেহ মোবারকের বিদায় গ্রহণ ঃ

সোমবার দিন দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত হযরত (দঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ঐ দিনের অবশিষ্ট দীর্ঘ সময় ত শোক ও বিহ্বলতার মধ্যেই কাটিল ; উহা হইতে অবসর লাভের পূর্ব্বেই সকলে অন্য আর একটি সমস্যা সম্পর্কে জড়াইয়া পড়িলেন। সেইটি হইল শাসন যন্ত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের স্থলাভিসিক্তের মনোনয়ন। বিষয়টি ছিল অত্যাবশ্যকীয়, বিশেষতঃ ঐ মুহূর্ত্তে, কারণ চতুর্দ্দিকে দ্বীন-ইসলামের শত্রুর অভাব ছিল না। মোসলেম জাতি বত্রিশ দাঁতের পরিবেষ্টনে এক জিহ্বার ন্যায় ছিল। তদুপরি মোনাফেকের দল আভ্যন্তরীন শত্রু রূপে সর্ব্বদাই সুযোগের সন্ধানে রহিয়াছে ; এমতায়বস্থায় উক্ত সমস্যার সমাধানের আবশ্যকতা কে অস্বীকার করিতে পারে ? বিশেষতঃ যখন সকলের জানা ছিল যে, কাফন-দাফনে বিলম্ব হইলেও হযরতের দেহ মোবারকে কোন রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই। সাধারণ শহীদের দেহই যখন কোন প্রকারে বিকৃত হয় না যাহার প্রামাণিক বিবরণ ১ম খণ্ডে ৭০০ নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ; এস্থলে ত সাইয়্যেদুল মোরছালীনের দেহ – বিকৃত হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। এসম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকায় সকলেই উক্ত সমস্যার সমাধানের প্রতি অধিক ব্যতিব্যস্ত হইলেন।

সাধারণ আলোচনার মধ্যেই আবুবকর (রাঃ) খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর মঙ্গলবার দিন হযরতের গোসল দানের সময় গায়েব হইতে আওয়াজ আসিল, আল্লার রসুলের দেহ পোশাক শূন্য করিও না, তিনি যেই পোশাকে রহিয়াছেন উহার মধ্যে রাখিয়াই

তাহাকে গোসল দান কর। তাহাই করা হইল এবং কাফন পরাইবার সময় উক্ত পোশাক খুলিয়া লওয়া হইল। (সীরতে মোস্তফা ৩—২১৯)

অতঃপর দাফন করার স্থান সম্পর্কে বিতর্ক হইলে আবুবকর (রাঃ) হাদীছ শুনাইলেন যে, পয়গাম্বর (দঃ)কে তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের স্থলেই দাফন করা হইবে। ইহাই চুড়ান্তরূপে গৃহিত হইল এবং ঐ স্থানেই কবর শরীফ খনন করা হইল।

মঙ্গলবার দিন কাফন পরাইয়া হযরতের দেহ মোবারক কবরের কিনারায় রাখিয়া দেওয়া হইল। সাধারণ নিয়মে জমাতের সহিত পূর্ণাঙ্গ কায়দায় জানাযার নামায পড়া হইল না*—যেরূপ (অনেক ইমামগণের মজহাব অনুসারে) শহীদের জন্য জানাযার নামাযের আবশ্যক হয় না। অবশ্য দলে দলে সকলেই সন্নিকটে দাঁড়াইয়া তকবীর এবং দরূদ ও সালাম পাঠ করিয়া যাইতে লাগিল। প্রথমে ফেরেশতাগণ, অতঃপর ছাহাবাগণ দলে দলে আসিলেন। আবুবকর এবং ওমর (রাঃ)ও এক দলে আসিলেন। বুধবার দিন পর্য্যন্ত দরূদ ও সালামের এই ছেলছেলাহ্ চলিল। অবশেষে বুধবার দিন এবং কাহারও মতে বুধবার দিবাগত—বৃহস্পতিবার রাত্রে দেহ মোবারককে ভুগর্ভে আবৃত করিয়া দেওয়া হইল। (সীরতে মোস্তফা ৩—২২২)

عَطِّرِ اللّٰهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْمَ — بِعَرْفٍ شَذِيٍّ مِّنْ صَلٰوةٍ وَّتَسْلِيْمٍ

হযরতের পরিত্যাক্ত সম্পদ ঃ

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) অন্যান্য মোহাজেরগণের ন্যায় নিঃস্ব অবস্থায়ই মদিনায় আসিয়াছিলেন। প্রথম দিকে মোসলমানগণ নিজ নিজ বাগানের এক-দুইটি করিয়া খেজুর গাছ হযরত (দঃ)কে দিয়া রাখিয়াছিল—হযরতের জীবিকা নির্ব্বাহের অছিলা উহাই ছিল। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে ইহারই উল্লেখ রহিয়াছে।

১৭৪৮। **হাদীছ ঃ—**(৪৪১ পৃঃ) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মদিনাবাসী কোন কোন মোসলমান নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে কতিপয় খেজুর বৃক্ষ দিয়া রাখিত, (উহা দ্বারা হযরতের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। মদিনার খেজুর বাগান-বিশিষ্ট শহরতলী এলাকা—) বনু কোরায়জা ও বনু নজীর—ইহুদী গোত্রদ্বয়ের বস্তি মোসলমানদের করায়ত্ব হইলে পর উহা হইতে প্রাপ্ত হযরতের অংশ বিশেষ দ্বারা হযরতের ব্যয় বহনের ব্যবস্থা হইল এবং হযরত (দঃ) লোকদের প্রদত্ত খেজুর বৃক্ষ ফেরৎ দিয়া দিতে লাগিলেন।

---

* কারণ নবীগণের মৃত্যু প্রকৃত প্রস্তাবে মৃত্যু নয় ; তাঁহাদের জীবন-সূর্য্য অস্তমিত হয় না, বরং শুধু আবরনে ঢাকিয়া যায় মাত্র। এই সূত্রেই তাঁহাদের মৃত্যুর পরেও অন্যত্র তাঁহাদের স্ত্রীগণের আর বিবাহ হইতে পারে না। সাধারণ শহীদের বেলাও এই হুকুম নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—দুনিয়ার কোন আকর্ষণ যে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে স্পর্শও করিতে পারিয়াছিল না তাহা নূতনভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই। "যুহ্দ" বা দুনিয়ার প্রতি বৈরীভাব সম্পর্কীয় অধ্যায়ের অসংখ্য হাদীছ এই বিষয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে; যাহার কিছু বিবরণ ইনশা আল্লাহ্ তায়ালা পরবর্ত্তী খণ্ডে অনুদিত হইবে। ঐসব হাদীছ এবং বিশেষরূপে ইতিহাসই ঐ সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমান ও সাক্ষী রহিয়াছে। সুতরাং বিশেষ কোন ধন সম্পদ হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) পরিত্যক্তরূপে ছাড়িয়া যান নাই—ইহারই উল্লেখ নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে।

১৭৪৯। **ছাদীছ ঃ**—(৬৪১ পৃঃ) আম্র-ইবনুল হারেছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বর্ণ-রৌপ্যের কোন মুদ্রা কিম্বা ক্রীতদাস-দাসী (ইত্যাদি কোন ধন-সম্পদ দুনিয়াতে) রাখিয়া যান নাই। তাঁহার ব্যবহারের যানবাহন একটি শ্বেত বর্ণের খচ্চর এবং তাঁহার নিজস্ব যুদ্ধাস্ত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন। আর রাখিয়া গিয়াছিলেন (পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের উপযোগী) কিছু পরিমাণ বাগান-জমি; উহারও মূল ভূমি আল্লার ওয়াস্তে দান করিয়া গিয়াছিলেন।

১৭৫০। **ছাদীছ ঃ**—(৯৯৬ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ইহজগৎ ত্যাগের পর তাঁহার স্ত্রীগণ নিজেদের মীরাস লাভ করার জন্য ওসমান (রাঃ)কে খলীফাতুল মোছলেমীন আবুবকরের নিকট পাঠাইতে উদ্যত হইলেন। তখন আয়েশা (রাঃ) তাঁহাদিগকে বলিলেন, আপনাদের কি স্মরণ নাই যে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন— لا نورث ما تركنا صدقة

"আমাদের (তথা নবীগণের সম্পত্তির) ওয়ারেস বা উত্তরাধীকারী কেহ হইতে পারে না; আমরা যাহা কিছু রাখিয়া যাইব সবই ছদকাহ্ পরিগণিত হইবে।"

১৭৫১। **ছাদীছ ঃ**—(৯৯৬ পৃঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার উত্তরাধীকারীগণ বন্টন করিয়া নেওয়ার কোন টাকা-পয়সা পাইবে না। যাহা কিছু আমার পরিত্যক্ত থাকিবে উহা হইতে আমার স্ত্রীগণের ভরণ-পোষন এবং কার্য্য পরিচালনাকারীগণের ব্যয় বহন করা হইবে; অতিরিক্ত যাহা থাকিবে তাহা দান বা ছদকাহ্ পরিগণিত হইবে।

১৭৫২। **ছাদীছ ঃ**—(৫২৬ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ফাতেমা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি যাহা মদিনায় দান স্বরূপ ছিল এবং ফদক এলাকা ও খয়বরের অংশ—এইসব সম্পত্তি হইতে স্বীয় উত্তরাধিকার-স্বত্ব চাহিয়া আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন।

আবুবকর (রাঃ) বলিলেন; রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমাদের তথা নবীগণের সম্পত্তির কেহ ওয়ারেস বা উত্তরাধীকারী হইতে পারে না; উহা ছদকাহ্ পরিগণিত

হইবে। অবশ্য মোহাম্মাদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) পরিবারবর্গ ঐ সম্পত্তি হইতে, যাহা বস্তুতঃ আল্লার জন্য হইয়া গিয়াছে—ভরণ-পোষন লাভ করিবে; তদতিরিক্ত ঐ সম্পত্তির মধ্যে সেই পরিবারবর্গেরও কোন হক্ব্ বা অধিকার নাই।

আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের (এই সুস্পষ্ট নির্দ্দেশের বিপরিত তাঁহার) দানকৃত বস্তু সমূহের মধ্যে আমি এক তিল পরিমাণও ব্যতিক্রম করিতে পারিব না। রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং যেরূপে ঐসবের পরিচালনা করিতেন আমিও ঠিক সেইরূপেই পরিচালনা করিব।

অতঃপর আলী (রাঃ) এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় আবুবকরের মর্ত্তবা ও মর্য্যাদার স্বীকৃতি দানপূর্ব্বক তাঁহাকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আত্মীয়বর্গের প্রতি লক্ষ্য করা এবং তাঁহাদের হক্ব্ ও অধিকারের প্রতি লক্ষ্য করার আবেদন জানাইলেন।

তদুত্তরে আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, আমি ঐ সর্ব্বশক্তিমান আল্লার কসম করিয়া বলিতেছি যাঁহার ক্ষমতায় আমার জান-প্রাণ যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আত্মীয়বর্গের প্রতি লক্ষ্য করাকে আমি আমার নিজ আত্মীয়বর্গের প্রতি লক্ষ্য করা অপেক্ষা অধিক (পছন্দ ও গুরুত্ব দান করিয়া থাকি। (অর্থাৎ হযরতের আত্মীয়বর্গ মাথার উপরে, কিন্তু হযরতের আদেশ সর্ব্বাগ্রে।)

ব্যাখ্যা—আবুবকর (রাঃ) যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা অতি সুস্পষ্ট ছিল। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্পত্তির উপর স্বীয় কর্ত্তৃত্ব জিয়াইয়া রাখাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি শুধু বিবি ফাতেমা (রাঃ)কেই উক্ত সম্পত্তি হইতে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন না। যদি উহা বন্টিত হইত তবে তাঁহার নিজ কন্যা আয়েশা (রাঃ) এবং ওমরের কন্যা হাফ্ছাহ্ (রাঃ) অংশীদার হইতেন, কিন্তু তিনি কাহাকেও কোন অংশ দেন নাই। আবুবকরের উদ্দেশ্য ছিল এই সম্পত্তি সম্পর্কে হযরতের নির্দ্দেশকে পালন করিয়া যাওয়া যাহার উল্লেখ বিভিন্ন হাদীছে রহিয়াছে।

অবশ্য ফাতেমা (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) এই ব্যাপারে আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি মনঃক্ষুন্ন হইয়া ছিলেন, এমনকি এই ব্যাপারটি বোখারী শরীফের ৪৩৫ এবং ৬০৯ পৃষ্ঠায়ও উল্লেখ হইয়াছে। তথাকার বর্ণনা মতে ফাতেমা (রাঃ) আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি এই ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু আবুবকর (রাঃ) হযরতের স্পষ্ট নির্দ্দেশের দরুণ অপারগ ছিলেন।

ব্যাপারটা হয়ত এইরূপ ছিল যে, ফাতেমা (রাঃ) ও আলী (রাঃ) ঐ সম্পত্তিকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উত্তরাধীকারী আত্মীয়বর্গের মধ্যে বণ্টন করতঃ তাঁহাদিগকে মোতাওয়াল্লী বানাইয়া দেওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন। অপর পক্ষে আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আশঙ্কা এই ছিল যে, হযরতের স্পষ্ট নির্দ্দেশ

অনুসারে এইসব সম্পত্তি আল্লার নামে দান ও ছদকাহ ; ইহা একবার ভাগ বণ্টনের আওতায় আসিয়া গেলে পরবর্ত্তীকালে ইহার বাস্তব রূপটা নষ্ট হইয়া যাইবে।

আবুবকরের নীতি যুক্তি সম্মত ছিল, কিন্তু ফাতেমা (রাঃ) ও আলী (রাঃ) হযরতের ঘনিষ্টতা সূত্রে তাঁহাদের যে অধিকার ছিল সেই অধিকার দাবী করিয়াছিলেন। ব্যাপারটা অতি সাধারণ ; সম পর্য্যায়ের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এই ধরণের মতবিরোধ বিশেষ কোন গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হয় না।

কিন্তু শিয়া সম্প্রদায় যাহারা আবুবকর (রাঃ) ও ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি ঈমানহীন রূপে ক্ষেপিয়া আছে, তাহারা আলোচ্য বিষয়টিকে ভয়ানক ঘোলাটে করিয়া দেখাইয়া থাকে। অথচ ঘটনা অতি সাধারণ ছিল। আবুবকর (রাঃ) স্বয়ং ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রাজি ও সন্তুষ্ট করিয়া নিয়াছিলেন। (সীরতে মোস্তফা ৩—২৬৬, ব-হাওয়ালা বোদয়াহ ওয়ান-নেহায়াহ্।) এবং স্বল্পকালের মধ্যে ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার মৃত্যু হইয়া যাওয়ার পর স্বয়ং আলী (রাঃ) আবুবকর (রাঃ)কে নিজ গৃহে সংবাদ দিয়া আনিয়াছিলেন এবং সম্মুখে পরস্পর সব কথাবার্ত্তা মন-খোলা ভাবে বলিয়া দিয়া অতঃপর সর্ব্ব সমক্ষে আনুষ্ঠানিক রূপে উভয়ের মিল-মিশের ঘোষণা জানাইয়া দিয়াছিলেন, যাহার বিবরণ নিম্নের হাদীছে অতি সুস্পষ্টাকারে বর্ণিত হইয়াছে।

১৭৫৩। হাদীছঃ—(৬০৯) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যে সম্পত্তি মদিনায় ছিল এবং ফদক এলাকা ও খয়বরের অংশ—এই সবের মিরাস্ দাবী করিয়া হযরতের কন্যা ফাতেমা (রাঃ) আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। আবুবকর (রাঃ) তদুত্তরে বলিলেন, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমাদের তথা নবীগণের সম্পত্তির ওয়ারেস বা উত্তরাধিকারী কেহ হইবে না ; আমাদের পরিত্যক্ত সব কিছু ছদকাহ্ পরিগণিত হইবে। অবশ্য মোহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম) পরিবারবর্গ এই সম্পত্তি হইতে ভরণ-পোষণ লাভ করিবে।

আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, খোদার কসম—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছদকাহ্কে আমি এক তিলও পরিবর্ত্তন করিতে পারিব না ; উহা তাহার পূর্ব্বাবস্থার উপরই বহাল থাকিবে—যে অবস্থায় হযরতের আমলে ছিল। আমি ঐ রূপেই উহার পরিচালনা করিব যেরূপে হযরত (দঃ) করিতেন। এই বলিয়া আবুবকর (রাঃ) ঐ সম্পত্তি ফাতেমা (রাঃ)কে বণ্টন করিয়া দিতে অস্বীকার করিলেন। ইহাতে ফাতেমা (রাঃ) তাঁহার প্রতি রাগান্বিত হইয়া চলিয়া আসিলেন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত (এই ব্যাপারে) আর তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাতও করেন নাই, কথাও বলেন নাই। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরে ফাতেমা (রাঃ) মাত্র ছয় মাস জীবিত ছিলেন।

(আলী (রাঃ)ও আবুবকর (রাঃ)এর প্রতি মনঃক্ষুন্ন ছিলেন, এমনকি) ফাতেমা (রাঃ) এন্তেকাল হইলে পর আলী (রাঃ) রাত্রি বেলায়ই তাঁহার কাফন-দাফন কার্য্য সমাধা করিয়া দিলেন, আবুবকর (রাঃ)কে সংবাদ জানাইলেন না।

ফাতেমা (রাঃ) জীবিত থাকাবস্থায় লোকদের মধ্যে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল, কিন্তু ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ইন্তেকাল হইলে পর আলী (রাঃ) অনুভব করিলেন যে, লোকদের সেই আকর্ষণ লোপ পাইয়া গিয়াছে। এতদ্দৃষ্টে আলী (রাঃ) আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সঙ্গে মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য এবং তাঁহার প্রতি প্রকাশ্যে সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য আগ্রহশীল হইলেন। এতদিন আলী (রাঃ) আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি সেইরূপে সমর্থন জ্ঞাপনের ঘোষণা দিয়াছিলেন না।

সেমতে আলী (রাঃ) আবুবকর (রাঃ)কে এই মর্ম্মে সংবাদ দিলেন যে, আপনি আমার গৃহে তশরীফ আনিবেন, আপনার সঙ্গে অন্য কেহ যেন না আসেন—উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ওমর (রাঃ) যেন সঙ্গে না থাকেন। ওমর (রাঃ) ইহা অবগত হইয়া আবুবকর (রাঃ)কে বলিলেন, কসম খোদার—আপনি একা তাহাদের গৃহে যাইতে পারিবেন না। আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, তাহাতে আশঙ্কার কি আছে ? তাহারা আমাকে কি করিবে ? অতঃপর আবুবকর (রাঃ) তথায় উপস্থিত হইলেন।

প্রথমে আলী (রাঃ) ভাষণ দান পূর্ব্বক আবুবকর (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমরা আপনার মর্ত্তবা সম্পর্কে এবং আপনাকে আল্লাহ তায়ালা যে উচ্চ মর্য্যাদা দান করিয়াছেন উহা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফ-হাল রহিয়াছি এবং তাহা আমরা স্বীকার করি। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যে উচ্চাসনের অধিকারী করিয়াছেন উহার জন্য আমরা মোটেও কোন হিংসা করি না, কিন্তু আমাদের অভিযোগ এই যে, আপনি ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্ব পরিচালনার ব্যাপারে এক-নায়কত্বের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জ্ঞাতি-গুষ্টি ও নিকটতম আত্মীয় হওয়া সূত্রে এই ব্যাপারে আমাদেরও হক্ক এবং দাবী ছিল বলিয়া আমরা মনে করি।

আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বক্তব্য শ্রবণে আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর চক্ষুদ্বয় বহিয়া পড়িল। অতঃপর তিনি এই বলিয়া বক্তব্য আরম্ভ করিলেন যে, ঐ মহান খোদার কসম যাঁহার ক্ষমতাধীন আমার জান-প্রাণ, নিশ্চয়ই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আত্মীয়তার মর্য্যাদা আমার নিকট আমার নিজের আত্মীয়তার মর্য্যাদা অপেক্ষা অনেক বেশী, কিন্তু আপনার ও আমার মধ্যে হযরতের এই জায়গা-জমির ব্যাপারে যেই মতানৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছে উহা সম্পর্কে আমি উত্তম পথ অবলম্বনে বিন্দুমাত্র অবহেলা করি নাই এবং এই পর্য্যন্ত আমি ঐ জমি সম্পর্কে এমন একটি কাজও ছাড়ি নাই যাহা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে করিতে দেখিয়াছি।

অতঃপর আলী (রাঃ) বলিলেন, আনুষ্ঠানিকরূপে আপনার সমর্থন ঘোষণার জন্য আগামীকল্য দিনের দ্বিতীয়ার্দ্ধের ওয়াদা রহিল। সেমতে পরবর্ত্তী দিন আবুবকর (রাঃ) জোহরের নামাযান্তে মিম্বরে আরোহন করিলেন এবং ভাষণ দান পূর্বক আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উল্লেখ করিলেন এবং তাঁহার তরফ হইতে প্রকাশ্যে সমর্থন ঘোষণায় বিলম্ব হওয়ার ওজর যাহা তিনি পেশ করিয়াছেন বর্ণনা করিলেন এবং সকল দোষ-ক্রুটির জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

তারপর আলী (রাঃ) ভাষণ দান পূর্বক আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর যোগ্যতার প্রতি অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং বলিলেন, তাঁহার প্রতি সমর্থন ঘোষণায় বিলম্ব করার কারণ ও হেতু তাঁহার প্রতি হিংসা বিদ্বেশ পোষণ করা নহে এবং তাঁহার খোদা প্রদত্ব মর্য্যাদাকে উপেক্ষা করাও নহে। হাঁ—আমাদের ধারণা এই যে, কর্ত্তৃত্ব পরিচালনার ব্যাপারে আমাদেরও পরামর্শ দানের অধিকার রহিয়াছে—সেই ক্ষেত্রে তিনি এক-নায়কত্বের ভূমিকা গ্রহণ করায় আমরা মনক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম। (এই বলিয়া আলী (রাঃ) আবুবকর (রাঃ)এর প্রতি অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং সর্ব্ব সমক্ষে তাঁহার হাতে হাত দিয়া তাঁহার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনের ঘোষণা প্রদান করিলেন। মোসলেম শরীফ।) এই মিল মহব্বত প্রকাশে মোসলমানগণ অতিশয় খুশি হইলেন এবং আলী (রাঃ)কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। এই শুভ কার্য্য সম্পাদিত হইলে পর মোসলমানগণ আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি অধিক সৌজন্যশীল হইয়া উঠিলেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—উল্লেখিত জায়গা-জমি আবুবকর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খেলাফতকাল পর্য্যন্ত তাঁহার তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হইল। ওমর (রাঃ) খলীফা হইলে পর দুই বৎসরকাল ঐ অবস্থায়ই চলিল; অতঃপর আলী (রাঃ) এবং আব্বাস (রাঃ) তাঁহার নিকট এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন যে, অন্ততঃ মদিনাস্থ জমির পরিচালনার ভার প্রদানে আমাদিগকে উহার মোতাওয়াল্লী বানান হউক। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে আসাল্লামের চাচা এবং চাচাত ভাই—এইরূপ ঘনিষ্ট হইয়াও তাঁহারা রসুলুল্লার পরিত্যক্ত সম্পত্তির সম্পর্ক হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকিবেন – ইহাই তাঁহাদের পক্ষে পীড়াদায়ক ছিল যদ্দরুন তাঁহারা এই ব্যাপারে এত অধিক তৎপরতা দেখাইতেন। ওমর (রাঃ) তাঁহাদের এই অভিপ্রায় এতটুকু পূরণ করিলেন যে, মদিনাস্থ বনু-নজীর মহল্লার জমির ভাগ-বন্টন ব্যতিরেকে আব্বাস (রাঃ) ও আলী (রাঃ)কে একত্রে মোতাওয়াল্লী বানাইয়া দিলেন। কিছুদিন পর পরিচালন ব্যাপারে তাঁহাদের মত-বিরোধের সৃষ্টি হইল। সেমতে তাঁহারা পুনরায় ওমর (রাঃ)-এর নিকট যাইয়া ঐ জমিকে বন্টন করতঃ প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন অংশের মোতাওয়াল্লী বানাইতে বলিলেন। ওমর (রাঃ) ঐ জমির উপর কোন প্রকার ভাগ-বন্টন আরোপ করাকে কঠোরভাবে অস্বীকার করিলেন। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নের হাদীছে রহিয়াছে—

১৭৫৪। হাদীছ ঃ—(৪৩১ ও ৫৭৫ পৃঃ) মালেক-ইবনে আউস (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি খলীফাতুল-মোছলেমীন ওমর রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট তাঁহার আহ্বানে উপস্থিত হইলাম ; এমতাবস্থায় তাঁহার দারওয়ান আসিয়া সংবাদ দিল যে, ওসমান (রাঃ), আবতুর রহমান-ইবনে আ'উফ (রাঃ), যোবায়ের (রাঃ) এবং সায়া'দ-ইবনে আবী অক্কাস (রাঃ) উপস্থিত হইয়াছেন—তাঁহারা আপনার সাক্ষাৎ চাহেন। ওমর (রাঃ) তাঁহাদের সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন। তাঁহারা তাঁহার নিকট আসিয়া সালাম করতঃ বসিয়া পড়িলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই দারওয়ান আসিয়া পুনঃ সংবাদ দিল, আলী (রাঃ) এবং আব্বাস (রাঃ)ও আসিয়াছেন ওমর (রাঃ)। তাঁহাদিগকেও অনুমতি দিলেন, তাঁহারাও উপস্থিত হইয়া সালাম করতঃ বসিলেন।

অতঃপর (হযরতের চাচা) আব্বাস (রাঃ) ওমর (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! আমার এবং ইহার (আলী (রাঃ)-এর) মধ্যে একটি চুড়ান্ত ফয়ছালা করিয়া দিন। তাঁহারা উভয়ে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরিত্যক্ত বনু-নজীর বস্তির তত্ত্বাবধান কার্য্য পরিচালনার ব্যাপারে মতবিরোধের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তথায় উপস্থিত ওসমান (রাঃ) এবং তাঁহার সঙ্গীগণও এই ব্যাপারে জোর দিলেন যে, হাঁ—তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে (ভাগ-বণ্টন করিয়া দিয়া) চুড়ান্ত ফয়ছালা করতঃ পরস্পরের মধ্যে শান্তির ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াই উত্তম।

ওমর (রাঃ) সকলকে বলিলেন, একটু থামুন। আমি আসমান-জমিনের রক্ষাকর্ত্তা মহান আল্লার কসম দিয়া আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা জানেন কি যে, রসুলুল্লাহ(দঃ) বলিয়াছেন, কেহ আমাদের (তথা নবীগণের) ওয়ারেস হইতে পারিবে না, আমাদের পরিত্যক্ত সব কিছু ছদকাহ পরিগণিত হইবে— এই কথার দ্বারা হযরত (দঃ) নিজের বিষয়ই উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন ? ওসমান (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীগণ এক বাক্যে বলিলেন, হাঁ—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ইহা বলিয়াছিলেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) আলী (রাঃ) ও আব্বাস (রাঃ)-এর প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করতঃ আল্লার কসম দিয়া তাঁহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারাও কি জানেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐরূপ বলিয়াছেন ? তাঁহারা উভয়ে স্বীকার করিলেন, হাঁ—হযরত (দঃ) ঐরূপ বলিয়াছেন।

তখন ওমর (রাঃ) তাঁহাদের সকলকে বলিলেন, আমি আপনাদিগকে মূল বৃত্তান্ত শুনাইতেছি—এই বলিয়া তিনি পবিত্র কোরআন ছুরা হাশরের একটি আয়াত তেলাওয়াত করিয়া বলিলেন, বিনা যুদ্ধে আল্লাহ তায়ালা যে জায়গা-জমি রসুলুল্লার হস্তগত করিয়া দিয়াছিলেন উক্ত আয়াত নাজেল করিয়া সেই জমির মালিকানাও আল্লাহ তায়ালা রসুলুল্লাহ (দঃ)কেই দিয়াছিলেন। (এই শ্রেণীর মালিকানা একমাত্র রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর জন্যই হইয়াছিল, অন্য কাহারও পক্ষে এইরূপ হইবে না।)

কিন্তু খোদার কসম—রসুলুল্লাহ (দঃ) ঐরূপ জায়গা-জমি সমূহ সকলকে বাদ দিয়া একাই সবগুলি কুক্ষিগত করিয়াছিলেন না, বরং সবই মোসলমানদের মধ্যে ভাগ বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। শুধুমাত্র এই সামান্য (বনু-নজীর মহল্লার) জমিটুকু (এবং "ফদক" এলাকাটুকু) রাখিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা হযরত (দঃ) স্বীয় পরিবারবর্গের পুর্ণ বৎসরের খোর-পোষের ব্যবস্থা করিতেন। ইহার আয়ের মধ্যেও যাহা অতিরিক্ত থাকিত তাহা লিল্লাহরূপে দান খয়রাত (বা সমরাস্ত্র সংগ্রহে*) ব্যয় করিয়া দিতেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় জীবনকালে এই পন্থায়ই উক্ত জমির কার্য্য চালাইয়া গিয়াছেন। ওমর (রাঃ) স্বীয় বক্তব্যের উপর উপস্থিত সকলকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কি এই বিবরণ অবগত আছেন ? সকলেই উত্তর করিলেন, হাঁ।

ওমর (রাঃ) বলিলেন, অতঃপর যখন হযরত (দঃ) ইহজগৎ ত্যাগ করিয়া গেলেন তখন আবুবকর (রাঃ) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ঐ জমির পরিচালনা নিজ হস্তে রাখিলেন এবং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পন্থায়ই কাজ চালাইয়া গেলেন। এই সময়ে ওমর (রাঃ) আব্বাস ও আলী (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, তখন আপনারা আবুবকরের সমালোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সাক্ষী আছেন যে, আবুবকর (রাঃ) এই ব্যাপারে সত্যের প্রতীক, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা হক্ পথের পথিক ছিলেন। তারপর আবুবকর (রাঃ) ইহজগৎ ত্যাগ করিলেন এবং আমি তাঁহার স্থলে বসিয়া ঐ জমির পরিচালনা ভার গ্রহণ করিলাম ও দুই বৎসরকাল রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং আবুবকরের পন্থায় আমি উহার পরিচালনা করিলাম। আল্লাহ তায়ালা সাক্ষী যে, আমি সত্য, ন্যায় ও হক্ ভাবে উহার পরিচালনা করিয়াছি।

অতঃপর আপনারা দুইজন আমার নিকট উপস্থিত হইয়া একই দাবী পেশ করিলেন। হে আব্বাস! আপনি ত চাচা হওয়া সূত্রে ভাতিজার অংশ দাবী করিলেন এবং আলী স্বীয় স্ত্রীর পক্ষে তাঁহার পিতার অংশ দাবী করিল। তখন আমি আপনাদিগকে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ঐ কথাই শুনাইলাম যে, কেহ তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবে না, তাঁহার পরিত্যক্ত সব ছদকাহ্ পরিগণিত হইবে। তারপর আমার রায় হইল যে, মদিনাস্থ জমিটা আপনাদের হাওয়ালা করি। সেমতে আমি আপনাদের উভয়কে ডাকিয়া বলিলাম যে, মোতাওল্লী স্বরূপ এই জমির পরিচালনার ভার আপনাদের হস্তে ছাড়িয়া দিতে পারি এই শর্ত্তে যে, আপনারা আল্লার নামে ওয়াদা অঙ্গীকার করিবেন যে, ইহার সমুদয় কার্য্য রসুলুল্লাহ (দঃ), আবুবকর (রাঃ) এবং আমি মোতাওয়াল্লী হইয়া এযাবৎ যেই পন্থায় চালাইয়াছি আপনারাও ঠিক সেই পন্থায়ই চালাইবেন। তখন আপনারা উভয়েই বলিয়াছিলেন, এই ভাবেই আমাদিগকে প্রদান করুন। আমি উক্ত শর্ত্তের উপর আপনাদিগকে মোতাওয়াল্লী বানাইয়া

* বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী বিষয়বস্তু মোছলেম শরীফে উল্লেখ আছে। (ফৎহুলবারী ৬—১৫৫)

ছিলাম। এস্থলেও উপস্থিত সকলকে তিনি কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার বক্তব্য ঠিক কি—না? সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিলেন যে, হাঁ—ঠিকই।

অতঃপর ওমর (রাঃ) আলী (রাঃ) ও আব্বাস (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ঐ ব্যবস্থার পরে এখনকি আপনারা আমার নিকট হইতে ভিন্ন কোন নূতন ব্যবস্থার আশা রাখেন? (যে, ভাগ-বণ্টন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অংশের মোতাওয়াল্লী বানাই?) মহান আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি যাঁহার আদেশে আসমান-জমিনের অস্তিত্ব কায়েম রহিয়াছে যে—আমার পূর্ব্ব ব্যবস্থা ভিন্ন নূতন কোন ব্যবস্থারই অবকাশ আমি দিব না। আপনারা ঐ ব্যবস্থানুযায়ী কাজ চালাইতে অপারগ হইলে উহা আমার হস্তে প্রত্যার্পণ করুন, আমিই আপনাদের স্থলে উহার কার্য্য পরিচালনা করিয়া যাইব।

অতঃপর ঐ জমি ছদকাহ্‌রূপে আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হয়; আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কর্ত্তৃত্ব অপসারিত হইয়া যায়। আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরে উহা তাঁহার পুত্র হাসান রাজিয়াল্লাহু আনহুর তত্ত্বাবধানে থাকে, তারপর হোসাইন রাজিয়াল্লাহু আনহুর তত্ত্বাবধানে থাকে, তারপর হোসাইনের পুত্র আলী—জয়নাল আবেদীন এবং হাসানের পুত্র হাসান—এই দুই জনের তত্ত্বাবধানে থাকে। তাঁহারা উভয়ে সময়ের ভিত্তিতে ভাগ করিয়া নিয়াছিলেন—কিছুকাল একজন এবং কিছুকাল অপরজন; এইভাবে তাঁহারা উহার তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহাদের পর উহা হাসানের পুত্র যায়েদের তত্ত্বাবধানে ছিল। বস্তুতঃ ঐ জমি রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক প্রদত্ত দান ও ছদকাহ্‌রূপেই পরিচালিত ছিল।

নবীজী মোস্তফার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য

হযরতের দৈহিক অঙ্গ-সৌষ্ঠব: (৫০১ পৃঃ)

১৭৫৫। হাদীছ:—(৫০২ পৃঃ) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দৈহিক গঠন মধ্যম শ্রেণীর ছিল—অতি লম্বাও নয়, একেবারে বেটে খর্ব্বকায়ও নয়। শরীরের রং অতি উজ্জল ছিল, ফেকাসিয়া সাদাও ছিল না, ময়লা শ্রেণীর শ্যামবর্ণও ছিল না। মাথার চুল অধিক কুঞ্চিতও ছিল না, সম্পূর্ণ সোজাও ছিল না—মামুলি বাঁকযুক্ত সুশৃঙ্খল ছিল।

চল্লিশ বৎসর বয়সকালে তাঁহার প্রতি অহী নাযেল হওয়া আরম্ভ হয় এবং তাঁহার নবুয়ত প্রকাশ হয়, অতঃপর তিনি মক্কায় দশ বৎসর এবং মদিনায় দশ বৎসর অতিবাহিত করেন। ইহজগত ত্যাগকালে তাঁহার মাথা ও দাঁড়ির মধ্যে সর্ব্বমোট কুড়িটি চুলও সাদা হইয়াছিল না।

ব্যাখ্যা ঃ—উল্লেখিত সময়ের হিসাব শুধু মাত্র মোটামুটি স্বরূপ, নতুবা সূক্ষ্ম হিসাব দৃষ্টে অহী নাযেলের আরম্ভকাল চল্লিশ বৎসর হইতে কয়েক মাস, কয়েক দিন ও কয়েক ঘণ্টার বেশ-কম হইবে, কারণ হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রবিউল আউওয়াল মাসের ১২ তারিখে ভোর বেলা ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন এবং রমজান মাসের শেষের দিকে কোন এক তারিখে লাইলাতুল কদরের রাত্রে সর্ব্বপ্রথম অহী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই সূত্রে চল্লিশ বৎসর হইতে কিছু কম-বেশ হওয়া অবধারিত।

মক্কায় অবস্থান সম্পর্কেও তদ্রূপই ; অন্যান্য সূত্রে মক্কায় অবস্থানকাল তের বৎসর সাব্যস্ত হইয়াছে ; আলোচ্য হাদীছে দশকের উপর ভাঙ্গা সংখ্যা ধরা হয় নাই।

১৭৫৬। হাদীছ ঃ—(৫০২ পৃঃ) বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সর্বাধিক সুশ্রী ও সুচরিত্রমান ছিলেন। তাঁহার দৈহিক গঠনও সুন্দর ছিল ; অধিক লম্বাও ছিলেন না এবং অধিক বেঁটেও ছিলেন না।

১৭৫৭। হাদীছ ঃ—(৮৭৬ পৃঃ) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মাথা অপেক্ষাকৃত বড় আকারের ছিল (যাহা জ্ঞানীবান শক্তিশালী পুরুষের আকৃতি) এবং তাঁহার পায়ের পাতা পুরু, বড় ও মজবুত ছিল। পূর্ব্বে বা পরে তাঁহার তুল্য (অঙ্গ সৌষ্ঠববিশিষ্ট) কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। হযরতের হাতের তালু সুপ্রশস্ত ছিল।

১৭৫৮। হাদীছ ঃ—(৫০২ পৃঃ) বরা ইবনে আ'যেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দৈহিক আকৃতি মধ্যম শ্রেণীর ছিল এবং তাঁহার কাঁধদ্বয়ের মধ্যস্থল সুপ্রশস্ত ছিল (তথা তাঁহার বক্ষ বা সিনা মোবারক অপেক্ষাকৃত চৌড়া ছিল।) তাঁহার মাথার গোপ উভয় কানের লতি পর্য্যন্ত পৌঁছিত (—ইহার অধিক লম্বা হইতে দিতেন না)।

আমি তাঁহাকে লাল রঙ্গের পোশাকে দেখিয়াছি—তিনি এত সুন্দর দেখাইতেন যে, আমি কাহাকেও তাঁহার তুল্য সুন্দর দেখি নাই।

১৭৫৯। হাদীছ ঃ—(৫০২ পৃঃ) বরা ইবনে আযেব (রাঃ)কে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চেহারা মোবারক কি তরবারির ন্যায় (জলজ্বলা লম্বা সাইজের) ছিল? বরা (রাঃ) বলিলেন, না—না, তাঁহার চেহারা মোবারক পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় (উজ্জ্বল ও গোলাকৃতির) ছিল।

১৭৬০। হাদীছ ঃ—(৫০৩ পৃঃ) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মোটা বা চিকন—কোন প্রকার রেশমী কাপড়ও হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হস্ত মোবারক অপেক্ষা অধিক কোমল পাই নাই এবং হযরতের শরীরে সৃষ্টিগতভাবে যে সুগন্ধি ছিল উহা অপেক্ষা অধিক কোন সুগন্ধি আমি কোথাও পাই নাই।

১৭৬১। হাদীছ :—আবু জোহায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (হজ্জের সময়ে মিনা হইতে মক্কার পথে আব্‌তাহ নামক স্থানে ছিলেন ;) দ্বিপ্রহরে (জোহরের নামাজের শেষ ওয়াক্তে তিনি তাবু হইতে) বাহির হইলেন এবং জোহরের নামায পড়িলেন, অতঃপর (আছরের নামাযের আউয়াল ওয়াক্তে) আছরের নামায আদায় করিলেন।

তখনকার ঘটনা—লোকেরা হযরতের হাতে হাত মিলাইয়া প্রত্যেকেই নিজ নিজ হাত (বরকতের জন্য) স্বীয় চেহারার উপর বুলাইতে লাগিল। আবু জোহায়ফা (রাঃ) বলেন, তখন আমিও হযরতের হস্ত স্পর্শ করিলাম এবং আমার হাতও আমার চেহারার উপর বুলাইলাম ; আমি স্পষ্ট অনুভব করিয়াছি, হযরতের হস্ত মোবারক বরফ তুল্য শীতল এবং মুশ্‌ক্‌ বা কস্তুরী অপেক্ষা অধিক সুগন্ধিময়।

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সময় সময় তাঁহাদের বাড়ী তশরীফ আনিতেন। তাঁহার মাতা) উম্মে-ছোলায়েম (দুপুর বেলা) হযরতের আরাম করার জন্য চামড়ার বিছানা বিছাইয়া দিতেন। হযরত (দঃ) ঐ বিছানার উপর দুপুর বেলা ঘুমাইতেন ; (স্বাভাবিক ভাবে হযরতের শরীরে অধিক পরিমানে ঘাম নির্গত হইয়া থাকিত।) হযরত যখন ঘুম হইতে উঠিয়া যাইতেন তখন উম্মে-ছোলায়েম চামড়ার বিছানার উপর হইতে হযরতের ঘাম এবং তাঁহার মাথা হইতে দুই-চারটা চুল ছিন্ন হইয়া পড়িয়া থাকিলে উহা কুড়াইয়া কাঁচের শিশিতে জমা করিতেন এবং উহাকে সুগন্ধির সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতেন।

(একদা হযরত (দঃ) উম্মে-ছোলায়েমকে ঐ সব কুড়াইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি ? উম্মে-ছোলায়েম আরজ করিলেন, ইহা আপনার শরীরের ঘাম—আমি উহা জমা করিয়া রাখি এবং সুগন্ধ বস্তুর সহিত মিশ্রিত করিয়া থাকি ; কারণ, উহা সর্ব্বাধিক সুগন্ধি ; উহার দ্বারা অন্য সুগন্ধির উৎকর্ষ সাধিত হয়।

উম্মে-ছোলায়েম ইহাও বলিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ। বরকতের জন্য উহা ছেলে-মেয়েদেরকেও ব্যবহার করাই। হযরত (দঃ) তদুত্তরে বলিয়াছেন, উত্তমই বটে।

হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাগের্দ বলিয়াছেন, আনাছ (রাঃ) মৃত্যুকালে অছিয়ত করিয়াছিলেন, হযরতের ঘাম মিশ্রিত সুগন্ধি যেন আমার কাফনে দেওয়া হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাহাই করা হইয়াছে।

১৭৬২। হাদীছ :—(৮৫৭ পৃঃ) মোহাম্মদ ইবনে সীরীন (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, হযরত নবী (দঃ) কি খেজাব ব্যবহার করিতেন ? তিনি বলিলেন, হযরতের বার্দ্ধক্য এতদূর পৌঁছিয়াছিল না যে, খেজাবের প্রয়োজন হয়। তাঁহার দাঁড়ি মোবারকের এত অল্প সংখ্যক চুল শাদা হইয়াছিল যে, ইচ্ছা করিলে সহযেই উহা গণনা করা যাইত।

১৭৬৩। হাদীছঃ—(৫০১ পৃঃ) আবু জোহায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়াছি, তাঁহার (নিম্ন উষ্ঠের নিচে) বাচ্ছা দাড়ীর কতিপয় চুল সাদা হইয়াছিল মাত্র।

১৭৬৪। হাদীছঃ—(৫০২ পৃঃ) হারীজ ইবনে ওসমান আবদুল্লাহ ইবনে বুছ্‌র (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, শুধু তাঁহার বাচ্ছা দাড়ীর কতিপয় চুল সাদা হইয়াছিল।

১৭৬৫। হাদীছঃ—(৫০২ পৃঃ) কাতাদাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কি খেজাব ব্যবহার করিতেন? তিনি বলিলেন, খেজাবের প্রয়োজনই ছিল না; শুধু কেবল তাঁহার মাথার উভয় পার্শ্বের কিছু পরিমাণ কেশ সাদা হইয়াছিল।

১৭৬৬। হাদীছঃ—(৫০৩ পৃঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রথমে স্বীয় মাথার বাবরি আঁচড়াইতে মাথার অগ্রভাগে সিঁথি না কাটিয়া অগ্রভাগের চুলগুলোকে গিঁট লাগাইয়া কপালের উপর ছাড়িয়া দিতেন, তৎকালে কেতাবধারী ইহুদী-নাছারাদের রীতিও ইহাই ছিল; মোশরেকগণ কিন্তু সিঁথি কাটিয়া থাকিত। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) যে কার্য্যে বিশেষ কোন নিয়মের আদিষ্ট না হইতেন সেই কার্য্যে তিনি কেতাবধারীদের রীতিকেই অগ্রগণ্য মনে করিতেন। (এস্থলে তিনি তাহাই করিতেন, কিন্তু) পরে তিনি সিঁথি কাটিবার রীতিই অবলম্বন করিয়াছিলেন।

হযরতের চরিত্র গুণ ঃ

১৭৬৭। হাদীছঃ—(২৮৫ পৃঃ) আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ), (যিনি তৌরাত কেতাবের বিশিষ্ট আলেম ছিলেন,) তাঁহাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, তৌরাত কেতাবে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের গুণাবলী কিরূপ বর্ণিত আছে তাহা জানাইবেন কি? তিনি বলিলেন, হাঁ—কোরআন শরীফে বর্ণিত অনেক গুণাবলী তৌরাতেও উল্লেখ রহিয়াছে যেমন—পবিত্র কোরআনে আছে—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا

"হে নবী! আমি আপনাকে রসুলরূপে প্রেরণ করিয়াছি—আপনি বাস্তব সত্যকে বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিবেন এবং সত্য-মিথ্যা, হেদায়েত ও গোমরাহীর সাক্ষ্যদাতা তথা নমুনা ও মাপকাঠি হইবেন এবং সত্যাবলম্বনকারীদের পক্ষে সুসংবাদ দানকারী হইবেন, সত্যের বিরোধীগণকে সতর্ককারী হইবেন।"

আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ) বলেন, তৌরাত শরীফেও হযরতের এই গুণগুলির উল্লেখ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে আরও কতিপয় গুণেরও উল্লেখ আছে যথা—"তিনি

অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন বিশ্ব-মানবকে রক্ষাকারী (ধর্ম্মের বাহক) হইবেন, আমার বিশিষ্ট বন্দা ও প্রেরিত প্রতিনিধি হইবেন, (আমার উপর পূর্ণ ভরসা ও নির্ভর স্থাপনকারী হইবেন ; যদ্দরুন) আমি তাঁহার নাম রাখিয়াছি "মোতাওয়াক্কেল" অর্থাৎ ভরসা স্থাপনকারী। তিনি কঠোর প্রকৃতির—কঠিন আত্মার লোক হইবেন না, (তাঁহার হৃদয় হইবে অতি কোমল। তিনি অতিশয় গাম্ভির্য্যপূর্ণ হইবেন, এমনকি পথে-ঘাটে) হাটে-বাজারে হট্টগোল করিয়া বেড়াইবার অভ্যাস তাঁহার মোটেই হইবে না। তিনি এতই সহিষ্ণু হইবেন যে, কাহারও দুর্ব্যবহারের প্রতিরোধ ও প্রতিশোধে তিনি দুর্ব্যবহার করিবেন না বরং ক্ষমা ও মার্জ্জনা করিবেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে ইহজগৎ হইতে উঠাইয়া নিবেন না যাবৎ না তাঁহার মাধ্যমে বক্রপথের পথিক কাফের জাতিকে সোজা করিয়া দেন, যে—তাহারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লার স্বীকৃতি দান করে এবং যাবৎ না তিনি এই কলেমার দ্বারা অন্ধ চক্ষু সমূহকে সত্যের আলো দান করেন, বয়রা-বধির কর্ণ সমূহে সত্য শ্রবন ও গ্রহণের শক্তি সৃষ্টি করেন, আবদ্ধ অন্তঃকরণ ও বুদ্ধি-বিবেককে সত্যের জ্ঞান দান করেন।

১৭৬৮। হাদীছ ঃ—(৫০৩ পৃঃ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَكَانَ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنَكُمْ اَخْلَاقًا۔

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম লজ্জাহীন অশ্লীল বিশ্রী কথাবার্ত্তায় অভ্যস্ত ত ছিলেনই না ঐরূপ কথা কুত্রাপি মুখেও আনিতেন না। তিনি উপদেশ দিতেন যে, যাহার চরিত্র ও আচার ব্যবহার ভাল সে-ই তোমাদের মধ্যে উত্তম।

১৭৬৯। হাদীছ ঃ—(৫০৩ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে কোন কার্য্যকে সমাধা করার একাধিক পথ-পদ্ধতি থাকিলে তিনি সহজ-সুলভ পথ-পদ্ধতি বাছিয়া লইতেন ; অবশ্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন যে, ইহাতে কোন দিক দিয়া শরীয়তের বরখেলাফ—গোনাহের কোন কিছু করিতে না হয়। যদি ঐ সহজ-সুলভ পথ-পদ্ধতি গোনাহের কারণ তথা শরীয়তের বরখেলাফ হইত তবে অবশ্যই তিনি ঐ পথ-পদ্ধতি হইতে বহু দূরে থাকিতেন।

আর রসুলুল্লাহ (দঃ) কখনও নিজস্ব কোন ব্যাপারে কাহারও হইতে প্রতিশোধ লইতেন না, (ক্ষমা করিতেন।) অবশ্য কেহ আল্লার শরীয়তের মর্য্যাদাহানীকর কোন কাজ করিলে সে স্থলে তিনি আল্লার দ্বীনের খাতিরে সুষ্ঠু প্রতিকার বিধান করিতেন।

১৭৭০। হাদীছ ঃ—(৫০৩ পৃঃ) আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অতিশয় লজ্জাশীল ছিলেন—পর্দ্দানশীন কুমারীও তত লজ্জাবতী হয় না। এমনকি রুচি বিরোধী কোন কিছুর সম্মুখীন হইলে তাঁহার চেহারার উপর উহার প্রতিক্রিয়া ভাসিয়া উঠিত, (কিন্তু মুখে কিছু বলিতেন না।)

১৭৭১। হাদীছ ঃ—(৫০৩ পৃঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কখনও কোন খাদ্য-বস্তুর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেন না; যদি মনের আকর্ষণ হইত তবে খাইতেন নতুবা খাইতেন না।

১৭৭২। হাদীছ ঃ—(৫০৩ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কথা বলার সময় এইরূপ ধীরে ধীরে কথা বলিতেন যে, তাঁহার শব্দাবলী কেহ গণনা করিতে ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তাহা করিতে পারিত।

১৭৭৩। হাদীছ ঃ—(৮৯৩ পৃঃ) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অশ্লীল কথা কখনও মুখে আনিতেন না, লান্-তান্ ও অভিসাপ দিতেন না এবং গালি-গালাজ করিতেন না। কাহারও ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলে শুধু এতটুকু বলিতেন, সে এরূপ করে কেন? তাহার কপালে মাটি পড়ুক।

১৭৭৪। হাদীছ ঃ—(৮৯২ পৃঃ) জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ)এর নিকট কোন কিছু চাওয়া হইলে কখনও তাঁহাকে "না" বলিতে দেখা যায় নাই।

১৭৭৫। হাদীছ ঃ—(৮৯২ পৃঃ) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি দীর্ঘ দশ বৎসরকাল নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমত করিয়াছি। কখনও তিনি আমাকে তিরস্কার করেন নাই বা কৈফিয়ত চাহেন নাই—এরূপ কেন করিয়াছ? এরূপ কেন কর নাই?

হযরতের সাধারণ অভ্যাস ঃ

১৭৭৬। হাদীছ ঃ—(৮৯২ পৃঃ) আছওয়াদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বাড়ীর ভিতরে কি কাজে থাকিতেন? তিনি বলিলেন, তিনি গৃহ-কর্ম্মও করিয়া থাকিতেন, কিন্তু নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইলেই নামাযের জন্য চলিয়া যাইতেন।

১৭৭৭। হাদীছ ঃ—(৯০০ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কখনও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে পূর্ণমুখে এই ভাবে হাসিতে দেখি নাই যে, তাহার আলজিভ নজরে পড়ে। তাঁহার হাসি একমাত্র মুচকি হাসিই ছিল।

হযরতের সরল ও অনাড়ম্বর জিন্দেগী ঃ

১৭৭৮। হাদীছ ঃ—(৮০৯ পৃঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরিবারবর্গ একাধারে তিন দিন পেট পুরিয়া খাওয়ার সুযোগ পান নাই; তাঁহার শেষ জীবন পর্য্যন্ত এই অবস্থাই চলিয়াছে।

১৭৭৯। হাদীছ ঃ—(৪৫৭ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন ইহজগত ত্যাগ করিয়াছেন তখন আমার ঘরে অল্প কিছু (মাত্র দুই সের পরিমাণ) জব ব্যতীত খাওয়ার উপযোগী কোন বস্তুই ছিল না। (ঐ অল্প পরিমাণ জবের মধ্যেই অনেক বরকত পাইতেছিলাম ;) উহাকে আমি মাচাঙ্গের উপর রাখিয়া দিয়াছিলাম ; তথা হইতে প্রতিদিন কিছু কিছু পরিমান বাহির করিয়া খাইয়া থাকিতাম—এইরূপে দীর্ঘ দিন কাটিল। একদা আমি উহার সমষ্টি মাপিয়া রাখিলাম, অতঃপর উহা সাধারণভাবে নিঃশেষ হইয়া গেল।

১৭৮০। হাদীছ ঃ—(৮১৪ পৃঃ) আবু হয্‌ম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি সাহল ইবনে সায়াদ (রাঃ) ছাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ময়দা (তথা ময়দার রুটি) খাইয়া থাকিতেন কি? তিনি বলিলেন, হযরত রস্থলুল্লাহ (দঃ) সারা জীব (নিজের ঘরে) ময়দা চোখেও দেখেন নাই।

আবু হযম (রঃ) বলেন, আমি তাঁহাকে আরও জিজ্ঞাসা করিলাম, হযরতের যমানায় আপনারা (আটার উৎকর্ষ সাধনে) চালনী ব্যবহার করিতেন কি ? তিনি বলিলেন, রস্থল (দঃ)ও সারা জীবন (নিজের ঘরে) চালনী চোখে দেখেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, চালনী ব্যতিরেকে জবের আটা কিরূপে খাইতেন ? তিনি বলিলেন, জব পিষিবার পর ফুৎকারে যতদূর সম্ভব ভুসি উড়াইয়া অবশিষ্টের দ্বারা রুটি তৈয়ার করিয়া খাইতাম।

১৭৮১। হাদীছ ঃ—(৮১৫ পৃঃ) একদা ছাহাবী আবু হোরায়রা (রাঃ) একদল লোকের নিকটবর্ত্তী পথে যাইতেছিলেন ; ঐ লোকগণ আস্ত বকরি ভুনা করা খাইতেছিল। তাহারা আবু হোরায়রা (রাঃ)কে তাহাদের সঙ্গে খাওয়ায় শরীক হওয়ার জন্য বলিল। আবু হোরায়রা (রাঃ) ঐ সৌখীন খাদ্যে শরীক হইতে অসম্মতি জানাইয়া বলিলেন, রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম দুনিয়া ত্যাগ করিয়াছেন এমতাবস্থায় যে, তিনি জবের রুটিও পেট পুরিয়া খাওয়ার সুযোগ সব সময় পাইতেন না।

১৭৮২। হাদীছ ঃ—(৮১৫ পৃঃ) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম চেয়ার-টেবিলে খানা খাইতেন না এবং পিরিচ-তশ্‌তরী (ইত্যাদি বিলাসিতার পাত্রও) ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার জন্য রুটিও পাত্‌লা তৈরী করা হইতনা (সাধারণ মোটা রুটিই খাইতেন।)

হাদীছ বর্ণনাকারীকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিল, হযরত (দঃ) টেবিলে খাইতেন না—কিসের উপর খাইতেন ? তিনি বলিলেন, হযরত (দঃ) দস্তরখানের উপর খাইতেন।

১৭৮৩। হাদীছ ঃ—(৮১৫ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রস্থলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মদিনায় আসার পর শেষ জীবন পর্য্যন্ত তাঁহার পরিবারবর্গ একাধারে তিন দিন গমের রুটি খাইবার সুযোগ পান নাই। (অর্থাৎ এক-দুই দিন গমের রুটি খাওয়ার সুযোগ পাইলেও আবার দুই-চার দিন

জবের রুটি বা খুরমা-খেজুরের উপর অতিবাহিত করিতে হইত। একাধারে গমের রুটি খাইয়া যাইবেন এইরূপ স্বচ্ছলতা হযরত (দঃ) নিজের জন্য অবলম্বন করেন নাই।)

১৭৮৪। হাদীছ ঃ—(৯৫৬ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরিবারবর্গ সাধারণতঃ প্রতিদিনের দুই ওয়াক্তের খানার মধ্যে এক ওয়াক্ত খুরমা-খেজুর খাইয়া থাকিতেন। (অর্থাৎ প্রতিদিন দুই ওয়াক্ত রুটি খাওয়ার মত স্বচ্ছলতা হযরত (দঃ) নিজের জন্য অবলম্বন করেন নাই।)

১৭৮৫। হাদীছ ঃ—(৯৫৬ পৃঃ) কাতাদাহ্ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা ছাহাবী আনাছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট ছিলাম। তাঁহার বাবুর্চি তাঁহার নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল, (সে তাঁহার জন্য খাদ্য পরিবেশন করিতেছিল ; সে উচ্চ শ্রেণীর খাদ্য তৈরী করিয়া আনিয়াছিল। উহা দৃষ্টে) আনাছ (রাঃ) উপস্থিত সকলকে বলিলেন, এই খাদ্য তোমরা গ্রহণ কর। আমার অবগতি অনুসারে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সারা জীবন পাত্‌লা চাপাতি রুটি (খাইবার জন্য) চোখে দেখারও সুযোগ গ্রহণ করেন নাই এবং ভুনা করা আস্ত বকরির কবাব (ইত্যাদির ন্যায় সৌখীন খাদ্য) চোখেও দেখেন নাই।

১৭৮৬। হাদীছ ঃ—(৯৫৬ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা (হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পরিবারবর্গ) পূর্ণ দুই-দুই মাস অতিবাহিত করিতাম এমন অবস্থায় যে, একদিনও আমাদের চুলায় আগুন জ্বলে নাই।

আয়েশা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ভাগিনা ওর্‌ওয়াহ্ (রাঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত কিরূপে ? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, পানি এবং খেজুর। অবশ্য কতিপয় পড়শী রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য দুগ্ধ দিয়া থাকিত উহা হইতে তিনি আমাদিকেও পান করাইয়া থাকিতেন।

১৭৮৭। হাদীছ ঃ—(৯৫৭ পৃঃ) عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْ اٰلَ مُحَمَّدٍ قُوْتًا

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এইরূপ দোয়া করিতেন, আয় আল্লাহ্! মোহাম্মদের পরিবারবর্গকে রিজিক্ তথা খোর-পোষ শুধু আবশ্যক পরিমাণ দান কর।

অর্থাৎ সাধারণভাবে জীবন ধারণে যেন পরের মুখাপেক্ষী হইতে না হয় এবং আবশ্যক পরিমাণ হইতে অধিকও যেন না হয়।

১৭৮৮। হাদীছ ঃ— (৯৫৬ পৃঃ) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিছানা ছিল চামড়ার, যাহার ভিতরে খেজুর গাছের (মাথার লাল রঙ্গের) ছাল বা (কুটিয়া নরম করা) বাকল ভরা ছিল।

মোজাদ্দেদে-যমান হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) তাঁহার সীরত-সঙ্কলন 'নশরুত তীব' গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য হাদীছ গ্রন্থাবলী হইতে নবীজী মোস্তফার বিভিন্ন গুণাবলীর একটি প্রবন্ধ সংযোজিত করিয়াছেন। উহার অনুবাদ—

নবীজী (দঃ) সৃষ্টিগতভাবেই অতি মহীয়ান গরীয়ান ছিলেন এবং শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। দেহ তাঁহার উজ্জ্বল গৌর বর্ণের সুন্দর ছিল, চেহারা মোবারক পূর্ণ চন্দ্ররূপ গোলাকার, দীপ্ত ও কমনীয় ছিল; পূর্ণ গোল ছিল না। তাঁহার শির অপেক্ষাকৃত বড় ছিল, কেশরাশি স্বভাবতই বিন্যস্ত আঁচড়ানোরূপী ছিল; অধিক লম্বা শুধু এতটুকু করিতেন যে, কানের নিম্নভাগ সামান্য অতিক্রম করিত। ললাট তাঁহার প্রশস্ত ছিল। তাঁহার ভ্রু সুরু ও মিহি এবং ঘন ছিল, উভয়টি পৃথক ছিল, মধ্যভাগে একটি ধমনী বা শিরা ছিল যাহা রাগের সময় ফুলিয়া উঠিত। নাসিকা তাঁহার একটু উঁচু ছিল যাহার উপর দীপ্ত আভা পরিদৃষ্ট হইত, যদ্দরুন নাসিকা অধিক উঁচু মনে হইত— বস্তুতঃ তত উঁচু ছিল না, মানানসই ছিল। দাঁড়ি তাহার বুক ভরা ছিল এবং খুব ঘন ছিল। চোখের পুতুলী মিসমিসে কাল ছিল, চোখের পাতার লোম দীর্ঘ দীর্ঘ এবং কাল ছিল, সুরমা ব্যবহার ছাড়াই সুরমা দেওয়া দেখাইত। চোখের সাদা অংশে লাল বর্ণের সুরু সুরু রেখা ছিল, চোখ ছিল দীর্ঘাকারে বড়। মুখ মানানসই বড় ছিল। গণ্ডদ্বয় সুসমতল ছিল; ফুলা-ফাঁপা ছিল না। দাঁতসমূহ অতিশয় সাদা সুবিন্যস্ত ছিল; কথা বলার সময় মনে হইত যেন দাঁতের ফাঁক হইতে নূর বা আলো বিচ্ছুরিত হইতেছে। হাসির সময় দাঁতসমূহ সাদা-শুভ্র শিলার ন্যায় দেখাইত। গ্রীবা তাঁহার এত সুন্দর ছিল যেন—হাতে গড়ানো এবং উহার বর্ণ ছিল ঝকঝকা উজ্জল। কাঁধ ও বক্ষ ছিল চৌড়া—প্রশস্ত। কাঁধে, বাহুতে ও বক্ষের উর্দ্ধ অংশে লোম ছিল এবং বক্ষ হইতে নাভি পর্য্যন্ত লোমের সরু ধারা ছিল; ইহা ব্যতিত অবশিষ্ট দেহ লোমহীন ছিল। পেট এবং বক্ষ সমতল ছিল, অবশ্য বক্ষ কিঞ্চিৎ স্ফীত ছিল। হাত লম্বা সাইজের ছিল, পাঞ্জা প্রশস্ত এবং পুরু ছিল। আঙ্গুলসমূহ দীর্ঘ ছিল। ধমনী বা শিরাসমূহ স্ফিতীহীন—দেহের মিলে ছিল। বাহু এবং হস্তদ্বয় মোটা—গোশ্তপূর্ণ ছিল। পায়ের গোছাও ঐরূপ ছিল, পায়ের পাতা পুরু সমতল মসৃণ ছিল; উহা হইতে পানি গড়াইয়া পড়িয়া যাইত। পায়ের তলার মধ্যস্থ খোঁচ অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল। পায়ের গোড়ালী শীর্ণ ও চাপা ছিল। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়াগুলি মজবুত শক্তিশালী ছিল—জোড়ার হাড়ের অগ্রভাগ মোটা মোটা ছিল। সম্পূর্ণ দেহই পরিপূর্ণ জমাট বাঁধারূপ ছিল। সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই অত্যন্ত মানানসই ছিল।

নবীজীর চালচলন ঃ

নবী (দঃ) হাটিবার সময় পা হেঁচড়াইয়া চলিতেন না—পা উঠাইয়া উঠাইয়া চলিতেন এবং সম্মুখ দিকে ঝুকিয়া অবনত দৃষ্টিতে চলিতেন; যেন উঁচু হইতে নিচু দিকে

চলিতেছেন। তিনি নম্র ও বিনয়ীর ন্যায় চলিতেন, দীর্ঘ পদক্ষেপে চলিতেন। তাঁহার পথ এত দ্রুত অতিক্রান্ত হইত যেন তাঁহার জন্য পথ ছোট হইয়া গিয়াছে। তাঁহার স্বাভাবিক গতির চলাচলেও তাঁহার সঙ্গে চলিতে আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িতাম। তাঁহার উঠা-বসা আল্লার জেক্‌রের উপর হইত। নবীজী কাহারও প্রতি তাকাইলে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইতেন। অবনত দৃষ্টি ছিল তাঁহার স্বভাব—তাঁহার দৃষ্টির গতি উর্দ্ধপানের অপেক্ষা নিম্নপানেরই বেশী ছিল। তাঁহার সাধারণ দৃষ্টিপাত বিনত চোখে হইত। সাধারণতঃ নবীজী পথ চলিতে ছাহাবীগণকে আগে চালাইতে চেষ্টা করিতেন। যাহারই সঙ্গে সাক্ষাত হইত নবীজী প্রথমে সালাম করায় সচেষ্ট হইতেন।

নবীজীর চারিত্রিক গুণাবলী ঃ

নবী (দঃ) সদা ভাবগম্ভীর ও চিন্তামগ্ন থাকায় অভ্যস্ত ছিলেন; তিনি আনন্দ-উল্লাস করিতেন না। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলিতেন না; যেই কথায় ছওয়াব হওয়ার আশা ঐরূপ কথাই বলিতেন। দীর্ঘ দীর্ঘ সময় নীরব থাকিতেন। কথা বলিলে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় কথা বলিতেন এবং অত্যন্ত মিষ্টভাষী ছিলেন। অল্প কথায় অনেক উদ্দেশ্য-বোধক উক্তি করিয়া থাকিতেন। তাঁহার কথা ধীরে ধীরে হইত; প্রয়োজন অপেক্ষা কথা অতিরিক্তও বলিতেন না, অসম্পুর্ণ এবং কমও বলিতেন না। তাঁহার বচনাবলী মুক্তার মালার ন্যায় হইত। কোমলভাষী ছিলেন; কঠোর প্রকৃতির ছিলেন না, কাহারও প্রতি ঘৃণা করিতেন না। আল্লার নেয়ামত অতি ছোট হইলেও উহাকে সম্মান করিতেন; আল্লার কোন নেয়ামতের কুৎসা করিতেন না। কোন খাদ্য বস্তুর (উহার প্রতি লালসা-বোধক) অতি প্রশংসাও করিতেন না, আবার উহার কুৎসাও করিতেন না। সত্যের বিরোধীতা দেখিলে সত্যকে সাহায্য করিয়া প্রতিষ্ঠিত না করা পর্য্যন্ত তাঁহার অপ্রতিহত ক্রোধ প্রসমিত হইত না। নিজস্ব ব্যাপারে তাঁহার ক্রোধও আসিত না এবং প্রতিশোধও লইতেন না। কাহারও প্রতি রাগান্বিত হইলে তাহার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া নিতেন; সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে দৃষ্টি অবনত করিতেন। তাঁহার হাসি মুচকি হাসি হইত এবং দাঁতসমূহ শিলার ন্যায় ঝকঝকে দেখাইত।

নবী (দঃ) গৃহে অবস্থানকালীন সময়কে তিন ভাগ করিতেন—এক ভাগ আল্লাহ তায়ালার (এবাদৎ-বন্দেগীর) জন্য, আর এক ভাগ পরিবার-পরিজনের (অভাব-অভিযোগ, কথাবার্ত্তা ও প্রয়োজন মিটাইবার) জন্য; আর এক ভাগ নিজের (ব্যক্তিগত প্রয়োজন মিটাইবার) জন্য। নিজের জন্য সময়ের বেশী অংশ জনগণের (শিক্ষা ইত্যাদির) কাজে ব্যয় করিতেন; কিছু সংখ্যকের মাধ্যমে সকলকে উপকৃত করার ব্যবস্থা করিতেন; জনগণ হইতে কোন কিছু লুকাইয়া রাখিতেন না।

জনসাধারণের জন্য নিজের সময় ব্যয় করিতে ধর্ম্মীয় জ্ঞানে যোগ্য ব্যক্তিগণকে অগ্রগণ্য করিতেন এবং প্রত্যেককে তাহার প্রয়োজনের ভিত্তিতে সময় দিতেন—কাহারও একটি প্রয়োজন, কাহারও দুইটি, কাহারও আরও অধিক; সেই অনুপাতেই তাহাদের সহিত ব্যাপৃত হইতেন। তাহাদের হাল-অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহাদেরে প্রায়াজনীয় বিষয়াবলী জ্ঞাত করিতেন, শিক্ষা দিতেন। আর লোকদিগকে অতিশয় তাকিদের সহিত বলিয়া দিতেন—উপস্থিতগণ অনুপস্থিতদিগকে পৌঁছাইয়া দিবে। আরও বলিতেন, কোন ব্যক্তি তাহার প্রয়োজনের সংবাদ আমার নিকট পৌঁছাইতে সক্ষম না হইলে তোমরা তাহার প্রয়োজনের সংবাদ আমার নিকট পৌঁছাইয়া দিও; যে ব্যক্তি শাসনকর্ত্তার নিকট অক্ষম লোকের প্রয়োজনের সংবাদ পৌঁছাইয়া দিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে পদস্থিতি দান করিবেন কেয়ামত দিবসে পুল-ছেরাৎ চলার সময়। নবীজীর দরবারে একজনের মুখে অপর জনের ঐ শ্রেণীর বিষয়ই আলোচনা করা যাইত; কাহারও মুখে অপরের অন্য কোন আলোচনা হইত না।

লোকজন নবীজীর দরবারে উপস্থিত হইত দ্বীনের অভাবী ও অন্বেষক রূপে; নবীজীর দরবারে তাহারা তৃপ্ত হইয়া বাহির হইত দ্বীনের অভিজ্ঞ ও দিশারীরূপে। মানুষের উপকারী কথা ছাড়া নবীজী স্বীয় জবানকে বন্ধ রাখিতেন। মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করিতেন, অনৈক্যের প্রতিরোধ করিতেন। গোত্রীয় প্রধানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন এবং তাহার প্রাধান্য বজায় রাখিতেন। লোকদেরকে সদা সতর্ক রাখিতেন, নিজেও লোকদের হইতে সতর্ক থাকিতেন, অবশ্য সকলের সঙ্গে হাসি-মুখ ও সদ্ব্যবহার বজায় রাখিতেন। সহচরগণের খোঁজ-খবর লওয়ায় তৎপর থাকিতেন। লোকদের হাল-অবস্থা অবগতির জন্য সচেতন থাকিতেন। ভালকে ভাল বলিয়া স্বীকৃতি দিতেন এবং উহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেন, মন্দকে মন্দ বলিয়া প্রকাশ করিতেন এবং উহার উচ্ছেদ-চেষ্টা করিতেন। সর্ব্ববিষয়ে তিনি মধ্যপন্থী ছিলেন; তাঁহার কার্য্যে বা কথায় অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হইত না। ভাল লোক তাঁহার অধিক নৈকট্য লাভ করিত; যে বেশী পরোপকারী হইত সে-ই তাঁহার নিকট বেশী ভাল গণ্য হইত। অন্যের সাহায্য ও বিপদ উদ্ধারে যে যত উত্তম হইত সে নবীজীর নিকট তত মর্য্যাদাবান পরিগণিত হইত।

মজলিসের মধ্যে তিনি প্রত্যেকের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন; এমনকি মজলিসের প্রত্যেক ব্যক্তি এই ভাবিত যে, তাহার অপেক্ষা অধিক আদরনীয় নবীজীর নিকট অন্য কেহ নহে। কেহ নবীজীকে কোন কাজের জন্য বসাইলে বা দাঁড় করাইলে তিনি কষ্ট সহ্য করিয়াও তাহার সাথে অপেক্ষা করিতেন, এমনকি ঐ ব্যক্তিকেই তাঁহার হইতে বিদায় নিতে হইত। কেহ তাঁহার নিকট কোন কিছুর সাহায্য চাহিলে হয় তাহার আশা পূর্ণ করিতেন, না হয় অতি মোলায়েম কথায় তাহাকে বিদায় দিতেন।

নবীজীর উদারতা ও সদ্ব্যবহার সকলের জন্য প্রসারিত ছিল ; এমনকি সকলে তাঁহাকে স্নেহশীল পিতা গণ্য করিত। সকলেই সমানভাবে তাঁহার হইতে উপকৃত হইত, তাক্‌ওয়া-পরহেজগারী অনুপাতে তাহাদের তারতম্য হইত।

তাঁহার মজলিসে জ্ঞান, বিদ্যা, সংযমশীলতা, ধৈর্য্য ও আমানতদারীর অনুশীলন হইত। সেই মজলিসে কথাবার্ত্তা উচ্চৈস্বরে হইত না, কাহারও মান-সম্মানে আঘাত করা হইত না, কাহারও দোষ চর্চ্চা করা হইত না। তাকক্‌ওয়া-পরহেজগারীর দরুন সকলেই পরস্পর নম্র ও বিনয়ী হইত ; বড়কে সম্মান করা হইত, ছোটকে স্নেহ করা হইত, অভাবীকে সাহায্য করা হইত, বিদেশীর প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা হইত।

নবীজী (দঃ) তিনটি স্বভাব হইতে মুক্ত ছিলেন—লোক দেখানো স্বভাব, অপব্যয় এবং নিষ্প্রয়োজন কাজে লিপ্ততা। আর তিনটি বস্তু হইতে মানুষকে রেহায়ী দিয়া রাখিয়াছিলেন—কাহারও গ্লানি করিতেন না, কাহারও প্রতি কটাক্ষ করিতেন না এবং কাহারও দোষ তালাশ করিয়া বেড়াইতেন না।

নবীজী (দঃ) খাওয়ায় ও শোয়ায় সল্পতার অভ্যস্ত ছিলেন। নবীজী নিদ্রা কালে শয্যায় ডান পার্শ্বের উপর শুইতেন। নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্ব হইতেই নবীজী (দঃ) প্রভাবময় মাহাত্মের অধিকারী ছিলেন ; ওক্‌বা ইবনে আম্‌র (রাঃ) নবীজীর দরবারে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতেই কাঁপিতে লাগিলেন। নবী (দঃ) বলিলেন, শান্ত থাক ; আমি কোন পরাক্রমশালী বাদশা নহি। মদিনার দশ বৎসরের জীবনে নবীজী (দঃ) কত কত বিজয় লাভ করিয়াছিলেন, কত এলাকা জয় করিয়া ছিলেন, রাজা-বাদশাদের পর্য্যন্ত কত কত উপহার-উপঢৌকন লাভ করিয়া ছিলেন। কিন্তু সবই জনসাধারণের জন্য ব্যয় করিয়া দিয়াছিলেন, এমনকি ইহজীবন ত্যাগকালে পরিবারের আহার জোটাইতে তাঁহার লৌহবর্ম্ম বন্ধক রাখা ছিল। খাওয়ায়, পরায় ও বাসস্থানে নবীজী (দঃ) অত্যধিক সরল এবং আড়ম্বর বিহীন ছিলেন।

তাঁহার প্রতি অন্যায় করা হইলে সেই অন্যায়ের প্রতিশোধ না লইয়া ক্ষমা করিতেন। অন্তরের প্রশস্ততায় অপরিসীম ছিলেন। সাহস ও বীরত্বে অতুলনীয় ছিলেন ; শত্রুর মোকাবিলায় তাঁহার সঙ্গে একমাত্র বীরপুরুষই থাকিতে সক্ষম হইত। সীমাহীন দাতা ছিলেন। স্বভাব অত্যন্ত কোমল ও মধুর ছিল। অতি সরস ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন ; সময়ে নিজ হাতে ঘর ঝাড়ু দিতেন। নিজের এবং গৃহের কাজ নিজেই করিতেন, অতি গরীব রোগীকেও দেখিতে যাইতেন, গরীবদের সহিতও উঠা-বসা করিতেন, নিজ খাদেম পরিচারকের সহিতও একত্রে বসিয়া খাইতেন, নিজ হাতে কাপড় তালি লাগাইতেন, বাজার হইতে নিজের বোঝা নিজেই বহন করিয়া আনিতেন। তিনি মানবকুলের জন্য সর্ব্বাধিক উপকারীজন ছিলেন এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক ছিলেন। "ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম"

নবুয়তের প্রমাণ তথা হযরতের মোজেযার বয়ান (৫০৪ পৃঃ)

নবী এবং রসুলগণ হইতেন আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার বন্দাগণকে তাঁহার পছন্দিত পথে পরিচালিত করার জন্য বন্দাগণের নিকট স্বীয় প্রতিনিধি স্বরূপ নবী ও রসুলগণকে প্রেরণ করিতেন। সুতরাং নবী ও রসুলগণের নিকট তাঁহাদের মনোনয়ন ও পদাধিকারের প্রমাণ থাকা আবশ্যক, যাহাকে তাঁহারা আল্লার বন্দাদের নিকট তাঁহাদের পরিচয়পত্ররূপে পেশ করিবেন এবং কেহ চ্যালেঞ্জ করিলে উক্ত প্রমাণ দ্বারাই সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিবেন। এই জন্যই ইমাম বোখারী (রঃ) মো'জেযা সমূহের বর্ণনার পরিচ্ছেদটিকে "নবুয়তের প্রমাণ সমূহের পরিচ্ছেদ" নামে ব্যক্ত করিয়াছেন—মো'জেযাকে নবুয়তের প্রমাণ নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন, এই আখ্যাটি বড়ই সামঞ্জস্যপুর্ণ ও তাৎপর্য্যপুর্ণ।

নবীগণের সেই প্রমাণ বা পরিচয় পত্রই হইল তাঁহাদের মো'জেযা। মো'জেযার অর্থ অসম্ভব কার্য্য নহে, বরং উহার অর্থ মানুষের অসাধ্য কার্য্য। নবীগণের মো'জেযা মানুষের শক্তি ও সাধ্য বহির্ভূত হয় বটে এবং সেই সুত্রেই উহা নবীর নবুয়তের প্রমাণ হইয়া থাকে, কিন্তু উহা কখনও আল্লাহ তায়ালার শক্তি-ক্ষমতা বহির্ভূত হয় না; আল্লাহ ত সর্ব্বশক্তিমান, অতএব উহাকে কোন মতেই অসম্ভব বলা যাইতে পারে না। বরং উহাকে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার প্রতিনিধির পক্ষে স্বীয় অসীম কুদরতের নিদর্শন স্বরূপই প্রকাশ করিয়া থাকিতেন। সুতরাং নবীদের মো'জেযাকে অসম্ভব সাব্যস্ত করতঃ উহাকে অস্বীকার করা বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালার সর্ব্বশক্তিমত্তাকে অস্বীকার করা। এতদ্ভিন্ন যে কোন দাবীর প্রমানকে অস্বীকার করা প্রকৃত প্রস্তাবে সেই দাবীর সমর্থনে শিথীলতা প্রকাশেরই নামান্তর, অতএব মো'জেযাকে অস্বীকার করার অর্থ নবীর নবুয়তের প্রতি ঈমানের দূর্বলতা প্রকাশ করা।

প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ তায়ালা এই পরিমাণ মো'জেযা প্রদান করিয়াছিলেন যাহা মানব জগতে তাঁহার নবুয়ত ও প্রতিনিধিত্ব প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হয়। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে এই বিষয়টি স্পষ্ট রূপে উল্লেখ হইয়াছে।

১৭৮৯। হাদীছ ঃ— عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ اِلَّا قَدْ

اُعْطِىَ مِنَ الْاٰيَاتِ مَا مِثْلُهٗ اٰمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَاِنَّمَا كَانَ الَّذِىْ اُوْتِيْتُ

وَحْيًا اَوْحَى اللّٰهُ اِلَىَّ فَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ -

অর্থ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, নবীগণের প্রত্যেককেই আল্লাহ তায়ালা এই পরিমাণ মো'জেযা দিয়াছিলেন যাহা মানব সমাজের জন্য সেই নবীর প্রতি ঈমান আনায় যথেষ্ট ছিল।

আমাকে (সর্ব প্রধান মো'জেযা রূপে) যাহা প্রদান করা হইয়াছে তাহা ওহী পর্য্যায়ের; (তথা কোরআন পাক—যাহাকে) আল্লাহ তায়ালা ওহী মারফৎ আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। (এবং উহা আমার দ্বীনের শাসনতন্ত্র বা আসমানী কেতাব রূপে আমার পরেও দীর্ঘস্থায়ী হইবে।) ফলে কেয়ামতের দিন দেখা যাইবে যে, আমার অনুসারীদের জামাতই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

ব্যাখ্যা—নবুয়ত প্রাপ্তির পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের হস্তে স্বভাবতঃ বা কাফেরদিগকে চ্যালেঞ্জ করিয়া বা কাফেরদের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় বহু মোজেযা বা অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা তাঁহার সত্যতার অকাট্য প্রমাণ ছিল। নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্বেও বরং ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্বেও তাঁহার সম্পর্কে অনেক অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পাইয়াছিল। এইসব ঘটনার সমষ্টি প্রায় তিন হাজার।

কাফেরদিগকে চ্যালেঞ্জ করিয়া যেসব মোজেযা প্রকাশ পাইয়াছিল উহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মোজেযা পবিত্র কোরআন। পবিত্র কোরআনের চ্যালেঞ্জ শুধু হযরতের যমানার কাফেরদের প্রতিই ছিল না, বরং কেয়ামত পর্য্যন্ত সমস্ত অমোসলেমদের প্রতিই এই চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রহিয়াছে। পবিত্র কোরআন একাধিক জায়গায় স্বয়ং সেই চ্যালেঞ্জের ঘোষণা করিয়াছে যে, এই কোরআন স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা কর্ত্তৃক মোহাম্মদের (দঃ) উপর অবতারিত হওয়া সম্পর্কে যদি কোন ব্যক্তি বা দল সন্দেহ পোষণ করে এবং তাহারা মনে করে যে, ইহা মোহাম্মদের বা অন্য কোন মানুষের রচিত তবে তাহারা এই কোরআনের বাক্য-বিন্যাসের সমতুল্য উহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ একটি ছুরা পরিমাণ বাক্য তৈয়ার করিয়া বিশ্ববাসীর সম্মুখে উপস্থিত করুক; তবেই তাহাদের সন্দেহ ও ধারণাকে বাস্তব বলা যাইতে পারিবে; অন্যথায় ঐরূপ সন্দেহ ও ধারণা অসার সাব্যস্ত হইবে। কারণ, কোন মানুষ কর্ত্তৃক রচিত এত বড় কলেবরের পুস্তকের শুধু মাত্র একটি লাইন পরিমাণ বাক্য উহার সমতুল্য রচনা করা অন্য মানুষের সাধ্যে না হওয়া অস্বাভাবিক।

এই বিজ্ঞান-যুগের যে কোন আবিষ্কার সম্পর্কে কোন মানুষ এইরূপ দাবি টিকাইয়া রাখিতে পারে না যে, চিরকাল পর্য্যন্ত অন্য কোন মানুষ ইহার সমতুল্য আবিস্কার করিতে পারিবে না। আজ পর্য্যন্ত বিশ্বে মানবাবিস্কারের এমন কোন আবিস্কৃত বস্তু দেখা যায় নাই যাহা সর্ব্বসাধারণ্যে প্রকাশিত ও প্রচারিত হওয়ার পরও উহার প্রতিদ্বন্দ্বী আবিস্কারে সারা বিশ্ব অপারগ রহিয়াছে এবং দীর্ঘকাল অপারগ থাকিবে। অথচ এই কোরআন প্রথমতঃ চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়াছে—

إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ -

"আমি আমার বিশেষ বন্দা (মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লার) উপর যে কেতাব নাযেল করিয়াছি (যাহা দ্বারা তিনি আমার রসুল ও প্রতিনিধি বলিয়া অকাট্য রূপে প্রমাণিত হইয়াছেন) উহা (আমার পক্ষ হইতে অবতারিত হওয়া) সম্পর্কে যদি তোমরা কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ কর তবে তোমরা উহার সমতুল্য একটি ছোট ছুরা পরিমাণ বাক্য রচনা করিয়া আন।" অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

"যদি তোমরা তাহা করিতে না পার এবং কস্মিন কালেও পারিবে না, তবে তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে (ঐ সত্য প্রমাণিত রসুলকে স্বীকার করিয়া) দোযখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করা। যাহার অগ্নি মানুষ ও পাথর দ্বারা প্রজ্জলিত হইবে।"

একাধিক বার এইরূপ চ্যালেঞ্জ প্রদাণের পর কোরআন ভবিষ্যদ্বানীও করিয়াছে—

لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْآنِ

لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا -

"বিশ্বের সমস্ত মানব-দানব সকলে একত্রিত রূপে পরস্পর সহায়ক হইয়াও যদি এই প্রচেষ্টা চালায় যে, কোরআনের সমতুল্য বাক্য রচনা করিয়া আনিবে তবুও তাহারা কস্মিনকালেও সেই প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভে সক্ষম হইবে না।" (১৫পাঃ ১০রুঃ)

পবিত্র কোরআন নাযেল হওয়ার যুগে কোরআনের ঘোর শত্রু আরবের পৌত্তলিকগণ এবং ইহুদী ও নাছারাগণ আরবী ভাষায় ও আরবী কাব্যে যে অতিশয় দক্ষ ও পারদর্শী ছিল তাহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এতদসত্ত্বেও সেই শত্রুগণ রসুলুল্লার বিরুদ্ধে, কোরআনের বিরুদ্ধে হাজার হাজার প্রাণ বিসর্জন দিয়া যুদ্ধ ও লড়াই করিয়াছে, কোরআনকে বানচাল করার জন্য শত শত তদবীর ও ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু এই সহজ পন্থায় তাহারা আসে নাই যে, মাত্র এক লাইন পরিমাণ একটি ছোট ছুরার সমতুল্য বাক্য রচনা করিয়া নিয়া আসে। বস্তুতঃ ইহা যে তাহাদের জন্যে মোটেই সম্ভব নহে তাহা তাহারা ভালরূপেই উপলব্ধি করিতেছিল।

আজও মধ্যপ্রাচ্যে আরবী ভাষাভাষী খৃষ্টান-ইহুদী অমোসলেম কোরআনের শত্রু বিদ্যমান রহিয়াছে ইউরোপ আমেরিকার মধ্যে অনেক অনেক আরবী ভাষার সুপণ্ডিত হইয়াছে এবং আছে, না থাকিলে হওয়ার জন্য আরবী ভাষার দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। মোসলমানদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার বিবাদ ছাড়িয়া দিয়া মোসলমানদের কোরআনকে

বানচাল করতঃ তাহাদের জাতীয় বুনিয়াদ ধ্বংস করিতে এই পথ তাহারা অবলম্বন করিতে পারে, কিন্তু মহান কোরআনের এত বড় প্রভাব যে, উহার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় দাঁড়াইবার সাহস কাহারও হয় নাই, কেয়ামত পর্য্যন্ত হইবেও না।

আজও আরবের অমোসলেম সাহিত্যিকগণ স্বীকার করিয়া থাকে—"কোরআনকে মানব-রচিত গ্রন্থ বলা স্বীয় সাহিত্যিকতা ও পাণ্ডিত্যের উপর কালীমা লেপন স্বরূপ।"

পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণকে যত মো'জেযাই প্রদান করা হইয়াছিল, প্রত্যেক নবীর দুনিয়া ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মোজেযাও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোন নবীর মো'জেযা বর্ত্তমান বিশ্বে বিদ্যমান আছে বলিয়া কেহ কোন নিদর্শন দেখাইতে পারিবে না। একমাত্র মোসলমানদের কোরআন এবং তাহাদের নবী মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ণনা ব্যতীত পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণ সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বর্ত্তমান বিশ্বে মোটেই নাই।

কিন্তু মোসলেম জাতির পয়গাম্বর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নবুয়ত তদ্রূপ নহে। তাঁহার প্রধানতম মো'জেযা পবিত্র কোরআন অবিকলরূপে উহার বিঘোষিত চ্যালেঞ্জ সহ আজও বিশ্ববুকে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং দুনিয়ার আয়ুকাল পর্য্যন্ত থাকিবে। যখন যাহার ইচ্ছা উহার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিয়া দেখিতে পারে যে, বাস্তবিকই ইহা মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নবুয়তের সঠিক প্রমাণই বটে।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) যেহেতু সর্ব্বশেষ নবী এবং তাঁহার দ্বীনই সর্ব্বশেষ দ্বীন, তাই তাঁহার জন্য এইরূপ দীর্ঘায়ু-বিশিষ্ট মোজেযার আবশ্যকও ছিল। তাঁহার এই মো'জেযার প্রভাবে যুগে যুগে বহু লোক তাঁহার দ্বীনে দিক্ষীত হইয়া আসিতেছে। এই বিষয়টির প্রতিই উল্লেখিত হাদীছে ইঙ্গিত রহিয়াছে।

পবিত্র কোরআন রসুলুল্লাহ ছাল্লল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মো'জেযা ছিল বিরুদ্ধ-বাদীগণকে চ্যালেঞ্জ করিয়া। এতদ্ভিন্ন কোন কোন মো'জেযা বিরুদ্ধবাদীগণের চ্যালেঞ্জের উত্তরেও প্রকাশ পাইয়াছিল, যেমন "শাক্কুল-কামার" চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মো'জেযা।

হযরত (দঃ) কর্ত্তৃক চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মো'জেযা (৫১৩—৫৪৬ পৃঃ)

অন্ধকার যুগেও কাফেরগণ মনগড়া রূপে হজ্জব্রত পালন করিয়া থাকিত। হজ্জের কার্য্যাবলী পালনান্তে জিলহজ্জ চাঁদের ১১, ১২, ১৩ তারিখ মিনায় অবস্থান করিয়া আল্লার জেকেরে মশগুল থাকার নিয়ম রহিয়াছে। সেকালেও এই দিনগুলি মিনায় কাটিবার নিয়ম ছিল; অবশ্য কাফেরগণ তথায় নিজেদের বাহাদুরী এবং নিজ নিজ পূর্বপুরুষদের প্রাধান্যের কবিতার ছড়াছড়ি করিয়া কাটাইত; এই সুত্রে উক্ত তারিখে মিনার মধ্যে একত্রে অনেক লোক পাওয়া যাওয়ার একটা সুযোগ লাভ হইত।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সুবর্ণ সুযোগটির সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই হয়ত তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। আবুজহল সহ কতিপয় কাফের সর্দ্দার তখন হযরত (দঃ)কে আল্লার রসুল হওয়ার দাবীর প্রমাণ স্বরূপ কোন অলৌকিক ঘটনা কিম্বা নির্দিষ্ট রূপে চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দেখাইবার চ্যালেঞ্জ করিল।

হযরত (দঃ) সর্ব্বদা মক্কার সর্দ্দারগণকে কোন উপায়ে ইসলামের ছায়াতলে টানিয়া আনার সুযোগের সন্ধানে থাকিতেন, সুতরাং তিনি তাহাদের এই চ্যালেঞ্জ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া করিলেন। অতঃপর স্বীয় শাহাদতের অঙ্গুলি দ্বারা * চাঁদের প্রতি খণ্ডিত করার ন্যায় ইশারা করিলেন, ফলে তৎক্ষণাৎ পূর্ণ চাঁদ দুই খণ্ড হইয়া গেল, এমনকি এক খণ্ড হইতে অপর খণ্ড অনেক দূর ব্যবধানে চলিয়া গেল। হযরত (দঃ) কাফেরদিগকে বলিলেন, "اشهدوا اشهدوا —তোমরা ভালরূপে প্রত্যক্ষ কর, ভালরূপে দেখিয়া নাও।"

তালাবদ্ধ অন্তরবিশিষ্ট কাফেরগোষ্ঠি সবকিছু দেখা ও উপলব্ধি করা সত্ত্বেও উহাকে যাদু বলিয়া উড়াইয়া দিল। এমনকি তাহাদের কেহ কেহ এইরূপ উক্তি করিল যে, মোহাম্মদ (দঃ) আমাদের দৃষ্টির উপর যাদু করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকিবে। অতএব দূর-দেশ হইতে আগন্তুক মুছাফিরদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা হউক যে, তাহারা এস্থান হইতে দূরে থাকাবস্থায় চাঁদ দ্বিখণ্ড হওয়া দেখিয়াছে কি না? খোঁজ করিয়া তাহারা এইরূপ লোকও পাইল যাহারা দূর দেশে থাকাবস্থায় এই তারিখে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া ↑ দেখিয়াছে। এতদসত্ত্বেও তাহারা উহাকে সর্ব্বগ্রাসী যাদু বলিয়া আখ্যায়িত করিল এবং ঈমান আনিল না।

সীরতশাস্ত্র তথা নবুয়তের ইতিহাস বর্ণনা শাস্ত্রে ত চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মো'জেযা সম্পর্কে ভূরি ভূরি প্রমাণ বর্ণিত রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন কোরআন-হাদীছের অকাট্য প্রমাণ দ্বারাও ইহা প্রমাণিত রহিয়াছে। পবিত্র কোরআনের ঘোষণা—

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ - وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ

অর্থ—(বিশ্ববাসী! সতর্ক হও;) কেয়ামত ঘনাইয়া আসিয়াছে; (যাহার সংবাদদাতার সত্যতা প্রমাণে) চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে**। (কিন্তু কাফেরদের অবস্থা এই যে,) তাহারা (রসুলুল্লার সত্যতার) কোন প্রমাণ দেখিলে উহাকে উপেক্ষা করে এবং বলে, ইহা বড় শক্তিশালী যাদু। (ছুরা কমর—২৭ পাঃ)

---

* তফছির রুহুল মায়ানী—ছুরা কমর।

↑ সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মোহাদ্দেছ "ইমাম বায়হক্বী" তাঁহার "দালায়েলুন-নবুয়াহ—নবীর সত্যতার প্রমাণ" নামক কেতাবে ঘটনা প্রত্যক্ষকারী ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসঊদ (রাঃ) হইতে এই সম্পর্কে একটি সুদীর্ঘ বিবৃতি বর্ণনা করিয়াছেন—যাহার উল্লেখ সম্মুখে আসিতেছে।

(** অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

এই সম্পর্কে হাদীছও অনেক আছে, ইমাম বোখারী (রঃ) দুই স্থানে দুইটি পরিচ্ছেদ এই বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। ৫১৩ পৃষ্ঠায় "মোশরেকগণ (সত্যতার) প্রমাণ দেখিতে চাহিলে নবী (দঃ) তাহাদিগকে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মো'জেযা দেখাইয়াছিলেন।" ৫৪৬ পৃষ্ঠায় "চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার বয়ান।" এই পরিচ্ছেদদ্বয়ে নিয়ে বর্ণিত হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

১৭৯০। হাদীছঃ— عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه

اِنَّ اَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُرِيَهُمْ

اٰيَةً فَاَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ حَتّٰى رَاَوْا حِرَاءَ بَيْنَهُمَا -

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, মক্কাবাসী কাফেররা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ফরমায়েশ করিল, তিনি যেন তাহাদিগকে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করিয়া দেখান। তিনি তাহা দেখাইলেন, এমনকি চাঁদের খণ্ডদ্বয় পরস্পর এরূপ ব্যবধানে চলিয়া গেল যে, উহাদের মধ্যস্থলে দর্শকগণ হেরা পর্ব্বত দেখিতে পাইল।

১৭৯১। হাদীছঃ— عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى

قَالَ اِنْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى فَقَالَ

اِشْهَدُوْا وَذَهَبَتْ فِرْقَةٌ نَحْوَ الْجَبَلِ -

অর্থ—ইবনে মসউ'দ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা মিনায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম,* (হযরতের আঙ্গুলের ইশারায়) চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। হযরত (দঃ) উপস্থিত সকলকে বলিলেন, (আমার রসুল হওয়ার প্রমাণ) প্রত্যক্ষ কর। একটি খণ্ড অপরটি হইতে দূরে হেরা পর্ব্বতের দিকে চলিয়া গিয়াছিল।

** "اِنْشَقَّ" শব্দটি মাজি তথা অতীতকাল বোধক ক্রিয়াপদ যাহার অর্থ খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে ভবিষ্যৎকালের অর্থ টানিয়া আনা যে, (কেয়ামত বা মহাপ্রলয়কালে) খণ্ডিত হইবে—ইহা উক্ত শব্দের মূল অর্থের বিপরীত। এইরূপ ব্যবহার রূপক বা উপঅর্থে স্থলবিশেষে অনুমোদিত, কিন্তু এস্থলে উহার প্রয়োজন না থাকায় অশুদ্ধ হইবে। এতদ্ভিন্ন এস্থলে ভবিষ্যৎ কালের অর্থ লওয়া হইলে সংলগ্ন পরবর্ত্তী আয়াতের সঙ্গতি বিনষ্ট হইবে। পরবর্ত্তী আয়াতের মর্ম্মে বুঝা যায়, কাফেরগণ হযরতের সত্যতার এই প্রমাণকে দেখিয়াছে এবং ইহাকে শক্তিশালী যাদু বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছে। ছাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ)ও উক্ত আয়াতকে আলোচ্য মোজেযা সম্পর্কেই সাব্যস্ত করিয়াছেন। ১৭৯২ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য। (* অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

১৭৯২। হাদীছ ঃ— عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنه

إِنَّ الْقَمَرَ انْشَقَّ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

আবহুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, নিশ্চয় ইহা একটি সত্য ঘটনা যে, হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় (তাঁহারই সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ) চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—"শকে-কামার" বা চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মোজেযা সম্পর্কে ইমাম বোখারী (র:) তিন জন সুপ্রসিদ্ধ ছাহাবীর বর্ণিত হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে আবহুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা:) ছাহাবীর বর্ণনায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, তিনি ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আনাছ (রা:) ও ইবনে আব্বাস (রা:) ছাহাবীদ্বয়ের বর্ণনায় প্রমাণিত হয়, ঐ ঘটনা সেকালের স্থানীয় লোকদের মধ্যে এতই প্রসিদ্ধ ছিল যে, উপস্থিত অনুপস্থিত সকলের নিকটই উহা বাস্তবরূপে স্বীকৃত ছিল। আনাছ (রা:) তথায় উপস্থিত ছিলেন না, আবহুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) ঘটনার সময় পয়দাও হন নাই, কিন্তু তাঁহারা জনসাধারণের স্বীকৃতি সূত্রেই ঘটনাকে বর্ণনা করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন হোযায়ফা (রা:), জোবায়ের ইবনে মোত্‌য়ে'ম (রা:), ইবনে ওমর (রা:) প্রমুখ ছাহাবীগণ হইতেও এই ঘটনা-বর্ণিত হাদীছ বিদ্যমান রহিয়াছে।

---

* হযরত (দ:) মিনায় থাকিয়াই চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মো'জেযা দেখাইয়া ছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় মক্কার নাম উল্লেখ আছে, উহা বাস্তবের বিপরীত নহে; কারণ মক্কাই হইল কেন্দ্রীয় নগরী; মিনা উহারই সংলগ্ন—উহার শহরতলী স্বরূপ। তদুপরি মক্কার নাম উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, হযরত (দ:) মক্কায় থাকাকালীন তথা মদিনায় হিজরত করিয়া আসিবার পূর্ব্বে এই মো'জেযা সংঘটিত হইয়াছিল।

চাঁদের খণ্ডদ্বয়ের মধ্যস্থলে হেরা পর্ব্বত দেখা যাওয়ার উল্লেখ মিনা এলাকায় ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সহিত বিশেষ সঙ্গতিপূর্ণ, কারণ হেরা পর্ব্বত মিনা এলাকায়ই অবস্থিত। কোন কোন বর্ণনায় চাঁদের খণ্ডদ্বয়ের অবস্থান নির্ণয়ে "আবু কোবায়েস পাহাড়" "সোয়ায়দা পাহাড়" "ছাফা পাহাড়" "মারওয়া পাহাড়" ইত্যাদির নাম উল্লেখ হইয়াছে এই সব পাহাড় খাছ মক্কা নগরীর মধ্যে অবস্থিত। এই সব বর্ণনা মূল ঘটনার সহিত সঙ্গতি বিহীনও নহে এবং পরস্পর বিরোধীও নহে, কারণ হেরা পর্ব্বত এবং উল্লেখিত অন্যান্য পর্ব্বতগুলি সবই ২।৩ মাইল সীমার মধ্যে অবস্থিত। চাঁদের ন্যায় এত উর্দ্ধের একটি বস্তু তথায় দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের সম্মুখে উল্লেখিত সবগুলি পাহাড়ের উপর দেখা যাওয়া এবং এক এক বর্ণনাকারীর এক একটি উল্লেখ করা বা একই বর্ণনাকারীর বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্নটির নাম উল্লেখ করা মোটেই সঙ্গতিবিহীন নহে। অধিকন্তু হেরা পর্ব্বত নাম উল্লেখের বর্ণনায় পর্ব্বতটি চাঁদের খণ্ডদ্বয়ের মধ্যস্থলে দৃশ্য হওয়ার বয়ান রহিয়াছে. পক্ষান্তরে অন্যান্য পর্ব্বত-নাম উল্লেখের বর্ণনায় চাঁদের এক একটি যে যে পাহাড় বরাবর দেখা যাইতেছিল উহার বয়ান রহিয়াছে।

"শাক্কুল-ক্বামার" বা চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার মোজেযা মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সত্যতার এবং রসুল হওয়ার একটি অতি উজ্জ্বল প্রমাণ ছিল। এই মোজেযা হযরতের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, অন্য কোন নবীকে চাঁদের উপর এইরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাইবার মোজেযাপ্রদান করা হইয়াছিল না। (যোরকানী ৫-১০৭)

"চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার" মোজেযার প্রামাণ্য ঃ

পুরাতন ও আদি যুগের ঘটনাবলীর সংবাদ পরিবহণ সম্পর্কে ইতিহাস শাস্ত্র অপেক্ষা হাদীছ শাস্ত্রের মান-মর্য্যাদা ও নির্ভরযোগ্যতা অনেক অনেক বেশী, এমনকি উভয়ের কোন তুলনাই হইতে পারে না। কারণ, হাদীছ শাস্ত্রের প্রাণবস্তু হইতেছে প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুর জন্য ছনদ বা পরম্পরা সাক্ষ্য-সূত্র উল্লেখ করা; তাহাও আবার মোহাদ্দেছগণের চুলচেরা বাছনিতে বিশ্বস্ততার অতি উচ্চস্তরে পৌঁছিয়া যায়; বিশেষতঃ ইমাম বোখারী ও ইমাম মোছলেমের বাছনির মর্য্যাদা ত অনেক উর্দ্ধে। পক্ষান্তরে ইতিহাস শাস্ত্রে অতীতের সংবাদ পরিবহণের ছড়াছড়ি ত খুবই আছে, কিন্তু হাদীছ শাস্ত্রের ন্যায় সাক্ষী পেশ করার রীতি সেখানে নাই, বাছনি করার কোন বাধ্যবাধকতা বা বিধান ত মোটেই নাই; অথচ হাদীছের ছনদ বা সাক্ষীসমূহকে তিলে তিলে বাছিয়া নিবার জন্য "ওছুলে-হাদীছ" নামে বিশেষ শাস্ত্র এবং উহার ধারাগুলি প্রয়োগের জন্য "আছ্‌মাউর-রেজাল" নামে আর একটি বিশেষ শাস্ত্র বিরাট বিরাট গ্রন্থাবলী আকারে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে (প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং কোন সংবাদ হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত হইলে সেখানে এইরূপ ওজুহাত পেশ করা যে, ইহা ইতিহাসে উল্লেখ নাই—জঘণ্য ধরণের অন্যায় হইবে।

আলোচ্য মোজেযার ঘটনাটি বোখারী ও মোসলেম শরীফ সহ সমুদয় হাদীছ গ্রন্থে প্রত্যক্ষ দর্শকদের সাক্ষ্য ও বিবৃতির মাধ্যমে বর্ণিত রহিয়াছে। তদুপরি মোসলমান ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থাবলীতে বিশেষতঃ সীরাত তথা নবুয়তের ইতিহাস শাস্ত্রের প্রত্যেক গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে। এতদসত্বেও ইসলাম বিদ্বেষীগণ আমাদের নবীর এই মহান মোজেযাটিকে এই বলিয়া উপেক্ষা করিতে চায় যে,ইতিহাসে ইহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না—ইহা জঘন্য ধৃষ্ঠতা। তাহাদিগকে ইহাও বুঝিতে হইবে, সেই আমলে আরবের ন্যায় শিক্ষাদীক্ষাহীন দেশে ইতিহাস সংগ্রহের স্বপ্নও কেহ দেখে নাই এবং সংবাদ-পত্র বা অন্য কোন যোগাযোগ ব্যবস্থায় বহির্বিশ্বের যোগসূত্রও সেখানে মোটেই ছিল না।

তাহারা আরও বলে যে, চন্দ্র এমন বস্তু যে, উহা বিশ্বের প্রত্যেক স্থান হইতে দেখা যায়, অতএব চন্দ্রের উপর এরূপ পরিবর্তন আসিয়া থাকিলে বিশ্ববাসী উহাকে অবশ্যই বিশেষ কৌতুকের সহিত গ্রহণ করিত এবং ইতিহাসে উহার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিত।

এই প্রশ্নের দ্বারা কোন জ্ঞানশূন্য বোকাকে ধোকা দেওয়া ত সম্ভব, কিন্তু বাস্তবের সম্মুখে ইহা মাকড়শার জাল স্বরূপ। চিন্তা করুন—(১) চন্দ্র-সূর্য্যের উদয়-অস্ত বিশ্বের

সকল দেশে এক সঙ্গে হয় না—এক দেশে যখন রাত্র, অপর দেশে তখন দিন; সুতরাং যেই সময় মক্কায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয় তখন বিশ্বের অনেক দেশে দিন ছিল; চন্দ্র দৃষ্টই ছিল না। যেরূপ এখনও চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ এক দেশে দৃষ্ট হয়, কিন্তু অনেক অনেক দেশে তাহা দৃষ্ট হয় না; সংবাদ-পত্র মারফত এইরূপ শুনা যায়। (২) উদয়-অস্তের বিভিন্নতার দরুন বিভিন্ন দেশে সময়ের বিভিন্নতা অপরিহার্য্য, সুতরাং মক্কা নগরীতে যখন এই ঘটনা ঘটিয়াছিল তখন অনেক অনেক দেশে এমন গভীর রাত্র ছিল যে, তখন সেস্থানের লোকগণ নিদ্রামগ্ন ছিল। (৩) স্বাভাবিক আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের দরুন উর্দ্ধ জগতে যে সব সাধারণ ঘটনা ঘটিয়া থাকে যেমন—চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ যাহা হিসাবের দ্বারা পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারিত ও প্রচারিত থাকে উহার প্রতি দৃষ্টি ও লক্ষ্য রাখার লোকের সংখ্যাও কতই না নগণ্য! আর আলোচ্য মোজেযাটি ত একটি আকস্মিক ও অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল যাহার কোনই পূর্ব্বাভাস ছিল না, সুতরাং ঘটনাস্থলের উপস্থিত লোকগণ ত অবশ্যই উহা অবলোকন করিয়াছে, কিন্তু সাধারণ বিশ্ববাসী বহু সংখ্যায় উহার প্রতি তাকাইবে এরূপ আশা করা নিতান্তই অবান্তর। (৪) ঘটনাটি রাত্রি বেলার, তাহাও সাময়িক এবং অল্প সময়ের; ঠিক ঐ সময়ে আকাশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধকারীর সংখ্যা কত হইতে পারে তাহা বুঝা কঠিন নহে।

এইসব বাস্তব বিষয়াবলীতে দৃষ্টি রাখিয়া প্রশ্নটি বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে, প্রশ্নটিকে যেভাবে বিশ্বজোড়া রূপ দেওয়া হইয়াছে উহা শুধু একটা ধোকার জাল মাত্র।

মক্কার পার্শ্ববর্ত্তী দেশ-বিদেশে এই ঘটনা পরিলক্ষিত হয় নাই তাহাও নহে। মক্কার সর্দ্দারগণ এই সম্পর্কে খোঁজ-খবর লইয়া ঘটনার বাস্তবতারই সাক্ষী প্রমাণ পাইয়াছে। ইমাম বয়হাক্বী ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ইবনে মছউ'দ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—

انشق القمر بمكة فقالوا سحركم ابن ابى كبشة فسلوا السفار فان كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق فانه لا يستطيع ان يسحر الناس كلهم وان لم يكونوا رأوا ما رأيتم فهو سحر فسألوا السفار وقد قدموا من كل وجه فقالوا رأيناه فقال الكفار هذا سحر مستمر -

অর্থাৎ—চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার মোজেযা মক্কায় প্রদর্শিত হইল, তখন মক্কাবাসী কাফেররা উহাকে যাদু বলিয়া সাব্যস্ত করিল এবং পরস্পর বলিল, বিদেশ-ভ্রমণ হইতে আগন্তুকদিগকে জিজ্ঞাসা কর; যদি তাহারাও এই ঘটনা দেখিয়া থাকে তবে সাব্যস্ত হইবে যে, মোহাম্মদ(দঃ) সত্যবাদী; সকলের উপর ত যাদুর তাছীর হইতে পারে নাই। আর যদি ভিন্ন দেশের কেহই এই ঘটনা দেখে নাই তবে মনে করিব যে, ইহা যাদু।

অতঃপর তাহারা বিদেশ ভ্রমণকারী আগকন্তুগণকে জিজ্ঞাসা করিল। অনেকেই বলিল, হাঁ—আমরা ঐরূপ ঘটনা দেখিয়াছি। এই সব প্রমাণ পাইয়া অন্তরান্ধ কাফের সর্দ্দারগণ মন্তব্য করিল যে, বস্তুতঃ ইহা অতিশয় শক্তিশালী যাদু। (যোরকানী ১—১০৯)

এতদ্ভিন্ন উক্ত ঘটনা ভারতেও দৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে সঙ্কলিত প্রসিদ্ধ "আল-বেদায়াহ্-ওয়ান্-নেহায়াহ্" ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

قد شوهد ذلك فى كثير من بقاع الارض ويقال انه ارخ ذلك فى بعض بلاد الهند - (৩—১২০)

অর্থাৎ উক্ত ঘটনা বিশ্বের অনেক স্থানেই দেখা গিয়াছিল, কথিত আছে যে, ভারতেরও কোন কোন শহরে এই ঘটনা দৃষ্ট হওয়ার তারিখ লিখিত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী এক ইতিহাস লিখক ভারতস্থ "মালিবার" এলাকায় উহা পরিদৃষ্ট হওয়ার ঘটনা লিখিয়াছেন। মালিবার রাজ্যের শাসকদের রীতি ছিল, তাঁহারা বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ রূপে রাজপুরীতে সংরক্ষণ করিত। তাহাদের সেই লিপির মধ্যে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত দেখার ঘটনাও উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। (তারীখে-ফেরেশতা দ্রষ্টব্য)

এতদ্ভিন্ন এই ঘটনার বাস্তবতার প্রমাণে ইহাই যথেষ্ট যে, ইসলাম, মোসলমান ও হযরত রসুলুল্লার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ইসলামের মূল উচ্ছেদকারী শত্রু তৎকালীন আরব ও মক্কাবাসীরা কখনও মোসলমানদের এই বর্ণনাকে মিথ্যা বলিয়া চ্যালেঞ্জ করে নাই। তাহারা এই ঘটনাকে যাদু বলিয়া এই ঘটনার দ্বারা রসুলুল্লার সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার প্রতিবাদ করিয়াছে, কিন্তু ঘটনার বিবরণকে মিথ্যা ও উহার বাস্তবতাকে অস্বীকার করে নাই। ঘটনার বাস্তবতা এতই উজ্জ্বল এবং অকাট্য ছিল যে, উহাকে মিথ্যা বলার এবং অস্বীকার করার কোন উপায়ই তাহাদের সম্মুখে ছিল না।

এই মো'জেযার সময় ও কাল ঃ

এই মো'জেযাটি হিজরতের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। (যোরকানী ৫—১০৮)

ইহা জিলহজ্জ চাঁদের ১২।১৩ তারিখের ঘটনা, অর্থাৎ চাঁদের বৎসরের শেষ দিন কয়টির ঘটনা। আর হযরত (দঃ) হিজরত করিয়াছিলেন নবুয়তের ত্রয়োদশ বৎসরের প্রথম ভাগে ; সুতরাং উক্ত ঘটনাকে নবুয়তের সপ্তম বৎসর জিলহজ্জ মাসে গণ্য করা হইলে উহা হিজরতের পাঁচ বৎসর দুই-আড়াই মাস পূর্ব্বে সাব্যস্ত হয়।*

---

* এই হিসাব মতে দেখা যায় যে, যাঁহাদের মতে হযরতের বিরুদ্ধে মক্কাবাসী কাফেরগণের বয়কট বা অসহযোগিতা নবুয়তের অষ্টম বৎসরে আরম্ভ হইয়াছিল তাহাদের মতানুসারে উক্ত মোযেজা বয়কটের পূর্ব্বে সাব্যস্ত হইবে। আর যাঁহাদের মতে বয়কট নবুয়তের সপ্তম বৎসরের প্রথম হইতেই ছিল তাহাদের মতানুসারে উক্ত মোজেযার ঘটনা বয়কটের সময়ে সাব্যস্ত হইবে।

যদিও কাফেররা হযরতের বিরুদ্ধে বয়কট ও অসহযোগিতা করিয়া যাইতেছিল, কিন্তু হযরত (দঃ) মুহূর্তের জন্যও ইসলামের তবলীগ কার্য্য ক্ষান্ত করেন নাই (আছাহ্হুছ্-ছিয়ার ৯৪)। এবং তাঁহারা সকলেই হজ্জের সময় হজ্জের অনুষ্ঠানাদিও সম্পন্ন করিয়া থাকিতেন। (যোরকানী ১—২৭৯)

হযরতের বিভিন্ন মো'জেযা

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিভিন্ন কার্য্যাবলীর মাধ্যমেও মোজেযা প্রকাশ পাইত। ঐরূপ ঘটনাবলীর কতিপয় হাদীছও বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন।

১৭৯৩। হাদীছ ঃ—(৫০৪ পৃঃ) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন এক ছফরে বাহির হইলেন, তাঁহার সঙ্গে কিছু সংখ্যক ছাহাবীগণও ছিলেন। পথিমধ্যে নামাযের ওয়াক্ত হইল তাঁহাদের সঙ্গে পানির ব্যবস্থা ছিল না। এক ব্যক্তি একটি পাত্রে অল্প পরিমান পানি উপস্থিত করিল। নবী (দঃ) উহা দ্বারা ওজু করিলেন অতঃপর অঙ্গুলি সমূহ ঐ পাত্রে বিছাইয়া দিলেন এবং ঐ পাত্র হইতে ওজু করিবার জন্য সকলকে নির্দ্দেশ দিলেন। সকলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া অজু করিলেন। তাঁহারা সংখ্যায় প্রায় সত্তর জন ছিলেন।

১৭৯৪। হাদীছ ঃ—(৫০৪ পৃঃ) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মদিনাস্থিত "যওরা" নামক স্থানে ছিলেন, (নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইল, পানির সল্পতা ছিল।) হযরত (দঃ) স্বীয় হস্ত একটি পানির পাত্রে রাখিয়া দিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার আঙ্গুল সমূহের ফাঁক দিয়া পানি উথলিয়া উঠিতে লাগিল। ঐ পানি দ্বারা উপস্থিত সকলে উত্তমরূপে ওজু করিলেন। আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা প্রায় তিন শত ছিল।

১৭৯৫। হাদীছ ঃ—(৫০৫ পৃঃ) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কিছু সংখ্যক ছাহাবীগণের সঙ্গে এক স্থানে ছিলেন, এমতাবস্থায় নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইল। যাহাদের বাড়ী নিকটবর্ত্তী ছিল তাহারা অজু করার জন্য নিজ নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেল। কিছু সংখ্যক লোক এমনও ছিল যাহাদের বাড়ী-ঘর নিকটবর্ত্তী ছিল না।

তখন হযরতের সম্মুখে একটি পাত্র উপস্থিত করা হইল, হযরত (দঃ) উহার মধ্যে হস্ত মোবারক ছড়াইয়া রাখিতে চাহিলেন, কিন্তু পাত্রটি সঙ্কীর্ণ ছিল, তাই তিনি হাতের আঙ্গুলসমূহ একত্রিত রূপে উহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অতঃপর উহা হইতে উপস্থিত সকলে ওজু করিল—তাহাদের সংখ্যা আশি ছিল।

১৭৯৬। হাদীছ ঃ—(৫০৫) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, সাধারণতঃ লোকেরা ধারণা করিয়া থাকে যে, মোজেযাসমূহ শুধু আল্লার আজাব সম্বলিত ঘটনাই হইয়া থাকে ; আমরা মোজেযার মধ্যে লাভজনক ঘটনাও পাইয়াছি।

আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এক ছফরে ছিলাম। নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হইল, কিন্তু পানি অতি সামান্য ছিল। হযরত (দঃ) বলিলেন, একটু পানি আমার নিকট উপস্থিত কর। একটি পাত্রে অতি সামান্য একটু

পানি উপস্থিত করা হইল। হযরত (দঃ) স্বীয় হস্ত ঐ পাত্রে রাখিয়া দিলেন এবং সকলকে বলিলেন, তোমরা আল্লার তরফ হইতে বরকতের পানি দ্বারা অজু করিতে আস।

আবছুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমি ঐ ঘটনায় দেখিয়াছি, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া পানি উথলিয়া উঠিতেছে।

এতদ্ভিন্ন হযরতের এই মোজেযাও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, খাদ্য বস্তুসমূহ তছবীহ পড়িয়া থাকিত এবং আমরা উহা শুনিতে পাইতাম।

১৭৯৭। হাদীছ:—(৫০৬) আবছুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (তাঁহার মসজিদের মিম্বার তৈরী হওয়ার পূর্বে) একটি শুষ্ক খেজুর গাছের খুঁটির প্রতি হেলান লাগাইয়া জুমার খোৎবা ইত্যাদি ভাষণ দিয়া থাকিতেন। মিম্বার তৈরী হইলে পর জুমার খোৎবাদানে তিনি ঐ খুঁটি ত্যাগ করতঃ মিম্বারে দাঁড়াইলেন ; তখন ঐ খেজুর কাণ্ডটি (শিশুর ন্যায় বা বাছুরহারা গাভীর ন্যায়) রোদন করিতে লাগিল। (উহার ক্রন্দনস্বর আমরা শুনিয়াছি।) অতঃপর হযরত (দঃ) মিম্বার হইতে অবতরণ করিয়া উহার নিকটে আসিলেন, উহার উপর হাত বুলাইলেন (এবং উহাকে আলিঙ্গন করিলেন)। তখন ধীরে ধীরে উহার ক্রন্দন স্বর থামিয়া আসিল, যেরূপ ক্রন্দনরত শিশুকে সান্ত্বনা দান করা হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—হাছান (রঃ) এই ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিতেন, হে মোসলমানগণ। একটি শুষ্ক কাঠ হযরত রসুলুল্লার প্রতি এত অনুরাগ ও আসক্ত ছিল ; তোমরা মানুষ—তোমাদের পক্ষে ঐরূপ হওয়া অধিক বাঞ্ছনীয় নয় কি ?

এক হাদীছে উল্লেখ আছে, এই ঘটনা উপলক্ষে হযরত (দঃ) লোকদিগকে বলিলেন, এই শুষ্ক কাষ্ঠের ক্রন্দনে তোমাদের অন্তরে বিস্ময় সৃষ্টি হয় না কি ? তখন বহু লোক সে দিকে লক্ষ্য করিল এবং ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল।

উক্ত খেজুর কাণ্ডটি সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছে অনেক তথ্য আছে। যথা—

(১) উহাকে হযরত (দঃ) বলিয়াছিলেন, তুমি ইচ্ছা করিলে আমি তোমাকে পুনঃ তোমার পূর্ব্ব স্থানে নিয়া রোপন করিয়া দেই, তুমি তাজা গাছ হইয়া যাইবে। আর ইচ্ছা করিলে আমি তোমাকে বেহেশতে রোপন করিতে পারি, তুমি বেহেশতের মাটি ও পানিতে পুষ্টিত হইয়া আল্লার পেয়ারা বান্দাগণকে ফল খাওয়াইবে। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, সেই খেজুর কাণ্ডটি দ্বিতীয় ব্যবস্থাকেই পছন্দ করিয়াছে।

(২) সাময়িক হযরত (দঃ) ঐ খেজুর কাণ্ডটিকে দাফন করাইয়া দিয়া ছিলেন।

(৩) পরবর্ত্তীকালে ঐ খেজুর কাণ্ডটি ছাহাবী উবাই ইবনে কায়াব (রাঃ)-এর হস্তগত হইয়া তাঁহারই হেফাজতে ছিল, এমনকি কালের পরিবর্ত্তনে ধীরে ধীরে উহার বিলুপ্তি সাধিত হয়। আলেমগণ লিখিয়াছেন যে, দাফনকৃত খেজুর কাণ্ডটি বোধহয় মসজিদ নববীর পুনঃনির্ম্মাণকালে উক্ত ছাহাবীর হস্তগত হইয়াছিল।

বৃক্ষ জাতীয় খেজুর কাণ্ডের মধ্যে ক্রন্দন ও কথোপকথনের শক্তি সঞ্চার হওয়াকে অসম্ভব মনে করিবে না। বৃক্ষ বরং সমস্ত বস্তু-নিচয়ই আল্লাহ তায়ালার তছবীহ পড়িয়া থাকে—এই সত্য পবিত্র কোরআনেই বর্ণিত আছে।

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ -

"নিশ্চয় প্রত্যেকটি চিজ-বস্তু আল্লাহ তায়ালার প্রসংশা ও পবিত্রতার গুণ গাহিয়া থাকে, অবশ্য তোমরা উহাদের তছবীহ বুঝিতে পার না।"

অবশ্য মরা শুষ্ক অবস্থায় উক্ত খেজুর কাণ্ডের মধ্যে সেই শক্তির সঞ্চার হওয়া এবং জনসাধারণ কর্তৃক শ্রুত ক্রন্দনশক্তি ও রসুলুল্লার সঙ্গে কথোপকথনের শক্তি তথা মানবীয় শাক্তর ন্যায় শক্তি সঞ্চয় হওয়া প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিশেষ মোজেযা স্বরূপ ছিল।

একদা ইমাম শাফী (রঃ) বলিলেন, হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ন্যায় বড় বড় মোজেযা অন্য কোন নবীকে দেওয়া হয় নাই। এক ব্যক্তি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলিল, হযরত ঈসা আলাইহেচ্ছালামকে মরা মানুষ জীবিত করার মোজেযা দেওয়া হইয়াছিল। ইমাম শাফী (রঃ) তদুত্তরে উক্ত খেজুর খাম্বার ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, ইহা মৃতকে জীবিত করার তুলনায় অধিক বৈশিষ্ট্যপুর্ণ। কারণ, এস্থলে একটি মরা কাষ্ঠে মানবীয় শক্তির সঞ্চার হইয়াছে। (উল্লেখিত তথ্য সমূহ "ফতহুল বারী" হইতে উদ্ধৃত।)

১৭৯৮। হাদীছ :—(৫১১ পৃঃ) আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একজন খৃষ্টান মোসলমান হইয়াছিল, এমনকি সে পবিত্র কোরআনের ছুরা বাকারাহ এবং ছুরা আল-এমরানের শিক্ষাও লাভ করিয়াছিল। সে হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রয়োজনীয় লেখার কাজ করিত। কিছু দিন পরে সে পুনরায় খৃষ্টান হইয়া গেল; সে হযরতের কুৎসা করিয়া বলিত যে, মোহাম্মদ বস্তুতঃ কিছুই জানেনা, আমার লিখিত বিষয়াবলি দেখিয়াই যাহা কিছু শিখিয়াছে।

অল্প দিনের মধ্যেই ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইল। তাহার লোকজন তাহাকে খৃষ্টান ধর্মের রীতি অনুসারে মাটিতে দাফন করিয়া দিল। পরদিন ভোরবেলা দেখা গেল, মাটি তাহাকে ভিতর হইতে বাহিরে ফেলিয়া রাখিয়াছে। তাহার লোকজন মোসলমানদের প্রতি দোষারোপ করিয়া বলিল, তাহারাই এইরূপ করিয়াছে যে, আমাদের লোকটিকে কবর খুড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া রাখিয়াছে। তাহারা পুনরায় অধিক মাটির নীচে তাহাকে দাফন করিয়া দিল; এইবারও ভোরবেলা পূর্ব্বের ন্যায় মাটির উপরেই তাহার লাশ দেখা গেল। তাহার লোকজন আবার মোসলমানদের প্রতি দোষারোপ করতঃ যথা সাধ্য মাটির তলদেশে তাহাকে দাফন করিয়া দিল,

কিন্তু এইবারও ভোরবেলা উহাকে মাটির উপর নিক্ষিপ্ত দেখা গেল। তখন সকলেই বুঝিতে পারিল যে, এই কার্য্য কোন মানুষের পক্ষ হইতে নহে, সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে ঐ অবস্থায়ই ফেলিয়া রাখা হইল।

ব্যাখ্যা—হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে বে-আদবী ও গোস্তাখীর কি পরিণতি তাহার আভাস দানে আল্লাহ তায়ালা এই ঘটনা ঘটাইয়াছিলেন যে, ঐ ব্যক্তির ধ্বংসাবশেষ অপদস্ততার মধ্যে নিশ্চিহ্ন ও বিলুপ্ত হইয়াছিল।

১৭৯৯। হাদীছঃ— (খন্দকের জেহাদ উপলক্ষে পরীখা খনন সময়ে ক্ষুধার দুর্ব্বলতায় নবী (দঃ) কাপড় দ্বারা পেটে পাথর বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন।) আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, আবুতাল্‌হা (রাঃ) (নবীজীর ঐ অবস্থা অবলোকন করিয়া) বাড়ী আসিলেন এবং স্বীয় স্ত্রী উম্মে-সোলায়েমকে বলিলেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়া আসিলাম—ক্ষুধার কারণে তাঁহার মুখে ভালভাবে শব্দও বাহির হয় না। তোমার নিকট খাওয়ার কিছু আছে কি? স্ত্রী বলিলেন, হাঁ—আছে; এই বলিয়া তিনি কতেকটি যবের রুটি বাহির করিলেন এবং একটি চাদর বাহির করিয়া উহার এক অংশে ঐ রুটিগুলি লেপটাইয়া আমার বগলে দাবাইয়া দিলেন এবং চাদরের বাকি অংশ দ্বারা আমার গা ঢাকিয়া দিলেন—(আনাছ তখন বালক) এই অবস্থায় তিনি আমাকে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আমি মসজিদে যাইয়া হযরত (দঃ)কে পাইলাম, তাঁহার নিকট অনেক লোক ছিল। আমি যাইয়া তথায় দাঁড়াইলাম। হযরত (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আবু তাল্‌হা তোমাকে পাঠাইয়াছে? আমি আরজ করিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, খাদ্য দিয়া পাঠাইয়াছে? আমি আরজ করিলাম, হাঁ। তখন হযরত (দঃ) উপস্থিত সকলকে বলিলেন, তোমরা সকলে চল (আবু তাল্‌হার বাড়ী দাওয়াত খাওয়ার জন্য।)

এই বলিয়া সকলে রওয়ানা হইলেন, আমি তাঁহাদের সম্মুখ ভাগে পথ দেখাইয়া চলিলাম এবং আবু তাল্‌হা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট আসিয়া তাঁহাকে বিস্তারিত খবর জ্ঞাত করিলাম। আবু তাল্‌হা তাঁহার স্ত্রী উম্মে-সোলায়েমকে বলিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) অনেক লোক সঙ্গে করিয়া আমাদের বাড়ী তশরীফ আনিতেছেন, অথচ আমাদের নিকট কোন ব্যবস্থা নাই যে, আমরা তাঁহাদিগকে খাওয়ার দিতে পারি। উম্মে-সোলায়েম বলিলেন, আল্লাহ এবং আল্লার রসুল আমাদের অবস্থা ভালভাবেই জ্ঞাত আছেন, (সুতরাং আমাদের চিন্তা করার আবশ্যক নাই।) আবুতাল্‌হা (রাঃ) বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)কে

অভ্যর্থনা করিয়া নিয়া আসিলেন। হযরত (দঃ) আবুতাল্‌হা সমভিব্যাহারে বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন, হে উম্মে-সোলায়েম! তোমার নিকট খাদ্য যাহা কিছু আছে উপস্থিত কর। উম্মে-সোলায়েম সেই রুটি কয়টি যাহা আমার সঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন উপস্থিত করিলেন। হযরতের আদেশে রুটিগুলি খণ্ড খণ্ড করা হইল। উম্মে-সোলায়েম ঐগুলার উপর কিছু ঘৃত ঢালিয়া দিলেন। অতঃপর হযরত (দঃ) উহার উপর কিছু পড়িয়া দোয়া করিলেন* এবং বলিলেন, লোকদের মধ্য হইতে দশ জনকে ডাকিয়া আন। তাহারা আসিয়া পেট পুরিয়া খাইলেন। অতঃপর আরও দশ জনকে ডাকিয়া আনা হইল তাহারাও পেট পুরিয়া খাইলেন। এইভাবে উপস্থিত সকলেই পেট পুরিয়া খাইলেন, তাঁহাদের সংখ্যা সত্তর বরং আশি ছিল। (তারপর হযরত (দঃ) বাড়ীর সকলকে নিয়া খাইলেন তবুও খাদ্য বাঁচিয়া গেল—উহা পড়শীগণের মধ্যে বিতরণ করা হইল। ফতহুল বারী)

আলোচ্য ঘটনা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যের আরও একটি ঘটনা ঐ খন্দকের জেহাদ উপলক্ষেই ছাহাবী জাবের (রাঃ)-এর সঙ্গে ঘটিয়াছিল—তিনি মাত্র তিন জন লোকের উপযোগী খাদ্য তৈরীর ব্যবস্থা করিয়া হযরত (দঃ)কে চুপি চুপি দাওয়াত করিয়াছিলেন, কিন্তু হযরত (দঃ) ব্যাপকভাবে দাওয়াতের ঘোষণা দিয়া জাবেরের বাড়ী উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং হযরতের মোজেযায় সেই তিন জনের খাদ্য এক হাজার লোকে খাওয়ার পরেও অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছিল।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে ১৪৭৩ নং হাদীছে রহিয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ইমাম বোখারী (রঃ) আরও কতিপয় মোজেযার ঘটনার হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সেই সব হাদীছের অনুবাদ পূর্বে হইয়া গিয়াছে, যেমন—প্রথম খণ্ডের ২৩১ নং, ৩৭০ নং ও ৫২১ নং হাদীছ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৬২ নং হাদীছ এবং তৃতীয় খণ্ডের ১৪৯৭ নং ও ১৪৯৮ নং হাদীছ। এতদ্ভিন্ন আরও কতিপয় হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যাহা আখেরী যমানা সম্পর্কে বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত ; যথাস্থানে ইনশা-আল্লাহ তায়ালা উহা অনুদিত হইবে।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আর একটি অন্যতম বিশেষ মোজেযা হইল মে'রাজ শরীফের ঘটনা। ইমাম বোখারী (রঃ)ও এই ঘটনা বিশেষ গুরুত্বের সহিত ৫৪৮ পৃষ্ঠায় দুইটি পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন।

---

* হযরত (দঃ) এই দোয়া পড়িয়াছিলেন—بسم الله اللهم اعظم فيها البركة
"আল্লার নামে—হে আল্লাহ! এই খাদ্যে বেশী মাত্রায় বরকত দান করুন।"

মে'রাজ শরীফের বয়ান

"মে'রাজ" শব্দের অর্থ সিঁড়ি বা সোপান, যদ্দারা উর্দ্ধে আরোহণ করা যায়। মে'রাজের ঘটনা বলিতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এক ঐতিহাসিক বিশেষ ঘটনা উদ্দেশ্য ; যেই ঘটনায় হযরত (দঃ) সাত আসমান ও তদুর্দ্ধের "মহান আরশ" এবং তাহারও উর্দ্ধে বিশেষ জগতের পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেই ঘটনাকে বা উহার এক অংশকে আরবী ভাষায় ইস্‌রাও* বলা হয় যাহার অর্থ রাত্রিকালের ভ্রমণ। এই ঘটনা রাত্রিকালে ঘটিয়াছিল বলিয়া এই শব্দ ব্যবহার করা হয়। পবিত্র কোরআনে এই শব্দেই উক্ত ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে।

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, কোন এক রাত্রিতে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আল্লাহ তায়ালার বিশেষ আমন্ত্রনক্রমে এবং তাঁহার বিশেষ ব্যবস্থাধীনে জিব্রিল ফেরেশতার পরিচারণ ও পরিচালনায় মক্কা হইতে প্রায় এক মাসের পথে "বাইতুল মোকাদ্দাস-মছজিদ" হইয়া তথা হইতে পর পর সাত আসমানের ভ্রমন করেন এবং সপ্তম আসমান হইতে মহান আরশ, অতঃপর তাহারও উর্দ্ধে সৃষ্ট জগতের বহু স্তর পরিভ্রমন করেন এবং বরযখী জগত, বেহেশত, দোজখ, লৌহ-মাহফুজ, বাইতুল-মা'মূর, হাওজে-কাওছার, সিদ্‌রাতুল-মোন্‌তাহা, আরশ-কুরছি ইত্যাদি সহ আল্লাহ তায়ালার কুদরতের ও তাঁহার বিশেষ সৃষ্টির বহু রকম অলৌকিক ও অসাধারণ বস্তুনিচয় পরিদর্শন করেন।

আল্লাহ তায়ালার বিশেষ দরবারে উপস্থিতি লাভ করেন, আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে কালাম বা কথা বার্ত্তার সুযোগ লাভ করেন, এমনকি (অধিকাংশের মতে) স্বচক্ষে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাৎও লাভ করেন। ইহজগতের বাহিরে এই সুদীর্ঘ পরিভ্রমণ সংঘটিত হয় এবং তথা হইতে হযরত (দঃ) প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু তাঁহার এই পরিভ্রমণের আরম্ভ ও প্রত্যাবর্ত্তন জাগতিক সময়ের হিসাবে ঐ রাত্রের এক অংশ ছিল মাত্র। তাঁহার এই পরিভ্রমণ ও পরিদর্শন সম্পূর্ণ বাস্তব এবং যথার্থ ও প্রকৃত সত্য ঘটনা ছিল। কোন প্রকার রূপক বা স্বপ্ন পর্য্যায়ের মোটেই ছিল না, অবশ্য সব কিছু সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার কুদরতের লীলা ছিল বটে।

---

* "ইস্‌রা" অর্থ রাত্রিকালের ভ্রমন এবং "মে'রাজ" অর্থ উর্দ্ধে আরোহন। আলোচ্য ঘটনায় উভয় কার্য্যই সংঘটিত হইয়াছিল ; মক্কা হইতে বাইতুল মোকাদ্দাদ-মছজিদ পর্য্যন্ত দীর্ঘ এক মাসের পথ ত হযরত (দঃ) ভ্রমন করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে তিনি উর্দ্ধে আরোহন করিয়াছিলেন। ফলে সাধারণতঃ উভয় শব্দই সম্পূর্ণ ঘটনার জন্য ব্যবহার করা হয়। আর কাহারও মতে ঘটনার প্রথম অংশের জন্য "ইস্‌রা" শব্দ এবং দ্বিতীয় অংশের জন্য "মে'রাজ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইমাম বোখারী (রঃ) এই মতামতকেই সমর্থন করেন বলিয়া মনে হয়, কারণ তিনি ভিন্ন ভিন্ন দুইটি পরিচ্ছেদ উল্লেখ করিয়াছেন—একটি পরিচ্ছেদে "মে'রাজ" আর একটি পরিচ্ছেদে "ইস্‌রা"।

মে'রাজ শরীফের তাৎপর্য্য ঃ

রসুল ও নবী মানব জাতির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক (Reformer)। মানুষ ভুলিয়া যায় তাহার সৃষ্টি কর্ত্তাকে এবং তাঁহার সম্পর্ককে, সে ভুলিয়া যায় তাঁহার বিচারকে, ভুলিয়া যায় তাঁহার বিচারের ফলাফল—প্রতিদান বা শাস্তিকে, ভুলিয়া যায় তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা কর্তৃক তাহার উপর ন্যস্ত কর্ত্তব্যাবলীকে, ছিন্ন হইয়া যায় সৃষ্টি কর্ত্তার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক। মানুষ এই সবকে ভুলিয়া যায়, অনেক স্থলে এই সবের অস্বীকারকারী হইয়া বসে, অনেক স্থলে এই সবের বিপরীতকে গ্রহণ ও বরণ করিয়া লয়। এই সব অবস্থা মানব জীবনের কলঙ্ক ও কুসংস্কার। এই সবের ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতেই রসুল ও নবীগণের আবির্ভাব হইয়া থাকিত; তাঁহারা মানবের ইহকালীন জীবনের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য এবং পরকালীন জীবনের ফলাফল ও তথ্যাদি স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তার তরফ হইতে মানবকে জ্ঞাত করিতেন এবং এই জ্ঞান দানের মাধ্যমেই নবী ও রসুলগণ মানব সমাজের ঐ অধঃপতনের সংস্কার (Reform) সাধন করিতেন।

দুনিয়া অস্থায়ী, উহার উপর মানব জাতির আবাদিও অস্থায়ী, সুতরাং রসুল এবং নবীগণের ছেল্‌ছেলারও শেষ সীমা রহিয়াছে। সেই সর্বশেষ রসুল ও নবী হইলেন আমাদের পয়গাম্বর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম। তাঁহার পর আর কোন নবী বা রসুল আসিবেন না, অতএব সাধারণ ও স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই তাঁহার সংস্কার (Reform) সর্বাধিক সুদৃঢ় ও দীর্ঘজীবী হওয়া আবশ্যক। আর সংস্কারকের Reformer -এর ছায়া তথা তাঁহার সংস্কার (Refrom) দীর্ঘস্থায়ী, দীর্ঘজিবী ও সুদৃঢ় হয় তাঁহার সংস্কারের ও Refram-এর বিষয়াবলী তথা তাঁহার উক্তি ও বক্তব্যাবলীর উপর তাঁহার নিজের (Faith) বিশ্বাসের অকাট্যতা ও দৃঢ়তা অনুপাতে।

পূর্ববর্ত্তী নবীগণ যে সব বিষয় লোকদিগকে জ্ঞাত করিয়াছেন, যেমন—আল্লাহ তায়ালা সম্বন্ধে জ্ঞাত করিয়াছেন, আরশ-কুরছী বেহেশ্‌ত-দোযখ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞাত করিয়াছেন এবং নেক-বদ আমলের প্রতিদান ও শাস্তি জ্ঞাত করিয়াছেন; এই সব কিছু তাঁহারা নিজেরা জ্ঞাত হইতেন ওহী দ্বারা। ওহী নির্ভুল, অকাট্য ইহাতে কোন সন্দেহের লেশ মাত্র থাকিতে পারে না, কিন্তু ওহী অকাট্য নির্ভুল হইলেও উহা শুধু শুনা পর্য্যায়ের; দেখা পর্য্যায়ের নহে। শুনা পর্য্যায়ের অকাট্যতা সন্দেহ দূরীভূত করার জন্য এবং পূর্ণ ঈমানের জন্য যথেষ্ট, ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা দেখা পর্য্যায়ের অকাট্যতার সমতুল্য নহে; "شنید کئے بود مانند دید" শুনা কখনও দেখার সমতুল্য হইতে পারে না।" এই মর্ম্মেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মৃতকে পুনর্জীবিত করার দৃশ্য চাক্ষুস দেখিয়া নেওয়ার দরখাস্ত আল্লাহ তায়লার দরবারে করিয়াছিলেন—যাহার বিবরণ ৪র্থ খণ্ডে হযরত ইব্রাহীমের আলোচনায় দ্রষ্টব্য।

আল্লাহ তায়ালা সর্ব্বশেষ পয়গাম্বর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছায়াকে তথা তাঁহার সংস্কার (Refrom)কে সর্ব্বাধিক দীর্ঘস্থায়ী, দীর্ঘজিবী ও সুদৃঢ় করার ব্যবস্থা স্বরূপ সব কিছু দেখাইয়া দিবার জন্য এই বিশেষ পরিভ্রমণের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের ঘোষণা—

سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ
الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا - (১৫ পাঃ ১ রুঃ)

অর্থ—অতি মহান পাক পবিত্র আল্লাহ; যিনি স্বীয় বিশিষ্ট বন্দা (মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম)কে রাত্রি বেলায় মক্কার মছজিদ হইতে বাইতুল মোকাদ্দাছ মছজিদের পথে পরিভ্রমণে নিয়াছেন, (তিনি স্বয়ং সেই পরিভ্রমণের) উদ্দেশ্য এই (প্রকাশ করিতেছেন) যে, আমি তাঁহাকে আমার (কুদরতের এবং সৃষ্টির) অনেক নিদর্শন ও অলৌকিক বস্তুনিচয়ের পরিদর্শন করাইব।

এই পরিভ্রমণের মাধ্যমে হযরত (দঃ) সব কিছু দেখিয়াছেন—বরযখী জগৎকে দেখিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণ যাঁহাদের ইতিহাস বিশ্ববাসীকে শুনাইবেন তাঁহাদিগকে দেখিয়াছেন, নেক-বদ আমলের প্রতিদান ও শাস্তিকে দেখিয়াছেন ; আরও দেখিয়াছেন বেহেশত-দোযখ, আরশ-কুরছি, বাইতুল-মা'মূর, ছেদরাতুল-মোনতাহা, লৌহে-মাহফুজ, হাউজে-কাওছার ইত্যাদি, এমনকি যতদূর দেখিবার আল্লাহ তায়ালাকেও দেখিয়াছেন।

পবিত্র কোরআনে অন্য এক প্রসঙ্গে হযরতের এই পরিভ্রমণের উল্লেখ রহিয়াছে—

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى - عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى - عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى -
اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى - مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى - لَقَدْ رَاٰى
مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى -

অর্থাৎ হযরত (দঃ) ছেদরাতুল-মোনতাহার নিকট পৌঁছিয়াছিলেন ; ঐ এলাকায়ই চিরবাসস্থান বেহেশত অবস্থিত। তখন (তথায় হযরতের আগমন উপলক্ষে) এক বিশেষ রকমের সজ্জা ছিদ্‌রাতুল-মোনতাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল। (সেই এলাকায় পৌঁছিয়াও) হযরতের পরিদর্শন ও অনুধাবন শক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ সতেজ সঠিক ও বিমল ছিল—পরিদর্শন ও অনুধাবনে কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল না। হযরত তথায় স্বীয় প্রভু পরওয়ারদেগারের বহু রকম বড় বড় নিদর্শন ও বস্তুনিচয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন। (২৭ পাঃ ৫ রুঃ)

এই ভাবে ইসলামের আকিদা ও বিশ্বাসীয় অদৃশ্য ও অলৌকিক বস্তুনিচয় যাহা অন্যান্য নবীগণের পক্ষে শুধু ওহী মারফৎ তথা শুনা পর্য্যায়ের অকাট্য ছিল ; মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পক্ষে ঐ সব বস্তুনিচয় দেখা পর্য্যায়ের অকাট্যতায় পরিণত হইয়াছিল। ফলে তাঁহার প্রচারিত ও বক্তব্য বিষয়াবলী সম্পর্কে তাঁহার এক্বীন ও বিশ্বাস (এবং Faith) ছিল সর্ব্বাধিক দৃঢ় ; যদ্দরুণ তাঁহার ছায়া তথা তাঁহার সংস্কার (Refrom) দীর্ঘস্থায়ী, দীর্ঘজিবী ও সুদৃঢ় হইয়াছে।

"মে'রাজ" হযরতের পক্ষে আদর ও সোহাগের মোলাকাত ছিল ঃ

নবুয়ত প্রাপ্তির পর দীর্ঘ নয় বৎসর কাল হযরত (দঃ) দুঃখ-যাতনার ভিতর দিয়া কাটাইয়াছেন—দশম বৎসরে তাঁহার মানসিক ও দৈহিক কষ্ট চরমে পেঁাছিল। ইহজগতে তাঁহার একমাত্র রক্ষণাবেক্ষণকারী সাহায্য সমর্থনদানকারী চাচা আবু তালেবের মৃত্যু হইল, এই বৎসরই পরম প্রতিভাশালীনী জীবন-সঙ্গীনী বিবি খাদিজারও ইন্তেকাল হইয়া গেল। হযরত (দঃ) শত্রু বেষ্টনীর মধ্যে ঘরে ও বাহিরে নিঃসঙ্গ নিঃসহায় হইয়া পড়িলেন, এমনকি হযরত স্বয়ং এই বৎসরকে "عام الحزن —শোকের বৎসর" নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। তদুপরি তায়েফ নগরীর ঘটনা ত তাঁহার ব্যথিত হৃদয়কে আরও ঘায়েল করিয়াছিল।

রহমানুর রহীম আল্লাহ তায়ালার সাধারণ নিয়ম যাহা তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا -

"কষ্টের সঙ্গেই মিষ্ট থাকে, কষ্টের সঙ্গেই মিষ্ট থাকে ,"

আল্লাহ আয়ালার এই সাধারণ নিয়মটি তাঁহার আওলিয়া—দোস্ত ও পেয়ারা বন্দাদের পক্ষে বিশেষরূপে বাস্তবায়িত হইয়া থাকে। এস্থলে আল্লাহ তায়ালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পেয়ারা হাবীব সর্ব্বাধিক দুঃখ যাতনা ভোগ করিলেন, তাঁহার জীবনের সর্ব্বাধিক ব্যথা ও আঘাতে তিনি মর্ম্মাহত হইলেন, এই ক্ষেত্রে কি আল্লাহ তায়ালা তাঁহার সেই সাধারণ নিয়ম—"কষ্টের সঙ্গে মিষ্ট"কে বাস্তবায়িত করিবেন না ? নিশ্চয়ই করিবেন ; রহমানুর রহীম আল্লাহ তায়ালা তাহাই করিয়াছেন।

দশম বৎসরে হযরত (দঃ) আন্তরিক ও বাহ্যিক উভয় দিক দিয়া ব্যথা ও দুঃখ-যাতনার চরম অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। চাচা আবুতালেবের ও জীবন-সঙ্গীনী বিবি খাদিজার ইন্তেকালে ত আন্তরিক ব্যথায় বিহ্বল হইয়াছিলেন, আর তায়েফের ঘটনায় বাহ্যিক দুঃখ যাতনার চরমে পেঁাছিয়াছিলেন। এই দুই প্রকার কষ্টের প্রতিদান ও প্রলেপ স্বরূপ দুই প্রকার মিষ্ট আল্লাহ তায়ালা হযরতকে দান করিয়াছিলেন ; একটি বাহ্যিক দ্বিতীয়টি আধ্যাত্মিক। বাহ্যিক মিষ্ট ও নেয়ামতটি ছিল মদিনাবাসীদের সঙ্গে হযরতের সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার সুযোগ ও ব্যবস্থা—

যাহার উপর ভিত্তি করিয়া মদিনায় ইসলামের কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং হযরত (দঃ) এক মস্ত বড় জাতিকে তাঁহার সাহায্য সমর্থন ও সহায়তায় সর্ব্বস্ব উৎসর্গকারীরূপে দণ্ডায়মান পান। এমনকি অচিরেই ইসলাম রাজনৈতিক ক্ষমতা ও রাষ্ট্রিয় মর্য্যাদা লাভ করিতে সক্ষম হয়। ইহার সুচনা দশম বৎসরেরই শেষ কয়টি দিনে হইয়াছিল যাহার বিস্তারিত বিবরণ "আকাবা সম্মেলন" বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে।

আধ্যাত্মিক মিষ্ট ও নেয়ামনতটি ছিল এই মে'রাজ শরীফ। যাহা একমাত্র হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ব্যতীত অন্য কোন নবী রসুল ফেরেশতা তথা কোন সৃষ্টের ভাগ্যেই জুটে নাই। নবুয়তের একাদশ বা দ্বাদশ বৎসরের রজব মাসে এই ঘটনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে সমস্ত নবীগণকে হযরতের পেছনে মোক্তাদী রূপে দাঁড় করাইয়া হযরত (দঃ) যে, তাঁহাদের সর্দ্দার তাহা আনুষ্ঠানিক রূপে দেখান হয়। হযরত (দঃ) এত উর্দ্ধে আরোহণ করেন যে, ঐশী যানবাহন বোরাকও তাঁহার পেছনে থাকিয়া যায়। হযরত (দঃ) আল্লাহ তায়ালার এত নৈকট্য লাভ করেন যে, জিব্রিল ফেরেশতাও তাঁহার সঙ্গ ত্যাগে বাধ্য হন। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে হযরতের সালাম ও কালামের বিনিময় হয়। আল্লাহ তায়ালা হযরতকে আদর সোহাগ করিয়া তাঁহার সৃষ্টি-কারখানার অলৌকিক ও অসাধারণ বস্তুনিচয়কে পরিদর্শন করান। এই সব ত হইল মে'রাজ শরীফের শুধু বাহ্যিক গুটি কয়েক বিষয়ের ইঙ্গিত মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে হযরত (দঃ) মে'রাজ শরীফের মাধ্যমে কি অসীম মর্য্যাদা যে, লাভ করিয়াছিলেন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়া কোথায় যে, তিনি পৌঁছিয়াছিলেন তাহা বুঝা ও বুঝান মানুষের পক্ষে বস্তুতঃ সম্ভবই নহে। কবী ঠিকই বলিয়াছেন—

لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقَّهُ — بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختصر

তাঁহার প্রশংসা ও বাস্তব মর্য্যাদার বিবরণ দান সম্ভবই নহে; সংক্ষেপে এতটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত করা বাঞ্ছনীয় যে, তিনি খোদা নন—খোদার পরের মর্ত্তবাই তাঁহার।

মে'রাজ শরীফের তারিখঃ

যুগে যুগে মানুষের জ্ঞান-চর্চ্চা ও বিদ্যা-চর্চ্চার ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ইসলামের পূর্ব্বে আরবদের মধ্যে তাহাদের সাহিত্য ও কাব্য ব্যতিরেকে আর কোন জ্ঞান ও বিদ্যা-চর্চ্চার রীতি ছিলই না বলিলে চলে। এমন কি তাহাদের পক্ষে সেই যুগকে জাহেলিয়াত বা অন্ধকার যুগ বলা হইয়া থাকে। উহারই সংলগ্ন ইসলামের প্রাথমিক যুগ; তখন হইতে আরবের মোসলমানদের মধ্যে জ্ঞান ও বিদ্যা-চর্চ্চা পুরাদমে চলিতে আরম্ভ করে, তাঁহারা আল্লার বাণী কোরআন এবং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিষয়াবলী তথা হাদীছকে

কণ্ঠস্থ করতঃ উহাকে প্রচার করায় মনোনিবেশ করেন। তখনকার রীতি ছিল মূল বিষয় বস্তু ঘটনাকে হৃদয়ঙ্গম কণ্ঠস্থ ও মুখস্থ করতঃ সংরক্ষণ করা। ইতিহাস-বেত্তাদের রুচি সম্মত রূপে প্রত্যেকটি ঘটনার তারিখ এবং সময় ও স্থানকে পূর্ণরূপে নির্দিষ্ট করার প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য থাকিত না। তাঁহাদের বিবৃতিতে অনেক বিশেষ বিশেষ ঘটনারও সঠিক কোন তারিখ-বর্ণনা দেখা যায় না। তাঁহারা উহাকে গুরুত্ব দিতেন না; বস্তুতঃ উহা মূল বিষয় ও ঘটনার ন্যায় গুরুত্ব দানের বস্তুও নহে।

পরবর্ত্তী যুগে যখন বিশেষতঃ ঐ সব বিষয়াবলী ও ঘটনাবলী ইতিহাস রূপে লিপিবদ্ধ হওয়া আরম্ভ হইল তখন উহার উদ্যোক্তাগণ ইতিহাস-বেত্তাদের রুচি ও রীতি অনুসারে ঘটনাবলী সমূহের দিন তারিখ এবং স্থান ও জায়গা নির্দ্ধারণে তৎপর হইলেন, কিন্তু মূল ঘটনার বর্ণনাকারীদের হইতে উহা সম্পর্কে কোন সুনির্দ্দিষ্ট খোঁজ না পাইয়া নানা প্রকার ইঙ্গিত আকার হইতে ঐ সব বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে সচেষ্ট হইলেন। সেমতে তাঁহাদের মধ্যে অনেকস্থলে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। সারকথা—অনেক অনেক অকাট্যরূপে প্রমাণিত ঘটনাবলীর তারিখ সম্পর্কে—যেমন, "মে'রাজ শরীফের" তারিখ সম্পর্কে সামঞ্জস্য বিহীন মতভেদ দেখা যায়, কিন্তু এই মতভেদ মূল ঘটনার সাক্ষ্যদাতাগণের মধ্যে নহে, বরং মূল ঘটনার সাক্ষীগণ তারিখ বর্ণনা না করায় পরবর্ত্তী যুগের লিখকগণ নিজেদের চেষ্টায় তারিখ বাহির করিতে যাইয়া মতভেদ করিয়াছেন এবং তাহা হওয়াই স্বাভাবিক।

স্থান বিশেষে মূল ঘটনা বর্ণনাকারীদের বিবৃতিতেও ঐ সব বিষয় নির্দ্ধারণে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়—যেমন, মে'রাজ শরীফের ঘটনায় হযরত (দঃ)কে কোন্ স্থান হইতে নেওয়া হইয়াছিল—হযরত তখন কোন্ ঘরে বা কোন্ জায়গায় ছিলেন সে সম্পর্কে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু পাঠকবৃন্দ! স্মরণ রাখিবেন, মূল ঘটনার বিবৃতি দানকারীদের বর্ণনায় কোন বিষয়ের বিভিন্নতা দেখা যাইতে পারে বটে, কিন্তু উহা সামঞ্জস্যতা বিহীন হয় না। মে'রাজ সম্পর্কীয় স্থান সম্পর্কে যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় উহার সামঞ্জস্যতা বিস্তারিত বিবরণে জানিতে পারিবেন।

মে'রাজের তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের অনেক মতভেদ আছে। তবে নবুয়তের একাদশ বৎসরে হওয়াই বিশেষ সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়, অবশ্য দ্বাদশ বৎসর সম্পর্কেও মতামত পাওয়া যায়। আর মাস ও তারিখ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ এই যে রজব মাসের ২৭ তারিখের রাত্রি ছিল। (যোরকানী ১—২০৮ দ্রষ্টব্য)

এই ধরণের বিষয়াবলীর তারিখ সম্পর্কে তৎপর না হওয়াই ইসলাম ও শরীয়তের দিক দিয়া উত্তম। ছাহাবী ও তাবেয়ীগণও এই সম্পর্কে তৎপরতা দেখান নাই, কারণ উহাতে বেদাৎ তথা নানা প্রকার কুসংস্কার সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে।

মে'রাজের বিবরণ ঃ

মে'রাজ শরীফের ঘটনার বিবরণ স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মাধ্যমেই পাওয়া গিয়াছে। হযরত (দঃ) বিভিন্ন উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে ছাহাবীদের সম্মুখে উহার বিবরণ দান করিয়াছেন। ঘটনাটি অতি বড় সুদীর্ঘ, সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় বিভিন্ন অংশ বর্ণিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন অংশ উল্লেখ বিহীন রহিয়াছে। সকলের বিবৃতিকে একত্রে দেখিলে মূল ঘটনার অনেকাংশ প্রকাশ পাইয়া যাইবে। মে'রাজ শরীফের বিবরণে ৩০ জন ছাহাবীর বর্ণনা বা হাদীছ বর্ত্তমান কেতাব সমূহে পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে বোখারী শরীফে সাত জনের হাদীছ রহিয়াছে যাহার সুশৃঙ্খল উদ্ধৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৮০০। হাদীছ ঃ— عن انس بن مالك عن مالك بن صعصعة

ان نبى الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة اسرى به
بينما انا فى الحطيم مضطجعا اذ اتانى ات فشق ما بين هذه الى
هذه يعنى به من ثغرة نحره الى شعرته فاستخرج قلبى ثم
اتيت بطست من ذهب مملوءة ايمانا فغسل قلبى ثم حشى ثم اعيد -
ثم اتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار ابيض فقال له الجارود
وهو البراق يا ابا حمزة قال انس نعم يضع خطوه عند اقصى طرفه
فحملت عليه - فانطلق بى جبرئيل حتى اتى السماء الدنيا فاستفتح
فقيل من هذا قال جبرئيل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد ارسل
اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجئ جاء ففتح فلما خلصت فاذا
فيها ادم فقال هذا ابوك ادم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام
ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح - ثم صعد بى حتى

أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هٰذَا قَالَ جِبْرَئِيلُ..................

অর্থ—আনাছ (রাঃ) মালেক ইবনে ছা'ছাআ'হ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে যেই রাত্রে আল্লাহ তায়ালা পরিভ্রমণে নিয়া গিয়াছিলেন সেই রাত্রের ঘটনা বর্ণনায় ছাহাবীগণের সম্মুখে তিনি বলিয়াছেন, যখন আমি কা'বা গৃহের উন্মুক্ত অংশ—হাতীমে (উপনীত হইলাম ঃ এবং তখনও আমি ভাঙ্গা ঘুমে ভারাক্রান্ত) উর্দ্ধমুখী শায়িত ছিলাম, হঠাৎ এক আগন্তুক (জিব্রিল ফেরেশতা) আমার নিকট আসিলেন (এবং আমাকে নিকটবর্ত্তী জমজম্ কূপের সন্নিকটে নিয়া আসিলেন।) অতঃপর আমার বক্ষের উর্দ্ধসীমা হইতে পেটের নিম্ন সীমা পর্য্যন্ত চিরিয়া ফেলিলেন এবং আমার দেলটা বাহির করিলেন। অতঃপর একটি স্বর্ণপাত্র উপস্থিত করা হইল যাহা ঈমান (ও পরিপক্ক সত্যিকার জ্ঞান বর্দ্ধক) বস্তুতে পরিপূর্ণ ছিল। আমার দেলটাকে (জমজমের পানিতে) ধৌত করিয়া উহার ভিতরে ঐ বস্তু ভরিয়া দেওয়া হইল এবং দেলটাকে নির্দ্ধারিত স্থানে রাখিয়া আমার বক্ষকে ঠিকঠাক করিয়া দেওয়া হইল (বক্ষনীর বিষয়গুলি ৪৫৫ × ৪৫৬ পৃষ্ঠার হাদীছে উল্লেখ আছে)।

অতঃপর আমার জন্য একটি যানবাহন উপস্থিত করা হইল—খচ্চর হইতে একটু ছোট, গাধা হইতে একটু বড়, শ্বেত বর্ণের ; উহার নাম "বোরাক্" যাহার প্রতি পদক্ষেপ দৃষ্টির শেষ সীমায়। সেই যানবাহনের উপর আমাকে ছওয়ার করা হইল।

ঘটনা প্রবাহের ভিতর দিয়া জিব্রায়ীল আমাকে লইয়া নিকটবর্ত্তী তথা প্রথম আসমানের দ্বারে পৌঁছিলেন এবং দরওয়াজা খুলিতে বলিলেন। ভিতর হইতে পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হইল ; জিব্রায়ীল স্বীয় পরিচয় প্রদান করিলেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনার সঙ্গে কে আছেন ? জিব্রায়ীল বলিলেন, মোহাম্মদ (দঃ) আছেন। বলা হইল, (তাঁহাকে নিয়া আসিবার জন্যই ত আপনাকে) তাঁহার নিকট পাঠান হইয়াছিল ? জিব্রায়ীল বলিলেন, হাঁ। তারপর আমাদের প্রতি মোবারকবাদ ও শুভেচ্ছা জানাইয়া দরওয়াজা খোলা হইল। গেটের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তথায় আদম (আঃ)কে দেখিতে পাইলাম। জিব্রায়ীল আমাকে তাঁহার পরিচয় করাইয়া বলিলেন, তিনি আপনার আদি পিতা আদম তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। আমার সালামের উত্তরদানে তিনি আমাকে "সুযোগ্য পুত্র ও সুযোগ্য নবী আখ্যায়িত করিলেন এবং খোশ-আমদেদ জানাইলেন।

অতঃপর জিব্রায়ীল আমাকে লইয়া দ্বিতীয় আসমানের দ্বারে পৌঁছিলেন এবং দরওয়াজা খুলিতে বলিলেন। এখানেও পূর্ব্বের ন্যায় কথোপকথন হইল এবং শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানাইয়া দরওয়াজা খোলা হইল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া তথায় ইয়াহ্য়্যা (আঃ) ও ঈসা (আঃ)-এর সাক্ষাৎ পাইলাম ; তাঁহাদের উভয়ের নানী

পরস্পর ভগ্নি ছিলেন। জিব্রায়ীল আমাকে তাঁহাদের পরিচয় দানে সালাম করিতে বলিলেন। আমি তাঁহাদিগকে সালাম করিলাম। তাঁহারা আমার সালামের উত্তর প্রদানে সুযোগ্য ভ্রাতা সুযোগ্য নবী বলিয়া আমাকে খোশ-আমদেদ জানাইলেন।

তারপর জিব্রায়ীল আমাকে লইয়া তৃতীয় আসমানের দ্বারে পৌঁছিলেন এবং দরওয়াজা খুলিতে বলিলেন। তথায়ও পূর্ব্বের ন্যায় কথোপকথনের পর শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাইয়া দরওয়াজা খোলা হইল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া ইউসুফ (আঃ)-এর সাক্ষাৎ পাইলাম। জিব্রায়ীল আমাকে তাঁহার পরিচয় করাইয়া সালাম করিতে বলিলেন; আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি সালামের উত্তর দান করতঃ আমাকে সুযোগ্য ভ্রাতা ও সুযোগ্য নবী বলিয়া মোবারকবাদ জানাইলেন।

অতঃপর আমাকে লইয়া জিব্রায়ীল চতুর্থ আসমানের গেটে পৌঁছিলেন এবং গেট খুলিতে বলিলেন। সেখানেও পূর্ব্বের ন্যায় প্রশ্নোত্তরের পর শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানাইয়া দরওয়াজা খোলা হইল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমরা তথায় ইদ্রিস (আঃ)-এর সাক্ষাৎ পাইলাম। জিব্রায়ীল আমাকে তাঁহার পরিচয় করাইয়া সালাম করিতে বলিলেন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি সালামের উত্তর দিলেন এবং সুযোগ্য ভ্রাতা ও সুযোগ্য নবী বলিয়া আমাকে মারহাবা জানাইলেন।

অতঃপর জিব্রাইয়ীল আমাকে লইয়া পঞ্চম আসমানে পৌঁছিলেন এবং গেট খুলিতে বলিলেন। এই স্থানেও পূর্ব্বের ন্যায় প্রশ্নোত্তর চলার পর শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ দানের সহিত দরওয়াজা খোলা হইল। আমি ভিতরে পৌঁছিয়া হারুন (আঃ)-এর সাক্ষাৎ পাইলাম। জিব্রায়ীল আমাকে তাঁহার পরিচয় দানে সালাম করিতে বলিলেন। আমি সালাম করিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন এবং সুযোগ্য ভ্রাতা ও সুযোগ্য নবী বলিয়া আমাকে খোশ-আমদেদ জানাইলেন।

তারপর জিব্রায়ীল আমাকে লইয়া ষষ্ঠ আসমানের গেটে পৌঁছিলেন এবং গেট খুলিতে বলিলেন। এস্থানেও পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হইল। জিব্রায়ীল স্বীয় পরিচয় দান করিলেন, অতঃপর তাঁহার সঙ্গে কে আছে জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি বলিলেন, মোহাম্মদ (দঃ); বলা হইল, তাঁহাকেই ত নিয়া আসিবার জন্য আপনাকে পাঠান হইয়াছিল? জিব্রায়ীল বলিলেন, হাঁ। তৎক্ষণাৎ শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানাইয়া দরওয়াজা খোলা হইল। তথায় প্রবেশ করিয়া মূছা (আঃ)-এর সাক্ষাৎ পাইলাম। জিব্রায়ীল আমাকে তাঁহার পরিচয় জ্ঞাত করিয়া সালাম করিতে বলিলেন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি সালামের উত্তর প্রদান করিলেন এবং সুযোগ্য ভ্রাতা ও সুযোগ্য নবী বলিয়া আমাকে মোবারকবাদ জানাইলেন।

যখন আমি এই এলাকা ত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিলাম তখন মূছা (আঃ) কাঁদিলেন। তাঁহাকে কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আমি

কাঁদিতেছি এই কারণে যে, আমার উম্মতে বেহেশত লাভকারীর সংখ্যা এই নবীর উম্মতের বেহেশত লাভকারীর সংখ্যা অপেক্ষা কম হইবে, অথচ তিনি বয়সের দিক দিয়া যুবক এবং দুনিয়াতে প্রেরিত হইয়াছেন আমার পরে।

তারপর জিব্রায়ীল আমাকে লইয়া সপ্তম আসমানের প্রতি আরোহণ করিলেন এবং উহার দ্বারে পৌঁছিয়া গেট খুলিতে বলিলেন। এস্থানেও পূর্ব্বের ন্যায় সকল প্রশ্নোত্তরই হইল এবং দরওয়াজা খুলিয়া শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান হইল। আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম, তথায় ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ হইল। জিব্রায়ীল আমাকে বলিলেন, তিনি আপনার (বংশের আদি) পিতা, তাঁহাকে সালাম করুন। আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন এবং সুযোগ্য পুত্র ও সুযোগ্য নবী বলিয়া মারহাবা ও মোবারকবাদ জানাইলেন।

.........ثُمَّ رُفِعْتُ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيَلَةِ قَالَ هٰذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَقُلْتُ مَا هٰذَانِ يَا جِبْرَئِيلُ قَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ - ثُمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ وَإِنَاءٍ مِنْ عَسَلٍ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ هِيَ الْفِطْرَةُ أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ - ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوٰتُ خَمْسِينَ صَلٰوةً كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ بِمَا أُمِرْتَ قَالَ أُمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلٰوةً كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ صَلٰوةً كُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي وَاللّٰهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ - فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ

فَوَضَعَ عَنِّى عَشْرًا فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ مِثْلَهٗ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّى
عَشْرًا فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ مِثْلَهٗ فَرَجَعْتُ فَاُمِرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ
كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهٗ فَاُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ
اِلٰى مُوْسٰى فَقَالَ بِمَا اُمِرْتَ قُلْتُ اُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ -
قَالَ اِنَّ اُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيْعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَاِنِّىْ قَدْ جَرَّبْتُ
النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ اِلٰى
رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيْفَ لِاُمَّتِكَ قَالَ سَأَلْتُ رَبِّىْ حَتّٰى اسْتَحْيَيْتُ
وَلٰكِنِّىْ اَرْضٰى وَاُسَلِّمُ قَالَ فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادٰى مُنَادٍ اَمْضَيْتُ
فَرِيْضَتِىْ وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِىْ -

অতঃপর আমি ছিদ্‌রাতুল-মোন্‌তাহার -নিকট উপনীত হইলাম। (উহা এত বড় প্রকাণ্ড কূল বৃক্ষবিশেষ যে,) উহার এক একটা কূল "হজর" অঞ্চলে তৈরী (বড় বড়) মটকার ন্যায় এবং উহার পাতা হাতীর কানের ন্যায়। জিব্রায়ীল আমাকে বলিলেন, এই বৃক্ষটির নাম "ছিদ্‌রাতুল-মোন্‌তাহা"। তথায় চারিটি প্রবাহমান নদী দেখিতে পাইলাম—দুইটি ভিতরের দিকে এবং দুইটি বাহিরের দিকে। নদীগুলি সম্পর্কে আমি জিব্রায়ীলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন, ভিতরের দিকে দুইটি বেহেশতে প্রবাহমান (ছাল্‌ছাবীল ও কাওছার নামক) দুইটি নদী এবং বাহিরের দিকে প্রবাহমান দুইটি হইল (ভূ-পৃষ্ঠের মিশরে প্রবাহিত) নীল নদ ও (ইরাকে প্রবাহিত) ফোরাত বা ইউফ্রেটিস নদীর উৎস।

তারপর আমাকে "বাইতুল-মা'মুর" পরিদর্শন করান হইল। তথায় প্রতিদিন (এবাদতের জন্য) সত্তর হাজার ফেরেশতা উপস্থিত হইয়া থাকেন; (যে দল একদিন সুযোগ পায় সেই দল চিরকালের জন্য দ্বিতীয় দিন সুযোগ প্রাপ্ত হয় না)।

অতঃপর (আমার সৃষ্টিগত স্বভাবের স্বচ্ছতা ও নির্ম্মলতা প্রকাশ করিয়া দেখাইবার উদ্দেশ্যে পরীক্ষার জন্য) আমার সম্মুখে তিনটি পাত্র উপস্থিত করা হইল—একটিতে ছিল সুরা বা মদ, অপরটিতে ছিল দুগ্ধ, আর একটিতে ছিল মধু। আমি দুগ্ধের

পাত্রটি গ্রহণ করিলাম। জিব্রায়ীল বলিলেন, দুগ্ধ সত্য ও খাঁটি স্বভাবগত ধর্ম্ম ইসলামের স্বরূপ ; (সুতরাং আপনি দুগ্ধের পাত্র গ্রহণ করিয়া ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন যে,) আপনি সত্য ও স্বভাবগত ধর্ম্ম ইসলামেরই উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং আপনার অছিলায় আপনার উম্মতও উহারই উপর থাকিবে।*

তারপর আমার শরীয়তে প্রত্যেক দিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরজ হওয়ার বিধান করা হইল। আমি ফিরিবার পথে মূছা (আঃ)-এর নিকটবর্ত্তী পথ অতিক্রম করা কালে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশেষ আদেশ কি লাভ করিয়াছেন ? আমি বলিলাম, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায। মূছা (আঃ) বলিলেন, আপনার উম্মৎ প্রতিদিন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায় করিয়া যাইতে সক্ষম হইবে না। আমি সাধারণ মানুষের স্বভাব সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি এবং বনী ইস্রায়ীলগণকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়াছি ; সুতরাং আপনি পরওয়ারদেগারের দরবারে আপনার উম্মতের জন্য এই আদেশকে আরও সহজ করার আবেদন করুন।

হযরত (দঃ) বলেন, আমি পরওয়ারদেগারের খাছ দরবারে ফিরিয়া গেলাম। পরওয়ারদেগার (দুইবারে পাঁচ পাঁচ করিয়া) দশ ওয়াক্ত কম করিয়া দিলেন। অতঃপর আমি আবার মুছার নিকট পৌছিলে তিনি পুর্ব্বের ন্যায় পরামর্শই আমাকে দিলেন। আমি পরওয়ারদেগারের দরবারে ফিরিয়া গেলাম এইবারও (ঐরূপে) দশ ওয়াক্ত কম করিয়া দিলেন। পুনরায় মূছার নিকট পৌছিলে তিনি আমাকে এইবারও সেই পরামর্শই দিলেন। আমি পরওয়ারদেগরের দরবারে ফিরিয়া গেলাম এবং (পূর্ব্বের ন্যায়) দশ ওয়াক্ত কম করিয়া দিলেন। এইবারও মুছার নিকট পৌছিলে পর তিনি আমাকে পূর্ব্বের ন্যায় পরামর্শ দিলেন। আমি পরওয়ারদেগারের দরবারে ফিরিয়া গেলাম এইবার আমার জন্য প্রতি দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। এইবারও মূছার নিকট পৌছিলে পর আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি আদেশ লাভ করিয়াছেন ? আমি বলিলাম, প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ প্রদান করা হইয়াছে।

মূছা (আঃ) বলিলেন, আপনার উম্মৎ প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেরও পাবন্দি করিতে পারিবে না। আমি আপনার পুর্ব্বেই সাধারণ মানুষের স্বভাব সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি এবং বনী ইস্রায়ীলগণকে অনেক পরীক্ষা করিয়াছি ; আপনি আবার পরওয়ারদেগারের দরবারে ফিরিয়া আরও কম করার আবেদন জানান।

* মদ ও দুগ্ধপাত্র উপস্থিত করার পরীক্ষার সম্মুখীন হযরত (দঃ) এই ঘটনায় দুইবার হইয়াছিলেন, একবার প্রথমে—যখন বাইতুল মোকাদ্দাসে পৌছিয়াছিলেন তখন ; যাহার উল্লেখ সম্মুখের এক হাদীছে আসিতেছে। দ্বিতীয়বার উর্দ্ধ জগতে যাহার উল্লেখ এস্থানে হইয়াছে।

হযরত (দঃ) বলেন, আমি মূছাকে বলিলাম, পরওয়ারদেগারের দরবারে অনেকবার আসা-যাওয়া করিয়াছি ; এখন আবার যাইতে লজ্জা বোধ হয়, আর যাইবনা বরং পাঁচ ওয়াক্তের উপরই সন্তুষ্ট রহিলাম এবং উহাকেই বরণ করিয়া নিলাম। হযরত (দঃ) বলেন, অতঃপর যখন আমি ফিরার পথে অগ্রসর হইলাম তখন আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে একটি ঘোষণা জারি করা হইল—(বান্দাদের প্রাপ্য তথা ছওয়াবের দিক দিয়া) "আমার নির্দ্ধারিত সংখ্যা (পঞ্চাশ)কে বাকি রাখিলাম, (আমার পক্ষে আমার বাক্য অপরিবর্ত্তিতই থাকিবে ৪১৭ ও ৪৫৫ পৃষ্ঠার হাদীছ দ্রষ্টব্য) অবশ্য কর্ম্মক্ষেত্রে বন্দাদের পক্ষে সহজ ও কম করিয়া দিলাম। (অর্থাৎ কর্ম্মক্ষেত্রে পাঁচ ওয়াক্ত রহিল, কিন্তু ছওয়াবের দিক দিয়া পাঁচই পঞ্চাশ পরিগণিত হইবে।) প্রতি একটি নেক আমলে দশ গুণ ছওয়াব দান করিব।

মে'রাজ শরীফের বর্ণনার হাদীছ বোখারী (রঃ) মে'রাজের পরিচ্ছেদ ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে ঐ সব হাদীছের অনুবাদ দেওয়া হইল।

১৮০১। হাদীছঃ—(৫০ পৃঃ) আনাছ (রাঃ) ছাহাবী হইতে বর্ণিত আছে, আবুজর (রাঃ) হাদীছ বয়ান করিয়াছেন—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমি মক্কায় থাকাকালীন একদা রাত্রে আমি যেই ঘরে শায়িত ছিলাম সেই ঘরের ছাদ খুলিয়া গেল, অতঃপর ঐ পথে জিব্রায়ীল (আঃ) অবতরণ করিলেন। (আমাকে ঐ ঘর হইতে কা'বাগৃহের নিকটবর্ত্তী নিয়া আসা হইল।) তারপর আমার বক্ষ খুলিয়া উহাকে জমজমের পানি দ্বারা ধৌত করা হইল এবং একটি স্বর্ণ পাত্র উপস্থিত করা হইল যাহা পরিপক্ক সত্যিকা'র জ্ঞান ও ঈমান বর্দ্ধক বস্তুতে পরিপূর্ণ ছিল ; উহা আমার বক্ষের ভিতরে ঢালিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর (ঘটনা প্রবাহের মধ্যে) জিব্রায়ীল (আঃ) আমার সঙ্গে হাত ধরিয়া থাকিয়া আমাকে লইয়া আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন। নিকটবর্ত্তী (তথা প্রথম) আসমানের দ্বারে পৌঁছিয়া জিব্রায়ীল (আঃ) আসমানের পাহারাদারকে দরওয়াজা খুলিতে বলিলেন। তখন পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হইল। জিব্রায়ীল (আঃ) স্বীয় পরিচয় দান করিলেন। পাহারাদার জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সঙ্গে কেহ আছেন কি ? জিব্রায়ীল বলিলেন, হাঁ—আমার সঙ্গে আছেন মোহাম্মদ (দঃ)। পাহারাদার বলিলেন, তাঁহার নিকটইত (আপনাকে) পাঠান হইয়াছিল ? জিব্রায়ীল বলিলেন, হাঁ।

অতঃপর যখন আমরা ঐ আসমানে পৌঁছিলাম দেখিতে পাইলাম, একজন লোক বসিয়া আছেন—তাঁহার ডানদিকে একদল লোক এবং বাম দিকে আর এক দল লোক। ঐ লোকটি যখন তাঁহার ডান দিকে তাকান হাসিয়া উঠেন এবং যখন বাম দিকে তাকান তখন কাঁদিয়া উঠেন। হযরত (দঃ) বলেন, ঐ লোকটি আমাকে "সুযোগ্য নবী ও সুযোগ্য পুত্র" বলিয়া স্বাগত জানাইলেন এবং জিব্রায়ীলের নিকট হইতে

তাঁহার পরিচয়ও পাইলাম। জিব্রায়ীল বলিয়াছেন যে, তিনি হইলেন আদম (আ:); তাঁহার ডান-বাম দিকের আকৃতিগুলি তাঁহার বংশধরগণের রূহ্ বা আত্মাসমূহ। ডান দিকেরগুলি যাহারা বেহেশ্ত লাভ করিবে এবং বাম দিকেরগুলি যাহারা দোযখবাসী হইবে; অতএব কারণে তিনি ডান দিকে তাকাইলে (আনন্দে) হাসিয়া উঠেন এবং বাম দিকে তাকাইলে (অনুতাপ ও আক্ষেপে) কাঁদিয়া উঠেন।

১৮০২। হাদীছ :— أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ - ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى أَتَى بِي السِّدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ -

অর্থ—ইবনে আব্বাস (রা:) ও আবু হাব্বাহ্ আনছারী (রা:) উভয়ে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী (দ:) ফরমাইয়াছেন, সপ্ত আসমানের পরিভ্রমণ করার পর আমাকে মহাউর্দ্ধে আরোহিত করা হইল; আমি এক সুসমতল ময়দানে পৌঁছিলাম; তথায় শুধুমাত্র কলম বা লেখনী চালনার শব্দ শুনা যাইতেছিল।

অত:পর আমাকে লইয়া জিব্রায়ীল আরও অগ্রসর হইলেন এবং ছিদরাতুল-মোন্‌তাহার নিকটবর্ত্তী পৌঁছিলেন; ঐ সময় ছিদ্‌রাতুল-মোন্‌তাহাকে বিভিন্ন বর্ণের রঙ্গমালা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল। উহা যে কি ছিল তাহার সঠিক তথ্য আমি তলাইয়া দেখি নাই। তারপর আমাকে বেহেশতের ভিতরে প্রবেশ করান হইল। উহার গুম্বুজ সমূহ মুক্তা দ্বারা তৈরী ছিল এবং উহার জমিন ছিল মোশ্‌ক্ বা কস্তুরীর।

ব্যাখ্যা :— সমস্ত সৃষ্ট-জগৎ পরিচালনার ভার ফেরেশতাদের উপর অর্পিত রহিয়াছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে তাঁহাদের প্রতি নির্দ্দেশাবলী আসিতে থাকে। সেই সব লেখার কেন্দ্রই ছিল উক্ত সুসমতল ময়দানটি যাহার পরিদর্শনে হযরত (দ:) তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। ছিদ্‌রাতুল-মোন্‌তাহাকে আচ্ছাদনকারী রঙ্গমালা কি ছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বয়ান মোছলেম শরীফের এক হাদীছে উল্লেখ আছে যে, উহা ছিল فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ—স্বর্ণদেহী পতঙ্গ সমূহ।

অন্য আর এক হাদীছে উল্লেখ আছে, (মে'রাজ উপলক্ষে) বহু সংখ্যক ফেরেশতার এক দল আল্লাহ তায়ালার দরবারে আবেদন করিয়াছিলেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দর্শন লাভের। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদিগকে অনুমতি দিয়া

দিলেন, সেমতে তাঁহারা ছিদ্‌রাতুল-মোন্‌তাহার নিকটে হযরতের উপস্থিতিকে লক্ষ্য করিয়া উহার উপর ভীড় জমাইয়াছিলেন। (তফছীর রুহুল-মায়া'নী ২৭—৫১)

সম্ভবতঃ ঐ ফেরেশতাগণই স্বর্ণদেহী পতঙ্গের আকৃতিতে ঝাঁক বাঁধিয়া ছিদ্‌রাতুল-মোন্‌তার উপর পতিত ছিলেন। উহাই অন্য এক হাদীছে আছে—নবী (দঃ) বলিয়াছেন, আমি ছিদ্‌রাতুল-মোন্‌তাহার প্রতিটি পাতায় এক একজন ফেরেশতা আল্লাহ তায়ালার তছবীহ—"ছোবহানাল্লাহ" পাঠরত দেখিয়াছি। (তফছীর রুহুল-মায়া'নী ২৭—৫১)

এতদ্ভিন্ন নিরাকার নিরাধার আল্লাহ তায়ালার নূরের তাজাল্লী বা বিকাশও ছিদ্‌রাতুল-মোন্‌তাহাকে সুসজ্জিত করিয়াছিল যেই নূরের সামান্যতম তাজাল্লী বা বিকাশ হযরত মূছার সম্মুখে তূর পর্ব্বতের উপর হইয়াছিল এবং উহাই ভূমিকা ছিল আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভের যাহার আকাঙ্খা হযরত মূছা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই নূরের তাজাল্লী ও বিকাশে তূর পর্ব্বত স্থির থাকিতে পারে নাই, ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং হযরত মূছাও ঠিক থাকিতে পারেন নাই, চেতনা হারাইয়া বেহুশরূপে ধরাশায়ী হইয়া গিয়াছিলেন; ফলে হযরত মূছা আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভের আকাঙ্খা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। (বিস্তারিত বিবরণ ৪র্থ খণ্ড হযরত মূছার বয়ান)

পক্ষান্তরে সেই নূর ও ভূমিকা দর্শনের সুযোগই এই স্থানে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রদান করা হইয়াছিল। এস্থলে সেই নূর বিকাশনের বাহক বা স্থান ছিদ্‌রাতুল-মোন্‌তাহাও স্থির রহিয়াছিল এবং উহার দর্শক মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)ও সম্পূর্ণ সুস্থ সচেতন ছিলেন। পবিত্র কোরআনেরই বর্ণনা—مازاغ البصر وما طغى "তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ও উপলব্ধি শক্তি স্বতেজ ও সুষ্ঠু ছিল; বিন্দুমাত্র অতিক্রম-ব্যতিক্রম ঘটে নাই

তাই বলা হয়, আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভের ভূমিকায়ই মূছা (আঃ) স্থিরতা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে বলা হইয়াছিল, لن ترانى "এই অবস্থায় আমার দর্শন লাভ আপনার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হইবে না।" পক্ষান্তরে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) মে'রাজ উপলক্ষে স্বীয় দৃষ্টিশক্তি ও উপলব্ধিশক্তি স্বতেজ সুষ্ঠু রাখিয়া আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, ফলে তিনি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার দিদার বা দর্শনও লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

হযরতের আগমন উপলক্ষে যে ছিদ্‌রাতুল-মোন্‌তাহার উপর আল্লাহ তায়ালার নূরের তাজাল্লী বা বিকাশ হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ হাদীছেও আছে এবং সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ী হাছান বছরী (রঃ)ও উহার উল্লেখ করিয়াছেন। (রুহুল-মায়া'নী ২৭—৫১)

১৮০৩। হাদীছ:—(৪৮১ পৃঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মে'রাজ-ভ্রমণের রাত্রে আমি মূছা (আঃ)কে দেখিয়াছি। তাঁহার দেহ প্রশস্ততায় মধ্যম আকারের

ছিল। (তিনি দীর্ঘ কায়ার শ্যামলা রঙ্গের ছিলেন।) তাঁহার মাথার চুল সোজা ছিল কোঁকড়ানো ছিল না। তাঁহার দৈহিক আকৃতি "শানুয়া" গোত্রীয় লোকদের ন্যায় ছিল। ঈসা (আঃ)কেও দেখিয়াছি। তিনি ছিলেন মধ্যম কায়া-বিশিষ্ট এবং রং ছিল গোরা, তিনি এমন পরিচ্ছন্ন দেখাইতে ছিলেন যেন তিনি এখনই গোছল করিয়া আসিয়াছেন। (তাঁহার মাথার চুল কিছুটা কোঁকড়ানো।) ইব্রাহীম (আঃ)কে দেখিয়াছি, আমার আকৃতি তাঁহার আকৃতির সর্ব্বাধিক নিকটতম। তারপর আমার সম্মুখে (পরীক্ষা স্বরূপ) দুইটি পাত্রও উপস্থিত করা হইয়াছিল—একটিতে দুগ্ধ অপরটিতে সুরা বা মদ। আমাকে বলা হইয়াছিল, যেইটাই আপনার ইচ্ছা পান করুন। (তখন মদ হারাম ছিল না।) আমি দুগ্ধের পাত্রটি গ্রহণ করিলাম এবং দুগ্ধ পান করিলাম। তখন বলা হইল, আপনি সঠিক সত্য ও স্বভাবগত ধর্ম্ম ইসলামের স্বরূপ—দুগ্ধকে গ্রহণ করিয়াছেন; (ইহার প্রতিক্রিয়ায় আপনার উম্মত এই ধর্ম্মকেই অবলম্বন করিবে।) পক্ষান্তরে যদি আপনি (সকল প্রকার গোমরাহী ও ব্যভিচারের মূল) মদের পাত্র গ্রহণ করিতেন তবে উহার প্রতিক্রিয়ায় আপনার উম্মত সেই পথের পথিক হইয়া গোমরাহ হইত। (এতদ্ভিন্ন হযরত (দঃ) দোযখের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ফেরেশতা "মালেক" এবং দজ্জালের উল্লেখও করিয়াছেন।)

ব্যাখ্যা—হযরত রসুলে করীমের সম্মুখে মদের পেয়ালা ও দুগ্ধের পেয়ালা উপস্থিত করিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং সেই পরীক্ষার ভাল ও মন্দ ফলাফল সম্পর্কেও ফেরেশতা জিব্রায়ীল ইঙ্গিত দান করিয়াছেন। ১৮০০ নং হাদীছে ভাল ফলটির উল্লেখ হইয়াছে যে, দুগ্ধ হইল সকলের পক্ষে স্বভাবগত আকর্ষণীয় বস্তু এবং অতি উত্তম বস্তু, উহাকে খাঁটী সত্য ও স্বভাবগত ধর্ম্ম ইসলামের স্বরূপ ও প্রতীক সাব্যস্ত করা হইয়াছিল; সুতরাং আপনি আপনার সমগ্র উম্মতের প্রধান হইয়া উহাকে গ্রহণ করার প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব আপনার নিম্নস্থদের তথা উম্মতগণের উপর এই হইবে যে, তাহারাও সেই খাঁটী সত্য ধর্ম্ম ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। আলোচ্য হাদীছে উহার বিপরীত মন্দ ফলের উল্লেখ হইয়াছে যে, মদ হইল সব রকম গোমরাহী ও ব্যভিচারের মূল; উহাকে গোমরাহী ও ব্যভিচারের পথের স্বরূপ ও প্রতীক সাব্যস্ত করা হইয়াছিল; সুতরাং আপনি সমগ্র উম্মতের মুরব্বি ও প্রধান হইয়া যদি উহাকে গ্রহণ করিতেন তবে স্বাভাবিকরূপে উহার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া উম্মতগণের উপর এই হইত যে, তাহারাও গোমরাহীর পথের পথিক হইত।

এই ফলাফলের সূত্র অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু অপরিহার্য্য ও বাস্তব এবং বিশেষ উপদেশ মূলক। বর্ত্তমানেও আমরা জাতীয় জীবনের শত শত ব্যাপারে উপরস্থ নেতা, কর্ত্তা ও প্রধানদের ক্রিয়া-কলাপ এবং স্বভাব-চরিত্রের যে প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া দেখি তাহা উক্ত সূত্রের সহিত বিশেষ সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমাদের নেতা ও প্রধানগণ এই উপদেশের

দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ না করায় সর্ব্বসাধারণের অবৈধ ক্রিয়া-কলাপের গোনাহের সমপরিমাণ বোঝা তাহাদের ঘাড়েও চাপিবে।

১৮০৪। হাদীছ :—(৪৫৯ পৃ:) আবুল আ'লিয়া (রঃ) বলেন, বিশ্ব-মোছলেমের নবীর পিতৃব্য-পুত্র ইবনে আব্বাস (রাঃ) স্বয়ং হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, আমি মে'রাজ উপলক্ষে মূছা (আঃ)কে দেখিয়াছি। তিনি ছিলেন গোধূম বা শ্যামলা বর্ণের লম্বা কায়াবিশিষ্ট মানুষ ; তাঁহার দেহ পাকা-পোক্ত "—শানুয়া" গোত্রীয় লোকের ন্যায়। ঈসা (আঃ)কেও দেখিয়াছি ; তিনি ছিলেন মধ্যম কায়াবিশিষ্ট, তাঁহার অঙ্গ সমূহ অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তিনি সাদা ও লাল মিশ্রিত গৌর বর্ণের ছিলেন, মাথার চুল প্রায় সোজা ছিল।

এতদ্ভিন্ন আমি দোযখের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মালেককেও দেখিয়াছি এবং দজ্জালকেও দেখিয়াছি। এই সব ছিল বড় বড় নিদর্শন সমুহের অন্তর্ভুক্ত যাহা আল্লাহ তায়ালা আমাকে দেখাইয়াছেন (বলিয়া পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে।)

বায়তুল-মোকাদ্দছে উপস্থিতি ঃ

মে'রাজের ঘটনায় হযরত (দঃ) সরাসরি মক্কা হইতে আসমানের দিকে যান নাই ; মক্কা হইতে বিদ্যুতগতি বোরাকে আরোহণ পূর্ব্বক প্রথমে বাইতুল-মোকাদ্দাছে পৌঁছিয়াছিলেন যাহার উল্লেখ নিম্নে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে।

১৮০৫। হাদীছ :—(৬৮৪ পৃঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মে'রাজ-ভ্রমণ রাত্রে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বাইতুল-মোকাদ্দাসে উপনীত হইলে পর তাঁহার সম্মুখে দুইটি পাত্র উপস্থিত করা হইল। একটি সুরা বা মদের, দ্বিতীয়টি দুগ্ধের। হযরত (দঃ) উভয় পাত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ; (তখন মদ হারাম ছিল না, কিন্তু হযরত উহার পাত্র ছুঁইলেনও না,) এবং দুগ্ধের পাত্রটি গ্রহণ করিলেন। এতদৃষ্টে জিব্রায়ীল (আঃ) বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লার যিনি আপনাকে সত্য ও স্বাভাবিক ধর্ম্ম ইসলামের স্বরূপ তথা দুধের প্রতি ধাবিত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে যদি আপনি মদের পাত্র গ্রহণ করিতেন তবে উহার প্রতিক্রিয়ায় আপনার উম্মত গোমরাহী ও ব্যভিচারে পতিত হইত।

ব্যাখ্যা—একই বিষয়ের পরীক্ষা সাধারণভাবেও একাধিকবার হইয়া থাকে। আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত পরীক্ষাটির সম্মুখীনও হযরত (দঃ) দুইবার হইয়াছিলেন। একবার ভূপৃষ্ঠে বাইতুল-মোকাদ্দাসে পৌঁছিয়া, দ্বিতীয়বার উর্দ্ধ জগতে পৌঁছিয়া সপ্তম আকাশ পার হওয়ার পর—যাহার উল্লেখ ১৫৯৯ নং ও ১৬২০ নং হাদীদে হইয়াছে। এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণে মোছলেম শরীফের একটি হাদীছ এই—

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, (মে'রাজ উপলক্ষে) আমার জন্য বোরাক উপস্থিত করা হইল।

উহার রং সাদা, গাধা অপেক্ষা বড় খচ্চর অপেক্ষা ছোট, উহার পদক্ষেপ তাহার দৃষ্টির শেষ সীমায় পৌঁছাইতে সক্ষম। সেই দ্রুতগামী যানবাহনে আমি আরোহণ করিলাম এবং বাইতুল মোকাদ্দাস-মসজিদে পৌঁছিলাম। সেই মসজিদের নিকটবর্ত্তী লোহার কড়ি-বিশেষ একটি ছিদ্রযুক্ত পাথর ছিল যাহার সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণ এই মসজিদে আসিলে নিজ যানবাহন বাঁধিয়া থাকিতেন। হযরত (দঃ) বলেন, আমিও বোরাককে উহার সহিতই বাঁধিলাম এবং মসজিদে দুই রাকাত নামাজ পড়িলাম।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মে'রাজের রাত্রির ভোরবেলা যখন লোকদের নিকট ঘটনা প্রকাশ করিলেন তখন তিনি প্রথমে ঘটনার এই অংশটুকুই বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, আমি অদ্য রাত্রে বাইতুল-মোকাদ্দাস মসজিদে গিয়াছিলাম এবং এই রাত্রেই ফিরিয়া আসিয়াছি।* আবু জহল ইত্যাদি কাফেররা এতটুকু শুনিয়াই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতে লাগিল, কারণ সাধারণভাবে মক্কা হইতে বাইতুল মোকাদ্দাস দীর্ঘ এক মাসের পথ; আসা-যাওয়ায় দুই মাস ব্যয় হওয়া আবশ্যক। কাফেররা এই ব্যাপারে হযরতের পরীক্ষা লওয়ার জন্য কা'বা গৃহের নিকটে জমায়েত হইল এবং বাইতুল-মোকাদ্দাসের বিভিন্ন চিজ-বস্তু সম্পর্কে খুটিনাটি প্রশ্ন করিতে লাগিল। হযরত (দঃ) বিভ্রাটে পড়িলেন, কারণ এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ খুটিনাটির খোঁজ কে লইয়া থাকে, কিন্তু আল্লার মহিমা ও তাঁহার বিশেষ ব্যবস্থায় হযরত (দঃ) তাহাদের সকল প্রশ্নেরই উত্তর দিতে সক্ষম হইলেন।

১৮০৬। হাদীছ :— (৬৮৪ পৃঃ) عن جابر رضى الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبنى قريش (حين اسرى بى الى بيت المقدس) قمت فى الحجر فجلى الله لى بيت المقدس فطفقت اخبرهم عن اياته وانا انظر اليه -

অর্থ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বিবৃতি শুনিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন, (মে'রাজ উপলক্ষে) রাত্রি বেলায় বাইতুল-মোকাদ্দাস পরিভ্রমণের কথা যখন আমি কোরায়েশগণের নিকট প্রকাশ

---

* কাফেরগণ উর্দ্ধ জগতের বস্তুনিচয়ের সঙ্গে পরিচিত ছিল না, বাইতুল-মোকাদ্দাসের সঙ্গে ভালরূপেই পরিচিত ছিল, তাই হযরত (দঃ) তাহাদের সম্মুখে বাইতুল-মোকাদ্দাস ভ্রমণের অংশটুকুরই উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহাতেই তিনি তাহাদের বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। পবিত্র কোরআনও সেই কাফেরদের বিরোধিতার প্রতিবাদেই শুধু বাইতুল-মোকাদ্দাস ভ্রমণের অংশটুকুরই উল্লেখ করিয়াছে। অবশ্য ছুরা-নজমে পূর্ণ ঘটনার উপরেও আলোকপাত করিয়াছে।

করিলাম এবং তাহারা আমার কথা অবিশ্বাস (করিয়া আমাকে পরীক্ষা) করিতে চাহিল, তখন আমি পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া কা'বা গৃহের উন্মুক্ত অংশ হাতিমের মধ্যে সকলের সম্মুখে দাঁড়াইলাম। আল্লাহ তায়ালা বাইতুল-মোকাদ্দাস গৃহকে আমার সম্মুখে সুস্পষ্টরূপে উদ্ভাসিত করিয়া দিলেন। আমি কাফেরদের প্রশ্নের উত্তরে বাইতুল-মোকাদ্দাছের নিদর্শন সমূহ দেখিয়া দেখিয়া বর্ণনা করিলাম।

ব্যাখ্যা—বর্ত্তমান "টেলিভিশন" যুগে হাদীছের বাস্তবতা অতি সহজ। যদিও বাইতুল-মোকাদ্দাস গৃহ মক্কা হইতে বহু দূরে এবং অনেক পাহাড় পর্ব্বতের আড়ালে অবস্থিত,কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার পক্ষে যান্ত্রিক সাহায্য ব্যতিরেকে ঐকাজ মোটেই কঠিন নহে যে কাজ মানুষ টেলিভিশন যন্ত্রের সাহায্যে করিতে পারিয়াছে।

মে'রাজ উপলক্ষে হুযরত (দঃ) কি কি পরিদর্শন করিয়াছেন ঃ

পূর্ব্বের বর্ণিত হাদীছ সমূহে উল্লেখ হইয়াছে যে, হযরত (দঃ) মে'রাজ উপলক্ষে (১) সাত আসমান (২) পূর্ব্ববর্ত্তী বিশিষ্ট নবীগণ (৩) বাইতুল মা'মুর (৪) ছিদ্‌রাতুল মোন্‌তাহা (৫) সুসমতল ময়দান (৬) বেহেশত (৭) দোযখের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা "মালেক" (৮) দাজ্জাল ইত্যাদি দেখিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক কিছু পরিদর্শন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন হাদীছে বিশেষ বিশেষ আরও বস্তুনিচয়ের উল্লেখ আছে। আমরা এস্থানে কতিপয় হাদীছ "আল্‌-খাছায়েছুল-কোবরা" কেতাব হইতে উল্লেখ করিতেছি।

হাওজে কাওছার ঃ (১) আনাছ (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীছে আছে—হযরত (দঃ) বলেন, অতঃপর জিব্রায়ীল আমাকে সপ্তম আসমানে লইয়া গেলেন। তথায় আমি একটি প্রবাহমান জলাশয়ের নিকট পৌছিলাম—যাহার উভয় কূলে (আরাম উপভোগের জন্য) মতি এবং হিরা ও ইয়াকুত পাথরের তৈরী কুঠি বা বাংলাসমূহ ছিল এবং ঐনহরের মধ্যে অতি সুন্দর সুন্দর পাখীও ছিল ; ঐরূপ সুন্দর পাখী আর কোথাও দেখি নাই। জিব্রায়ীলকে বলিলাম, পাখীগুলি বড়ই সুন্দর। জিব্রায়ীল বলিলেন, যে সব লোক এই সব পাখী উপভোগ করিবেন তাঁহারা অধিক উত্তম হইবেন। অতঃপর জিব্রায়ীল আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি জানেন কি ইহা কোন নহর ? আমি বলিলাম, জানি না। তিনি বলিলেন, ইহাই হইল "কাওছার" আল্লাহ তায়ালা শুধু আপনাকেই দান করিয়াছেন। তখন আমি অধিক আগ্রহের সহিত উহা পরিদর্শন করিলাম। সেখানে সুসজ্জিতরূপে স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রসমূহ ছিল, হিরা-মাণিক্য,মণি-মুক্তার কাঁকর ঐ নহরের তলদেশে বিছান ছিল—যাহার উপর দিয়া পানি প্রবাহমান। উহার পানি দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক সাদা। তথায় সাজান গ্লাসগুলি হইতে আমি একটি গ্লাস লইয়া ঐ পানি পান করিলাম—উহা মধু অপেক্ষা অধিক মিষ্ট এবং কস্তুরী অপেক্ষা অধিক সুগন্ধী।

(২) আবু ছায়ীদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, মে'রাজ ভ্রমণে আমি হাওজে-কাওছারের নিকটবর্ত্তী গমন কালে জিব্রায়ীল বলিলেন, ইহাই হাওজে-

কাওছার যাহা আল্লাহ তায়ালা আপনাকে বিশেষ রূপে দান করিয়াছেন। হযরত (দঃ) বলেন, আমি উহার মাটি হাতে লইয়া দেখিলাম, তাহা অত্যধিক সুগন্ধময় কস্তরী।

আ'রশ ঃ আবুল হাম্‌রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মে'রাজ ভ্রমণে সপ্তম আসমানের পর আরশের নিকট পৌছিয়া দেখিলাম উহার খাম্বায় লিখিত আছে--লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ।

দোযখ ঃ ছোহায়েব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, মে'রাজের ঘটনায় পরীক্ষামূলক ভাবে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে পানি তারপর মদ ও দুগ্ধের পাত্র পেশ করা হইলে তিনি দুগ্ধের পাত্র গ্রহণ করিলেন। তখন জিব্রায়ীল বলিলেন, আপনি সঠিক সত্য ও খাঁটী স্বভাবগত ধর্ম্ম ইস্‌লামের স্বরূপ ও প্রতীক বস্তুকে গ্রহণ করিয়াছেন; এই বস্তুটি প্রত্যেক প্রাণীর স্বাভাবিক খাদ্য। পক্ষান্তরে যদি আপনি মদের পাত্র গ্রহণ করিতেন তবে উহা আপনার ও আপনার উম্মতের পক্ষে ভ্রষ্টতার দিনর্শন হইত এবং ঐস্থানে বসবাসকারী হইতে বাধ্য হইতেন। এই বলিয়া ঐ প্রান্তের প্রতি ইশারা করিলেন যেই প্রান্তে জাহান্নাম অবস্থিত। হযরত (দঃ) দেখিলেন, জাহান্নামের ভয়ঙ্কর অগ্নিশিখা উত্তেজিত আকারে লেলিহানরূপে উত্থিত হইতেছে।

পরজগতের সমুদয় বস্তুনিচয় ঃ

হোযায়ফা (রাঃ) নবী ছাল্লল্লোহু আলাইহে অসাল্লামের মে'রাজের ঘটনা বর্ণনায় বলিয়াছেন, সপ্ত আসমান ভ্রমণ করা পর্য্যন্ত "বোরাক" সব সময়ই হযরতের সঙ্গেই ছিল। অতঃপর হযরত (দঃ) বেহেশতও পরিদর্শন করিয়াছেন, দোযখও পরিদর্শন করিয়াছেন এবং আখেরাত বা পরজগতের যত কিছু চিজ-বস্তু সম্পর্কে বর্ণনা দান করা হইয়াছে উহার সবই হযরত (দঃ) পরিদর্শন করিয়াছেন। তারপর ভূপৃষ্ঠে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

গিবৎ বা পরনিন্দার আজাব ঃ

আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মে'রাজ উপলক্ষে আমি একদল লোকের নিকটবর্ত্তী পথ অতিক্রম করিলাম যাহাদের হাতে শিশার তৈরী বড় বড় নখ রহিয়াছে; তাহারা উহা দ্বারা নিজেদেরই মুখ ও বক্ষ আচড়াইতেছে। আমি জিব্রায়ীলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন্ শ্রেণীর লোকের দৃশ্য? জিব্রায়ীল বলিলেলন, ইহা ঐসব লোকের দৃশ্য যাহারা অন্য লোকের গোশত খাইয়া থাকিবে—তথা (গিবৎ ও নিন্দা করিয়া) তাহার মান-ইজ্জত নষ্ট করিবে।

আমলহীন ওয়ায়েজ বা বক্তার আজাব ঃ

আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মে'রাজ উপলক্ষে আমি এমন এক দল লোকের নিকটবর্ত্তী পথ অতিক্রম করিলাম যাহাদের ঠোঁট দোযখের আগুনে তৈরী কেঁচি দ্বারা কাটা

হইতেছিল। ঠোঁট কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে উহা পুনঃ গজাইয়া উঠে এবং পুনরায় কাটিয়া ফেলা হয়। জিব্রায়ীলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন শ্রেণীর লোকের দৃশ্য। তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উম্মতের ঐ সব বক্তা ও ওয়ায়েজ ব্যক্তিদের দৃশ্য যাহারা অন্যদেরকে যে সব নছিহৎ করিবে নিজে উহার উপর আমল করিবে না।

সুদ খোরের আজাব ঃ

(১) ছামুরা ইবনে জুন্দুব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মে'রাজ ভ্রমণে আমি দেখিয়াছি, একটি মানুষ নদীর মধ্যে সাঁতরাইতেছে, (সে কিনারায় উঠিবার সুযোগ পাইতেছে না ;) পাথর মারিয়া মারিয়া তাহাকে হঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। আমি জিব্রায়ীলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন শ্রেণীর লোকের দৃশ্য ? তিনি বলিলেন, ইহা সুদ-খোরের অবস্থার দৃশ্য।

(২) আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মে'রাজ ভ্রমণে আমি সপ্তম আকাশের উপরে দেখিলাম— তথায় ভীষণ বজ্রপাত, বিজলী ও গর্জ্জন এবং এক দল লোক দেখিলাম, তাহাদের পেট ঘরের সমান বড় বড়—উহার ভিতর অনেক সাপ কিলবিল করিতেছে যাহা পেটের বাহির দিক হইতে দেখা যায়। আমি জিব্রায়ীলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন শ্রেণীর লোকের দৃশ্য। তিনি বলিলেন, যাহারা সুদ খাইবে তাহাদের।

বিভিন্ন গোণাহের আজাব ঃ

আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) স্বয়ং হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে মে'রাজের বিস্তারিত বিবরণের বর্ণনা দান করতঃ বলিয়াছেন—হযরত (দঃ) বলেন, প্রথম আসমানে পৌঁছিবার পর আমি এক স্থানে দেখিতে পাইলাম, কতিপয় দস্তরখান বিছান আছে উহার উপর রান্না করা ভাল ও উত্তম গোশত রাখা আছে, কিন্তু তথায় উপস্থিত লোকগুলির কেহই ঐ গোশতের নিকটেও যায় না। পক্ষান্তরে নিকটেই অন্য কতিপয় দস্তরখান যাহার উপর অতি দুর্গন্ধময় পঁচা গোশত রহিয়াছে ঐ লোকগুলা উহা খাইতেছে। আমি জিব্রীলকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহা কোন শ্রেণীর লোকের দৃশ্য ? তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উম্মতের ঐসব লোকের দৃশ্য যাহাদের নিকট ব্যবহারের জন্য হালাল চিজ-বস্তু থাকিবে, কিন্তু তাহারা উহা উপেক্ষা করিয়া হারামে লিপ্ত হইবে।

আরও কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর এক দল লোক দেখিতে পাইলাম যাহাদের পেট একটা ঘরের সমান বড় ; পেট লইয়া তাহারা উঠিতে পারে না, উঠিতে চেষ্টা করিলে অধমুখী আছাড় খাইয়া পড়িয়া যায় এবং তাহারা ফেরআ'উনের লোক লস্করদের পথ অবলম্বন করিয়াছে ; পথিকদের একটি বিরাট দল তাহাদিগকে পদতলে পিষ্ট করিতেছে, তাহারা আল্লাহ তায়ালার নিকট ভয়ঙ্কর চিৎকার করিতেছে। আমি জিব্রায়ীলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন শ্রেণীর লোকের দৃশ্য ? তিনি বলিলেন,

ইহা আপনার উম্মতের ঐসব লোকের দৃশ্য যাহারা সুদ খাইবে, ফলে কেয়ামতের দিন তাহারা ভূতের আছরকৃত পাগলের ন্যায় হইয়া হাসরের মাঠে উপস্থিত হইবে।

আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম এক দল লোক তাহাদের ঠোঁট উটের ঠোঁটের ন্যায় (মোটা ও বড় বড়); জবরদস্তি মুলক তাহাদের মুখ খুলিয়া ভিতরে পাথর প্রবেশ করান হয়। সেই পাথর তাহাদের মলদ্বার দিয়া বাহির হয় এবং তাহারা আল্লাহ তায়ালার নিকট ভীষণ চিৎকার করিতেছে। আমি জিব্রায়ীলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই লোকগুলির অবস্থা কোন শ্রেণীর লোকের দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উম্মতের ঐসব লোকের দৃশ্য যাহারা অন্যায়ভাবে এতিমের মাল আত্মসাৎ করিবে। তাহারা বস্তুতঃ আগুনের আঙ্গারা পেটের ভিতর ভরিবে এবং অচিরেই শাস্তি ভোগের জন্য ভয়ঙ্কর অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।

আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলাম এবং দেখিতে পাইলাম এক দল নারী তাহাদের কতকগুলিকে পেস্তানে বাঁধিয়া শূন্যে লটকাইয়া রাখা হইয়াছে, আর কতকগুলিকে মাথা নীচের দিকে করতঃ পা বাঁধিয়া লট্‌কাইয়া রাখা হইয়াছে। তাহারা সকলেই আল্লাহ তায়ালার নিকট ভীষণ চিৎকার করিতেছে। আমি জিব্রায়ীলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন শ্রেণীর নারীর দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা ঐসব নারীর দৃশ্য যাহারা জেনা ব্যভিচার করিবে এবং সন্তান মারিয়া ফেলিবে।

আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলাম এবং দেখিতে পাইলাম, এক দল লোক তাহাদের বাহু কাটিয়া গোশত বাহির করা হইতেছে এবং সেই গোশত তাহাদিগকে খাওয়ান হইতেছে। আমি জিব্রায়ীলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোন লোকের দৃশ্য। তিনি বলিলেন, ঐসব লোকের দৃশ্য যাহারা অপর ভাই-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ রটাইবে।

করজে হাছানাহ্‌ বা ধার দেওয়ার ছওয়াব ঃ আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মে'রাজ ভ্রমণে আমি বেহেশতের দরওয়াজায় লিখিত দেখিয়াছি, দান-খয়রাতের ছওয়াব দশগুণ আর করজে-হাছানা বা ধার দানের ছওয়াব আঠার গুণ। জিব্রায়ীলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ধার দেওয়া দান খয়রাতের তুলনায় উত্তম কিরূপে? তিনি বলিলেন, অনেক ক্ষেত্রে ছায়েল—যাচ্ঞাকারী ভিক্ষা চাহিয়া থাকে, অথচ তাহার নিকট কিছু টাকা-পয়সা আছে। পক্ষান্তরে সাধারণতঃ কর্জ্জ বা ধার তখনই চাওয়া হয় যখন মানুষ অত্যধিক ঠেকে।

বিভিন্ন কার্য্যাবলীর পরিণাম ঃ

আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি মে'রাজের ঘটনা বয়ান করতঃ বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জিব্রায়ীল সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই উপলক্ষে তিনি এক দল লোক দেখিলেন, তাহারা জমিতে বীজ বপন করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গেই শস্য জন্মিয়া পাকিয়া যাইতেছে এবং

স্বয়ংক্রিয়রূপে কাটিয়া পড়িতেছে ; তাহারা উহা স্তুপীকৃত করিতেছে এবং কাটিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুনঃ ফসল জন্মিয়া যাইতেছে। হযরত নবী (দঃ) জিব্রায়ীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কিসের দৃশ্য ? তিনি বলিলেন, ইহা আল্লার দ্বীনের জন্য জেহাদকারীদের অবস্থার দৃশ্য ? আল্লার রাস্তায় জেহাদকারীদের ছওয়াব যে, বহুগুণে লাভ হইয়া থাকে এবং তাঁহারা ঐপথে যাহা কিছু ব্যয় করেন উহার ছওয়াব যে, তাহাদের পরেও জারী থাকে উহারই রূপক দৃশ্য ইহা।

অতঃপর আর এক দল লোককে দেখিলেন, যাহাদের মাথা মস্ত বড় বড় পাথরের আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করা হইতেছে এবং চূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গেই আবার উহা ভাল হইয়া যায় তখন পুনরায় চূর্ণ বিচূর্ণ করা হয়—তাহাদের এই অবস্থার ক্ষান্ত নাই। নবী (দঃ) জিব্রায়ীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন শ্রেণীর লোকের দৃশ্য ? তিনি বলিলেন, ইহা ঐসব লোকের শাস্তির দৃশ্য যাহাদের মাথা নামাযের জন্য উঠিতে চাহিবে না।

অতঃপর এক দল নর-নারীকে দেখিলেন, যাহাদের সম্মুখ ও পেছনের লজ্জাস্থানে নেকড়া ঠাসিয়া রাখা হইয়াছে এবং তাহারা গরু ছাগলের ন্যায় বিচরণ করিয়া দোযখের উদ্ভিজ্জ "জারী" ও "যাক্কুম্" গাছ এবং দোযখের কাঁকর ও পাথর ভক্ষণ করিতেছে। হযরত (দঃ) জিব্রায়ীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন শ্রেণীর লোকের দৃশ্য ? তিনি বলিলেন, এই দৃশ্য ঐ লোকদের যাহারা স্বীয় ধন-সম্পত্তির যাকাৎ-ছদকাহ্ আদায় না করিবে। এই শাস্তি তাহাদের সমোচিত শাস্তি, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর কোনরূপ জুলুম করেন নাই।

অতঃপর এক দল লোক দেখিলেন, তাহাদের সম্মুখে পাত্রে রান্না করা উত্তম গোশ্‌ত, অপর পাত্রে পঁচা দুর্গন্ধময় কাঁচা গোশ্‌ত রহিয়াছে—তাঁহারা প্রথমটিকে উপেক্ষা করিয়া দ্বিতীয় পাত্রটি হইতে খাইতেছে। হযরত (দঃ) জিব্রায়ীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন শ্রেণীর লোকের দৃশ্য ? তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উম্মতের ঐসব লোকের দৃশ্য যাহাদের নিকট বিবাহিতা হালাল স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তাহারা হারাম ফাহেসা নারীর নিকট রাত্রি যাপন করিবে এবং ঐসব নারীর দৃশ্য যাহাদের হালাল স্বামী থাকা সত্ত্বেও তাহারা হারাম বদমাশ পুরুষদের নিকট রাত্রি যাপন করিবে।

অতঃপর পথের মধ্যে একটি কাষ্ঠবিশেষ বস্তু দেখিতে পাইলেন, সেই কাষ্ঠটি পথিকদের কাপড়-চোপড় জড়াইয়া ধরিয়া ফাড়িয়া ফেলে। হযরত (দঃ) জিব্রায়ীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কিসের দৃশ্য ? তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উম্মতের ঐসব লোকের দৃশ্য যাহারা পথে বসিয়া থাকিয়া পথিকদেরে লুণ্ঠন করিবে।

অতঃপর একটি লোককে দেখিলেন, সে লাকড়ির এক বিরাট বোঝা একত্রিত করিয়াছে যাহা উঠাইতে সে কোন প্রকারেই সক্ষম হইবে না, এতদসত্ত্বেও সে

ঐ বোঝা আরও অধিক ভারি করিতেছে। হযরত (দঃ) জিব্রায়ীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন লোকের দৃশ্য? তিনি বলিলেন, ইহা আপনার উম্মতের ঐ লোকের দৃশ্য যাহার নিকট লোকদের বহু আমানত রহিয়াছে—যাহা আদায় করিতে সে সক্ষম নহে, কিন্তু সে আরও আমানত লাভের সুযোগ তালাশ করে।

অতঃপর দেখিলেন, জিহ্বা ও ঠোঁট কেঁচি দ্বারা কাটা হইতেছে—তাহাদের এই অবস্থার ক্ষান্ত নাই। হযরত (দঃ) জিব্রায়ীলকে এক দল লোকের ঐ দৃশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি বলিলেন, ইহা ভ্রষ্ট পথের প্রতি আহ্বানকারী বক্তাগণের দৃশ্য।

অতঃপর দেখিতে পাইলেন, একটি ছোট পাথর খণ্ড উহা হইতে বিরাট একটি বলদ বাহির হইল এবং পুনরায় সে উহার ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সক্ষম হইতেছে না। হযরত (দঃ) জিব্রায়ীলকে ঐ দৃশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। জিব্রায়ীল বলিলেন, ইহা ঐ লোকের দৃশ্য যাহার মুখ দিয়া কোন অসংগত কথা বাহির হইয়া যায়, পরে সে অনুতপ্ত হয়, কিন্তু ঐ কথা আর ফিরাইয়া আনিতে পারে না।

তারপর এক স্থানে পৌছিয়া অসাধারণ সুগন্ধিময় শীতল বাতাস এবং কস্তুরীর খুশবু অনুভব করিলেন এবং মধুর সুরের আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। হযরত (দঃ) জিব্রায়ীলকে উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, এই সুর ও আওয়াজ বেহেশতের। বেহেশত আল্লাহ তায়ালার নিকট আবেদন নিবেদন করিতেছে যে, হে পরওয়ারদেগার! আমার ভিতর স্বর্ণ-চান্দি, আয়েশ-আরাম ও ভোগ-বিলাসের আসবাব-পত্র অনেক অনেক জমা হইয়া আছে, এখন উহার ব্যবহারকারী প্রদান সম্পর্কে তোমার যে আশ্বাস রহিয়াছে তাহা দান কর। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে উত্তর দিয়াছেন, মোমেন-মোসলমান নারী-পুরুষ তোমার জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিলাম। তদুত্তরে বেহেশত বলিয়াছে, আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি।

তারপর আর এক স্থানে পৌছিয়া ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনিতে পাইলেন এবং ভীষণ দুর্গন্ধময় বাতাস অনুভব করিলেন। হযরত (দঃ) জিব্রায়ীলকে উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। জিব্রায়ীল বলিলেন, ইহা জাহান্নামের আওয়াজ। সে ফরিয়াদ করিতেছে—হে পরওয়ারদেগার! আজাব, কষ্ট ও দুঃখ-যাতনার সমুদয় জিনিষ আমার মধ্যে পরিপূর্ণরূপে জমা হইয়াছে, এখন ঐ সবের শাস্তি ভোগের পাত্র আমাকে দান করুন। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বলিয়াছেন, কাফের-মোশরেক এবং কুকর্ম্মী ও অহঙ্কারী নারী-পুরুষ যাহারা হিসাব-নিকাশের দিনকে বিশ্বাস করে না তাহাদিগকে তোমার জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি। সে বলিয়াছে, আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি।

আল্লাহ তায়ালাকে দেখিয়াছিলেন কি?

এই সম্পর্কে স্বয়ং হযরতের ছাহাবীগণ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ব শ্রেণীর আলেমদের মধ্যেই মতভেদ রহিয়াছে। মতভেদের কারণ এই যে, এই সম্পর্কে

হাঁ, না—উভয় পক্ষেরই কিছু কিছু প্রমাণ বিদ্যমান আছে এবং অকাট্য প্রমাণ কোন পক্ষেই নাই, সুতরাং পরবর্ত্তী বিশিষ্ট এক শ্রেণীর আলেমদের মত এই যে, এই সম্পর্কে কোন প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করা হইতে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়।

এই ভ্রমণে ব্যয়িত সময়ের পরিমাণ ঃ

এই সম্পর্কে বিশেষ কোন বিস্তারিত বিবরণ ও নির্দ্ধারণ পাওয়া গেল না, শুধু মাত্র নিম্নে বর্ণিত দুইটি হাদীছই আমাদের খোঁজে পাওয়া গিয়াছে।

(১) শাদ্দাদ ইবনে আউস্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনার মে'রাজ-ভ্রমণের ঘটনাটা কিরূপ ছিল? তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন,

صليت مع اصحابى صلاة العتمة بمكة معتما فاتانى جبرئيل بدابة

"আমি আমার সঙ্গী সাথীগণের সঙ্গে একত্রেই রাত্রির পূর্ণ অন্ধকার সময়ের নামায (যাহা তখন পূর্ব্ব আমলের কোন নিয়মে পড়া হইয়া থাকিত) মক্কা নগরীতেই পূর্ণ অন্ধকারে আদায় করিলাম। অতঃপর আমার নিকট জিব্রায়ীলের আগমন হইল। (ঘটনা প্রবাহের মধ্যে) আমার সম্মুখে শ্বেত বর্ণের, গাধা অপেক্ষা বড় খচ্চর অপেক্ষা ছোট রকমের একটি যানবাহন উপস্থিত করিয়া আমাকে উহার উপর আরোহণ করান হইল। (বিস্তারিত বিবরণ দানের পর হযরত (দঃ) বলিয়াছেন,)—

ثم اتيت اصحابى قبل الصبح بمكة فاتانى ابوبكر (رضى الله عنه)
فقال يا رسول الله اين كنت الليلة فقد التمستك فى مظانك -

"তারপর আমি মক্কায় আমার সঙ্গী সাথীগণের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছি ভোর হওয়ার পূর্ব্বে।" তখন আবুবকর (রাঃ) আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি রাত্রে কোথায় ছিলেন? আমি ত আপনাকে সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায়ই তালাস করিয়াছি! তখন হযরত (দঃ) বাইতুল-মোকাদ্দাছ যাওয়ার উল্লেখ করিলেন। আবুবকর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! বাইতুল-মোকাদ্দাছ ত মক্কা হইতে এক মাসের পথে অবস্থিত! (আবুবকর পূর্ব্বে বাইতুল-মোকাদ্দাছ দেখিয়াছিলেন।) হযরত (দঃ) তাঁহাকে বাইতুল-মোকাদ্দাছের মোটামুটি অনেক নিদর্শন বলিয়া দিলেন। তখন আবুবকর নব উদ্যমে বলিয়া উঠিলেন, বাস্তবিকই আপনি আল্লার রসুল। (তফছীর ইবনে কাছীর ৩ × ১৩—১৪)

(২) হযরতের চাচা আবুতালেবের কন্যা উম্মে-হানী (রাঃ) মে'রাজের ঘটনা বর্ণনা করিতেন যে, মে'রাজের ঘটনার রাত্রে হযরত (দঃ) আমারই গৃহে নিদ্রিত ছিলেন। হযরত (দঃ) সন্ধ্যা রাত্রের পরের নামায আদায় করিয়া শুইয়া পড়িলেন, আমরাও শুইয়া পড়িলাম। প্রভাত হওয়ার পূর্ব্বক্ষণে আমরা হযরতের সঙ্গেই নিদ্রা হইতে

উঠিলাম। প্রভাতের নামাযান্তে হযরত (দঃ) আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,

لقد صليت معكم العشاء الاخرة كما رأيت بهذا الوادى ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه ثم صليت الغداة معكم الان كما ترين -

"আমি এই মক্কা নগরীতেই তোমাদের দৃষ্টি সমক্ষে এশার নামায আদায় করিয়াছিলাম, তারপর আমি বাইতুল-মোকাদ্দাছে উপনীত হইয়াছিলাম, তথায় মসজিদে আমি নামায পড়িয়াছি, তারপর এখন তোমাদের সঙ্গেই ফজরের নামায আদায় করিলাম। (তফছীর ইবনে কাছীর ৩—২২)

উল্লেখিত হাদীছদ্বয় দৃষ্টে ইহা বলা অবাস্তব হইবে না যে, মে'রাজ শরীফের ঘটনাটি রাত্রের এক সুদীর্ঘ অংশে সংঘটিত হইয়াছিল।

মে'রাজ জাগ্রত অবস্থায় স্বশরীরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ঃ

১৮০৭। হাদীছ ঃ—(৫৫০ পৃঃ) عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه فِى قَوْلِهٖ تَعَالٰى "وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ" قَالَ هِىَ رُؤْيَا عَيْنٍ اُرِيَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِهٖ اِلٰى بَيْتِ الْمَقْدِسِ -

অর্থ—পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সম্বোধন করতঃ বলিয়াছেন, "আমি যেসব অলৌকিক দৃশ্য ও বস্তুনিচয় আপনাকে দেখাইয়াছি—একমাত্র লোকদের পরীক্ষার জন্যই (উহা তাহাদের নিকট ব্যক্ত ও প্রকাশ করা হইয়াছে যে, তাহারা উহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে কি-না।)"

এই আয়াতে উল্লেখিত ঘটনা সম্পর্কে ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সমুদয় দৃশ্য ও বস্তুনিচয় স্বচক্ষে বাস্তবরূপে প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন ও পরিদর্শন করাই উদ্দেশ্য। (অর্থাৎ ঐ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক রসুল (দঃ)কে পরিদর্শন করানের যে কথা উল্লেখ করা হইয়াছে উহা প্রকৃত প্রস্তাবেই পরিদর্শন ছিল; উক্ত আয়াতে পরিদর্শনের কোন প্রকার রূপক অর্থ বা স্বপ্ন দেখার অর্থ উদ্দেশ্য নহে।)

যেই রাত্রে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বাইতুল-মোকাদ্দাছে উপনীত হইয়াছিলেন, সেই রাত্রেই আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক রসুল (দঃ)কে পরিদর্শন করানের ঘটনা ঘটিয়াছিল।

ব্যাখ্যা—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চাচাত ভাই, যাঁহার পক্ষে স্বয়ং হযরত (দঃ) কোরআনের জ্ঞান এবং দ্বীনের ছমঝ ও বুঝের জন্য বিশেষরূপে দোয়া করিয়া ছিলেন—সেই ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই বিষয়টিকে খোলাসারূপে বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, মে'রাজ শরীফের ঘটনা বাস্তবরূপে

স্বচক্ষে অবলোকন ও প্রত্যক্ষভাবে পরিদর্শন করার ঘটনা। কোন প্রকারে শুধু আত্মার বিচরণ বা স্বপ্ন দেখার ঘটনা নহে। পূর্ব্বাপর বিশ্ব মোসলেম জামাতের ঈমান আক্বিদাহ্ এবং বিশ্বাসও ইহাই এবং যুক্তি প্রমাণে এই দাবীই গ্রহণীয়। কারণ—

(১) হযরতের পিতৃব্য-কন্যা "উম্মে-হানী" যাঁহার গৃহে হযরত (দঃ) মে'রাজের রাত্রে অবস্থানরত ছিলেন তাঁহার বর্ণনা এই যে, হযরত (দঃ) মে'রাজের রাত্রে আমার গৃহে শায়িত ছিলেন। পরে আমি দেখিতে পাইলাম হযরত (দঃ) গৃহে নাই, ফলে আমার নিদ্রা দূর হইয়া গেল। আমি চিন্তিত হইলাম যে, শত্রু দলের লোক কোন ষড়যন্ত্র করিয়াছে না-কি। (রাত্রি প্রভাতে নামাযান্তে) হযরত (দঃ) নিজেই ঘটনা বর্ণনা করিলেন যে, রাত্রি বেলা জিব্রায়ীল আসিয়া আমাকে গৃহ হইতে বাহির করেন এবং বোরাক্বে আরোহন করাইয়া বাইতুল-মোকাদ্দাসে লইয়া যান ইত্যাদি ইত্যাদি—

ঘটনা যদি আত্মার বিচরণ বা স্বপ্ন হইত তবে গৃহ হইতে অন্তরিত হওয়ার অর্থ কি?

(২) শাদ্দাদ ইবনে আউস বর্ণিত হাদীছে আছে, মে'রাজের রাত্রে ভোর বেলা আবুবকর (রাঃ) হযরতের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ। রাত্রিবেলা কোথায় চলিয়া গিয়াছিলেন? সম্ভাব্য সকল স্থানেই আপনাকে তালাশ করিয়াছি। তদুত্তরে হযরত (দঃ) মে'রাজের ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। (তফছীর ইবনে কাছীর ৩—১৪)

স্বশরীরে মে'রাজ না হইয়া থাকিলে হযরত (দঃ) রাত্রে নিখোঁজ হইলেন কিরূপে?

(৩) হযরত (দঃ) ভোরবেলা উক্ত ঘটনা সর্ব্বসাধারণ্যে ব্যক্ত করিলে পর লোকদের মধ্যে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হইয়া গেল এবং হযরতের প্রতি অবিশ্বাস জন্মাইবার জন্য এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার জন্য কাফেরা এই ঘটনাকে এক বিশেষ অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিল। এমনকি কোন কোন নব দীক্ষিত দুর্ব্বল বিশ্বাসের মোসলমান এই ঘটনাকে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া কাফেরদের প্ররোচনার ফলে ইসলাম হইতে সরিয়া পড়িল।

মে'রাজ ভ্রমণের বাস্তবতাই যদি হযরতের দাবী না হইত তবে ঐরূপ আলোড়ন সৃষ্টির হেতু কি থাকিতে পারে? স্বপ্নে ত সাধারণ মানুষের পক্ষেও ঐরূপ ঘটনা অসম্ভব নহে, সুতরাং সব রকম আলোড়ন ও দ্বিধা বোধের অবসান করার জন্য হযরতের পক্ষে শুধু এতটুকুই বলা যথেষ্ট ছিল যে, ঘটনা বাস্তব জাতীয় নহে, স্বপ্ন জাতীয়। ঐরূপ বলা হয় নাই, বরং উহাকে বাস্তব ঘটনারূপে প্রমাণিত করারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(৪) ১৮০৭ হাদীছের মর্ম্মে দেখা যায় ঘটনার এক বিশেষ অংশ বাইতুল-মোকাদ্দাস পরিদর্শন সম্পর্কে হযরত (দঃ) কাফেরদের পক্ষ হইতে পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছিলেন; যদ্দরুন হযরত (দঃ) বিশেষভাবে বিব্রতও হইয়াছিলেন। অবশেষে আল্লার বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে হযরত (দঃ) উক্ত পরীক্ষায় স্বীয় দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন।

ঘটনা স্বপ্ন হইলে পরীক্ষার প্রশ্নই উঠিত না এবং হযরতের বিব্রত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। ঘটনাকে স্বপ্ন বলার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুর অবসান হইয়া যাইত।

মে'রাজের প্রতিরূপ বা স্বরূপ প্রদর্শন ঃ

১৮০৮। হাদীছ ঃ—(১১২০পৃঃ) عن شريك قال سمعت انس بن مالك

يَقُوْلُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ

الْكَعْبَةِ اِنَّهُ جَاءَهُ ثَلٰثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ اَنْ يُوْحٰى اِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِى

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ اَوَّلُهُمْ اَيُّهُمْ هُوَ فَقَالَ اَوْسَطُهُمْ هُوَ خَيْرُهُمْ فَقَالَ

اٰخِرُهُمْ خُذُوْا خَيْرَهُمْ فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتّٰى اَتَوْهُ لَيْلَةً

اُخْرٰى فِيْمَا يَرٰى قَلْبُهُ وَتَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ وَكَذٰلِكَ الْاَنْبِيَاءُ

تَنَامُ اَعْيُنُهُمْ وَلَا يَنَامُ قُلُوْبُهُمْ فَلَمْ يُكَلِّمُوْهُ حَتّٰى احْتَمَلُوْهُ فَوَضَعُوْهُ

عِنْدَ بِئْرِ زَمْزَمَ .... فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

অর্থ—ছাহাবী আনাছ (রাঃ) কা'বা গৃহের নিকট হইতে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের রাত্রি ভ্রমণের ব্যাপারে একটি বিবরণ ইহাও প্রদান করিয়াছেন যে, নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্বের ঘটনা—হযরত (দঃ) হরম শরীফের মসজিদে (অন্যান্য আরও লোকদের সঙ্গে) নিদ্রিত ছিলেন। এমতাবস্থায় (তিনি দেখিলেন,) তাঁহার নিকট তিন জন লোক আসিল। তাহাদের প্রথম ব্যক্তি সঙ্গিদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "ইহাদের মধ্যে তিনি কোন জন ?" আগন্তুক তিন জনের মধ্যম ব্যক্তি উত্তর করিল, ইহাদের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ব্যক্তি যিনি উনিই তিনি। তখন তৃতীয় জন বলিল, সর্ব্বোত্তম ব্যক্তিকে উঠাইয়া লও।

এই রাত্রির ঘটনা এতটুকু হইল—ইহার পর উক্ত আগন্তুকগণকে হযরত আর দেখিতে পাইলেন না ; অবশ্য আর এক রাত্রে তাহারা পুনরায় আসিল। ঐ সময়ও হযরতের চক্ষুদ্বয় নিদ্রিতই ছিল, কিন্তু তাঁহার অন্তর নিদ্রিত ছিল না—উহার অনুভূতিশক্তি সম্পুর্ণ জাগ্রত ছিল। নবীগণের নিদ্রাবস্থা এইরূপই যে, চক্ষু নিদ্রামগ্ন হয়, দেল বা অন্তর নিদ্রামগ্ন হয় না।

এই রাত্রে আগন্তুকগণ আসিয়া কোন কথাবার্ত্তা না বলিয়াই হযরত (দঃ)কে বহন করিয়া জম্‌জম্ কূপের নিকটবর্ত্তী লইয়া আসিল। (১৮০০ নং হাদীছে বর্ণিত অনুরূপ আকাশ ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণের দৃশ্য দেখার পর বলা হইয়াছে—) অতঃপর হযরত নিদ্রাভঙ্গ হইলেন ; তিনি হরম শরীফের মসজিদেই ছিলেন।

ব্যাখ্যা—নবুয়ত প্রাপ্তির পর হযরত (দঃ) ওহী মারফত তথা প্রত্যক্ষ ভাবে জিব্রায়ীল ফেরেশতার উপস্থিতি ও আগমন দ্বারা আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে খবরা-খবর প্রাপ্ত হইতেন। নবুয়তের পূর্ব্বে সেই ওহীরই প্রতিরূপ বা স্বরূপ আকারে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক হযরত (দঃ)কে সত্য স্বপ্ন দেখান হইত যাহা দিবা-লোকের ন্যায় বাস্তবায়ীত হইয়া থাকিত। নবুয়তের নিকটবর্ত্তী ছয় মাস কাল ঐরূপ স্বপ্নের খুব আধিক্য হইয়াছিল যাহার উল্লেখ প্রথম খণ্ডে ৩ নং হাদীছে রহিয়াছে।

তদ্রূপ মে'রাজের ন্যায় বিশেষ অলৌকিক ও অতি অসাধারণ, বরং মানুষের ধ্যান, খেয়াল ও ধারণা বহির্ভূত ঘটনা যাহা হযরতের পক্ষে বাস্তবায়িত হওয়ার ছিল ঐ ঘটনাটিরও অবিকল প্রতিরূপ হযরত (দঃ)কে নবুয়তের পূর্ব্বে স্বপ্নের মাধ্যমে দেখাইয়া দেওয়া রইয়াছিল। উল্লেখিত হাদীছে সেই স্বপ্নাত্ম মে'রাজেরই বর্ণনা হইয়াছে যাহা ভিন্ন ঘটনা, পক্ষান্তরে বাস্তব মে'রাজ ভিন্ন ঘটনা।

অনেক ধোকাবাজ লোক সর্ব্ব সাধারণকে এরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করে যে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মে'রাজ শরীফ স্বপ্নের ঘটনা ছিল মাত্র, বাস্তব ঘটনা ছিল না। সেই ধোকাবাজগণ উল্লেখিত হাদীছখানা দ্বারা নিজেদের দাবী প্রমাণ করিতে চায়। তাহাদের বুঝা উচিৎ যে, বাস্তব মে'রাজের কোন সম্পর্ক এই হাদীছের সঙ্গে মোটেই নাই। কারণ, এস্থলে বর্ণিত ঘটনা সম্পর্কে এই হাদীছের মধ্যে স্পষ্টরূপে উল্লেখ রহিয়াছে যে, "قبل ان يوحى اليه" অর্থাৎ এই ঘটনা হযরতের নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্বের ঘটনা, অথচ বাস্তব মে'রাজ সম্পর্কে ত সমস্ত ঐতিহাসিক, মোফাচ্ছের, মোহাদ্দেছগণের সিদ্ধান্ত, বরং বিশ্ব মোছলেমের আকিদা ইহাই যে, উহা হযরতের নবুয়ত প্রাপ্তির পরের ঘটনা। অতএব উভয় ঘটনা যে, ভিন্ন ভিন্ন উহাতে সন্দেহের কোন অবকাশই নাই।

আলোচ্য হাদীছ বর্ণনাকারী আনাছ (রাঃ) তিনিই বাস্তব মে'রাজ সম্পর্কে ১৮০১ এবং ১৮০২ নং হাদীছে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীছদ্বয়ে এমন কোন একটি অক্ষরও নাই যাহার দ্বারা মে'রাজ স্বপ্নে হওয়ার পক্ষে কোন ইঙ্গিত-আকার পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং ইহা অবধারিত যে, আলোচ্য হাদীছ বাস্তব মে'রাজ সম্পর্কে নহে।

আলোচ্য হাদীছখানা যে, বাস্তব মে'রাজ সম্পর্কীয় মোটেই নহে সে সম্বন্ধে ইমাম বোখারী (রঃ)ও সম্পূর্ণ একমত। তাহার স্পষ্ট প্রমাণ ইহাতেই পাওয়া যায় যে, "ইছ্‌রা" ও "মে'রাজ" নামে বোখারী (রঃ) বাস্তব মে'রাজ সম্পর্কে দুইটি পরিচ্ছেদ রাখিয়াছেন, এই পরিচ্ছেদদ্বয়ের মধ্যে আলোচ্য হাদীছ খানার কোন উল্লেখই করেন নাই।

ইমাম বোখারী (রঃ) স্বীয় মূল গ্রন্থের সমাপ্তির নিকটবর্ত্তী যাইয়া অন্য এক প্রসঙ্গে আলোচ্য হাদীছখানা উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা শুধু ধোকা ভঞ্জনের উদ্দেশ্যে এই স্থানে উক্ত হাদীছখানার আলোচনায় এবং উহার সঠিক মর্ম্ম উদ্‌ঘাটনে বাধ্য হইয়াছি।

মে'রাজের মূল ঘটনা বাস্তব হওয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঃ

(১) শাদ্দাদ ইবনে আউছ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর রেওয়াতে এই বিষয়টিও উল্লেখ আছে যে, মোশরেকগণ মূল ঘটনার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করিলে পর হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আমি যাহা বলিতেছি উহার সত্যতার একটি প্রমাণ এই যে, বাইতুল-মোকাদ্দাসের পথে তোমাদের একটি সওদাগরী কাফেলার নিকটবর্ত্তী অমুক স্থানে আমি পথ অতিক্রম করিয়াছি। তথায় তাহাদের একটি উট হারাইয়া গিয়াছিল, অমুক ব্যক্তি সেই উটটি তাহাদের নিকট আনিয়া দিয়াছে। তাহারা (যেই পথ বহিয়া আসিতেছে সেই অনুপাতে) অমুক অমুক মঞ্জেল হইয়া অমুক দিন তাহারা মক্কায় পৌছিবে। কাফেলার সম্মুখ ভাগে গোধূম বর্ণের একটি উট রহিয়াছে যাহার পৃষ্ঠে কাল রঙ্গের কম্বল বিছান রহিয়াছে এবং কাল রঙ্গেরই দুইটি বস্তাও উহার পৃষ্ঠে রহিয়াছে।

নির্দ্ধারিত দিনে সেই কাফেলা মক্কায় পৌছিল এবং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত দেখা গেল।

(২) ১ম খণ্ড ৬ নং হাদীছ যাহার মধ্যে রোম সম্রাট হেরাক্লের প্রতি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের লিপি প্রেরণের এবং আবুসুফিয়ান ও হেরাক্লের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের ঘটনা বর্ণিত রহিয়াছে; সেই হাদীছেরই এক রেওয়ায়েতে নিম্নে বর্ণিত বিষয়টিও উল্লেখ রহিয়াছে।

আবু সুফিয়ান বলেন, মিথ্যাবাদী প্রসিদ্ধ হওয়ার ভয়ে রোম সম্রাটের প্রশ্নাবলীর উত্তরে রসুলুল্লার মর্য্যাদাহানীমূলক কোন উক্তি করার সুযোগ না পাইয়া আমি তাঁহার রাত্রি ভ্রমণের কাহিনীটি রোম সম্রাটের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলাম। আমি বলিলাম, বাদশাহ নামদার! আমি নবুয়তের দাবীদার ব্যক্তির এমন একটি ঘটনা জ্ঞাত করিব যাহাকে অবশ্যই আপনি মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত করিবেন।

রোম সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই ঘটনাটি কি? আবু সুফিয়ান বলেন, আমি বলিলাম, তিনি এই দাবী করিয়াছেন যে, আমাদের দেশ মক্কা হইতে বাহির হইয়া এক রাত্রে এই শহরস্থ বাইতুল-মোকাদ্দাসের-মসজিদে পৌছিয়া ছিলেন এবং সেই রাত্রেই প্রভাত হওয়ার পূর্ব্বে মক্কা নগরীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

এই কথাবার্ত্তার সময় বাইতুল-মোকাদ্দাসের প্রধান পোপ বা লাট পাদ্রি রোম সম্রাটের সন্নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন; তিনি বলিলেন, উক্ত রাত্রের ঘটনা সম্পর্কে আমিও জ্ঞাত আছি। রোম সম্রাট পোপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নিকট সেই অবগতি কিরূপে? পোপ বলিলেন, বাইতুল মোকাদ্দাস মসজিদের দরওয়াজাসমূহ বন্ধ করার দায়িত্ব আমার উপর; আমি নিদ্রার পূর্ব্বে অবশ্যই দরওয়াজাসমূহ বন্ধ করিয়া থাকি। আলোচ্য ঘটনার

রাত্রিতে আমি মসজিদের দরওয়াজাসমূহ বন্ধ করিতে লাগিলাম, সব দরওয়াজাই বন্ধ হইল, কিন্তু একটি দরওয়াজা কোন উপায়েই বন্ধ হইল না, এমনকি উপস্থিত লোকজন সহ মসজিদের সমস্ত খাদেমগণ সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা তদবীর করিয়াও উহাকে হিলাইতেও পারিল না, উহা পাহাড়ের ন্যায় অটল মনে হইতেছিল। অতঃপর ছুতার মিস্ত্রী ডাকিয়া আনা হইল, তাহারা সব কিছু দেখিয়া বলিল, দরওয়াজার উপর দিকের চৌকাঠটি নীচে নামিয়া গিয়াছে, সুতরাং রাত্রিবেলা দরওয়াজা বন্ধ করা সম্ভব হইবে না। ভোরে দেখা যাইবে, এরূপ কেন হইল ?

পোপ বলিলেন, উক্ত দরওয়াজার উভয় কপাট খোলা রাখিয়াই আমি শয়ন কক্ষে চলিয়া আসিলাম। রাত্রি প্রভাত হওয়ার পর উক্ত দরওয়াজার নিকট উপস্থিত হইলাম (এবং দেখিলাম দরওয়াজাটি এখন স্বাভাবিক ভাবেই বন্ধ হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ইহাও) দেখিলাম যে, মসজিদের এক কোণে (লোহার কড়ার ন্যায় মধ্য ভাগে ছিদ্রবিশিষ্ট যে একটি পাথর ছিল এবং উহার সেই ছিদ্র বহুদিন হইতে বন্ধ আজ সেই) পাথরের ছিদ্রটি খোলা রহিয়াছে এবং উহার সঙ্গে যান-বাহন বাঁধার নিদর্শনও রহিয়াছে। আমি আমার সঙ্গী সাথীদেরকে বলিলাম, গত রাত্রিতে এই দরওয়াজাটি আখেরী নবীর আগমন উপলক্ষেই খোলা থাকার ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেই নবী রাত্রে আসিয়াছিলেন এবং এই মসজিদে নামায পড়িয়া গিয়াছেন।* (খাছায়েছে কোব্‌রা ১—১৭০ এবং তফছীর ইবনে কাছীর ৩—২৩)

মে'রাজের সম্ভাব্যতা ঃ মে'রাজ শরীফের সম্পর্কে দুইটি প্রশ্নই বিশেষ জটিল বোধ হইয়া থাকে। (১) সুদীর্ঘ ভ্রমণ যাহার জন্য হাজার হাজার বৎসর আবশ্যক, কারণ এক হাদীছের বর্ণনা দৃষ্টে প্রত্যেকটি আসমান অতিক্রম করিতে প্রায় এক হাজার বৎসর আবশ্যক ↑ এই হিসাবে সাত আসমান অতিক্রম করিতে প্রায় সাত হাজার বৎসর আবশ্যক, তার উর্দ্ধে মহান আরশ ইত্যাদি বহু কিছুর ভ্রমণ মে'রাজের ঘটনায় হইয়াছিল, এমনকি হযরত (দঃ) এই ঘটনায় তিন লক্ষ বৎসরের পথ ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া বিবরণ পাওয়া যায়। (তফছীর রুহুল মায়া'নী ১৫—১১) কিরূপে হইতে পারে ?
এত বড় সুদীর্ঘ ভ্রমণ শুধু এক রাত্রে, বরং উহার এক অংশে

---

* পোপের এই মন্তব্য আসমানী কেতাব সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতানুসারেই ছিল, কারণ পূর্ব্বকালে নবীগণ এই বাইতুল মোকাদ্দাস মসজিদে নামায পড়িতে আসিয়া নিজ নিজ যানবাহন উক্ত ছিদ্রবিশিষ্ট পাথরের সঙ্গেই বাঁধিয়া থাকিতেন। উহা নবীগণের ব্যবহারের জন্যই ছিল এবং দীর্ঘ ছয় শত বৎসর হইতে উহা অব্যবহৃত থাকায় উহার ছিদ্র বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন শেষ জমানার নবীর মে'রাজ সম্পর্কেও আছমানী কেতাব সমূহে উল্লেখ ছিল।

↑ পথ চলার সাধারণ নিয়মের পরিমাপে তথা দৈনিক ১৬।১৭ মাইল হিসাবে এই নির্দ্ধারণকে অনুধাবন করা যাইতে পারে। প্রতিটি আকাশ এবং দুই আকাশের ব্যবধানের এই হিসাব।

(২) মহাশূন্যে বায়ুহীন, অগ্নি ইত্যাদির যেসব স্তর বা মণ্ডল বিজ্ঞানের দ্বারা আবিস্কৃত হইয়াছে ঐসব অতিক্রম করা শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর নির্ভরশীল এবং রক্ত-মাংসে গঠিত জীব—মানুষের পক্ষে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

পাঠকবর্গ। এই ধরণের যত প্রশ্নই সম্মুখে আসুক, সবের খণ্ডন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে মে'রাজের ঘটনা বর্ণনায় একটি শব্দের মাধ্যমে প্রদান করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—سبحان الذى اسرى অর্থাৎ অতি মহান (সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বপ্রকার অক্ষমতা হইতে) পাক পবিত্র তিনি যিনি এই ভ্রমণ করাইয়া ছিলেন।

এতদ্ভিন্ন বর্ত্তমান রকেটের যুগে ঐ ধরণের প্রশ্ন ত একমাত্র হাস্যস্পদই গণ্য হইতে পারে। কারণ মানুষ এইরূপ দ্রুত যান তৈরী করিতে সক্ষম হইয়াছে যাহা ঘণ্টায় ৫৮০০ মাইল তথা প্রায় এক বৎসরের পথ অতিক্রম করিতে পারে।** আল্লাহ তায়ালা ত বহু পূর্ব্বেই এর চেয়েও কত অধিক দ্রুতগামী বস্তু তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকদের আবিস্কৃত হিসাব অনুসারেই পৃথিবীর বার্ষিক গতি প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৬৮৪৪৬ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবী উহার বার্ষিক গতিতে প্রতি ঘণ্টায় এগার বৎসরের অধিক কালের পথ অতিক্রম করিয়া থাকে। আলো এবং শব্দের গতি আরোও অধিক। মহান আল্লাহ তায়ালা যে, আরও কত কত অধিক দ্রুত গতির বস্তু ও বাহন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং করিতে পারেন তাহার অনুভূতি আমাদের ঈমানের উপরই নির্ভর করে, হিসাবের আওতায় না-ও আসিতে পারে। "ولا يحيطون بشئ من علمه—আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসীম পরিধিকে মানুষ হিসাবের বেষ্টনীতে আবদ্ধ করিতে পারিবে না।"

রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই ভ্রমণ উপলক্ষে যে যানবাহনকে প্রথমে ব্যবহার করা হইয়াছিল উহার নাম "বোরাক্", যাহা "বারক্" শব্দ হইতে গৃহীত ; উহার অর্থ বিদ্যুত। বিদ্যুতের গতি যে কত দ্রুত তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। আকাশে এবং ইলেক্ট্রিক তারে প্রত্যেকেই উহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। উক্ত যানবাহনটির দ্রুত গতি বুঝাইবার জন্যই উহার এই নাম করণ হইয়াছে। উহার পরে আরও বিশিষ্ট বাহন ব্যবহার করা হইয়াছিল বলিয়া হাদীছে বর্ণনা রহিয়াছে।

আল্লাহ তায়ালার নগণ্য সৃষ্টি মানুষ আজ মহা শূন্যের জয় যাত্রা আরম্ভ করিয়াছে। স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার পক্ষে সেই মহাশূন্যকে জয় করা কোন প্রকারে জটিল হইতে পারে—এরূপ ধারণা পাগলের পক্ষেও সম্ভব কি না তাহা ভাবিবার বিষয়।

** আমেরিকা গভর্ণমেন্ট ২৮শে জুলাই ১৯৬৪ ইং তারিখে চাঁদের ফটো লইবার জন্য ৮০৬ পাউণ্ড ওজনের "Ranger—7" নামের যেই যান্ত্রিক মহাশূন্য যানটি চাঁদের দিকে প্রেরণ করিয়াছিল উহার গতি প্রতি ঘণ্টায় ৫৮০০ মাইল ছিল বলিয়া রয়টার ও এ, পি, পি, পরিবেশিত খবর ২৯শে জুলাই-এর সমুদয় খবরের কাগজেই প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্মুখে আরও অনেক কিছু হইবে।

ছিনা-চাক্ বা বক্ষ বিদীর্ণ করা ঃ

মে'রাজ ভ্রমণ উপলক্ষে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছিনা-চাক্ বা বক্ষ বিদীর্ণ করা হইয়াছিল ; সে সম্পর্কে বহু সংখ্যক হাদীছ বর্ণিত আছে। বোখারী শরীফ, মোসলেম শরীফ, তিরমিজী শরীফ এবং নেছায়ী শরীফ সহ অনেক হাদীছের কেতাবেই উহা বিদ্যমান আছে। বোখারী শরীফে এই সম্পর্কে একাধিক হাদীছ উল্লেখ আছে। ১৮০০ নং হাদীছের বিবরণটি অতি সুস্পষ্ট, বিস্তারিত এবং এই সম্পর্কে হেরফেরকারীদের সব রকমের ধোকা ভঞ্জনে বিশেষ সহায়ক। কারণ, এই হাদীছে মূল বিষয়টিকে "شق – শাক্কা" শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে, উহার অর্থ বিদীর্ণ করা যাহা একটি বাহ্যিক কার্য্য। সঙ্গে সঙ্গে এই হাদীছের বিবৃত্তিতে ইহাও উল্লেখ আছে যে, স্বয়ং হযরত (দঃ) স্বীয় বক্ষের দিকে ইশারা করতঃ বিদীর্ণ কার্য্য সমাধার সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, من هذه الى هذه এই স্থান হইতে এই স্থান পর্য্যন্ত। যাহার ব্যাখ্যায় পরম্পরা ঘটনা বর্ণনাকারী বা সাক্ষীগণ বলিয়াছেন—ছিনার উপরিভাগ হইতে নাভীর নিম্নদেশ পর্য্যন্ত। হযরত (দঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, তৎপর আমার দিল বা হৃদপিণ্ডটি বাহির করা হইয়াছিল এবং উহাকে ধৌত করা হইয়াছিল। ১৮০১ নং হাদীছে এবং আরও অনেক হাদীছে ইহাও উল্লেখ আছে যে, অতঃপর আমার বক্ষকে জমজমের পানি দ্বারা ধৌত করা হইয়াছে। তারপর হযরত (দঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, ঈমান ভরা একটি পাত্র আনা হইয়াছে যদ্দারা আমার হৃদপিণ্ডকে ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৮০১ নং হাদীছে আছে—ঈমান ও হেকমত ভরা একটি পাত্র আনিয়া আমার বক্ষের ভিতরে ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই তথ্যটির তাৎপর্য্য এই যে, স্বর্ণ পাত্রে করিয়া এমন কোন বস্তু আনা হইয়াছিল যাহা ঈমান ও হেকমত তথা পরিপক্ক জ্ঞান বর্দ্ধক ছিল, যেমন নানাপ্রকার টনিক বা ইঞ্জেকশন বোতল ও শিশিতে করিয়া আনিয়া মানুষের দেহে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, কোনটা দর্শনশক্তি বর্দ্ধক হইয়া থাকে, কোনটা শ্রবণশক্তি বর্দ্ধক হইয়া থাকে, কোনটা হৃদয়শক্তি বর্দ্ধক হইয়া থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঈমান ও হেকমতের উন্নতির ধাপ আল্লার দরবারে অসংখ্য রহিয়াছে, অতএব হযরতের পক্ষে উহা বর্দ্ধনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা সমীচীন বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

হযরত আরও বলিয়াছেন যে, অতঃপর হৃদপিণ্ডটি উহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। "যোরকানী" নামক কেতাবে আছে, হযরতের ছিনা মোবারক চাক্ বা বিদীর্ণ করিয়া অতঃপর উহাকে সেলাই করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মোসলেম শরীফের হাদীছে ঘটনা বর্ণনাকারী ছাহাবী আনাছ (রাঃ) স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি হযরতের বক্ষ মোবারকে সেই সেলাই-এর নিদর্শন দেখিয়াছেন।

বর্ত্তমান সার্জ্জিক্যাল সাইন্সের অসাধারণ উন্নতির যুগে আলোচ্য বিষয়টি সম্পর্কে কোন ধরণের সংশয় বা দ্বিধাবোধ যে, মোটেই সঙ্গত হইবে না তাহা অতি সুস্পষ্ট।

"ছিনা-চাক্‌ বা বক্ষ বিদীর্ণ" হযরতের উপর চার বার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

(১) সর্ব্ব প্রথম ছিনা-চাক্‌ করা হইয়াছিল বাল্যকালে চার-পাঁচ বৎসর বয়সের সময়। তখন তিনি দুধ-মা হালিমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে ছিলেন।

এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ "হযরতের দুগ্ধ পান" আলোচনায় বর্ণিত হইয়াছে।

এই ঘটনার বর্ণনায় পাঁচ খানা হাদীছ বর্ণিত আছে (সীরতে মোস্তফা ১—৫৭)। এই ঘটনার বিবরণে একটি তথ্য বর্ণিত আছে যে, ফেরেশতাদ্বয় হযরতের বক্ষ বিদীর্ণ করতঃ হৃদপিণ্ডকে বাহির করিয়া অপারেশন করতঃ উহার ভিতর হইতে জমাট রক্তের দুইটি টুক্‌রা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন যে, ইহা শয়তানের অংশ।

ছিনা-চাক্‌ অস্বীকারকারীগণ ঘটনার এই অংশটুকুকে সম্বল করিয়া হযরতের মর্য্যাদাহানীর দোহাই দেওয়ার অপচেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা তাহাদের বোকামী, কারণ মানুষ হিসাবে হযরতের ভিতরে সৃষ্টিগত ভাবে অন্যান্য মানুষের ন্যায় সব কিছুই ছিল, যেমন তাঁহার ভিতরে মল-মূত্রের ন্যায় বস্তুরও সঞ্চার হইত।

বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে, মানুষ শয়তানী কাজ তথা খেলা-ধুলা ও অপরাধ প্রবনতায় মাতিয়া উঠে উহার উৎস ও মূল হিসাবে পরীক্ষাক্ষেত্র ইহজগতে পরীক্ষাত্রী মানুষ জাতের মানবীয় দেহের অংশ হৃদপিণ্ডের ভিতরে ঐ ধরণের একটা বস্তু থাকে। মানুষ হিসাবে হযরতের হৃদপিণ্ডেও উহা থাকা নিতান্ত স্বাভাবিক। অবশ্য তিনি নবী হিসাবে তাঁহার বৈশিষ্ট এই ছিল যে, অঙ্কুরেই ঐ মূল ও উৎসকে নিপাত করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা আল্লাহ তায়ালা করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বিবরণ "হযরতের দুগ্ধ পান" আলোচনায় টিকার মধ্যে রহিয়াছে।

(২) দ্বিতীয় বার দশ বৎসর বয়সে। (৩) তৃতীয় বার নবুয়ত প্রাপ্তির সময়। (৪) চতুর্থ বার মে'রাজের ভ্রমন উপলক্ষে যাহার উল্লেখ আলোচ্য হাদীছে রহিয়াছে।

প্রথমবারের বক্ষ বিদারণের উদ্দেশ্য উহার বর্ণনার মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়-বারের উদ্দেশ্য সহজেই অনুমেয় যে, "الشباب شعبة من الجنون—সকল প্রকার উন্মাদনার সময় হইল যৌবন কাল।" এই ভয়াবহ যৌবনই আবার সব রকম বল-শক্তি ও উৎসাহ-উদ্দিপনার উৎস। এই দোধারি যৌবনের ঢেউ এবং খর ও বিদ্যুতকে সংযত ও সুসংহত রাখার জন্য যৌবনের সূচনা আরম্ভের পূর্ব্বেই বক্ষ বিদারণের মাধ্যমে সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। তৃতীয় বারের উদ্দেশ্যও সুস্পষ্ট; ওহী এক অসাধারণ আভ্যন্তরিত চাপের বস্তু (প্রথম খণ্ড ২নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)। ঐ চাপ সামলাইবার যোগ্য শক্তি প্রদান ছিল এই বার বক্ষ বিদারণের মাধ্যমে। চতুর্থ বারের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন ত এই রকেট-যুগে নিতান্তই সহজ বোধ্য। মানব-

দেহকে উর্দ্ধ জগতে বিচরণযোগ্য করার জন্য রকেট-আরোহীদেরকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কত রকমে প্রস্তুত করা হয়। এতদ্ভিন্ন আল্লাহ তায়ালার অসাধারণ বিশেষ সৃষ্টি—নূরের তাজাল্লীতে তুর পর্ব্বত খান খান হইয়া গিয়াছিল এবং পয়গাম্বর মূছা (আঃ) চৈতন্যহীন হইয়া পড়িয়া ছিলেন। নবীজী মোস্তফা (দঃ)কে এই ভ্রমণে মহান ছেদরাতুল-মোন্‌তাহা ও মহান আরশের উপর উক্ত নূরের তাজাল্লী অপেক্ষা কত লক্ষ গুণ বেশী নূরের তাজাল্লী চৈতন্যপূর্ণ বজায় রাখিয়া পরিদর্শন করিতে হইবে এবং সেই নূরের তাজাল্লী অপেক্ষা আরও কত উর্দ্ধের উর্দ্ধের মহান মহান বস্তুনিচয় পরিদর্শন করিতে হইবে। সেই শক্তি সামর্থের প্রস্তুতিও ত ভ্রমণ আরম্ভে সম্পন্ন করিতে হইবে। এই সবই ছিল এই চতুর্থবার বক্ষ বিদারণের তাৎপর্য্য।*

হযরত মোহাম্মদ (দঃ) সর্ব্বশেষ নবী, তাঁহার পরে কোন নবী হয় নাই, কেয়ামত পর্য্যন্ত হইবেও না

১৮০৯। হাদীছ ঃ— (৫০১ পৃঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার এবং আমার পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের একটি দৃষ্টান্ত বুঝিয়া রাখ—এক ব্যক্তি একের পর এক ইটের গাথুনি দ্বারা একটি সুদৃশ্য সুন্দর অট্টালিকা বা ঘর তৈরী করিয়াছে, কিন্তু উহার এক কোনায় এক খানা ইট রাখার স্থান খালি রাখিয়াছে। দর্শকগণ ঘরখানা দেখিয়া খুবই প্রশংসা করে, কিন্তু এই বলিয়া অনুতাপও প্রকাশ করিতে থাকে যে, এই স্থানে একখানা ইট রাখিয়া ঘরখানার সম্পূর্ণতা সাধন করা হইল না কেন। হযরত (দঃ) বলেন—

فَاَنَا اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ

"আমিই সেই অবশিষ্ট একখানা ইট এবং আমিই সর্ব্বশেষ নবী।"

ব্যাখ্যা—সৃষ্টের সেরা মানব জাতির দ্বারা এক আল্লার প্রভুত্বের বিকাশ সাধন—যাহা সারা জাহান সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য উহা বাস্তবায়িত করার ব্যবস্থা স্বরূপ আল্লাহ তায়ালা স্বীয় প্রতিনিধি রসুল বা নবীগণের যে বহর প্রেরণ করিয়াছিলেন সেই নবী-বহরকে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) একটি সুদৃশ্য অট্টালিকার দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইয়াছেন। এই দৃষ্টান্তটি নবীগণের পারস্পরিক সম্বন্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিককেও অতি সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিয়াছে। নবীগণ বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন পরিবেশের

---

* বহু সমালোচিত আকরম খাঁ মরহুম এই সব উর্দ্ধের বিষয়াবলী হইতে অজ্ঞ থাকায় বক্ষ বিদারণের মোজেযা অস্বীকার করিতে যাইয়া তাঁহার মোস্তফা-চরিত গ্রন্থে যে সব প্রলাপ করিয়াছেন তাহা খণ্ডন করিতেও ঘৃণার উদ্রেক হয়। পাঠক উল্লেখিত তথ্যাবলী সম্মুখে রাখিয়া খাঁ মরহুমের অসার প্রলাপগুলির খণ্ডন বুঝিয়া নিবেন; আশা করি বেগ পাইতে হইবে না।

উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন শরীয়ত নিয়া আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য—এক আল্লার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সকলে ঐক্যতার শৃঙ্খলে এইরূপ অবিচ্ছেদ্য ও মজবুত ভাবে আবদ্ধ ছিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্নতা মোটেই ছিল না, বরং তাঁহারা সকলে মিলিয়া এক ছিলেন, যেরূপ কোন একটি সুদৃশ্য সৌধ বা অট্টালিকা হাযার হাযার সংখ্যক বিচ্ছিন্ন ইট দ্বারা তৈরী হয়, কিন্তু ঐ ইটগুলি সকলে মিলিয়া একটি মাত্র উদ্দেশ্য সাধনে এত দৃঢ়তর রূপে একত্রিত হয় যে, অবশেষে এত এত সংখ্যার বিভিন্ন ইটগুলি সৌধ বা অট্টালিকা তথা একটি বস্তুতে পরিণত হইয়া পড়ে!

অতএব যেই ধর্ম্ম বা ধর্ম্মীয় ব্যবস্থায় বিন্দুমাত্র শেরক তথা এক আল্লার প্রভুত্বের বরখেলাফী থাকিবে উহা সমস্ত নবীগণের তরীকার পরিপন্থি সাব্যস্ত হইবে, উহাকে কোন নবীর তরীকা বা শরীয়তরূপে মনে করা বা দাবী করা অবাস্তব ও মিথ্যা হইবে।

ধারাবাহিকরূপে নবীগণের আগমন অব্যাহত থাকিয়া সর্ব্বশেষ নবী আগমনের পূর্ব্বে দীর্ঘ ছয় শত বৎসরকাল নবী-আগমন বন্ধ থাকা এবং সুদীর্ঘ সময় সেই অবশিষ্ট সর্ব্বশেষ নবীর আবির্ভাবের প্রতিক্ষাকে বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্তে বলা হইয়াছে যে, অট্টালিকা নির্ম্মেতা ধারাবাহিক রূপে ইটের গাথুনী দ্বারা সুদৃশ্য অট্টালিকা তৈরী করিয়াছে, শুধু মাত্র একখানা ইটের স্থান খালি রহিয়াছে, দর্শকগণ সেই শূন্যস্থান পূর্ণ হওয়ার কামনা ও প্রতিক্ষায় রহিয়াছে।

অবশিষ্ট সর্ব্বশেষ নবী যে স্বয়ং হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)ই ছিলেন—দৃষ্টান্তে তাহা বুঝাইবার জন্য হযরত (দঃ) বলিতেছেন যে, ঐ অট্টালিকায় একটিমাত্র ইটের শূন্যস্থান পুরণকারী ইটখানা হইলাম আমি।

হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পর নবুঅতের সৌধ ও অট্টালিকার মধ্যে কাহারও প্রবেশের অবকাশই যে রহিল না, তথা নবীগণের সারিতে দাঁড়াইতে পারে এমন আর কেহই যে বাকি থাকিল না, এই বিষয়টি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়া স্বীয় উম্মৎকে প্রতারণার হাত হইতে রক্ষাকল্পে দৃষ্টান্ত দান শেষে হযরত (দঃ) বলিলেন "اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ—আমি সর্ব্বশেষ নবী।"

বোখারী শরীফ ৫০১ পৃষ্ঠার একখানা হাদীছ পূর্ব্বে অনুদিত হইয়াছে ; উক্ত হাদীছ খানা বোখারী শরীফ ৭২৭ পৃষ্ঠায়ও বর্ণিত হইয়াছে—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন।

لِى خَمْسَةُ اَسْمَاءٍ اَنَا مُحَمَّدٌ وَ اَحْمَدُ وَ اَنَا الْمَاحِى الَّذِى يَمْحُو اللّٰهُ بِىَ الْكُفْرَ وَ اَنَا الْحَاشِرُ الَّذِى يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِى وَ اَنَا الْعَاقِبُ ـ

অর্থ—হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, আমার বিশেষ পাঁচটি নাম আছে—আমার নাম মোহাম্মদ এবং আহমদ এবং মাহী'—নিশ্চিহ্নকারী; আমার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা কুফুরীর মূল উৎপাটন করিবেন এবং আমার নাম হাশের—একত্রকারী; সমস্ত লোককে হাশরের মাঠে আমার পেছনে একত্রিত করা হইবে এবং আমার নাম "আ'ক্কেব"। (মোছলেম শরীফ ২—২৬১ পৃষ্ঠায় আলোচ্য হাদীছে এই নামটিরও তাৎপর্য্য উল্লেখ আছে যে, والعاقب الذى ليس بعده "আ'ক্কেব" অর্থ সকলের পেছনে আগমনকারী—আমি এমন নবী যেই নবীর পরে আর কোন নবীর আবির্ভাব হইবে না।)

১৮১০। হাদীছ ঃ—(৪৯১ পৃঃ) আবু হয্ম(রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, দীর্ঘ পাঁচ বৎসর আবু হোরায়রা (রাঃ)ছাহাবীর শিষ্যত্বে আমি রহিয়াছে। তাঁহাকে আমি এই হাদীছ বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি, হযরত নবী (দঃ) বলিয়াছেন, বনী ইস্রায়ীলদিগকে নবীগণ পরিচালিত করিতেন—যখন এক নবীর মৃত্যু হইত তখনই তাঁহার স্থলে আর এক নবীর আবির্ভাব হইত, কিন্তু তোমরা নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখিও, আমার পরে কোন নবীর আবির্ভাব হইবে না, অবশ্য আমার স্থলে খলীফা বা কার্য্য পরিচালনকারী দাঁড়াইবে।

ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ সময়ের জন্য আপনি আমাদিগকে কি পরামর্শ দেন? হযরত (দঃ) বলিলেন, প্রথম যে ব্যক্তিকে তোমরা খলীফা নির্ব্বাচিত করিবে তাহার প্রতি সমর্থন বজায় রাখিয়া চলিবে, অতঃপর তাহার পরে যাহাকে নির্ব্বাচিত করিবে তাহার প্রতি—এই ভাবে পর পর নির্ব্বাচিত খলীফাগণের হক আদায় করিয়া যাইবে। (তাহাদেরও সতর্ক থাকিতে হইবে;) স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাহাদের হইতে হিসাব লইবেন যে, তাহারা তোমাদের পরিচালন-কার্য্য কিরূপ সমাধা করিয়াছিল।

১৮১১। হাদীছ ঃ—(৬৩৩ পৃঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তবুকের জেহাদে যাইবার কালে তাঁহার স্থলে আলী (রাঃ)কে মদিনার শাসনভার দিয়া রাখিয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু আলী (রাঃ) (জেহাদে যাওয়ার প্রতি অধিক অনুরাগী ছিলেন, তাই তিনি মনঃক্ষুণ্ণ রূপে) বলিলেন, আমাকে আপনি (জেহাদে অক্ষম) শিশু ও নারীদের দলভুক্তরূপে ছাড়িয়া যাইতেছেন? তখন হযরত (দঃ) আলী (রাঃ)কে সান্ত্বনা দানে বলিলেন, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, মূছা(আঃ) যেরূপ হারুন (আঃ)কে তাঁহার স্থানে বসাইয়া আল্লার আদেশে তুর পর্ব্বতে গিয়াছিলেন তদ্রূপ তুমি আমার স্থানে থাকিবে! অবশ্য (তুমি হারুণ (আঃ)-এর ন্যায় নবুয়ত প্রাপ্ত হইবে না, কারণ) الا انه ليس نبى بعدى "আমার পরে কেহ নবুয়ত পাইতে পারে না।"

১৮১২। হাদীছ ঃ—(১০৩৫ পৃঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, নবুয়তের কোন অংশই বাকি নাই, (যাহা কেহ লাভ করিতে পারে।) শুধু মোবাশ্শেরাত বাকি রহিয়াছে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, মোবাশ্শেরাত কি জিনিস? তিনি বলিলেন, উহা হইল সুস্বপ্ন।

ব্যাখ্যা—নবীর নিকট নবুয়ত সংশ্লিষ্ট অনেক বস্তুই থাকে, যেমন—ওহী, আসমানী কেতাব, মোজেযা ইত্যাদি এই শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বাধিক নিম্নের বস্তু হইল "সুস্বপ্ন"।

বোখারী শরীফ ১০৩৬ ও ১০৩৯ পৃষ্ঠায় এক হাদীছে আছে—رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة "মোমেনগণের সুস্বপ্ন নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের একভাগ" তথা এই বস্তুটি নবুয়ত সংশ্লিষ্ট বস্তুনিচয়ের শ্রেণীভুক্তই বটে, কিন্তু নিম্নস্তরের এবং বহু দূর সম্পর্কীয়। কোন হাদীছে ইহাকে সত্তর ভাগের এক ভাগও বলা হইয়াছে। দূর সম্পর্কটা বুঝানই উভয় হাদীছের উদ্দেশ্য।

আলোচ্য হাদীছের মর্ম্ম এই যে, নবুয়ত সংশ্লিষ্ট বস্তুনিচয়ের মধ্যে একমাত্র এই দূর সম্পর্কীয় বস্তুটিই বাকি রহিয়াছে যাহা মোমেনেরই লাভ হইয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন নবুয়তের আর কোন অংশও বাকি নাই যাহাকে কেহ লাভ করিতে পারে। সুতরাং অন্য কাহারও নবুয়ত লাভের কোন অবকাশই নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—হযরত মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (দঃ) সর্ব্বশেষ পয়গাম্বর ছিলেন, তাঁহার পর কেয়ামত পর্য্যন্ত আর কোন নবীর আবির্ভাব হইবে না। এই সম্পর্কে উল্লেখিত হাদীছ কয়টি শুধু বোখারী শরীফ হইতে উদ্ধৃত করা হইল। এতদ্ভিন্ন মোসলেম শরীফ ও ছেহাহ্-ছেত্তার অবশিষ্ট কেতাব এবং হাদীছ তফছীরের অন্যান্য কেতাবে এত অধিক সংখ্যক হাদীছ বর্ণিত রহিয়াছে যাহা দৃষ্টে বলিতে বাধ্য হইতে হয় এবং ইসলাম ও শরীয়ত বিশেষজ্ঞ সকলেই এক মত হইয়া স্পষ্ট ফৎওয়া দিয়াছেন যে, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) সর্ব্বশেষ পয়গাম্বর, তাঁহার পর আর কোন নবীর আবির্ভাব হয় নাই এবং কেয়ামত পর্য্যন্ত হইবে না— এই আকিদা বা দৃঢ় বিশ্বাস যদি কাহারও না থাকে এবং সে অন্য কাউকে নবীরূপে স্বীকার করে তবে সে নিঃসন্দেহে কাফের গণ্য হইবে ; তাহাকে অমোসলেম বিধর্ম্মী গণ্য করা সকল মোসলমানের পক্ষে ফরজ।

স্বয়ং হযরত (দঃ)ও এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দান করিয়াছেন, যাহার কারণও তিনি এক হাদীছে উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীছটি বোখারী শরীফ ১০৫৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে। হাদীছটি সুদীর্ঘ, উহাতে এই অংশটুকুও রহিয়াছে যে—

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُبْعَثَ

دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبٌ مِّنْ ثَلٰثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ

"কেয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া পর্য্যন্ত আমার উম্মতের মধ্যে এমন এমন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হইবে যাহারা পয়গাম্বর হইবার দাবী করিবে তাহাদের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হইবে।" এইসব প্রতারকদের হইতে সতর্ক করার উদ্দেশ্যেই নবী (দঃ) এইরূপ ঘোষণা শুনাইয়া থাকিতেন, "আমি সর্ব্বশেষ পয়গাম্বর, আমার পর কোন নবীর আবির্ভাব হইবে না।"

রহমতুল-লিল-আলামীন

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"আমি আপনাকে বিশ্ব-কল্যাণ, বিশ্ব-মঙ্গল সারা বিশ্বের জন্য করুণারূপে পাঠাইয়াছি।"

সারা জাহান আল্লার সৃষ্ট, নবীজীও আল্লার সৃষ্ট; সেই সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালাই বলিতেছেন—নবীজী মোস্তফা (দঃ)কে তিনি সারা জাহানের জন্য মঙ্গল ও করুণারূপে পাঠাইয়াছেন। এই তথ্যের সৃষ্টিগত রহস্য নিশ্চয় কিছু রহিয়াছে এবং সেই রহস্যই বড় কারণ নবীজীকে রহমতুল-লিল-আলামীন আখ্যা দেওয়ার। এতদ্ভিন্ন নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দেওয়া শাসন-ব্যবস্থা, সমাজ-ব্যবস্থা ও পারিবারিক জীবন-ব্যবস্থায় যে সব শিক্ষা, নীতি ও আদর্শের প্রতিফলন হইয়াছে সেই সব শিক্ষা, নীতি এবং আদর্শ বিশ্ব-কল্যাণ ও বিশ্ব-মঙ্গলের জন্য মহাদান। উহার অনুসরণ ও অনুকরণে অমোসলেমরাও জাগতিক কল্যাণ লাভে ধন্য হইতে পারে।

নবীজীর হাজার হাজার হাদীছের মধ্যে ঐ সব শিক্ষা, নীতি ও আদর্শের বর্ণনা রহিয়াছে। নমুনা স্বরূপ আমরা ঐ সবের সামান্য আলোচনা করিতেছি।

কল্যাণ ও মঙ্গলময় শাসন-ব্যবস্থা দানে রহমতুল-লিল-আলামীন ঃ

১। নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার মহান আদর্শ।

মঙ্গল ও কল্যাণময় শাসন-ব্যবস্থার সর্ব্ব-প্রথম বৈশিষ্ট হইল, মানুষের ত্রিবিদ নিরাপত্তার মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ। সেই বিষয়ে নবীজীর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ছিল অতুলনীয়। তৎকালীন মোসলমানদের সর্ব্বময় সমাবেশ—বিদায় হজ্জে লক্ষাধিক মোসলমানের উপস্থিতিতে নীতি নির্দ্ধারণী ভাষণে নবীজী (দঃ) ঘোষণা করিয়াছিলেন—"মানুষের জান, মাল ও আবরু-ইজ্জত, এমনকি তাহার চামড়াটুকুও সুরক্ষিত থাকিবে; পরস্পর কাহারও দ্বারা উহার নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হইতে পারিবে না"—রাষ্ট্রের দায়িত্ব থাকিবে প্রতিটি মানুষের এই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান। দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২। সাম্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ ঃ পূর্ব্বোল্লেখিত মৌলিক অধিকারে ও নাগরিকত্বের সুযোগ-সুবিধা ভোগে এবং ইনসাফ ও ন্যায় বিচার লাভে সকলে সমান অধিকারী।

বিদায় হজ্জের সমাবেশেই নবীজী (দঃ) ঘোষণা করিয়াছিলেন—সকল মানুষের আদি পিতা এক আদম; অতএব মানবাধিকার ও ন্যায় বিচারে সকলে সমান পরিগণিত হইবে। আরবী এবং অ-আরবী, সাদা এবং কালার মধ্যে কোন পার্থক্য হইবে না।

আভিজাত্যের গর্ব্বে নবীজীর নিজ বংশ কোরেশ গোত্র সর্ব্বাগ্রে ছিল। তাই মক্কা বিজয়ের ভাষণেও নবীজী অভিজাত-অনভিজাত, উচ্চ-নীচ ইত্যাদির ব্যবধানে যে, বিচারে পার্থক্য প্রচলিত ছিল তাহার উচ্ছেদ ঘোষণা করিয়া বিচারে সকলকে সমান সাব্যস্ত করিয়া ছিলেন (তৃতীয় খণ্ড মক্কা বিজয় দ্রষ্টব্য)।

৩। সংখ্যালুঘুর প্রতি অসীম উদারতা এবং তাহাদের স্বার্থ রক্ষা ও নাগরিকত্বের পুর্ণ সুযোগ-সুবিধা দানের নিশ্চয়তা বিধান।

নবী (দঃ) ঘোষণা দিয়াছেন—যে ব্যক্তি কোন অমোসলেম অনুগত নাগরিককে অত্যাচার করিবে বা তাহার প্রাপ্য কম দিবে কিম্বা তাহার উপর অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিবে অথবা তাহার মনস্তুষ্টি ছাড়া তাহার কোন বস্তু হস্তগত করিবে—ঐরূপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমি কেয়ামত দিবসে আল্লার দরবারে ফরিয়াদী হইব (মেশকাত শঃ ৩৫৪)।

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, অমোসলেম অনুগত নাগরিককে যে মোসলমান হত্যা করিবে সে বেহেশতের গন্ধও পাইবে না (বোখারী শরীফ ১০২১)।

৪। নিরাশ্রয়, অসহায়, এতিম-বিধবা—নিঃস্বদের প্রতিপালনে রাষ্ট্রের উপর ব্যাপক দায়িত্ব অর্পণ। কথায় বা কলমে অর্পণই নয় শুধু, স্বয়ং নবীজী ঐ দায়িত্ব বহন করিয়াছেন এবং সকল রাষ্ট্রনায়কের উপর তাহা বর্ত্তাইয়া গিয়াছেন।

যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করিয়া এবং উহার ব্যবস্থাও না রাখিয়া মরিয়া যাইত প্রথম দিকে নবীজী তাহার জানাযার নামায নিজে পড়িতেন না। অতঃপর বাইতুল-মাল প্রতিষ্ঠার উদ্বোধনী ভাষণে নবীজী মোস্তফা (দঃ) এক যুগান্তকারী ঘোষণা প্রদান করিলেন, من ترك دينا او ضياعا فعلى "যে কোন অসহায় ব্যক্তি প্রাণ বাঁচাইবার তাগিদে ঋণ করিয়া উহা পরিশোধে অক্ষম অবস্থায় মরিয়া যাইবে কিম্বা নিরাশ্রয় এতিম-বিধবা রাখিয়া যাইবে তাহার সেই ঋণ পরিশোধ করা এবং এতিম বিধবার প্রতিপালন রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে আমার জিম্মায় থাকিবে। বাইতুল-মাল—সরকারী ধনভাণ্ডারের প্রথম ব্যয়-বরাদ্দই ইহা। (বোখারী শরীফ)

৫। জনগণের শিক্ষা-দিক্ষা ও নৈতিক চরিত্র গঠনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত।

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, "রাষ্ট্রনায়ক যে জনগণের শাসক হইয়াছে সে জনগণকে পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছে; জনগণের সম্পর্কে সে দায়ী থাকিবে। (বোখারী)

৬। ক্ষমতাসীন হইয়া জনগণের প্রয়োজনের আড়ালে থাকিতে পারিবে না।

নবীজী (দঃ) বলিয়াছেন, মোসলমান জনসাধারণের শাসনক্ষমতায় সমাসীন হইয়া যে ব্যক্তি তাহাদের অভাব-অভিযোগ হইতে আড়ালে থাকিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার অভাব-অভিযোগ হইতে আড়ালে থাকিবেন (মেশকাত শরীফ ৩২৪)।

বোখারী শরীফে আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দারোয়ান ছিল না।

৭। শাসন পরিচালকদের ন্যায়-নিষ্ঠাবান হইতে হইবে।

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দশজন লোকের উপর ক্ষমতাধিকারী ছিল তাহাকেও কেয়ামত দিবসে গলবদ্ধ শৃঙ্খলে বাঁধা অবস্থায় হাসর মাঠে উপস্থিত হইতে হইবে। অতঃপর হয় তাহার ন্যায়পরায়নতা তাহাকে মুক্ত করিবে, না হয় তাহার অত্যাচার-অবিচার তাহাকে ধ্বংসের নরকে পতিত করিবে (মেশকাত ৩২১)।

নবীজী বলিয়াছেন, কেয়ামত দিবসে আল্লার অধিক নৈকট্য লাভকারী এবং অধিক ভালবাসার পাত্র হইবে ন্যায়পরায়ন শাসক। আর সর্ব্বাধিক গজবের পাত্র এবং আজাবে লিপ্ত হইবে অত্যাচারী শাসক। (ঐ ৩২২)

৮। শাসকদের কর্ত্তব্য জনগণের আস্থাভাজন ও প্রিয় হওয়া।

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, উত্তম শাসক তাহারা যাহাদিগকে জনগণ ভালবাসে এবং তাহাদের জন্য দোয়া করে, তাহারাও জনগণকে ভালবাসে এবং তাহাদের জন্য দোয়া করে। আর নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত শাসক তাহারা যাহাদের প্রতি জনগণ বিদ্বেষ পোষণ করে এবং অভিসাপ করে, তাহারাও জনগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং অভিসাপ করে (মেশকাত শরীফ ৩১৯)।

৯। ক্ষমতায় থাকিয়া জনগণের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, ক্ষমতাসীন হইয়া যে ব্যক্তি জনগণকে তাহাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের সহিত প্রতিপালন না করিবে সে বেহেশতের গন্ধও পাইবে না (বোখারী শঃ)

১০। ক্ষমতালাভ করিয়া জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না।

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি শাসক হইয়া জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকরূপে মরিবে আল্লাহ তাহার জন্য বেহেশত হারাম করিয়া দিবেন। (মেশকাত শরীফ ৩২১)

১১। ক্ষমতা লাভ করিলে সতর্ক থাকিবে যেন জনগণের জীবনমান সঙ্কীর্ণ না হয়।

নবী (দঃ) এই দোয়া করিতেন, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের উপর ক্ষমতা লাভ করিয়া তাহাদের জীবনকে সঙ্কীর্ণ করিয়া তোলে তুমি ঐ ব্যক্তির জীবনকে সঙ্কীর্ণ করিয়া দাও। আর যে ব্যক্তি ক্ষমতা লাভ করিয়া তাহাদের জীবন-যাপনকে সহজ করিয়া তোলে তুমি তাহার সব কিছুকে সহজ করিয়া দাও। (মেশকাত শঃ ৩২১)

কত শাসক নির্ব্বাসিত বা কারাগারের জীবন যাপনে বাধ্য হয়। কত শাসক সবংশে ধ্বংস হইয়া যায়; জীবন সঙ্কীর্ণ হওয়ার পরিণাম ইহজগতে এই, পরকালে আরও যে কত সঙ্কীর্ণ হইবে!

১২। কোন শাসক বা আমলা সরকারী ধন অন্যায়ভাবে ব্যয় করিবে না।

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, কোন কোন লোক আল্লার তথা জনগণের সরকারী মালের অন্যায় ব্যবহার করে কেয়ামত দিবসে তাহাদের জন্য নরক নির্দ্ধারিত (বোখারী শঃ)।

১৩। উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষেরও সরকারী ধন নির্দ্ধারিত পরিমাণের বেশী ব্যয় করা হারাম। ঐ

১৪। শাসক-প্রশাসকদের অবশ্যই সরল-সহজ, ভোগ-বিলাসবিহীন, অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করিতে হইবে।

নবী (দঃ) ছাহাবী মোয়াজ (রাঃ)কে ইয়ামন দেশের গভর্ণর পদে নিযুক্ত করিয়া বিদায়কালীন উপদেশ দানে বলিয়াছিলেন—বিলাসিতার জীবন-যাপনকে সযত্নে পরিহার করিয়া চলিবে। আল্লাহ-ভক্ত লোক বিলাসপ্রিয় হয় না। মেশকাত শঃ ৪৪৯

নবী (দঃ) মোআজ (রাঃ)কে ইয়ামনের গভর্ণর মনোনীত করিলেন। তিনি যাত্রা করিয়া যাওয়ার পর নবী (দঃ) সংবাদ পাঠাইয়া তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইলেন এবং বলিলেন, আমার অনুমতির বাহিরে কোন কিছু ব্যয় করিবে না। ঐরূপ ব্যয় খেয়ানত ও আত্মসাধ গণ্য হইবে এবং কেয়ামত দিবসে ঐ খেয়ানতের বোঝা ঘাড়ে করিয়া হাশরের মাঠে উপস্থিত হইতে হইবে। এই সতর্কবাণীর জন্যই প্রত্যাবর্ত্তন করাইয়াছিলাম; এখন নিজ কার্য্যস্থলে যাত্রা কর। (মেশকাত শরীফ ৩২৬)

১৫। রাষ্ট্রপ্রধান হইয়াও ব্যক্তিগত জীবনমানের উপরই চলিবে, নিজ অবস্থার উর্দ্ধে ভোগ-বিলাসে রাষ্ট্রের ধন ব্যয় করিবে না।

নবীজীর গোটা জীবনই উক্ত আদর্শের মহাগ্রন্থ ছিল। তাঁহার বাসস্থান খেজুর গাছের খুঁটি ও আড়ায় তৈরী ছিল, এত সঙ্কীর্ণ ছিল যে, তিনি তাহাজ্জুদ নামাযে দাঁড়াইলে বিবি আয়েশা (রাঃ) শায়িত অবস্থায় সম্মুখে থাকিতেন, তাঁহার পা গুটাইলে নবীজী সেজদা করিতে পারিতেন। এতটুকু মাত্র উঁচু ছিল যে, ১২।১৪ বৎসরের বালকের হাত উহার ছাদ পর্য্যন্ত পৌছিত। দরওয়াজায় লোমের চট লটকানো ছিল। তাঁহার গৃহের উনুতে মাসেককাল পর্য্যন্ত আগুন জ্বলিত না; পরিবারবর্গ খেজুর ও পানির উপর জীবন যাপন করিতেন। যখন রুটি জুটিত বেশীর ভাগ জবেরই হইত, গমের রুটি এবং গোশ্‌ত কমই হইত; পাত্‌লা চাপাতি রুটিত কখনও গৃহে তৈরী হইত না। কাপড়ে নিজ হাতে তালি লাগাইতেন, ছেড়া জুতা নিজ হাতেই সেলাই করিতেন।

এইরূপে সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের হাজার হাজার নজীর নবীজীর জীবনে রহিয়াছে। অথচ নবীজী (দঃ) রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন, তাঁহার হস্তে কত কত বিজয় লাভ হইয়াছে। লক্ষ-কোটি টাকা সরকারী আয় তাঁহারই হাতে বন্টিত ও ব্যয়িত হইয়াছে; সব তিনি জনগণের মধ্যে ব্যয় করিয়াছেন। ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫নং আদর্শাবলীর বদৌলতেই ৪ নম্বরে বর্ণিত যুগান্তকারী ঘোষণা ও বিধানটি বাস্তবায়িত করা শুধু সম্ভবই নয়, বরং সহজ হইয়া ছিল। বর্ত্তমান যুগে রাষ্ট্রপ্রধান এবং তাঁহারই অনুপাতে আমলাগণের মাথাভারী ব্যয় বহুল প্রতিপালনে সরকারী ধন-ভাণ্ডার খালি হইয়া যায়, তাই ৪ নং বিধানের অবকাশ স্বপ্নে দেখাও ভাগ্যে জুটে না।

১৬। রাষ্ট্রপ্রধান হইয়াও রাষ্ট্রীয় কার্য্যে সকলের সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া, সকলের সুখে-দুঃখে সমভাবে শরীক থাকিয়া কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

নবীজী মোস্তফা (দঃ) খন্দকের জেহাদে মাসেক কাল পর্য্যন্ত পরিখা খননে শরীক রহিয়াছেন। জরুরী অবস্থার ভয়াবহতায় অনাহারী থাকিতে হইয়াছে, ফলে কোমর শক্ত রাখার জন্য পেটে পাথর বাঁধিতে হইয়াছে; ছাহাবীগণ এক একটি পাথর বাঁধিয়াছেন, আর নবীজী (দঃ)কে দুইটি পাথর বাঁধিতে হইয়াছে। জাবের (রাঃ) ছাহাবীর বাড়ীতে গোপনে দাওয়াত লাভ করিয়াছেন, কিন্তু একা না খাইয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া দাওয়াত খাইতে গিয়াছেন (বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে খন্দকের জেহাদ দ্রষ্টব্য) রহমতুল-লিল-আলামীনের কিঞ্চিৎ মাত্র তাৎপর্য্য ইহা।

১৭। দেশ রক্ষায় বিপদ সঙ্কুল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আত্মদান অগ্রভাগে থাকিতে হইবে।

একদা রাত্রিবেলা মদিনা শহরের নিকটবর্ত্তী একটি ভীতিজনক শব্দ শ্রুত হইল। শহরের লোকজন ঘটনার অনুসন্ধানে যাইবে, কিন্তু শত্রুর আক্রমণ-শব্দ কি-না সেই ভয়ে তাহারা লোকজন জমা করিয়া যাত্রা করিল। এদিকে নবীজী (দঃ) ঐ শব্দ শুনার সঙ্গে সঙ্গে একাই তরবারি কাঁধে ঝুলাইয়া অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক সমগ্র শহরতলি এলাকা পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। সকলকে সান্ত্বনা দিলেন যে, তোমাদের যাইতে হইবে না, আমি সর্ব্বত্র দেখিয়া আসিয়াছি ভয়ের কোন কারণ নাই।

ওহোদ এবং হোনায়ন রণাঙ্গণে নবীজীর ভূমিকা উন্নয়নকামী জাতির রাষ্ট্রপ্রধানদের জন্য সোনালী আদর্শরূপে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। (তৃতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য)

১৮। রাষ্ট্রপ্রধান সর্ব্বক্ষেত্রে প্রশাসক ও আমলাগণকে সততা, শান্তি ও ন্যায়ের জন্য তাকিদ করিবে। এমনকি যুদ্ধ-জেহাদের সামরিক অভিযান ক্ষেত্রেও।

নবী (দঃ) জেহাদ অভিযানে সৈন্য বাহিনীর বিদায় মুহূর্ত্তে এই উপদেশ দিতেন— "আল্লার সাহায্য কামনা করিয়া আল্লার দ্বীনের জন্য জেহাদ করিও। আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করিও। কোন কিছু আত্মসাধ করিও না, বিশ্বাসঘাতকতা করিও না, নাক-কান কাটিয়া শত্রুকে যাতনা দিও না, শিশুকে হত্যা করিও না। মেশকাত শরীফ

১৯। যুদ্ধের জরুরী অবস্থায়ও শান্তির জন্য এবং সত্যকে বুঝিবার সুযোগদানে শত্রুর প্রতিও উদার থাকার আদর্শ ত্যাগ করিতে নাই। শত্রুর নিধন অপেক্ষা তাহার সংশোধনকে অগ্রগণ্য করিবে।

খয়বর যুদ্ধে প্রায় মাসেক কাল ভীষণ যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়ার পর চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য যখন আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হস্তে নবীজী (দঃ) পতাকা অর্পণ করিতেছিলেন সেই মুহূর্ত্তে আলী (রাঃ) দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি দানে শত্রুর উপর দ্রুত ঝাপাইয়া পড়ার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে রহমতুল-লিল-আলামীন নবীজী মোস্তফা (দঃ) আলী (রাঃ)কে তাঁহার মনোভাবে বাধা দিয়া বলিলেন, ধীরস্থিররূপে অগ্রসর হইবে, শত্রুর অবস্থানের নিকট পৌছিয়া তাহাদের নিকট ইসলাম পেশ

করিবে। তাহা গ্রহণ না করিলে ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য গ্রহণের প্রস্তাব করিবে তাহাতেও কর্ণপাত না করিলে আল্লার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিবে। তখনও স্মরণ রাখিবে—তোমার অছিলায় আল্লাহ তায়ালা একটি মাত্র ব্যক্তিকে সৎ পথ দান করিলে উহা তোমার জন্য সর্ব্বোচ্চ সম্পদ অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যের কারণ হইবে (বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ড ১৩৪৭ নং হাদীছে)।

২০। শান্তির খাতিরে শত্রুর সহিতও আপোস-মীমাংসায় চরম ধৈর্য্য ও পরম উদারতা অবলম্বন করিবে।

এই বিষয়ে নবীজী (দঃ) যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, উহার নজীর ইতিহাসে বিরল। হোদায়বিয়া-সন্ধি উপলক্ষে বিরাট শক্তি-সামর্থের অধিকারী হইয়াও নবীজী (দঃ) শত্রুপক্ষের অন্যায় জেদের সম্মুখে উদারতা ও ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন—যাহা শুধু শান্তির জন্য ও আপোসের জন্য ছিল।

হিজরতেরও ছয় বৎসর পর যখন খন্দকের যুদ্ধে ইসলাম ও মোসলমানদের শত্রু শিবীর ধ্বসিয়া পড়ার পথে ছিল এবং ইসলাম শক্তিশালী হইয়া উঠিয়া ছিল। নবীজীর সঙ্গে প্রায় পনর শতের আত্মোৎসর্গকারী দল ছিল যাহাদের মাত্র তিন শতই বদর-রণাঙ্গণে মক্কাবাসীদেরে চরম পরাজিত ও পর্য্যুদস্ত করিয়া ছিল। নবীজীর সঙ্গে এত বড় শক্তি; তিনি ঐ পনর শত লোক লইয়া আল্লার ঘর জেয়ারত উদ্দেশ্যে তিন শত মাইল দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতঃ মক্কার সন্নিকটে মাত্র নয় মাইল ব্যবধানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। মক্কাবাসীরা এমতাবস্থায় আল্লার ঘর জেয়ারতে তাঁহাকে বাধা দিল—অগ্রসর হইতে দিবে না। এই চরম উত্তেজনার মুহূর্ত্তে শান্তির নবী রহমতুল-লিল-আলামীন দৃঢ় কণ্ঠে শপথের সহিত ঘোষণা করিলেন—সম্মানিত আল্লার স্মৃতি সমূহের সম্মান ক্ষুন্ন না হয় এরূপ যে কোন শর্ত্ত তাহারা আরোপ করিবে আমি মানিয়া লইব।

যেমন ঘোষণা তেমন কার্য্য—সন্ধিপত্র লিখিতে বিছমিল্লাহ লেখায়, "রসুলুল্লাহ" লেখায় আপত্তি; সব আপত্তিই মানিলেন। তিন শত মাইলের পরিশ্রম নিষ্ফল করিয়া আল্লার ঘর জেয়ারত ছাড়াই প্রত্যাবর্ত্তনের শর্ত্ত সহ আরও অনেক অবাঞ্ছিত শর্ত্ত মানিয়া লইলেন তবুও মক্কাবাসীদের সহিত দশ বৎসর মেয়াদের "যুদ্ধ নয়" শান্তিচুক্তি সম্পাদন করিয়া মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন (বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে)।

২১। আন্তর্জাতিক সৌহার্দ গড়িয়া তোলা ও বজায় রাখার আদর্শে সচেষ্ট থাকিবে।

বিদেশী প্রতিনিধিবৃন্দ এবং কুটনৈতিক মিশনসমূহের সদস্যগণকে নবীজী (দঃ) সম্মান ও প্রীতির উপহার দিয়া থাকিতেন। এমনকি মৃত্যুশয্যায় নবীজী মোসলেম জাতিকে যে সব উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে ইহাও ছিল যে—"আমি যেরূপ বিদেশী প্রতিনিধিবৃন্দকে উপহার দিয়া থাকিতাম তোমরাও সেইরূপ উপহার দিও"।

২২। ক্ষমতার সর্ব্বোচ্চে থাকিয়াও নিজ ব্যাপারে ক্ষমার আদর্শ পালন করিবে।

এই বিষয়ে নবীজীর অসংখ্য ঘটনা বিদ্যমান রহিয়াছে। একবার এক জেহাদের ছফরে বিশ্রাম নেওয়া অবস্থায় নবীজী (দঃ) সঙ্গীগণ হইতে ভিন্ন একা একটি বৃক্ষের ছায়ায় ঘুমাইয়া পড়িলেন; তাঁহার তরবারি লটকাইয়া রাখিয়া ছিলেন। এক বেদুইন কাফের এই সুযোগে নবীজীর তরবারীটি হস্তগত করিয়া নবীজীর উপরই উহা তুলিয়া ধরিল। এমতাবস্থায় নবীজীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, চোখ খুলিয়া তাঁহার উপর তরবারী ধরা দেখিতে পাইলেন। বেদুইন হুঙ্কার মারিয়া নবীজীকে প্রশ্ন করে, আপনাকে আমার হইতে কে রক্ষা করিতে পারে? নবীজী গম্ভীর স্বরে বলিলেন, আল্লাহ্। এই শব্দের স ঙ্গ সঙ্গে বেদুইনের হস্তে কম্পন সৃষ্টি হইয়া তরবারী হাত হইতে পড়িয়া গেল। নবীজী (দঃ) তরবারী হাতে লইয়া ছাহাবীগণকে ডাকিলেন এবং বেদুইনকে দেখাইয়া ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। এত বড় ঘটনা, কিন্তু নবী (দঃ) বেদুইনকে ক্ষমা করিয়া দিলেন (বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে ১৪৮৭ নং হাদীছ)।

২৩। ক্ষমতার প্রতাপে অন্যায়-অত্যাচার কখনও করিবে না।

ইয়ামন দেশের গভর্ণররূপে নবী (দঃ) মোয়াজ (রাঃ)কে নিয়োগ করিয়া বিদায়-কালের উপদেশ দানে বলিলেন, কাহারও প্রতি অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম করিয়া তাহার বদদোয়ার পাত্র হইও না। মজলুমের বদদোয়া সরাসরি আল্লাহ তায়ালার দরবারে পৌঁছিয়া থাকে। (বোখারী শরীফ)

২৪। যুদ্ধের আক্রমণ ক্ষেত্রেও মানুষকে বাঁচাইবার যথাসাধ্য সুযোগ দিবে।

মক্কা বিজয় সময়ে শহর হইতে ১২।১৪ মাইল দূরে রাত্রি যাপন করিয়া শহরে প্রবেশের জন্য যাত্রাকালে নবীজী (দঃ) তাঁহার দশ সহস্র সেনা বাহিনীকে নির্দ্দেশ দিয়া ছিলেন—আক্রান্ত না হইয়া আক্রমণ করিও না এবং নিরাপত্তার দ্বার অনেক সূত্রে খুলিয়া দিলেন। যথা—(১) যে অস্ত্র সমর্পণ করিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা, (২) যে গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া নিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা, (৩) যে মসজিদে আশ্রয় লইবে তাহার জন্য নিরাপত্তা, (৪) যে আবু সুফিয়ান সর্দ্দারের গৃহে আশ্রয় নিবে তাহার জন্য নিরাপত্তা। (তৃতীয় খণ্ডে মক্কা বিজয় দ্রষ্টব্য)

২৫। বিজিতদের উপর বিগত আক্রোশে প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ মূলক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে উদার নীতি গ্রহণ করিবে।

মক্কা বিজয়ের দিনই দীর্ঘ ২১ বৎসরের জালেম শত্রুদের প্রতি নবীজী (দঃ) ঘোষণা করিয়াছিলেন—"তোমাদের কাহারও প্রতি কোন অভিযোগ নাই; তোমরা মুক্ত।"

২৬। চরম বিজয়ী হইয়াও পরম বিনয়ী থাকার মহান আদর্শ পালন করিবে।

মক্কা বিজয় নবীজীর জন্য মহাবিজয় ছিল, এই ক্ষেত্রেও তিনি এতই বিনয়ী ছিলেন যে, শহরে প্রবেশ কালে তিনি নতশিরে প্রবেশ করিয়াছেন। এমনকি তাঁহার নাক তাঁহার বাহনের পৃষ্ঠে ঘর্ষণ খাইতে ছিল।

২৭। আইনের শাসন প্রয়োগে স্বজন-প্রীতির বিপরীত স্বজনদের উপর সর্বাগ্রে আইন প্রয়োগ করিতে হইবে। এই আদর্শে নবীজীর কার্য্যক্রম ছিল অতুলনীয়।

বিদায় হজ্জের ভাষণে অন্ধকার যুগের রীতি নীতির উচ্ছেদ এবং ইসলামী আইনের প্রবর্ত্তন ঘোষণায় যখন তিনি বলিতেছিলেন—বংশ, গোত্র বা অঞ্চল হিসাবে খুনের প্রতিশোধ গ্রহণ রহিত ও বেআইনী হইল, হত্যাকারী ভিন্ন অন্য কাহারও হইতে খুনের প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাইবে না; তখন দৃঢ়কণ্ঠে তিনি এই ঘোষণাও করিলেন, আমার বংশ কোরেশদের একটি খুনের প্রতিশোধ প্রাপ্য রহিয়াছে বনু-হোজায়েল গোত্রের উপর। ইসলামের আইন প্রয়োগে সর্বপ্রথম ঐ প্রতিশোধ গ্রহণ বাতিল ঘোষিত হইল।

তদ্রূপ সুদ বাতিল ঘোষণা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নবীজী (দঃ) দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, আমার পিতৃব্য আব্বাসের সুদী ব্যবসার সমুদয় সুদ সর্বপ্রথম বাতিল ঘোষিত হইল (দ্বিতীয় খণ্ড বিদায় হজ্জের ভাষণ দ্রষ্টব্য)।

২৮। আইনের বিচারে আপন-পর সকলকে এক দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে, ন্যায় বিচারে আপনদের বেলায় কঠোর থাকিতে হইবে।

মক্কাবিজয় লগ্নে কোরেশ বংশীয় এক রমণীর উপর চুরি প্রমাণিত হইল। ইসলামী আইনের বিচারে তাহার হাত কর্ত্তনের ভয়ে কোরেশগণ বিচলিত হইয়া নবীজীর নিকট সুপারিশ পাঠাইল। সেই সুপারিস প্রত্যাখ্যানে নবীজী (দঃ) জনসমাবেশে ভাষণ দিলেন এবং বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—মোহাম্মদ-তনয়া ফাতেমার উপরও যদি চুরি প্রমাণিত হয়, খোদার কসম—বিনা দ্বিধায় আমি তাহার হাত কাটিয়া দিব।

২৯। ভোট দান, মনোনয়ন দান ইত্যাদি রাজনৈতিক নির্ব্বাচন ও সমর্থন ব্যক্তিগত স্বার্থ বা আশা ও লোভ-লালসার ভিত্তিতে করিবে না।

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি শাসক নির্বাচনে ভোট বা সমর্থন দেয় নিজ স্বার্থের উদ্দেশ্যে—তাহার স্বার্থ পূরণ করিলে সমর্থন বজায় রাখে, নতুবা সমর্থন প্রত্যাহার করে; এইরূপ ব্যক্তির উপর কেয়ামত দিবসে ভয়াবহ আজাব হইবে। আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি নেক দৃষ্টি করিবেন না; গোনাহও মাফ করিবেন না।

৩০। রাষ্ট্রের ও শাসন কর্ত্তৃপক্ষের আনুগত্যে সংহতি বজায় রাখিবে।

নবীজী (দঃ) মোসলমানদের হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন—নরমে-গরমে, আনন্দে-নিরানন্দে—সর্বাবস্থায়, এমনকি নিজের অপেক্ষা অন্যের অধিক সুযোগ-সুবিধা দেখিয়াও রাষ্ট্রের অনুগত থাকিবে এবং যোগ্য ব্যক্তির প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অবতীর্ণ হইবে না, সর্বক্ষেত্রে সত্যের উপর সুদৃঢ় থাকিবে, আল্লার সন্তুষ্টি লাভের কাজে কাহারও নিন্দামন্দের পরওয়া করিবে না। (বোখারী শরীফ)

৩১। অন্যায় অত্যাচার ও নৈতিকতার বিপরীত—সৃষ্টিকর্ত্তার নাফরমানী কাজে রাষ্ট্রকেও জনগণ সমবেতভাবে বাধা দান করিবে।

নবীজী (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লার নাফরমানী কাজে রাষ্ট্রের আনুগত্য চলিবে না। রাষ্ট্রের আনুগত্য শুধু মাত্র বৈধ কার্য্যে। (বোখারী শরীফ)

৩২। ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের সংহতি বিনষ্ট করিবে না।

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, শাসন কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে নিজের নাপছন্দ কোন কিছু দেখিলে ধৈর্য্য ধরিবে—সংহতি নষ্ট করিবে না। যে কোন ব্যক্তি সুসংহত ব্যবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দাঁড়াইবে তাহার জীবন অন্ধকার যুগের অনৈছলামিক জীবন হইবে (মেশকাত শরীফ ৩১৯)।

৩৩। ক্ষমতাসীনদের অপকর্ম্মে সমর্থন দিবে না; উহা জঘন্য পাপ।

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, পরবর্ত্তী যুগে নানারকম শাসক হইবে, যাহারা সেই শাসকদের নৈকট্যের জন্য তাহাদের মিথ্যাকে সত্য বলিবে এবং তাহাদের অন্যায়ের সমর্থন করিবে—ঐ শ্রেণীর লোক আমার উম্মত হইতে খারিজ। তাহাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নাই, হাওজে-কাওছারের পানি তাহাদের ভাগ্যে জুটিবে না (মেশকাত ৩২২)।

৩৪। শাসন ক্ষমতায় আসিবার জন্য নিজে উদ্যমী হইবে না।

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, শাসন ক্ষমতা নিজে চাহিয়া লইও না অন্যথায় আল্লার সাহায্য হইতে বঞ্চিত থাকিবে। নিজের চেষ্টা ছাড়া উহা তোমাকে অর্পণ করা হইলে উহা পরিচালনায় আল্লার সাহায্য পাইবে। (বোখারী শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, তোমরা শাসন ক্ষমতা লাভে লালায়িত হইবে, কিন্তু কেয়ামত দিবসে উহা বিষম অনুতাপের কারণ হইবে। এতদ্ভিন্ন শাসন ক্ষমতার আরম্ভ অতি মিষ্ট, কিন্তু উহার পরিণাম অতি তিক্ত। (বোখারী শরীফ)

৩৫। শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য ছুটাছুটির প্রবণতা নিতান্তই অবাঞ্ছনীয়।

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে শাসন ক্ষমতাকে নিজের জন্য তিক্ত গণ্য করে; অবশ্য যদি উহাকে তাহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। (বোখারী শঃ)

৩৬। শাসনকর্ত্তাদের সম্বর্দ্ধনা ও মানপত্র-দান ইত্যাদির প্রবণতা বাঞ্ছনীয় নহে। ইমাম বোখারী (রঃ) বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা ইহা প্রমাণ করিয়াছেন, ১০৬৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩৭। শাসনকর্ত্তাদের উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করা চাই না—উহা তাহারা ভোগ করিতে পারিবে না। (বোখারী শরীফ ১০৬৪ পৃঃ)

৩৮। আইন প্রয়োগ এবং শাসন পরিচালনে কঠোরতা এড়াইয়া সহজ পন্থার এবং আইনের প্রতি জনগণকে বিতশ্রদ্ধ না করিয়া আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

নবী (দঃ) কাহারও উপর শাসন ক্ষমতা অর্পণ করিলে তাহাকে উপদেশ দিতেন, আইনের প্রতি লোকদেরকে আকৃষ্ট করিও তাহাদের মধ্যে ঘৃণা ও ভীতির সঞ্চার করিও না। সহজ পন্থার ব্যবস্থা করিও, কঠোরতা অবলম্বন করিও না। (বোখারী)

৩৯। শুধু আইনের শাসন চালাইবে না, উপদেশ দানে অধিক তৎপর থাকিবে।

নবী (দঃ) বাদী-বিবাদী উভয়কে সুস্পষ্ট ভাষায় উপদেশ দানে বলিতেন, আমি তোমাদের বর্ণনা শুনিয়া বিচার করিব ; হয়ত তোমাদের একজন অধিক বাকপটু (সে মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পায়।)

জানিয়া রাখিও—বিবরণের উপর বিচারে অপরের হক্ পাইয়া ফেলিলেও উহা তাহার জন্য দোযখের অগ্নি হইবে (উহা কখনও ভোগ করিবে না।) বোখারী শরীফ

৪০। শাসনকার্য্য পরিচালনায় প্রশাসকদের পরস্পর সহযোগীতা প্রয়োজন, বিভেদ সৃষ্টি করিবে না।

নবী (দঃ) ইয়ামন দেশের দুই অঞ্চলে বা দুই শাখায় দুইজন প্রশাসক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের বিদায়ী উপদেশে বলিয়া দিলেন—তোমরা পরস্পর সহযোগীতার সহিত কাজ করিবে, বিরোধ-বিভেদ সৃষ্টি করিবে না। (বোখারী শরীফ)

কল্যাণ ও মঙ্গলময় শাসন ব্যবস্থার এইরূপ শত শত শিক্ষা ও আদর্শ নবীজী (দঃ) দান করিয়াছেন—যাহার অনুসরণে অমোসলেমরাও জাগতিক কল্যাণ লাভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে উহা এড়াইয়া গিয়া মোসলমানগণও অবনতির গহ্বরে পতিত হইয়াছে।

কল্যাণ ও মঙ্গলময় সমাজ-ব্যবস্থা দানে রহমতুল-লিল-আলামীন ঃ

সুখ-শান্তির সমাজ, উন্নত ও প্রগতিশীল সমাজ, কল্যাণ ও মঙ্গলের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য বিশেষ প্রয়োজন হয় সমাজের লোকদের মধ্যে সদ্ভাব-সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব, একতা ও শৃঙ্খলা, পরস্পর সহযোগীতা ও সাহায্য-সহায়তা। আরও প্রয়োজন হয় কনিষ্ঠদের উপর জ্যেষ্ঠদের প্রভাব, কনিষ্ঠদের প্রতি জ্যেষ্ঠদের স্নেহ-মমতা এবং শ্রেণীগত বিভেদের মূল উচ্ছেদ। আর বিশেষ ভাবে প্রয়োজন হয় সমাজের সর্বস্তরে শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং জ্ঞান বিস্তারের সুব্যবস্থা। সুতরাং সুখের সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সমাজের লোক-জনকে ঐ সব গুণের শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে, তাহাদিগকে নরমে-গরমে ঐ সব গুণের প্রতি আকৃষ্ট করিতে হইবে, ঐ সব গুণে গুণান্বিতরূপে তাহাদিগকে গড়াইয়া তুলিতে হইবে। এই পথে নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যে সব শিক্ষা ও আদর্শ রহিয়াছে তাহা শুধু বিরলই নহে, বিশ্ব উহা হইতে সম্পূর্ণ অজ্ঞও ছিল। নমুনা স্বরূপ আমরা তাঁহার ঐ শ্রেণীর শিক্ষা ও আদর্শের সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করিতেছি—

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—নবীজী (দঃ) কাহারও প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধে কখনও দুর্ব্যবহার করিতেন না, বরং কেহ দুর্ব্যবহার করিলে তাহা ক্ষমা করিতেন এবং অন্তর হইতে উহা মুছিয়া ফেলিতেন। (তিরমিজী শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি লোকদের প্রতি সদয় নয় আল্লাহও তাহার প্রতি সদয় হইবেন না (বোখারী)। নবীজী (দঃ) বলিয়াছেন, মোমেনগণ সকলে মিলিয়া একটি দেহের ন্যায় হইতে হইবে ; উহার চোখে ব্যথা হইলে সারা দেহে ব্যথা হইবে, মাথায় যাতনা হইলে সমস্ত দেহে যাতনা হইবে। (মোসলেম শরীফ)

নবীজী (দঃ) বলিয়াছেন, নিঃসহায় এবং এতিম-বিধবাদের সহায়তাকারী ঐ ব্যক্তির সমতুল্য যে আল্লার পথে জেহাদ করে বা সারা রাত্র নামায পড়ে, প্রতিদিন রোযা রাখে।

নবীজী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অপর মোসলমানের প্রয়োজন মিটাইবে আল্লাহ তাহার প্রয়োজন মিটাইবেন। যে ব্যক্তি অপর মোসলমানের একটি দুঃখ দূর করিবে আল্লাহ কেয়ামত দিবসে তাহার অনেক দুঃখ দূর করিবেন। যে ব্যক্তি অপর মোসলমানের মান-ইজ্জত রক্ষা করিবে, আল্লাহ তাহার মান-ইজ্জত রক্ষা করিবেন। (বোখারী)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যাহার হইতে ভালোর আশা করা যায় এবং মন্দের ভীতি না থাকে সে-ই উত্তম মানুষ। পক্ষান্তরে যাহার হইতে ভালোর আশা না থাকে এবং মন্দের আশঙ্কা থাকে সে-ই খারাব মানুষ। (তিরমিজী শরীফ)

নবীজী(দঃ) বলিয়াছেন, মোসলমানদের পরস্পর ছয়টি দাবী—(১)সাক্ষাতে সালাম করিবে, (২) আহ্বানে সাড়া দিবে, (৩) সাহায্য প্রার্থীকে উপকার করিবে, (৪) হাঁছি দিয়া আল্‌হামদু-লিল্লাহ বলিলে ইয়ারহামু-কাল্লাহ বলিয়া দোয়া দিবে, (৫)রোগে-শোকে খোঁজ-খবর নিবে, (৬) মরিয়া গেলে কাফন-দাফনে শরীক হইবে। (মোসলেম শরীফ)

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) রুগীকে দেখিতে যাইতেন, জানাযার সঙ্গে গমন করিতেন, কোন দাস তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিলে তাহাও গ্রহণ করিতেন।

নবীজী (দঃ) বলিরাছেন, সদ্ব্যবহারের বিনিময়ে সদ্ব্যবহার করার নাম সদ্ব্যবহার নয় ; যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছে তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করার নামই সদ্ব্যবহার। (মেশকাত)

নবীজী (দঃ) বলিয়াছেন, মোসলমান পরস্পর ভাই ভাই ; একে অন্যের প্রতি অন্যায় করিবে না, সাহায্য ছাড়িবে না, একে অন্যকে ঘৃণা করিবে না। (মোসলেম)

নবীজী (দঃ) বলিয়াছেন, দ্বীন-ইসলামের বড় কাজ হইল, প্রত্যেক মোসলমানের কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করা। (বোখারী শরীফ)

নবীজী (দঃ) বলিয়াছেন, জগদ্বাবাসীদের প্রতি তুমি দয়াল হও আল্লাহ তোমার প্রতি দয়াল হইবেন। (তিরমিজী শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ছোটদেরকে স্নেহ না করিবে এবং জ্যেষ্ঠদেরকে শ্রদ্ধা না করিবে এবং সৎ কাজের আদেশ না করিবে, অন্যায় কাজে বাধা না দিবে সে আমার উম্মত হইতে খারিজ। (মেশকাত শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোন লোককে খুসি করার জন্য তাহার প্রয়োজন মিটাইবে সে বস্তুতঃ আমাকে খুসি করিয়াছে ; আর যে আমাকে

খুসি করিয়াছে সে বস্তুতঃ আল্লাহকে খুসি করিয়াছে ; যে আল্লাহকে খুসি করিয়াছে, আল্লাহ তাহাকে বেহেশত দান করিবেন। (মেশকাত শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য তিহত্তরটি মাগফেরাত লিখিয়া দিবেন ; উহার একটি দ্বারাই তাহার সব বিষয়ের শুদ্ধি ও সুষ্ঠুতা লাভ হইবে, আর বাহত্তরটি দ্বারা কেয়ামত দিবসে উন্নতি লাভ হইবে। (মেশকাত শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, আল্লার বন্দাগণ আল্লার আপন জন স্বরূপ, সুতরাং যে আল্লার বন্দাদের উপকার করিবে সে আল্লার প্রিয় হইবে। (মেশকাত শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, অন্যের দোষ খুঁজিও না, কাহারও নিন্দামন্দ করিও না, হিংসা করিও না, শত্রুতা বাঁধিও না, কাহারও দোষচর্চ্চা করিও না, দুনিয়া বাড়াইতে প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ হইও না। লোকদের সহিত ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করিবে। (বোখারী)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, সমাজের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্দ ও সদ্ভাব বজায় রাখিতে যত্নবান হওয়ার পুণ্য নামায রোযা ও দান-খয়রাতের পুণ্য অপেক্ষা অধিক। পক্ষান্তরে পরস্পরের সম্পর্ক খারাব হওয়া সুখ-শান্তি ও দ্বীন-ঈমান সবকিছুকেই বিদায় দেয়।

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি চাহিবে আল্লাহ তাহার ক্ষতি করিয়া দিবেন। যে ব্যক্তি অন্যের জীবন সঙ্কীর্ণ করার চেষ্টা করিবে আল্লাহ তাহার জীবন সঙ্কীর্ণ করিয়া দিবেন। (তিরমিজী শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মোমেনকে ধোকা দেয় বা তাঁহার ক্ষতি করে, তাহার প্রতি অভিসাপ। (তিরমিজী শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মোসলমান ভ্রাতার দোষ খুঁজিয়া প্রকাশ করিবে আল্লাহ তাহার দোষ প্রকাশ করিবেন এবং গৃহভ্যন্তরে লুকাইয়া থাকিলেও তাহাকে লাঞ্ছিত করিবেন। (তিরমিজী শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, ঈর্ষা করা হইতে দূরে থাকিও ; ঈর্ষা নেক আমলকে বরবাদ করিয়া দেয় যেরূপ অগ্নি শুষ্ক কাষ্ঠকে ভস্ম করিয়া দেয়। (আবু দাউদ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, প্রতি সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার লোকদের আমলনামা আল্লার হুজুরে পেশ হয় এবং ঐ সময় অনেক বন্দারই গোনাহ মাফ হয়। কিন্তু যে দুই মোসলমানের মধ্যে অসদ্ভাব সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদের সম্পর্কে বলা হয়, সদ্ভাবের প্রতি তাহাদের ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত তাহাদের জন্য ক্ষমা মুলতুবী রাখ।

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, বেহেশত পাইবে না মোমেন না হইলে ; মোমেন গণ্য হইবে না পরস্পর ভালবাসা ও সদ্ভাবের সৃষ্টি না করিলে। আমি একটি কাজের পরামর্শ দেই যাহা করিলে পরস্পর ভালবাসা ও সদ্ভাবের সৃষ্টি হইবে—পরস্পর সালাম করার নীতি বেশী পরিমাণে প্রবর্ত্তন কর। (মোসলেম শরীফ)

মাতৃজাতি সম্পর্কে নবীজী ঃ

মাতৃজাতি সমাজের অর্দ্ধাংশ এবং অর্দ্ধাঙ্গিনী ; তাহাদের প্রতি ঘৃণা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও উপেক্ষা এবং অন্যায়-অত্যাচার সমাজকে পঙ্গু করিয়া রাখিবে। অন্ধকার যুগে ত সমাজ নারীদের প্রতি এতই হিংস্র, নির্দয়-নিষ্ঠুর ও নির্মম ছিল যে, মেয়ে সন্তানকে ভালবাসিত না কেহই ; অনেকে তাহাকে জীবিত কবর দিয়া দিত। বর্ত্তমান যুগ যাহাকে নারীদের রাজত্বের যুগ বলা যাইতে পারে—এই যুগেও মেয়ে সন্তান জন্মের প্রতি অনেক কম লোকেরই আনন্দ হয়। ইহা কি নারীদের প্রতি বৈরীভাবের লক্ষণ নহে ? নবীজী (দঃ) মেয়েদের প্রতিপালন হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বস্তরে তাহাদের মান-মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠায় অতুলনীয় শিক্ষা ও আদর্শ রাখিয়াছেন। সংক্ষিপ্ত কতিপয় নমুনা পেশ করা হইল—

নবীজী বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুইটি মাত্র মেয়েরও সুন্দররূপে ভরণ-পোষণ ও প্রতিপালন করিবে সে বেহেশতে আমার এত নিকটবর্ত্তী হইবে যেরূপ হাতের আঙ্গুল সমূহ পরস্পর নিকটবর্ত্তী। (মোসলেম শরীফ)

নবীজী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তিনটি মেয়ে বা তিন জন ভগ্নির প্রতিপালন ও শিক্ষাদান সুচারুরূপে করিবে যাবৎ না তাহাদের নিজ নিজ ব্যবস্থা হয়—তাহার জন্য বেহেশত অবধারিত হইয়া যাইবে। দুই জন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া নবী (দঃ) বলিলেন, দুই জনের প্রতিপালনেও তাহাই। একজনের প্রতিপালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে নবীজী (দঃ) তদুত্তরেও তাহাই বলিতেন। (মেশকাত শরীফ ৪২৩)

নবীজী (দঃ) বলিয়াছেন, যাহার নিকট কোন মেয়ে থাকে এবং সে মেয়েকে তুচ্ছ না করে, ছেলেকে অগ্রগণ্য না করে আল্লাহ তাহাকে বেহেশত দান করিবেন। আবু দাউদ

নবীজী (দঃ) বলিয়াছেন, তোমার কোন মেয়ে স্বামীর পরিত্যক্তা হইয়া নিরাশ্রয়-রূপে তোমার আশ্রয়ে ফিরিয়া আসিলে তাহার জন্য তুমি যাহা ব্যয় করিবে তাহা তোমার জন্য সর্ব্বাধিক উত্তম দান-খয়রাত গণ্য হইবে। (ইবনে মাজাহ শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, নারী জাতি সৃষ্টিগত ভাবেই একটু বক্র স্বভাবের ; পূর্ণ সোজা করিতে চাহিলে (সোজা না হইয়া) ভাঙ্গিয়া যাইবে তথা বিচ্ছেদের পর্য্যায় আসিয়া যাইবে। সুতরাং তাহাকে বাঁকা থাকিতে দিয়াই তাহার সহিত তোমার জীবিকা নির্বাহ করিতে হইবে। তোমাদের প্রতি আমার বিশেষ উপদেশ—তোমরা নারীদের প্রতি উত্তম ও ভাল হইয়া থাকিবে। (মোসলেম শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, নারীগণ নামায-রোযা, সতীত্ব রক্ষা ও স্বামীর আনুগত্য—এই সংক্ষিপ্ত আমল দ্বারা আল্লাহ তায়ালার নিকট এত বড় মর্য্যাদা লাভ করিবে যে, বেহেশ-তের যে কোন শ্রেণীতে সে প্রবেশ করার অধিকার লাভ করিবে। (মেশকাত ২৮১)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, পরিপূর্ণ ঈমানদার ঐ ব্যক্তি যে তাহার সহধর্ম্মিণীর সহিত সদ্ব্যবহার করে এবং তাহার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। (তিরমিজী শরীফ)

একদা নবী (দঃ) কড়া নির্দ্দেশ দিলেন, গৃহিণীদেরকে কেহ প্রহার করিতে পারিবে না। অতঃপর এক দিন ওমর (রাঃ) নবীজীর নিকট প্রকাশ করিলেন, নারীগণ অত্যন্ত বেপরওয়া হইয়া গিয়াছে। সেমতে নবীজী (দঃ) (প্রয়োজন স্থলে সংযমের সহিত) প্রহারের অনুমতি দিলেন। এরপর বহু সংখ্যক মহিলা তাহাদের স্বামীদের প্রতি অভিযোগ নিয়া নবীজীর গৃহে ভিড় জমাইল। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) কঠোর ভাষায় বলিলেন, অনেক মহিলা তাহাদের স্বামীদের সম্পর্কে অভিযোগ করিতেছে; ঐরূপ স্বামীগণ মোটেই ভাল মানুষ নহে। (আবু দাউদ শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, সহধর্ম্মিণীর সহিত যে উত্তম জীবন-যাপনকারী হয় সে-ই উত্তম মানুষ। আমি আমার সহধর্ম্মিণীদের সহিত উত্তম জীবন-যাপন করি। (তিরমিজী শঃ)

সত্যই নবীজী (দঃ) সহধর্ম্মিণীদের প্রতি অতি উত্তম ছিলেন। একবার ছফর অবস্থায় বিবি ছফিয়্যা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার জন্য উটের উপর আরোহণ করা কঠিন হইলে নবী (দঃ) নিজ উরু পাতিয়া দিলেন। ছফিয়্যা (রাঃ) সিঁড়ির ন্যায় নবীজীর উরু মোবারকের উপর পা রাখিয়া উটে আরোহণ করিলেন। (বোখারী শঃ)

আর একবার নবীজী (দঃ) এতেকাফে ছিলেন; ছফিয়্যা (রাঃ) নবীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন; তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের সময় নবীজী তাঁহাকে মর্য্যাদার সহিত বিদায় দানে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া মসজিদের দরওয়াজা পর্য্যন্ত আসিলেন।

আয়েশা (রাঃ) কম বয়স্কা ছিলেন; নবীজীর গৃহে নয় বৎসর বয়সে আসিয়া ছিলেন। নবী (দঃ) তাঁহার বাল্যবয়সের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কতিপয় বান্ধবী ছিল যাহাদের সঙ্গে আমি বাল্যসুলভ খেলাধুলা করিতাম। নবীজী গৃহে আসিলে উহারা লুকাইয়া যাইত; নবী (দঃ) উহাদিগকে তালাশ করিয়া আমার নিকট পাঠাইতেন। তাহারা পুনঃ আমার সহিত খেলা জুড়িত। (বোখারী শঃ)

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একবার ঈদের আনন্দে খঞ্জর চালনার খেলা হইতেছিল। নবীজী আমাকে গৃহদ্বারে তাঁহার পেছনে দাঁড় করাই তাঁহার কাঁদের ফাঁক দিয়া ঐ খেলা দেখাইলেন। খেলা দেখায় আমার মন ভরিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত তিনি দাঁড়াইয়া থাকিলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন—খেলা দেখায় লালায়িতা যুবতী কত দীর্ঘকাল খেলা দেখিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। (বোখারী শরীফ)

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী (দঃ) আমার সহিত দৌড়-প্রতিযোগিতা করিলেন; তাহাতে আমি জয়ী হইলাম। অনেক দিন পর যখন আমার শরীর ভারী হইয়া গিয়াছিল তখন আর একদিন সেই প্রতিযোগিতা করিলে আমি পরাজিত হইলাম। নবীজী (দঃ) তখন কৌতুক করিয়া বলিলেন, আমার সেই পরাজয়ের বিনিময়ে তোমার এই পরাজয়। (আবু দাউদ শরীফ)

নবীজীর কী মধুর সম্পর্ক ছিল সহধর্ম্মিণীগণের সঙ্গে। নবীজী তাঁহাদের সহিত সময়ে খোশ-গল্পও করিতেন। একদা নবীজী বিবি আয়েশার সঙ্গে এক সুদী খোশ-গল্প জুড়িয়া ছিলেন। হাদীছটি বোখারী শরীফেও উল্লেখ আছে—"হাদীছে উম্মেযারা" এক সময় আরবের একাদশ সংখ্যক সুসাহিত্যিক মহিলা একত্র হইয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বামীর অবস্থা বর্ণনায় ভাষাজ্ঞানের বাহাদুরী দেখাইল। তন্মধ্যে উম্মেযারা' নাম্নী মহিলা সুদীর্ঘ ও সুললিত ভাষায় নিজ স্বামীর সর্ব্বাধিক বেশী প্রশংসা করিল। নবী (দঃ) আয়েশার নিকটে সেই একাদশ মহিলার প্রসিদ্ধ গল্পটি বর্ণনা করিয়া বলিলেন, আয়েশা! উম্মেযারার স্বামী তাহার জন্য যেরূপ ছিল আমি তোমার জন্য সেরূপ।

নারী সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রতিও নবীজী (দঃ) বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। নবীজীর আমলে দ্বীন-শিক্ষার একমাত্র কেন্দ্র নবীজীই ছিলেন; নবীজীর সব কথা বিশেষতঃ ভাষণসমূহ শরীয়তের বিশেষ বস্তু ছিল। তাই নবীজীর ভাষণ উপলক্ষে নর-নারী নির্ব্বিশেষে সকলের উপস্থিতির আদেশ ছিল। জুমা ও ঈদের নামাযে নবীজী (দঃ) বিশেষ ভাষণ দিতেন; সেই ভাষণ শুনিবার জন্য সকলেই উপস্থিত হইতেন তবে নারীগণ সকলের পেছনে থাকিতেন। একবার ঈদের খোৎবা তথা ভাষণ সাধারণ নিয়মে প্রদানের পর নবীজী লক্ষ্য করিলেন, নারীদের পর্য্যন্ত তাঁহার কথা পূর্ণরূপে পৌঁছে নাই। তাই নবী (দঃ) বেলাল (রাঃ)কে সঙ্গে করিয়া নারীদের অবস্থান স্থলে যাইয়া পুনঃ ভাষণ দিলেন। (বোখারী শরীফ)

আরও একবারের ঘটনা—নারীগণ নবীজীর নিকট অভিযোগ করিল, নবীজীর মজলিসে তাহারা পুরুষদের ভিড়ের কারণে পূর্ণ উপকৃত হইতে পারে না। সেমতে তাহাদের অভিলাস অনুযায়ী নবীজী তাহাদের জন্য ভিন্ন মজলিসের ব্যবস্থা করিলেন।

নারীদের প্রতি নবীজী কত অধিকসহানুভূতিশীল ছিলেন। এবং তাহাদের কত বেশী মর্য্যাদা তিনি দিতেন। নবীজী তাঁহার সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ—বিদায় হজ্জের নীতি-নির্দ্ধারণী ঐতিহাসিক ভাষণে নারীদেরে মর্য্যাদানের কর্ত্তব্য বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। সেই ভাষণে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—

"নারীদের উপর স্বামীদের যেরূপ হক্ক ও দাবী আছে তদ্রূপ স্বামীদের উপর স্ত্রীদেরও হক্ক এবং দাবী আছে।" তিনি আরও বলিয়াছেন—নারীদের সম্পর্কে আমার বিশেষ নির্দ্দেশ পালন করিও যে, তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকর ব্যবস্থা বজায় রাখিও।......তাহাদিগকে তোমরা লাভ করিয়াছ আল্লার আমানতরূপে এবং তাহাদের সতিত্বকে ভোগ করিতে পারিয়াছ আল্লার বিধানের অধীনে। সেই আল্লার রসুল আমি, অতএব তাহাদের সম্পর্কে আমার নির্দ্দেশ পালনে তোমরা বাধ্য।

একদা আবুবকর (রাঃ) নবীজীর গৃহে আসিতে ছিলেন; বাহির হইতে বিবি আয়েশার উচ্চ স্বর শুনিতে পাইলেন—তিনি নবীজীর সহিত প্রতিউত্তর করিতে

ছিলেন। আবুবকর(রাঃ) ক্রোধভরে ঘরে আসিয়া আয়েশা(রাঃ)কে এই বলিয়া শাসাইতে লাগিলেন যে, এত বড় আস্পর্দ্ধা। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আওয়াজের উর্দ্ধে তোমার আওয়ায! আবুবকর (রাঃ) এই বলিয়া আয়েশা (রাঃ)কে চড় মারিতে উদ্যত হইলে নবী (দঃ) আয়েশাকে আবুবকর হইতে আড়াল করিয়া রাখিলেন। আবুবকর (রাঃ) চলিয়া গেলে নবী (দঃ) আয়েশাকে আড়াল করিয়া রাখিলেন। আবুবকর (রাঃ) চলিয়া গেলে নবী (দঃ) আয়েশাকে বলিতে লাগিলেন, দেখিলে ত মিঞা সাহেব হইতে কত কষ্টে তোমাকে বাঁচাইয়াছি! (আবুদাউদ)

প্রতিবেশী সম্পর্কে নবীজী :

নবীজী (দঃ) বলিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি মোমেন নয় যাহার পড়শী তাহার হইতে নিরাপদ নহে। (বোখারী)

নবীজী (দঃ) বলিয়াছেন, যাহার পড়শী তাহার হইতে নিরাপদ নহে সে বেহেশত পাইবে না। (মেশকাত শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি মোমেন নয় যে পেট পুরিয়া খায়, অথচ তাহার প্রতিবেশী তাহারই নিকটবর্ত্তী অনাহারী রহিয়াছে। (ঐ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে লোক তাহার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম পরিগণিত সে আল্লার নিকটও উত্তম পরিগণিত। যে ব্যক্তি নিজ সঙ্গীদের নিকট উত্তম পরিগণিত সে আল্লার নিকটও উত্তম পরিগণিত। (তিরমিজী শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের প্রিয় হইতে চায় তাহার কর্ত্তব্য হইবে—সত্যবাদী হওয়া, বিশ্বাসী হওয়া এবং প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহারকারী হওয়া। (মেশকাত শরীফ)

এতিম সম্পর্কে নবীজী :

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লার ওয়াস্তে তথা নিঃস্বার্থভাবে এতিমের মাথায় স্নেহের হস্ত বুলায় তাহার হস্তস্পর্শিত প্রতিটি লোমের পরিবর্ত্তে নেকী লাভ হইবে। যে ব্যক্তি কোন এতিম বালক বা বালিকার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে সে বেহেশতের মধ্যে আমার অতি নিকটবর্ত্তী হইবে। (তিরমিজী শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, আত্মীয় বা অনাত্মীয় এতিমের লালন-পালনকারী ও আমি বেহেশতে এইরূপ নিকটবর্ত্তী থাকিব যেরূপ হাতের দুইটি আঙ্গুল। (বোখারী শরীফ)

দানশীলতায় নবীজী :

নবীজী (দঃ) কোন সময় দানপ্রার্থীকে "না" বলিতেন না—তাঁহার এই উদার স্বভাব অনেকেই বর্ণনা করিয়াছেন। এক সময় নবীজীর পরিধেয়ের প্রয়োজন ছিল। এমন সময় এক মহিলা নবীজীর জন্য সযত্নে হাতে বুনিয়া একটি চাদর পেশ করিল। প্রয়োজন সময়ে উহা পাইয়া নবীজী উহা পরিধানে ছাহাবীগণের সমাবেশে আসিয়া

বসিলেন। এক ব্যক্তি আরজ করিল, হুজুর চাদরখানা আমাকে দান করুন। নবী (দঃ) গৃহে যাইয়া পুরাতন চাদর পরিধান পূর্ব্বক নূতন চাদরখানা ঐ ব্যক্তিকে দান করিয়া দিলেন। বিস্তারিত বিবরণ ১ম খণ্ডে ৬৬৭ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।

এক ছাহাবী তাহার ওলীমার দাওয়াতের ব্যবস্থা করিতে নবীজীর নিকট সাহায্য চাহিলে নবীজী তাহাকে বলিয়া দিলেন, আয়েশার ঘরে এক ধামা আটা আছে, উহা নিয়া যাও। ঐ ব্যক্তি উহা নিয়া চলিয়া গেল, অথচ নবীজীর ঘরে উহা ছাড়া আর কিছু ছিল না। (সীরতুন-নবী)

আতিথেয়তা ঃ ইহা নবীজীর এক মহান আদর্শ। তিনি বলিয়াছেন, যাহার ঈমান আছে তাহার কর্ত্তব্য মেহমানের সম্মান করা।

একদা নিরাশ্রয় লোকদের ভিড় জমিয়া গেল। নবীজী (দঃ) ঘোষণা করিলেন, যাহার ঘরে দুই জনের আহার আছে সে যেন তৃতীয় জনকে নিয়া যায়। যাহার ঘরে চার জনের আহার আছে যে সে যেন ষষ্ঠ জন পর্যন্ত সঙ্গে নিয়া যায়। আবুবকর (রাঃ) তিন জন মেহমান নিলেন, আর নবীজী তাঁহার গৃহে দশ জনকে নিলেন। (মোসলেম)

কোন নিরাশ্রয় আসিলে তাহার আতিথেয়তার জন্য প্রথমে নবীজী (দঃ) নিজ গৃহে অবকাশের খোঁজ লইতেন। তাঁহার গৃহে একেবারেই কোন ব্যবস্থা সম্ভব না হইলে অন্যদেরকে অনুরোধ করিতেন।

নিঃসহায়দের অন্যতম একজন ছিলেন আবু হোরায়রা(রাঃ), তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইয়া পড়িলাম। কাহারও নিকট খাদ্য চাহিতে লজ্জা হয়, তাই শুধু ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য ক্ষুধার্থকে অন্নদান সম্পর্কীয় কোরআনের আয়াতের প্রতি লোকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে লাগিলাম। এমনকি আবুবকর এবং ওমরকেও ঐরূপ করিলাম, কিন্তু কেহই আমার মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলেন না। নবী (দঃ) আমাকে ঐ রূপ করিতে দেখিয়া তিনি আমার অবস্থা ঠাহর করিয়া ফেলিলেন এবং মুচকি হাসি দিয়া বলিলেন, আবু হোরায়রা! আমার সঙ্গে আস। গৃহে যাইয়া এক পেয়ালা দুগ্ধ পাইলেন যাহা কেহ হাদিয়া দিয়া গিয়াছে। আদেশ হইল, মসজিদের বারান্দায় নিরাশ্রয় সকলকে ডাকিয়া আন। প্রথমে সকলকে পান করাইতে বলিলেন, অতঃপর আমাকে পুনঃ পুনঃ তৃপ্তির অতিরিক্ত পান করাইলেন।

নবী (দঃ) অমোসলেমের অতিথেয়তায়ও কুণ্ঠিত হইতেন না। আবু বছ্রা (রাঃ) নামক এক ছাহাবী বর্ণনা করিয়াছেন, ইসলাম গ্রহণ পূর্ব্বে আমি এক রাত্রে নবীজীর অতিথি হইয়া ছিলাম। তাঁহার গৃহে যে কয়টি বকরী ছিল সবগুলির দুগ্ধ একা আমিই পান করিয়া শেষ করিলাম। নবীজী পরিবার-পরিজন সহ ঐ রাত্র অনাহারেই কাটাইলেন; তিনি আমার প্রতি বিন্দুমাত্রও বিরক্ত হইলেন না। (সীরতুন-নবী)

আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক রাত্রে এক কাফের ব্যক্তি নবীজীর অতিথি হইল। নবীজী তাহাকে ছাগীর দুধ দোহন করিয়া পান করাইতে লাগিলেন, সে পর পর সাতটি ছাগীর দুধ একাই পান করিয়া ফেলিল। নবীজী (দঃ) মোটেই বিরক্ত না হইয়া যত্নের সহিত তাহার সম্মুখে দুধ পরিবেশন করিয়া গেলেন। ঐ কাফের নবীজীর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া ভোর হইতেই মোসলমান হইয়া গেল! এখন সে একটি ছাগীর দুধেই তৃপ্ত হইয়া গেল। (তিরমিজী শরীফ)

ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি ঘৃণা ঃ

ভিক্ষাবৃত্তির উচ্ছেদে নবীজী সদা সচেষ্ট থাকিতেন। এক ব্যক্তি নবীজীর নিকট সাহায্য চাহিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার কিছুই নাই কি? সে বলিল, শুধু মাত্র একটি কম্বল আর একটি পানি পানের পেয়ালা আছে। নবী (দঃ) তাহার সেই বস্তুদ্বয়ই আনাইলেন এবং উহা দুই দেরহামে বিক্রি করিয়া বলিলেন. এক দেরহাম পরিবারের খরচের জন্য দিয়া আস, আর এক দেরহাম দ্বারা একটি কুড়াল ক্রয় করিয়া আমার নিকট নিয়া আস। নবীজী নিজে ঐ কুড়ালের হাতল লাগাইয়া তাহাকে দিলেন এবং বলিলেন, জঙ্গল হইতে জ্বালানি কাষ্ঠ কাটিয়া বিক্রি করিবে; পনর দিন যেন আমি তোমাকে দেখিতে না পাই—একধারে ঐ কাজ করিয়া যাইবে। ঐ ব্যক্তি তাহাই করিল এবং অচিরেই দশ দেরহাম উপার্জন করিয়া কাপড় ক্রয় করিল, খাদ্য ক্রয় করিল। নবী (দঃ) তাহাকে বলিলেন, এই ব্যবস্থা তোমার জন্য উত্তম হইয়াছে ইহা অপেক্ষা যে তুমি ভিক্ষা করিতে এবং কেয়ামত দিবসে তোমার চেহারায় ভিক্ষাবৃত্তির নিশান সর্ব্বসমক্ষে ফুটিয়া উঠিত। (আবুদাউদ শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, সম্বল থাকিতে যে ব্যক্তি ভিক্ষা চাহিবে হাশর মাঠে তাহার চেহারায় আঁচর ও ক্ষত হইবে। (তিরমিজী শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যাহার সম্বল (তথা এক দিনের আহার) আছে তাহার জন্য বা যাহার অঙ্গ সমূহ সঠিক আছে তাহার জন্য ভিক্ষা চাওয়া হালাল নহে। তিরমিজী

শ্রমের মর্য্যাদা দান ঃ নবী (দঃ) বলিয়াছেন, দড়ি লইয়া জঙ্গলে যাও এবং জ্বালানী কাষ্ঠের বোঝা পিঠের উপর বহন করিয়া বিক্রি কর; ইহা দ্বারা আল্লাহ তোমার মান ইজ্জত রক্ষা করিবেন—ইহা ভিক্ষাবৃত্তি অপেক্ষা উত্তম। (বোখারী শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তির জন্য তাহার নিজ হাতের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম খাদ্য নাই। (বোখারী শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, মানুষের জন্য সর্ব্বাধিক পাক-পবিত্র খাদ্য হইল তাহার উপার্জ্জিত খাদ্য। (নেছায়ী শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, হালাল উপার্জ্জনের চেষ্টা করাও একটি ফরজ। (মেশকাত)

নবীজী (দঃ) বলিয়াছেন. যে ব্যক্তি শ্রমিক দ্বারা কাজ করাইয়া শ্রমিকের পারি-শ্রমিক পরিশোধ না করিবে কেয়ামত দিবসে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাহার বিরুদ্ধে বাদী হইবেন। (বোখারী শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, মজদুর দ্বারা কাজ করাইলে মজদুরের ঘাম শুকাইবার পূর্ব্বে তাহার মজদুরী আদায় করিয়া দাও। (মেশকাত শরীফ)

স্বভাবগত সংসারী-জীবনের শিক্ষা দান ঃ

স্বভাবের বিপরীত বৈরাগ্য ও সন্যাস জীবনের প্রতি নবীজীর দৃঢ় অনিহা ছিল। তিনি সব সময়ই সংসারী জীবনের আদর্শ স্থাপন ও শিক্ষা দান করিয়াছেন।

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, ইসলামে সন্যাস জীবনের স্থান নাই। বিশিষ্ট ছাহাবী ওসমান ইবনে মাজউন (রাঃ) সন্যাস জীবনের অনুমতি চাহিলে নবী (দঃ) দৃঢ়তার সহিত তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন।

একদা তিন জন ছাহাবী তিন রকম প্রতিজ্ঞা করিলেন। একজন বলিলেন, আমি রাত্রে কখনও নিদ্রা যাইব না—সারা রাত্র নামায পড়িয়া কাটাইব। অপরজন বলিলেন, সারা জীবন রোযা রাখিব। আর একজন বলিলেন, সারা জীবন বৈরাগী হইয়া থাকিব—বিবাহ করিব না। নবী (দঃ) তাহাদের প্রতিজ্ঞা শ্রবণে শপথের সহিত বলিলেন, আমি আল্লাহ তায়ালাকে সর্ব্বাধিক ভয় করি, তথাপি রাত্রে ঘুমাই, রোযাবিহীনও থাকি, বিবাহও করিয়াছি। আমার এই তরিকা হইতে যে বিরাগী হইবে সে আমার জমাত হইতে খারিজ গণ্য হইবে। (বোখারী শরীফ)

অধীনস্থদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার আদর্শ ঃ

শ্রমিক, মজুর, ভৃত্যদের প্রতি নিজেত নবীজী (দঃ) দয়াবান ছিলেনই। বিশেষ-ভাবে ইহার আদর্শ শিক্ষা দানেও নবীজী তৎপর থাকিতেন।

একজন ছাহাবী তাঁহার দাসের প্রতি কঠোরতা করিলে নবী (দঃ) তাঁহাকে সতর্ক করিয়া বলিলেন, তুমি তাহার প্রতি যতটুকু ক্ষমতা রাখ নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমার উপর তদপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষমতা রাখেন। (বোখারী শরীফ)

বিশিষ্ট ছাহাবী আবুজর (রাঃ) তাঁহার দাসকে বাঁদীর বাচ্চা বলিয়া গালি দিলে নবীজী তাঁহাকে কঠোর ভাষায় বলিলেন, তোমার মধ্যে অন্ধকার যুগের অসভ্যতা রহিয়াছে। এই দাস ও ভৃত্যগণ তোমাদেরই ভ্রাতা ; আল্লাহ তাহাদিগকে তোমাদের অধীনস্থ করিয়াছেন। তোমাদের কর্ত্তব্য—অধীনস্থদেরে নিজেদের ন্যায় যত্নের সহিত খাওয়ানো, পরানো। (বোখারী শরীফ)

নবীজী বলিয়াছেন, তোমার ভৃত্য তোমার জন্য খাদ্য তৈরী করিয়া আনিলে তোমার কর্ত্তব্য সেই খাদ্যের এক গ্রাস তাহাকেও প্রদান করা। এই খাদ্য তৈরী করিতে সে অগ্নি তাপ সহ্য করিয়াছে এবং নানা কষ্ট করিয়াছে। (বোখারী শরীফ)

নবীজী (দঃ) বলিয়াছেন, তোমার দাসকেও তাহার সাধ্যের অধিক কষ্টের কাজ চাপাইয়া দিও না। যদি সেইরূপ কষ্টের কাজ তাহার দ্বারা করিতেই হয় তবে তোমার কর্ত্তব্য হইবে—তাহাকে সাহায্য করা। (বোখারী শরীফ)

কল্যাণ ও মঙ্গলময় পারিবারিক জীবন-ব্যবস্থা শিক্ষাদানে রহমতুল-লিল-আলামীন

পারিবারিক জীবনকে কল্যাণময় ও মঙ্গলময় করিতে হইলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি দ্বারাই তাহা সম্ভব হইবে। সেই সম্পর্কের উন্নতির জন্য নবীজীর দেওয়া আদর্শ ও শিক্ষা অতুলনীয়। সেই সব আদর্শ ও শিক্ষার অনুসরণে সহজেই একটা সুখী পরিবার গড়িয়া উঠিতে পারে।

একদা নবীজী তিন বার বলিলেন, সে লাঞ্ছিত হউক। জিজ্ঞাসা করা হইল, সেই ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি মাতা-পিতা উভয়কে বা তাঁহাদের একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পাইয়া তাহাদের খেদমত করিয়া সে বেহেশতের অধিকারী হইতে পারে নাই। (মোসলেম শরীফ)

আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার মা পৌত্তলিকা থাকাবস্থায় মদিনায় আমাকে দেখিতে আসিলেন। আমি নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি আমার এই মাতার খেদমত করিব কি? তিনি বলিলেন, নিশ্চয় তাহার খেদমত করিবে। (বোখারী)

নবীজী বলিয়াছেন, মাতা-পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লার সন্তুষ্টি; আর মাতা-পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লার অসন্তুষ্টি। (তিরমিজী শরীফ)

এক ব্যক্তি নবীজীর নিকট জিজ্ঞাসা করিল, আমার মাতা-পিতা এন্তেকাল করিয়াছেন; এখনও তাঁহাদের প্রতি সদ্ব্যবহারের কিছু বাকি আছে কি? নবীজী বলিলেন, হাঁ—তাঁহাদের জন্য দোয়া করিবে, মাগফেরাত চাহিবে, তাঁহাদের ওয়াদা-অঙ্গীকার তুমি পুরা করিয়া দিবে, তাঁহাদের সম্পর্কীয় আত্মীয়দের খেদমত করিবে, তাঁহাদের বন্ধু-বান্ধবদের শ্রদ্ধা করিবে। (আবুদাউদ শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, কোন হতভাগার মাতা-পিতা যদি তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট অবস্থায় মরিয়া যায় তবে সে যদি আজীবন তাহাদের জন্য দোয়া ও মাগফেরাত কামনা করিতে থাকে তাহা হইলে তাহাকে আল্লাহ তায়ালা মাতা-পিতার সন্তুষ্টিভাজন গণ্য করিয়া নিবেন। (মেশকাত শরীফ ৪২১)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দাবী ঐ পরিমাণ যে পরিমাণ মাতা-পিতার দাবী সন্তানের উপর। (ঐ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, মানুষ যাহার সঙ্গে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব করে সাধারণতঃ তাহার স্বভাব-চরিত্র ও মতবাদ অবলম্বনকারী হইয়া পড়ে। অতএব লক্ষ্য করা চাই, কিরূপ ব্যক্তির সহিত ভালবাসা ও বন্ধুত্ব করা হইতেছে। (মেশকাত শরীফ ৪২৭)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন মোলায়েম ব্যবহার অবলম্বন কর; উহা সুনাম-সুখ্যাতি বর্দ্ধক। কঠোরতা ও লজ্জাহীনতা পরিহার কর; উহা কুখ্যাতির কারণ। (মোসলেম)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, সুচরিত্র বড় পুণ্য। (মেশকাত শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, সুচরিত্র ও সদ্ব্যবহারের দ্বারা মোমেন ব্যক্তি সমস্ত দিন রোযা ও সারা রাত্র নামাযের পুণ্য লাভ করিতে পারে। (আবুদাউদ শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, প্রকৃত মোমেন সরল ও ভদ্র হয়। পক্ষান্তরে ধোকাবাজী ও অভদ্রতা ফাছেক হওয়ার পরিচয়। (আবুদাউদ শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, লজ্জা-শরম দ্বীন-ইসলামের বৈশিষ্ট্য। (মেশকাত ৪৩২)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লার সন্তুষ্টি লাভ উদ্দেশ্যে বিনম্র হইবে আল্লাহ তাহাকে উচ্চ মর্য্যাদা দান করিবেন। ফলে সে নিজকে নিজে ছোট মনে করিলেও লোকদের দৃষ্টিতে সে মহান গণ্য হইবে। আর যে ব্যক্তি অহঙ্কার করিবে আল্লাহ তাহাকে হেয় ও নিচ করিয়া দিবেন। ফলে সে নিজকে নিজে বড় মনে করিলেও লোকদের দৃষ্টিতে এত ছোট হইবে যে, শুকর-কুকুর অপেক্ষাও অধিক ঘৃণিত হইবে। (ঐ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মুখকে সংযত রাখিবে আল্লাহ তাহার ইজ্জতের হেফাজত করিবেন। যে ব্যক্তি ক্রোধ দমাইয়া রাখিবে কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তাহাকে আজাবমুক্ত রাখিবেন। যে ব্যক্তি আল্লার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হইবে আল্লাহ তাহাকে ক্ষমা করিবেন। (মেশকাত শরীফ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, প্রকৃত নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি যে কেয়ামত দিবসে নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদির ছওয়াব লইয়া উপস্থিত হইবে; কিন্তু সে কাহাকেও গালি দিয়াছে, কাহাকেও অপবাদ লাগাইয়াছে, কাহারও ধন আত্মসাধ করিয়াছে, কাহাকেও খুন করিয়াছে, কাহাকেও মারপিট করিয়াছে। ঐ সব দাবীদারকে তাহার সমুদয় নেক বা ছওয়াব বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং দাবীদার শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই তাহার নেক বা ছওয়াব শেষ হইয়া গিয়াছে; ফলে অবশিষ্ট দাবীদারদের গোনাহের বোঝা তাহার উপর চাপানো হইয়াছে—পরিণামে তাহাকে দোযখে ফেলা হইয়াছে। (ঐ)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের পরকালকে বিনষ্ট করিয়াছে অন্যের ইহকাল ভাল করার জন্য সে কেয়ামত দিবসে সর্ব্বাধিক মন্দ ও নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হইবে। ঐ

যত লোক জায়েজ-নাযায়েয চিন্তা না করিয়া নামায-রোযার খেয়াল ছাড়িয়া দিয়া, নিজের পরকালের উন্নতি বিধান না করিয়া দুনিয়ার সম্পদের উপর সম্পদ ধনের উপর ধন বাড়াইয়াতে থাকে সেই শ্রেণীর সব লোক উক্ত হাদীছের লক্ষ্য। কারণ, অতিরিক্ত ধন-সম্পদ সমূহ ত সবই অন্যের; চক্ষু বুজিবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ধন-সম্পদের মালিক ওয়ারিসানগণ হইয়া যাইবে। অথচ এই সব ধন-সম্পদ উপার্জ্জনে নিজের দ্বীন-ঈমান বিনষ্ট ও পরকালের জীবনকে ধ্বংস করা হইয়াছিল।

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, দুনিয়ার বেশী অনুরাগী যে হইবে তাহাকে আখেরাতের ক্ষতি করিতে হইবে ; আর যে আখেরাতের বেশী অনুরাগী হইতে চাহিবে তাহাকে দুনিয়ার কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। তোমরা চিরস্থায়ী তথা আখেরাতকে অগ্রগণ্য কর ক্ষণস্থায়ী তথা দুনিয়ার উপর। অর্থাৎ আখেরাতেরই অনুরাগী হও যদিও দুনিয়ার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। (মেশকাত শরীফ ৪৪১)

নবী (দঃ) বলিয়াছেন, আকৃতি বা ধন-সম্পদে তোমার অপেক্ষা উচ্চে এরূপ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য গেলে সঙ্গে সঙ্গে এরূপ ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য কর যে তোমার অপেক্ষা নিম্নে। (জাগতিক ব্যাপারে) সদা তোমার অপেক্ষা নিম্নদের প্রতি দৃষ্টি রাখিও, উচ্চদের প্রতি দৃষ্টি দিও না ; তাহা হইলে আল্লার নেয়ামতের শোকরগুজারী সহজ হইবে। (ঐ)

পারিবারিক জীবনে সুষ্ঠুতার তাগিদ ঃ

আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র (রাঃ) ছাহাবীর অতিরিক্ত রোযা, অতিরিক্ত তাহাজ্জুদ নামাযের চর্চ্চা হইলে নবীজী তাঁহাকে সাংবাদ দিয়া আনিলেন, এমনকি আবার স্বয়ং তাঁহার বাড়ীতে পৌঁছিয়া তাঁহাকে ঐরূপ না করার কড়া নির্দ্দেশ দিয়া বলিলেন— তোমার উপর তোমার জানের হক্‌ রহিয়াছে, চোখের হক্‌ রহিয়াছে, স্ত্রীর হক্‌ রহিয়াছে, এমনকি সাক্ষাৎ প্রার্থীরও হক্‌ রহিয়াছে। অর্থাৎ এই সব হক্‌ তোমাকে অবশ্যই আদায় করিতে হইবে ; অতিরিক্ত নফল এবাদতে মগ্ন হইয়া ঐ সব হক্‌ ক্ষুন্ন করা চলিবে না। বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে ১০২৯ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।

ব্যক্তিগত জীবনে রহমতুল-লিল-আলামীন

"নিশ্চয় আপনি চরিত্রের চরম উৎকর্ষের অধিকারী" (আল-কোরআন)

আলী রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বর্ণনা—নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অত্যন্ত প্রশস্ত হৃদয়ের ছিলেন, কথা বার্ত্তায় অত্যন্ত সত্যবাদী ছিলেন, অত্যধিক কোমল স্বভাবের ছিলেন। প্রথম দর্শনে দর্শকের উপর তাঁহার ঐশী প্রভাব পতিত হইত, কিন্তু তাঁহার সাহচর্য্যে ও মেলামেশায় মানুষ মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে বাধ্য হইত। তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া প্রত্যেকেই বলিতে বাধ্য হইত—তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে তাঁহার তুলনা কোথাও দেখি নাই। ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম। (তিরমিজি শরীফ)

জাবের ইবনে ছামুরাহ (রাঃ)এর বর্ণনা—জোহর নামায পড়িয়া আমি নবীজীর সঙ্গে চলিলাম তিনি গৃহে ফিরিতেছিলেন। কচিকাচারা তাঁহার প্রতি ছুটিয়া আসিতে লাগিল ; তিনি প্রত্যেককে তাহার গণ্ডদ্বয় ধরিয়া স্নেহ দেখাইতেছিলেন। স্নেহভরে আমার গণ্ডদ্বয়ও স্পর্শ করিলেন ; তাঁহার হস্ত মোবারক সুশীতল ছিল এবং এরূপ সুগন্ধময় ছিল যেন উহা এখনই আতরের ডিবা হইতে বাহির করা হইয়াছে। মোসলেম

আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা নবীজী (দঃ)কে অনুরোধ করা

হইল মোশরেকদের প্রতি বদদোয়া করার জন্য। তিনি বলিলেন, আমি বদদোয়ার জন্য আসি নাই ; আমি ত রহমত ও মঙ্গলময় রূপে আসিয়াছি। (মোসলেম শরীফ)

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবীজীর সহিত কেহ মোছাফাহা—করমর্দন করিলে, অপর ব্যক্তি হাত না ছাড়া পর্য্যন্ত তিনি হাত ছাড়িতেন না। ঐ ব্যক্তি মুখ ফিরাইয়া নেওয়ার পূর্ব্বে তিনি মুখ ফিরাইতেন না। (তিরমিজী শরীফ)

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) ফজর নামায হইতে অবসর হওয়ার পর মদিনার গৃহ-ভৃত্যরা পানি লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত ; (পানি তাঁহার দ্বারা বরকতময় করিয়া নেওয়ার জন্য।) নবীজী তাহাদের প্রত্যেকের পানিতে হাত ডুবাইতেন। এমনকি প্রবল শীতের সময়ও নবীজী তাহাদের পানিতে হাত ডুবাইয়া থাকিতেন। (মোসলেম শরীফ)

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একমাত্র জেহাদ ছাড়া নবীজী কাহাকেও কোন সময় প্রহার করেন নাই—এমনকি খাদেম, ভৃত্য বা কোন স্ত্রীকেও নয়। (ঐ)

ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুনতা ঃ

আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ইহুদী পণ্ডিত নবীজীর নিকট কিছু টাকা পাওনাদার ছিল। সে একদা ঐ টাকার তাগাদায় আসিল ; ঐ সময় নবীজীর হাতে টাকা ছিল না, তাই তিনি তখন উহা পরিশোধে অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। ইহুদী পণ্ডিত বলিল, টাকা উসুল না করিয়া আমি যাইব না এবং আপনাকে ছাড়িব না। নবীজী বলিলেন, আচ্ছা—টাকার ব্যবস্থা করিতে সক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত আমি তোমার হইতে দূরে কোথাও যাইব না। সেমতে নবীজী (দঃ' দুপুর বেলা হইতে এশার নামায পর্য্যন্ত ঐ ইহুদী পণ্ডিতের ধারে ধারেই থাকিলেন। এমনকি রাত্রেও সে তথায়ই থাকিল এবং নবীজীও বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও গেলেন না। এই অবস্থায় ফজর নামায পড়া হইলে ছাহাবীগণ ঐ ইহুদীকে ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং তাহার উপর চটাচটি আরম্ভ করিলেন। নবীজী (দঃ) তাহা টের পাইয়া ছাহাবীগণকে বাধা দিলে তাঁহারা বলিলেন, এক ইহুদী আপনাকে এইভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? তদুত্তরে নবীজী (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে নিষেধ করিয়াছেন কাহারও প্রতি, এমনকি কোন অমোসলেম নাগরিকের প্রতিও অন্যায় করিতে।

বেলা একটু বেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহুদী কলেমা পড়িয়া মোসলমান হইয়া গেল এবং তাহার সমুদয় সম্পত্তির অর্দ্ধেক আল্লার রাস্তায় দান করিয়া দিল ; সে অনেক বড় ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। (মেশকাত শরীফ ৫২১)

আবদুল্লাহ ইবনে আবুহামছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবীজী নবী হওয়ার পূর্ব্বের ঘটনা—নবীজীর সহিত আমার একটি লেনদেন হইল এবং লেনদেনের কিছু অংশ বাকি থাকিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, অবশিষ্ট প্রাপ্য আমি নিয়া আসিতেছি

এস্থানেই উহা আপনাকে অর্পণ করিব। তিনি তথায় অপেক্ষমান থাকিলেন; যেন আমি আসিয়া তাঁহাকে না পাইয়া বিব্রত না হই। ঘটনাক্রমে আমি তথায় ফিরিয়া আসিবার কথা ভুলিয়া গেলাম। তিন দিন পর হঠাৎ আমার ঐ কথা স্মরণ হইল; আমি ঐস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, নবীজী তথায় আমার জন্য অপেক্ষমান আছেন। আমাকে তিনি শুধু এতটুকুই বলিলেন, তুমি আমাকে কষ্টে ফেলিয়া রাখিয়াছ। তিন দিন যাবত আমাকে তোমার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইতেছে—(তুমি আমাকে না পাইয়া বিব্রত হও না-কি।) (আবুদাউদ শরীফ)

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা একদল ইহুদী নবীজীর নিকট আসিয়া সালাম করার স্বরে আচ্ছালামু আলাইকুমের স্থলে আচ্ছামু আলাইকুম বলিল, যাহার অর্থ আপনার উপর মৃত্যু হউক। নবীজী তাহাদিগকে "আলাইকুম—তোমাদের উপর" বলিয়া উত্তর দিলেন; আর কিছুই বলিলেন না।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি (রাগ শামলাইতে না পারিয়া পর্দার ভিতরে থাকিয়াই) বলিলাম, তোমাদের উপর মৃত্যু, আল্লার অভিসাপ ও আল্লার গজব। নবী (দঃ) আমাকে বাধা দিয়া বলিলেন, দেখ আয়েশা! সব কাজেই নম্রতাকে আল্লাহ ভাল বাসেন। আমি বলিলাম, আপনি শুনিলেন না তাহারা কি বলিল? নবী (দঃ) বলিলেন, আমি শুনিয়াছি এবং "আলাইকুম—তোমাদের উপর" বলিয়া দিয়াছি।

দেখ, আয়েশা! সদা নম্রতা অবলম্বনে যত্নবান থাকিও; কুবাক্য, কটুক্তি কঠোরতা পরিহার করিয়া চলিও আল্লাহ তায়ালা কুবাক্য-কটুক্তিকে ভাল বাসেন না। মোসলেম

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক অশিক্ষিত গ্রাম্য ব্যক্তি নবীজীর নিকট নবীজীর মসজিদে আসিয়া হঠাৎ সে মসজিদের ভিতরেই এক জায়গায় প্রস্রাব করিতে লাগিল। ছাহাবীগণ তাহার প্রতি তিরস্কার আরম্ভ করিলে নবীজী তাঁহাদিগকে বাধা দিয়া বলিলেন, তাহার প্রস্রাব বন্ধ করিও না (হঠাৎ প্রস্রাব বন্ধ করায় রোগের আশঙ্কা থাকে)। অতঃপর ঐ ব্যক্তিকে ডাকিয়া নবী (দঃ) তাঁহার নিকটে আনিলেন। ঐ ব্যক্তির নিজের বর্ণনা—কসম খোদার! নবীজী আমাকে একটুও ধমকাইলেন না, মন্দ বলিলেন না, কোন প্রকার কঠোরতা দেখাইলেন না। তিনি মোলায়েমভাবে আমাকে বুঝাইলেন, মসজিদ আল্লার এবাদতের ঘর, মল-মুত্র ইত্যাদি অপবিত্র ও ঘৃণার বস্তুর স্থান ইহা নহে। অতঃপর ঐ স্থানে পানি বহাইয়া দিলেন। (মোসলেম)

আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি নবীজীর নিকট তাহার প্রাপ্যের তাগাদায় আসিল এবং কঠোর ভাষায় কথা বলিল। ছাহাবীগণ ঐ ব্যক্তির প্রতি ক্ষেপিয়া উঠিলেন। নবীজী তাঁহাদিগকে বলিলেন, তাহাকে মন্দ বলিও না; পাওনাদারের বলার অধিকার থাকে। (বোখারী শরীফ)

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি নবীজীর সঙ্গে পথ চলিতে ছিলাম।

নবীজীর গায়ে একখানা চাদর ছিল যাহার পাড় মোটা শক্ত ও পুরু ছিল। হঠাৎ এক গ্রাম্য ব্যক্তি আসিয়া নবীজীকে ঐ চাদরে জড়াইয়া অতি জোরে টান দিল এবং বলিল, জনসাধারণকে দেওয়ার যে মাল আপনার হাতে রহিয়াছে উহা হইতে আমাকে কিছু দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। তাহার টানের চোটে নবীজীর গ্রীবার উপর ঐ চাদর পাড়ের রেখা পড়িয়া গেল। নবীজী তাহার প্রতি তাকাইয়া হাসিলেন এবং তাহাকে মাল দেওয়ার আদেশ করিলেন। (বোখারী শরীফ)

ইতিহাস প্রসিদ্ধ দানবীর হাতেম তাই-এর পুত্র ছিল "আদী"। তাহারা ছিল খৃষ্টান ; তাহাদের গোত্র প্রভাবশালী ও প্রতাপশালী ছিল, "আদী" ছিল গোত্রপতি। মোসলমানগণ তাহাদের বস্তির উপর আক্রমণ করিলে আদী সপরিবারে পলায়ন করিয়া সিরিয়া চলিয়া যায়। তাহার এক বৃদ্ধা ভগ্নি ছিল, সে বন্দীরূপে মদিনায় উপনিত হইলে নবীজীর করুণা ভিক্ষা চাহে। নবীজী তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে শুধু মুক্তিই দিলেন না, বরং তাহার ভ্রাতার নিকট সিরিয়ায় পৌঁছিবার জন্য সমুদয় ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সে যাইয়া ভ্রাতা আদীকে নবীজীর অসাধারণ অমায়িকতার কথা শুনাইলে আদী নবীজীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সদলবলে মদিনা যাত্রা করিল (বিস্তারিত বিবরণ হিজরী নবম বৎসরের বর্ণনা দ্রষ্টব্য)।

উক্ত আদীর বর্ণনা—সর্ব্বত্র বিজয়ের অধিকারী মোসলেম জাতির প্রধান— মদিনার রাষ্ট্রপতি নবী সম্পর্কে তিনি নানা ধারণা পোষণ করিতেছিল। তিনি মদিনায় উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন ভক্ত অনুরক্তগণের পরিবেশে নবীজী বসিয়া আছেন। এমন সময় একজন অতি সাধারণ মহিলা আসিয়া নবীজীকে অনুরোধ করিল—দরবার হইতে উঠিয়া গোপনে ও নিরবে তাহার কিছু কথা শুনিবার জন্য। তাহার আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে নবীজী তাহার সহিত দূরে গেলেন এবং পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার কথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। মহিলাটির কথা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নবীজী পরম ধৈর্য্যের সহিত তাহার জন্য দাঁড়াইয়া থাকিলেন। হাতেম পুত্র আদী বলেন, বিনয় ও উদারতার এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমি অভিভূত হইলাম এবং আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে, বাস্তবিকই তিনি আল্লার প্রেরিত মহাপুরুষ রসুল। (সীরাতুন-নবী)

নবীজীকে কেহ হাদিয়া—উপঢৌকন দিলে নবীজী তাহাকে উহার প্রতিদান দিতেন। অন্যকেও এই নীতি শিক্ষা দিয়াছেন। "জাহের" নামীয় এক গ্রাম্য ছাহাবী গ্রাম্য চিজ-বস্তু নবীজীর জন্য নিয়া আসিতেন ; নবীজী তাঁহাকে শহরীয় চিজ-বস্তু দানে বিদায় করিতেন এবং কৌতুক করিয়া বলিতেন—জাহের আমাদের গ্রাম, আমরা তাহার শহর।

নবীজী (দঃ) অপরিসীম অমায়িক ও মধুরতাপ্রিয় ছিলেন, তাই তিনি ভক্ত অনুরক্ত ছাহাবীদের সহিত কৌতুক-পরিহাসও করিতেন। উল্লেখিত ছাহাবী জাহের (রাঃ)কে

নবী মোহাম্মদ (দঃ) ভালবাসিতেন, তিনি ছিলেন অসুন্দর আকৃতির। একদা তিনি বাজারে বসিয়া কোন জিনিস বিক্রি করিতেছিলেন। নবীজী তাঁহার পেছন দিক হইতে লুকাইয়া আসিয়া তাঁহাকে এমনভাবে জড়াইয়া ধরিলেন যে তিনি পেছন দিক তাকাইতে পারিতে ছিলেন না। প্রথমে তিনি নবীজীর কথা ভাবিতেও পারেন নাই; অন্য লোক ভাবিয়া বলিলেন, কে আপনি? আমাকে ছাড়িয়া দিন। অতঃপর নবীজীকে ঠাহর করিতে পারিলেন এবং যথাসম্ভব নিজের পিঠকে নবীজীর বক্ষের সহিত সাধ্যমতে ঘেঁষিয়া রাখিতে যত্নবান হইলেন। নবীজী ঐ অবস্থায় কৌতুক করিয়া বলিতে লাগিলেন, এই দাসকে খরিদ করিবে কে? তখন ঐ ছাহাবী নিজের অসুন্দর আকৃতির ইঙ্গিতে বলিলেন, আমাকে বিক্রি করিতে চাহিলে আমাকে অচল পাইবেন। নবী (দঃ) বলিলেন, কিন্তু তুমি আল্লার নিকট অচল নও। (মেশকাত ৪১৭)

নবীজী কাহারও অসুস্থতার সংবাদ পাইলে তাহাকে দেখিতে যাইতেন। এমনকি প্রতিবেশী অমোসলেমকেও তাহার রোগ শয্যায় দেখিতে গিয়াছেন। রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার কপালে ও হাতের শিরায় হাত রাখিতেন এবং আশ্বস্ত করিতে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেন—কোন ভয় নাই, কষ্টের বিনিময়ে গোনাহ মাফ হইবে। এতদ্ভিন্ন রোগীর শরীরে বা যাতনাস্থানে হাত বুলাইয়া বিশেষ দোয়া পড়িতেন।

দয়ার দরিয়া নবীজী (দঃ)

দয়া ছিল নবীজীর অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট। তিনি দয়ার যে, ভূমিকা পালন করিতেন উহাই তাঁহার রহমতুল-লিল আলমীন হওয়ার যথেষ্ট প্রমান। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে অতিশয় দয়াল বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

শত্রুর প্রতি দয়া ঃ

মানব চরিত্রে সর্ব্বাধিক দুর্ল্ভ বস্তু হইল শত্রুর প্রতি উদারতা, দয়া ও ক্ষমা। কিন্তু নবীজীর চরিত্র ভাণ্ডারে ঐ দুর্ল্ভ বস্তুরও অভাব ছিল না; তিনি শত্রুর প্রতিও অযাচিত অনুগ্রহ এবং উদারতা ও ক্ষমা প্রদর্শনে অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ছিলেন।

তৃতীয় খণ্ডে মক্কা বিজয় আলোচনায় পরম শত্রু মক্কাবাসীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ও দয়ার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

হোবার ইবনে আসওয়াদ নামক মক্কার এক মহাদুষ্কৃতিকারী যে নবীজীর কন্যা জয়নব (রাঃ)কে মদিনায় হিজরত করাকালে ভীষণ নির্য্যাতন করিয়াছিল। এমনকি সেই আঘাতে তাঁহার গর্ভপাত হইয়া গিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন মোসলমানদের উপর বহু অত্যাচারের অভিযোগ তাহার প্রতি ছিল এবং ইসলামের শত্রুতায় সে অগ্রগামী ছিল। এমনকি মক্কা বিজয় সময়ে প্রাণদণ্ডের আসামী সেও ছিল। সে নবীজীর দরবারে আসিয়া আরজ করিল, ইয়া রসুলাল্লাহ! প্রাণভয়ে ইরানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিলাম। আমার বিরুদ্ধে সব অভিযোগই সত্য, কিন্তু আপনার দয়া ও ক্ষমার

কথা মনে পড়ায় ইসলাম গ্রহণ করার জন্য ফিরিয়া আসিয়াছি। রহমতুল-লিল-আলামীন এই অপরাধীকেও রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দান করিলেন। (সীরতুন-নবী)

মক্কায় খাদ্য সরবরাহের প্রধান উৎস ছিল ইয়ামামা নামক অঞ্চল। তথাকার গোত্রপতি ছুমামা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিয়া ঘোষণা দিলেন—এখন হইতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অনুমতি ছাড়া ইয়ামামা হইতে খাদ্য শস্যের একটি দানাও আর মক্কায় যাইবে না। অল্পদিনের মধ্যেই মক্কায় হাহাকার লাগিয়া গেল। বাধ্য হইয়া মক্কাবাসীরা নবীজীর দ্বারে উপস্থিত হইল। মক্কায় খাদ্যাভাবের সংবাদ শুনিয়া রহমতুল-লিল-আলামীনের দয়া উথলিয়া উঠিল ; তৎক্ষনাত তিনি ছুমামার প্রতি আদেশ পাঠাইলেন খাদ্য অবরোধ তুলিয়া দিবার জন্য। (সীরাতুন-নবী)

তায়েফের ঘটনায় অসাধারণ দয়ার বিবরণ বর্ণিত রহিয়াছে। যাহারা নবীজীকে অকথ্যভাবে অত্যাচার করিয়া তাঁহাকে বেহুস করিয়া ফেলিয়াছিল এবং প্রস্তর বর্ষণে তাঁহার সম্পূর্ণ দেহকে রক্তাক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল—আল্লার আজাব হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে তাহাদের জন্যও দয়ার দরিয়া নবীজী মোস্তফা (দঃ) দোয়া করিয়াছিলেন, আল্লার নিকট অনুনয়-বিনয় করিয়াছিলেন।

এই তায়েফবাসীরাই আট-দশ বৎসর পরও ইসলামের আহ্বান তীর-তরবারি ও বর্শার আঘাতে অত্যাখ্যান করিয়াছে। সুদীর্ঘ যুদ্ধ চালাইয়া ইসলামের প্রতিরোধ করিয়াছে। তাহাদের ভয়াবহ যুদ্ধে নিহত ও আহত ছাহাবীগণকে সম্মুখে রাখিয়া তায়েফবাসীদের প্রতি বদদোয়ার অনুরোধও নবীজীর দরবারে করা হইয়াছে। কিন্তু তিনি তাহাদের জন্য দোয়া করিয়াছেন—আয় আল্লাহ। ছকীফ (তায়েফবাসী) গোত্রকে ইসলামে দীক্ষিত কর এবং তাহাদেরে বন্ধুবেশে মদিনায় হাজির কর।" অচিরেই তায়েফবাসীর ভাগ্যাকাশে সেই দোয়ার নক্ষত্র উদিত হইল—তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিল এবং তাহাদের প্রতিনিধিদল মদিনায় উপস্থিত হইয়া নবীজীর চরণের শরণ লাভে ধৈন্য হইল। (সীরতুন-নবী)

নবীজী (দঃ)কে এই ধরাপৃষ্ঠে সর্ব্বাধিক যাতনা দিয়াছে যাহারা তাহাদের অন্যতম একজন ছিল মোনাফেক-সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। মোসলমানদের মধ্যে কত কত ফাছাদ সে সৃষ্টি করিয়াছে! তাহার ষড়যন্ত্রে ও উস্কানীতে কত কত যুদ্ধ বঁধিয়াছে, মোসলমানগণ বিপদে পড়িয়াছে! এতদ্ভিন্ন সে নবীজীর প্রতি শক্রুতা সাধনে সর্ব্ব প্রকার পথ অবলম্বন করিয়াছে। এমনকি নবীজীর মান-সম্মানকে ঘায়েল করার জন্য পাক-পবিত্রা বিবি আয়েশার উপর জঘন্য অপবাদ গড়াইয়াছে। যাহা মুছিবার জন্য পবিত্র কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে। সেই আবদুল্লাহ আজীবন মোনাফেক রহিয়াছে ; মোনাফেকীর উপরই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ্যে ইসলামের দাবীদার ছিল, তাই নবীজী স্বয়ং তাহার জানাযার নামায পড়াইতে সম্মত হইলেন।

ওমর (রাঃ) আপত্তি করিলেন এবং তাহার দুষ্কৃতিগুলি এক একটা করিয়া নবীজীর স্মরণে আনিয়া দিলেন। এমনকি আল্লাহ তায়ালা যে, পবিত্র কোরআনে বলিয়া দিয়াছেন, মোনাফেকদের জন্য আপনি সত্তরবার মাগফেরাত কামনা করিলেও আল্লাহ তাহাদেরে ক্ষমা করিবেন না—ওমর (রাঃ) ইহাও নবীজীর স্মরণে উপস্থিত করিলেন। দয়ার দরিয়া রহমতুল-লিল-আলামিন ওমরকে উত্তর দিলেন, সত্তরের অধিক করিলে যদি ক্ষমার আশা হয় তবে আমি সেই চেষ্টাও করিব। (বোখারী শরীফ)

মোনাফেকদের জানাযা পড়া এবং তাহাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করা তখনও সুস্পষ্ট নিষিদ্ধ হইয়াছিল না। তাই নবীজী তাঁহার দয়া বশে আবদুল্লার জানাযা পড়াইয়াছিলেন। উহার পরেই পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াত নাযেল হয় উহা নিষিদ্ধ হইয়া যায়।

শিশুদের প্রতি নবীজী ঃ

নবীজীর উদারতা এবং দয়া ও স্নেহ-মমতা এতই সম্প্রসারিত ছিল যে, শিশু—কচিকাচারাও তাহা উপভোগ করিত।

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী (দঃ) বালকদের নিকটবর্ত্তী পথে গমন করিতে বালকদিগকে সালাম করিলেন। (বোখারী শরীফ)

একদা এক বিবাহের মজলিস হইতে কচিকাচারা তাহাদের মাতাদের সহিত বাড়ী ফিরিতে ছিল। দূর হইতে নবীজী তাহাদিগকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তাহারা নিকটে আসিলে স্নেহভরে তাহাদিগকে বলিলেন, আমি তোমাদিগকে খুবই ভালবাসি।

কোন কোন সময় নবীজী কোথাও হইতে মদিনায় প্রবেশকালে কচিকাচাদেরকে পথে দেখিলে তাহাদিগকে নিজ বাহনের অগ্রপশ্চাদে বসাইয়া লইতেন।

একদা এক ছাহাবী তাঁহার শিশু কন্যাকে লইয়া নবীজীর সাক্ষাতে গেলেন। কথাবার্ত্তার মধ্যে এক সময় মেয়েটি তাহার শিশুসুলভ কৌতুহল বশে নবীজীর পৃষ্ঠদেশে মোহরে-নবুয়তকে নাড়িয়া-চাড়িয়া খেলা আরম্ভ করিল। পিতা কন্যাকে ধমক দিলে নবীজী (দঃ) পিতাকে বারণ করিয়া বলিলেন, উহাকে খেলিতে দাও। (বোখারী)

মৌসুমের বা কাহারও গাছের প্রথম ফল ছাহাবীগণ নবীজীর নিকট হাদিয়ারূপে নিয়া আসিতেন। নবীজী উহাকে উপলক্ষ করিয়া মদিনার ফল-ফসলে বরকতের দোয়া করিতেন। অতঃপর ঐ ফল কোন শিশুকে দিয়া দিতেন। (বোখারী শরীফ)

নবীজী অনেক সময় শিশুকে দেখিয়া আদর-স্নেহে চুম্বন করিতেন। একদিন এক গ্রাম্য ব্যক্তি তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া বলিল, আমার দশটি সন্তান আছে; আমি কাহাকেও চুম্বন করি না। নবীজী রুষ্টতার সহিত উত্তর দিলেন, আল্লাহ যদি তোমার অন্তর হইতে স্নেহ-মমতা উঠাইয়া লইয়া থাকেন তবে আমি কি করিব?

কৃচ্ছ্রতার জীবন-যাপন শিক্ষা দানে নবীজী ঃ

আয়েশা (রাঃ) দুম্বার লোমে বুনানো গায়ে দেওয়ার একখানা কম্বল এবং তহবন্ধ রূপে পরিধেয় একখানা মোটা চাদর—এই কাপড় দুইখানা দেখাইয়া বলিয়াছেন, এই পোষাকেই নবীজী পরপারের ছফরে ইহকাল ত্যাগ করিয়া ছিলেন। (বোখারী)

নবীজীর বিছানা সময়ে চামড়ার ভিতরে খেজুর গাছের আঁশ ভরা গদী হইত এবং সময়ে লোমের তৈরী চট বা কাপড় ভাজ করা বিছানা হইত ; তাহা অধিক নরম হইত না। বিবি হাফ্‌ছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক রাত্রে আমি বিছানার কাপড়টা চার ভাজ করিয়া বিছাইলাম যেন একটু নরম হয়। ভোর বেলা নবীজী এই নরম বিছানার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। (শামায়েল তিরমিজি)

একদা নবীজী খালি চাটাই-এর উপর শয়ন করিয়াছিলেন ; নিদ্রা হইতে উঠিলে দেখা গেল, তাঁহার দেহে চাটাই-এর রেখা পড়িয়া গিয়াছে। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) আরজ করিলেন, অনুমতি দিলে আমরা বিছানা তৈরী করিয়া দেই। নবী (দঃ) বলিলেন, দুনিয়ার আরাম-আয়েশ আমার প্রয়োজন কী ? দুনিয়ার সঙ্গে ত আমার সম্পর্ক ঐরূপ মাত্র যেরূপ কোন পথিক বিশ্রামের জন্য গাছের ছায়ায় বসিয়াছে; অল্প সময়ের মধ্যেই সে উহা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। (মেশকাত ৪৪২)

ওমর (রাঃ) বর্ণিত এইরূপ একটি ঘটনা প্রথম খণ্ডে ৭৫নং হাদীছে বর্ণিত আছে।

সাধারণ স্বভাবে নবীজী ঃ

নবী (দঃ) কখনও কোন আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতেন না। গৃহে আসিতে হাস্যোজ্জল চেহারায় প্রবেশ করিতেন। ভক্ত-অনুরক্ত বন্ধুজনের মধ্যেও পা ছড়াইয়া বসিতেন না।

নবী (দঃ) অত্যধিক লজ্জাশীলও ছিলেন। পর্দানশীন কুমারী কী লজ্জাবতী হয় ? নবী (দঃ) তদপেক্ষা অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। এমনকি অরুচিকর কোন কিছুর সম্মুখীন হইলেই উহার প্রতিক্রিয়া তাঁহার চেহারার উপর ভাসিয়া উঠিত। (বোখারী)

গৃহের কাজকর্ম্ম নবীজী নিজে করিতেন, এমনকি ছেড়া কাপড় ছেড়া জুতা নিজ হাতে সেলাই করিতেন। বাজার হইতে সওদাপত্র নিজে বহন করিয়া আনিতেন। গৃহের বকরি দোহাইতেন। নবীজী তাঁহার নিজ গৃহের জীবনব্যবস্থা এতই সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, গৃহে পাতলা চাপাতি রুটি চোখেও দেখেন নাই। নিজ গৃহে কোন সময় দিনের দুই বেলা তৃপ্তির সহিত রুটি জুটিত না— এক বেলা রুটি খাইলে আর এক বেলা খোরমা খাইয়া থাকিতে হইত। অনেক সময় সকাল বেলা বিবিগণের ঘরে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন—খাবার কিছু আছে কি ? যদি বলা হইত কিছু নাই, তবে এই বলিয়া বাহির হইয়া আসিতেন, আচ্ছা ! আজ আমি রোযা রাখিলাম। (মেশকাত শরীফ)

নবী (দঃ) দোয়া করিতেন, আয় আল্লাহ! আমার জীবন যেন মিছকীনদের অবস্থায় কাটে, মৃত্যুও যেন মিছকীনদের অবস্থায় হয়, হাসর ময়দানেও যেন মিছকিনদের সঙ্গে থাকি। আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দোয়া কেন করেন? নবীজী বলিলেন, মিছকীনগণ ধনীদের অনেক আগে বেহেশতে যাইবে। নবীজী আরও বলিলেন, হে আয়েশা। মিছকীনকে খালি হাতে ফিরাইও না; খোরমার এক অংশ হইলেও তাহাকে দিও। হে আয়েশা! মিছকীনকে ভালবাসাদিও, তাহাদেরে নিকটে আনিও আল্লাহ কেয়ামতদিবসে তোমাকে তাঁহার নিকটে নিবেন। (মেশকাত ৪৪৭)

নবীজীর নিকট আল্লাহ তায়ালা মক্কার কোন পাহাড়কে স্বর্ণের খনি বানাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব পাঠাইলেন। নবীজী (দঃ) তখন দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! আমি একদিন খাইব, আর একদিন না খাইয়া থাকিব। যখন খাইব তখন তোমার শোকর করিব, আর যখন অনাহারী থাকিব তখন ছবর করিব। অর্থাৎ এইভাবে শোকর ও ছবর উভয় রকমের বন্দেগী আদায় হইবে।

আদর্শ নেতৃত্ব শিক্ষা দানে নবীজী ঃ

নবীজীর হৃদয়ে বিবি ফাতেমার স্থান সম্পর্কে বর্ণনা দিতে হয় না। সেই ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গৃহে ভৃত্য না থাকায় তাঁহাকেই গৃহকাজ সমাধা করিতে হইত। এমনকি আটার চাক্কি চালনায় বিবি ফাতেমার হাতে কড়া পড়িয়া গিয়াছিল এবং পানির মশক বহনে তাঁহার বক্ষে নিলা রেখা পড়িয়া গিয়াছিল। ইতিমধ্যেই জেহাদলব্ধ সম্পদের মধ্যে কতিপয় দাস-দাসী লাভ হইয়াছিল। এই সুযোগে আলী (রাঃ) নবীজীর খেদমতে একটি দাসীর আবেদন পেশ করিলেন। নবীজী বলিলেন, দেখ! এখনও ছোফ্‌ফায় আশ্রয় গ্রহণকারী ছিন্নমূল লোকদের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয় নাই। যাবৎ না তাহাদের সুব্যবস্থা হইয়া যায় তোমাদের জন্য আমি কিছুই করিতে পারিব না। (আবু দাউদ শরীফ)

আর এক সময় আলী (রাঃ) নবীজীর নিকট কোন বস্তুর আবদার করিলে নবীজী বলিলেন, তোমাকে দিব আর ছোফ্‌ফার নিঃসহায় ব্যক্তিরা ক্ষুধার্ত্ত থাকিবে এইরূপ কখনও হইতে পারে না। (সীরাতুন-নবী—মোছনাদে-আহমদ)

একবার নবী (দঃ) ফাতেমা রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার গলায় স্বর্ণের মালা দেখিতে পাইয়া বলিলেন—হে বৎসে! লোকে যদি বলে যে, পয়গাম্বরের কন্যার গলায় অগ্নির ফাঁস পড়িয়াছে—তাহা তুমি পছন্দ করিবে কি? (নাছায়ী শরীফ)

দৈনন্দিন অবস্থায় নবীজী ঃ

চলাফেরা ঃ পথ চলাকালে নবী (দঃ) সম্মুখপানে অবনত দৃষ্টিতে সামান্য ঝুঁকিয়া বিনয়ীর আকৃতিতে হাটিতেন—যেন উচ্চ হইতে নীচের দিকে অবতরণ করিতেছেন। দীর্ঘ পদক্ষেপে চলিতেন, তাই দ্রুত পথ কাটিত। পা হেঁছড়াইয়া চলিতেন না।

কথাবার্ত্তা ঃ নবীজী (দঃ) সুস্পষ্ট উচ্চারণে ধীরে ধীরে কথা বলিতেন। তাঁহার কথা অত্যন্ত মধুর এবং হৃদয়গ্রাহী হইত; কথায় তিনি মানুষের মনকে সহজে জয় করিয়া নিতেন; শত্রুগণ তাঁহাকে যাদুকর বলিবার ইহাও একটি কারণ ছিল। গুরুত্বপূর্ণ কথা হইলে তাহা তিনবারও বলিতেন ঃ প্রয়োজন বা ছওয়াব লাভের ক্ষেত্র ছাড়া কথা বলিতেন না। বেশী সময় চুপ থাকিতেন—ভাবগম্ভীর অবস্থায় চিন্তামগ্ন থাকিতেন। হাসিতেন কম এবং একমাত্র মুচকি হাসিই হাসিতেন।

ভাষণ বা বক্তৃতা ঃ তাঁহার ভাষণ বক্তৃতা অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা দ্বারা আরম্ভ হইত। মাটিতে দাঁড়াইয়া, মিম্বারে আরোহণ করিয়া, বাহনের পৃষ্ঠে থাকিয়া—যখন যেরূপ অবস্থায় প্রয়োজন বা সুযোগ হইত ভাষণ দিতেন। পরকালের ভীতি প্রদর্শনে ভাষণ দিলে প্রাণ যেন তাঁহার উথলিয়া উঠিত। তাঁহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত, গলার স্বর গুরুগম্ভীররূপে উচ্চতর হইয়া উঠিত এবং ক্রোধান্বিত ব্যক্তির ন্যায় কথায় এবং আওয়াজে তীক্ষ্নতা আসিয়া যাইত। অত্যন্ত আবেগপূর্ণ হইত তাঁহার সতর্কবাণী; মনে হইত, যেন তিনি সকাল বা বিকাল মুহূর্ত্তে আক্রমণে আগত শত্রু সৈন্য হইতে জাতি ও দেশবাসীকে সতর্ক করিতেছেন। বক্তৃতার জন্য মিম্বারে আরোহণ করিয়া লোকদের সম্মুখীন দাঁড়াইতেন এবং সালাম করিতেন। আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার উপর বক্তৃতা সমাপ্ত করিতেন। ভাষণ দানকালে সাধারণতঃ লাঠি বা ধনুর উপর ভর করিতেন। (যাদুল-মায়াদ)

পোষাক-পরিচ্ছদ ঃ নবীজী (দঃ) সাধারণতঃ লম্বা চাদর আকৃতির তহবন্দ পরিধান করিতেন—৪॥হাত লম্বা, ৩॥হাত চৌড়া। "পায়জামা" সম্পর্কে ইহাত সকলেই স্বীকার করেন যে, তিনি উহা খরিদ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ গবেষক হাফেজ ইবনুল কাইয়্যেম লিখিয়াছেন, একাধিক হাদীছে প্রমাণিত আছে, তিনি নিজে পায়জামা পরিয়াছেন, এবং ছাহাবীগণ তাঁহার পরামর্শে পায়জামা পরিতেন। (যাদুল-মায়াদ)। গায়ে দিতেন চাদর—৬ হাত লম্বা, ৩॥ হাত চৌড়া; কামিজ আকারের জামাও তাঁহার প্রিয় ছিল। আবা বা জুব্বাও তিনি পরিধান করিতেন। আস্তিনের মুখে রেশমী পাড় লাগানো চর্ম-নির্মিত নওশেরওয়ানীও তিনি পরিতেন। "উত্তরী" গায়ে দিতেন, সাধারণতঃ উহা ডোরাবিশিষ্ট ইয়ামান দেশীয় হইত। একই রঙ্গের তহবন্দ ও চাদর সময় সময় পরিধান করিতেন; অনেকে উহাকে লাল রঙ্গের বলিয়াছেন। কিন্তু অনেকের মতে লাল রঙ্গের কাপড় নবীজী পরিধান করিতেন না, উহা পরিধান করা মকরুহ; নবীজীর ঐ কাপড় লাল ডোরাবিশিষ্ট ছিল।

মোজা (অন্ততঃ শীত মৌসুমে) স্বাভাবিকরূপেই ব্যবহার করিতেন (যাদুল-মায়াদ)। অজুর সময় (শরীয়তের বিধান অনুযায়ী) উহার উপর মছেহ করিতেন। আশি জন ছাহাবী নবীজীর চর্ম্ম-মোজার উপর মছেহ করার ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

মাথায় পাগড়ী বা আমামা বাঁধিতেন ; বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁহার কালো রঙ্গের পাগড়ীর উল্লেখ হাদীছে পাওয়া যায়।

তাঁহার জুতা "না'আল" তথা সেণ্ডেল আকারের ছিল, চর্ম নির্মিত।

জেহাদ রণাঙ্গনে তিনি লৌহবর্ম এবং লোহার শিরাবরণ ব্যবহার করিতেন।

পরিধেয়ে নবীজী (দঃ) সাদা রং বেশী ভালবাসিতেন ; ধুসর বা সোনালী রংও পছন্দ করিতেন, কাল রঙ্গের পরিধেয়ও ব্যবহার করিয়াছেন। পুরুষের জন্য লাল রং পছন্দ না করার প্রমাণই বেশী পাওয়া যায়। নবীজীর দুইখানা সবুজ রং উত্তরী ছিল। একখানা কাল চাদর ছিল, আর একখানা মোটা চাদর ছিল লাল রঙ্গের। একখানা কম্বলও ছিল (যাদুল-মায়াদ)।

খাদ্য ঃ নবীজীর জীবন সাধনাময় ছিল ; কঠোর কৃচ্ছ্রতাই ছিল তাঁহার স্বভাব। শৌখন বিলাসী খানা-পিনার পরিবেশ তাঁহার গৃহে তিনি সৃষ্টিই হইতে দেন নাই। তাঁহার গৃহে চাপাতি রুটি তৈরী হইত না, গোশতও খুব কমই জুটিত, ময়দাও তাঁহার গৃহে দেখা যাইত না—জবের বা গমের মোটা রুটিরই ব্যবস্থা করা হইত। তাঁহার গৃহের উনানে মাসের পর মাস আগুন জ্বলিত না—পানি ও খোরমার উপরই জীবন কাটিত।

সিরকাকেই তিনি রুটি খাওয়ার জন্য তরকারী গণ্য করিতেন। অগ্নিতে গরম করা চর্বির দ্বারাও রুটি খাইতেন। পনিরের সঙ্গে বা খোরমার সঙ্গেও রুটি খাইতেন। শশা জাতীয় সব্জি কাকড়ির সহিত তাজা পাকা খেজুর এবং তরমুজের সহিতও ঐরূপ খাইতেন। ছাগল বা দুম্বার সামনা রানের গোশ্‌ত বেশী পছন্দ করিতেন।

আরবের রীতি ছিল, গোশতের খণ্ড বড় বড় রাখা। খাসি-বকরির রান অনেকে আস্ত রাখিয়া দিত, এবং তাহারা গোশত অতি মোলায়েম রান্না করিত না। ঐরূপ ক্ষেত্রে খাইবার সময় বাধ্য হইয়া গোশ্‌ত ছুরি দ্বারা কাটিয়া নিতে হইত, নতুবা নবীজী (দঃ) দাঁতে কাটিয়াই খাইতেন। সুতরাং সাধারণ অবস্থায় তিনি ছুরি ব্যবহার করিতেন না। তিনি বলিয়াছেন, গোশত খাইতে ছুরি দ্বারা কাটিও না ; উহা অমোসলেমদের রীতি। তোমরা দাঁতে কাটিয়া খাইও ; উহাতে স্বাদও বেশী পাওয়া যায় এবং উহা সহজও বটে।

খাইবার সময় সাধারণতঃ উভয় উরু খাড়া করিয়া বসিতেন ; সময়ে উভয় পা পেছন দিকে এবং গোছাদ্বয়ের উপর উরুদ্বয় স্থাপন করতঃ ঝুকিয়া বসিতেন ; আর বলিতেন, আমি বড় মানুষ নই ; আল্লার অনুগত দাস। সুতরাং আমার খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা ঐ রূপেরই হইবে। আসন করিয়া বা এক হাতের উপর ভর করিয়া বসিতেন না।

মেজের উপর টেবিলের উপর খানা খাইতেন না ; সাধারণতঃ তিনি জমিনের উপর দস্তরখান বিছাইয়া খানা খাইতেন। তাঁহার একটি চামড়ার দস্তরখান ছিল। সম্মুখ দিক হইতে খানা খাইতেন। সাধারণতঃ তিন আঙ্গুলে খানা খাইতেন এবং খাওয়া শেষ করিয়া আঙ্গুল চাটিয়া খাইতেন, তদ্রূপ খাদ্যের পাত্রও পরিষ্কার করিয়া খাইতেন।

খাওয়া আরম্ভে বিছমিল্লাহ বলিয়া আরম্ভ করিতেন এবং সমাপ্তে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিতেন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন দোয়া হাদীছে বর্ণিত আছে। সাধারণতঃ মিঠা বস্তু ভালবাসিতেন বিশেষতঃ মধু অধিক ভালবাসিতেন। তদ্রূপ সব্জির মধ্যে কদু বা লাউ অত্যধিক পছন্দ করিতেন।

পানীয়ঃ নবীজী মোস্তফা (দঃ) ঠাণ্ডা পানি বেশী পছন্দ করিতেন। পানিকে সুস্বাদু করার জন্য সময় সময় পানির সহিত দুধ মিশাইতেন, কোন সময় খোরমা বা কিশমিশ পানিতে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই পানি পান করিতেন। কোন সময় ছাতু এবং দুধ পানিতে মিশ্রিত করিয়া শরবত পান করিতেন। দাঁড়াইয়া পান করাকে নাপছন্দ করিতেন; বসিয়া পান করিতেন।

অভিরুচীঃ সব কাজেই যথাসাধ্য ডান দিক হইতে আরম্ভ করা ভালবাসিতেন; (অবশ্য মসজিদ হইতে বাহির হইতে এবং মলত্যাগের স্থানে প্রবেশ করিতে প্রথমে বাম পা অগ্রসর করিতেন।) মাথায় তৈল অপেক্ষাকৃত বেশী ব্যবহার করিতেন এবং একদিন অন্তর চিরুণী ব্যবহার করিতেন। চুল-দাঁড়ি সুবিন্যস্ত রাখিতেন। সুগন্ধি ভালবাসিতেন। পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন।

দিনের বেলাঃ ফরজ নামাযান্তে কেবলা মুখী আসন করিয়া বসিয়া কিছু সময় জিক্‌র ও ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। সূর্য্যোদয়ের পর ছাহাবীগণের সঙ্গে শিক্ষাদান, উপদেশ দান, স্বপ্নের আলোচনা ইত্যাদি কথাবার্ত্তা বলিতেন। কেহ তাঁহার দ্বারা পানি বরকতময় করিয়া নেওয়ার জন্য আসিলে তাহা করিয়া দিতেন। বেলা একটু উপরে উঠিলে চাশ্‌তের নামায পড়িয়া গৃহে চলিয়া যাইতেন। গৃহের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম্ম সমাধা করিতেন. জনগণকে সাক্ষাৎ দান করিতেন—যাহাতে বেশীর ভাগ সময় কাটিতেন লোকদেরে শিক্ষাদানে, উপদেশ দানে, জনসাধারণের খোঁজ খবর গ্রহণে এবং তাহাদের অভাব-অভিযোগ সমাধানে। নামাযের সময় মসজিদে আসিয়া নামায পড়িতেন। আছরের নামায পড়িয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতেন এবং বিবিগণের প্রত্যেকের ঘরে ঘরে যাইয়া খোঁজ-খবর লইতেন, আলাপ করিতেন।

রাত্রি বেলাঃ বিবিগণের প্রত্যেকের জন্য নবীজীর অবস্থান বণ্টন করা ছিল। যাঁহার ঘরে যেই দিন অবস্থান করা হইত মাগরেবের নামায হইতে অবসর হইয়া সেই ঘরেই আসিতেন এবং রাত্রের খানা-পিনা সেই ঘরেই করিতেন। এশার নামায শেষ করিয়া সেই গৃহে আসিতেন; ঘরে আসিয়া চার রাকাত নফল নামায পড়িতেন, এবং নির্দ্দিষ্ট কতিপয় ছুরা তেলাওয়াত করিতেন। অতঃপর যথা-সত্তর শুইয়া পড়িতেন; এশার পরে সাধারণতঃ কথাবার্ত্তা পছন্দ করিতেন না। শয়ন-শয্যায় বিভিন্ন দোয়া পড়িতেন এবং বাঁ হাত গালের নীচে রাখিয়া ডান পার্শ্বের উপর শুইতেন। রাত্রের

শেষ তৃতীয়াংশে জাগিয়া উঠিতেন এবং এই অবস্থার নির্দ্ধারিত দোয়া পড়িতেন। অতঃপর চোখ-মুখ হইতে নিদ্রাভাব মুছিয়া ছুরা আল-এমরানের শেষ দশটি আয়াত তেলাওয়াত করিতেন। অতঃপর মেছওয়াক করিতেন এবং মশক হইতে পানি লইয়া অজু করিতেন। তারপর নামাযে দাঁড়াইয়া দুই দুই রাকাতে সাধারণতঃ আট রাকাত তাহাজ্জুদ নামায পড়িতেন। কোন কোন রাত্রে একাধিকবার পুনঃ পুনঃ জাগিয়া উঠিতেন এবং নামায পড়িতেন। প্রভাত ঘনাইয়া আসিলে গৃহিণীকে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত করিয়া দিতেন। সময়ে ফজরের জমাতের পূর্ব্বে একটু ঘুমাইতেন, সময়ে শুধু ডান পার্শ্বের উপর হেলান দিয়া আরাম করিতেন, সময়ে গৃহিণীর সহিত আলাপ করিতেন। এর মধ্যেই ফজরের ছুন্নত দুই রাকাত পড়িয়া নিতেন, এবং মোয়াজ্জেনের সংবাদদানে মসজিদে চলিয়া যাইতেন।

রাত্রিবেলা দীর্ঘ দীর্ঘ সময় নামাযে দাঁড়াইয়া কোরআন তেলাওয়াত করিতে থাকিতেন। এমনকি তাঁহার পা ফুলিয়া যাইত; রসের ভারে পায়ের চামড়া ফাটিয়াও যাইত। তাঁহাকে অনুরোধ করা হইত যে, আপনার ত কোন গোনাহ নাই; (অর্থাৎ তবে কেন এত এবাদতের কষ্ট করেন?) নবীজী উত্তরে বলিতেন, যে আল্লাহ আমাকে নিষ্পাপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন আমি তাঁহার শোকরগুজারী করিব না কি?

উম্মতের সমবেদনায় নবীজী ঃ

উম্মতের জন্য তাঁহার যে, দরদ এবং স্নেহ-মমতা ছিল তাহা একমাত্র রহমতুল-লিল-আলামীনের জন্যই সম্ভব হইয়া ছিল। আবুবকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রাত্রে নফল নামায পড়াকালে নবী (দঃ) এই আয়াতে পৌঁছিলেন—

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ ......

"হে আল্লাহ! আপনি যদি তাহাদেরে শাস্তি দেন দিতে পারেন; কারণ তাহারা আপনারই বন্দা। আর যদি ক্ষমা করিয়া দেন তাহাও করিতে পারেন—কাহারও বাধা দেওয়ার ক্ষমতা হইবে না; আপনি সর্ব্বশক্তিমান হেকমতওয়ালা।" (৭পাঃ ১৬রুঃ)

কেয়ামতের দিন হজরত ঈসা (আঃ) তাঁহার উম্মত সম্পর্কে আল্লার দরবারে এই প্রার্থনা করিবেন; উহার আলোচনা উক্ত আয়াতে রহিয়াছে। উহা তেলাওত করিতেই নবীজী তাঁহার উম্মতের স্মরণে ডুবিয়া পড়িলেন এবং সারা রাত্রি দাঁড়াইয়া ঐ একটি মাত্র আয়াতের তেলাওয়াতে রাত্র প্রভাত করিয়া ফেলিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার দ্বারা নবী (দঃ) ছুরা নেছা তেলাওত করাইয়া শুনিতে ছিলেন। যখন আমি এই আয়াতে পৌঁছিলাম—

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ ......

"কি অবস্থা হইবে তখন যখন প্রত্যেক উম্মতের নবীকে তাহাদের সম্পর্কে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব এবং আপনাকেও আপনার উম্মত সম্পর্কে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব।" (৫পাঃ ৬রুঃ) এই আয়াতে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে নবীজী আমাকে ক্ষান্ত হইতে বলিলেন। আমি তাকাইয়া দেখিলাম, তাঁহার নয়নযুগল হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। হাশর-মাঠে নবীজীর উম্মতের বিপদ সম্পর্কে এই আয়াতে আলোচনা হইয়াছে—উহা স্মরণেই নবীজীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই শ্রেণীর শত শত ঘটনা হাদীছে বর্ণিত রহিয়াছে।

হাশর-মাঠে নবীজী মোস্তফা (দঃ) আদি-অন্তের সারা বিশ্ব-মানবের জন্য, তারপর স্বীয় উম্মতের জন্য কত কত উপকার করিবেন তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা সপ্তম খণ্ডে কেয়ামত ও হাশরের বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনায় পাওয়া যাইবে।

সায়াদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একবার আমরা নবীজীর সহিত মক্কা হইতে মদিনার পানে যাত্রা করিলাম। পথিমধ্যে এক জায়গায় নবীজী বাহন হইতে অবতরণ করিয়া আল্লার দরবারে হাত উঠাইলেন এবং দীর্ঘ সময় মোনাজাত করিলেন। অতঃপর সেজদায় চলিয়া গেলেন, সেজদা হইতে মাথা উঠাইয়া পুনরায় দীর্ঘ মোনাজাত করিলেন। আবার সুদীর্ঘ সেজদা করিলেন। এইভাবে পুনঃ পুনঃ সেজদা ও মোনাজাত হইতে অবসর হইয়া ছাহাবীগণকে বলিলেন, আমি আমার উম্মতের মাগফেরাতের জন্য হাত তুলিতেছিলাম। এক এক বারের মোনাজাতে আংশিকভাবে আমার দোয়া কবুল হইত; আমি উহার কৃতজ্ঞতায় সেজদাবনত হইয়া শোকর আদায় করিতাম এবং পুনঃ অধিক মাগফেরাতের জন্য মোনাজাত করিতাম। তাই আমি পুনঃ পুনঃ মোনাজাত ও সেজদা করিয়াছি। (আবু দাউদ)

রহমতুল-লিল-আলামীনের মূল তাৎপর্য্য ঃ

নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আদর্শিক গুণাবলীর আলোচনা করা হইয়াছে; সেই আলোচনা অতি সুদীর্ঘ। হাদীছ ভাণ্ডারে উহার এত অসংখ্য তথ্য ও নজীর পাওয়া যায় যে বহু গ্রন্থেও উহার সঙ্কলন শেষ হইবে না। কিন্তু উল্লেখিত শ্রেণীর তথ্যাবলী রহমতুল-লিল-আলামীনের মূল তাৎপর্য্য নহে, বরং কিঞ্চিত আভাস মাত্র—তাহাও শুধু স্থুল-দৃষ্টিবাদিদের জন্য। নবীজী মোস্তফা (দঃ) যে, রহমতুল-লিল-আলামীন ছিলেন উহার মূল তাৎপর্য্য ঐ জাগতিক আদর্শীয় শ্রেণীর সমুদয় তথ্যাবলী হইতে বহু উর্দ্ধের বহু উর্দ্ধের।

আল্লাহ-ভোলা মানবকে আল্লার সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া, আল্লার পথের অন্ধকে চক্ষু দান করা, ঐ পথের বধিরকে আল্লার ডাক শুনানো—ইহা ছিল নবীজী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবন-সাধনা ও সর্ব্বদার তৎপরতা। ইহার দ্বারাই মানব

তাহার চিরস্থায়ী জীবনের শান্তি ও সুখ লাভ করিতে পারে। সুতরাং মানবের মুখ্য কল্যাণ ও মুখ্য মঙ্গল যাহা—তাহারই জন্য নবীজীর সারা জীবনটাই উৎসর্গীত ছিল। অন্যান্য সকল নবীই এই কাজ করিয়াছেন; সকল নবী-রসুল এই এক উদ্দেশ্যেই প্রেরিত ছিলেন। কিন্তু যেমন, সকল ডাক্তারই রোগের চিকিৎসা করেন, তন্মধ্যে কোন ডাক্তারকে আল্লাহ তায়ালা বৈশিষ্ট্য দিয়া থাকেন সহজ-সুলভ ব্যবস্থায়, কম ঔষধে, অল্প ব্যয়ে দ্রুত রুগীদেরে আরোগ্যের পথে নিয়া যাওয়ার। অন্যান্য নবী-রসুলগণের তুলনায় নবীজী মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বৈশিষ্ট্যও তদ্রূপই ছিল।

মানবের মুখ্য কল্যাণ ও আসল মঙ্গল চিরস্থায়ী জীবনের শান্তি ও সুখ। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيٰوةُ
الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

"দোযখ হইতে মুক্তি ও বেহেশ্ত লাভ—ইহা হইল সাফল্য। দুনিয়ার জীবন ত শুধু ধোকার বস্তু।" (৪ পাঃ ১৯ রুঃ)

মানবকে এই সাফল্যের যোগ্য বানাইতে নবী ভিন্ন অন্য কোন মানুষই কিছু দান করিতে পারে না। সকল নবী-রসুলগণের মধ্যে নবীজী মোস্তফা (দঃ) মানব জাতির জন্য এই যোগ্যতার পথ সর্ব্বাধিক সুগম ও সহজ-সুলভ করিতে সর্ব্বাধিক বেশী কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যাহার ফলে এক বা দুই লক্ষের অধিক নবী-রসুলগণের উম্মত সমষ্টিগত ভাবে যত সংখ্যায় বেহেশ্তী হইবে এক নবীজী মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের উম্মত উহার দ্বিগুণ সংখ্যায় বেহেশ্তী হইবে। তাই তাঁহার আখ্যা হইয়াছে—

রহমতুল-লিল-আলামীন
ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে ও আলা আলিহী
ও আছহাবিহী ও বারাকা ও সাল্লাম